কারবার সংগঠন পরিচয়

(An Introduction To Business Organisation)

[For Three-Year B. Com. Degree Students]

শ্রীনরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী,

এম. এ., বি. কম., এল-এল. বি., ডব্লিউ. বি. ই. এস. (অবসরপ্রাপ্ত)

কারবার সংগঠন বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক,

গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স এণ্ড বিজনেস

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কলিকাতা।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই স্নাতক শ্রেণীতে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করিয়া থাকেন। বাণিজ্যিক বিষয়গুলি সম্পর্কেও একথা বলা চলে। কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ ভিন্ন কোনও বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানলাভের পথ সহজ ও সরল হইতে পারে না—ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। উপযুক্ত পুস্তকের অভাবেই অনেক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বিঘ্নিত হইতেছে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষা মাধ্যম হিসাবে এখনও ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। তবে আশা করা যায় যে, ছাত্রছাত্রীদের এই অসুবিধা শীঘ্রই দূর হইবে। কারবার সংগঠন (Business Organisation) সম্পর্কে অতি অল্পসংখ্যক পুস্তকই বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বিশেষ খ্যাতনামা ও অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের দ্বারা লিখিত সন্দেহ নাই, কিন্তু উক্ত পুস্তকগুলি বি. কম. পরীক্ষার সর্বস্তরের প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করিতে পারিতেছে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক সংখ্যক পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। এজন্য উক্ত অপর্যাপ্ত ভাণ্ডারে যথাযোগ্য স্থান করিয়া লইতে পারিবে ভরসায় এই পুস্তকখানি রচনায় ব্রতী হইয়াছি। সমপর্যায়ের অন্যান্য পুস্তকের সহিত ইহা ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব। পুস্তকখানি কলিকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. কম. পাঠক্রম (Syllabus) অনুযায়ী পাস ও অনার্স পরীক্ষার প্রশ্নাবলীর এবং আধুনিক কারবারী ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত হইয়াছে।

যে খ্যাতনামা লেখকদের পুস্তকাদির তথ্যাদি দ্বারা এই পুস্তকখানি বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সর্বশেষে এই পুস্তকের প্রকাশক, মুদ্রক এবং বন্ধুস্থানীয় সহৃদয় 'প্রুফ' সংশোধনকারীদিগকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি; কারণ ইঁহাদের অক্লান্ত ও অকুণ্ঠ পরিশ্রমের ফলেই পুস্তকখানি অতি অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে প্রকাশিত হইতে পারিয়াছে। ইতি—

সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ } গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পুস্তকখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ পাওয়ায় শিক্ষার্থী ও সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। মাতৃভাষার মাধ্যমে অনার্স পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের এবিষয়ে পড়াশুনার সুযোগ আসায় পুস্তকখানির যথা সম্ভব উৎকর্ষ সাধন করা হইয়াছে এবং এযাবৎ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. কম. পরীক্ষার পাস ও অনার্সে যে স্তরের প্রশ্নগুলি আসিয়াছে উহার যথাযথ উত্তর প্রদানের চেষ্টা করা হইয়াছে। আশাকরি শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকদের নিকট ইহা অধিকতর সমাদর লাভ করিবে। ইতি—

জুন ১৯৭৪ } গ্রন্থকার

বিষয়-সূচী (Contents)

বিষয়		পৃষ্ঠা

———

কারবার সংগঠন পরিচয়

(An Introduction To Business Organisation)

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক সমাজে কারবারী কার্যকলাপ

(Business Activities in Modern Society)

কারবার ও উহার প্রকৃতি (Business and its Nature)

ইংরাজী 'Business' কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। ইহার অর্থ যে-কোনও কাজে ব্যস্ত থাকা (state of being busy in any work)। কিন্তু কারবার সংগঠনে (in Business Organisation) ইহার অর্থ এতটা ব্যাপক নহে। কারবার সংগঠনে ইহা যে অর্থে প্রযুক্ত নিম্নলিখিত দুই-একটি সংজ্ঞা হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে।

Prof. Norman Richard Owens-এর মতে কারবার (Business) হইতেছে যে কোনও প্রচেষ্টা যাহা বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টন ব্যাপারে লিপ্ত থাকে বা মূল্যের বিনিময়ে সেবা পরিবেশন করে (Business means an enterprise engaged in the production and distribution of goods for sale in a market or the rendering of services for a price)।[1]

Prof. S. Chatterjee-র মতে বিক্রেতার নিজ প্রচেষ্টায় উৎপাদিত বা নির্দিষ্ট আকারে অন্য উৎপাদকের নিকট হইতে ক্রীত দ্রব্যাদি ও সেবার পুনঃপুনঃ বিক্রয় কার্যকে কারবার বলে (Recurring sales of those goods and services which are either produced by the seller or purchased from other producers in the given form)।[2]

Prof. M. C. Shukla অর্থনৈতিক ও কার্যকারিতার দিক দিয়া কারবারের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়া কারবারের অর্থ মানুষের কোনও কাজ, প্রচেষ্টা ও আচরণ যাহা ধনোৎপাদনে নিযুক্ত থাকে এবং কার্যকারিতার দিক দিয়া ইহা হইতেছে মানুষের সেই সকল কার্যকলাপ যাহা পণ্য উৎপাদন বা ক্রয়-সংক্রান্ত

1. Business Organisation and Combination (4th Edition) P. 1.
2. Modern Business (7th Edition) P. 1.

ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া উহা মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে বিক্রয় করে (In economic sense, Business means work, efforts and acts of people which are connected with production of wealth. Functionally, by business we mean those human activities which involve production or purchase of goods with the object of selling them at a profit)।[৪]

উপরি-উক্ত সংজ্ঞা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে—

অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য লইয়া মানুষ যে পণ্য ও সেবা উৎপাদন এবং ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে উক্ত কার্যকলাপকে কারবার (Business) বলে। কারবারের ক্ষেত্র ব্যাপক ও নানাবিধ। ইহা প্রকৃতি হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করে, কিংবা অন্যের নিকট হইতে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত দ্রব্যাদি ক্রয় করে। উহারা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের কাজের উপযোগী না হইলে শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে উহাদের উপযোগিতা সৃষ্টি করে। প্রয়োজনমত উক্ত দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ করে। মানুষের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে নানাবিধ দ্রব্য সঞ্চয় করে। এইভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগিতা সৃষ্টি করিয়া মূল্যের বিনিময়ে সম্ভোগকারীদের নিকট বিক্রয় করে। সুতরাং উপরি-উক্ত এক বা একাধিক কার্যে লিপ্ত থাকিয়া নানাবিধ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা একাধারে মানুষের আহার, বাসস্থান, পরিচ্ছদ ও অন্যান্য অভাব পূরণ এবং অন্যপক্ষে অর্থোপার্জন করা কারবারের কাজ। অন্যকথায় বলা চলে—কারবার বিভিন্ন প্রকার উপযোগ সৃষ্টি (creation of utilities) করার বাহন। এই উপযোগগুলি হইতেছে আকার (form), ব্যক্তি (person), স্থান (place), সময় (time), মালিকানা বা স্বাধিকার (ownership or possession), অর্থ (finance), ঝুঁকি (risk), প্রচার (publicity) প্রভৃতি সম্পর্কীয়।

পূর্বে মানুষ যখন নিজের অভাব নিজের চেষ্টাতেই পূরণ করিত কিংবা বিনিময় দ্বারা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিজেদের পরস্পরের অভাব পূরণ করিত তখন কারবারের পরিধি সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায়, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, যন্ত্রাদি ও উন্নত যানবাহনের আবিষ্কার হওয়ায় কারবারের পরিধি দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এইভাবে আধুনিক বা বর্তমান সমাজে কারবারের রূপ এবং কলেবর উভয়ই অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাইতেছে। কারবার এইভাবে বহুমুখী কার্যের মধ্য দিয়া মানুষের সর্ববিধ অভাব পূরণ করিতেছে এবং উহাতে লিপ্ত ব্যক্তিদের জীবিকার সংস্থান করিতেছে। কারবারের প্রকৃতি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইলেও কোন কার্যকে কারবারের আওতায় আনিতে হইলে উহার নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন :

৪. Business Organisation and Management (12th Edition) P. 3.

১। **সম্পদ উৎপাদন ও অর্জন (Production and Acquisition of Wealth)** কারবার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য চাহিদা ও প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। সম্পদ উৎপাদন ও অর্জন ভিন্ন এই চাহিদার পরিতৃপ্তি কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং সম্পদ উৎপাদন ও অর্জন কারবারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কারবারের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে রূপ দান করিতে হইলে প্রকৃতি হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ, শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে উহাদিগকে মানুষের ভোগের উপযুক্ত অবস্থায় আনয়ন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের জন্য সঞ্চয়করণ, সম্ভোগকারীদের চাহিদা অনুযায়ী স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ এবং মূল্যের বিনিময়ে সম্ভোগকারীদের হস্তে সমর্পণ প্রভৃতি কার্যকলাপ প্রয়োজন। ফলে উপরি-উক্ত কার্যকলাপ কারবারের বৈশিষ্ট্যের মূলগত উপাদান।

২। **ক্রয়-বিক্রয়ের পৌনঃপুনিকতা (Recurring Purchases and Sales):** কারবার একটি আকস্মিক ঘটনা নহে। একটিমাত্র ক্রয়-বিক্রয় কারবারের আওতায় আসে না। কারবারে ক্রয়-বিক্রয়ের ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন। ক্রয়-বিক্রয়ের পৌনঃপুনিকতা (recurring purchases and sales) এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া থাকে। একটি জিনিস ক্রয় করিয়া উহার প্রয়োজন ফুরাইল, বা উহা অপছন্দ হইলে কিংবা অর্থের প্রয়োজনে উহা পুনরায় বিক্রয় করিলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়কে কারবারের আওতায় আনা হয় না। লাভের উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হইলেই উহাকে কারবার বলা হয়।

৩। **বিক্রয়ের অভিপ্রায় (Intention for Sale):** উৎপাদন বা ক্রয়কে সাধারণভাবে কারবারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু এই উৎপাদন বা ক্রয়ের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া উহাকে কারবারের আওতায় আনিতে হইবে। পুনর্বিক্রয়ের উদ্দেশ্য না লইয়া ব্যক্তিগত ভোগের জন্য কোন কিছু উৎপাদন বা ক্রয় করিলে উহা কারবার বলিয়া গণ্য হইবে না।

৪। **পারস্পরিক সুবিধা (Mutual Advantage):** কারবার প্রকৃত প্রস্তাবে বিনিময়ের নামান্তর মাত্র। এই বিনিময়ের ফলে যে উপযোগ সৃষ্টি হয় তাহাতে কারবারী মুনাফা লাভ করে এবং ক্রেতা সম্ভোগ-তৃপ্তি লাভ করে। উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত কার্যকলাপের দ্বারা এবংবিধ পারস্পরিক সুবিধা দেখা দিলে উহাকে কারবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়।

৫। **ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা (Risk and Uncertainty):** কারবার করিতে গেলে কিছু ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন অবশ্যই হইতে হয়। সুতরাং ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা যে কারবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পণ্য বা সম্পদ উৎপাদন ও অর্জন করিতে হইলে চাহিদার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ইহা অবশ্যই অনুমানসাপেক্ষ। এই পূর্ব-অনুমান (forecasting) কারবারী ক্ষেত্রে বর্তমান থাকায় ইহা যেমন কারবারের একটি বৈশিষ্ট্য অন্যপক্ষে ইহা

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার নামান্তর মাত্র। ফলে পূর্ব-অনুমান, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা কারবারী ক্ষেত্রে নিজস্ব আসনে অধিষ্ঠিত।

৬। **মুনাফালাভের আশা (Expectation of Profit):** কারবারে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। No risk, no gain. সুতরাং মুনাফালাভের আশাতেই কারবারিগণ এই ঝুঁকি বহন করিয়া থাকে। এজন্য মুনাফালাভের আশা কারবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কারবারের মুনাফা ঝুঁকি বহনের পারিশ্রমিক মাত্র। ইহা ছাড়া মুনাফা কারবারকে সজীব রাখে। অন্যথায় ইহার অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

৭। **ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক দিয়া উৎপাদনক্ষম (Productive from the Individual and Social Point of View):** কারবার যে সেবা বা পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে উহা দ্বারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি পায়। ফলে কারবার ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক দিয়া উৎপাদনক্ষম।

আধুনিক বা বর্তমান সমাজে কারবারের সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি এইভাবে বিশ্লেষণ করা চলে।

কারবারের উদ্দেশ্য (Objectives of Business)

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, মানুষের ক্রমবর্ধমান অভাব, উহা পূরণ করার জন্য নানাবিধ কারবারী প্রচেষ্টা, বিভিন্ন কারবারের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কারবার পরিচালনায় জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। এজন্য আধুনিক সমাজে কতকগুলি উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কারবার পরিচালনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত উদ্দেশ্যগুলি অবশ্য একদিকে জনকল্যাণমূলক এবং অন্যদিকে কারবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করার স্থায়ী পন্থা। এই উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নলিখিত বিভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা চলে।

১। **অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য (Economic Objectives):** কারবারের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হইল মানুষের বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য ও সেবা (goods and services)-র অভাব পূরণ করা এবং এরূপ কারবারে নিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে মুনাফা লাভ করা। কারবার মানুষের নানাবিধ দ্রব্যের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যেই প্রধানত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দ্রব্যাদি মানুষের আহার, বাসস্থান ও পরিচ্ছদের অভাব পূরণ করে। ইহাতে মানুষের দৈহিক তৃপ্তি এবং আরাম সৃষ্টি হয়। ইহা ছাড়া কারবার পুস্তক, রেডিও, গ্রামোফোন প্রভৃতি জিনিসের যোগান দিয়া মানুষের মানসিক পরিতৃপ্তি সাধন করে। নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ, থিয়েটার, সিনেমা, যানবাহন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াও কারবার মানুষের নানাবিধ অভাব পূরণের কার্যে ব্যাপৃত আছে। কিন্তু এই সকল কারবারী ব্যবস্থার মাধ্যমে যাঁহারা মানুষের অভাব পূরণকার্যে লিপ্ত আছেন তাঁহারা উক্ত ব্যবস্থার দ্বারা অর্থোপার্জন ও মুনাফা অর্জন করিয়া থাকেন। এই মুনাফাই কারবার গঠনে প্রেরণা যোগায়। নতুবা কোন ব্যক্তিই কেবল পরোপকারের উদ্দেশ্য লইয়া কারবারে লিপ্ত থাকিতেন না। সুতরাং একাধারে মানুষের অভাব পূরণ এবং অন্য দিকে

মুনাফা লাভ কারবারের মুখ্য উদ্দেশ্য বলা চলে। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া প্রত্যেক কারবারীই কারবার পরিচালনা করিয়া থাকেন।

২। **সামাজিক উদ্দেশ্য (Social Objectives):** কেবল যে-কোন প্রকারে মানুষের অভাব পূরণ এবং মুনাফা লাভের প্রবৃত্তি লইয়া কারবার পরিচালনা করিলে উহাতে কখনই স্থায়ী সাফল্য আসিতে পারে না। Mr. Urwick বলেন: Profit can be no more the objective of a business than eating is the objective of living.[1] মানুষ যেমন একমাত্র খাওয়ার উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকে না তেমন একমাত্র মুনাফা লাভই কারবারের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। অধিক খাইলে পীড়িত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেরূপ অধিক লাভের দিকে মন দিলে কারবারও পীড়িত হইয়া পড়িতে পারে অর্থাৎ উহা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। এজন্য Drucker বলেন: Profit is not the explanation, cause or rationale of business behaviour and business decisions but the test of their validity.[2] মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কালোবাজার সৃষ্টি করিয়া, অযথা দ্রব্যাদি মজুত রাখিয়া, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহিত অপ্রয়োজনীয় জিনিস মিশ্রিত করিয়া প্রভৃতি নানাভাবে মুনাফা অর্জন করা যাইতে পারে। ইহাতে মানুষ তৃপ্তির সহিত তাঁহার অভাব পূরণ করিতে পারে না। এইভাবে কারবার পরিচালিত হইলে উহার প্রতি খরিদ্দারদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ পতিত হওয়া কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। সুতরাং কোন কারবার যদি খরিদ্দারদের যথাযথ অভাব পূরণের দিকে উদাসীন থাকে এবং মুনাফালাভকেই একমাত্র কাম্যবস্তু বলিয়া গ্রহণ করে সেরূপ কারবার কখনই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। এজন্য কারবার পরিচালনায় কারবারীকে সততই মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি যে সমাজে বাস করেন সেই সমাজের তিনি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং তাঁহার কার্যের ফলে সমাজের বা লোকের ক্ষতি হইলে তাঁহারও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। আবার সমাজের উন্নতির অর্থ হইল তাঁহারই উন্নতি। এই মনোভাব লইয়া কারবার পরিচালনা করিলে স্থায়ী সাফল্য অবশ্যই আসিবে। এজন্য কারবারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সমাজের কল্যাণসাধন করা। ন্যায্য মূল্যে ভাল জিনিস খরিদ্দারদের সরবরাহ করা, সরকারকে কর ফাঁকি না দেওয়া, জনহিতকর কাজে যেমন, স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, হাসপাতাল, ধর্ম প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে সাধ্যমত অর্থ ব্যয় করা, কারবারের পরিবেশকে মানুষের বিরক্তি উৎপাদনের কেন্দ্রে পরিণত না করা ইত্যাদিও কারবারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক কারবারীই এরূপ প্রয়োজন অনুভব করেন ও এবংবিধ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কারবার পরিচালনায় প্রবৃত্ত হন।

৩। **মানবিক উদ্দেশ্য (Human Objectives):** মানবিক উদ্দেশ্য কারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। কারবারের

1. The Elements of Administration (1958) P. 27.
2. The Practice of Management (1963) P. 28

কর্মচারীদের, খরিদ্দারদের এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি না দিলে কারবারের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। খরিদ্দারদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তদের প্রতি কারবারীর কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী থাকা উচিত উহা 'সামাজিক উদ্দেশ্যে' বর্ণিত হইয়াছে। কর্মচারীদের সুখ-সুবিধার প্রতি কিরূপ দৃষ্টি দেওয়া উচিত উহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে বলা প্রাসঙ্গিক। কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতন, মর্যাদা, কাজের স্থায়িত্ব, কারখানা বা কারবারী প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ প্রভৃতি যাহাতে কর্মচারীদিগের কাজে ও মনে উৎসাহ আনিতে পারে সেরূপ উদ্দেশ্য প্রত্যেক কারবারের থাকা উচিত; কারণ কোন কারবারীই এককভাবে কারবার পরিচালনা করিতে পারেন না। কারবারের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইলে কর্মচারীদের সাহায্য প্রয়োজন। এজন্য কর্মচারীরা যদি সন্তুষ্টমনে কাজ করিবার সুযোগ পান তবেই কারবারের সাফল্য সুনিশ্চিত। অন্যথায় কারবারের পতন অনিবার্য। সুতরাং প্রত্যেক কারবারী যাহাতে কর্মচারীদের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কারবার পরিচালনা করিতে পারেন সে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকিবেন।

৪। **জাতীয় উদ্দেশ্য (National Objectives):** জাতীয় উদ্দেশ্য সামাজিক উদ্দেশ্য হইতে কিছুটা পৃথক। কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে উহা কিভাবে পরিচালিত হইলে সামাজিক কল্যাণ সাধন হইতে পারে উহাই সামাজিক উদ্দেশ্যে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু দেশের বা জাতির প্রয়োজনে কি জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হওয়া উচিত সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জাতীয় উদ্দেশ্যের লক্ষ্য। যেমন, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। ইহার উন্নতির জন্য কৃষির উন্নতিমূলক শিল্পাদি যেমন, কৃষির যন্ত্রপাতি, ফসলের কীটনাশক দ্রব্যাদি প্রভৃতি শিল্প গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করা কারবারীদের জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করা, এতদ্ উদ্দেশ্যে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে মনঃসংযোগ করা জাতীয় উদ্দেশ্যের মুখ্য কাজ। কারণ এই জাতীয় মনোভাব কারবারীদের মধ্যে প্রবেশ না করিলে উহারা অযথা মুনাফালাভের দিকেই মন দিবে এবং দেশের প্রয়োজনের দিকে যে তাহাদের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে সেদিকে অজ্ঞ থাকিবে। এরূপ পরিস্থিতিতে কারবারীদের আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি হইলেও দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত না হইয়া যায় না। দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হইলে কারবারিগণও উহা হইতে বাদ পড়েন না এবং তাঁহাদের স্বার্থও বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সবদিক দিয়া বিচার করিলে উভয়ের স্বার্থে জাতীয় উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রত্যেক কারবারীর অবশ্য প্রয়োজন।

কারবারের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক (Individual and Social Aspects of Business)

মানুষ নানাভাবে জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। কারবার উহাদের মধ্যে একটি।

শাস্ত্রে বলে—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য বা কারবার ধন উৎপাদনের এবং উপার্জনের একটি শ্রেষ্ঠ পন্থা। এজন্য বহু লোকে কারবারের দ্বারা জীবিকা অর্জনে আগ্রহশীল। কারণ, কারবারে প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হইলে এবং প্রচুর ধনাগম হইলে কারবারীর পক্ষে মান, সম্ভ্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই লাভ করা সম্ভব হয়। এজন্য কারবার যাহাতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তাহার জন্য প্রত্যেক কারবারী যত্নশীল থাকেন। ইহা কারবারের ব্যক্তিগত দিক (individual aspects)। ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা কারবার প্রতিষ্ঠা করার অনুপ্রেরণা যোগায়। আমাদের দেশের বিড়লা, টাটা প্রভৃতি পরিবার এইভাবে বিভিন্ন কারবার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছেন এবং বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ হিসাবে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। অন্যান্য দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ যেমন, হেনরি ফোর্ড, রকফেলার প্রভৃতি এইভাবে কারবারের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং ব্যক্তিগত বিচারে কারবার অর্থ উপার্জনের একটি শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র এবং কারবারীর যত্নশীল চেষ্টা থাকে তাঁহার কারবারকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। কারবারের এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে উহাতে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আসিয়া যায় :

১। ইহাতে কারবারীর ও উঁহার পরিবারবর্গের জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থা হয়। কারণ কারবার উঁহার আয়ের উৎস।

২। কারবার লাভজনক হইলে উঁহার আয়ের সবটাই ভোগের জন্য ব্যয়িত হয় না। ফলে উঁহার কিছুটা সঞ্চয় হয়। অন্য কথায় কারবার উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে এবং উক্ত উদ্বৃত্ত কারবারে নিয়োজিত হইয়া উহার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়া থাকে।

৩। কারবারে লাভ ব্যক্তিগত ধনসম্পদ সৃষ্টি করিতেও সাহায্য করে।

৪। ব্যক্তিগত ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইলে সামাজিক মর্যাদা, মান, সম্ভ্রম, প্রভাব, প্রতিপত্তি প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়।

৫। উক্ত অবস্থা কারবারীকে দেশের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতেও সাহায্য করে।

সুতরাং কারবারের ব্যক্তিগত দিক (Individual aspects) বিচার করিলে উহা যে অর্থোপার্জন এবং মুনাফালাভের ক্ষেত্র ইহাই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু কারবারের এই ব্যক্তিগত দিক উপেক্ষণীয় না হইলেও ইহার একটি সামাজিক দিক (Social aspects)-ও আছে। কারণ কারবারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে সমাজও নানাভাবে উপকৃত হয়। উহা নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। কারবারের মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানুষ তাহার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়

দ্রব্যাদি ও সেবা অনায়াসে পাইয়া থাকে। ইহাতে সামাজিক জীবনযাত্রা সহজ, সরল ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয়।

২। কারবারী কার্যকলাপের ফলে যে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে উহাতে দেশের উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে এবং লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়।

৩। উপরি-উক্ত অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে এবং মানুষের বেকারত্ব দূর হয়।

৪। কারবারী কার্যকলাপের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিলে দেশে শিল্পী ও দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি হয়, গবেষণার সুযোগ-সুবিধা ঘটে, নূতন নূতন দ্রব্যাদি উৎপাদন আরম্ভ হয় ও নূতন নূতন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন হয়।

৫। কারবারের প্রসার হইলে বহির্বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে। এই বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত উন্নতিও দেখা দেয়।

সুতরাং কারবারের সামাজিক দিক জনকল্যাণ ও জনসেবারই মুখপাত্র। তবে কারবারের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উদ্দেশ্য ঠিকমত সাধিত হইতে হইলে কারবারীকে কতকগুলি নীতিগত বাধা-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়।

কারবারের ব্যক্তিগত দিক হইতে মুনাফা লাভ কারবারের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু একমাত্র মুনাফা লাভ প্রবৃত্তি লইয়া কারবার পরিচালনা করিলে কারবারে সাফল্যলাভ অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। কারণ খরিদ্দারদের বা সম্ভোগকারীদের শোষণ করিয়া মুনাফা লাভে প্রবৃত্ত হইলে উহারা কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। একথাও সত্য যে, (প্রত্যেক উৎপাদক বা কারবারীও একজন খরিদ্দার বা সম্ভোগকারী।) সুতরাং এরূপ অবস্থায় কেবল মুনাফা লাভ কারবারের উদ্দেশ্য হইলে খরিদ্দার বা সম্ভোগকারী হিসাবে ন্যায্য মূল্যে জিনিস না পাইলে তাহার ঠকিবার বা অসন্তুষ্ট হইবার সঙ্গত কারণ ঘটিবে। যে কারবার এইভাবে খরিদ্দার ঠকানোর কাজে লিপ্ত থাকে উহার নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে সব খরিদ্দার সরিয়া পড়িতে বাধ্য। ফলে কারবারের পতন অনিবার্য। কারবারী নিজেকে সম্ভোগকারী এবং উৎপাদক এই উভয় হিসাবে গণ্য করিলেই উহা বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং কারবারের মুনাফা লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছাড়া ইহার একটা সামাজিক দিক আছে। এই সামাজিক দিক নানাবিধ সামাজিক দায়িত্ব পালনের দিকে কারবারীর কর্তব্য নির্দেশ করিয়া থাকে। কারবারীর স্থায়ী সাফল্য ইহাদের উপর নির্ভর করে। খরিদ্দারদিগকে ন্যায্যমূল্যে ভাল জিনিস সরবরাহ করা, সরকারকে কর ফাঁকি না দেওয়া, জনহিতকর কার্যে অর্থব্যয় করা, জাতীয় ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, কারবারকে জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করা, সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর এবং বিরক্তিকর কোন অবস্থার সৃষ্টি না করা, একচেটিয়া কারবারের মনোভাব ত্যাগ করা, অযথা

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না করা বা কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি না করা প্রভৃতি কারবারীর সামাজিক দায়িত্ব। এই সামাজিক দায়িত্ব পালিত না হইলে সমাজের কল্যাণকর রূপ নষ্ট হয় এবং উহাতে দুর্নীতি প্রবেশ করে। সুতরাং কারবারীর পক্ষে কারবারের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা বর্তমানযুগে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

কারবারের সামাজিক দায়িত্ব (Social Responsibilities of Business)

মুনাফা লাভের জন্য যে কারবার পরিচালিত হয় একথা কেহ অস্বীকার করেন না। কারণ মুনাফা প্রবৃত্তিই কারবার গঠনে প্রেরণা যোগায়। কেহই কেবল পরোপকারের জন্য বা দানের জন্য কারবার পরিচালনা করেন না। কারবার একটা ঝুঁকির ব্যাপার। কারবারে লাভের আশা না থাকিলে কেহ এই ঝুঁকি বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং ঝুঁকি বহনের জন্য লাভ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু কারবারে এই লাভ শুধু শুধু গড়িয়া উঠে না। সৎকারবারীর কার্যকলাপের ফলে সমাজ প্রভূত উপকৃত হয়। কিন্তু সমাজও নানাভাবে কারবারীর উপকার সাধন করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজ দেশের মধ্যে অনুকূল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া কারবারীকে প্রভূত সাহায্য করিয়া থাকে। যেমন, কারবার করিতে হইলে ভূমি (land), শ্রম (labour), মূলধন (capital), সংগঠন (organisation) এবং বাজার (market) নিতান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কারবারীর নিজস্ব দান হইতেছে মূলধন এবং সংগঠন। কারবারীকে অন্যান্য উপাদানের জন্য সমাজের উপর নির্ভর করিতে হয়—অর্থাৎ সমাজের যোগানদার, শ্রমিক, ক্রেতা প্রভৃতির সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। এইভাবে পরস্পরের মধ্যে দায়-দায়িত্ব, সহযোগিতা প্রভৃতি গড়িয়া উঠে। অতীতে কারবারে ব্যক্তিগত দিক অধিক প্রবল ছিল। মুনাফালাভের জন্য অনেক উচিত-অনুচিত পন্থা গৃহীত হইত। শিক্ষা ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে বর্তমানকালে কারবারের সামাজিক দিকটাও বিশেষ গুরুত্বলাভ করিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে কারবারের ক্রমবর্ধমান বিস্তার, ব্যাপক মালিকানাযুক্ত কারবারের প্রসার, মালিকানা ও পরিচালনার পৃথকীকরণ, শ্রমিক-মালিক বিরোধ, শ্রমিক সংঘের ক্রমোন্নতি প্রভৃতি কারবারের সামাজিক দায়িত্বের পথিকৃৎ। এজন্য সামাজিক দায়িত্ব পালন ভিন্ন কারবারের সাফল্য অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়ায়। এই দায়িত্ব বিভিন্নমুখী এবং কারবারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট, যথা—শ্রমিক (labour), মালিক (owner), খরিদ্দার (customer), সরকার (government) প্রভৃতির দিকে প্রসারিত। ইহাই কারবারী ক্ষেত্রে সামাজিক-অর্থনৈতিক চিন্তাধারা (Socio-economic ideas)। আধুনিক কারবারী ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারার সম্প্রসারণ ও অগ্রগতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা ভিন্ন বর্তমান জগতে দেশের, সমাজের ও কারবারীদের কল্যাণ সাধন এক অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং পরিবর্তনশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় কারবারী কার্যকলাপের যে মতবাদ (Concepts relating

to business activities arising out of changing socio economic ideas) উহা নানাবিধ সামাজিক দায়িত্ব পালনের পথ নির্দেশক। এজন্য কারবারের সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রকৃতি ও ভাবার্থ (Nature and implications of social responsibilities of business) নিম্নরূপ হওয়া অপরিহার্য :

১। খরিদ্দারদিগকে ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় ভাল জিনিস উপযুক্ত স্থানে ও সময়ে সরবরাহ করা। কারণ, খরিদ্দার সন্তুষ্ট না থাকিলে কারবারের প্রসার ও উন্নতি সম্ভব নহে।

২। নূতন জিনিস উৎপাদন, নূতন চাকুরীর সংস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা। ইহাতে কারবারের উন্নতি সূচিত হইবে এবং কারবার ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া দেশের ও দশের কল্যাণসাধন করিবে।

৩। যে-সকল লোক কারবারে নিযুক্ত থাকিবেন উঁহাদের ভাল বেতন দেওয়া, স্থায়ী চাকুরীর ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য সুখকর পরিবেশ সৃষ্টি করা। ইহাতে কর্মচারিগণ সন্তুষ্টচিত্তে কাজে মন দিতে পারিবেন এবং উহাতে তাঁহাদের কাজে আগ্রহ জন্মিবে। এরূপ অবস্থা ভিন্ন কারবারের প্রসার ও উন্নতি কখনই সম্ভব নহে।

৪। কারবারের প্রসার ও উন্নতির কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে উহা যাহাতে সমাজের কল্যাণকর হয় এবং কোন প্রকার ক্ষতির কারণ না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে। এইভাবে কারবারের প্রতি লোকের সহানুভূতি দেখা দিবে এবং কারবারও ইহাতে লাভজনক হইবে।

৫। কারবারের সম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং উহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুষ্ঠু ব্যবহার অত্যাবশ্যক। যাঁহারা কারবারে মূলধন নিয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা যাহাতে মূলধনের উপর উপযুক্ত সুদ পান সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সম্পত্তির ব্যবহারের ফলে কোন জাতীয় ক্ষতি (National Loss) যাহাতে সাধিত না হয় উহার দিকে মনোযোগ দেওয়াও কারবারের অন্যতম দায়িত্ব।

৬। সরকারের পাওনা ট্যাক্স বা অন্য কিছু ঠিকমত সময়ে দেওয়া। কারণ সরকার কারবার পরিচালনার নিরাপত্তা সৃষ্টি করে। উহার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য ভাল পরিবহণের ব্যবস্থা, শক্তি সরবরাহ, আর্থিক সাহায্য প্রভৃতি করিয়া থাকে। ইহার বিনিময়ে সরকারের পাওনা মিটানো কারবারের অন্যতম দায়িত্ব।

৭। যাহাদের সাহায্য ও সহানুভূতির উপর কারবারের উন্নতি নির্ভর করে তাহাদের অভাব-অভিযোগ ঠিকমতভাবে পূরণ করা।

৮। কারবার যে জিনিস সরবরাহ করিবে উহা যেন সমাজের অনুমোদন লাভ করে। কারখানা বা কারবারের অফিস পরিচালনায় দেখিতে হইবে যে, তাহাদের কার্যের ফলে এতদ্ অঞ্চলের আবহাওয়া দূষিত হইয়া লোকের স্বাস্থ্যহানি না ঘটায়, কোনপ্রকার অযথা শব্দ লোকের বিরক্তি উৎপাদন না করে। ইহা ছাড়া, সমাজের

উন্নতির জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা বা তাহাতে সাধ্যমত অর্থ দান করাও বর্তমান সমাজে কারবারের অন্যতম দায়িত্ব।

৯। অযথা জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি বা একচেটিয়া কারবার দ্বারা লোকের অসুবিধা সৃষ্টি না করা।

১০। পাওনাদারদের ন্যায্য পাওনায় বঞ্চিত না করা এবং জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনে অনুপ্রাণিত হওয়াও কারবারের বিশেষ দায়িত্ব।

কারবারের মূলগত সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Basic Features Common to all Business Enterprises)

নিম্নলিখিত মূলগত বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক কারবারেই দেখিতে পাওয়া যায় :

১। **উদ্যোক্তা (Entrepreneur) :** প্রত্যেক কারবারে এক বা একাধিক উদ্যোক্তা থাকিবেন। তিনি কারবার আরম্ভ ও উহার পরিচালনার সকল প্রকার দায়িত্ব বহন করিয়া থাকেন। তিনি যে নামেই অভিহিত হন না কেন এরূপ ব্যক্তি ভিন্ন কারবার আরম্ভ বা পরিচালনার কথা চিন্তা করা যায় না।

২। **সংগঠন (Organisation) :** কোনও উদ্যোক্তাকে কারবার পরিচালনা করিতে হইলে 'সংগঠন' প্রয়োজন। সংগঠন কারবারের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কারবারের বিভিন্ন কাজ ইহার মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করে। এজন্য ইহাকে কারবারের প্রাণ বলা হয়। প্রাণ ছাড়া যেমন দেহ চলে না, তেমনই সংগঠন ভিন্ন কারবার চলে না। সংগঠন ছোট বা বড় হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক কারবারের জন্য ইহা চাই-ই।

৩। **মূলধন (Capital) :** কারবার ছোট হউক আর বড় হউক উহা পরিচালনার জন্য কিছু মূলধন চাই-ই। এই মূলধন কারবারের গৃহ ক্রয় বা নির্মাণে, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য, কর্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। সুতরাং মূলধন ভিন্ন কারবার আরম্ভ ও পরিচালনা করা চলে না।

৪। **পূর্ব-অনুমান (Forecasting) :** কারবারে যে জিনিস উৎপন্ন হইবে বা ক্রয় বিক্রয় হইবে তাহার চাহিদা পূর্ব হইতেই অনুমানসাপেক্ষ। কি পরিমাণ জিনিস বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন করিতে হইবে বা মজুত করিতে হইবে উহার অনুমান করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কারণ, যে জিনিস আজ তৈয়ারী হইবে বা ক্রয় হইবে উহা আগামীকল্য বা পরবর্তী দিবসে অর্থাৎ ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে। সুতরাং প্রত্যেক কারবারে পূর্ব-অনুমান একটি অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য।

৫। **ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা (Risk and Uncertainty) :** কারবারে পূর্ব-অনুমান ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ইহা ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার ব্যাপার। পূর্ব-অনুমান ঠিকমত পরিচালিত হইলে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মাত্রা কম থাকে। সরকারী কারবারে এই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বর্তমান থাকিলেও তজ্জন্য কাহারও খুব বেশী

মাথাব্যথা থাকে না। কিন্তু বেসরকারী কারবারে ইহার জন্য কারবারীকে খুবই চিন্তাগ্রস্ত থাকিতে হয়। সুতরাং ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা প্রত্যেক কারবারের বৈশিষ্ট্য।

৬। **উদ্বৃত্ত সৃষ্টি (Surplus Creation):** কারবার লাভের জন্য বা উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্যই আরম্ভ হয় এবং পরিচালিত হয়। কারবারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে যে পার্থক্য উহাই কারবারের উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি অর্থাৎ লাভ বা লোকসান। ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হইলে লাভ বা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়। যে কারবারে যত বেশী উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইবে সে কারবারের অবস্থা তত ভাল হইবে। কিন্তু কিছু উদ্বৃত্ত ভিন্ন কারবার বেশীদিন চলিতে পারে না। এজন্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টিও কারবারের একটি বৈশিষ্ট্য।

৭। **সেবার মনোভাব (Service Motive):** উদ্বৃত্ত সৃষ্টি কারবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইলেও শুধু শুধু উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় না। সেজন্য চাই সেবার মনোভাব অর্থাৎ খরিদ্দারদের প্রয়োজন ও সুবিধা-অসুবিধার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখা। খরিদ্দারদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া, ন্যায্যমূল্যে এবং ঠিকমত সময়ে ভাল জিনিস সরবরাহ করা ইত্যাদি সেবার মনোভাবের পরিচায়ক। এই সেবার মনোভাব দ্বারা খরিদ্দারদের সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে কারবারে কখনই সাফল্য আসিতে পারে না। এজন্য প্রত্যেক কারবারের সাফল্যের জন্য উহাতে সেবার মনোভাব বর্তমান থাকা অত্যাবশ্যক।

৮। **জন-উদ্দেশ্য (Public Purpose):** জনগণের কল্যাণসাধন বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় কারবারের অন্যতম উদ্দেশ্য। এজন্য যে জিনিস উৎপন্ন হইবে উহা জনসাধারণের ব্যবহারের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়, কারখানার পরিবেশ কর্মচারীর এবং জনসাধারণের বিরক্তিকর না হয়, কারবার পরিচালনার ফলে অযথা হট্টগোল, বিরক্তিকর শব্দ, অস্বাস্থ্যকর পবিস্থিতি প্রভৃতি সৃষ্টি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখাও কারবারের বৈশিষ্ট্য।

কারবারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Business)

কারবারকে প্রধানত নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা চলে :
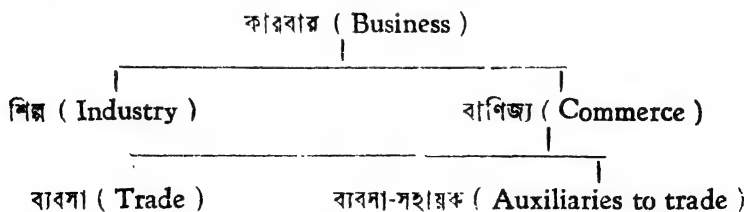
উপরি-উক্ত বিভাগ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কারবারের পরিধি ব্যাপক। শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা প্রভৃতি কারবারের অন্তর্গত। উহাদের বৈশিষ্ট্য এবং পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :

শিল্প (Industry) : যে কর্মপ্রচেষ্টা এবং প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে এবং উহার রূপান্তর ঘটাইয়া মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করে তাহাকে এককথায় শিল্প বলা চলে। সুতরাং শিল্পের কাজ মানুষের ব্যবহারযোগ্য জিনিস প্রস্তুত করা। কর্মপ্রচেষ্টার এবং প্রক্রিয়ার বিভিন্নতার জন্য শিল্পকেও নানাভাগে বিভক্ত করা হয় যেমন, প্রজনন শিল্প (Genetic Industry), নিষ্কাশন শিল্প (Extractive Industry), নির্মাণ-শিল্প (Construction Industry), যান্ত্রিক শিল্প (Manufacturing Industry) ইত্যাদি।

প্রজনন শিল্পের কাজ এমন জিনিস সৃষ্টি করা যাহা পুনরায় সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হইয়া মানুষের ব্যবহার উপযোগী জিনিস সৃষ্টি করিতে পারে। যেমন, শস্যের বীজ শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়া মানুষের ভোগের উপযুক্ত শস্য সৃষ্টি করে। এই শস্যের বীজ উৎপাদন প্রজনন শিল্পের অন্তর্গত।

যে শিল্প-প্রচেষ্টার দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন বা আহরণ হয় তাহা নিষ্কাশন শিল্প নামে পরিচিত। কৃষিকর্ম, খনিজ পদার্থ উত্তোলন, মৎস্য আহরণ, বনজাত কাষ্ঠ আহরণ প্রভৃতি এই শিল্পের পর্যায়ে পড়ে।

স্থপতির (Architect) কর্ম-কুশলতায় এবং বাস্তুকারের (Civil Engineer) প্রচেষ্টায় যে জিনিস সৃষ্টি হয় উহা নির্মাণ শিল্পের অন্তর্গত। সেতু, প্রাসাদ, বাঁধ, সড়ক প্রভৃতি নির্মাণকার্য এই শিল্পের উদাহরণ।

শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল বা অর্ধ-প্রস্তুত জিনিসকে মানুষের ব্যবহার-উপযোগী করার প্রচেষ্টাকে যান্ত্রিক শিল্প আখ্যা দেওয়া হয়। কাঁচামাল তুলা হইতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যে বস্ত্র প্রস্তুত হয় উহা যান্ত্রিক শিল্পের অন্তর্গত। উৎপাদনের প্রক্রিয়া অনুসারে এই শিল্প বিশ্লেষণ (Analytical), যৌগিক (Synthetical), পর্যায়-যুক্ত (Processing) এবং সংযোজন (Assembling) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিশ্লেষণ শিল্পের কাজ একই পদার্থ হইতে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা। যেমন, খনিজ তৈল হইতে পরিস্রাবণ (refining) দ্বারা কেরোসিন, পেট্রোল, মোম প্রভৃতি পাওয়া।

যৌগিক শিল্পের কাজ অনেকগুলি জিনিসের মিশ্রণ দ্বারা একটি জিনিস প্রস্তুত করা। সিমেণ্ট, সার, সাবান এই জাতীয় শিল্প।

যখন কাঁচামাল বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহার-উপযোগী জিনিসে রূপান্তরিত হয় তখন উহাকে বলা হয় পর্যায়-যুক্ত শিল্প। যেমন, কাঁচামাল তুলা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বস্ত্রে রূপান্তরিত হয়। পৃথক পৃথক অনেকগুলি জিনিস একত্র করিয়া যে পূর্ণাঙ্গ জিনিস প্রস্তুত হয় উহাকে সংযোজন শিল্প আখ্যা দেওয়া হয়। মোটর গাড়ী, টাইপ মেসিন প্রস্তুত প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

বিশ্লেষণ, যৌগিক, সংযোজন প্রভৃতি প্রক্রিয়াও একটিমাত্র শিল্পে দেখা যায়। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। এরূপ শিল্পকে বলা হয় Integrated.

উপরি-উল্লিখিত যে-কোনপ্রকার শিল্প-প্রচেষ্টার দ্বারা ব্যবহারযোগ্য জিনিস প্রস্তুত হউক না কেন তাহা তখনই ব্যবহারকারীর কাজে লাগিয়া যায় না। অন্যবিধ প্রচেষ্টার দ্বারা উক্ত জিনিস ব্যবহারকারীর কাজে লাগান হয়। যেমন, শিল্প প্রচেষ্টার দ্বারা কাঁচামাল পাট হইতে মানুষের ব্যবহার উপযোগী চট, থলে, দড়িদড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কিন্তু উক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হওয়ার পর উহা শিল্প কারখানা হইতে স্থানান্তর না হইলে মানুষের কাজে লাগিতে পারে না। আবার পাট যেখানে উৎপন্ন হয় তথা হইতে উহা শিল্প কারখানায় না পৌছাইলে উহা হইতে বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে না। যে কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা কাঁচামাল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পৌছান হয় এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রেতা-সাধারণের নিকট উপস্থিত করা হয় তাহাকে এক কথায় **বাণিজ্য** (Commerce) বলা হয়।

বাণিজ্যের মুখ্য কাজ পণ্য বিনিময়ের বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকা। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, শিল্পের কাজ উৎপাদন এবং বাণিজ্যের কাজ বিনময় ও বণ্টন। আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় কর্মবিভাগ ভিন্ন চলিবার উপায় নাই। কোনও ব্যক্তির পক্ষে নিজ কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সকল অভাব পূরণ করা সম্ভব নহে। মানুষের অভাব পূরণ বর্তমানকালে এই উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ইহাকে এককথায় **কারবার** (Business) বলা চলে। সুতরাং শিল্প ও বাণিজ্য কারবারের উপবিভাগ (Subdivision)। শিল্প এবং বাণিজ্য উভয়ই কারবার এবং মানুষের অভাব পূরণের বাহন। এরূপ অবস্থায় ইহারা এক। সমাজের অভাব পূরণের জটিল অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনের কাজে নিযুক্ত থাকিয়া মানুষের বহুমুখী অভাব পূরণ করা সম্ভব হইতেছে না। এজন্য সুষ্ঠুভাবে অভাব পূরণের কাজ সমাধা করার উদ্দেশ্যে কারবারের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের পৃথকীকরণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কারবারের বিভাগ প্রয়োজন হইলেও এই বিভিন্ন বিভাগ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল (inter-dependent)। কেবল শিল্প-প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষের অভাব পূরণ হয় না। আবার শিল্প উৎপাদন কার্যে ব্যাপৃত না থাকিলে বাণিজ্যের বা বণ্টনের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং শিল্পের এবং বাণিজ্যের কর্মক্ষেত্র পৃথক হইলেও উহারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এই পারস্পরিক সম্পর্কই সভ্যতার ক্রমবিকাশের মূলসূত্র এবং বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর বা গোড়ার কথা। ইহা ভিন্ন প্রাচীনযুগের গুহামানব গুহামানবই থাকিয়া যাইত। তাহার পক্ষে নানাবিধ দ্রব্য ব্যবহার বা সুদৃশ্য ও মনোরম অট্টালিকায় বাস কখনই সম্ভব হইত না।

বাণিজ্যের কাজ বিনিময় ও বণ্টন। এই কাজ বর্তমানকালে খুবই ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে এবং দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর কোনও এক প্রান্তে হয়ত একটি পণ্য উৎপন্ন হইতেছে কিন্তু উহার ভোগ হইতেছে হয়ত পৃথিবীর

বিভিন্ন প্রান্তে। এরূপ ব্যাপকতার জন্য এবং বাজারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের গতিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য বাণিজ্যের কর্মক্ষেত্রের পৃথকীকরণ বা উপবিভাগ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণভাবে বাণিজ্যকে **ব্যবসা** (**Trade**) এবং **ব্যবসা-সহায়ক** (**Auxiliaries to Trade**) এই দুই অংশে বিভাগ করা চলে এবং এই বিভাগ প্রথমেই দেখান হইয়াছে। এরূপ বিভাগে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কে ব্যবসা নামে অভিহিত করা হয়। ব্যবসাকে স্থানীয় Local বা আঞ্চলিক (Regional) অথবা আভ্যন্তরীণ (Home) ও বৈদেশিক Foreign) ভিত্তিতে বা পরিমাণ অনুযায়ী পাইকারী (Wholesale) ও খুচরা (Retail) ক্রয়-বিক্রয়ে বিভক্ত করা চলে। ঁর যাহাদের সাহায্যে এই পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তাহাদিগকে এক কথায় ব্যবসা-সহায়ক নাম দেওয়া চলে। ইহারা ক্রয়-বিক্রয়ের আনুষঙ্গিক কার্যগুলি করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে পরিবহণ (Transport), বিজ্ঞাপন (Advertising), বীমা (Insurance), গুদাম (Warehousing), ব্যাঙ্ক (Banking), প্রতিনিধিত্ব (Agency) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারবারের অন্তর্গত এই বহুবিধ সংস্থার সমবেত চেষ্টায় পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের ব্যক্তিগত, স্থানগত এবং কালগত বাধা দূর হয় এবং বিচ্ছিন্ন ও অগণিত ভোক্তার হাতে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অনায়াসলভ্য হয়।

কারবারীর অত্যাবশ্যক গুণাবলী (Essential Qualifications for a Businessman)

কারবারের সাফল্য অনেকাংশে কারবারীর ব্যক্তিগত চরিত্র ও গুণাবলীর উপর নির্ভর করে। কারবার আরম্ভ এবং চালু করিতে হইলে ভূমি (Land), শ্রম (Labour), মূলধন (Capital) এবং সংগঠন (Organisation প্রয়োজন। ভূমি, শ্রম ও মূলধন প্রয়োজনমত থাকা সত্ত্বেও সংগঠনের যোগ্যতার অভাবে অনেক কারবার সাফল্যলাভ করিতে পারে না। আবার অনেকক্ষেত্রে স্বল্প মূলধন ও শ্রমিক লইয়া সংগঠনের যোগ্যতার বলে কারবারকে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে দেখা যায়। যদিও কারবারের সাফল্যের জন্য সবকিছুই প্রয়োজন, তথাপি সংগঠনের যোগ্যতা যে ইহাতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সুষ্ঠু সংগঠন-ব্যবস্থা অবশ্যই কারবারীর কার্যদক্ষতা ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর উপর নির্ভর করে। এজন্য কারবারীর পক্ষে নিম্নলিখিত গুণাবলীর অধিকারী হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন :

(১) **শিক্ষা** (**Education**) **:** কারবারীর পক্ষে অন্ততঃ সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে তাঁহার মানসিক দুর্বলতা দূর হইবে এবং ধীশক্তির প্রসারতা লাভ হইবে। সাধারণ শিক্ষা ছাড়া কারবার শিক্ষাও অত্যাবশ্যক। ইহার ফলে যে কারবারী জ্ঞান লাভ হইবে উহা কারবার নির্বাচনে ও পরিচালনায় সাহায্য করিবে। সুতরাং উভয়বিধ শিক্ষাই কারবারীর গ্রহণ করা উচিত।

(২) **সেবার মনোভাব** (Service Motive): কারবারের উদ্দেশ্য মানুষের অভাব পূরণ করা। সেবার মনোভাব না থাকিলে এই অভাব পূরণ কখনই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। খরিদ্দারের কি জিনিস কোন্ সময়ে প্রয়োজন সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাকে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিলে এই সেবার মনোভাবের প্রকাশ পায়। ইহাতে খরিদ্দার সন্তুষ্ট থাকেন এবং কারবারেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং কারবারীর এই সেবার মনোভাব থাকিলে কারবারে সাফল্যলাভ সহজসাধ্য হয়।

(৩) **সততা** (Honesty): Honesty is the best policy. একথা কারবারীকে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে। খরিদ্দারগণ কারবারীর সদ্‌গুণের পরিচয় পাইলে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় জিনিস ন্যায্য মূল্যে উপযুক্ত সময়ে পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারেন। এরূপ অবস্থা কারবারের সুনাম বৃদ্ধি করে এবং উহার সাফল্যলাভে সহায়তা করে। অসৎ উপায়ে স্বল্পকালের জন্য কিছু মুনাফা অর্জন বিচিত্র নয়। খরিদ্দারের অভাব, উদাসীনতা এবং ভালমানুষীর ফলে এরূপ মুনাফালাভ অনেকক্ষেত্রে সম্ভব। কিন্তু স্থায়ী সাফল্য একমাত্র সততার উপরই নির্ভর করে। সুতরাং কারবারে স্থায়ী সাফল্য আনিতে হইলে কারবারীর সততা নিতান্ত প্রয়োজন। কারবারীকে একথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত: He can befool all people for some time, some people for all time, but not all people for all time.

(৪) **সময়ানুবর্তিতা** (Punctuality): সময়ের মূল্যবোধ থাকা কারবারীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। দোকান বা অফিস ১০টার সময় খোলার কথা থাকিলে যদি উহা ১১টার সময় খোলা হয় তবে উহাতে কারবারীর সময়জ্ঞানের অভাবই সূচিত হয়। এই সময়ের মধ্যে বহু খরিদ্দার ফিরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইহাতে কারবারের সাফল্যে অবশ্যই বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। সুতরাং প্রতিটি কর্ম নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার উপর কারবারের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। এই সময়ানুবর্তিতার দিকে দৃষ্টি থাকা প্রত্যেক কারবারীরই অবশ্য কর্তব্য।

(৫) **সুযোগের সদ্ব্যবহার** (Full Use of Opportunity): কারবারের গতি প্রকৃতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা কারবারীর অবশ্য কর্তব্য। এই গতি প্রকৃতির দিকে সজাগ দৃষ্টি থাকিলে কারবারের সাফল্যের অনেক সুযোগ-সুবিধাও দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। উক্ত সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের উপর কারবারের সাফল্য অনেকক্ষেত্রে নির্ভর করে। সুতরাং প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার দ্বারাই কারবারী উহার কারবারে সাফল্য আশা করিতে পারেন।

(৬) **সজাগ দৃষ্টি** (Alertness): কারবার এবং খরিদ্দারদের সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখা কারবারের সাফল্যের অন্যতম গুণাবলী। জগৎ পরিবর্তনশীল। খরিদ্দারদের রুচিও পরিবর্তনশীল। সুতরাং এতদ্-উভয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া চলা কারবারের সাফল্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই সজাগ দৃষ্টির অর্থ নূতন নূতন উৎপাদন, চাহিদার পরিবর্তন, যন্ত্র ও প্রয়োগ বিদ্যার প্রসার প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিচয় থাকা। কেবল

অনুসন্ধিৎসা ও পর্যবেক্ষণ শক্তিই এরূপ পরিচয় পাইতে পারে। ইহাই সজাগ দৃষ্টির মূলকথা। এই পরিচয় থাকিলে কালের গতির সহিত হাত মিলাইয়া কারবারে পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। ইহা ভিন্ন কারবারী কখনই খরিদ্দারদের নিত্য-নূতন অভাব-অভিযোগ পূরণ করিতে পারিবেন না। ফলে তিনি কারবারীক্ষেত্রে অনেকের পিছনে পড়িয়া থাকিবেন এবং অকৃতকার্যতার সম্মুখীন হইবেন।

(৭) **পূর্ণ আস্থা (Full Confidence):** খরিদ্দারদের এবং কর্মচারীদের পূর্ণ আস্থা অর্জন করাও কারবারের সাফল্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। এই আস্থা নির্ভর করে কারবারীর চরিত্র ও কার্যকলাপের উপর। চারিত্রিক বলে বলীয়ান হইয়া এরূপ আস্থা অর্জন করিতে পারিলে সকলের মনে কারবারের প্রতি নিরপত্তা-বোধ জাগিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিয়া কারবার সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

(৮) **গণতান্ত্রিক মনোভাব (Democratic Attitude):** বর্তমানকালে গণতন্ত্রের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। কারবারের সাফল্যের জন্য গণতন্ত্রের মূলনীতি কারবারেও প্রতিফলিত হওয়া উচিত। কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ সহানুভূতির চক্ষে বিবেচনা করা এবং তাহাদের মতামত উপেক্ষা না করাই গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয়। ইহার ফলেই অপরের মন জয় করা যায়, জনপ্রিয়তা লাভ করা সম্ভব হয় এবং অধীন কর্মচারীদের ভালবাসা, আনুগত্য ও সহযোগিতা আদায় করা চলে। ইহাতে শ্রমিক-মালিক বিরোধ ঘটিতে পারে না এবং পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। ফলে, তাহাদের পূর্ণ সহযোগিতার এবং কর্মতৎপরতার কোন অভাব হয় না এবং কারবারের সাফল্যলাভে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় না।

(৯) **কর্মদক্ষতা (Ability):** কারবারের উন্নতি এবং সাফল্যের জন্য প্রত্যেক কারবারীর উপরি-উক্ত সাধারণ গুণাবলী থাকা অবশ্য প্রয়োজন। তদুপরি কারবারীর কর্মদক্ষতাও প্রয়োজন। কর্মদক্ষতা শারীরিক সুস্থতা, মানসিক বল, কর্মস্পৃহা প্রভৃতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। এবংবিধ গুণাবলীর অধিকারী হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ভিন্ন কারবারে সাফল্য আনয়ন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সুতরাং কারবারীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করাও কারবারের সাফল্যের জন্য অত্যাবশ্যক।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. Clearly explain what is meant by business activities and also state the purposes of such activities.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1968]

কারবারী কার্যকলাপ কাহাকে বলে উহা ব্যাখ্যা কর এবং এই সকল কার্য-কলাপের উদ্দেশ্য বল।

2. In modern society business is conducted with certain objectives in view. What are those objectives ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1964 ; B. U. B. Com. 1971 ; N. B. B. Com. 1969]

আধুনিক সমাজে কতকগুলি উদ্দেশ্য লইয়া কারবার পরিচালিত হয়। উক্ত উদ্দেশ্যগুলি কি ?

3. Discuss the concept relating to business activities arising out of changing socio-economic ideas.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1971]

পরিবর্তনশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় কারবারী কার্যকলাপ সম্পর্কীয় মতবাদ আলোচনা কর।

4. It is said that business has got two aspects—individual and social. Explain these aspects.

[C. U. B. Com. (Pass) 1965 , (Hons.) 1970]

ইহা বলা হয় যে, কারবারের দুইটি দিক আছে—ব্যক্তিগত ও সামাজিক। এই দিকগুলি ব্যাখ্যা কর।

*5. Discuss the social and individual aspects of business.

[C. U. B. Com. (Pass) 1965 ; (Hons.) 1967 , (Pass) 1971]

কারবারের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক আলোচনা কর।

6. Critically examine the social and individual aspects of business. [C. U. B. Com. (Hons.) 1969]

কারবারের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক আলোচনা কর।

7. It is said that apart from profit motive business has got its social aspects. Give your views. [C. U. B. Com. (Hons.) 1967]

ইহা বলা হয় যে, মুনাফা প্রবৃত্তি ছাড়া কারবারের সামাজিক দিক আছে। তোমার মতামত লিখ।

8. "Sole objects of business is to earn profiit." Critically examine the statement. [C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

"কারবারের মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফালাভ।" এই উক্তির সমালোচনা কর।

9. At present it is often said that business has got social responsibility. Explain its real significance. [C. U. B. Com. (Pass) 1969]

বর্তমানকালে কারবারের সামাজিক দায়িত্ব আছে বলিয়া প্রায়ই বলা হয়। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

10. "Every producer is a consumer." Does this statement mean that a businessman has got obligations to the society ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1967]

"প্রত্যেক উৎপাদক সম্ভোগকারী" এই উক্তির ফলে কি বুঝিতে পারা যায় যে, কারবারীর সমাজের প্রতি দায়িত্ব আছে ?

11. Discuss the social responsibilities of a business enterprise.

[C. U. B. Com. (Pass) 1963 ; (Hons.) 1966 ; B. U. B. Com. 1966 ; 1970]

কারবারী প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্ব আলোচনা কর।

12. Discuss the basic features common to all business enterprises. [C. U. B. Com. (Hons.) 1965 ; (Pass) 1964, 1968, 1970, 1973 ; N. B. B. Com. 1969]

সকল কারবারের মূলগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

13. Discuss the differences amongst trade, industry and commerce. Are they interdependent ? If so, how ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1966]

ব্যবসা, শিল্প ও বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। উহারা কি পরস্পর নির্ভরশীল ? যদি হয়, কিভাবে ?

14. Discuss the essential qualifications for a successful businessman.

সফলকাম কারবারী হইতে হইলে যে অত্যাবশ্যক গুণাবলীর প্রয়োজন উহা আলোচনা কর।

15. Discuss the nature and implications of social responsibilities of a business. [C. U. B. Com. (Hons.) 1972]

কারবারের সামাজিক দায়িত্বের প্রকৃতি ও ভাবার্থ আলোচনা করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যবস্থাপনার কতিপয় শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য

(Meaning and Significance of Some Management Terms)

সংগঠন (Organisation)

সংগঠন (Organisation) বলিতে কি বুঝায় তাহা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। সংগঠনের ভাষাগত অর্থ প্রকৃষ্টরূপে গঠন। অধ্যাপক Haney-র মতে এক বা একাধিক সম-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ বিশেষ অংশসমূহের সুসামঞ্জস্য-পূর্ণ সমন্বয় বিধানকে সংগঠন বলা হয় (Organisation is a harmonious adjustment of specialised parts for the accomplishment of some common purpose or purposes)। অধ্যাপক G. E. Milward-এর মতে কাজ ও কর্মীর মধ্যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ককে সংগঠন বলে (Organisation is the harmonious inter-relation of functions and staff)। অর্থবিদ্যায় সংগঠন উৎপাদনের একটি উপাদান। ইহার কাজ উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান, যথা—ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে একত্রীকরণে সাহায্য করা এবং উৎপাদন-ব্যবস্থা চালু রাখা। কারবারী শাস্ত্রে ইহার অর্থ আরও কিছুটা ব্যাপক। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই উহার সমগ্র কার্যাবলীকে বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া ছোট-বড় বিভিন্ন অংশের সৃষ্টি করা হয়। নির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই বিভিন্ন কর্মী এবং কার্যাংশের মধ্যে যে সুসংবদ্ধ সম্পর্ক গঠন করা হয় উহাই কারবারী শাস্ত্রে সংগঠন নামে অভিহিত। ইহার ফলে বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। পারস্পরিক সম্পর্কের এই কাঠামোই সংগঠন। সংগঠন মানুষের প্রাণবন্ত দেহের মত। দেহ সচল থাকার জন্য যেমন উহাতে প্রাণ থাকা আবশ্যক সেরূপ কারবার চালু রাখিতে হইলে উহার সংগঠন প্রয়োজন। সংগঠন কারবারের ভিত্তি ও প্রাণস্বরূপ।

কারবারের সংগঠন কাঠামো (Organisational structure) বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন, কোনও কারখানার সংগঠন শিল্পের প্রকৃতি, উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদিত দ্রব্যের প্রকৃতি, উৎপাদনের প্রক্রিয়া এবং শ্রমিকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কারখানা সাধারণত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের একটি অংশ বা বিভাগ। সুতরাং কারখানা সংগঠন বলিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিপণন, অর্থসংস্থান, হিসাব রক্ষণ প্রভৃতি বাদ দেওয়া চলে। কারখানার প্রাসঙ্গিক খসড়া চিত্র বা নক্শা নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :
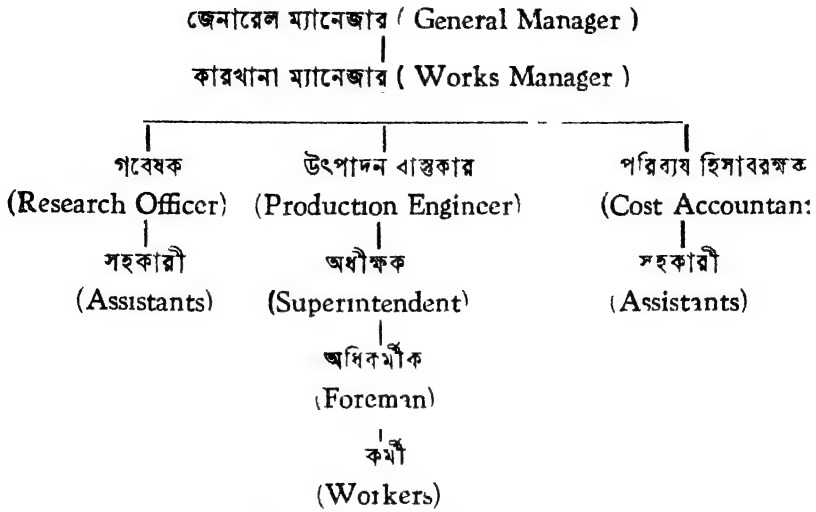
কারখানার প্রধান কার্য উৎপাদন। উৎপাদনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে সংগঠন প্রয়োজন এবং যাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন আবশ্যক তাহা কাঠামো উপরে দেওয়া হইল। উক্ত কাঠামোর ভিতর বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। কর্মীদের সাহায্যে ও পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে সুসংবদ্ধ সম্পর্ক গঠন দ্বারা নির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে।

সংগঠনের মৌলিক তত্ত্ব এবং উপাদান (Principles and Elements of Organisation)

সংগঠনের মৌলিক তত্ত্ব বা নীতি ও উপাদান বলিতে কতকগুলি বিধান বা নিয়মকে বুঝায়। ঐগুলির আলোচনা নিম্নলিখিতভাবে করা যাইতে পারে :

১। **উদ্দেশ্য তত্ত্ব (Principle of Objective) :** সংগঠনের প্রত্যেকটি অংশ একটিমাত্র উদ্দেশ্য সাধনের কাজে ব্যাপৃত থাকিবে। বিভাগীয়, উপবিভাগীয় বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কারবারের সামগ্রিক উদ্দেশ্য রচনা করা এবং তাহাতে উহা প্রতিফলিত করা উদ্দেশ্য তত্ত্বের মূলকথা।

২। **ক্ষমতা এবং দায়িত্ব (Authority and Responsibility) :** ক্ষমতা ও দায়িত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে একত্রিত থাকিবে। কারণ, ইহারা উভয়ই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ক্ষমতা এবং দায়িত্বের সমতা না থাকিলে নানাবিধ বিড়ম্বনা দেখা দিবে এবং স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। আর এই দায়িত্ব পালনে উর্ধ্বতন কর্মচারী মধস্তন কর্মচারীর কাজের জন্য দায়ী থাকিবেন।

৩। **নিয়ন্ত্রণ বিস্তার** (**Span of Control**): মানুষের সামর্থ্য ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সুতরাং একজন ঊর্ধ্বতন কর্মচারী কতজন অধস্তন কর্মচারীর উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারেন এবং তাহাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে তদারক করিতে পারেন তাহা নিরূপণ করাও সংগঠনের একটি মৌলিক তত্ত্ব। সাধারণত সুসংবদ্ধ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একজন ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর পক্ষে Prof. Urwick-এর মতে ৫ হইতে ৬ জন কর্মচারীর কাজ সুষ্ঠুভাবে তদারক করা সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

৪। **স্তর নীতি** (**Scalar Principle**): ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের ক্ষমতা-প্রবাহ অধস্তন কর্মচারীদের উপর কিভাবে প্রয়োগ হইবে তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সংগঠনের অন্যতম মৌলিক নীতি। সকল কর্মীদের মধ্যে ইহা ঠিকমত প্রচারিত হইলে পরস্পরের ভূমিকা, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অবদান সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় এবং সামগ্রিক উদ্দেশ্য সাধনের পথ প্রশস্ত হয়।

৫। **কার্য ও পদমর্যাদা বিভাগ** (**Division of Work and Position**): প্রতিষ্ঠানের কার্যসমূহের সুস্পষ্ট বিভাগ এবং যে ব্যক্তি যে কাজে নিয়োজিত থাকিবেন তাঁহার পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও দায়িত্বের যথাযথ ব্যাখ্যা সুষ্ঠু কর্ম সম্পাদনের জন্য অপরিহার্য। সংগঠন কাঠামোর সুদৃঢ় ভিত্তি ইহার উপর নির্ভরশীল।

৬। **আদেশের সঙ্গতি** (**Unity of Command**): আদেশের সঙ্গতি রক্ষা করাও সংগঠনের একটি মূলনীতি। এজন্য আদেশকারীদের আদেশের মধ্যে যাহাতে পরস্পর বিরোধিতা উপস্থিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কারণ এরূপ অবস্থায় কর্মিগণ সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতে পারে না। ফলে, উহাদের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায় এবং কারবারের উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এজন্য একজন কর্মচারী তাঁহার কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত একজন ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন ইহাই সংগঠনের একটি নীতি হওয়া উচিত।

৭। **ভারসাম্য** (**Balance**): কারবারের কার্যাবলী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। উহাদের কার্যের ধারা বিভিন্ন হওয়ায় উহাদের কার্যের মধ্যে অনেক-ক্ষেত্রে কোন সাদৃশ্য থাকে না। ফলে, ভারসাম্যেরও অভাব ঘটিতে পারে। ভারসাম্যের অভাব ঘটিলে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ, রেষারেষি প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। ইহাতে কারবারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। সুতরাং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কর্মসমন্বয় রক্ষা করিয়া ভারসাম্য বজায় রাখা সংগঠনের অন্যতম মূলনীতি।

৮। **পরিবর্তনক্ষমতা** (**Flexibility**): পণ্যের বাজারের গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলা কারবার সংগঠনের অবশ্যই একটি মূলনীতি। সুতরাং প্রয়োজনবোধে কার্যক্রম ও কার্যপদ্ধতির যাহাতে দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব হয় এরূপ সাংগঠনিক ব্যবস্থা প্রত্যেক কারবারেরই থাকা উচিত।

৯। **ব্যয়সংকোচ** (**Economy**) : তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে অযথা ব্যয়বৃদ্ধি সুষ্ঠু কারবার পরিচালনার এবং উহার সম্প্রসারণের পরিপন্থী। সুতরাং সর্বদিকে ব্যয়সংকোচ করার নীতি প্রত্যেক সংগঠনেই থাকা উচিত।

১০। **স্থিতিশীলতা** (**Continuity**) : কারবার স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গঠিত হয়। উহার আয়ু যাহাতে উহার ২।১ জন কর্মাধ্যক্ষের বিদায় গ্রহণে শেষ না হয় বা পণ্যের চাহিদার পরিবর্তনের ফলে কারবার গুটাইতে না হয় সেরূপ সংগঠনই প্রত্যেক কারবারের কাম্য। এজন্য কারবারের স্থিতিশীলতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখাও সংগঠনের একটি মূলনীতি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১১। **অধিকার ও দায়িত্ব ভারার্পণ** (**Delegation of Authority and Responsibility**) : কর্তব্য বণ্টনের সহিত অধিকার ও দায়িত্ব বণ্টনও সংগঠনের মূলনীতি হওয়া প্রয়োজন। কারবারের আয়তন বৃদ্ধির সহিত অধিকার ও দায়িত্ব অর্পণ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কারণ এরূপ অবস্থায় কোনও কারবারীর পক্ষে কারবারের সমুদয় কার্য একাকী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। যাহার উপর কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হইবে তাহাকে উহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকার বা ক্ষমতা অর্পণ না করিলে দায়িত্বের কোন অর্থ হয় না। এজন্য কার্যসম্পাদনের জন্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা উভয়েরই প্রয়োজন। সাধারণত সংগঠনের উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তর পর্যন্ত ধাপে ধাপে এই ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পিত হইয়া থাকে।

১২। **কৈফিয়ৎ গ্রহণ** (**Accountability**) : ক্ষমতা অর্পণের বিনিময়ে অধস্তন কর্মচারিগণ উঁহাদের উর্ধ্বতন কর্মচারীদের নিকট তাঁহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিবেন, সংগঠনে এই নীতিও কার্যকরী থাকা প্রয়োজন। সাধারণত ক্ষমতার প্রবাহ নিম্নগামী এবং কৈফিয়তের প্রবাহ উর্ধ্বগামী।

১৩। **সহযোগিতা, সংযোজনা ও ভারসাম্য** (**Co-operation, Co-ordination and Balance**) : কর্তব্য বণ্টন-নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মচারীর উপর বিভিন্ন কাজের ভার দেওয়া হয়। ইঁহারা পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ কর্মসম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই কার্যগুলির মধ্যে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন হওয়া উচিত যাহাতে সংসাধিত কাজগুলি কারবারের একটি সামগ্রিক কার্যে পরিণত হয়। কার্যাবলীর এই সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনই সংযোজনার (Co-ordination) মূলকথা। আবার এই সমন্বয় সাধন ব্যাপারে সকল বিভাগের কাজ যেন একই তালে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাই ভারসাম্যের (Balance) মূলকথা। মোটের উপর সকল কার্যের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং বিভাগীয় কার্যগুলির পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষা ভিন্ন সুষ্ঠু কারবার পরিচালনা আশা করা যায় না। কিন্তু এই সমন্বয় ও ভারসাম্য কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ভিন্ন সম্ভব নহে। সুতরাং উচ্চস্তরের মানবিক সম্পর্ক (Human relations) স্থাপন করিয়া কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের মধ্যে সহৃদয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ

আবহাওয়া সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ইহার ফলেই শুধু কর্মীদের নিকট হইতে স্বচ্ছন্দ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা আশা করা যায় এবং কারবারের সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। সংগঠনে এই নীতি অবশ্য পালনীয়।

১৪। **কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ** (**Centralised Control**): বিভিন্ন বিভাগের কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন হইতেছে কিনা এবং উহাদের কার্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষা হইতেছে কিনা ইহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি থাকাও সুষ্ঠু সংগঠনের জন্য প্রয়োজন। এজন্য চাই কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী তদারক করিবে এবং সংসাধিত কার্যগুলিকে একটি সুপরিকল্পিত পথে অগ্রসর করাইয়া সামগ্রিক রূপ পরিগ্রহ করাইবে।

১৫। **সরলতা** (**Simplicity**): কারবারের নীতি ও কার্যক্রমের পরিবর্তন-শীলতা সংগঠন কাঠামোর সরলতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এজন্য সংগঠনে সরলতা আনয়ন করা প্রয়োজন। কারবার ছোট হইলে এই সরলতা অনায়াসলভ্য। কিন্তু কারবারের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। এই ক্রম-বর্ধমান জটিলতা হ্রাস করিবার উপায় হইতেছে সংগঠনের কার্যধারার বিভিন্ন পর্যায়-গুলিকে সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা এবং উহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। ইহাতে পরিচালন-ব্যবস্থায় সরলতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। অন্যথায় উহাতে জটিলতা বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন বিভাগের কার্য ব্যাহত হয়, বিঘ্ন বৃদ্ধি পায়, অপচয় বৃদ্ধি পায়, পরিচালনার দীর্ঘসূত্রতা দেখা দেয়, পরিবর্তনশীলতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং কারবারের সাফল্যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। সুতরাং সংগঠনে সরলতা একটি বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

১৬। **কর্মী নিয়োগ** (**Employment of Personnel**): কারবার পরিচালনায় কর্মীদের দান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কর্মীদের দক্ষতার উপর কারবারের সাফল্য নির্ভর করে। এজন্য উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োগ করা উচিত। কর্মী নিয়োগের পর তাঁহাদের যোগ্যতা অনুসারে কর্ম, দায়িত্ব ও ক্ষমতা বণ্টন করা উচিত। কারবারের সাফল্যের জন্য ইহাও একটি মূলনীতি হওয়া উচিত।

১৭। **নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি** (**Creation of Opportunity for Leadership**): সংগঠনের বিভিন্নস্তরের কর্মী নির্বাচন এরূপভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে নিম্নস্তরের কর্মিগণ কার্যদক্ষতার গুণে উচ্চস্তরে উন্নীত হইতে পারেন। সংগঠনে এই নীতি প্রবর্তিত হইলে কোনও সুযোগ্য নেতা অবসর গ্রহণ করিলে অপর একজন উহার স্থান অধিকার করিতে পারেন। এরূপ সুযোগ সৃষ্টি করাও সংগঠনের একটি মূলনীতি হওয়া উচিত। এজন্য সংগঠনে প্রশিক্ষণের (Training) ব্যবস্থা রাখিতে হয়।

সংগঠনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য (Importance and Significance of Organisation)

সুস্থ ও সুপ্রতিষ্ঠিত সংগঠনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে :

১। সংগঠন কারবারের ভিত্তিপ্রস্তর (foundation of business)। কারণ ইহার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার কার্যাদি (functions of management) রূপ পরিগ্রহ করে, কর্মচারীদের প্রচেষ্টা ফলবতী হয় এবং তাঁহারা উত্তরোত্তর অধিকতর সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের সুযোগ-সুবিধা পান।

২। সংগঠন কার্যে নিশ্চয়তা আনিয়া দেয়। কারণ ইহা কারবারের যাবতীয় কার্য কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া থাকে এবং প্রত্যেকের কার্যের পরিধি ও সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া থাকে।

৩। সুষ্ঠু কার্যবণ্টনের ফলে কোনও কর্মচারী কার্যের দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতে পারেন না। ফলে কার্যগুলি নিশ্চয়তার সহিত দ্রুত সম্পন্ন হয়।

৪। ইহাতে ব্যবস্থাপনা কার্যের দক্ষতাও বৃদ্ধি পায় এবং কার্য সম্পাদনের মধ্যে কোন প্রকার বিলম্ব, বিশৃঙ্খলা বা ভুল বোঝাবুঝি স্থান পায় না।

৫। সংগঠনের ফলে কার্য সম্পাদনের জন্য যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় তাহাতে প্রয়োজনীয় আদেশ, নির্দেশ ও সংবাদাদি সহজে বিভিন্ন ঊর্ধ্বতন, অধস্তন এবং সমপর্যায়ের কর্মচারীদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে পারে। ইহার ফলে কার্য সম্পাদনের কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয় না এবং প্রত্যেকেই তাঁহার নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করিয়া সুষ্ঠু কর্ম সম্পাদনে মনোনিবেশ করিতে পারেন।

৬। ইহার ফলে ভৌতিক (Physical), যান্ত্রিক (Mechanical) এবং মানবিক (Human) প্রচেষ্টার ব্যবহার পূর্ণমাত্রায় সম্ভব হইয়া থাকে।

৭। সকলের কাজ একসূত্রে গ্রথিত করিয়া ইহা সংযোজনার (Co-ordination) কাজ সহজসাধ্য করিতে পারে।

৮। বিভিন্ন কার্যের মধ্য দিয়া ইহা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ (Training), গুণাগুণ বিচার এবং উঁহাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া থাকে।

৯। সংগঠনের মূলনীতিগুলি (Principles) যথাযথ পালিত হইলে ইহা বলিষ্ঠ বৃহৎ কারবার গঠনে সহায়তা করিয়া থাকে। বৃহৎ কারবারগুলির আবির্ভাব সুষ্ঠু সংগঠন শক্তির জন্য সম্ভব হইয়াছে। এজন্য Andrew Carnegie একদা বলিয়াছিলেন —"Take away our factories, take away our trade, our avenues of transportation, our money, leave us nothing but our organisation and in four years we shall have established ourselves".[1] সংগঠনের গুরুত্ব এই উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

1. M. Banerjee, Business Administration. P. 109.

১০। সুপ্রতিষ্ঠিত সংগঠন অসাধুতা, কলুষতা এবং অসদাচরণ প্রতিরোধ করিতে পারে।

সুতরাং সুস্থ ও বলিষ্ঠ কারবার গঠনের পক্ষে সংগঠনের দান অপরিসীম।

ব্যবস্থাপনা এবং উহার কাজ (Management and its Functions)

অপরের সাহায্যে ও সহযোগিতায় সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে এবং তত্ত্বাবধানে কারবারের যাবতীয় কার্য সম্পাদনকে ব্যবস্থাপনা (Management) বলে (Management is the executive functions of getting things done by others according to pre-arranged plans and policies)।

কারবার ছোট হইলে এবং একজনমাত্র ব্যক্তি উহার ব্যবস্থাপনায় এবং যাবতীয় কর্ম সম্পাদনে নিযুক্ত থাকিলে অপর কাহারও সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কারবারের আয়তন বড় হইলে এক ব্যক্তির পক্ষে উহার ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পন্ন করা হয়ত অনেকক্ষেত্রে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু কারবারের উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে একাকী নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। একাধিক ব্যক্তি ব্যবস্থাপনার কার্যে নিযুক্ত থাকিলেও অন্যান্য কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আবশ্যকমত অনেক লোকের সমাবেশ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় কার্য বিভাগও প্রয়োজন হয়। এই কার্যবিভাগ প্রধানত দুই অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে—ব্যবস্থাপনা (Management) এবং ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন। যাঁহারা ব্যবস্থাপনা কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের সংখ্যা অপেক্ষা যাঁহারা ব্যবস্থাপনা কার্যের বাস্তব রূপ দিয়া থাকেন তাঁহাদের সংখ্যা সাধারণত অনেক বেশী। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটা উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা থাকে। এই উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানে কার্যকরী হয়। ব্যবস্থাপনার কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা কম বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। ফলে, অন্যান্য কর্মচারীদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। ইঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে সব কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ব্যবস্থাপনা উক্ত বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য বিভিন্ন উপায়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া থাকে। ব্যবস্থাপনার কৃতিত্ব এই উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার উপর নির্ভর করে। আর সমস্ত কাজ ঠিকমত সম্পাদিত হইতেছে কিনা উহার তদারকি ভারও ব্যবস্থাপনার উপর ন্যস্ত থাকে। এজন্য বলা হয় যে, ব্যবস্থাপনার কাজ হইতেছে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে অন্যান্য ব্যক্তিদের দ্বারা কারবারের যাবতীয় কাজ নির্বাহ করা। এজন্য ব্যবস্থাপনার কাজ অত্যন্ত ব্যাপক। শুধু তদারকি দ্বারা অন্যের সাহায্যে কার্য সম্পাদন করিলে চলে না। ইহা ব্যবস্থাপনার একটা দিক মাত্র। ব্যবস্থাপনার যে বিভিন্ন কাজ উহা নিম্নলিখিতভাবে আলোচিত হইল :

১। পরিকল্পনা (Planning): ব্যবস্থাপনার প্রথম কাজ পরিকল্পনা। পরিকল্পনা বলিতে ভবিষ্যতের কার্যসূচীকেই বুঝাইয়া থাকে। কার্যে অগ্রসর হওয়ার

পূর্বে কার্যসূচী প্রণয়ন বিচক্ষণতার পরিচায়ক। ব্যবস্থাপনার মধ্যে এই বিচক্ষণতা ভিন্ন কার্যে সাফল্য আনা সম্ভব নয়। পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে উদ্দেশ্য (Objective), নীতি (Policy), কর্মপদ্ধতি (Procedure), আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপার (Budget) এবং পূর্বানুমান (Forecasting) প্রভৃতি বিষয়গুলির স্থান পাওয়া এবং উহাদের বিশদ আলেচনা করা অবশ্যকরণীয় বিষয়। সুতরাং এই সকল উপকরণ লইয়া উহাদের দ্বারা কার্যে অগ্রসর হওয়া ব্যবস্থাপনার অবশ্য কর্তব্য কাজ।

২। **সংগঠন** (**Organisation**): সংগঠন হইল সকলের মিলিত প্রচেষ্টাকে সার্থক করার কাঠামো। সুতরাং সংগঠনও ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ অঙ্গ। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাপনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করার পর সংগঠন কিরূপ হইবে উহা স্থির করাও ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ। কারণ সংগঠনের মাধ্যমেই মিলিত প্রচেষ্টা, বিশেষজ্ঞদের অবদান, কার্যাবলীর সুবিন্যাস ও সমন্বয় প্রভৃতি রূপ পরিগ্রহ করে। কাজেই সংগঠন ছাড়া ব্যবস্থাপনার কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। সংগঠনের উপর ব্যবস্থাপনা কার্যের সুষ্ঠু পরিচালনা নির্ভর করে। ফলে, ব্যবস্থাপনা কার্যধারায় সংগঠন এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকে। এজন্য সংগঠনের কাঠামো ঠিক করা ব্যবস্থাপনার একটি অত্যাবশ্যক কাজ। সংগঠনের কাজে ঠিকমত অগ্রসর হইতে হইলে বিভিন্ন কাজের উপযুক্ত বিভিন্ন গুণের **কর্মীনিয়োগ** (**Staffing**), উঁহাদের প্রশিক্ষণের (Training) ব্যবস্থা এবং সংগঠনে উঁহাদের সুষ্ঠুভাবে কাজ করিবার পরিবেশ সৃষ্টি করাও সংগঠন রচনায় ব্যবস্থাপনার কাজ।

৩। **আদেশদান** (**Command**): পরিকল্পনা এবং সংগঠনের কার্য সম্পন্ন হইলে কার্যারম্ভের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কারবারের কার্য আরম্ভের জন্য আদেশদান প্রয়োজন। কে কি কাজ করিবেন এবং কখন তাঁহাদের কাজ শুরু হইবে ইত্যাদি হুকুমনামাকে আদেশদান বলে। এই আদেশদান ভিন্ন কার্য আরম্ভ হইতে পারে না। সুতরাং আদেশদানও ব্যবস্থাপনার একটি অত্যাবশ্যক কাজ।

৪। **নির্দেশদান** (**Direction**): আদেশদানের পর কার্য আরম্ভ হয় সত্য, কিন্তু কর্মীরা কিভাবে কাজে অগ্রসর হইবেন তাহার জন্য প্রয়োজন নির্দেশদান। নির্দেশদান কাজের গতিকে অব্যাহত রাখে এবং কর্মীদিগকে ঠিকপথে চালিত করে। ইহার ফলে কর্মীরা দ্বিধা ও সংকোচ মুক্ত হয় এবং কার্যের গতিকে অব্যাহত রাখিয়া উহার গতি বৃদ্ধি করে ও কার্যদক্ষতার পরিচয় দেন। সুতরাং নির্দেশদানও ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ কাজ।

৫। **অনুপ্রাণিতকরণ** (**Motivation**): কার্যের গতি শুধু অব্যাহত রাখিলেই চলিবে না, উহা উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে কিনা উহা দেখিতে হইবে। কর্মীদের মধ্যে কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করাকে অনুপ্রাণিতকরণ বলে। সুতরাং অনুপ্রাণিতকরণের কাজ হইতেছে উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রেরণা, উপদেশ, নির্দেশ প্রভৃতির মাধ্যমে কর্মীদিগকে সুষ্ঠু কর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত রাখা।

এই উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য প্রয়োজন কর্মীদের সর্বপ্রকার অভাব-অভিযোগের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া এবং উহা প্রতিকারের সর্ববিধ চেষ্টা করা। সুতরাং ব্যবস্থাপনার কার্যে অনুপ্রাণিতকরণ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাপনার কাজ কখনই ঠিক পথে চালিত হইতে পারে না।

৬। **সংযোজনা** (Co-ordination): ব্যক্তিগতভাবে কর্মীরা সকলে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত কার্য করিলেও সমষ্টিগতভাবে তাঁহাদের কার্যের ফল আশানুরূপ নাও হইতে পারে। আশানুরূপ ফললাভের জন্য সহযোগিতা (Co op-eration) অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু শুধু সহযোগিতাও কর্মে সাফল্য আনিতে পারে না। এজন্য প্রধান প্রয়োজন 'সংযোজনা'। অন্য কথায় ইহাকে বলা চলে কর্মসমন্বয়। সংযোজনা বা কর্মসমন্বয়ের অর্থ বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে এরূপভাবে সংহতি স্থাপন করা যাহাতে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা ঠিকপথে ও যথাযথ সময়ে সম্পন্ন হইয়া একটি অখণ্ড আকার ধারণ করে। অর্থাৎ সম-উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মী ও কর্মের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং ছন্দবদ্ধভাবে তাল বজায় রাখাই সংযোজনার মূল উদ্দেশ্য। ব্যবস্থাপনার কার্যে সংযোজনার কাজ যত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবে ততই কারবারের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হইবে। সুতরাং সংযোজনা ব্যবস্থাপনার একটি বিশিষ্ট কাজ।

৭। **নিয়ন্ত্রণ** (Control): কারবার পরিচালনার যে পরিকল্পনা গৃহীত হইল, সংগঠন প্রতিষ্ঠা হইল, আদেশ ও নির্দেশনামা প্রচারিত হইল, উৎসাহ ও উদ্দীপনার ব্যবস্থা হইল এবং সহযোগিতা ও সংযোজনার সৃষ্টি হইল তাহাতে উহা ঠিকমত পরিচালনা হইতেছে কিনা কিংবা উহাদের মধ্যে কোন ত্রুটি আছে কিনা প্রভৃতি দেখাশুনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন 'নিয়ন্ত্রণ'-দ্বারা সংসাধিত হয়। নিয়ন্ত্রণের কাজ কর্মের মান নির্ধারণ, সম্পাদিত কর্মের পরিমাপ ও মূল্য নির্ধারণ, ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণ এবং উহাদের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সুতরাং ব্যবস্থাপনার কার্যের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ অবশ্য প্রয়োজন।

তবে নিয়ন্ত্রণের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে হইলে **বিবরণ পেশ** (**Reporting**) **এবং আয়-ব্যয় বরাদ্দ** (**Budgeting**) প্রয়োজন। বিবরণ পেশ দ্বারা কিভাবে কার্য সম্পাদিত হইতেছে উহার বিবরণ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হয়। আয়-ব্যয় বরাদ্দ দ্বারা টাকা-পয়সা সংক্রান্ত ব্যাপারের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা সম্ভব হয়। নতুবা অপব্যয়ের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

৮। **আধুনিকীকরণ ও নবীকরণ** (**Modernisation and Innovation**): উপরি-উল্লিখিত কাজগুলি ব্যবস্থাপনার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু ভবিষ্যতের ঘটনা বিশ্লেষণ এবং উহার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করাও ব্যবস্থাপনার উচিত কাজ। ইহাতে কারবারের অগ্রগতি ব্যাহত হয় না এবং বিপর্যয়ের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা জন্মে। এজন্য কালের পরিবর্তনের সহিত সঙ্গতি বজায় রাখার কাজ আধুনিকী-

করণের আওতায় আসে এবং ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন ও উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ করাই নবীকরণের মূলকথা। এই দুই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখা ব্যবস্থাপনা কার্যের পরম ত্রুটি বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। সুতরাং উহারাও ব্যবস্থাপনা কার্যের অন্তর্গত।

৯। উপস্থাপন (Reprcsentation): ব্যবস্থাপনার এই কাজ দ্বারা কারবারকে বহির্জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে। এই বহির্জগতের সভ্যগণের মধ্যে সরকার, শ্রমিক-সংঘ, খরিদ্দার, নাগরিক, আর্থিক-সংস্থা, অন্যান্য কারবারী প্রতিষ্ঠান, যোগানদার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উপস্থাপনের কাজ হইবে কারবারের নীতি ও কার্যপদ্ধতি ইহাদের নিকট বিশ্লেষণ করা এবং ইহাদের সহিত প্রয়োজনীয় যোগসূত্র রক্ষা করা। বৃহত্তর জগতের সহিত পরিচয়সূত্র স্থাপন না করিতে পারিলে এবং উহার সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করিতে না পারিলে কারবারের সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এজন্য উপস্থাপন বর্তমানে ব্যবস্থাপনার একটি বিশিষ্ট কাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য (Importance and Significance of Management or Administration)

সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে এবং তত্ত্বাবধানে কারবারের যাবতীয় কাজ অপরের দ্বারা সম্পাদন করানোকে ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন বলে। কারবার পরিচালনায় ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অসীম। নিম্নলিখিতভাবে উহা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে:

১। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন ভাল কারবারের সৃষ্টি করে। কারণ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন কারবারের মধ্যে জীবনীশক্তির স্ফুরণ ঘটায়।

২। প্রত্যেক কারবারের মধ্যে মানুষ Men), বিভিন্ন পদার্থ (Materials), অর্থ (Money), যন্ত্র (Machines), পদ্ধতি (Methods), বাজার (Market) ও ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনের (Management or Administration) সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন উপরি-উক্ত বিষয়গুলির শীর্ষস্থানে অবস্থান করিয়া উহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং কারবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়।

৩। মন যেমন উহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেহকে চালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে, প্রশাসন বা ব্যবস্থাপনাও সেই প্রকার কারবারকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিয়া উহার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে।

৪। ইহা কারবারের ভিতর নূতন জ্ঞান, নূতন ভাবনা ও নূতন চিন্তাধারা প্রবেশ করাইয়া উহাকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে প্রেরণা যোগায়।

৫। ইহা ভাল-মন্দ সব দিকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকে, মন্দকে আয়ত্তে রাখিয়া কম পরিশ্রমে অধিক ফললাভ করার পথ প্রস্তুত করে এবং কর্মচারীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক অবস্থার সৃষ্টি করে। ফলে কারবারের পক্ষে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সহজসাধ্য হয়।

৬। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনের ফলে কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়, অবসর বা বিশ্রামের সুযোগ ঘটে এবং সহজ ও সুন্দর জীবনযাত্রার সর্ববিধ উপকরণ মিলিয়া থাকে।

৭। কারবারের সমস্যা সমাধানে ইহা বন্ধু, দার্শনিক ও চালক (friend, philosopher and guide)-এর কাজ করিয়া থাকে এবং কারবারের নানাবিধ জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিয়া থাকে।

৮। ইহার মধ্য দিয়াই নেতৃত্বের প্রশাসনিক গুণ প্রকাশ পায় যাহার ফলে উৎকৃষ্ট উপায়ে কার্য সম্পাদন ঘটে এবং কম মূল্যে ভাল জিনিস উৎপাদন সম্ভব হয়।

৯। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন জাতীয় সম্পদের অপচয় বন্ধ করে এবং সামাজিক ও মানবিক কল্যাণ সাধনের যন্ত্র হিসাবে কাজ করে।

১০। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন কারবারের বিভিন্ন কর্মচারীদের পদমর্যাদা অনুযায়ী শিক্ষা এবং কুশলতা লাভের জ্ঞান দিয়া থাকে এবং কারবার পরিচালনার জন্য নূতন নূতন যোগ্য নেতা সৃষ্টি করে। এরূপ অবস্থায় কারবারের অবনতি ঘটার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

১১। কারবার ধন উৎপাদনের ক্ষেত্র। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন এই ধন উৎপাদনের কাজকে অব্যাহত রাখে এবং জাতীয় কল্যাণ সাধন করে।

সুতরাং ইহার উপর কারবারের শুভাশুভ, লাভ-ক্ষতি, সাফল্য-অসাফল্য প্রভৃতি নির্ভর করে। যোগ্যতার সহিত ইহার কাজ সম্পন্ন হইলে দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন হয়, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

Prof. V. L. Srivastava-এর ভাষায় বলিতে হয়—"Management or Administration is "destined to play its decisive role in the world of today, where technological advances are making possible the use of resources on a scale never before known to humanity which is on the road of a global struggle surrounded by atomic and nuclear and diabolical weapons; and where the intellectual qualifications which raise men above all other animals, have never been more assiduously exercised than in perfecting the art of war."[1]

ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Management and Administration)

ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। Prof. E. F. L. Brech-এর মতে ব্যবস্থাপনার অর্থ ব্যাপক। ইহার দ্বারা পরিকল্পনা,

1. Industrial Management and Business Administration (1963) P. 21.

নীতি নির্ধারণ, সংযোজনা, শৃংখলা রক্ষা, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্যাবলীকে বুঝায়। ইহার মতে প্রশাসনের অর্থ কেবল পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের কার্যে ব্যাপৃত থাকা।

কিন্তু Spriegel, Sheldon, Sargant Florence প্রভৃতি ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্তরে থাকিয়া উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণ, সাংগঠনিক কাঠামো নিরূপণ প্রভৃতি কাজকে প্রশাসন বলে। উক্ত উদ্দেশ্য ও নীতির তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে অন্যের সাহায্যে উহা কার্যে পরিণত করার কাজকে ব্যবস্থাপনা বলে। সুতরাং এই মতানুযায়ী উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা চলে:

প্রশাসন (Administration)	ব্যবস্থাপনা (Management)
১। ইহা নীতি নির্ধারণ করে।	১। ইহা উক্ত নীতি কার্যে পরিণত করে।
২। ইহার কাজ বিধান স্থির করা।	২। ইহার কাজ বিধান কার্যে পরিণত করা।
৩। পরিকল্পনা ও সংগঠনের কাজ ইহার অন্তর্ভুক্ত।	৩। আদেশ, নির্দেশ, অনুপ্রাণিতকরণ, সংযোজনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ ইহার অন্তর্ভূত।
৪। ইহার কাজ মনে ও চিন্তায়।	৪। ইহার কাজ কর্মে।
৫। ইহার কাজ প্রধানত স্থিরীকরণ।	৫। ইহার কাজ প্রধানত পরিচালন।
৬। এই কাজ প্রধানত মালিকদের বা উহাদের প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত থাকে।	৬। এই কাজ প্রধানত বেতনভোগী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত থাকে।

Prof. Brech-এর মত মানিয়া লইলে উপরি-উক্ত পার্থক্য বিপরীতভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

যে মতেই হউক, উপরি-উক্ত পার্থক্য মানিয়া লইলেও বাস্তবক্ষেত্রে উক্ত পার্থক্য অনুযায়ী কার্যে অগ্রসর হওয়া অনেকক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা, সংগঠন, আদেশ, নির্দেশ, অনুপ্রাণিতকরণ, সংযোজনা, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। অনেকক্ষেত্রে মাত্র এক শ্রেণীর লোকের উপর এই সকল কার্যের ভার অর্পণ করা হয়। অনেক বেতনভোগী কর্মচারী, যেমন জেনারেল ম্যানেজারকে অনেকক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণ ও উক্ত নীতি কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং একই লোককে উভয়বিধ কার্য করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করা খুবই কঠিন ব্যাপার। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইত এবং এতদ্ উভয়ের মধ্যে উপরি-লিখিত পার্থক্য রক্ষা করা হইত। কিন্তু পরবর্তী যুগে ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা বিস্তৃতি লাভ করিলে উক্ত পার্থক্যের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দেয়। কারণ ব্যবস্থাপনা বলিতে তখন কারবার পরিচালনার সমগ্র রূপটিকেই বুঝাইয়া থাকে। সেক্ষেত্রে প্রশাসন এই সামগ্রিক রূপটির একটি অংশবিশেষ হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য বর্তমানে বিশ্ববিখ্যাত অনেক ব্যবস্থাপনাবিদ্ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করিতে প্রস্তুত নন। উভয় শব্দই এজন্য এখন একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। সরকারী বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রশাসন (Administration) কথাটি এবং কারবারী-ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা (Management) কথাটি প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। আবার আমেরিকায় প্রশাসন কথাটির বেশী প্রয়োগ হয়, কিন্তু বৃটেনে ব্যবস্থাপনা কথাটির আদর বেশী। এজন্য ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃটেনে Institute of Industrial Administration এবং British Institute of Management যখন যুক্ত হয় তখন উহা British Institute of Management আখ্যা লাভ করে।

Henri Fayol-এর মতে, "All undertakings require planning, organisation, command, co ordination and control, and in order to function properly, all must observe the same general principles. We are no longer confronted with several administrative sciences, but with one which can be applied equally well to public and private affairs."[1] সুতরাং কারবারী ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন কথা দুইটি পৃথকভাবে বিবেচনা না করিয়া উহাদিগকে একই অর্থে গ্রহণ করা উচিত। **এই একই অর্থে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও কার্য আলোচিত হইয়াছে।**

ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Management and Organisation)

ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

ব্যবস্থাপনা (Management)	**সংগঠন (Organisation)**
১। কারবারের যাবতীয় কাজ অপরের দ্বারা সম্পন্ন করানোকে ব্যবস্থাপনা বলে।	১। যাহার মাধ্যমে কাজ ও কর্মীর মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় বিধান হয় উহাকে সংগঠন বলে।
২। ইহার কাজ বিরাট ও ব্যাপক এবং পরিকল্পনা, সংগঠন, আদেশদান, নির্দেশদান, অনুপ্রাণিত-করণ, সংযোজনা, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সব কিছুই ইহার অন্তর্ভুক্ত।	২। ইহা ব্যবস্থাপনার একটি অংশবিশেষ।

1. General and Industrial Management (1949) P. XV

৩। ইহার কাজ প্রশাসনিক।	৩। ইহার কাজ সাংগঠনিক।
৪। ইহা সংগঠনের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করে।	৪। ইহা ব্যবস্থাপনাকে কার্য সম্পাদনের সাহায্য করে।
৫। ইহা মানুষের দেহের মত।	৫। ইহা মানুষের দেহের স্নায়ুর মত।
৬। ইহার বিভিন্ন স্তর আছে।	৬। ইহার কোন স্তর নাই।

সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য (Distinction among Organisation, Management and Administration)

সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

সংগঠন (Organisation)	ব্যবস্থাপনা (Management)	প্রশাসন (Administration)
১। ইহার উদ্দেশ্য কাজ ওকর্মীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সমন্বয়-সাধন।	১। ইহার কাজ অন্যের দ্বারা কার্য সম্পাদন।	১। ইহার কাজ উদ্দেশ্য ও নীতি-নির্ধারণ।
২। ইহা ব্যবস্থাপনার একটি অংশ বিশেষ।	২। আদেশ, নির্দেশ, অনুপ্রাণিতকরণ, সংযোজনা ও নিয়ন্ত্রণ ইহার অন্তর্ভুক্ত।	২। পরিকল্পনা ও সংগঠনের কাজ ইহার অন্তর্ভুক্ত।
৩। ইহা ব্যবস্থাপনার কার্যসম্পাদনের কাঠামো।	৩। সংগঠনের মাধ্যমে ইহার কার্য সম্পাদন হয়।	৩। ইহা সংগঠন সৃষ্টি করে যাহার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার কাজ অগ্রসর হয়।
৪। ইহা মানুষের দেহের স্নায়ুর মত।	৪। ইহা মানুষের সম্পূর্ণ দেহের মত।	৪। ইহা এই দেহ সৃষ্টির কারিগরের মত।
৫। ইহা কারবারের পরিল্পকনা অনুযায়ী কর্মীদের কার্য সম্পাদনের ভিত্তিস্থল।	৫। ইহা কারবারের পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মীদের কার্য সম্পাদনের তত্ত্বাবধায়ক।	৫। ইহা কারবারের পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কর্মাধ্যক্ষ।
৬। ইহা কারবারের সর্বস্তরের কর্মীদের কার্য সম্পাদনের কর্মক্ষেত্র।	৬। ইহা শুধু কারবারের মধ্যে ও নিম্নস্তরের কর্মিবৃন্দের কর্মক্ষেত্র।	৬। ইহা শুধু কারবারের উচ্চস্তরের কর্মীদের কর্মক্ষেত্র।

সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের মধ্যে উল্লিখিত উপায়ে পার্থক্য নির্ণয় করা হইলেও অধুনা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের মধ্যে কোন পার্থক্য ধরা হয় না। ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের মধ্যে যে পার্থক্য পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে উহা হইতে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে।

সংযোজনা ও সহযোগিতা (Co-ordination and Co-operation)

একাধিক ব্যক্তির উপর কোন কার্যের ভার থাকিলে উহাদের মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা কার্যটি সম্পন্ন হইলে উহাকে সহযোগিতা (Co operation) বলে। কিন্তু স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া উক্ত মিলিত প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যবিধান দ্বারা কার্যকে একসূত্রে গ্রথিত করার নাম সংযোজনা (Co ordination)। সুতরাং সহযোগিতা ও সংযোজনার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। বিভিন্ন ব্যক্তির মিলিত প্রচেষ্টার নাম সহযোগিতা, কিন্তু উহাদের প্রচেষ্টা বা কার্যধারার মধ্যে যে সমন্বয়সাধন উহাই সংযোজনা। সহযোগিতার তুলনায় সংযোজনা কিছুটা উচ্চ পর্যায়ের এবং ইহা সহযোগিতা ছাড়া আরও কিছু যথা, স্থান, কাল, পাত্র, মাত্রা ও লক্ষ্য জ্ঞাপন করে। সংযোজনা বিভিন্ন খণ্ড-বিক্ষিপ্ত কার্যগুলিকে লইয়া একটি অখণ্ড ও সম্পূর্ণ রূপ দান করিয়া থাকে।

উভয়ের মধ্যে এরূপ মূলগত পার্থক্য থাকিলেও কোন কর্মধারা সম্পূর্ণরূপে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে হইলে সহযোগিতা ও সংযোজনা উভয়ই প্রয়োজন। উহারা একসূত্রে গ্রথিত। এজন্য উহারা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। উহারা পৃথকভাবে কোন কার্য সুষ্ঠুভাবে কমই সম্পাদন করিতে পারে। পৃথকভাবে চলিতে গেলে কার্য-সম্পাদনে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং উহার ফল মারাত্মক হয়। এরূপ অবস্থা কারবারের সমূহ ক্ষতির কারণ হয়। এজন্য উহাদের একজন ছাড়া অপরের চলিবার চেষ্টা দেহের সহিত মনের গরমিলের মত। মন যদি কোন স্থানে যাইতে চায় সেক্ষেত্রে যদি দেহ সচল না হয় তবে যেমন মনের বাসনা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়, সেইরূপ সহ-যোগিতা ও সংযোজনার মিলন না হইলে কোন কারবারের উদ্দেশ্যই সফল হয় না। সুতরাং কারবারে সহযোগিতা ও সংযোজনা পরস্পর নির্ভরশীল। কিভাবে উহারা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল নিম্নের আলোচনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

১। সহযোগিতা হইতেছে ভিত্তিপ্রস্তর। উহার উপর সংযোজনা প্রতিষ্ঠিত। ভিত্তি ছাড়া যেমন কোন কিছু গড়িয়া তোলা যায় না সেই প্রকার সহযোগিতা ভিন্ন সংযোজনা কার্যকরী হয় না। অধিকন্তু সহযোগিতার দ্বারাই সংযোজনা পুষ্টিলাভ করে। কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সহযোগতার দ্বারা সংযোজনার পথ প্রশস্ত হয়। মনে করি, কোনও কারখানায় বিভিন্ন যন্ত্রে পণ্যের বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত হইতেছে। আবার বিভিন্ন কর্মী এই পণ্যের বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত করার কার্যে নিযুক্ত আছেন। এখানে বিভিন্ন যন্ত্র ও যন্ত্রীর সহযোগিতায় পণ্যের বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পণ্যের বিভিন্ন অংশের একত্রীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হইলে উহা বিক্রয়োপযোগী

হয়। এজন্য পণ্যের যে অংশ যতটা পরিমাণ কোনও সময়ে পণ্যের একত্রীকরণের জন্য প্রয়োজন, উৎপাদন ব্যবস্থার সেই গতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা না হইলে ঠিকমত সময়ে একত্রীকরণের কাজ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। এইভাবে বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা ও কর্মের মধ্যে ভারসাম্য ও সমন্বয় সাধন করার কাজই সংযোজনা। সুতরাং সমষ্টিগত প্রচেষ্টার পূর্ণ বা অখণ্ড রূপ দিতে হইলে সহযোগিতাকে ভিত্তি করিয়া সংযোজনার কাজে অগ্রসর হইতে হয়।

২। সহযোগিতার দ্বারা অবশ্য অনেক কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু ইহাতে স্থান, কাল, পাত্র, মাত্রা ও লক্ষ্যের সমন্বয়ের অভাব থাকিতে পারে। ফলে, যে কাজটি সহযোগিতার দ্বারা সম্পন্ন হইল উহা যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্বাচিত হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইতে পারে। এখানে সংযোজনার কাজ হইবে স্থান, কাল, পাত্র, মাত্রা ও লক্ষ্য অনুযায়ী কর্মসম্পাদন দ্বারা উদ্দেশ্য সফল করা। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে। মনে করি, কোনও প্রতিষ্ঠানে রামবাবু, শ্যামবাবু ও যদুবাবু তিন প্রকার কাজে নিযুক্ত আছেন। রামবাবু চিঠি লিখিয়া থাকেন। শ্যামবাবু উহা টাইপ করেন এবং যদুবাবু ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর দ্বারা সহি করাইয়া উহা যথাস্থানে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং এখানে তিনজনের মিলিত চেষ্টায় বা সহযোগিতায় পত্রালাপের কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং এখানে সহযোগিতার কোন অভাব নাই। মনে করি, কোনও দিন একখানা জরুরি পত্র লেখা ও প্রেরণের প্রয়োজন হইল। পত্রখানা রামবাবু লিখিলেন কিন্তু শ্যামবাবু উহা টাইপ করিতে বিলম্ব করিলেন এবং যদুবাবুও উহা সেদিন যথাস্থানে প্রেরণের বিশেষ আগ্রহ দেখাইলেন না। ফলে পত্রখানা, মনে করি, দুইদিন পর প্রেরিত হইল। ঠিকমত সময়ে যথাস্থানে পত্রখানা প্রেরিত না হওয়ায় যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উহা প্রেরিত হওয়ার কথা ছিল উহা ব্যর্থ হইল। এখানে পত্র লেখা, টাইপ করা ও পত্রপ্রেরণ প্রভৃতি তিনজনের সহযোগিতায় সম্পন্ন হইল সত্য, কিন্তু সংযোজনার অভাব থাকায় এবং উহাদের কার্যের মধ্যে সময় সম্পর্কে সমন্বয়সাধন না হওয়ার ফলে উহাদের কার্য উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হইল এবং কারবারের ক্ষতির কারণ হইল। সুতরাং সুষ্ঠু কার্য সম্পাদনের জন্য সংযোজনা ও সহযোগিতা উভয়ই অত্যাবশ্যক। কারণ সহযোগিতাকে ভিত্তি করিয়া সংযোজনা ব্যবস্থাপনার নির্দেশমত যথাসময়ে উপযুক্ত চেষ্টার দ্বারা স্থির লক্ষ্যে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করে। অন্যথায় কারবারের উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন দেখা দিবে এবং উহা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সহযোগিতা ও সংযোজনা ব্যবস্থাপনার মূলভিত্তি ও প্রাণশক্তি। উহাদের উপর কারবারের অস্তিত্ব ও সাফল্য নির্ভর করে। ইহাদের একটিকে বাদ দিলে অপরটি অর্থহীন হইয়া পড়ে এবং কারবারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। এজন্য বলা যাইতে পারে যে, কারবারে সহযোগিতা ভিন্ন সংযোজনা বা সংযোজনা ভিন্ন সহযোগিতার ফল সাংঘাতিক (dangerous) ও মারাত্মক (fatal)।

সহযোগিতা ও সংযোজনা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক (Internal and External)

দুই প্রকারের। ইহার অর্থ এই যে, কারবারের বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মীদের মধ্যে যেরূপ সহযোগিতা ও সংযোজনা প্রয়োজন, কারবারের সহিত সম্পর্কযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট বাহিরের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কর্মধারার মধ্যেও সেইরূপ সহযোগিতা ও সংযোজনা প্রয়োজন। আভ্যন্তরীণ সহযোগিতা ও সংযোজনা ঘটে বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ এবং ব্যক্তিগত কার্যের সমন্বয় সাধন দ্বারা। এরূপ সহযোগিতা ও সংযোজনা লাভ করিতে হইলে বিভিন্ন কার্যধারার ও বিভাগের মধ্যে সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন। যাঁহারা আবার এরূপ কার্য সম্পাদনের জন্য দায়ী তাঁহাদের কর্মে যোগ্যতা, আগ্রহ, উৎসাহ এবং একত্ববোধ থাকা আবশ্যক। এজন্য আবার প্রয়োজন পরস্পরের মধ্যে বিবাদশূন্য মনোভাব এবং কারবারের সর্বপ্রকারের সুখকর এবং উৎসাহ-উদ্দীপনাময় পরিবেশ।

কারবারের বাহিরে সহযোগিতা ও সংযোজনার জন্য প্রয়োজন ক্রেতা, যোগানদার এবং প্রতিযোগীদের মনোভাব ও কার্যকলাপের সহিত পরিচয় এবং তদনুযায়ী ভারসাম্য রক্ষা করা। ইহা ছাড়া প্রয়োজন কারিগরি ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের নূতন নূতন উদ্ভাবিত কৌশল, অর্থনীতির অবস্থান্তর এবং সরকারী বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুনের সহিত পরিচয় এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

সংযোজনা ও নিয়ন্ত্রণ (Co-ordination and Control)

(বিভিন্ন কার্যের স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানকে সংযোজনা (Co-ordination) বলে। আর পরিকল্পনা, আদেশ ও নির্দেশমত উক্ত কাজ ঠিক পথে চালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখা-শুনা করার কাজকে নিয়ন্ত্রণ (Control) বলে। ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ ছাড়া এই সংযোজনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। ব্যবস্থাপনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে সংযোজনা ও নিয়ন্ত্রণ উভয়ের বিশেষ প্রয়োজন।) কারবারে উহাদের উপর এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন নিম্নের বিবরণ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

সংযোজনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য (Importance and Significance of Co-ordination)

সংযোজনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা চলে :

১। (প্রত্যেক ব্যবস্থাপনার কাজে ইহা বিভিন্নতার মধ্যে একত্ববোধ জাগাইয়া তোলে। ইহাও সত্যকথা যে, এই একত্ববোধ ভিন্ন কারবারের কোন কাজই ঠিকপথে চালিত হইতে পারে না।

২। বিভিন্ন বিভাগ বা কার্যের মধ্যে একমাত্র সংযোজনাই মিলনসূত্র স্থাপন করিয়া থাকে। ইহা এইভাবে কারবারের মধ্যে বিবাদ, বিসম্বাদ ও বিচ্ছেদ দূর করিয়া থাকে।

৩। ব্যবস্থাপনার কর্মাধ্যক্ষ যে স্থানেই অবস্থান করুন না কেন সংযোজনা থাকিলে তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিয়া কারবারের অখণ্ড রূপ দেখিতে পারেন।

৪। ইহাই কারবারের বিভিন্ন বিভাগ ও অংশের মধ্যে একত্ববোধ জাগাইয়া তোলার পক্ষে বিশেষ সূত্র।

৫। ইহারই মাধ্যমে সমবেত চেষ্টার ফলে একক চেষ্টার তুলনায় অধিক ফললাভ সম্ভব হয়।

৬। একই প্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তি রোধ করিয়া ইহা অধিকতর ও উন্নততর উৎপাদনের জন্য কর্মীদের শক্তি ও তেজ প্রকাশের সুযোগ দিয়া থাকে।

৭। বিপরীতমুখী কর্মপ্রচেষ্টা রোধ করিয়া ইহা কর্মীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করে।

৮। ইহা দ্রুততা ও মন্থরতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কর্মীদের কর্মক্ষমতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং ইহার দ্বারা সুখময়, হৃদ্যতাপূর্ণ ও সহানুভূতিসূচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৯। ব্যবস্থাপনার কাজে ইহা মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করে এবং ইহার সাহায্যে ব্যবস্থাপনার সকল প্রচেষ্টা, শক্তি এবং কর্মধারার মিশ্রণ সতর্কভাবে রক্ষিত হয়।

১০। সুষ্ঠু ফলোৎপাদক সংগঠনের ইহা একটি মূল উপাদান এবং সংগঠনের প্রথম নীতি বলিয়া পরিগণিত। ইহা পরিকল্পনাকে অধিকতর উদ্দেশ্যমূলক, সংগঠনকে অধিকতর সংঘবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রণকে অধিকতর নিয়মাধীন করে। সুতরাং ব্যবস্থাপনার কাজে সংযোজনা সুদূরপ্রসারী সর্বাত্মক কর্মপ্রচেষ্টার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন। এক কথায় বলা চলে—প্রত্যেক ব্যবস্থাপনার কাজ সংযোজনার অনুশীলন(Each of the managerial functions is an exercise in co-ordination.[1])।

নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য (Importance and Significance of Control)

নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা চলে :

১। ইহা ব্যবস্থাপনা কাজের পরিকল্পনা অনুযায়ী সুষ্ঠু কর্মসম্পাদনের বাহন।

২। ইহা উপযুক্ত সময়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে এবং এইভাবে সময়, অর্থ ও শক্তির অপচয় দূর করে। উচ্চস্তরের কর্ম সম্পাদন ইহা ভিন্ন সম্ভব হয় না।

৩। কারবার পরিচালনায় নানাপ্রকার অনিশ্চিত এবং অভূতপূর্ব অবস্থার সম্মুখীন হওয়া কোন বিচিত্র ব্যাপার নহে। এরূপ পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ উহার দ্বারোদ্ঘাটন দ্বারা ঠিকমত সময়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সাহায্য করে। এইভাবে ইহা পরিকল্পনা এবং কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, সর্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করে এবং সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে।

৪। কারবারের পরিকল্পনা রচনাকালে কাজের একটা মানও অবশ্য নির্ণয় করা

1. Principles of Management (Koontz and O'Donnell) 1968, P. 50.

হয়। উক্ত মান অনুযায়ী কার্য-সম্পাদন হইতেছে কিনা উহা দেখার ভার নিয়ন্ত্রণের উপর।

৫। ইহা কারবারের প্রতি কর্মচারীদের কর্তব্যপরায়ণ, আজ্ঞানুবর্তী এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ হইতে যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে। নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হইলে বা না থাকিলে উপরি-উক্ত অবস্থার অভাব ঘটে, কার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং কারবারের উদ্দেশ্যসাধন ব্যর্থ হয়।

৬। কারবার ছোট হইলে সেখানে হয়ত দলীয়-একত্ববোধ কিছুটা থাকে। কিন্তু বৃহৎ কারবারে এই দলীয়-একাত্ববোধের অভাব অনেকক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দলীয়-একত্ববোধ না থাকিলে কারবারের কার্য কখনই ঠিকমত অগ্রসর হইতে পারে না। এই দলীয়-একত্ববোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বিশেষ কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

৭। ইহা সংযোজনার কার্যেও সহায়তা করিয়া থাকে। কারবারের সকল প্রচেষ্টাকে নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রাখিয়া এবং উহাদিগকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিয়া নিয়ন্ত্রণ সংযোজনার কার্য ঠিকমত পথে চালিত করে।

৮। নিয়ন্ত্রণ প্রতিনিধিত্বমূলক কার্য-ভারার্পণে সহায়তা করে, প্রত্যেককে ঠিকমত কার্যসম্পাদনে স্বাধীনতা এবং অনুপ্রেরণা যোগায় এবং এইভাবে কর্মচারীদের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কাজ আদায় করিয়া থাকে।

৯। ইহা বিকেন্দ্রীকরণক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের অব্যবস্থা বা গোলযোগ নিবারণ করে।

১০। কারবারের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ইহা ঠিকমত অনুধাবন করিয়া থাকে এবং থার্মোমিটার ও ব্যারোমিটারের মত কাজ করিয়া থাকে।

১১। ইহার মাধ্যমেই ব্যবস্থাপনার অবাস্তব বা অসম্ভব পরিকল্পনার রূপ ধরা পড়ে।

সুতরাং নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্য ও কার্য-সম্পাদনের মধ্যে প্রকৃত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া থাকে এবং আদেশ, নির্দেশ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিকমত কাজ হইতেছে কিনা উহার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

সহযোগিতা ও সংযোজনা লাভ বা সাধনের উপায় (Methods for achieving Co-operation and Co-ordination)

ব্যবস্থাপনা কর্মচারীদের দ্বারা বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাইয়া থাকে। সুতরাং কর্মচারীদের সহযোগিতা এবং উহাদের কার্যের মধ্যে সংযোজনা স্থাপন করিতে না পারিলে কখনই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কর্মচারীদের পূর্ণ সহযোগিতা পাইতে হইলে উহাদের মধ্যে কাজ করিবার আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইবে। এই আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন উপায় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এজন্য চাই

প্রত্যেক কর্মচারীর কি কাজ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে তাহার সুস্পষ্ট ধারণা। তাহার পর প্রয়োজন উক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। কাজ করিবার উপযুক্ত পরিবেশ এবং প্রত্যেকের কাজ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকিলে এবং ঠিকমত কার্য সম্পাদন করিলে পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকিবে এরূপ পরিস্থিতি স্বভাবতই সকল কর্মচারীর মধ্যে সহযোগিতার সূত্র সৃষ্টি করিবে এবং সংযোজনার ভিত্তিতে কাজ সম্পাদন করার দায়িত্ব আসিয়া যাইবে। সুতরাং সংক্ষেপে সহযোগিতা ও সংযোজনা সাধন বা লাভের উপায় হইতেছে ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ভিত্তিতে করণীয় কার্যের তথ্যাদির আদান-প্রদান—কার্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা —কার্য সম্পাদনে অনুপ্রেরণা—সহযোগিতা—সংযোজনা (Communications—Understanding—Motivation—Co-operation—Co-ordination)।

কারবার সংগঠন পাঠের উপযোগিতা (Importance of the Study of Business Organisation)

'কারবার সংগঠন' (Business Organisation) বিষয়ের পাঠ্যবস্তু অনেক কিছু। ইহা পাঠ করিলে কারবারের উদ্দেশ্য, সামাজিক দায়িত্ব, কারবার সংগঠনের মূলনীতি, বিভিন্ন প্রকারের কারবার, উহাদের উপযুক্ত প্রয়োগ ক্ষেত্র, বিভিন্ন কারবার পরিচালনার রীতি-নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান জন্মে। এক কথায় ইহা শিল্প-বাণিজ্যের রীতি-নীতি, গতি-প্রকৃতি, পদ্ধতি, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি পরিবেশন করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, তত্ত্বজ্ঞানের সহিত বাস্তব কারবারের বিভিন্ন তথ্যাদিও ইহাতে আলোচিত হয়। ফলে, ইহা পাঠ করিলে কারবারীজগৎ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়। এই জ্ঞানলাভের দ্বারা কারবারীক্ষেত্রে যে সকল শক্তি লোকচক্ষুর অন্তরালে কর্মরত আছে উহা উপলব্ধি করারও সুযোগ হয়। বর্তমানকালে কারবার পরিচালনা জটিলতাপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকার কারবারের দ্রুত সম্প্রসারণ এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন, নানাবিধ আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ নিয়ম-কানুন, উত্তরোত্তর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি এবং উহার ফলে নানাবিধ সরকারী বিধিনিষেধ, মুদ্রা-ব্যবস্থার জটিলতা, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, উৎপাদন ব্যবস্থার জটিলতা প্রভৃতি কারবারী ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জটিলতা সৃষ্টি করিতেছে। সুতরাং এবংবিধ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কারবারীর এবং কারবারে প্রবেশার্থীদের পক্ষে ইহা পাঠ বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কারবারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীশ থাকিয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কারবারী জ্ঞানলাভ করার রীতি বেশী প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানকালে শুধু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কারবারী জ্ঞানলাভ করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এজন্য যথাবিধি পাঠক্রমের মাধ্যমে কারবারী শিক্ষালাভ করার রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ব্যবস্থায় কারবার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অতি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। কারবারী জগতে সাফল্যলাভের ইহা নূতন পন্থা। অনেকে হয়ত 'কারবার সংগঠন' পাঠ না করিয়া বা কারবার সম্পর্কে পাঠক্রমের

মধ্যে না গিয়া কারবারী জগতে বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছেন। কারবার সম্বন্ধে কোন কিছু তত্ত্বজ্ঞান পাঠ না করিয়া যে সকল ব্যক্তি কারবারে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম। তাঁহারা সত্যই প্রতিভাশালী ব্যক্তি সন্দেহ নাই এবং অন্য প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের মত তাঁহাদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। সাধারণভাবে বলা চলে যে, যাঁহারা কারবারে সাফল্যলাভ করিয়া থাকেন তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি না থাকিলেও কারবারের তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা থাকে কিংবা এজাতীয় পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

একথাও সত্য যে, শুধু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেই বড় কারবারী হওয়া যায় না। উহার সহিত বাস্তব জ্ঞানেরও সংমিশ্রণ প্রয়োজন।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে 'কারবার সংগঠন' পাঠের উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারা যাইবে। কেবল 'কারবার সংগঠন' পাঠ করিলেই কারবার পরিচালনার যথোপযুক্ত জ্ঞানলাভ হয় না। 'কারবার সংগঠন' কারবারী পাঠক্রমের একটিমাত্র বিষয়। এই পাঠক্রমের অখণ্ডতা বজায় রাখিতে হইলে কারবার সংগঠনের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনেক বিষয়ের পাঠ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যে বিষয়গুলি কারবারী বিদ্যার অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন উহাদিগকে প্রথমতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে, যথা—সংখ্যাবাচক বিষয় (Quantitative Subjects), আচরণমূলক বিষয় (Behavioural Subjects) এবং ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিষয় (Management Subjects)। সংখ্যাবাচক বিষয়গুলির মধ্যে হিসাবরক্ষণ (Accountancy), বাণিজ্যিক গণিত (Commercial Mathematics) ও সংখ্যাতত্ত্ব (Statistics), আচরণমূলক বিষয়গুলির মধ্যে অর্থবিদ্যা (Economics) ও মনোবিদ্যা (Psychology) এবং ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিষয়গুলির মধ্যে কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (Business Organisation and Management) উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, অর্থ নৈতিক ভূগোল (Economic Geography), বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন (Commercial and Industrial Law), ইংরাজী এবং দেশীয় ভাষা (English and Vernacular) অবশ্য পাঠ্য।

উক্ত পাঠক্রমের মধ্যে কারবার সংগঠনের স্থান অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। কারবার সংগঠন ইহাদের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং ইহাকে কারবারী শিক্ষার প্রাণস্বরূপ বলিয়া গণ্য করা হয়।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. What is Organisation ? Give an outline of a factory organisation. [C. U. B. Com. (Pass) 1965]

সংগঠন কাহাকে বলে ? একটি কারখানা সংগঠনের রেখাচিত্র দাও।

2. Discuss the basic principles and significance of 'organisation' in modern business. [C. U. B. Com. (Pass) 1964]

আধুনিক কারবারে সংগঠনের মূলনীতি ও তাৎপর্য আলোচনা কর।

3. Discuss the basic principles of organisation in business.
[C. U. B. Com. (Pass 1967 ; (Hons.) 1968]

কারবারে সংগঠনের মূলনীতি আলোচনা কর।

4. What is meant by Organisation and Co-ordination? Explain their significance to a business concern.
[C. U. B. Com. (Pass) 1970 ; 1973]

সংগঠন ও সংযোজনা বলিতে কি বুঝ? কারবারী প্রতিষ্ঠানে উহাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

5. What do you mean by the term Organisation? What are the different elements of sound business organisation?
[N. B. B. Com. 1968]

সংগঠন শব্দটির অর্থ কি? সুস্থ কারবার সংগঠনের বিভিন্ন উপাদান কি কি?

6. Explain the principal functions of Management.
[C. U. B. Com. (Hons.) 1964]

ব্যবস্থাপনার প্রধান কাজ ব্যাখ্যা কর।

7. It is said that the process of management consists of six functions. Discuss those functions. [C. U. B. Com. (Hons.) 1967]

ইহা বলা হয় যে, ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার ছয়টি কাজ। উক্ত কাজগুলি আলোচনা কর।

8. The job of management may be broken down into five functions: planning, organising, staffing, direction and control. Briefly describe these functions. [C. U. B. Com. (Hons.) 1968]

ব্যবস্থাপনার কাজ পাঁচভাগে ভাগ করা চলে—পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীনিয়োগ, নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণ। সংক্ষেপে এই কাজগুলি বর্ণনা কর।

9. Management is getting things done by people. Discuss fully. [C. U. B. Com. (Pass) 1966]

ব্যবস্থাপনার অর্থ লোক দ্বারা কাজ করানো। বিশদভাবে আলোচনা কর।

10. Is there any distinction between Management and Administration? Discuss and state reasons.
[C. U. B. Com. (Hons.) 1966 ; (Pass) 1968]

ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? আলোচনা কর ও কারণ দেখাও।

11. Clearly explain the difference between Organisation, Management and Administration. [C. U. B. Com. (Pass) 1965]

পরিষ্কারভাবে সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

12. In business Co-operation without Co-ordination or *vice-versa* is fatal. Discuss. [C. U. B. Com. (Pass) 1963 ; (Hons.) 1966]

কারবারে সংযোজনা ভিন্ন সহযোগিতা বা সহযোগিতা ভিন্ন সংযোজনা মারাত্মক। আলোচনা কর।

13. Explain why so much importance is attached to Co-ordination and Control. [C. U. B. Com. (Hons.) 1965 ; 1971]

সংযোজনা এবং নিয়ন্ত্রণের উপর এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন ব্যাখ্যা কর।

14. Good management depends on Co-operation and Co-ordination. How can these be achieved ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1967]

ভাল ব্যবস্থাপনা সহযোগিতা ও সংযোজনার উপর নির্ভর করে। ইহা কিভাবে সাধিত হইতে পারে ?

15. Why so much emphasis is laid on 'co ordination' in management ? Discuss fully.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1969 ; (Hons.) 1970-Special.]

ব্যবস্থাপনায় সংযোজনার উপর এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন ?

16. What are the meaning and significance of Control in modern business organisation ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1969 ; (Hons.) 1970]

আধুনিক কারবারী সংগঠনে নিয়ন্ত্রণের অর্থ ও তাৎপর্য কি ?

17. What is meant by 'Management' and 'Control' ? Discuss their significance in business. [C. U. B. Com. (Pass) 1972]

ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের অর্থ কি ? কারবারে উহাদের তাৎপর্য আলোচনা কর।

18. Discuss the importance of the study of the subject of Business Organisation in the integrated group course of commerce.

একত্রীভূত বাণিজ্যশিক্ষা পাঠক্রমের মধ্যে কারবার সংগঠন পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

19. "Each of the managerial functions is an exercise in Co-ordination." Elucidate the statement. [C. U. B. Com. (Hons.) 1973]

"প্রত্যেক ব্যবস্থাপনার কাজ সংযোজনার অনুশীলন।" এই উক্তির ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং কারবার সংগঠন ও উহার আয়তন

(Economic System and Organisation of Business and its Size)

মিশ্র বা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ও উহার বৈশিষ্ট্য (Features of Mixed or Regulated Economy)

বর্তমানকালে কারবারীক্ষেত্রে তিনপ্রকার অর্থনীতির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা হইতেছে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Capitalistic System), সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Socialistic System) এবং মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থা (Mixed Economy System)। কারবারীক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের তারতম্য হিসাবে উহাদের এরূপ নামকরণ হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কারবারীক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নাই। ইহাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং মালিকানা পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কারবারীক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সর্বাধিক। এখানে ব্যক্তিগত মালিকানার স্থান নাই এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। আর মিশ্র অর্থনীতিতে কারবারীক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সহ-অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্র এখানে জনকল্যাণ রাষ্ট্র আখ্যা পাইয়া থাকে এবং ব্যক্তিগত বা বেসরকারী উদ্যমের ক্ষেত্র এই নীতির সীমারেখা অতিক্রম করিতে পারে না। মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকার অর্থনীতির সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কারবারীক্ষেত্র দ্বিধা-বিভক্ত। প্রয়োজনমত জাতীয় জীবনের গুরুত্ব অনুযায়ী এবং সমষ্টির স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে কতকগুলি কারবারীক্ষেত্রে সরকারী মালিকানা আনা হয় এবং সাধারণত প্রতিযোগিতামূলক কারবারীক্ষেত্রে বেসরকারী মালিকানা স্বীকৃত হয়। তবে এরূপ বিভাগের মধ্যে কখনই সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন মনে করিলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হইতে পারে বা উহা রাষ্ট্রায়ত্ত হইতে পারে। ভারতে বর্তমানে এই নিয়ন্ত্রিত (Regulated) বা মিশ্র (Mixed) অর্থনীতি প্রচলিত। ইহার বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১। সরকারী ও বেসরকারী কারবারের সহ-অবস্থিতি (Co-existence of Public and Private Sectors): ১৯৫৬ সালের ভারতের শিল্পনীতি দ্বারা এই সহ-অবস্থানের গোড়াপত্তন হয়। ইহার দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, খনিজ তৈল, বিমান নির্মাণ, বিমান পরিবহন, রেলপথ, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন, পারমাণবিক শক্তি, ভারী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ১৭টি শিল্প প্রথম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা

হইয়াছে। এই ১৭টি শিল্প কেবল সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। ইহা ছাড়া, এই জাতীয় পুরাতন শিল্প যাহা বেসরকারী মালিকানায় আছে উহাদের সম্প্রসারণ সরকারী অনুমতি ভিন্ন সম্ভব হইবে না। ইহা ছাড়া, রাসায়নিক সার, কৃত্রিম রবার, লৌহ সঙ্কর, অলৌহবর্গীয় ধাতু, এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ, রাজপথ, সমুদ্রপথে পরিবহন প্রভৃতি ১২টি শিল্পকে দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই শিল্পগুলির স্থাপন ও সম্প্রসারণ সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে হইতে পারিবে। তবে ঐ সকল ক্ষেত্রেও সরকারী উদ্যোগই বেশী কার্যকরী হইবে।

অবশিষ্ট শিল্পগুলি তৃতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ বেসরকারী উদ্যোগের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে বেসরকারী উদ্যোগে শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ ব্যাপারে সরকারী সাহায্য ও সহানুভূতির কোন অভাব হইবে না।

উপরি-উক্ত বিভাগ দ্বারা সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র স্থির করা হইলেও সরকার ইচ্ছা করিলে বা প্রয়োজন মনে করিলে সরকারী উদ্যোগে উহাদের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ হইতে পারিবে।

২। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ব্যবস্থা (Balance between Public and Private Sectors and Central Planning): সমাজের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য জাতীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এবং উহার যথাযথ বণ্টন অবশ্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে সরকারী ও বেসরকারী সকল কারবারী প্রচেষ্টা একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত। এজন্য সরকারী ও বেসকারী কার্যকলাপের পারস্পরিক সমন্বয় সাধন অপরিহার্য। তজ্জন্য চাই সকল কার্যকলাপের উপর সরকারের সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে এবং সকল কার্যকলাপকে ইহার আওতায় আনা হইয়াছে। এইভাবে সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার নীতি গৃহীত হইয়াছে।

৩। বেসরকারী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ (State Control in Private Sector): ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনানুসারে [Industries (Development and Regulation) Act 1951] বেসরকারী ক্ষেত্রের বৃহৎ শিল্পগুলিকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই আইনের নিম্নলিখিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

(ক) এই আইনের ফলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার অধিক স্থির পুঁজি লইয়া গঠিত সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সরকারের নিকট হইতে অনুজ্ঞাপত্র (Licence) লইতে হয়। এ সকল কারবার সম্প্রসারণও সরকারী অনুমতি ভিন্ন সম্ভব হইবে না। অনুমতি ও অনুজ্ঞাপত্র দেওয়ার পূর্বে কারবারের অবস্থান, আয়তন, মান ইত্যাদি সম্পর্কে সরকার শর্তাদি আরোপ করিতে পারেন।

(খ) এই আইনের তালিকাভুক্ত শিল্পের জন্য সরকার উন্নয়ন পরিষদ (Development Council) গঠন করিতে পারেন। শিল্পপতি, শ্রমিক, ক্রেতা ও বিশেষজ্ঞ লইয়া এই সকল পরিষদ গঠিত হইবে। এই সকল পরিষদের কাজ হইবে সর্বাধিক উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা, অপচয় নিবারণ করা, দক্ষতার মান নির্ণয় করা, উৎপাদনের লক্ষ্য (target) স্থির করা, যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতার (installed capacity) পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্পর্কে পন্থা নির্ধারণ করা ও তদনুযায়ী সুপারিশ করা এবং কারিগরী শিক্ষার ও গবেষণার প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া। শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য মালিক, শ্রমিক, ক্রেতা প্রভৃতির প্রতিনিধি লইয়া একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ (Central Advisory Council) গঠনের ক্ষমতাও সরকারের ইহাতে আছে।

(গ) যদি কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদনে বা উৎপন্ন দ্রব্যে উৎকর্ষ হ্রাস পায়, কিংবা উহা অযৌক্তিকরূপে পণ্যের মূল্য বাড়ানো বা উহার পরিচালনা ক্রেতা সাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী হয় তবে সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করিতে পারেন বা স্বহস্তে উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারেন।

৪। **যৌথ কোম্পানী পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ (State intervention in the management of Joint Stock Companies) :** ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে (Companies Act, 1956) যৌথ কোম্পানী গঠন ও পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্প্রসারিত হইয়াছে। প্রয়োজনবোধে সংখ্যালঘু সদস্যদের স্বার্থরক্ষার্থে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীতে সরকার কর্তৃক সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা, কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান, মূলধন সংগ্রহের পদ্ধতি, হিসাবরক্ষণ প্রভৃতিতে সরকারের হস্তক্ষেপ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের অধিকার এই আইনে দেওয়া হইয়াছে।

৫। **অবাধ বাণিজ্যনীতির অবসান (Abolition of Free Trade Policy) :** পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য এবং ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্য পণ্যের আমদানি ও রপ্তানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সরকার অবাধ বাণিজ্য-নীতির অবসান ঘটাইয়াছেন। জাতীয় স্বার্থের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া কেবল বিশেষ বিশেষ পণ্য আমদানির জন্য মাত্র অনুজ্ঞাপত্র (Licence) দেওয়া হয়।

৬। **সরকারী ও বেসরকারীক্ষেত্রে বিনিয়োগের হার নির্ধারণ (Determination of the Ratio of Investment between Public and Private Sectors) :** বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী-ক্ষেত্রে বিনিয়োগের হার নির্ধারিত হইতেছে এবং উহাতে সরকারীক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাত্রা বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

৭। **প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থা (Progressive Taxation) :** ধন বণ্টনের বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে কর-ব্যবস্থাকে ক্রমশ অধিকতর প্রগতিশীল করার চেষ্টা চলিতেছে। আয়কর (Income Tax), দানকর (Gift Tax), ব্যয় কর (Expen-

diture Tax), সম্পত্তি কর (Estate Duty), মূলধনী লাভ কর (Capital Profit Tax) প্রভৃতি কর-ব্যবস্থা প্রগতিশীল করের উদাহরণ।

৮। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Social Security Measures): সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বৃদ্ধির জন্যও নানাবিধ আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে নিম্নতম মজুরী (Minimum Wages), ভবিষ্যনিধি (Provident Fund), রাষ্ট্রীয় কর্মচারী বীমা (Employees' State Insurance), শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ (Workmen's Compensation) বীমা প্রভৃতি আইন উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং বর্তমানের এই মিশ্র অর্থনীতি ভারতের কারবার সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে (Present-day ragulated or controlled economy provides the background for organisation ot business in India)। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, এই নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে কারবারী জগতে অনেক বাধানিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। এই নিয়ন্ত্রণ থাকায় সর্বক্ষেত্রে এবং সব সময় বেসরকারী কারবারীর ইচ্ছামত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কারবার গঠন, সংগঠন, পরিচালনা ও সম্প্রসারণ সম্ভব হইতেছে না বা হইতে পারে না। কারণ জনকল্যাণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় সমগ্র দেশের কারবারী কার্যকলাপের মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বজায় রাখা, কারবারের অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমতা স্থাপন এবং সকল প্রকার সরকারী ও বেসরকারী কারবারকে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতে মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তনের কারণ (Reasons for the Introduction of Mixed Economy in India)

ভারতে শিল্পোন্নতি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে অর্থাৎ মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তিতে সংঘটিত হইতেছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি অবস্থান অনেকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু এই দ্বিবিধ উদ্যোগের কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে উক্ত বিভ্রান্তি দূর হইবে এবং এই সহ-অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে। এই কারণগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে:

১। ধন ও সুযোগ বণ্টনে বৈষম্য (Inequality of Income and Opportunity): ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই সকল দেশে স্বীকৃত রাজনৈতিক মতবাদ ছিল। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের কাজ ছিল কেবল আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা এবং বহিঃশত্রুর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করা। আর অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং মালিকানা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করিত। ইহাকে অন্য কথায় ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আখ্যা দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার সুবিধার মধ্যে ক্রেতার স্বাধীনতা, চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতে আদর্শ ভারসাম্য রক্ষা,

মুনাফার প্রেরণা প্রভৃতি উল্লেখ করা হয়। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ, এরূপ হস্তক্ষেপ ব্যক্তিত্ববিকাশের এবং সামাজিক অগ্রগতির প্রবল অন্তরায়। কিন্তু কালক্রমে এরূপ ব্যবস্থার ফলে অর্থ নৈতিকক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ধনী ও মালিকদের হাতে অপ্রতিহত ক্ষমতা আসিয়া যায় এবং একচেটিয়া কারবারের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। ফলে, ক্রেতা বিক্রেতাব হাতে শোষিত হইতে থাকে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়, ধনী অধিকতর ধনী হইবার সুযোগ পায় এবং বিত্তহীনের বিত্ত ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। লর্ড কেইনস্ (Lord Keynes)-এর মতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের (Savings and Investment) ভারসাম্যের উপর অর্থ নৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং অর্থ নৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে, বেকারী, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি অকল্যাণকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এজন্য অবাধ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোন দেশই মানিয়া লইতে রাজী নয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আবার সব কিছুর উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যবস্থারও নানাবিধ ত্রুটি আছে। রাষ্ট্রের অত্যাধিক ক্ষমতা থাকায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও স্বাধীনতা হ্রাস পায় এবং উৎপাদনের পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। অনেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 'দাসতন্ত্র' আখ্যা দিয়া থাকেন। অতএব ব্যক্তির কল্যাণের সহিত ব্যষ্টির কল্যাণের সামঞ্জস্য বিধান করার একমাত্র উপযুক্ত পন্থা মিশ্র অর্থনীতি অর্থাৎ সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের সহ-অবস্থান। ইহা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যবর্তী পথ। উভয়ের ভাল দিকটা গ্রহণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। ভারতের কর্ণধারগণ সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে (Socialistic Pattern) দেশে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টায় আছেন। মিশ্র অর্থনীতিই এই ব্যবস্থা চালু করিতে সক্ষম এরূপ বিবেচনাতেই ভারতে মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তন দেখা দেয় এবং ইহাই ধন ও সুযোগ বৈষম্য দূর করিতে পারিবে বলিয়া ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

২। **জনকল্যাণ (Public Welfare):** যে সরকার জনকল্যাণ চান, সে সরকার জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের (Public Utility Concerns) কর্তৃত্ব ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার উপর কখনই ছাড়িয়া দিতে পারেন না। কারণ, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য জনসেবা। মুনাফালাভ ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এরূপ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবহন, ডাক ও তার, শক্তি সরবরাহ, জীবনবীমা, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অবশ্য প্রয়োজন। এরূপ প্রয়োজন মিটানোর জন্য মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তনের প্রযোজন হইয়া পড়ে।

৩। **দেশরক্ষার প্রয়োজন (Defence Requirements):** দেশরক্ষা ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানা কখনই নিরাপদ ব্যবস্থা নয়। সুতরাং মিশ্র অর্থনীতির আশ্রয়ে এই সকল শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইযাছে।

৪। শ্রমিক কল্যাণ (Labour Welfare): শ্রমিকরা স্বভাবতই দরিদ্র। ইহাদের পক্ষে মালিকদের সহিত আঁটিয়া উঠা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ফলে উহারা মালিকদের হাতে শোষিত হইবার আশঙ্কা করে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই আশঙ্কা দূর করা এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা। ভারতে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য অনেক আইন পাস হইয়াছে। ফলে, শ্রমিক সম্পর্কে মালিকদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সুতরাং ইহার ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই এবং মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে।

৫। সম্ভোগকারীদের স্বার্থ (Consumers' Interests): সম্ভোগকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্যও মিশ্র অর্থনীতির প্রয়োজন হইয়াছে। কারণ, উৎপাদকদের হস্তে সম্ভোগকারীদের ছাড়িয়া দিলে তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত মূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া সম্ভব হয় না। পণ্যের গুণগত মান, ন্যায্যমূল্য প্রভৃতি বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, মিশ্র অর্থনীতিব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

৬। সমন্বয় ও ভারসাম্য (Co-ordination and Balance): বর্তমান পরিস্থিতিতে সকল কারবারী প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এক হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া সকলেই মনে করেন। এই উদ্দেশ্য হইতেছে সেবার মনোভাব লইয়া প্রয়োজনীয় পণ্য ন্যায্য মূল্যে ক্রেতাদের সরবরাহ করা। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় ও ভারসাম্য রক্ষা করিয়া উক্ত উদ্দেশ্য সাধন করা এক অসম্ভব ব্যাপার। এজন্য প্রয়োজন সর্বপ্রকার কারবারের জন্য এক সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা। ব্যক্তিগত মালিকানা ও স্বাধীন উদ্যোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও উদ্যোগ এই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় অবশ্য স্থান পাইয়াছে এবং ইহার ফলে মিশ্র অর্থনীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে।

সুতরাং মিশ্র অর্থনীতির মূলকথা হইতেছে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি অবস্থান এবং জনকল্যাণের জন্য বিভিন্নক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। এই অত্যাবশ্যক নীতি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে এবংবিধ ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রয়োজন হইয়াছে।

শিল্প-বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান সরকারী ভূমিকা এবং মিশ্র অর্থনীতির অবদান (Expanding Role of Public Sector in Industry and Commerce and Achievement of Mixed Economy)

ভারত একটি অর্ধোন্নত দেশ। এ দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এখনও সম্ভব হয় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে উহার পূর্ণ ব্যবহারের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ইহার মূলধনের অভাব। জনসাধারণের আয় কম। এজন্য সঞ্চয়ও কম! স্বল্প সঞ্চয়ের জন্য

উৎপাদনে বিনিয়োগও স্বল্প। ফলে, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান নিম্ন। শিল্পে অনগ্রসরতা এবং কৃষির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাও ইহার অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এজন্য কৃষিতে ছদ্মবেশী বেকারের (disguised unemployment) সংখ্যা খুব বেশী। এখানে উৎকট ধনবৈষম্যও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে শতকরা ৬০ ভাগ লোক মোট জাতীয় আয়ের ⅓ অংশ ভোগ করে। জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ ধনীলোক জাতীয় আয়ের ⅓ ভোগ করে। বাকী অংশ মধ্যবিত্ত লোকের ভোগাধিকারে। ব্যক্তিগত ধনবৈষম্য ছাড়া আঞ্চলিক ধনবৈষম্যও আছে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ছাড়া নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এই বৈষম্য যথেষ্ট রহিয়াছে। বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিকূল বাণিজ্যই (unfavourable balance of trade) ভারতের ভাগ্যে দেখা যাইতেছে। কারিগরী দক্ষতার অভাবও যে নাই এরূপ নহে। এবংবিধ পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যেই মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তন। ইহার ফলেই কারবারী ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার সহ-অবস্থান, বেসরকারী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, যৌথ কোম্পানী পরিচালনায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, অবাধ বাণিজ্য নীতির অবসান, সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের হার নির্ধারণ, প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রভৃতি। ইহার উদ্দেশ্য—To do greatest good to the greatest number. জনকল্যাণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা যে রাষ্ট্রের বিশেষ কর্তব্য এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। সরকারকে জনকল্যাণ রাষ্ট্র (Welfare State) আখ্যা পাইতে হইলে ইহার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ধন ও সুযোগ বণ্টনে বৈষম্য দূর করা, শ্রমিক কল্যাণ সাধন করা, সম্ভোগকারীদের স্বার্থ বিপন্ন না করা এবং বিদেশের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা—এ সমস্তই জনকল্যাণ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ২৬ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, কিন্তু সরকারের সদিচ্ছা এখনও আশানুরূপ পূরণ হইতে পারিল না। কারবারী ক্ষেত্রের অনিশ্চয়তা দূর হইল না। রাষ্ট্রীয় কারবারে লাভের পরিবর্তে লোকসানই মজ্জাগত হইয়া রহিল। দ্রব্যমূল্য সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতার সীমা ছাড়াইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বেকার সমস্যা প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ করিল। ধনবৈষম্যও পুরামাত্রায় বিদ্যমান। শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে কোন কোন দিকে কিছুটা উন্নতি দেখা দিলেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উহার সুফল অধিকাংশ লোক ভোগ করিতে পারিতেছে না। প্রশাসনিক গলদ, দেশের লোকের জাতীয়তাবোধের অভাব, বেসরকারী কারবারের মুনাফা প্রবৃত্তি প্রভৃতি কারণে যে আশানুরূপ ফললাভ বিলম্বিত হইতেছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সুতরাং উপরি-উক্ত গলদ দূর হইয়া অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বর্তমান অবস্থার যে পরিবর্তন হইবে এবং আমাদের লক্ষ্যে পৌছাইতে বিশেষ বিলম্ব হইবে না এ আশা আমরা অবশ্যই রাখিতে পারি।

ভিত্তিমূলক শিল্পগুলির সরকারী মালিকানা ও পরিচালনা (Government Ownership and Management of Basic Industries)

ভারত সরকারের পক্ষে ভিত্তিমূলক শিল্পগুলির মালিকানা ও পরিচালনা গ্রহণ করার প্রয়োজন বুঝিতে হইলে ভারতের শিল্পোন্নয়নের অবস্থা জানা প্রয়োজন। শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে পরিকল্পনা। স্বাধীনতালাভের পূর্বে ভারত সরকারের কোন নির্দিষ্ট ও সুসম্বদ্ধ শিল্পনীতি ও পরিকল্পনা ছিল না। তখন ধনতান্ত্রিক বিদেশী সরকারের নিকট ভারতের সুসম শিল্পোন্নয়ন মোটেই কাম্য ছিল না। উহা তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। তখনকার ভারতের শিল্পনীতিকে বলা চলে উদাসীন স্বাতন্ত্র্যবাদ (apathetic laissez-faire)। ফলে, শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন গঠন এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় নাই। এজন্য ভারত নানাদিক দিয়া অনগ্রসর ও অনুন্নত থাকিয়া যায়। জমিদারগণ ভূমিকরের মাধ্যমে কৃষকদিগকে শোষণ করিত এবং উহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ ভোগ-বিলাসে ব্যয় করিত। এরূপ অবস্থায় কৃষির উদ্বৃত্ত হইতে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য মূলধন গঠন সম্ভব হয় নাই। তখন মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগ প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে প্রেরিত হইত। জনগণের জীবনযাত্রার মান খুবই নীচু ছিল। পক্ষান্তরে বৃটিশ যন্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগিতায় ভারতের অনেক শিল্পই ধ্বংস হইল। ইহা ছাড়া, ভারত ইংলণ্ডকে শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল যোগান দিতে বাধ্য ছিল। দেশীয় ও বিদেশীয় প্রচেষ্টায় যাহা কিছু শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল উহা প্রধানত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের জন্য। ভিত্তিমূলক ও মূলধনী বস্তু উৎপাদন শিল্পের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। কিন্তু সুসম শিল্পোন্নয়ন ভিন্ন দেশের আর্থিক কাঠামো সুদৃঢ় হয় না এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইতে পারে না। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে সর্বপ্রথম ভারতের শিল্পনীতি গৃহীত হইল এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া ১৯৫৬ এবং ১৯৭৩ সালে যে শিল্পনীতি গৃহীত হইল তাহাই এখন চালু আছে।

এই শিল্পনীতি অনুযায়ী শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্র সরকারী ও বেসরকারী এই দুই ভাগে বিভক্ত হইল। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই বিভাগের প্রয়োজন অনুভূত হইল। কারণ সকল শিল্প বেসরকারী উদ্যোগের হাতে ছাড়িয়া দিলে শিল্পের দ্রুত ও সুসম উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। উহার কারণ মূলধনের স্বল্পতা, নৈপুণ্যের অভাব এবং প্রথম অবস্থায় মুনাফার স্বল্পতা। বেসরকারী উদ্যোগের প্রধান আকর্ষণ মুনাফালাভ। মুনাফালাভে বিলম্ব হইলে সে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় বেসরকারী প্রচেষ্টার বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয় না। কতকগুলি শিল্প, বিশেষতঃ ভিত্তিমূলক শিল্প (basic industries) এই জাতীয়। এই শিল্পে প্রচুর মূলধনেরও প্রয়োজন। যেমন, একটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য অন্ততঃ ১০০ কোটি টাকার দরকার। উহাও বেসরকারী প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করা এক দুরূহ ব্যাপার। ইহা

ছাড়া. কারিগরি বিদ্যায় নিপুণ লোক নিয়োগ করার ব্যয়ও ইহাতে খুব বেশী। এই সকল অসুবিধার জন্য বেসরকারী প্রচেষ্টায় কেবল ভোগ্যবস্তু শিল্পের প্রসারই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, ইহাতে মুনাফালাভের সম্ভাবনা বেশী। ভিত্তিমূলক শিল্পের প্রতিষ্ঠা এজন্য বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। অথচ শিল্পোন্নয়নে এই ভিত্তিমূলক শিল্পের দান অনস্বীকার্য। কারণ, এই শিল্পের উন্নতির উপর অন্যান্য শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি নির্ভর করে। এই কারণে বেসরকারী উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রের মালিকানায় এরূপ শিল্পের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য শিল্পনীতিতে ঘোষিত হইয়াছে যে, ভিত্তিমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প (Basic and Key Industries) যেমন লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, বিমানপোত, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি সরকারী মালিকানায় ও পরিচালনায় গড়িয়া তোলা হইবে এবং এক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টা ও মালিকানা চলিতে দেওয়া হইলেও প্রয়োজনবোধে উহা জাতীয়করণ করা হইবে। ইহা ছাড়া, দেশরক্ষা ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, আণবিক শক্তি, রেলপথ প্রভৃতিতেও উপরি-উক্ত নিয়মে সরকারী মালিকানা ও পরিচালনা কার্যকরী হইয়াছে।

সরকারের পক্ষে শিল্পজাত দ্রব্যের বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ (Control over distribution and prices of manufactured goods by Government)

আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল জনকল্যাণ রাষ্ট্র (Welfare State) প্রতিষ্ঠা করা। এই সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা সামাজিক স্বার্থকে বড় করিয়া দেখা হয় সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয় না। যে সকল রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক হইতে চাহে না, আবার ধনতন্ত্রকেও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে না, সেই সকল রাষ্ট্রে জনকল্যাণের জন্য অনেকক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত সরকার মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থার দ্বারা ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ (Socialistic Pattern of Society) গঠন করার কাজে ব্রতী আছেন। ইহার ফলে প্রয়োজনবোধে অনেকস্থলে সরকারী কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য দেখা দিবে।

বেসরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ যে নবীন সৃষ্টি প্রেরণার অগ্রদূত ইহা কেহ অস্বীকার করেন না। উৎপাদন ব্যবস্থায় এই উদ্যোগ চালু থাকিলে চাহিদা ও যোগানের সুসম ও স্বাভাবিক নিয়মের ভিত্তিতেই দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থার সুফল আমরা কমই ভোগ করিতেছি। ইহার কুফল আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বাজারের অবস্থা মোটামুটি স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু ১৯৪১ সাল হইতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেইভাব এখন পর্যন্ত চলিতেছে। যুদ্ধের সময়ে নানাকারণে অনেক জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে—একথা সত্য। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা। সকল সভ্যদেশেই

দ্রব্যমূল্য যাহাতে অযথা বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য সরকার সচেষ্ট থাকেন। প্রথম অবস্থায় ভারত সরকার সম্মিলন, কমিশন ইত্যাদির দ্বারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু উহার ফল শুভ হয় নাই। দ্রব্য মূল্য ক্রমশ বাড়িয়াই চলিল, সরকারী ব্যবস্থায় ইহার কোন প্রতিকার হইল না, ধীরে ধীরে অনেক জিনিস বাজার হইতে অদৃশ্য হইতে লাগিল, চড়া দাম দিয়া কালোবাজারে উহা পাইতে কোন অসুবিধা দেখা দিল না। যুদ্ধের আতঙ্ক দেখা দেওয়ায় এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ ঠিকমত প্রয়োগ না হওয়ায় এক শ্রেণীর মুনাফাবাজ কারবারী দেখা দিল। তাহারা যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলির সুযোগ লইয়া দ্রব্যমূল্য কেবলই বাড়াইয়া যাইতে লাগিল। অনিশ্চিত ও আশঙ্কাজনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে জিয়াইয়া রাখিয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দ্বারা লোকের দুর্দশা বাড়াইয়া চলিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে অনেকদিন এবং দেশও স্বাধীন হইয়াছে ২৬ বৎসরের অধিক, কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেলাম। অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ন্যায় শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্যও একইভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। যে বস্ত্রের মূল্য যুদ্ধের পূর্বে ছিল মাত্র এক টাকা উহার মূল্য এখন কমপক্ষে বার টাকা। ভারতের কর্ণধারগণ অবশ্য ইহাতে বিচলিত বোধ করেন এবং ব্যবসায়ীদের প্রতি অনেক আবেদন, অনুরোধ জানান। কিন্তু ইহাতে কোন মুনাফাবাজ ব্যবসায়ী সাড়া দিয়াছেন কিনা আমাদের জানা নাই। সুতরাং যে সকল শিল্পজাত দ্রব্যাদির যোগান চাহিদার তুলনায় কম এবং যাহা ব্যবসায়িগণ মজুত রাখিয়া কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে এবং যে-কোন মূল্যে ধনী ব্যক্তিদের নিকট বিক্রয় করিয়া তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে সেরূপ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে দ্রব্যমূল্য বাঁধিয়া দিয়া কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখা অবশ্য প্রযোজন। কিন্তু সরকারের হাতে কোন মাল নাই, অথচ মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইল এরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কখনই কার্যকরী হইতে পারে না। সুতরাং বণ্টনের উপরও সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাজার হইতে জিনিস উধাও হওয়া আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন উভয়ই কঠোরভাবে দৃঢ়তার সহিত চালু রাখা ভিন্ন মুনাফাবাজী বন্ধ হইবে না এবং জনসাধারণও ন্যায্য মূল্যে জিনিস ক্রয় করিতে পারিবে না। এজন্য সরকারের পক্ষে কেবল শিল্পজাত দ্রব্য কেন সকল প্রকার দ্রব্যের নিয়ন্ত্রন ও বণ্টন গ্রহণ করা উচিত। ইহা ভিন্ন বর্তমান পরিস্থিতিতে জনসাধারণের দুর্দশা ও হয়রানি দূর হওয়ার সম্ভাবনা কম।

কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিমাপ (How to measure the size of a business unit)

কারবারের আয়তন পরিমাপ করা এক দুরূহ ব্যাপার। কারণ এই আয়তন পরিমাপের কোন নির্দিষ্ট মান নাই। সুতরাং কোন কারবার সম্বন্ধে যখন 'কত বড়' বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করা হয় তখন উহার দ্বারা কোন পরিমাপ নির্ধারণ হয় না। এরূপ মন্তব্য শুধু 'অত্যধিক বড়' প্রশ্নে দাঁড়াইয়া যায়। কারবারীদের এরূপ সমস্যার

অবশ্যই সম্মুখীন হইতে হয়। এই সমস্যার সমাধানের কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি না থাকিলেও কারবারের প্রকৃতি ও উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য বিচার-বিবেচনা করিয়া আয়তন পরিমাপের বিভিন্ন মাপকাঠি বা মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়। সাধারণত নিম্নলিখিত এক বা একাধিক বিষয় বিবেচনা করিয়া কোন কারবার বড় কি ছোট উহা পরিমাপ করা হয়।

১। **মূলধন বিনিয়োগ (Capital Investment) :** কোন কারবারে বেশী মূলধন বিনিয়োগ হইলে (সাধারণত ২০ লক্ষ টাকার অধিক) উহাকে বৃহৎ (large) কারবারের পর্যায়ে ফেলা হয়। ৭½ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ হইলে উহাকে বলা হয় মাঝারি (medium) এবং ৭½ লক্ষ টাকার নীচে হইলে উহাকে বলা হয় ছোট (small) কারবার। এইভাবে মূলধন বিনিয়োগ কারবারের আয়তনের পরিমাপ নির্ণয়ের মাপকাঠি হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। যেমন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, জাহাজ-নির্মাণ-শিল্প প্রভৃতি অধিক মূলধন ভিন্ন স্থাপন করা সম্ভব হয় না। এজন্য এই শিল্পগুলি বৃহৎ শিল্পের পর্যায়ে পড়িয়া থাকে। তবে অনেকক্ষেত্রে কোন্ কারবারে কতটা পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে উহা কেবল আদায়ীকৃত মূলধন (Paid up Capital) বা মোট লগ্নীকৃত মূলধন (Total Capital Investment) দেখিয়া ঠিক করা যায় না। কারণ, বিভিন্ন কারবারে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের পদ্ধতি নানা প্রকারের।

২। **উৎপাদন ক্ষমতা (Plant Capacity) :** কোন্ কারবারে কি পরিমাণ যন্ত্রাদি নিযুক্ত আছে এবং উক্ত যন্ত্রাদির উৎপাদন ক্ষমতা কিরূপ উহার পরিমাপ দ্বারা কারবারের আয়তন নির্ণয় করা চলে। যে সকল ক্ষেত্রে কোন কারবারের উৎপাদিত দ্রব্যের মান একরূপ নহে তথায় এই উৎপাদন-ক্ষমতা আয়তন নির্ণয়ে সাহায্য করিতে পারে। রাসায়নিক, কাঁচ, ইস্পাত, কাগজ, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পের আয়তন এইভাবে নির্ণয় করা যাইতে পারে। যেমন, বস্ত্রশিল্পে তাঁত ও মাকুর সংখ্যা এবং উহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা দ্বারা মোটামুটিভাবে কারবারের আয়তনের পরিমাপ করা সম্ভব।

৩। **উৎপাদনের পরিমাণ (Volume of Output) :** উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ দেখিয়াও কোন কারবারের আয়তন নির্ণয় করা যাইতে পারে। যে সকল কারবারে নির্দিষ্ট মানের পণ্য (Standardised goods) উৎপাদিত হয় তথায় এইভাবে আয়তন নির্ণয় করা চলে। সিমেন্ট, চিনি, কয়লা প্রভৃতি শিল্পের আয়তন উহাদের উৎপাদন দৃষ্টে নির্ণয় করা যাইতে পারে।

৪। **উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (Value of Products) :** কোন কারবারের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য দেখিয়াও উক্ত কারবারের আয়তন নির্ণয় করা চলে। তবে এক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য অত্যধিক উঠানামা করিলে চলিবে না। সেক্ষেত্রে এই পরিমাপের মানদণ্ড কারবারের আয়তন নির্ণয়ে কমই সাহায্য করিবে।

৫। **শ্রমিক-সংখ্যা (Number of Workers) :** কোন কারবারে নিযুক্ত

শ্রমিকের সংখ্যা দ্বারাও উহার আয়তন নির্ধারণ করা যাইতে পারে। সাধারণ বিবেচনায় বৃহৎ কারবারে শ্রমিক-সংখ্যা বেশী। তবে বিভিন্ন কারবারের আয়তনের তুলনামূলক বিচার শ্রমিক-সংখ্যা দ্বারা করিতে হইলে উহাদের উন্নতির স্তর এবং উৎপাদনের প্রকৃতি একরূপ হওয়া উচিত। অন্যথায় এই মাপকাঠি দ্বারা আয়তন নির্ণয় নির্ভুল হইতে পারে না।

৬। **কাঁচামালের ব্যবহার (Quantity of Raw Materials Used):** একই জাতীয় পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত এবং একই স্তরে উন্নত বিভিন্ন কারবারের আয়তন উহাদের মোট কাঁচামালের ব্যবহার দেখিয়াও নির্ণয় করা যাইতে পারে।

৭। **শক্তির ব্যবহার (Amount of Power Consumed):** ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ দেখিয়াও কারবারের আয়তন স্থির করা যাইতে পারে।

সুতরাং কোন কারবারের আয়তন নির্ধারণ করিতে উপরি-উক্ত এক বা একাধিক মাপকাঠি গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাধারণত কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁচামাল, শ্রমিক-সংখ্যা এবং উৎপাদিত পণ্যের গড় ফলের ভিত্তিতে কাববারের আয়তন স্থির করা হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য ও শ্রমিক-সংখ্যা কিংবা মূলধন ও শ্রমিক-সংখ্যা দৃষ্টেও আয়তন নির্ধারণ হয়। যেভাবেই আয়তন নির্ধারণ হউক না কেন উপরি-উক্ত কোন-না-কোন নীতি গ্রহণ করিয়াই উহা স্থির করিতে হইবে। কারবারীর ইচ্ছানুযায়ী উহা কখনই স্থির করা উচিত নহে। কারণ কারবারের আয়তনের উপর উৎপাদন ব্যয়, উৎপাদন কৌশলের নিপুণতা এবং লাভ-লোকসান বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ কারবারী এইভাবেই আয়তনের সমস্যার সমাধান করিয়া থাকেন।

যে যে অবস্থার উপর কারবারের আয়তন নির্ভর করে (Factors determining or limiting the size of a business establishment)

কোনও কারবার বৃহদায়তন হইবে কি ক্ষুদ্রায়তন হইবে কিংবা মধ্যমায়তন হইবে উহা বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে। নিম্নে উহাদের আলোচনা করা হইল।

১। **মূলধন (Capital):** মূলধন প্রাপ্তির সুবিধা এবং পরিমাণের উপর কারবারের আয়তন অনেকাংশে নির্ভর করে। একক মালিকানা ও অংশীদারী কারবারে সাধারণত বেশী মূলধন সংগ্রহের সম্ভাবনা কম। এজন্য এরূপ মালিকানায় কারবার বৃহদায়তন হওয়ার সুযোগ পায় না। কিন্তু যৌথ কারবারের মূলধন সংগ্রহের সুযোগ-সুবিধা বেশী। এজন্য এরূপ কারবারের বৃহদায়তন হওয়ার সুযোগ-সুবিধা বেশী। প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ কারবারের অধিকাংশই বৃহদায়তন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এমন কতকগুলি কারবার আছে যাহা স্থাপন করিতে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। লৌহ ও ইস্পাত, পরিবহন, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্প এই জাতীয়। ইহাতে প্রচুর শ্রমিক এবং নানাবিধ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। ফলে, অধিক মূলধন লইয়া এরূপ কারবার বৃহদায়তনে গঠিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে সকল কারবার কম

মূলধনে চালিত হইতে পারে সে সকল শিল্পের আয়তনও ক্ষুদ্রায়তন হইয়া থাকে। বিভিন্ন কুটির-শিল্প, দর্জির দোকান, দেশীয় চুরুট ও বিড়ি শিল্প প্রভৃতি এই জাতীয় শিল্প। এইরূপ শিল্পে নানাবিধ বৃহৎ ও ভারী যন্ত্রের বা অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না। ফলে এ জাতীয় কারবারের আয়তন সাধারণত ছোট হইয়া থাকে।

২। **পণ্যের চাহিদা (Demand of the Products) :** যে পণ্যের চাহিদা ব্যাপক এবং দেশের সর্বত্র বিস্তৃত এমন কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত সেরূপ পণ্য উৎপাদনের কারখানা বৃহৎ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কোন পণ্যের চাহিদা স্থানীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিলে উক্ত পণ্য উৎপাদন কারখানা ছোট আকারের হইয়া থাকে।

৩। **পণ্যের প্রকৃতি (Nature of the Products) :** পণ্যের প্রকৃতির উপরও অনেকাংশে কারবারের আয়তন নির্ভর করে। দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির পণ্য উৎপাদনের কারবার সাধারণত বৃহৎ হইয়া থাকে। কারণ, এরূপ পণ্য উৎপাদনের পর বিক্রয়ের জন্য গুদামজাত করিয়া রাখা চলে। ফলে, বৃহৎ কারখানার অধিক পরিমাণে উৎপাদনের কোন বাধা নাই। পক্ষান্তরে স্বল্পস্থায়ী ও পচনশীল দ্রব্য উৎপাদনের কারবার ছোট হওয়াই স্বাভাবিক। দুগ্ধ, মিষ্টদ্রব্য, পাউরুটি, কেক প্রভৃতি এই জাতীয় দ্রব্য। এই সকল দ্রব্য খরিদ্দারদিগকে টাটকা অবস্থায় যোগান দিতে হয়। কারণ, এ সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা চলে না। ইহাদের চাহিদা সাধারণত স্থানীয়। তবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিলে কেন্দ্রীয়ভাবে বৃহৎ কারখানায় উৎপাদন করিয়া শাখা বিপণির মারফত ইহাদের যোগান দেওয়া সম্ভব হইতে পারে।

৪। **বাজার (Market) :** যে পণ্যের বাজার ব্যাপক উহার কারবার বৃহৎ হইবার সুযোগ থাকে। কিন্তু উহার বাজার সীমিত হইলে কারবার বৃহদায়তন হইতে পারে না।

৫। **দ্রব্যের মান (Standard of the Products) :** যে সকল ক্ষেত্রে সমমানের পণ্য অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব তথায় কারবার বৃহদায়তন হইতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত রুচি, পছন্দ, পণ্যের কারুকার্য প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন মানের পণ্য উৎপাদন করিতে হইলে কারবার বৃহৎ করা চলে না। পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির চাহিদা ব্যাপক হইলেও উহাদের বিক্রয় ক্রেতার ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দের উপর নির্ভর করে। আবার রুচি ও পছন্দের অবিরাম পরিবর্তনও দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য তৈয়ারী পোশাক-পরিচ্ছদের দোকান খুব বৃহদাকার হইতে পারে না। ব্যক্তিগত রুচি মিটাইতে হয় বলিয়া দর্জির দোকানও বৃহৎ হইতে দেখা যায় না। অনুরূপ কারণে অলঙ্কার, আসবাবপত্র প্রভৃতিতে কারুকার্যের স্থান আছে। উক্ত কারুকার্যও ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজন্য এ-জাতীয় কারবারও বৃহৎ হওয়ার সুযোগ পায় না।

৬। **ঝুঁকি (Risk) :** যে কারবারে ঝুঁকি বেশী উহা বৃহদাকারই হইয়া থাকে। কারণ, বৃহৎ কারবারের পক্ষে ঝুঁকি বহন করার ক্ষমতা বেশী। পক্ষান্তরে যে কারবারে ঝুঁকি কম উহার আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট হইয়া থাকে।

৭। **পরিবহন ব্যয় (Cost of Transport) :** শিল্পের কাঁচামাল কারখানায় আনয়ন করার পরিবহন ব্যয় বেশী হইলে কারবার ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন, চিনির কারখানা বৃহদাকার হইলে উহার উৎপাদন ব্যয় কম পড়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই শিল্পের কাঁচামাল ইক্ষু কারখানা হইতে দূরে এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অবস্থিত হইলে উহা সংগ্রহের জন্য পরিবহন ব্যয় অত্যধিক হওয়া স্বাভাবিক। ফলে, বৃহদাকারে কম মূল্যে পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। এরূপ অবস্থায় স্বল্পমূল্যে নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে কাঁচামাল সংগ্রহের সুযোগ-সুবিধার উপর কারবারের আয়তন নির্ভর করে।

৮। **সংগঠনের যোগ্যতা ও পরিচালনদক্ষতা (Organising Ability and Management Skill) :** সংগঠনের যোগ্যতা ও পরিচালন দক্ষতা থাকিলে কারবারী সহজেই তাঁহার কারবারকে, অন্যদিকে কোন অসুবিধা না থাকিলে, ক্ষুদ্রায়তন হইতে বৃহদায়তনে পরিণত করিতে পারেন। কিন্তু অযোগ্য হস্তে পড়িলে এরূপ অবস্থায় কারবারের সম্প্রসারণ ব্যাহত হয় এবং কারবার ক্ষুদ্রায়তনই থাকিয়া যায়।

৯। **সরকারী আইন ও নিয়ন্ত্রণ (Government Regulation and Control) :** কারবার সম্পর্কীয় সরকারী আইন ও নিয়ন্ত্রণ কারবারের আয়তনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যেমন, যদি এরূপ কোন আইন থাকে যে, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বীজাণুশোধিত না করিয়া বিক্রয় করা চলিবে না তাহা হইলে কারবার বৃহৎ না হইলে ইহার জন্য যন্ত্রপাতি স্থাপন করা লাভজনক হইবে না। ফলে এরূপ কারবার বৃহৎ না হইয়া যায় না। আবার মুনাফার উপর প্রগতিশীল হারে কর ধার্য হইলে উক্ত কর এড়াইবার জন্য কারবার ক্ষুদ্রাকারে রাখাই অধিক লাভজনক হইবে। সরকারী আইনদ্বারা মূলধন ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকিলে ইচ্ছানুযায়ী কারবার সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না এবং কারবারও বড় হইতে পারে না।

১০। **উৎপাদনের নিয়ম (Laws of Return) :** যে শিল্পে ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন নিয়ম (Law of Diminishing Return) প্রচলিত তথায় অধিক উৎপাদন হইলে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে কারবার ছোট রাখা লাভজনক। পক্ষান্তরে যে শিল্পে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন নিয়ম (Law of Increasing Return) প্রচলিত তথায় অধিক উৎপাদন হইলে গড় ব্যয় কম হয়। ফলে এরূপ ক্ষেত্রে কারবার বৃহৎ হওয়া লাভজনক।

১১। **ভৌগোলিক নিশ্চেষ্টতা (Geographical Inertia) :** অঞ্চল বিশেষে শিল্পস্থাপন বড় বা ছোট আকারে আরম্ভ হইলে নূতন শিল্পস্থাপনে ঐ আকারের প্রাধান্যই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই ভৌগোলিক নিশ্চেষ্টতা বা নিষ্ক্রিয়তা। এজন্য

বোম্বাই বা আমেদাবাদের বস্ত্র-শিল্পের আয়তন দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বস্ত্র-শিল্পের আয়তনের তুলনায় বড়। দেশ-বিদেশেও ভৌগোলিক বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তন ভারতের অনুরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড়।

১২। অন্যান্য অবস্থা (Other factors): অন্যান্য অবস্থার মধ্যে বলা চলে যে, মালিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরও কারবারের আয়তন নির্ভর করে। ইহা ছাড়া যে সকল শিল্পে নিপুণ কারিগর প্রয়োজন সেক্ষেত্রে কারবার বেশী বড় হইতে পারে না। খরিদ্দার তাহার প্রয়োজন গৃহের নিকটবর্তী অঞ্চলের দোকান হইতে পূরণ করার মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইলেও কারবার বেশী বড় হয় না। সিনেমা, লণ্ড্রী, চুল ছাঁটাইয়ের সেলুন প্রভৃতি এই জাতীয় শিল্প। কোনও কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এ জাতীয় কারবার হইতে এ জাতীয় প্রয়োজন মিটানোর ইচ্ছা লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলে, খরিদ্দারদের বাসস্থানের নিকটেই এ জাতীয় অনেক দোকান ছোট আকারে স্থাপিত হইয়া থাকে।

কারবারের অর্থনৈতিক আয়তন এবং সর্বোত্তম বা কাম্য আয়তন
('Economic Size' and 'Optimum Size' of a Business Unit)

লাভজনকভাবে কারবার চালাইতে হইলে উহার আয়তন অন্ততঃ একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌছান উচিত। কারবারের আয়তন উক্ত সীমার নিম্নে হইলে উহা লাভজনকভাবে চলিতে পারে না এবং উহাতে যান্ত্রিক উৎপাদন প্রয়োগ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহাই লাভজনক কারবারের নিম্নতম আয়তন এবং অর্থনৈতিক (Economic) বা কারিগরি (Technical) আয়তন নামে পরিচিত। সুতরাং যে আয়তন প্রাপ্ত হইলে কারবার লোকসানের হাত হইতে অব্যাহতি পায় উহাই কারবারের অর্থনৈতিক নিম্নতম আয়তন (Minimum Economic Size)। কারবার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে সাধারণত উহা অনেকক্ষেত্রে এই অর্থনৈতিক আয়তন অপেক্ষা বেশী বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, কারবার পরিচালনায় যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা (Risk and Uncertainty, থাকে কারবার এরূপ ক্ষুদ্র আয়তনের হইলে সাফল্যের সহিত উক্ত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা আয়ত্তে রাখা সম্ভব হয়।

কিন্তু কোন কারবারীই তাঁহার কারবার এই নিম্নতম আয়তনে রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। কারবারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে এবং অধিক মুনাফা-লাভের ইচ্ছা থাকিলে সুযোগ-সুবিধামত কারবারের আয়তন বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত। এই ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া সকল কারবারীই তাঁহার কারবারের আয়তন বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকেন। কারবারের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উহার পক্ষে বৃহদায়তন কারবারের অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ সম্ভব হয়। কিন্তু কারবারের আয়তন বৃদ্ধিরও একটি সীমা আছে। কোন কারবারই সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কারণ কারবার বৃদ্ধি বা সম্প্রসারিত হইতে হইতে এরূপ একটি পর্যায়ে আসিয়া পৌছায় যখন

উক্ত পর্যায় অতিক্রম করিলে লাভের অঙ্ক বা যোগ্যতার মান (standard of efficiency) কমিয়া যায়। সর্বাপেক্ষা লাভজনক এবং যোগ্য কারবার এই পর্যায় বা সীমারেখা দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। সম্প্রসারণের এই সীমারেখায় যে কারবার উন্নীত উহাকে সর্বোত্তম বা কাম্য আয়তন (optimum size) বলা হয়। মিসেস রবিনসনের মতে কাম্য আয়তনের কারবার বলিতে সেই কারবারকে বুঝায়, যে কারবার বর্তমান কারিগরি অবস্থা এবং সাংগঠনিক দক্ষতার ফলে দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়ের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করিয়া নিম্নতম গড় ব্যয়ে দ্রব্য উৎপাদন করিয়া থাকে। (By optimum firm we mean that firm which in existing condition of technique and organising ability has the lowest average cost of production per unit when all these costs which must be covered in the long run are included)।[1] ইহা সঠিক আয়তনের শ্রেষ্ঠ কারবার। কিন্তু এই কাম্য আয়তন কখনই অপরিবর্তনীয় নহে। ইহা সতত পরিবর্তনশীল। এই আয়তন কারিগরি অবস্থা, যান্ত্রিক-কৌশল-সংক্রান্ত জ্ঞান, সাংগঠনিক দক্ষতা প্রভৃতির উন্নতি ও উৎকর্ষের ফলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আবার উৎপাদনের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য উহা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং কাম্য আয়তন চূড়ান্ত নহে, ইহা আপেক্ষিক। সে যাহা হউক, কাম্য আয়তনই কারবারের শ্রেষ্ঠ আয়তন। ইহাকে অন্য কথায় আয়তনের প্রান্তিক বিন্দু (Marginal Point) বলা চলে। কারবার এই আয়তনের সীমা ছাড়াইলে অর্থাৎ এই আয়তন অপেক্ষা বৃহদাকার প্রাপ্ত হইলে উহাতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Return কার্যকরী দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ এই অবস্থায় পরিচালন দক্ষতার ও বাজারের সীমাবদ্ধতা এবং পণ্যের জটিলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে কাম্য আয়তন হইতে বৃহদাকার প্রাপ্ত হইলে দক্ষতা হ্রাস পায়, ব্যয়াধিক্যের চাপ আসিয়া যায় এবং মুনাফা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং কাম্য আয়তন (Optimum size) অপেক্ষা বৃহৎ আয়তনের কারবারকে অতি বৃহৎ (too big) কারবার বলা হয়। আবার কাম্য আয়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার হইলে দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ থাকিয়া যায়। উহার ফলেও মুনাফা সর্বাধিক হইতে পারে না। এইভাবে কারবারের আভ্যন্তরীণ কিংবা বাহ্যিক প্রসার বা বৃদ্ধি কাম্য আয়তন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (Expansion, whether internal or external, is controlled by the optimum size)।

কারবারের কাম্য আয়তন নির্ধারণের শক্তিসমূহ (Forces determining the Optimum Size of a Firm)

কারবারের কাম্য আয়তন যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে উহারা হইতেছে কারিগরি শক্তি (Technical Forces), ব্যবস্থাপনা শক্তি (Managerial Ability), আর্থিক শক্তি (Financial Forces), বিপণন শক্তি (Marketing Forces) এবং ঝুঁকি শক্তি (Force of Risk)। ইহাদের প্রত্যেকটির অবস্থা অনুযায়ী এক-একটি পৃথক পৃথক কাম্য আয়তনের কারবার সৃষ্টি হয়। উহারা হইতেছে কারিগরি কাম্য

1. E. A. G. Robinson, The Structure of Competitive Industry (1946) P 15.

আয়তন (Technical Optimum Size), ব্যবস্থাপনা কাম্য আয়তন (Managerial Optimum Size), আর্থিক কাম্য আয়তন (Financial Optimum Size), বিপণন কাম্য আয়তন (Marketing Optimum Size) এবং ঝুঁকি বহনক্ষম বা টিকিয়া থাকিবার মত কাম্য আয়তন (Risk or Survival Optimum Size)। নিম্নে উহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

১। কারিগরি কাম্য আয়তন (Technical Optimum Size): উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতি এবং কারিগরি-পদ্ধতি অনুসৃত হইলে উন্নত ধরনের শ্রমবিভাগও প্রবর্তন হইতে পারে। ইহাদের প্রয়োগে বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয়-সাধন (Integration of processes)-ও সম্ভব হয়। এরূপ কারবারে, নানাপ্রকারের ছাঁট ও পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি হইতে উপজাত পণ্যাদি প্রস্তুতও হয়। ইহার ফলে কারবারের আয়তন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়-সঙ্কোচ করাও সম্ভব হয়। কিন্তু এইভাবে কারবারের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে পাইতে উহা এরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় যে, তখন কারিগরি ব্যয়-সঙ্কোচ সর্বাধিক হয়। ইহার পর কারবারের আয়তন আরও বৃদ্ধি পাইলে কারিগরি ব্যয়-সঙ্কোচ স্থিতাবস্থায় উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ব্যয়-সঙ্কোচ আর বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় না। কারবারী প্রতিষ্ঠানের এই আয়তনকে কারিগরি কাম্য আয়তন (Technical Optimum Size) বলে। তবে এই কাম্য আয়তনের দ্বারা ঊর্ধ্বতম সীমার পরিবর্তে নিম্নতম সীমাই সমধিক প্রভাবান্বিত হয়, কারণ এই কারিগরি কাম্য আয়তন অপেক্ষা কারবারের আয়তন ক্ষুদ্রতর হইলে ব্যয়-সঙ্কোচ অপেক্ষাকৃত কম হইবে এবং বৃহত্তর হইলে ব্যয়-সঙ্কোচের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। সুতরাং এই শক্তির দ্বারা কারবারের বৃহত্তম সীমা নির্ধারণ করা চলে না। ইহা অন্যান্য শক্তির সাহায্যে নির্ধারিত হয়।

২। ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কাম্য আয়তন (Managerial Optimum Size): ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নহে। এই দক্ষতার পূর্ণ বিকাশের জন্য কারবার বড় হওয়া প্রয়োজন। কারবার বড় হইলে উচ্চ বেতনের দক্ষ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা সম্ভব হয় এবং ইহার ফলে ব্যয়-সঙ্কোচও বৃদ্ধি পায়। ব্যবস্থাপনার জন্য কারবারের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ব্যয়-সঙ্কোচও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এইভাবে কারবারের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায় যখন ব্যয়-সঙ্কোচও সর্বাধিক হয়। সুতরাং দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য কারবারের আয়তন বৃদ্ধি পাইলে ব্যয়-সঙ্কোচ যখন সর্বাধিক হয় তখন উক্ত আয়তনকে ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কাম্য আয়তন বলে। কারবারের আয়তন ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দক্ষতা হ্রাস পায় এবং ব্যয়-সঙ্কোচের পরিবর্তে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। আবার উক্ত কারবারের আয়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলে ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দক্ষতার এবং ব্যয়-সঙ্কোচের সুযোগ থাকিয়া যায়। ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কার্যধারার মধ্যে সমন্বয়-সাধনের অসুবিধার জন্যই কাম্য আয়তন অপেক্ষা বৃহত্তর আয়তনের পক্ষে

সর্বাধিক ব্যয়-সঙ্কোচ করা চলে না। কর্তৃত্বভার অর্পণের নীতি (Policy of Authority or Power Delegation), পরিচালন-পদ্ধতির উন্নতি এবং কর্মীদের দক্ষতা অনুযায়ী কার্যের পুনর্বিন্যাস দ্বারা এই ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কাম্য আয়তন বৃদ্ধির চেষ্টা বর্তমানকালের এক উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা।

৩। আর্থিক কাম্য আয়তন (Financial Optimum Size): বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সুবিধামত শর্তে ও কম সুদে বেশী পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। এজন্য কারবারের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে অনেকটা ব্যয়-সঙ্কোচ হয়। তবে কারবারের আয়তন কতটা বৃদ্ধি পাইলে ব্যয়-সঙ্কোচ সর্বাধিক হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ, পরিচালনের সুখ্যাতির জন্য বা কোন খ্যাতিমান ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকিলে ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও মূলধন সংগ্রহ অনেকটা সহজতর হয়। এজন্য আর্থিক কাম্য আয়তনের কোন নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন সীমা নাই।

৪। বিপণন কাম্য আয়তন (Marketing Optimum Size): কারবার বড় হইলে বিপণন-সংক্রান্ত অনেক ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়। ইহার পক্ষে কম মূল্যে একসঙ্গে বেশী পরিমাণ পণ্য বা কাঁচামাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। একসঙ্গে অধিক পরিমাণ পণ্য বাজারে পাঠানোর পরিবহন ব্যয়ও ইহার কম পড়ে। বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে ইহার ক্রয়-বিক্রয় পরিচালিত হয়। বিক্রয়-উদ্যোগীদের চেষ্টা, কম বিজ্ঞাপন ব্যয় প্রভৃতির ফলে ইহার ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত ব্যয় ক্রমশই হ্রাস পায়। এই ব্যয় হ্রাস বা সঙ্কোচের ফলে এরূপ কারবারের পক্ষে কারবারের কারিগরি বা ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কাম্য আয়তন অতিক্রম করাও সম্ভব। এইভাবে কারবারের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে পাইতে উহা এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায় যাহার পরে বিক্রয় বৃদ্ধির ব্যয় উহার ব্যয়-সঙ্কোচ অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে। এই অবস্থাই কারবারের বিপণন কাম্য আয়তন।

৫। ঝুঁকিবহনক্ষম বা টিঁকিয়া থাকিবার মত কাম্য আয়তন (Risk or Survival Optimum Size): পণ্যের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে কারবারের আয়তনও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া উহা কারিগরি বা ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কাম্য আয়তনে পৌঁছাইতে পারে। কিন্তু ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা, ক্রেতার রুচির পরিবর্তনের জন্য চাহিদার পরিবর্তন, পণ্যের উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তন প্রভৃতির ফলে পণ্যের অব্যাহত চাহিদা অনেকক্ষেত্রে হ্রাস পাইয়া থাকে। ইহার জন্য কারবারের আয়তন যদৃচ্ছা বৃদ্ধি করা চলে না। বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির দ্বারা পরিচালিত বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের লাভের মাত্রা বেশী হইলেও ঐ ধরনের নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হইলে এই পরিবর্তনের সহিত দ্রুত খাপ খাওয়াইয়া চলা বৃহদায়তন কারবারের পক্ষে অনেকক্ষেত্রে সম্ভব নহে। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন কারবারের পক্ষে উহা

সহজতর হয়। ফলে ঝুঁকিবহনক্ষম বা টিকিয়া থাকিবার মত কাম্য আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারই হইয়া থাকে।

মোটের উপর উপরি-উক্ত পাঁচটি শক্তির সংঘাতে কারবারে পাঁচ প্রকারের কাম্য আয়তন হইতে পারে। কিন্তু কারবারের প্রকৃত আয়তন কখনই পাঁচ প্রকারের হইতে পারে না। কারবারের প্রকৃতি অনুযায়ী উক্ত শক্তিসমূহের সামঞ্জস্য সাধনের উপর চূড়ান্ত কাম্য আয়তন (ultimate or final optimum size) নির্ভর করে। মোটের উপর যে আয়তনে কারবারের সর্বাধিক ব্যয়-সঙ্কোচ হয় উহাই কারবারের প্রকৃত কাম্য আয়তন। পূর্ণপ্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এরূপ কারবারের প্রান্তিক ও গড়ব্যয় (marginal and average cost) উহার প্রান্তিক ও গড় আয়ের (marginal and average revenue) সমান হয়। এই অবস্থাতেই গড়ব্যয় সর্বনিম্ন হয়। কিন্তু বাস্তব জগতে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে চূড়ান্ত কাম্য আয়তনের কারবার দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কাম্য আয়তন একটি ধারণা (concept) মাত্র। ইহার আলোচনার ফলে প্রত্যেক কারবার উহার নিজ নিজ ব্যয়-সঙ্কোচের চেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকে— কাম্য আয়তনের আলোচনার সার্থকতা এখানেই।

ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বৃহদায়তন কারবারের ধারণা এবং ভারতের কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন নমুনা (Concept of Small, Medium and Large-Scale Industries and Size Pattern of Indian Business Units)

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্পর্কে ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ প্রভৃতি কথাগুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র, মাঝারি বা বৃহৎ বলিলে কোন্ আয়তনের প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় সে সম্পর্কে কোন স্বীকৃত মান না থাকিলেও উহাদের সংজ্ঞা নিম্নরূপ দেওয়া হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্রায়তন (Small-scale): যে কারবারের মূলধন ৭½ লক্ষ টাকার কম এবং শক্তি ব্যবহার করিলে কর্মচারীর সংখ্যা ৫০ জন এবং শক্তি ব্যবহার না করিলে ১০০ জনের বেশী হয় না উহাকে ক্ষুদ্রায়তন কারবার (Small-scale Business) বলে।

মাঝারি আয়তন (Medium-scale): যে কারবারের মূলধন ৭½ লক্ষ টাকা বা উহার বেশী কিন্তু ২০ লক্ষ টাকার কম উহাকে মাঝারি আয়তনের কারবার (Medium-scale Business) বলা হয়।

বৃহদায়তন (Large-scale): যে কারবারের মূলধন ২০ লক্ষ টাকা বা উহার অধিক উহাকে বৃহদায়তন কারবার (Large-scale Business) বলা হয়।

ভারতের বিভিন্ন কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ—সকল প্রকার আয়তনের কারবারই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আবার মালিকানাভেদে একক মালিকানা, অংশীদারী কারবার, একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক কারবার, যৌথ মূলধনী কারবার, সমবায় কারবার, রাষ্ট্রীয় কারবার প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত।

ভারতে অনেক কারবারী প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্রায়তনের। ভারত গ্রামভিত্তিক দেশ। এজন্য ইহার গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন হইতে আরম্ভ করিয়া উহাদের ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত কাজ-কারবার অধিকাংশই ক্ষুদ্রায়তন-বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে প্রাথমিক (Primary) ও গৌণ বা যান্ত্রিক (Secondary or Manufacturing) উভয় প্রকার কারবার বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাথমিক শিল্পের মধ্যে এখানে **জীবনধারণের উপযোগী কৃষি-শিল্প** (**Subsistence Farming**) সমধিক প্রসিদ্ধ। যান্ত্রিক শিল্পের মধ্যে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। উহাদের প্রাধান্য গ্রাম অপেক্ষা শহর বা শহরের নিকটবর্তী স্থানে বেশী। এই শিল্পগুলির মধ্যে গুড় প্রস্তুত, তৈল নিষ্কাশন, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, ছোট আকারের ঢালাই কারখানা, হাল্কা যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানা, সাবান, পেষ্ট বোর্ড, বিড়ি প্রস্তুত, ছাপাখানা, আসবাবপত্র, পোশাক তৈয়ারী, ছোট আকারের রাসায়নিক কারখানা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম ছাড়া শহরেও ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত খুচরা ও পাইকারী অনেক কারবার ক্ষুদ্রাকারেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ক্ষুদ্রায়তনের অধিকাংশ কারবার একক মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক মালিকানা ও অংশীদারী কারবার ও সমবায় ভিত্তিক কারবারও ইহাতে কিছু কিছু আছে। স্বল্প মূলধন, শ্রমিক, যন্ত্রপাতি ও শক্তির ব্যবহারই এ সকল কারবারের মূল বৈশিষ্ট্য। প্রায় ক্ষেত্রেই এই সকল শিল্পের কাজ মালিক নিজে পরিচালনা করেন। তবে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোতে এই ক্ষুদ্রায়তন কারবারের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের শ্রমশক্তির একটা বিরাট অংশ ইহাতে নিয়োজিত এবং বৈজ্ঞানিক যুগে যান্ত্রিক শিল্পের প্রাধান্য সত্ত্বেও ইহারা জাতীয় জীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বর্তমানে অনেক ক্ষুদ্রায়তন অংশীদারী কারবার ঘরোয়া যৌথ কোম্পানীতে রূপান্তরিত হইয়া মাঝারি আয়তনবিশিষ্ট হওয়ার চেষ্টায় আছে। ইহাদের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশী নয় এবং ইহারা প্রধানতঃ হাল্কা যন্ত্রপাতি ও ভোগ্যপণ্য দ্রব্য প্রস্তুতে নিযুক্ত।

ভারতে বৃহদায়তন কারবারের অধিকাংশ আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। বৃহদায়তন প্রাথমিক শিল্পের মধ্যে বাগিচা শিল্প (Plantation Industry) যেমন চা, কফি, রবার এবং খনিজ শিল্পের মধ্যে কয়লা, লৌহ আকরিক, তাম্র, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। **বৃহদায়তন শিল্পের মালিকানা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌথ কারবার ও রাষ্ট্রীয় কারবারের অন্তর্গত।** ইহাদের মধ্যে যে সকল কারবার ব্যক্তিগত বা অংশীদারী কারবার হিসাবে স্থাপিত হইয়াছিল উহারা অসীমিত দায়ের (Unlimited Liability) ঝুঁকি এড়াইবার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘরোয়া যৌথ কোম্পানীতে (Private Limited Company) রূপান্তরিত হইয়াছে। বৃহদায়তন যান্ত্রিক যৌথ কারবারের মধ্যে কার্পাস, পাট, সিমেণ্ট, কাগজ, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত, মোটরযান, রাসায়নিক দ্রব্য, বনস্পতি, জাহাজ, বিমানপোত, রেলইঞ্জিন, যুদ্ধাস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহাদের পরিচালনায় কিছুটা

জটিলতাও আছে। শেয়ারগ্রহীতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) ছাড়া ইহাতে ম্যানেজিং এজেন্টদের প্রাদুর্ভাবও ছিল। বর্তমানে ইহাদের অনেকগুলিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে ৬২১৬টি সার্বজনিক যৌথ কোম্পানী, ২২,৪৩৫টি ঘরোয়া যৌথ কোম্পানী এবং ২৩২টি রাষ্ট্রীয় কারবার দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ছিল যথাক্রমে ১,৬৫১ কোটি টাকা, ২,১৩২ কোটি টাকা এবং ১,৩৯১ কোটি টাকা।

ভারতের কয়েকটি বড় বড় শিল্পের আয়তনিক ধাঁচের বিবরণ (An account of the size pattern of some of the big industries of India)

নিম্নে ভারতের কয়েকটি বড় বড় যৌথ কারবারী শিল্পের আয়তনিক ধাঁচের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :

১। কয়লা-শিল্প (Coal Industry) : ইহা ভারতের মৌলিক শিল্প হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। বিভিন্ন শিল্পোন্নয়ন ইহার উপর অনেকটা নিভরশীল। কয়লা প্রকৃতির দান। কয়লাখনি সংস্থাপনে ভারতের প্রতি প্রকৃতির কৃপণতা নাই। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৮৫০টি কয়লা খনি কার্যরত। কিন্তু ঐ কয়লা খনির অনেকগুলির আয়তন অর্থনৈতিক আয়তন (Economic size) অপেক্ষা ছোট। ফলে, সর্বনিম্ন ব্যয়ে ইহাদের উৎপাদন সম্ভব হইতেছে না। এই শিল্পে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত। এজন্য মাথাপিছু উৎপাদন অনেক দেশের তুলনায় কম। এই শিল্পে যান্ত্রিকীকরণ এবং তজ্জনিত ব্যয়-সঙ্কোচের সুযোগ থাকিলেও এরূপ ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট খনিগুলির সম্ভাব্য আয়তনের মান উন্নীত হইতে পারিতেছে না। ১৯৪৬ সাল হইতে বিভিন্ন 'কমিটি ও কমিশন' এই ক্ষুদ্রায়তন খনিগুলির আয়তন বৃদ্ধির প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। ইহাদের মধ্যে ১৯৫৭ সালে বলবন্তরাও মেহতার সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কমিটি রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া অঞ্চলে যে সমস্ত খনি মাসে ১০ হাজার টনের কম কয়লা উত্তোলন করে অথবা যাহাদের ১০০ একরের উপর কয়লাপূর্ণ খনি নাই তাহাদের বাধ্যতামূলকভাবে একত্রীকরণের (Compulsory Amalgamation) সুপারিশ করিয়াছেন। সরকার অবশ্য এই বাধ্যতামূলক একত্রীকরণের পূর্বে স্বেচ্ছামূলক একত্রীকরণের (Voluntary Amalgamation) জন্য ছোট ছোট খনির মালিকদিগকে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু এই অবস্থায় বিশেষ ফললাভ হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে না। এইভাবে একত্রীকরণের সংখ্যা খুব বেশী বৃদ্ধি পাইতেছে না। কয়লাশিল্প জাতীয়করণের ফলে এই অবস্থা দূর হইবে বলিয়া মনে হয়।

২। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry) : ইহা ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প এবং ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি দ্বারা ব্যয়-সঙ্কোচ

করার সুযোগ-সুবিধা আছে। এজন্য আধুনিক পদ্ধতিতে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন প্রয়োজন। কিন্তু মূলধনের সমস্যাই ইহার বড় সমস্যা। একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ভালভাবে স্থাপন করিতে অন্তত: ১০০ কোটি টাকার প্রয়োজন। বে-সরকারী উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত জামসেদপুর ও বার্ণপুরের কারখানা সম্প্রসারণের সুযোগ পায় নাই। বে-সরকারী কারখানাগুলিকে সম্প্রসারণের জন্য ইদানীং অবশ্য বিশ্বব্যাঙ্ক ও ভারত সরকার ঋণ দিতেছেন এবং ইহার ফলে সম্প্রসারণের কার্যসূচীও গৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সরকারী উদ্যোগে দুর্গাপুর, ভিলাই, রুড়কেলায় ও বোকারোতে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। অন্য অসুবিধার মধ্যে কারিগরি জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিরও অভাব আছে। তবে এই শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনাময় এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে এবং এই শিল্পের ধাঁচ ও দেশের অবস্থা উহার সম্প্রসারণের বিশেষ অনুকূল রহিয়াছে।

৩। **কার্পাস বস্ত্র-শিল্প (Cotton Industry):** ইহা প্রাচীনতম শিল্পগুলির অন্যতম। যন্ত্রচালিত শিল্পের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পরেই ইহার স্থান। তবে এখনও পর্যন্ত এই শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী। পৃথিবীর মধ্যে বস্ত্র উৎপাদনের শতকরা ১৪ ভাগ এবং সুতা উৎপাদনের শতকরা ১৩ ভাগ ভারতে উৎপন্ন হয়। কাপড়ের কলগুলির অধিকাংশ অবশ্য বোম্বাই ও আমেদাবাদে অবস্থিত। বোম্বাই অঞ্চলে কলগুলিতে ৩০ হাজার হইতে ৬০ হাজার পর্যন্ত মাকু আছে। আমেদাবাদ অঞ্চলে এই মাকুর সংখ্যা ১৫ হাজার হইতে ৩০ হাজার, অন্যান্য অঞ্চলে ১০ হাজার হইতে ১৫ হাজার পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ত্রাদির চাহিদা ব্যক্তিবিশেষের বিভিন্নরূপ রুচির জন্য বিভিন্ন [illegible] কারখানাগুলিকে নানাপ্রকারের বস্ত্রাদি উৎপন্ন করিতে হয়। ফলে ইহার [illegible] কাম্য আয়তন খুব বড় হইতে পারে না। কিন্তু কারিগরি আয়তন কো[illegible] ক্ষুন্ন না করিয়া অন্যান্য কাম্য আয়তন বৃদ্ধির সুযোগ ইহাতে আছে। এই শিল্পের মধ্যে অর্থনৈতিক আয়তনের নীচেও অনেক কারখানা আছে। ইহাদিগকে বন্ধ করিয়া দেওয়া কিংবা একত্রীকরণ ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা সরকারী তরফ হইতে চলিতেছে।

৪। **পাট-শিল্প (Jute Industry):** পাটজাত দ্রব্য প্রধানত রপ্তানির উদ্দেশ্যেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে ইহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আছে। ভারত প্রতিবৎসর ১০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিয়া থাকে। কিন্তু কলিকাতার উপকণ্ঠে হুগলী নদীর উভয় তীরেই অধিকাংশ পাটকল অবস্থিত। এখানকার কলগুলিতে ৫০০ হইতে ২,৫০০ পর্যন্ত তাঁত আছে। অন্যান্য অঞ্চলের পাটকলগুলির তাঁতের সংখ্যা পাঁচ শতের নীচে। ইহার কাম্য আয়তন কার্পাস বস্ত্র-শিল্পের অনুরূপ। মোটামুটি ইহার আয়তন সম্পর্কে বিশেষ কোন সমস্যা নাই। ইহার প্রধান সমস্যা কাঁচা পাট যাহা বাংলাদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বৈদেশিক বাজারেও ইহাকে বাংলাদেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়। ফলে

উৎপাদন বেশী দেখা দেওয়ায় উৎপাদনের সময় হ্রাস করা হইয়াছে এবং কিছু সংখ্যক তাঁত অচল রাখা হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে হইলে ইহার উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং তজ্জন্য ছোট কারখানাগুলি বন্ধ, বড় কারখানার সহিত উহাদের তাঁতগুলি সংযুক্ত করা হইতেছে।

৫। চিনি-শিল্প (Sugar Industry): ইক্ষুদণ্ড উৎপাদনের দিক দিয়া ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু ইক্ষু চিনি উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। সুতরাং ইহা ভারতের উন্নতিশীল শিল্পের মধ্যে একটি। ইহার এই উন্নতি ১৯৩২ সালের সংরক্ষণের পূর্বে সম্ভব হয় নাই। এক কথায় ইহাকে সংরক্ষণের সন্তান (Child of Protection) বলা হয়। বিশ্লেষণ প্রথায় (Analytical Method) চিনির উৎপাদন হইয়া থাকে। ফলে এই শিল্পে কারিগরি কাম্য আয়তন বড় হইতে পারে। কিন্তু কতকগুলি অসুবিধার দরুন ইহা কাম্য আয়তনে পৌছাইতে পারিতেছে না। ফলে জাভা বা কিউবার তুলনায় ইহার উৎপাদন-ব্যয় বেশী। ইহার প্রধান অসুবিধা কাঁচামালের উৎপাদন স্থান হইতে কারখানার দূরত্ব। উক্ত কাঁচামাল কারখানায় আনিতে ব্যয় বেশী পড়ে। তাহা ছাড়া, কারখানায় পৌছাইতে পৌছাইতে ইক্ষুদণ্ডের রস অনেকটা শুকাইয়া যায়। ইহার উপজাত দ্রব্য যথা, সুরাসার, মেথিলেটেড স্পিরিট, পেষ্ট বোর্ড প্রভৃতিতেও ভারত খুব অগ্রসর নয়। ইহা ছাড়া, চিনির কলগুলি সারা বৎসর চালু থাকে না। ইক্ষু হইতে রস নিষ্কাশন-পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং ইহার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াইতে হইলে আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। এজন্য অবশ্য একটি উন্নয়ন পরিষদ (Development Council)-ও গঠন করা হইয়াছে। চিনি-শিল্পের সম্প্রসারণের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। এজন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক আয়তনের নিম্নে যে সকল কারখানা আছে উহাদের অন্ততঃ অর্থনৈতিক আয়তনে উন্নত করা। ব্যয়-সঙ্কোচের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে ইহা ভবিষ্যতে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

বৃহদায়তন কারবারী প্রচেষ্টার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of large scale operations in industries)

যে শিল্প বহু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে এবং এক সঙ্গে প্রভূত দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাকে বৃহদায়তন শিল্প বলে। সাধারণত যে সকল কারবারের মূলধন ২০ লক্ষ টাকা বা ততোধিক উহা বৃহদায়তন আখ্যা পাইয়া থাকে। শ্রম বিভাগ ও উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলেই শিল্প বা কারবার বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ পায়। উহাদের ব্যবহারের ফলে যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় তাহা বৃহদায়তন শিল্পের পক্ষেই ভোগ করা সম্ভব হয়। অধ্যাপক মার্শাল কারবারের সুবিধাগুলি প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—(১) বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ (External Economies) এবং (২) আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ (Internal Economies)।

কোনও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে উহা কতকগুলি অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। ইহার ফলে যে ব্যয়-হ্রাস ঘটে উহাই বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ। শিল্পের একদেশতা (localisation) ঘটিলে এই বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধাগুলি পাওয়া যায়। এই সুবিধাগুলি হইতেছে—যাতায়াত, সংবাদ আদান-প্রদান, গবেষণা, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, সহায়ক শিল্প, শ্রমিক সমাবেশ, স্থানের সুনাম প্রভৃতির সুবিধা। শিল্পের একদেশতা ঘটিলে এই ব্যবস্থাগুলির গোড়াপত্তন ও উন্নতি হইতে থাকে এবং উক্ত এলাকার প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানই ইহা হইতে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি ভোগ করিতে পারে।

উপরি-উক্ত বাহ্যিক সুবিধাগুলি ছাড়া বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচের ফলেও কতকগুলি সুবিধা লাভ হয়। কোন শিল্প উহার নিজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল হিসাবে নানাপ্রকার ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধা পায়। উহাই আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ। আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচের কারণগুলি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। **কারিগরি ব্যয়-সঙ্কোচ** (**Technical Economies**): বৃহৎ কারবারের পক্ষে বৃহৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সহজসাধ্য। ইহাতে কিছুটা ব্যয়-সংক্ষেপ হয়। কারণ বৃহৎ যন্ত্রপাতির নির্মাণ ব্যয় অনুরূপ ছোট যন্ত্রপাতির তুলনায় কম। এই যন্ত্রপাতির উন্নত কলাকৌশলের জন্য উৎপাদন ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত কম পড়ে। যেমন, দোতলা বাসের নির্মাণ ব্যয় একতলা বাসের নির্মাণ ব্যয়ের কখনও দ্বিগুণ হয় না। উহা অপেক্ষা কিছু কমই পড়ে। বৃহৎ কারবারের উন্নত কলাকৌশলের ইহা নিদর্শন। ক্ষুদ্রায়তন কারবার এরূপ সুবিধা পায় না। কেবল বৃহদায়তন কারবার এই সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

২। **উৎপাদন-সংক্রান্ত ব্যয়-সঙ্কোচ** (**Economies of Production**): বৃহদায়তন কারবারের পক্ষে পাইকারী হারে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করা সম্ভব হয়। উহাদের পরিবহন ব্যয়ও গড়ে কম পড়ে। ইহা ছাড়া এই সকল দ্রব্য ক্রয় করা ব্যাপারে এরূপ কারবার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে। এবংবিধ কারণে গড়পড়তা কম ব্যয়ে ইহা পণ্য উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করে। ক্রয়-জনিত উপরি-উক্ত সুবিধা ছাড়া উৎপাদন ব্যাপারে ইহার পক্ষে আরও বিভিন্ন প্রকারের সুবিধা ভোগ করার সুযোগ আছে। এরূপ প্রতিষ্ঠানে শ্রম বিভাগ (division of labour) বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা চলে। ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত প্রতিটি কার্যের জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং সুদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা চলে। ইহার ফলে শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির পূর্ণ ব্যবহার করা চলে। ফলে অপচয় বন্ধ হয়। নিজেদের প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদিও ইহা উৎপাদন করিতে পারে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিত্যক্ত অংশাদি হইতে উপজাত দ্রব্যাদিও (by-products) ইহা প্রস্তুত করিতে পারে। তাঁহা ছাড়া ইহার পক্ষে গবেষণার দ্বারা পণ্যের মান উন্নয়ন করাও সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া উৎপাদন ব্যাপারে পেটেন্ট (Patent), ট্রেড মার্ক (Trade Mark), গোপন

উৎপাদন কৌশল, তুলনামূলক হিসাব রক্ষা, উৎপাদন ব্যয়-সংক্রান্ত হিসাব রক্ষণ (costing), উৎপাদন উৎকর্ষের মান নিয়ন্ত্রণ (quality control) প্রভৃতি ব্যবস্থার সুফলও বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানই গ্রহণ করিতে পারে এবং ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে পারে। ক্ষুদ্রায়তন কারবারের পক্ষে এরূপ ব্যয়-সঙ্কোচ ও সুবিধা ভোগ করা সম্ভব নহে।

৩। **ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত ব্যয়-সঙ্কোচ** (**Economies of Management**): ক্ষুদ্রায়তন কারবারে মালিককেই সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনার কাজ করিতে হয়, সব কিছু তদারক করিতে হয়। এইভাবে নানাবিধ কাজে লিপ্ত থাকায় এরূপ কারবারের মালিকের পক্ষে তাহার চিন্তাশক্তি এবং পরিচালন প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সাধন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বৃহৎ কারবার উহার সমগ্র কাজ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগীয় কাজের জন্য উচ্চ বেতনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারে। ইহাতে একদিকে যোগ্যতম ব্যক্তি নিয়োগ যেমন সম্ভব হয়, অন্য দিকে উহাদের কর্মশক্তির পূর্ণবিকাশ ও ব্যবহারেরও সুযোগ সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত উৎকর্ষ সাধন ঘটে, পণ্যের মান উন্নত হয় এবং গড়পড়তা ব্যয় সংক্ষেপ হয়। যেমন, একজন দক্ষ বিক্রয়-উপযোগী (salesman) তাঁহার কর্মকুশলতার দ্বারা বিক্রয় দ্বিগুণ বাড়াইতে পারেন, কিন্তু ইহার ফলে বিক্রয় ব্যয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় না। এইভাবে সামান্য বেশী ব্যয়ে অধিক লাভ করা বড় প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এরূপ সুবিধা লাভ কমই ঘটিয়া থাকে।

৪। **অর্থসংগ্রহ-সংক্রান্ত ব্যয়-সঙ্কোচ** (**Financial Economies**): বৃহদায়তন কারবার সুবিধাজনক শর্তে এবং অল্প সুদে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। কারণ এরূপ কারবার ঋণের জন্য উপযুক্ত জামিন দিতে পারে। প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া ইহা ঋণদাতার মনে নিরাপত্তাভাব জাগাইয়া তুলিতে পারে। কারবার বৃহৎ হইলে উহা বাজারে অধিক পরিচিত ও সুনাম লাভ করার সুযোগ পায়। ইহাও ঋণ সংগ্রহের পক্ষে সুবিধাজনক। এরূপ কারবারের মুনাফাও বেশী বলিয়া উহার কিছুটা অংশ কারবারে পুনর্নিয়োগ হইতে পারে। অনেক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি করিয়া নগদ বিক্রয় বা কম ধার দিয়া অনাদায়ী পাওনা (Bad Debt) হ্রাস করিতে পারে। ইহাদের আর্থিক সঙ্গতি দৃঢ় থাকায় ব্যবসা মন্দা (Trade Depression) দেখা দিলেও টিকিয়া থাকিতে পারে।

৫। **বিক্রয়জনিত ব্যয়-সঙ্কোচ** (**Economies of Marketing**): বৃহৎ কারবারের পক্ষে উহার পণ্য বিক্রয়েও নানাপ্রকার ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয়। প্রথমত, পাইকারী হারে পণ্য বিক্রয় বা রপ্তানির দ্বারা ইহা কম পরিবহন ব্যয়ের সুবিধা পায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাপক প্রচার ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে বিক্রয় বৃদ্ধি পায় তাহাতে প্রচার ও বিজ্ঞাপনের ব্যয় গড়পড়তায় কম পড়ে। বিভিন্ন স্থানে নিজস্ব প্রতিনিধি ও শাখা স্থাপন করিয়া বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে তৎপরতার সহিত ইহা পণ্য যোগান দিতে পারে। ইহার ফলে একদিকে কারবারের

সুনাম বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদিকে বিক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ফলে গড়পড়তা ব্যয় কম পড়ে।

৬। **ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা (Risk-bearing Capacity):** বৃহৎ কারবারের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার এবং বিভিন্ন মানের পণ্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব হয়। ফলে ইহার পক্ষে কোন পণ্যের চাহিদার পরিবর্তন হইলে অন্য পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে একের ক্ষতি অন্যের লাভ দ্বারা পূরণ করিতে পারে। বিভিন্ন বাজারে পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিয়াও চাহিদার পরিবর্তনের জন্য যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা তাহা দূর করিতে পারে। এইভাবে বৃহৎ কারবারের পক্ষে ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা বেশী দেখা দেয়।

কিন্তু বৃহদায়তন কারবারের কতকগুলি **অসুবিধাও** আছে। এই কারণে বৃহদায়তন কারবারের পাশাপাশি বহু ক্ষুদ্রায়তন কারবারও টিকিয়া আছে। বৃহদায়তন কারবারের কতকগুলি অসুবিধার জন্যই ক্ষুদ্রায়তন কারবার কতকগুলি সুবিধা ভোগ করিতে পারে। ফলে ক্ষুদ্রায়তন কারবারের পক্ষে বৃহদায়তন কারবারের প্রতিযোগী হইয়াও লাভজনকভাবে কারবার পরিচালনা করা সম্ভব হয়। নিম্নের বিবরণ হইতে বৃহদায়তন কারবারে অসুবিধা এবং **ক্ষুদ্রায়তন কারবারের সুবিধা** বুঝিতে পারা যাইবে।

১। বৃহদায়তন শিল্প সাধারণত একই ধরনের অনেক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় যেখানে ব্যক্তিগত রুচির উপর পণ্যের চাহিদা নির্ভর করে সেখানে বৃহদায়তন শিল্পে এরূপ অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করিলেও ব্যক্তিগত রুচি মিটাইবার জন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পও পাশাপাশি থাকিয়া যায়। কমলালয়ের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে 'রেডিমেড' পোশাক পাওয়া গেলেও বাজারে ছোট আকারের পোশাকের দোকান বা দর্জির দোকানের অভাব নাই।

২। কারবার ছোট হইলে মালিক উহার তত্ত্বাবধান নিজে করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে এরূপ অবস্থায় সর্বদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাও সম্ভব হয়। ইহার ফলে খরিদ্দারদের প্রয়োজন ও রুচির উপরেও তিনি দৃষ্টি দিতে পারেন এবং কর্মচারীদের কাজেরও তদারক করিতে পারেন। এজন্য সকল প্রকার খরিদ্দারদের যেমন সন্তুষ্ট করা সম্ভব তেমনই আবার মালিক-কর্মচারীর মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। অনেক খরিদ্দার এই কারণে ছোট দোকানে আকৃষ্ট হন। এরূপ সুবিধা বৃহৎ কারবারে খুবই কম। কারবার যতই বড় হইতে থাকে মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে ব্যবধান ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শ্রমিক অসন্তোষ বৃহৎ কারবারে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

৩। এমন অনেক শিল্প আছে যেখানে বৃহদায়তনে উৎপাদন সম্ভব নয়। সূক্ষ্ম কারুকার্য-সমন্বিত উচ্চাঙ্গের কাশ্মীরী শাল ছোট কারখানাতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এরূপ পণ্যের উৎপাদন বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পে সম্ভব হয় নাই।

৪। বাজারের আয়তনের উপর আবার কারবারের আয়তন নির্ভর করে। বাজার বৃহৎ হইলে অর্থাৎ চাহিদা বা ক্রেতার সংখ্যা প্রচুর হইলে বৃহদায়তনে অধিক উৎপাদন সুবিধাজনক। কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা কম হইলে সেখানে ক্ষুদ্রায়তন কারবারই প্রধান্য লাভ করে।

৫। যেখানে পণ্য পচনশীল কিংবা ক্রেতারাও বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করেন সেরূপক্ষেত্রে বৃহদায়তন কারবার অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন কারবার সুবিধাজনক।

৬। চাহিদা পরিবর্তনশীল হইলে উহার সহিত দ্রুত সামঞ্জস্য রক্ষা করা বৃহদায়তন কারবারের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। কারণ বৃহৎ কারবারের যন্ত্রপাতি এবং ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন কারবারের পক্ষে উহার সামান্য যন্ত্রপাতির পরিবর্তন সাধন দ্বারা চাহিদার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা অধিক সহজসাধ্য।

৭। বৃহৎ কারবারের পক্ষে উহার নীতি ও কর্মধারা তৎপরতার সহিত পরিবর্তন করা কষ্টসাধ্য। কারণ, বৃহৎ কারবারে এরূপ পরিবর্তন অনেকের পরামর্শ ও মতামতের উপর নির্ভর করে। ক্ষুদ্রায়তনের পক্ষে এরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

৮। কারবারী প্রতিষ্ঠান যতই বড় হইতে থাকিবে ততই ইহার ব্যবস্থাপনায় জটিলতা দেখা দিবে। আবার কারবার বড় হইতে হইতে এমন একটি অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায় যখন উৎপাদন ব্যয় না কমিয়া বাড়িতে থাকে। ফলে এরূপ কারবার বাড়তি খরচের কারণ হয়। এরূপ অবস্থায় শ্রমবিভাগ এবং বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুবিধা নষ্ট হয়, অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের বিক্রয় ব্যয়ও অযথা বৃদ্ধি পায় এবং প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের ব্যয়ও অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং কারবার যদৃচ্ছা বৃদ্ধি করা চলে না। ক্ষুদ্রায়তন কারবারের পক্ষে এসকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় না।

বৃহদায়তন শিল্পের নানাবিধ অসুবিধা এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের এবংবিধ সুবিধার জন্য সকল দেশেই এমন কি উন্নত দেশগুলিতেও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প অনেক আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র শিল্পের শতকরা ৯২·৫ ভাগ, জাপানের শতকরা ৮০ ভাগ এবং ভারতের শতকরা ৯৫ ভাগ শিল্প ক্ষুদ্রায়তনের। সুতরাং ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানও কারবারী ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

অর্থ নৈতিক উন্নতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের শিল্পের ভূমিকা
(Role of small and medium sized industries in the economic development of a country)

যে শিল্পের মূলধন ৭½ লক্ষ টাকার কম এবং কর্মীর সংখ্যাও ১০০ জনের কম উহাকে ক্ষুদ্রশিল্প আখ্যা দেওয়া হয়। আবার যে শিল্পের মূলধন ৭½ লক্ষ টাকা কিংবা উহার অধিক, কিন্তু ২০ লক্ষ টাকার কম উহা মাঝারি শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। এই জাতীয়

শিল্প ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। যদিও ভারতে বৃহদায়তন শিল্পের প্রাচুর্য আছে, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটিরশিল্পের প্রাধান্যও এ দেশে কম নয়। National Income Committee এই সকল শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ৯০০ কোটি টাকার বেশী বলিয়া হিসাব করিয়াছেন। পক্ষান্তরে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হিসাব হইয়াছে ৫৫০ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা যেখানে ৩০ লক্ষ, এই সকল শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা সেখানে ২ কোটি। এজন্য ভারতের বেকার সমস্যা সমাধানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে এক নূতন তাৎপর্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা কৃষকদের সহকারী জীবিকা হিসাবে প্রধান অবলম্বন। সারা-বৎসর কৃষিকাজ চলে না। অবসর সময়ে কৃষক কুটিরশিল্পের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটিরশিল্পের উন্নতি হইলে ইহা বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় হইবে। আমাদের দেশে বৃহদায়তন শিল্পের উন্নতি হইলেও এখনও আমাদের সামাজিক কাঠামো কৃষিভিত্তিক। শতকরা ৭০ জন লোক প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। ইহাতে কৃষির উপর অত্যধিক চাপ পড়িতেছে এবং লোকের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে। এই চাপ কমানোর জন্যও এ শিল্প প্রসারের প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে। বৃহদায়তন শিল্প স্থাপনের জন্য প্রচুর মূলধন এবং বিদেশ হইতে অত্যধিক মূল্যে যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ মূলধন যোগানের সুবিধা নাই। উপরন্তু বৃহদায়তন শিল্প মূলধন-প্রধান (Capital intensive), কিন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প শ্রমিক-প্রধান (Labour intensive)। সুতরাং কম মূলধনে অধিক লোক নিয়োগের ক্ষেত্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। বিকেন্দ্রীকরণের যুক্তিতেও ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটিরশিল্পের প্রসার সমর্থনযোগ্য। বৃহদায়তন শিল্প গড়িয়া উঠে একদেশতার ভিত্তিতে। ইহাতে গৃহ সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা, ধনবৈষম্য সমস্যা দেখা দেয়। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটিরশিল্পে এই সকল সমস্যা নাই বরং ইহাদের উন্নতিতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার সমস্যা হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে। আর্থিক বৈষম্য এবং সামাজিক ব্যয় হ্রাস করিতেও ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অশেষ। ইহাতে বৃহদায়তন শিল্পের ন্যায় উন্নত কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। স্থির ব্যয় (Fixed Expenditure) কম বলিয়া ইহারা সহজেই ব্যবসা মন্দার হাত হইতে রেহাই পাইতে পারে। স্বল্পকালের মধ্যে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রা-স্ফীতির চাপ কমাইতেও ইহাদের গুরুত্ব বেশী। সুতরাং উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে অর্থনৈতিক উন্নতিতে ইহাদের ভূমিকা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। এজন্য এই শিল্পগুলির নানাবিধ সমস্যা দূর করিয়া ইহাদের প্রসারে যত্নবান হওয়া সকলের অবশ্য কর্তব্য।

প্রাথমিক এবং যান্ত্রিক উভয় প্রকার কারবারই অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাথমিক শিল্পের মধ্যে কৃষি-শিল্পের এবং শ্রম-শিল্পের মধ্যে কুটিরশিল্প ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া গুড় প্রস্তুত, তৈল নিষ্কাশন, মৃৎ-শিল্প, তাঁত-শিল্প, ঢালাই

কারখানা, হাল্কা যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানা, সাবান, পেষ্ট বোর্ড, বিড়ি, ছাপাখানা, আসবাবপত্র, পোশাক, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি শিল্পে ছোট ও মাঝারি আকারের অনেক কারখানা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত অনেক খুচরা ও পাইকারী কারবার ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারেরই বেশী হইয়া থাকে। দেশের শ্রমশক্তির একটা বিরাট অংশ ইহাতে নিয়োজিত এবং বৈজ্ঞানিক যুগে বৃহৎ যান্ত্রিক শিল্পের প্রাধান্য সত্ত্বেও ইহারা জাতীয় জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। যদিও ভারতে বৃহদায়তন শিল্পের প্রাচুর্য আছে, তথাপি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রাধান্যও এদেশে কম নয়। ইহা শুধু ভারতেরই বৈশিষ্ট্য নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র শিল্পের শতকরা ৯২·৫ ভাগ, জাপানের শতকরা ৮০ ভাগ এবং ভারতের শতকরা ৯৫ ভাগ শিল্প ক্ষুদ্রায়তনের। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও মাঝারি শিল্প ব্যক্তিগত রুচি, সূক্ষ্ম কারুকার্যের এবং নানাবিধ ছোট-খাট অভাব যতটা পূরণ করিতে পারে বৃহদায়তন শিল্প ততটা পারে না। সূক্ষ্ম কারুকার্য-সমন্বিত কাশ্মিরী শাল ছোট কুটিরশিল্পেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এরূপ পণ্যের উৎপাদন বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পে কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং বৃহদায়তন শিল্পের পক্ষে মানুষের সর্বপ্রকার অভাব পূরণ করা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া, বৃহদায়তন শিল্পকেও নানাপ্রকার দ্রব্যের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর নির্ভর করিতে হয়। বৃহদায়তন শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনমত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, উপকরণ, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি নিজস্ব কারখানায় প্রস্তুত করা মোটেই লাভজনক নহে। ঐ সকল দ্রব্যাদি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সংগ্রহ করা অধিক সুবিধা-জনক। কারণ প্রতিযোগিতার বাজারে এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে ন্যায্য দরে নির্দিষ্ট মানের জিনিসপত্র সরবরাহের জন্য ইহারা দর কষাকষিও করিতে পারে। নিজস্ব কারখানায় প্রস্তুত হইলে এরূপ সুবিধা লাভ করা বৃহদায়তন কারখানার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। এজন্য উন্নত দেশেও অতিকায় বৃহৎ শিল্প-সংস্থাগুলি নির্ভরযোগ্য ছোট ও মাঝারি কারখানা হইতে যন্ত্রাংশ, সাজসরঞ্জাম এবং অন্যান্য ভোগ্য পণ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। সুইজারল্যাণ্ডের খ্যাতনামা ঘড়ির বড় কারখানাগুলি উহার প্রয়োজনীয় অংশ-গুলি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কারখানা হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকে। জাপানে বৃহৎ শিল্পগুলি উৎপাদনের কোন কোন পর্যায় ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লয়। সুতরাং বৃহৎ শিল্পের নিজেদের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নতিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন ব্যয় কম পড়িবে, ফলে জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং এইভাবে ইহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। এজন্য ভারতের মত দরিদ্র ও বেকারসমস্যাক্লিষ্ট দেশে বৃহৎ শিল্পের পক্ষে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নতির ও প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া নিজেদের স্বার্থে এবং সমাজের কল্যাণের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। বৃহৎ কারবারের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলে উহারা নিজেরাও উন্নতি লাভ করিতে পারে এবং ক্ষুদ্র কারবারের উন্নতিতে সহায়তা করিতে পারে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ত্রুটি এবং সরকারী প্রচেষ্টা (Drawbacks of Small Industries and Government Steps)

ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আছে। কিন্তু এ শিল্পের সাংগঠনিক (organisational), আর্থিক (financial) এবং পণ্য ক্রয়-বিক্রয় (marketing)-সংক্রান্ত ব্যাপারে কতকগুলি ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নের বিবরণ হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে।

১। প্রথমত, যে সকল লোক এই শিল্পে নিযুক্ত তাহাদের অনেকেই দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। আবার অনেক ক্ষেত্রে আংশিক বেকারত্ব দূর করার উদ্দেশ্যে বহুলোক ইহাতে নিয়োজিত হইতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় এই শিল্পের সংগঠনকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এজন্য ব্যবস্থাপনার এবং করণকৌশলের দিক দিয়া ঐ শিল্পের অবস্থা মোটেই উন্নত নয়। ইহাদের পণ্যে কোন নির্দিষ্ট মান নাই। উৎপাদন ব্যয়ও অত্যাধিক পড়ে এবং ইহারা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতে পারে না। দেশের বৃহৎ শিল্পের সহিত এবং বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় ইহারা হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই সাংগঠনিক দুরবস্থার জন্য ইহাদিগকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইতেছে না।

২। ইহাদের আর্থিক অবস্থাও শোচনীয়। ইহাদের কাঁচামাল ক্রয় ও পণ্যদ্রব্য বিক্রয় ব্যাপারে যে অর্থের প্রয়োজন হয় সে অর্থ এরূপ দরিদ্র মালিকদের নিজের অর্থে সংকুলান হয় না। এই অর্থের জন্য ইহাদিগকে মহাজনদের শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহাদের অসহায় অবস্থা দেখিয়া মহাজনরাও অধিক সুদে টাকা ধার দিয়া থাকে। এই ঋণের টাকা এই দরিদ্র শিল্পীরা কখনই শোধ করিতে পারে না। ফলে ইহারা ঋণভার লইয়া চলিতে থাকে এবং মহাজনদের ও মধ্যস্থ কারবারীদের নির্দেশমত কাঁচামাল ক্রয় ও পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

৩। ইহাদের ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। মহাজন ও মধ্যস্থ কারবারিগণই (Middlemen) অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাদিগকে উচ্চ মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ করিয়া থাকে এবং উৎপাদিত পণ্য অত্যন্ত কমমূল্যে ইহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া থাকে। ইহার ফলে দরিদ্র শিল্পীরা উহাদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না এবং পণ্য বিক্রয় দ্বারা মোটেই মুনাফা অর্জন করিতে পারে না। মুনাফার মোটা অংশ মহাজন ও মধ্যস্থ কারবারিগণই ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং অর্থনৈতিক কাঠামোতে ইহাদের আর্থিক অবস্থা এবং পণ্যের মান কোনটাই উন্নত হইতে পারে না।

দেশ যখন বিদেশী শাসনে ছিল তখন ইহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সম্যক চেষ্টা কোনদিনই করা হয় নাই। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় সরকার এদিকে পূর্ণ দৃষ্টি দিয়াছেন এবং নানাবিধ প্রচেষ্টার দ্বারা ইহাদের অবস্থার উন্নতি এবং এই শিল্প দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলিতেছে। নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। বর্তমানে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প শিল্পোন্নয়ন, বিজ্ঞান ও করণকৌশল সম্পর্কীয় মন্ত্রকের (Ministry of Industrial Development, Science and Technology) অধীন। অনুরূপ মন্ত্রক প্রত্যেক রাজ্যেও স্থাপিত হইয়াছে। এই মন্ত্রকের উপর ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতি বিধানের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে।

২। এই মন্ত্রকের চেষ্টায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য কতকগুলি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। উহারা হইতেছে ন্যাশনাল স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশন (National Small-scale Industries Corporation), রিজিওনাল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ সার্ভিসেস্ ইন্‌ষ্টিটিউটস্ (Regional Small Industries Services Institutes), মেজর ইনষ্টিটিউটস্ (Major Institutes), ব্রাঞ্চ ইন্‌ষ্টিটিউটস্ (Branch Institutes) এবং একস্‌টেনশন সেণ্টারস্ (Extension Centres)। ইহারা নিজ নিজ কার্যের পরিধির মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। উঁহাদের কার্য নিয়ন্ত্রণ ও সংযোজনার জন্য ডেভেলপমেণ্ট কমিশনারও (Development Commissioner) নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। ন্যাশনাল স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশন (National Small-scale Industries Corporation) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকে এবং উহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহা ইহাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারে অর্ডার সংগ্রহ করিতে সাহায্য করে, ভাড়া-ক্রয় হিসাবে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়া থাকে এবং উহাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ড (Small-scale Industries Board) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতি বিধানের উপযোগী কার্যরূপ (Programme) প্রস্তুত করে এবং তদনুযায়ী কার্যে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয় সুপারিশ করিয়া থাকে।

৪। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিভিন্নভাবে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সুবিধা আছে। স্টেট ব্যাঙ্কের পাইলট স্কিম (Pilot Scheme) অনুযায়ী বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের আর্থিক সাহায্যের সহজ ও সরল পন্থা স্থির হইয়াছে। এইভাবে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্টেট্ ফিনান্সিয়াল করপোরেশন, কোপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক, কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক এবং সরকারের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সুবিধা আছে। যদি বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা এজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার আংশিক পূরণ করিয়া থাকে।

৫। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেট্ (Industrial Estates) স্থাপিত হইয়াছে। উহাদের বিশেষ কাজ শিল্পীদের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ সার্ভিসেস্ ইন্‌ষ্টিটিউস্, ব্রাঞ্চ ইন্‌ষ্টিটিউস্, একস্‌টেনশন সেণ্টারস্ প্রভৃতির কাজ হাতেকলমে এই প্রশিক্ষণের কাজে নিযুক্ত থাকা। ইহা ছাড়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোপারেটিভস্ সমবায় প্রথায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে একত্রিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত।

৬। বৃহদায়তন শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা এড়ানোর জন্য সরকার কার্ভে কমিটির (Karve Committee) সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সুপারিশ অনুযায়ী ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের কর্মক্ষেত্রের কিছুটা পৃথকীকরণ হইয়াছে, অনেকক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন সীমা নির্ধারিত হইয়াছে, বৃহদায়তন শিল্পের উপর কর (Cess) বসাইয়া ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে উহার দ্বারা সাহায্য করা হইতেছে, বৃহদায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে তৈয়ারী হইতেছে এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পণ্যদ্রব্য প্রদর্শনীর (Exhibitions) মাধ্যমে প্রচার করা হইতেছে। এবংবিধ চেষ্টার ফলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতি আশানুরূপ না হইলেও অনেকটা অগ্রগতি লাভ করিয়াছে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. Explain the characteristics of 'Mixed Economy' as in operation in India at present. Give your views about expanding role of the public sector in the Indian industrial field.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1971]

ভারতে বর্তমানে কার্যরত 'মিশ্র-অর্থনীতি'র বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ভারতীয় শিল্পে সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

2. Discuss the features of present day regulated economy in India. [C. U. B. Com. (Pass) 1966]

ভারতে বর্তমানের নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

3. In India industries are being developed both in public and private sectors. Do you think it is a sound policy ? Give reasons for your answer. [C. U. B. Com. (Hons.) 1964]

ভারতে শিল্পোন্নতি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সংগঠিত হইতেছে। ইহা কি সুস্থ পন্থা ? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

4. The existence of public and private sectors side by side in India often creates confusion. Do you think this policy of the Government is justified ? [C. U. B. Com. (Hons.) 1963]

সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি অবস্থান বিভ্রান্তি সৃষ্টিকর। ভারত সরকারের এই নীতি কি যুক্তিসঙ্গত ?

5. We often hear about public and private sectors in India. What do they really mean and why this division is needed ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1965]

আমরা সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের নাম শুনিয়া থাকি। উহাদের কি অর্থ এবং এই বিভাগের কি প্রয়োজন ?

6. What arguments were advanced when the Goverment of India decided to adopt the policy of having both public and private sectors functioning side by side ? Do you think their expectations have been fulfilled ? [C. U. B. Com. (Hons.) 1966]

সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার সময় ভারত সরকার কি যুক্তি দেখাইয়াছিলেন ? উহাদের আশা কি পূরণ হইয়াছে বলিয়া মনে কর ?

7. What do you understand by public sector and private sector ? Which one would you advocate in India ? Give reasons.

[C. U. B. Com. (Pass) 1968]

সরকারী ক্ষেত্র ও বেসরকারী ক্ষেত্র বলিতে কি বুঝ ? ভারতে কোন্‌টি পছন্দ কর ? কারণ দর্শাও।

8. We always talk about public and private sectors in India. What these expressions actually mean ? State the justification for such division. [C. U. B. Com. (Hous.) 1969]

আমরা সর্বদা সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের কথা বলিয়া থকি। এই কথাগুলির প্রকৃত অর্থ কি ? এই বিভাগের যুক্তিযুক্ততা উল্লেখ কর।

9. Why has it become necessary in India for the Government to own and manage basic industries ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1966]

ভারত সরকারের পক্ষে ভিত্তিমূলক শিল্পগুলির মালিকানা ও পরিচালনা গ্রহণ করার প্রয়োজন হইয়াছে কেন ?

10. Is it desirable in the interest of development of business or otherwise to control the distribution and prices of manufactured goods by Government ? [C. U. B. Com. (Pass) 1967]

কারবারের উন্নতি বা অন্য কিছুর জন্য সরকারের পক্ষে শিল্পজাত দ্রব্যের বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা কি বাঞ্ছনীয় ?

11. How would you measure the size of a business unit ?

কোনও কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন কিভাবে পরিমাপ করিবে ?

12. "How big is too big" is a question which confronts businessmen. How is the problem solved ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1966]

"কত বড় অত্যধিক বড়"—এই প্রশ্ন কারবারীদের সম্মুখীন হইতে হয়। কিভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে ?

13. What are the factors which determine the size of a business establishment ? [C. U. B. Com. (Pass) 1966 (Hons.) 1968 N. B. B. Com. 1968]

কি কি অবস্থার উপর কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে ?

14. In your opinion when a business may be considered as "to big" ? Discuss fully. [C. U. B. Com. (Hons.) 1968]

তোমার মতে কখন কোনও কারবার অত্যধিক বড় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে ? বিশদভাবে আলোচনা কর।

15. Discuss the forces which determine the optimum size of a firm.

কারবারের কাম্য আযতন নির্ধারণের শক্তিসমূহ আলোচনা কর।

16. "Expansion ot a business unit, whether internal or external, is controlled by the optimum size." Discuss the statement.
[C. U. B. Com. (Hons.) 1970]

'আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক যে প্রকারেরই হউক কারবারের বৃদ্ধি উহার কাম্য আয়তন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।' এই উক্তির আলোচনা কর।

17. Discuss the concept of small, medium and large-scale industries and give an account of the size pattern of Indian industries.

ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বৃহদায়তন কারবারের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং এই প্রসঙ্গে ভারতের কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তনিক ধাঁচের একটি বিবরণ দাও।

18. Write an essay on the size pattern of joint stock companies in India. [C. U. B. Com. (Hons.) 1971]

ভারতের যৌথ কোম্পানীর আয়তনিক ধাঁচ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ।

19. Discuss the advantages and disadvantages of large-scale operations in industries.
[C. U. B. Com. (Pass) 1965 (Hons).) 1965]

বৃহদায়তন শিল্পের কার্যকলাপের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

20. Describe the role of small and medium sized industries in the economic development of a country like India.
[C U. B. Com. (Hons.) 1967],

ভারতের মত কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের শিল্পের ভূমিকা বর্ণনা কর।

21. It is often maintained that big industries should, in their own interest, foster the growth of medium and small-scale industries. Do you share this view ? Give reasons for your answer. [C. U. B. Com. (Hons.) 1968]

ইহা বলা হয় যে, বৃহদায়তন শিল্পগুলির নিজেদের স্বার্থে মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতিতে সহায়তা করা উচিত। তুমি কি এই মত পোষণ কর ? তোমার উত্তরের যুক্তি দেখাও।

22. Explain the organisational, financial and marketing draw-backs of small industries. In what ways the Government is dealing with the problems in India ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1970]

ছোট শিল্পের সাংগঠনিক, আর্থিক এবং পণ্য-বিক্রয় সম্পর্কীয় ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ কর। ভারত সরকার কিভাবে এই সমস্যাগুলি দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন ?

23. Mention the factors that determine the size of business units. Discuss the ecomomic justification for small-scale industries.

[C. U. B. Com. (Pass) 1972]

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারণের অন্যতম কারণগুলি উল্লেখ কর। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অর্থনৈতিক সমর্থনযোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

24. Discuss the limiting factors of the size of an industrial unit. [C. U. B. Com. (Hons.) 1973]

যে যে অবস্থার উপর কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন সীমা নির্ধারিত হয় উহা আলোচনা কর।

25. Explain the concept of mixed economy. Analyse the pattern of the public enterprises in India.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1973]

মিশ্র-অর্থনীতির মতবাদ আলোচনা কর। রাষ্ট্রীয় কারবারের বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ কর।

26. Discuss in what ways large-scale enterprises aid the growth of small scale enterprises. [C. U. B. Com. (Hons.) 1973]

বৃহৎ কারবার কিভাবে ক্ষুদ্র কারবারের উন্নতিতে সাহায্য করে আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকারের কারবারী প্রতিষ্ঠান

(Different Types of Business Organisation)

বিভিন্ন প্রকারের কারবারী প্রতিষ্ঠান ও উহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Different types of business organisations and their chief characteristics)

মালিকানাভেদে কারবারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। নিম্নে উহাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য দেওয়া হইল :

১। একক-মালিকানা কারবার (Sole Proprietorship Business): যে কারবারী প্রতিষ্ঠানের মালিক একজনমাত্র ব্যক্তি তাহাকে একক-মালিকানা কারবার বলে। ইহাই প্রাচীনতম কারবারী প্রতিষ্ঠান এবং কারবারীক্ষেত্রে এরূপ কারবারের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এরূপ কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে মালিক নিজেই মূলধনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার পরিচালনা ভার মালিকের উপর ন্যস্ত থাকে। কারবারের লাভ-লোকসানের ঝুঁকি মালিকের (He risks all, gains all)। কারবারের দায়ের জন্য মালিক নিজেই দায়ী থাকেন। মালিক ভিন্ন এরূপ কারবারের কোন পৃথক সত্তা নাই এবং ইহা স্থাপনের কোন জটিল বিধিনিষেধ নাই। কারবারের স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে। মালিকের দায় অসীমিত বলিয়া এবং ব্যক্তিগত সামর্থ্য সীমাবদ্ধ বলিয়া এরূপ কারবারের আয়তন বিশেষ বড় হইতে পারে না।

২। অংশীদারী কারবার (Partnership Business): একাধিক ব্যক্তির মধ্যে চুক্তি দ্বারা উহাদের শ্রম, অর্থ প্রভৃতি বিনিয়োগ করিয়া যে কারবার প্রতিষ্ঠিত হয় উহাকে অংশীদারী কারবার বলে। একজনের পক্ষে যখন কোন কারবার গঠন করা সম্ভব হয় না তখনই এরূপ কারবারের সৃষ্টি হয়। এরূপ কারবারও ব্যবসা-ক্ষেত্রে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সাধারণ অংশীদারী কারবার হইলে ২০ জন এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসা হইলে ১০ জনের বেশী লোক লইয়া এরূপ কারবার গঠন করা চলে না। কারবারও আইনানুমোদিত হওয়া চাই এবং অংশীদারগণের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা থাকা চাই। কারবার পরিচালনা চুক্তি অনুযায়ী হইয়া থাকে। অন্যথায় সকলেই ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন হইয়া থাকে। অন্যথায় সকলেই সমান অংশীদার। আইনত

অংশীদার ভিন্ন ইহার পৃথক সত্তা নাই। কিন্তু এরূপ কারবারে প্রত্যেক অংশীদারের দায় অসীমিত। এজন্য এরূপ কারবারও খুব বড় হইতে দেখা যায় না।

৩। **যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার (Joint Hindu Family Business) :** হিন্দু মিতাক্ষরা আইন অনুযায়ী যে যৌথ পরিবার, উহার কোন কারবার থাকিলে উহা যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার নামে পরিচিত। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, যৌথ পরিবারের সকল সভ্যই ইহার সমান অংশীদার। ইহাদের পক্ষ হইয়া পরিবারের একমাত্র কর্তাই এরূপ কারবার পরিচালনা করিয়া থাকেন। কর্তা প্রয়োজনবোধে কারবারের জন্য ঋণও করিতে পারেন। তবে কর্তা কারবারের অর্থ আত্মসাৎ করিলে তাহার জন্য অংশীদারগণকে তিনি ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকেন। এরূপ কারবারের সংখ্যা স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। কারণ ইহা পারিবারিক কারবার।

৪। **যৌথ মূলধনী কারবার (Joint Stock Company) :** প্রয়োজনীয় মূলধন 'শেয়ারে' বিভক্ত হইয়া উক্ত শেয়ার বহু সংখ্যক লোকের মধ্যে বিক্রীত অর্থ লইয়া যে কারবার গঠিত হয় উহাকে যৌথ মূলধনী কারবার, সংক্ষেপে যৌথ কারবার বা কোম্পানী বলা হয়। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, যাঁহারা শেয়ার ক্রয় করেন তাঁহারাই এরূপ কারবারের মালিক। ইহাদের দায় সাধারণত সীমিত (limited) থাকে। ইহার গোড়াপত্তন কতিপয় ব্যক্তির চেষ্টায় হয় এবং শেয়ার বিক্রয় দ্বারা ইহার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। রেজেষ্ট্রী ছাড়া এরূপ কারবার চালানো যায় না। কারবার রেজেষ্ট্রী করার পর ইহা পৃথক সত্তা লাভ করে। ইহার শেয়ারগ্রহীতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) গঠিত হয় এবং উক্ত পরিচালকমণ্ডলী কারবার পরিচালনা করিয়া থাকেন। সাধারণত এরূপ কারবারের শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য। কোন শেয়ারগ্রহীতার মৃত্যু হইলে এবং উহাদের কেহ দেউলিয়া হইলে কারবার ভঙ্গ হয় না। ইহার শেয়ার হস্তান্তর দ্বারা মালিকানা বদল হইতে পারে এবং অলাভজনক কারবারে পরিণত না হইলে বা অন্য কোন কারণে ভঙ্গ না হইলে ইহা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালু থাকে। ইহার প্রচুর মূলধন সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকে। ফলে এরূপ কারবার বৃহদাকার প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রকৃতপ্রস্তাবে বড় বড় কারবার যৌথ কারবারের ভিত্তিতেই গঠিত হইতে দেখা যায়।

৫। **সমবায় কারবার (Co-operative Business) :** নিজেদের স্বার্থ রক্ষার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্য পরস্পর মিলিত হইয়া সাম্য, মৈত্রী, একতা প্রভৃতির ভিত্তিতে যে কারবার প্রতিষ্ঠা হয় তাহাকে সমবায় কারবার বলে। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ধনীর হস্তে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের শোষণ অনেকক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের উন্নতি বিধান করাই এরূপ কারবারের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহা গঠন করার জন্য অন্ততঃ দশজন সভ্যের প্রয়োজন হয়। সভ্যদের দায় সীমিত বা অসীমিত হইতে পারে। উহার পরিচালনা সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত

পরিচালকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত থাকে। পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য হইতে একজন কর্মসচিবও নির্বাচিত হন। তিনিই প্রধানত পরিচালকমণ্ডলীর মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেন। সভ্যদের স্বার্থরক্ষাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে মুনাফা অর্জনের প্রবৃত্তি কম থাকে। মুনাফার এক অংশ শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সভ্যদের অন্যান্য মঙ্গলবিধানের কাজেও ব্যয়িত হয়। আইনত ইহার পৃথক সত্তা আছে এবং ইহা রেজিষ্ট্রার অব কোপারেটিভ সোসাইটির নিকট রেজেষ্ট্রী করিয়া লইতে হয়। উহার জন্য অবশ্য কোন ফি দিতে হয় না।

৬। **রাষ্ট্রীয় কারবার (State Enterprise):** রাষ্ট্র যখন কোন কারবারের মালিক হন তখন উহাকে রাষ্ট্রীয় কারবার বলা হয়। ইহার উদ্দেশ্য জনস্বার্থ রক্ষা করা এবং জনগণের মঙ্গল বিধান করা। মুনাফা অর্জন এরূপ কারবারের প্রধান উদ্দেশ্য নহে। বে-সরকারী কারবারে অনেকক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হয় না। তখন এরূপ কারবারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বর্তমানকালে এরূপ কারবারের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কোম্পানী আইন অনুযায়ী যৌথ কারবারের ভিত্তিতে, সরকারী বিভাগ হিসাবে কিংবা পৃথক আইন দ্বারা গঠিত হইতে পারে। এরূপ কারবারের পরিচালনা সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি পরিচালকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত থাকে। ইহাদের বার্ষিক আয়-ব্যয়, হিসাবপত্র প্রভৃতি আইনসভায় পেশ করিতে হয়।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. What are the different types ot business organisations that can be formed in India? Mention their chief characteristics.

[C. U. B. Com. (Pass) 1967]

ভারতে কি কি প্রকারের কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে পারে? উহাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

2. Among the different forms of business, which form do you prefer? Give reasons for your anwer.

বিভিন্ন প্রকার কারবারের মধ্যে কোন্‌টি তুমি বেশী পছন্দ কর? তোমার উত্তরের কারণ দর্শাও।

পঞ্চম অধ্যায়

একক-মালিকানা ও যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার

(Sole Proprietorship and Joint Hindu Family Business)

একক-মালিকানা কারবার এবং উহার বৈশিষ্ট্য (Sole Proprietorship Business and its Characteristics)

যে কারবারে মালিক একজনমাত্র ব্যক্তি সেই কারবারকে **একক-মালিকানা কারবার** (Sole Proprietorship Business) বলে। এরূপ প্রতিষ্ঠানের নিম্নলিখিত **বৈশিষ্ট্যগুলি** উল্লেখযোগ্য :

১। **মালিকানা ও গঠন (Ownership and Formation) :** এরূপ কারবার স্থাপনের জন্য আইনের নানাবিধ বিধি কমই মানিয়া চলিতে হয়। এরূপ কারবার স্থাপন করা সহজ ও সরল। কারণ ইহার মালিক একজন। কারবারটি আইনানুমোদিত হইলে মালিকের ইচ্ছানুযায়ী এরূপ কারবার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

২। **মূলধন (Capital) :** এই কারবারের প্রয়োজনীয় মূলধন মালিক নিজেই সরবরাহ করিয়া থাকেন। নিজের সঞ্চয় কারবারের মূলধনের পক্ষে অকুলান হইলে মালিক নিজ দায়িত্বে অপরের নিকট হইতে ঋণ করিয়া মূলধনের অভাব পূরণ করিয়া থাকেন।

৩। **পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ (Management and Control) :** এরূপ কারবার পরিচালনা মালিক নিজেই করিয়া থাকেন। প্রয়োজনবোধে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি এক বা একাধিক কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকেন। এরূপ কারবারের মালিককে সাহায্য করিবার জন্য কোন অংশীদার গ্রহণ করা হয় না। সেরূপ করিলে একক-মালিকানা স্বত্ব ক্ষুণ্ণ হয়।

৪। **ঝুঁকি ও মুনাফা বণ্টন (Risk and Distribution of Profit) :** এরূপ কারবারের লাভ-লোকসানের ঝুঁকি সম্পূর্ণ মালিকের। 'He risks all, gains all.' কোনও কর্মচারী বা অন্য কেহ ইহার লাভ-লোকসানের জন্য দায়ী থাকেন না বা লাভ-লোকসান গ্রহণ করেন না। কর্মচারিগণ বেতন পাইয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে লাভের অংশ কর্মচারীদের মধ্যে 'বোনাস' (Bonus) হিসাবে বণ্টন করা হয়। বাকী লাভের সবটুকু মালিকেরই প্রাপ্য। উহা তিনি নিজের ব্যয়ের জন্য গ্রহণ করিতে পারেন কিংবা কারবারের মূলধন বৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করিতে পারেন।

৫। **দায়** (Liability): এরূপ কারবারের দেনার জন্য মালিক নিজেই সর্বতোভাবে দায়ী। এই দায়িত্বের কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। কারবার ছাড়া মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ঘরবাড়ী, জোতজমা সমস্তই কারবারের দেনা মিটানোর জন্য প্রযুক্ত হইতে পারে।

৬। **সত্তা** (Entity) : মালিক ভিন্ন এরূপ কারবারের পৃথক কোন সত্তা আইনে স্বীকৃত হয় না।

৭। **স্থায়িত্ব** (Continuity): কারবারের স্থায়িত্ব মালিকের কর্মক্ষমতা বা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। মালিক ইচ্ছা করিলে যে-কোন সময়ে কারবার গুটাইয়া ফেলিতে পারেন।

৮। **কারবারের আয়তন** (Scale of Operation) : একক-মালিকানা কারবারের অর্থ সব সময় ক্ষুদ্র কারবার নহে। তবে অপরিমিত দায় এবং এক ব্যক্তির সামর্থ্য সীমাবদ্ধ বলিয়া এরূপ কারবার বৃহদায়তনের খুব কম দেখা যায়।

একক-মালিকানা কারবারের সুবিধা (Advantages of Sole Proprietorship Business)

একক-মালিকানা কারবারে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি দেখিতে পাওয়া যায় :

১। **সহজ গঠন** (Easy Formation): অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার কারবারের তুলনায় এরূপ কারবার সহজে প্রতিষ্ঠা করা চলে এবং ইহা অনেকাংশে জটিলতামুক্ত। মালিকের ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকিলে এরূপ কারবার স্থাপনে কোন বেগ পাইতে হয় না।

২। **সুষ্ঠু পরিচালনা** (Efficient Management): মালিকের নিজের তত্ত্বাবধানে এরূপ কারবার পরিচালিত হয় বলিয়া কাজ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় এবং ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। অসীম (Unlimited) দায়িত্বের জন্য মালিক বিশেষ সতর্কতা, মিতব্যয়িতা ও সাবধানতার সহিত কারবার পরিচালনা করিয়া থাকেন। মালিকের সর্বস্ব কারবারের সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া ইহাতে ঋণ পাওয়া সহজ হয়।

৩। **কর্মচারীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা** (Close Contact with the Employees): এরূপ কারবারে মালিকের সজাগ দৃষ্টি সর্বদিকেই পরিব্যাপ্ত থাকে। এজন্য তিনি কর্মচারীদের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে পারেন, তাঁহাদের সুবিধা-অসুবিধা প্রত্যক্ষভাবে দেখিবার সুযোগ পান এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। ইহার ফলে কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং মালিক্ লাভের পূর্ণ ফল ভোগ করিতে পারেন।

৪। **ক্রেতাদের সহিত মালিকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ** (Direct Contact with Customers): ক্রেতাদের সহিতও মালিকের এরূপ কারবারে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্ভব হয়। ইহার ফলে মালিক ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দমত মাল সরবরাহ করিতে পারেন।

৫। **ক্ষিপ্রতার সহিত কর্মপন্থা নির্ধারণ** (Quick Decision): প্রয়োজনবোধে মালিক এরূপ কারবারে সত্বর পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন, ক্ষিপ্রতার সহিত কাজে অগ্রসর হইতে পারেন এবং কর্মপন্থা নির্ধারণ করিতে পারেন।

৬। **ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন** (Show of Individuality): শিল্পনৈপুণ্য ও কোন জিনিস উৎপাদনে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের ইহা উপযুক্ত ক্ষেত্র। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের ইহাই একমাত্র ক্ষেত্র।

৭। **স্বল্পব্যয়ে হিসাব রক্ষণ** (Preparation of Accounts at a Lower Cost): আইনে এরূপ কারবারে হিসাবপত্র রাখা বা উহা নিরীক্ষণ (Audit) সম্বন্ধে কোন কড়াকড়ি নাই। এজন্য মালিক নিজের ইচ্ছামত স্বল্পব্যয়ে হিসাবপত্র রাখিতে পারেন।

৮। **ঋণপ্রাপ্তির সুবিধা** (Easy Availability of Loan): এরূপ কারবারের দায় অপরিমিত (Unlimited) বলিয়া এবং মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও কারবারের ঋণের জন্য দায়ী থাকে বলিয়া এরূপ কারবারের পক্ষে ঋণ পাওয়ার অসুবিধা হয় না।

৯। **ব্যক্তিগত উদ্যম ও সাফল্যের সমন্বয়** (Matching of efforts and rewards): কারবারের মুনাফা মালিকের নিজের প্রাপ্য বলিয়া উহা বৃদ্ধির জন্য মালিকের চেষ্টার অভাব কখনই দেখা যায় না। এই চেষ্টা বা ব্যক্তিগত উদ্যম কারবারের সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি সূচনা করে।

১০। **বৃহৎ কারবারের গোড়াপত্তন** (Origin of big businesses): একক-মালিকানা কারবার ক্ষুদ্র আকারে আরম্ভ হইলেও উহার সাফল্য দেখা দিলে উহা আর ক্ষুদ্রাকার থাকে না। প্রয়োজন হইলে মালিকানার প্রসারণ ঘটাইয়া উহা বৃহদাকার প্রাপ্ত হয়। অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বৃহৎ কারবার এইভাবেই সৃষ্ট হইয়াছে।

সুতরাং এক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ বা একক-মালিকানা কারবার সবচেয়ে ভাল যদি উক্ত ব্যক্তি কারবারের সব কিছু পরিচালনা করার যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন হন। কিন্তু একক-মালিকানার কতকগুলি বিশেষ অসুবিধার জন্য এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

একক-মালিকানা কারবারের অসুবিধা (Disadvantages of Sole Proprietorship Business)

একক-মালিকানা কারবারে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়:

১। **বৃহৎ কারবারের অনুপযুক্ত** (Unsuitable for Big Business): মালিকের সুষ্ঠু পরিচালনক্ষমতার মধ্যে এরূপ কারবার যতদিন থাকে ততদিন কারবার ভালই চলে। কিন্তু কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কারবার

পরিচালনা উহার আয়তনের উপর নির্ভর করে। কারবার বৃহৎ হইলে একজনের পক্ষে উহা ঠিকমত চালনা করা সম্ভব না হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং এরূপ কারবারের সুযোগ-সুবিধা থাকিলেও উহার সম্প্রসারণ বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না। তাই একক-মালিকানা কারবার বৃহৎ কারবার গঠনের পরিপন্থী।

২। **সীমাবদ্ধ মূলধন (Limited Capital) :** কোনও ব্যক্তি-বিশেষের সঞ্চয় ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সুতরাং এরূপ কারবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা কোন কালেই সম্ভব নয়। ফলে মূলধনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকে।

৩। **অসীমিত দায় (Unlimited Liability) :** এরূপ কারবারে মালিকের অপরিমিত দায়িত্ব এবং সীমাবদ্ধ সঞ্চয় ক্ষমতা বৃহৎ কারবার গঠনের পরিপন্থী।

৪। **বিশেষীকরণের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ (Limited Scope for Specialisation) :** কারবার পরিচালনের যে বহুমুখী প্রতিভা প্রয়োজন উহা এক ব্যক্তির মধ্যে সমাবেশ না হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং বিশেষীকরণের ক্ষেত্র ইহাতে সীমাবদ্ধ।

৫। **অনিশ্চিত স্থায়িত্ব (Uncertain Duration) :** এরূপ কারবারের স্থায়িত্বও অনিশ্চিত। একটিমাত্র ব্যক্তির অক্ষমতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি লাভজনক কারবারের অবসান ঘটাইতে পারে। ইহা অযোগ্য উত্তরাধিকারের হস্তেও সমর্পিত হইতে পারে এবং এইভাবে স্বল্পদিনের মধ্যে কারবারের অবসান ঘটিতে পারে।

৬। **মালিকের খামখেয়ালী (Whims of the Owner) :** এরূপ কারবারের মালিকের খামখেয়ালী ও অযোগ্যতার জন্য কর্মচারীদেরও অশেষ দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয় এবং এরূপ অবস্থায় কারবারের অবস্থা খারাপের দিকে গেলে কর্মচারীদের কিছুই করিবার থাকে না, বরং তাঁহাদের বেকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৭। **প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাব (Lack of Direct Contact) :** বর্তমানকালে অতি অল্প সংখ্যক কারবারের খরিদ্দারগণ স্থানীয় বলা যাইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে কারবারের খরিদ্দারগণ বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত খরিদ্দারগণের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করা মালিকের পক্ষে সম্ভব হয় না এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কখনই সম্ভব নহে।

So "one man control is the best in the world if that one man is big enough to manage everything."[1]

একক-মালিকানার উপযুক্ত কারবারীক্ষেত্র (Business Suitable under Sole Proprietorship)

নিম্নলিখিত কারবারগুলি সাধারণত একক-মালিকানার উপযুক্ত ক্ষেত্র :

১। যে কারবারে স্বল্প মূলধন প্রয়োজন, যেমন পানের দোকান, বিড়ির দোকান ইত্যাদি।

1. William R. Basset, The Organisation of Modern Business, P. 171,

২। যে কারবার বৃহৎ হওয়ার প্রয়োজন নাই।
৩। যে কারবার ব্যক্তিগত রুচি মিটাইতে সক্ষম এবং যাহাতে ব্যক্তিগত কলাকৌশল প্রদর্শনের সুযোগ-সুবিধা বেশী।
৪। ডাক্তার, উকিল, হিসাবরক্ষক, দর্জি, ফটোতোলা প্রভৃতি কারবার।
৫। সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনে যেখানে অনেক কারিগরের সমাবেশ, যেমন, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প ইত্যাদি।

একক-মালিকানা কারবারের ভূমিকা ও গুরুত্ব (Role and Importance of Sole Proprietorship Business)

একক মালিকানা কারবারের কতকগুলি সুবিধার জন্য ইহার বৃহৎ কোম্পানীর দ্বারা অভিভূত হওয়ার ভয় নাই বা থাকে না। এজন্য এরূপ কারবার অধিক সংখ্যায় ভারতে টিকিয়া আছে। ইহার এরূপ সুবিধাগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

যে কারবারে স্বল্প পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন, যে কারবারের বৃহৎ হওয়ার প্রয়োজন নাই, যে কারবার ব্যক্তিগত রুচি মিটাইতে সক্ষম বা যাহাতে ব্যক্তিগত কলাকৌশল দেখাইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র তথায় একক-মালিকানাই উপযুক্ত কারবারী ক্ষেত্র। ইহা ছাড়া, ডাক্তার, উকিল, হিসাবরক্ষক, দর্জি, ফটোতোলা প্রভৃতি কারবারে একক-মালিকানাই অধিক সুবিধাজনক কারবার। সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনে, যেমন মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প প্রভৃতিতে যেখানে অনেক কারিগরের সমাবেশ তথায় প্রধানত একক-মালিকানার ভিত্তিতেই উহা পরিচালিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বৃহৎ কোম্পানীর স্থান নগণ্য। যাঁহারা স্বাধীনচেতা এবং নিজেদের সত্তা বজায় রাখার জন্য কৃতসংকল্প তাঁহারা প্রধানত একক-মালিকানার ভিত্তিতে কারবার স্থাপন করিয়া থাকেন। এরূপ লোকের সংখ্যাও ভারতে কম নয়। তজ্জন্য ভারতে অনেক একক-মালিকানা কারবার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামে বসবাস করিয়া থাকে। উহাদের অনেকেই স্বল্প বিত্তসম্পন্ন। তাহাদের অনেকেই নিজেদের পরিবারের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ কারবার দ্বারা জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। উহাদের কারবারের উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের বাজারেরও অভাব হয় না। সুতরাং উপরি-উক্ত সুযোগ-সুবিধার জন্য ভারতে অনেক একক-মালিকানা কারবার আছে এবং উহারা বৃহৎ কোম্পানীর পাশাপাশিই অবস্থান করিয়া আসিতেছে। এরূপ কারবার শুধু ভারতেরই বৈশিষ্ট্য নহে, ইংলণ্ডের দুই-তৃতীয়াংশ কারবার একক-মালিকী। যুক্তরাষ্ট্রেও এরূপ কারবার অনেক আছে। মোটের উপর উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য অনেক দেশেই বহু সংখ্যায় একক-মালিকানা কারবার দেখিতে পাওয়া যায়।

একক মালিকানা কারবারের অর্থ কারবারের উপর এক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ। তিনি কারবারের সকল মুনাফার অধিকারী এবং উহার সকল প্রকার ঝুঁকি বহন করার জন্যও তিনি দায়ী। কারবারের উপর এক ব্যক্তির নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকিলে এবং তিনি

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দক্ষ লোক হইলে অন্যান্য মালিকানা কারবারের তুলনায় ইহার সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এরূপ কারবার সহজেই গঠন করা যায়। আইনের কঠোরতা ইহাতে নাই। অসীমিত দায়ের জন্য মালিক বিশেষ সতর্কতা, মিতব্যয়িতা ও সাবধানতার সহিত কারবার পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইহার সর্বদিকেই মালিকের সজাগ দৃষ্টি থাকে। ইহার ফলে কর্মচারীদের সহিত তিনি নানাভাবে মিলিত হইতে পারেন। তাহাদের সুবিধা-অসুবিধা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন এবং তদনুযায়ী তাহাদের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। ইহার ফলে নিজের কর্মদক্ষতার সহিত কর্মচারীদের কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পায় এবং মালিক ও শ্রমিক কর্মদক্ষতার ফলস্বরূপ প্রচুর মুনাফা ও পারিশ্রমিকের অধিকারী হন। ক্রেতার সহিত মালিকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়। ইহার ফলে মালিক ক্রেতার ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী মাল সরবরাহ করিতে পারেন। মালিক ইচ্ছামত এরূপ কারবারের দ্রুত পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন। ফলে একক-মালিকানা কারবারক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু এই সুষ্ঠু পরিচালনা কারবার যতদিন ছোট থাকে ততদিনই সম্ভব। কারবার বৃহৎ হইলে একজনের পক্ষে সর্বদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং সেইমত ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। এজন্য এইরূপ কারবারের আয়তন কখনই খুব বড় হইতে পারে না। সুতরাং এক ব্যক্তির পরিচালন দক্ষতার নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া কারবার বড় করিতে গেলে উহার মধ্যে নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং জটিলতা প্রবেশ করে এবং তখন উহা কখনই সুষ্ঠুভাবে এক ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত হইতে পারে না। কারণ, "Difficulties of management and supervision increase with every extension in the scale of business." এরূপ অবস্থায় সংযোজনার (Co-ordination) অভাবই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে, এরূপ কারবার ছোটই থাকিয়া যায়।

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার (Joint Hindu Family Business)

যৌথ পরিবার ভারতীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় হিন্দু সমাজে দুইপ্রকার উত্তরাধিকার আইন প্রচলিত আছে। একটি দায়ভাগ, অপরটি মিতাক্ষরা। দায়ভাগ আইন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যায় এবং মিতাক্ষরা আইন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত। দায়ভাগ আইন মতে, কোন ব্যক্তি তাঁহার পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইলে উহাতে তাঁহার নিরঙ্কুশ অধিকার জন্মে। তিনি সেই সম্পত্তি যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন। সেই সম্পত্তিতে তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির কোন অধিকার জন্মে না। মিতাক্ষরা আইন মতে, সমস্ত সম্পত্তির মালিক সমগ্র পরিবার। সেখানে 'জন্ম মাত্রই' সম্পত্তিতে মালিকানা অধিকার বর্তাইয়া থাকে। মিতাক্ষরা আইনে কোন ব্যক্তি এভাবে কোনও সম্পত্তির মালিক হইলে তাঁহার পুত্র

জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সম্পত্তিতে পিতার সহিত পুত্রের অধিকারও স্বীকৃত হয়। সুতরাং মিতাক্ষরা আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে পিতা, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী, অবিবাহিতা কন্যা প্রভৃতি সকলের অধিকারই আছে। তবে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ পর্যন্ত কেবল পুরুষ সভ্যেরা (Male Members) এই সম্পত্তির শরিক বা সহ-মালিক (Coparcener) হইয়া থাকেন। এরূপ যৌথ পরিবারের কোন কারবার থাকিলে উক্ত কারবার **যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার (Joint Hindu Family Business)** নামে পরিচিত। এরূপ কারবারের নিম্নলিখিত **বৈশিষ্ট্যগুলি** উল্লেখযোগ্য :

১। **গঠন (Formation) :** মিতাক্ষরা আইন অনুযায়ী যে সকল পুরুষ সভ্য (Male Members) কোন যৌথ সম্পত্তির শরিক (Coparcener) হিসাবে এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তাহারাই শুধু এরূপ কারবার গঠন করিতে পারেন।

২। **পরিচালনা (Management) :** এরূপ যৌথ পরিবার বা কারবার পরিচালনার দায়িত্ব যাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে তিনি 'কর্তা' নামে পরিচিত। এই কর্তার হাতে সমগ্র কারবার পরিচালনার ভার অর্পিত হইয়া থাকে এবং কারবারের সর্বপ্রকার লেন-দেনের কার্য তিনিই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

৩। **সদস্যপদ (Membership) :** যাঁহারা এই হিন্দু যৌথ পরিবারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাঁহারা উক্ত কারবারেরও অংশীদার বা সদস্য।

৪। **পরিচালনের আইন (Governing Law) :** কিন্তু এই অংশীদারগণের অধিকার ও স্বত্ব 'অংশীদারী কারবারের' (Partnership) অংশীদারগণের অধিকার ও স্বত্ব হইতে কিছুটা পৃথক। 'অংশীদারী কারবার' ১৯৩২ সালের অংশীদারী কারবারের আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়, কিন্তু হিন্দু যৌথ পারিবারিক কারবার 'হিন্দু আইন' (Hindu Law) অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

৫। **ভঙ্গ (Dissolution) :** যৌথ পারিবারিক কারবার উহার কোন শরিকের বা অংশীদারের মৃত্যুতে বন্ধ হইয়া যায় না। অংশীদারী কারবার সাধারণত সেইরূপ হইয়া থাকে।

৬। **নাবালকের স্থান (Position of Minor) :** অপ্রাপ্তবয়স্ক কেহ অংশীদারী কারবারের অংশীদার হইতে পারেন না। কিন্তু যৌথ পরিবারে কোন পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তিনি উক্ত কারবারের অংশীদার হইয়া পড়েন। অর্থাৎ নাবালকও ইহার অংশীদার হইতে পারেন।

৭। **কর্তার স্থান (Position of Karta or Manager) :** এরূপ কারবারে 'কর্তাই' কারবারের সব কিছু দেখাশুনা করেন। কারবার পরিচালনে তাঁহার কার্যে কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। তবে তাঁহার কার্যকলাপ অপছন্দ হইলে অন্য অংশীদার কারবারের 'বিভাগ' (Partition) দাবী করিতে পারেন।

কর্তা কারবারের অর্থ আত্মসাৎ করিলে তাহার জন্য অন্য অংশীদারগণকে তিনি ক্ষতি-পূরণ করিতে বাধ্য থাকেন। কর্তা প্রয়োজনবোধে কারবারের জন্য অর্থ ধার করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত অর্থের জন্য অংশীদারগণ শুধু তাঁহার ন্যায্য অংশের জন্য দায়ী থাকিবেন। ইহা ছাড়া কারবার বন্ধক, বিক্রয়, ভঙ্গ, তৃতীয় পক্ষের সহিত চুক্তিপত্রে সহি, ঋণ-আদায়, আপস, রফা সব কিছুই তিনি এককভাবে করিতে পারেন। কেবল কারবারের পাওনা মকুব করিতে পারেন না। সেরূপ অবস্থায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন। শরিকগণ এজন্য দায়ী থাকেন না।

৮। **দেউলিয়া** (Insolvency): প্রাপ্তবয়স্ক অংশীদারগণ কারবারের দায়ের জন্য দেউলিয়া হইতে পারেন, কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক অংশীদারগণ দেউলিয়া হইতে পারেন না। উহাদের 'অংশমাত্র' কারবারের ঋণের জন্য দায়ী।

৯। **শরিকানা ও অংশ** (Share and Interest): জন্মাধিকার (By birth) বলে ইহার শরিকানা স্থির হয়। সুতরাং ইহাতে শরিকদের অংশ কোন শরিকের মৃত্যু হইলে বৃদ্ধি পায় এবং জন্ম হইলে হ্রাস পায়।

১০। **নিবন্ধন** (Registration): এরূপ কারবারের কোন নিবন্ধন প্রয়োজন হয় না।

১১। **সভ্যসংখ্যা** (Number of Members): ইহার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য থাকে না। পরিবারভুক্ত লোকের সংখ্যার উপর উহা নির্ভর করে।

১২। **অবসরগ্রহণ** (Retirement): এরূপ কারবার হইতে কেহ অবসর গ্রহণ করিতে চাহিলে তাঁহাকে কারবার সহ অন্যান্য সম্পত্তির বিভাগের ব্যবস্থা করিতে হয়। এরূপ অবসর গ্রহণের পর কোন শরিক কারবারের অতীত লাভ-লোকসানের কোন হিসাব চাহিতে পারেন না।

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Joint Hindu Family Business)

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের **সুবিধা** নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

১। **কারবারী অভিজ্ঞতা** (Business Experience): এরূপ কারবারের পরিচালনভার কর্তার উপর ন্যস্ত হইলেও পরিবারের সকলের ইহাতে অংশ গ্রহণ করার কোন বাধা নাই। এমনকি নাবালকও ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। এইভাবে সকলেই কারবার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন এবং নিজ নিজ দক্ষতারও পরিচয় দিতে পারেন। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরে প্রয়োজনবোধে কেহ ইচ্ছা করিলে পৃথক্‌ভাবে কারবার আরম্ভ করিতে পারেন। সুতরাং পরিবারের সন্তান-সন্ততির কারবারী জ্ঞান লাভ করার ইহা একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র।

২। **স্বার্থপরতাশূন্য কাজ** (Selfless Activities): ইহাতে সকলেই

মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতে পারেন। এই শিক্ষা উহাদিগকে স্বার্থপরতাশূন্যভাবে পরিবারের সকলের জন্য কাজ করিতে সাহায্য করে।

৩। **আয়ের ব্যবস্থা** (A Source of Income): কারবারে যে যাহাই কাজ করুক না কেন শরিকগণ ইহা হইতে একটা আয় পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিতে পারেন। ইহাতে নিজেদের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে ইহা একটা নিরাপত্তা আনিয়া দেয়।

৪। **শ্রমবিভাগ** (Division of Labour): পরিবারস্থ সকলে নিজেদের দক্ষতা ও পছন্দমত কারবারের বিভিন্ন কাজগুলি ভাগ করিয়া লইতে পারেন। ফলে পরিবারের মধ্যে শ্রমবিভাগের নীতি পালিত হইয়া কারবার লাভবান হয়।

৫। **সদস্যপদ** (Membership): জন্মগত অধিকার এই কারবারে স্বীকৃত। এজন্য ইহার অংশীদার বা সদস্যপদ পাইতে কাহারও কোন পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করিতে হয় না। পরিবারের শরিকগণ এমনকি নাবালকও ইহার অংশীদার হইতে পারেন। সুতরাং কারবার প্রতিষ্ঠার ঝামেলা ছাড়াই ইহারা এরূপ কারবারের মালিক হওয়ার সুবিধা-সুযোগ পাইয়া থাকেন।

৬। **দায়** (Liability): ইহার অংশীদারগণের দায় সীমাবদ্ধ। কারবারের ঋণের জন্য উহাদের নিজ নিজ অংশটুকুই মাত্র দায়ী থাকে। সুতরাং অংশীদারী কারবার কিংবা একক-মালিকানা কারবারের মত অসীমিত দায়ের জন্য ইহার অংশীদারদের সদাই সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় না। এরূপ কারবারের অংশীদারগণ ব্যক্তিগতভাবে অভিযুক্ত হইতে বা অভিযোগ করিতে পারেন না।

৭। **স্থায়িত্ব** (Stability): কোন অংশীদারের মৃত্যুতে এরূপ কারবার ভঙ্গ হয় না। ফলে ইহার স্থায়িত্ব পুরুষানুক্রমিক। এজন্য এরূপ কারবার ইচ্ছা করিলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও গ্রহণ করিতে পারে।

সুতরাং উপরি-উক্ত বিভিন্ন উপায়ে যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার ভারতের অর্থনীতিতে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আছে।

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের **অসুবিধা** নিম্নরূপ:

১। **আলস্য বৃদ্ধির স্থান** (Place of Idleness): ইহাতে কাজ না করিয়াও মুনাফার অংশ গ্রহণের অধিকার থাকে। এজন্য কাজের আগ্রহের পরিবর্তে নিশ্চিন্তমনে কাজ না করিয়া মুনাফার অংশ গ্রহণের প্রবৃত্তিই বেশী দেখা যায় এবং এরূপ কারবার এইভাবে আলস্য বৃদ্ধির প্রশ্রয় দেয়।

২। **নির্দিষ্ট অংশের অভাব** (Absence of Definite Share): কোনও অংশীদারের ইহাতে বরাবর একই অংশ (Share) থাকে না। পরিবারে কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে উহা হ্রাস পায়। এজন্য অংশীদারগণকে উহার অংশ ও মুনাফা সম্পর্কে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যেই দিন কাটাইতে হয়।

৩। **স্বার্থের ক্ষতি** (**Loss of Interest**) : কারবার হইতে সম্পর্ক ত্যাগ করিলে কোন অংশীদার কারবারের অতীত লাভ-লোকসানের কোন হিসাব দাবী করিতে পারেন না। ফলে এরূপ পরিস্থিতিতে তাহার স্বার্থহানিই দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। **স্ত্রীলোকদের শরিকানার অভাব** (**Loss of Coparcenery Right to Women**) : পরিবারের স্ত্রীলোকদের শুধু ভোগাধিকার। তাঁহাদের কোন শরিকানা অধিকার নাই। এরূপ ব্যবস্থা উঁহাদের প্রতি অবিচারের সামিল।

৫। **উৎসাহের অভাব** (**Absence of Encouragement**) : ইহাতে কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক বা পুরস্কারের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং অংশীদারদের কাহারও পক্ষে বেশী উৎসাহ সহকারে কাজ করিবার আগ্রহ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

৬। **স্বার্থের সংঘাত** (**Conflict of Interest**) : কারবারের প্রবীণতম ব্যক্তির উপরই কারবার পরিচালনার দায়িত্ব থাকে। অন্য অংশীদারদের ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। ফলে নবীন ও প্রবীণের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত, ব্যক্তিত্বের সংঘাত, মতের অমিল প্রভৃতি অশান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়া এরূপ কারবারের ভাঙ্গনের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়।

৭। **গুরুভার** (**Heavy Responsibility**) : কর্তার দায় ইহাতে অসীমিত। ফলে তাঁহাকে এই গুরুভার লইয়া অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে দিন যাপন করিতে হয়।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. What is a Sole Proprietorship Business ? Discuss briefly its advantages and disadvantages. [C. U. B. Com. (Pass) 1970]

একক-মালিকানা কারবার কাহাকে বলে ? এই কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

2. The Sole Proprietorship form of business still servives in India in a large measure. What are the reasons ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1964]

একক-মালিকানা কারবার ভারতে এখনও অধিক সংখ্যায় টিকিয়া আছে। উহার কারণ কি ?

3. Although the Sole Proprietorship accounts for the largest number of business establishments in any country, there are strict limits beyond which it cannot grow. Explain the significance of this statement.

কোনও দেশে একক-মালিকানা কারবারের সংখ্যা সর্বাধিক দেখা গেলেও ইহা নির্দিষ্ট আয়তন সীমা ছাড়াইতে পারে না। এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

4. What is a Joint Hindu Family Business? Discuss its chief features, merits and demerits.

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার কাহাকে বলে? উহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ আলোচনা কর।

5. Discuss the role of Sole Trading and Joint Hindu Family Business in Indian economic growth. [N. B. B. Com. 1969]

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে একক-মালিকানা কারবার এবং যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের ভূমিকা আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অংশীদারী কারবার

(Partnership Business)

অংশীদারী কারবার এবং উহার প্রধান বৈশিষ্ট্য (Partnership Business and its Essential Features)

যখন একাধিক ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হইয়া শ্রম, অর্থ প্রভৃতি বিনিয়োগ করিয়া মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন কারবার প্রতিষ্ঠা করেন তখন উক্ত কারবারকে **অংশীদারী কারবার** বলা হয়। ভারতীয় অংশীদারী আইনে (Indian Partnership Act) অংশীদারী কারবার নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। "মিলিতভাবে বা সকলের পক্ষে একজন দ্বারা পরিচালিত কোন কারবারের মুনাফার অংশ গ্রহণে সম্মত একাধিক ব্যক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক উহাকে 'অংশীদারী' (Partnership) বলা হয়।" "The Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all." এরূপ চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের প্রত্যেককে 'অংশীদার' (Partner) বলা হয়। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাকে 'কারবারী সংস্থা' (Firm) বলা হয়। অংশীদারী কারবারের **বৈশিষ্ট্য** নিম্নলিখিত উপায়ে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

১। মালিকানা ও মুনাফার অংশগ্রহণ (Ownership and Sharing of Profit) : এখানে মালিক একাধিক ব্যক্তি এবং ইহাদের মধ্যে কারবারের মুনাফার অংশ গ্রহণ অংশীদারী কারবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মুনাফার অংশ গ্রহণ করিলেও উহাদিগকে 'অংশীদার' আখ্যা দেওয়া চলিবে না :

(ক) যৌথ সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে উক্ত সম্পত্তির মুনাফা বণ্টন।

(খ) কোনও কারবারের উত্তমর্ণ কর্তৃক তাহার টাকার সুদ বাবদ মুনাফার অংশ গ্রহণ।

(গ) কোনও কর্মচারীকে বেতনের পরিবর্তে মুনাফার অংশ প্রদান।

(ঘ) মৃত অংশীদারের স্ত্রী বা পুত্র কর্তৃক মুনাফার অংশ গ্রহণ।

(ঙ) সুনাম (Goodwill) বিক্রয়ের জন্য পূর্ববর্তী মালিকের মুনাফার অংশ গ্রহণ।

২। চুক্তি সম্পাদনের ফল (Result of Contract) : অংশীদারীতে একটি কারবার থাকা আবশ্যক এবং উহা পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

হওয়া চাই। ইহা জন্মগত অধিকার বা পদমর্যাদার (Status) ভিত্তিতে গঠিত হয় না। It arises from contract and not from status.

৩। **চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা** (**Capacity to Contract**): উক্ত কারবার আইনানুমোদিত হওয়া চাই এবং অংশীদারগণের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা থাকা চাই অর্থাৎ অংশীদারগণকে সাবালক ও সুস্থ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট হইতে হইবে।

৪। **অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা** (**Capacity to become a Partner**): অংশীদার কোন ব্যক্তিবিশেষ মাত্র হইতে পারেন।

৫। **সত্তা** (**Entity**): আইনতঃ অংশীদারগণ ভিন্ন উক্ত কারবারী সংস্থার কোন পৃথক্ সত্তা নাই।

৬। **অংশীদারদের সংখ্যা** (**Number of Partners**): সাধারণ অংশীদারী কারবারে ২০ জন এবং উহা ব্যাঙ্ক ব্যবসা হইলে ১০ জন পর্যন্ত অংশীদার থাকিতে পারিবেন।

৭। **অন্যকে দায়ী করার ক্ষমতা** (**Capacity to bind Others**): কারবার পরিচালনায় প্রত্যেক অংশীদারই তাঁহার কার্যের জন্য অপর অংশীদারকে দায়ী করিতে পারেন।

৮। **দায়** (**Liability**): অংশীদারগণ পৃথক্‌ভাবে এবং মিলিতভাবে কারবারের ঋণের জন্য দায়ী।

৯। **দান** (**Contribution**): অংশীদারগণ শ্রম, অর্থ প্রভৃতি সমভাবে বা অসমভাবে দান বা বিনিয়োগ করিতে পারেন এবং মুনাফার অংশও সমভাবে বা অসমভাবে গ্রহণ করিতে পারেন।

১০। **পরিচালনা** (**Management**): অংশীদারগণ মিলিতভাবে বা একজন অংশীদার সকলের পক্ষ হইয়া কারবার পরিচালনা করিতে পারেন।

১১। **নিবন্ধন** (**Registration**): কারবারটি নিবন্ধিত কিংবা অনিবন্ধিত হইতে পারে।

১২। **পূর্ণতম বিশ্বাসের চুক্তি** (**Contract of Uberrimae fidei or Utmost Good Faith**): ইহা পূর্ণতম বিশ্বাসের চুক্তি এবং এজন্য কারবার-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন অংশীদার অপর কোন অংশীদারের নিকট কোন কিছু গোপন রাখিবেন না।

কোনও কারবার অংশীদারী কারবার কিনা বা উক্ত কারবারে কোনও ব্যক্তি অংশীদার কিনা উহা স্থির করিতে হইলে উপরি-উক্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

অংশীদারী চুক্তিনামা (Partnership Deed)

অংশীদারী কারবার পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত চুক্তি লিখিত বা মৌখিক উভয় প্রকারই হইতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে ইহা লইয়া যাহাতে কোন বাদানুবাদ বা বিরোধ সৃষ্টি না হয় তজ্জন্য চুক্তিগুলি লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যখন কোন অংশীদারী কারবার স্থাপিত হয় তখন অংশীদারদের মধ্যে কোন প্রকার অসদ্ভাবই দেখা যায় না। "They are invariably found best in spirits with a co operative attitude with best of friendship" কিন্তু কিছুদিন পর প্রায়ই এই অবস্থার পরিবর্তন হইতে থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস ও বন্ধুত্বের অভাব দানা বাঁধিতে থাকে। Prof. Haney-এর মতে "the partnerships of fellow travellers are an example of the difficulty in men living together and having things in common, for they generally fall out by the way and quarrel about any trifle which turns up."[1] আমরাও এই মত অনেকটা সমর্থন করি। এরূপ পরিস্থিতিতে মৌখিক চুক্তি অপেক্ষা লিখিত চুক্তিই যুক্তিযুক্ত। যে দলিলে অংশীদারগণের মধ্যে এই চুক্তি লিখিত হইয়া থাকে উহাকে অংশীদারী চুক্তিনামা (Articles or Deed of Partnership or Partnership Agreement) বলে। উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ব্যাখ্যা থাকা একান্ত প্রয়োজন :

১। **কারবারী সংস্থার নাম (Name of the Firm) :** ইহা কারবারের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। যদিও অংশীদারী কারবারের পৃথক্ সত্তা আইনে স্বীকৃত হয় না, ইহার দ্বারা চুক্তির ভিত্তিপ্রস্তর প্রস্তুত হয় এবং অংশীদারগণ কাহাকে অবলম্বন করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইলেন তাহা জানিতে পারা যায়। আয়কর আইনে অবশ্য আয়কর ধার্যের জন্য অংশীদারী কারবারের পৃথক্ সত্তা স্বীকৃত হয় এবং অংশীদারগণের উপর পৃথক্‌ভাবে আয়কর ধার্য ছাড়া কারবারের উপরও আয়কর ধার্য হয়। সুতরাং এদিক দিয়া বিচার করিলেও নামের গুরুত্ব যথেষ্ট আছে।

২। **কারবারের প্রকৃতি (Nature of the Business) :** কারবারের প্রকৃতি লইয়া যাহাতে কোন বিরোধ উপস্থিত না হয় তজ্জন্য স্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে কারবারের প্রকৃতি উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৩। **কারবারের স্থায়িত্ব (Duration of the Partnership) :** কারবারের স্থায়িত্ব অংশীদারগণের ইচ্ছানুসারে হইতে পারে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হইতে পারে। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোনপ্রকার দ্বিমত যাহাতে উপস্থিত না হয় তজ্জন্য চুক্তিপত্রে উহা লিখিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

৪। **মূলধন যোগান (Supply of Capital) :** অংশীদারগণ সমভাবে

1. Business Organisation and Combination.

কিংবা অসমভাবে কারবারে মূলধন যোগান দিতে পারেন। সুতরাং কিভাবে এই মূলধনের যোগান দেওয়া হইবে এবং কে কি পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করিবেন ইহা চুক্তিপত্রে লেখা থাকিলে এ সম্পর্কে সংশয় দূর হয় এবং বিরোধ উপস্থিত হাওয়ার কোন সুযোগ থাকে না।

৫। **মূলধনের উপর সুদ** (Interest on Capital) : অংশীদারী আইনে মূলধনের উপর কোন সুদ দেওয়ার নিয়ম নাই। সুতরাং এই নিয়ম চালু করিতে হইলে উহা চুক্তিপত্রে লেখা থাকা প্রয়োজন। অংশীদারগণ সমভাবে মূলধনের যোগান দিলে অবশ্য এই সুদের প্রশ্ন না উঠাইলেও চলে। কিন্তু মূলধন অসমভাবে যোগান দিলে যিনি বেশী মূলধন দিবেন মুনাফার অংশ সমভাবে বণ্টিত হইলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। সুতরাং এ সম্পর্কে বিরোধ দূর করার জন্য মূলধনের উপর সুদ দেওয়ার বিষয় চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৬। **মুনাফার অংশ বিভাগ** (Division of Profit) : মুনাফার অংশ সমভাবে বা অসমভাবে অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টিত হইতে পারে। কিভাবে উহা বণ্টিত হইবে উহার উল্লেখ চুক্তিপত্রে থাকিলে উহা লইয়া কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না।

৭। **অংশীদারগণের টাকা গ্রহণ** (Drawings of Partners) : কোন্ অংশীদার কি পরিমাণ টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কারবার হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন তাহার মীমাংসাও চুক্তিপত্রে থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় কেহ টাকা বেশী গ্রহণ করিল, কেহ কম টাকা গ্রহণ করিল ইত্যাদি লইয়া বিরোধ লাগা অসম্ভব নয়। যে টাকা কোনও অংশীদার কারবার হইতে গ্রহণ করিবেন উহার উপর কোন সুদ আদায় করা হইবে কিনা তাহার মীমাংসাও চুক্তিপত্রে থাকা প্রয়োজন।

৮। **অংশীদারগণের বেতন** (Partners' Salaries) : অংশীদারগণের মধ্যে কেহ কারবারের কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, কেহ হয়ত কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ নাও করিতে পারেন। যিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিবেন তিনি কোন বেতন পাইবেন কিনা তাহার মীমাংসা চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া উচিত। কারণ অংশীদারা আইনে কারবারের কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার জন্য কোন বেতন দেওয়ার নিয়ম নাই। সুতরাং ইহার মীমাংসা থাকিলে বেতন লইয়া কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না।

৯। **পরিচালনা** (Management) : কারবার পরিচালনায় সকল অংশীদার সমানভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ নাও করিতে পারেন। এজন্য পরিচালনায় কোন্ অংশীদার কিভাবে অংশ গ্রহণ করিবেন, তাঁহার কি কাজ হইবে ইত্যাদির ব্যাখ্যাও চুক্তিপত্রে থাকা প্রয়োজন। নতুবা ইহা লইয়া বিরোধ চরমে উঠিতে পারে এবং কারবার ভঙ্গের আশংকা থাকে।

১০। **হিসাবপত্র রাখা এবং হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা** (Method of

Keeping Accounts and Audit): হিসাবপত্র রাখা এবং হিসাব নিরীক্ষার যদি উপযুক্ত পন্থা এবং ব্যবস্থা গৃহীত হয় তবে কারবারের আর্থিক অবস্থা, লাভ-লোকসান প্রভৃতি সম্বন্ধে অংশীদারদের সংশয় দূর হইয়া থাকে। এজন্য এ সম্বন্ধে কি পন্থা ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহার বিশদ বিবরণ চুক্তিপত্রে থাকা বাঞ্ছনীয়।

১১। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা এবং উহাতে অংশীদারদের অধিকার (Banks where money should remain deposited and the right of the Partners thereto): বিভিন্ন অংশীদারের ইচ্ছামত যত্রতত্র টাকা জমা রাখা এবং খরচ করার অধিকার থাকিলে টাকা-পয়সা তছনছ হওয়ার আশংকা থাকে। উক্ত আশংকা যাহাতে না উপস্থিত হয় এবং উহার ফলে কোন বিরোধ দেখা না দেয় তজ্জন্য চুক্তিপত্রে এ বিষয়ে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। কোন্ ব্যাঙ্কে টাকা জমা থাকিবে, উহা জমা দেওয়ার এবং উঠাইবার অধিকার কাহার থাকিবে ইহা চুক্তিপত্রে অবশ্যই উল্লেখ থাকিবে।

১২। অংশীদারদের মৃত্যু, অবসর গ্রহণ, বহিষ্কার এবং নূতন অংশীদারের প্রবেশ প্রভৃতি সংক্রান্ত ফলাফল (Effects of death, retirement, expulsion and admission of Partners): এ সকল কারণে কারবারে কি পরিস্থিতি উদ্ভব হইবে এবং কিভাবে হিসাবপত্রের মীমাংসা হইবে ইত্যাদি চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকিলে ইহা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হওয়ার আশংকা দূর হয়।

১৩। সুনামের মূল্য নির্ধারণ (Valuation of Goodwill): মৃত্যু, অবসরগ্রহণ, নূতন অংশীদারগ্রহণ, কারবার বিক্রয়, কিংবা উহা যৌথ কারবারে রূপান্তর-করণের সময় সুনামের মূল্য নির্ধারণের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুনামের মূল্য নির্ধারণ বিভিন্ন উপায়ে হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব হইতে উহার উপায় চুক্তিপত্রে উল্লেখ না থাকিলে ইহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হওয়া কোন বিচিত্র ব্যাপার নহে। এজন্য উহা নির্ধারণের উপায় চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকিলে এ সম্পর্কে বিরোধ উপস্থিত হওয়ার অবকাশ থাকে না।

১৪। কোন অংশীদারের মৃত্যু বা অবসরগ্রহণকালে মূলধন নিরূপণ (Determination of capital in the event of death or retirement of partner): কোনও অংশীদারের মৃত্যু হইলে কিংবা কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ করিলে কারবারের হিসাব-নিকাশ করিয়া উক্ত অংশীদারের প্রাপ্য মূলধন স্থির করিতে হয়। কিন্তু চুক্তিপত্রে ইহার কোন উপায় নির্দেশ থাকিলে কোনও অংশীদারের মৃত্যু হইলে কিংবা কোনও অংশীদার অবসর গ্রহণ করিলে হিসাব-নিকাশ প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয় না। বৎসরের মাঝখানে এরূপ হিসাব-নিকাশ প্রস্তুত করিতে হইলে কারবারের অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার আশংকা থাকে। এই চুক্তির দ্বারা উক্ত অসুবিধা দূর হইতে পারে।

১৫। নূতন মূলধন এবং নূতন অংশীদারের প্রবেশ (Provision for new capital and admission of new Partners): কারবারের প্রয়োজনে অতিরিক্ত মূলধন প্রয়োজন হইলে কিংবা কোনও নূতন অংশীদার গ্রহণ করিতে হইলে কারবারের অগ্রগতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য উহার মীমাংসা চুক্তিপত্রে থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

১৬। কারবার ভঙ্গ হইলে হিসাবপত্রের মীমাংসা (Settlement of Accounts in case of Dissolution): কারবার ভঙ্গ হইলে হিসাবপত্রের মীমাংসা কিভাবে হইবে, চুক্তিপত্রে উহার নির্দেশ থাকিলে এরূপ পরিস্থিতিতে গুরুতর বিবাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

১৭। বিবাদ মীমাংসার উপায় (Provision for arbitration in case of dispute): চুক্তিপত্রে বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কোনও বিরোধ উপস্থিত হইলে উহার মীমাংসা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে উহার ইংগিতও চুক্তিপত্রে থাকা প্রয়োজন। এরূপ উপায় উল্লিখিত হইলে বিবাদ মীমাংসাও সত্বর সম্ভব হইতে পারে এবং কারবারের অগ্রগতি অব্যাহত থাকিতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে অংশীদারী চুক্তিনামার গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে।

উক্তরূপ চুক্তিপত্র প্রত্যেক অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে। প্রয়োজন হইলে সর্বসম্মতিক্রমে চুক্তিপত্রের রদ-বদল হইতে পারিবে।

অংশীদারের অধিকার ও কর্তব্য (Rights and obligations of a Partner)

যে ক্ষেত্রে লিখিত 'অংশীদারী চুক্তিনামা' থাকে সেক্ষেত্রে উহাতে অংশীদারগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে শর্তাদি লিপিবদ্ধ থাকে। যে ক্ষেত্রে লিখিত 'চুক্তিনামা' নাই, সেক্ষেত্রে 'ভারতীয় অংশীদারী আইনে'র নির্দেশমত অধিকার ও কর্তব্য স্থির হইবে। নিম্নে উহা উল্লেখ করা হইল।

অধিকার (Rights):

১। প্রত্যেক অংশীদারের কারবার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। অবশ্য এজন্য তিনি কোন বেতন পাইবার অধিকারী নন।

২। প্রত্যেক অংশীদারই সমানভাবে মুনাফার অংশ ভোগের অধিকারী।

৩। প্রত্যেক অংশীদার মূলধন ছাড়া কারবারে কোন টাকা অগ্রিম বা ঋণ হিসাবে প্রদান করিলে তিনি উক্ত টাকার উপর বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ পাওয়ার অধিকারী। মূলধনের উপর কোন সুদ পাওয়ার তিনি অধিকারী নন।

৪। কারবারের কোন সুবিধা বা কল্যাণপ্রচেষ্টায় কোন অংশীদার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি উক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

৫। প্রত্যেক অংশীদার কারবারের হিসাবপত্র দেখা বা পরীক্ষা করার বা উহার নকল লইবার অধিকারী।

৬। প্রয়োজনবোধে কোন অংশীদার কারবার বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য আবেদন করার অধিকারী।

৭। কারবার বন্ধ হইলে কারবারের দায় বা ঋণ মিটাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে অংশীদার উহার সমান অংশ পাওয়ার অধিকারী।

৮। কারবারের প্রকৃতি পরিবর্তন হইলেও কিংবা মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও কারবার চালু থাকিলে অংশীদারগণের পূর্ব অধিকার বজায় থাকে।

৯। নূতন কোন অংশীদার গ্রহণ বা পুরাতন অংশীদারের রদ-বদল বা বহিষ্কার সকল অংশীদারের সম্মতি ভিন্ন সম্ভব নয়।

১০। কারবারের প্রকৃতি বা ধরন পাল্টাইতে হইলেও প্রত্যেক অংশীদারের সম্মতি প্রয়োজন। দৈনন্দিন কারবার পরিচালনায় অবশ্য অধিকাংশ অংশীদারের মতই গ্রহণযোগ্য।

কর্তব্য বা দায় (Obligations) ঃ

১। অংশীদারগণকে কারবারে সমানভাবে মূলধন যোগান দিতে হইবে। লাভ-লোকসানের অংশও সমানভাবে বহন করিতে হইবে।

২। কারবারের ঋণের জন্য অংশীদারকে মিলিতভাবে এবং পৃথক্‌ভাবে দায়ী থাকিতে হইবে। এই দায়িত্বের পরিমাণ অপরিমিত (Unlimited) এবং তজ্জন্য কারবারের অর্থ বা সম্পত্তি অকুলান হইলে কোন অংশীদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তির শেষ কপর্দক ব্যয়িত হইতে পারে।

৩। প্রত্যেক অংশীদারকে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসভাজন হইতে হইবে। কারণ পারস্পরিক বিশ্বাসই (Uberrimae Fidei) অংশীদারী কারবারের মূল ভিত্তি।

৪। সুষ্ঠুভাবে কারবার পরিচালনার জন্য প্রত্যেক অংশীদারই দায়ী এবং প্রত্যেকের কর্তব্য হইবে সততা ও নিষ্ঠার সহিত উক্ত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা।

৫। কোন অংশীদার কারবারের সুযোগ লইয়া বা নাম ভাঙ্গাইয়া ব্যক্তিগতভাবে কোন মুনাফা লাভের চেষ্টা করিবেন না এবং কারবারের জিনিস ক্রয়-বিক্রয় বা লেন-দেনে কোনপ্রকার দস্তুরী (Commission) লইবেন না। এরূপ কোন মুনাফা বা দস্তুরী কারবারেরই প্রাপ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৬। কোন অংশীদার অন্যান্য সকল অংশীদারের সম্মতি ভিন্ন কোন নূতন অংশীদার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৭। নূতন অংশীদার কোনও পুরাতন চুক্তির মুনাফার অংশ গ্রহণ না করিলে পুরাতন কোন চুক্তির জন্য দায়ী থাকিবেন না।

৮। অবসর গ্রহণের পরও কোন অংশীদার অংশীদারী কারবার থাকাকালীন ঋণের ও দেনার জন্য দায়ী থাকিবেন।

অংশীদারী এবং যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Partnership and Joint Hindu Family Business)

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে :

অংশীদারী কারবার	যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার
১। পারস্পরিক চুক্তি হইতে উদ্ভূত।	১। জন্মগত অধিকার হইতে উদ্ভূত।
২। কোনও অংশীদারের মৃত্যুতে কারবার ভঙ্গ হয়।	২। কোনও অংশীদারের মৃত্যুতে কারবার ভঙ্গ হয় না।
৩। নাবালক অংশীদার হইতে পারে না।	৩। নাবালক অংশীদার হইতে পারে।
৪। অংশীদার কারবার হইতে সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় অতীত লাভ-লোকসানের হিসাবপত্র দাবী করিতে পারেন।	৪। অংশীদার কারবার হইতে সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় অতীত লাভ-লোকসানের হিসাবপত্র দাবী করিতে পারেন না।
৫। ভারতীয় অংশীদারী আইন মতে পরিচালিত।	৫। ভারতীয় হিন্দু আইন মতে পরিচালিত।
৬। কারবারের নামে অভিযুক্ত হইতে বা অভিযোগ করিতে পারা যায়।	৬। কারবারের নামে অভিযুক্ত হইতে বা অভিযোগ করিতে পারা যায় না।
৭। অংশীদারগণ পৃথক্ বা যৌথভাবে কারবারের সমস্ত ঋণের জন্য দায়ী।	৭। অংশীদারগণের অংশমাত্রই কারবারের ঋণের জন্য দায়ী।
৮। প্রত্যেক অংশীদার কারবারের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হন এবং তাঁহার কাজের জন্য কারবার দায়ী থাকে।	৮। কর্তা ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহার কাজের জন্য কারবারকে দায়ী করিতে পারেন না। একমাত্র কর্তাই ঋণ-গ্রহণ করিতে বা সম্পত্তি বন্ধক দিতে পারেন।
৯। তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১০০.০০ টাকার অতিরিক্ত দাবীর জন্য কারবার নিবন্ধন প্রয়োজন।	৯। এক্ষেত্রে কারবার নিবন্ধন প্রয়োজন নাই।

অংশীদারী কারবার	যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার
১০। অংশীদারগণের অংশ চুক্তি-মত নির্দিষ্ট।	১০। অংশীদারগণের কোন নির্দিষ্ট অংশ নাই। কোন পুত্রসন্তানের জন্ম ও মৃত্যু উহার তারতম্য ঘটায়।
১১। অংশীদারের মৃত্যু হইলে উহার অংশ তাঁহার উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য হয়।	১১। কোনও অংশীদারের মৃত্যু হইলে তাঁহার অংশ অন্যান্য জীবিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে।
১২। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অংশীদার হইতে পারেন।	১২। মিতাক্ষরা আইনে শুধু পুরুষই অংশীদার হন। স্ত্রীলোকদের শুধু ভোগাধিকার।

অংশীদারী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Partnership Business)

অংশীদারী কারবারে নিম্নলিখিত **সুবিধাগুলি** দেখিতে পাওয়া যায়ঃ

১। **অধিক মূলধন (Larger Amount of Capital) :** একক-মালিকানা কারবারে একজনের পক্ষে যে পরিমাণ মূলধন যোগান দেওয়া সম্ভব নয়, অংশীদারী কারবারে তাহার সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং অধিকতর মূলধন লইয়া অংশীদারী কারবার চালনা সম্ভব।

২। **বৃহত্তর কারবারের ঝুঁকি (Larger Business Risk) :** এরূপ বেশী মূলধন পাওয়ার সুযোগ থাকায় একক-মালিকানা অপেক্ষাকৃত বড় কারবারের ঝুঁকি লইতে পারে, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারে এবং বড় কারবারের মত ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারে।

৩। **বিশেষজ্ঞ গ্রহণ (Employment of Specialists) :** এরূপ কারবার অংশীদার হিসাবে বিশেষজ্ঞ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায় এবং বিশেষজ্ঞের সহায়তায় বিচক্ষণতার সহিত কারবার পরিচালনা করিতে পারে।

৪। **অপরিমিত দায়ের জন্য সতর্কতা (Cautious due to Unlimited Liability) :** এরূপ কারবারে দায় অপরিমিত (Unlimited) বলিয়া অংশীদারগণ সততই বিশেষ সতর্কতার সহিত কারবার পরিচালনা করিয়া থাকেন।

৫। **ঋণ সংগ্রহ সহজ (Easy Availability of Loans) :** এরূপ কারবারে দায় অপরিমিত বলিয়া প্রয়োজনবোধে ঋণ সংগ্রহ সহজেই হইতে পারে। কারণ, এক্ষেত্রে উত্তমর্ণ বুঝিতে পারেন যে, প্রয়োজন হইলে তাঁহার টাকার জন্য অংশীদারগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও তিনি ক্রোক করাইতে পারেন। সুতরাং উত্তমর্ণগণ এরূপ কারবারে ঋণ দেওয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করেন।

৬। **অংশীদারদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য** (**Individuality of Partners** : এখানে প্রত্যেক অংশীদারের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় এবং সংখ্যাধিক্যের চাপ সহ্য করিতে হয় না। সেরূপ ক্ষেত্রে তিনি কারবার হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পারেন।

৭। **আইনের কড়াকড়ি কম** (**Lesser Legal Formalities**) **:** এরূপ কারবার গঠনে ও পরিচালনায় আইনের চাপও খুব কম। সুতরাং এরূপ কারবার সহজে গঠিত হইতে পারে এবং অংশীদারগণ স্বাধীনভাবে তাঁহাদের ইচ্ছামত কারবার পরিচালনা করিতে পারেন।

৮। **নমনীয়তা** (**Flexibility**) **:** অংশীদারগণের সম্মতিক্রমে এরূপ কারবার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সঙ্কোচন, বিলোপ সমস্তই অনায়াসসাধ্য। ফলে ইহাতে নমনীয়তা দেখিতে পাওয়া যায়।

অংশীদারী কারবারে নিম্নলিখিত **অসুবিধাগুলি** দেখিতে পাওয়া যায় :

১। **অন্যের নিবুদ্ধিতা ও অপকর্মের জন্য দায়িত্ব** (**Liability for foolishness and misdeeds of others**) **:** কারবার পরিচালনায় একজন অংশীদারের কাজের দায়িত্ব অন্যান্য অংশীদারকেও বহন করিতে হয় এবং উক্ত কাজের জন্য কারবারটিও দায়ী থাকে। ফলে, একজনের নিবুদ্ধিতার ও অপকর্মের জন্য অন্য অংশীদারগণকেও দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয়।

২। **স্থায়িত্বে অনিশ্চয়তা** (**Uncertainty of Duration**) **:** মতানৈক্য, অসাধুতা, মৃত্যু, মস্তিষ্ক-বিকৃতি, দেউলিয়া প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী কারবারের অবসান ঘটাইতে পারে। সুতরাং এরূপ কারবারের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত।

৩। **পূর্ণতম বিশ্বাসের অভাব** (**Want of Utmost Good Faith**) **:** এরূপ কারবারের জন্য যে সততা, বন্ধুত্ব, বিশ্বাস প্রভৃতির দরকার তাহা বর্তমান যুগে বিরল। এজন্য অংশীদারী কারবারের পতন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এরূপ কারবারের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত।

৪। **বিনিয়োগে সীমিত দায়ের অভাব** (**Absence of Limited Liability in Investment**) **:** যে সমস্ত ব্যক্তি কারবারে মূলধন নিয়োগ করিয়া নিশ্চিত হইতে চান এবং কোনপ্রকার ঝুঁকি বহন করিতে ইচ্ছুক নহেন তাঁহাদের পক্ষে এরূপ কারবারে মূলধন বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগে এরূপ লোকের সংখ্যাই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য একজন অংশীদার পাওয়া গেলেও দ্বিতীয় অংশীদার পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার হইয়া পড়ে। সুতরাং এরূপ কারবার গঠন যে সহজসাধ্য বলা হয় তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য কিনা বিবেচনার বিষয়।

৫। **ঝুঁকির মাত্রা বেশী** (**Greater Risk**) **:** অপরিমিত দায়ের জন্য এরূপ কারবার গঠনের ঝুঁকির মাত্রা বেশী এবং উহা কম লোকেই বহন করিতে চান।

৬। **অপরিমিত দায়ের জন্য বৃহৎ কারবার অনুপযুক্ত** (**Unsuitable for Big Business due to Unlimited Liability**) **:** বৃহৎ কারবার গঠন ও পরিচালনায় প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ অংশীদারগণ প্রয়োজনীয় মূলধন কমই যোগান দিতে পারেন। ফলে অংশীদারী হিসাবে বৃহৎ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

৭। **জনসাধারণের আস্থা কম** (**Less Faith of the Public**) **:** আইনের কড়াকড়ি না থাকায় এবং এরূপ কারবারের প্রকৃত অবস্থা জনসাধারণের গোচরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকায় এরূপ কারবারের উপর জনসাধারণের আস্থা কম দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রকারের অংশীদারী কারবার (**Different Types of Partnership Business**) **:**

অংশীদারী কারবারকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয় :

১। **সাধারণ অংশীদারী কারবার** (**Ordinary Partnership Business**)

২। **পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবার** (**Limited Partnership Business**)

সাধারণ অংশীদারী (**Ordinary Partnership**)

যে কারবারের প্রত্যেক অংশীদারই মিলিত ও পৃথক্‌ভাবে কারবারের সমস্ত ঋণ ও দেনার জন্য দায়ী থাকেন সেরূপ কারবার 'সাধারণ অংশীদারী' নামে পরিচিত এরূপ কারবারে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারের অংশীদার থাকিতে পারে :

(ক) **উদ্যোগী অংশীদার** (**Active Partner**) **:** যে অংশীদার কারবার পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাকে 'উদ্যোগী অংশীদার' বলা হয়।

(খ) **অনুদ্যোগী বা নিষ্ক্রিয় অংশীদার** (**Sleeping or Dormant Partner**) **:** যে অংশীদার কারবারে মূলধন নিয়োগ করিয়া তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন এবং কারবার পরিচালনায় কোনপ্রকার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন না তাঁহাকে 'অনুদ্যোগী বা নিষ্ক্রিয় অংশীদার' বলে।

(গ) **কর্মী বা গা-ভাগী অংশীদার** (**Working Partner**) **:** যে অংশীদার কারবারে কোনপ্রকার মূলধন নিয়োগ না করিয়া কেবল পরিশ্রম ও কর্মকুশলতার জন্য অংশীদার হইয়াছেন তাঁহাকে 'কর্মী অংশীদার' বলে।

(ঘ) **অর্ধ-অংশীদার** (**Quasi-Partner**) **:** যে অংশীদার কারবার হইতে বিদায় লইয়াছেন কিন্তু তাঁহার মূলধন ঋণ হিসাবে কারবারে রাখিয়া লাভের তারতম্য অনুসারে উক্ত মূলধনের উপর সুদ পাইয়া থাকেন তাঁহাকে 'অর্ধ-অংশীদার' বলে।

(ঙ) **নামমাত্র অংশীদার** (Nominal Partner) : যে ব্যক্তি কারবারে কোন মূলধন নিয়োগ করেন না কিংবা কারবার পরিচালনায় কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন না অথচ নিজের নাম কারবারের সহিত সংযুক্ত রাখিয়া পাওনাদারদের নিকট অংশীদারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁহাকে 'নামমাত্র অংশীদার' বলে।

(চ) **রূপক অংশীদার** (Partner by Holding Out) : যে ব্যক্তি প্রকৃত অংশীদার না হইয়াও নিজেকে কোনও কারবারের অংশীদাররূপে প্রচার করেন কিংবা অপরকে তাঁহার নাম অংশীদাররূপে প্রচার করিতে দেন এবং পাওনাদারগণ উক্ত প্রচারের উপর বিশ্বাস করিয়া কারবারে যখন ঋণ দেন তখন তিনি আর তাঁহার প্রচারিত রূপ অস্বীকার করিতে পারেন না এবং এইভাবে তিনি যখন নিজেকে অংশীদার হিসাবে দায়ী করিয়া থাকেন তখন তাঁহাকে 'রূপক অংশীদার' আখ্যা দেওয়া হয়।

পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী (Limited Partnership)

যে অংশীদারী কারবারে 'পরিমিত দায়যুক্ত' (Limited) এবং 'অপরিমিত দায়যুক্ত' (Unlimited) এই দুইপ্রকার অংশীদার থাকে তাহাকে 'পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী' বলে। এরূপ কারবারে 'পরিমিত দায়যুক্ত' অংশীদারের (Limited Partner) দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। তাঁহার অধিকার ও দায়িত্ব নিম্নরূপ :

১। তিনি যে পরিমাণ মূলধন কারবারে নিয়োগ করিবেন কারবারের ঋণের জন্য তিনি সেই পরিমাণ অর্থের জন্য দায়ী থাকিবেন। ইহা অপেক্ষা অধিক ঝুঁকি তাঁহাকে বহন করিতে হয় না।

২। কারবারে তাঁহার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার নাই।

৩। চুক্তির মিয়াদ শেষ হইবার পূর্বে কারবার হইতে তাঁহার মূলধন তুলিয়া লইবার অধিকার নাই।

৪। তিনি কারবার পরিচালনায় তাঁহার সৎপরামর্শ দিতে পারেন এবং প্রয়োজন বোধে উহার হিসাবপত্র দেখিতে পারেন।

'অপরিমিত দায়যুক্ত' অংশীদার কারবারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন এবং কারবারের সমস্ত ঋণের জন্য দায়ী থাকিবেন। 'অপরিমিত দায়যুক্ত' অংশীদারকে 'সাধারণ অংশীদার' (General Partner)-ও বলা হয়। 'পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী' আমাদের ভারতীয় অংশীদারী আইনে উল্লেখ নাই। ঐরূপ কারবার ইংলণ্ডের বৈশিষ্ট্য।

পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Limited Partnership Business)

পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর **সুবিধা** নিম্নরূপ :

১। যিনি মূলধন নিয়োগ করিতে প্রস্তুত, অথচ কারবারের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বহন করিতে অনিচ্ছুক তাঁহার পক্ষে এরূপ কারবার বিশেষ সুবিধাজনক, কারণ তিনি

যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করিয়া থাকেন তাঁহাকে তদপেক্ষা বেশী দায়-দায়িত্ব বহন করিতে হয় না।

২। যাঁহার কারবার পরিচালনার দক্ষতা আছে, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে মূলধন নিয়োগ করার সামর্থ্য নাই তাঁহার পক্ষেও এরূপ কারবার বিশেষ সুবিধাজনক। তিনি সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারের নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া দক্ষতার সহিত কারবার চালাইতে পারেন।

৩। অসীমিত দায়যুক্ত অংশীদারের সংখ্যা ইহাতে বেশী থাকে না। ফলে পরিচালনার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। কারণ এরূপ অংশীদারের সংখ্যা বেশী হইলে আলাপ-আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী হইয়া পড়ে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অযথা বিলম্ব হয়।

৪। এরূপ কারবারের স্থায়িত্ব সাধারণত দীর্ঘকালই হইয়া থাকে এবং উহা দক্ষতার সহিতই পরিচালিত হইতে থাকে। কারণ সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারগণ তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী কারবার হইতে মূলধন তুলিয়া লইতে পারেন না। ইহা ছাড়া উঁহাদের মৃত্যু, মস্তিষ্ক বিকৃতি বা দেউলিয়া হওয়ার ফলে কারবার বন্ধ করিতে হয় না। উঁহারা কারবার পরিচালনায় হস্তক্ষেপও করিতে পারেন না। অসীমিত অংশীদারগণ তাঁহাদের অসীমিত দায় সম্পর্কে সচেতন থাকিয়া মিতব্যয়িতা ও সতর্কতার সহিত কারবার পরিচালনার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

কিন্তু এরূপ কারবারের **অসুবিধাগুলি** নিম্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায়:

১। ইহাতে অসীমিত দায়যুক্ত অংশীদারগণের দায়িত্বভার অত্যধিক হইয়া পড়ে। ফলে কারবারের অগ্রগতি ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয়। এজন্য এখানেও বৃহৎ কারবার গঠন সম্ভব হয় না।

২। সীমিত ও অসীমিত দায়যুক্ত অংশীদারগণের দায়িত্ব বিভিন্ন বলিয়া ইহা ন্যায়পরায়ণতার অভাব দোষে দুষ্ট।

৩। কারবারের গতি খারাপের দিকে অগ্রসর হইলেও সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারগণের দক্ষতাসত্ত্বেও অধিকারের অভাবে উহা কাজে লাগান সম্ভব হয় না। ইহার ফলে উঁহাদের মূলধন অসীমিত দায়যুক্ত অংশীদারগণের হাতে যদৃচ্ছ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং উঁহারা এজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হন।

৪। এরূপ কারবারের নিবন্ধন (Registration) বাধ্যতামূলক। এজন্য ইহা সর্বক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করিতে পারে না।

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার বনাম পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবার (Joint Hindu Family Business vs. Limited Partnership Business)

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের সহিত পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারে কতকগুলি বিষয়ের সাদৃশ্য আছে। উক্ত সাদৃশ্যগুলি নিম্নরূপ:

১। উভয় প্রকার কারবারে দুই শ্রেণীর অংশীদার আছে—সীমিত দায়যুক্ত ও অসীমিত দায়যুক্ত। যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারে কর্তার দায় অসীমিত। এজন্য তাঁহার দায়-দায়িত্ব পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের অসীমিত দায়যুক্ত অংশীদারগণের অনুরূপ। যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারে কর্তা ভিন্ন অন্যান্য অংশীদারগণের দায় পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারের অনুরূপ।

২। পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারগণের কারবারে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের কোন অধিকার নাই। অনুরূপে যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারেও উহার সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারগণের কারবারে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের কোন অধিকার নাই।

৩। পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারে অসীমিত দায়যুক্ত সাধারণ অংশীদারগণ কারবার পরিচালনা করিয়া থাকেন। যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারেও অসীমিত দায়যুক্ত অংশীদার অর্থাৎ কর্তা কারবার পরিচালনা করিয়া থাকেন।

৪। পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবার হইতে সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারগণের মূলধন তুলিয়া লওয়ার কোন অধিকার নাই। যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারেও সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারগণের কারবার হইতে তাঁহাদের মূলধন তুলিয়া লওয়ার অধিকার নাই।

৫। পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের কোন সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারের মৃত্যু হইলে কারবার তুলিয়া দিতে হয় না। যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারেরও কোন সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারের মৃত্যু হইলে কারবার তুলিয়া দিতে হয় না।

উপরি-উক্ত সাদৃশ্য থাকায় যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারকে পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের নিকট পরিবর্ত (Close substitute) বলা হয়। কিন্তু উভয়বিধ কারবারের মধ্যে উপরি-উক্ত সাদৃশ্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও আছে। উহাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলি নিম্নরূপ :

১। পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবার চুক্তি (Contract) হইতে উদ্ভূত, কিন্তু যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের উৎপত্তি জন্মগত অধিকার হইতে।

২। কোনও নাবালক পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের অংশীদার হইতে পারেন না, কিন্তু যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারে নাবালক অংশীদার থাকার কোন বাধা নাই। এরূপ পারিবারে কোন পুরুষসন্তানের জন্ম হইলে তিনি যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের অংশীদার হইয়া পড়েন।

৩। পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই অংশীদার থাকিতে

পারেন, কিন্তু যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারে স্ত্রীলোকের অংশীদারত্ব নাই। উহাদের শুধু ভোগাধিকার।

৪। পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের নিবন্ধন (Registration) প্রয়োজন, কিন্তু যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের নিবন্ধন প্রয়োজন হয় না। কারণ ইহা পারিবারিক কারবার।

৫। পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবার পরিচালিত হয় পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী আইন অনুযায়ী, কিন্তু যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার পরিচালিত হয় হিন্দু মিতাক্ষরা আইন অনুযায়ী।

৬। পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদারের অংশ চুক্তিদ্বারা নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের অংশ চুক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না। ইহাতে কোনও পুত্রসন্তানের জন্ম হইলে অন্যান্য অংশীদারের অংশ কমিয়া যায় এবং কোনও সদস্যের মৃত্যু হইলে উহা বৃদ্ধি পায়।

৭। যে-কোনও সাবালক ও সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবার গঠিত হইতে পারে। ইহা কোনও পরিবার বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কোন নিয়ম নাই। কিন্তু যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার এরূপভাবে গঠন করা চলে না। উহা পরিবার বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৮। যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার ভারতের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবার ভারতে নাই।

সুতরাং উপরি-উক্ত বৈসাদৃশ্যের জন্য যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারকে পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের নিকট পরিবর্ত (Close substitute) বলা চলে না। এই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার করিলে একে অন্য হইতে পৃথক বলা চলে।

অংশীদারী কারবারে নাবালকের স্থান (Position of a minor in a Partnership Firm)

অংশীদারী কারবারের মূল ভিত্তি চুক্তি। নাবালকের আইনত চুক্তি করিবার অধিকার নাই। এজন্য নাবালক অংশীদার হইতে পারেন না।

অংশীদার হইবার অধিকার না থাকিলেও, সকল অংশীদারের সম্মতি লইয়া নাবালককে অংশীদারী কারবারের উপকারার্থে উক্ত কারবারে গ্রহণ করা যাইতে পারে (may be admitted to the benefits of Partnership)। এরূপ নাবালক অংশীদারী কারবারের মুনাফা ভোগের অধিকারীও হইতে পারেন। কিন্তু কারবারের দায়ের (liability) জন্য এরূপ নাবালক যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পত্তি বিনিয়োগ করিবেন ততটা পর্যন্তই দায়ী থাকিবেন। সুতরাং অন্যান্য অংশীদারের মত তাঁহার দায় অসীমিত নহে। নাবালক থাকা পর্যন্ত এই নিয়মেই তিনি অংশীদার থাকিবেন। কিন্তু সাবালক হইবার ছয় মাসের মধ্যে তিনি কারবারের অংশীদার হিসাবে থাকিবেন

কিনা তাহা প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা জানাইতে হয়। অংশীদার হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে যেদিন হইতে নাবালক অবস্থায় তিনি কারবারে যোগদান করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে কারবারের সকল দায়ের জন্য তিনি দায়ী বলিয়া গণ্য হইবেন। অংশীদার হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে তাঁহার দায় প্রকাশ্য ঘোষণার দিন পর্যন্ত পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী স্থির হইবে। সাবালক হইবার পর ঘোষণার দ্বারা যদি তিনি অংশীদার হইবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা জ্ঞাপন না করেন তবে তিনি সম্পূর্ণ অংশীদার হিসাবে গণ্য হইবেন।

নিবন্ধন (Registration)

অংশীদারী কারবারে নিবন্ধনের আইনত প্রয়োজন নাই। তবে কারবার নিবন্ধন না হইলে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে।

১। এরূপ কারবার তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১০০.০০ টাকার উর্ধ্বে কোন দাবীর জন্য আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারে না।

২। এরূপ কারবারে কোনও অংশীদারও তৃতীয় ব্যক্তির কিংবা তাঁহার সহ-অংশীদারের বিরুদ্ধে আদালতে কোন অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারেন না। তবে এই অসুবিধা কারবার তুলিয়া দিবার জন্য, বিচ্ছিন্ন বা ভঙ্গ কারবারের সম্পত্তির টাকা আদায়ের জন্য আদালতে নালিশ করা সম্বন্ধে প্রযুক্ত নহে।

কারবার নিবন্ধন করিতে হইলে 'রেজিস্ট্রার অব ফার্মের' (Registrar of Firms) নিকট প্রয়োজনীয় ফি ও নিম্নলিখিত বিবরণসহ আবেদন করিতে হইবে :

১। কারবারের নাম।

২। উহার প্রকৃতি ও স্থান।

৩। অন্য কোথাও উক্ত কারবার চালাইলে তাহার নাম।

৪। অংশীদারগণের কারবারে যোগ দেওয়ার তারিখ।

৫। অংশীদারগণের নাম ও ঠিকানা।

৬। কারবারটি কতদিনের।

কারবার নিবন্ধনের সুবিধা—

১। ইহাতে উপরি-উক্তি অসুবিধাগুলি দূর হইবে।

২। কারবারে ইহার ফলে অসাধুতা ও প্রতারণার ভয় কম থাকিবে।

৩। অংশীদারগণ তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা ঠিকমতভাবে ও সহজে বুঝিয়া লইতে পারিবে।

৪। কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিবেন।

অংশীদারী কারবার ভঙ্গ (Dissolution of Partnership Business)

কিরূপ অবস্থায় 'অংশীদারী কারবার' ভঙ্গ হইতে পারে বা তুলিয়া দেওয়া যাইতে

পরে উহার সুস্পষ্ট নির্দেশ 'অংশীদারী চুক্তিনামায়' সাধারণত উল্লেখ থাকে। যদি উহাতে কোন কিছু উল্লেখ না থাকে তবে আইনের নির্দেশমত নিম্নলিখিত যে-কোন উপায়ে উহা ভঙ্গ হইতে পারে :

(১) সমস্ত অংশীদারগণের সম্মতি অনুসারে।

(২) চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে।

(৩) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত হইলে উক্ত সময় অন্তে।

(৪) 'ইচ্ছানুযায়ী অংশীদারী' (Partnership at will) হইলে কোনও অংশীদার কারবার তুলিয়া দেওয়ার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে।

(৫) কোনও অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে কিংবা কোন অংশীদার দেউলিয়া (Insolvent) হইলে।

(৬) সমস্ত অংশীদার কিংবা একজন ব্যতীত সমস্ত অংশীদার দেউলিয়া হইলে।

(৭) কারবার কোনও কারণে বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইলে।

(৮) কোনও অংশীদারের মূলধন ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজন হইলে।

(৯) অন্যান্য অংশীদারগণের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ করিতে চাহিলে।

(১০) নিম্নলিখিত অবস্থায় কোনও অংশীদারের আবেদনক্রমে আদালত বাধ্যতা-মূলকভাবে (Compulsorily) কারবার তুলিয়া দিতে পারে :

(ক) কোনও অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিলে।

(খ) কোনও অংশীদার স্থায়িভাবে তাঁহার কর্তব্যপালনে অসমর্থ হইলে।

(গ) কোনও অংশীদার চুক্তিভঙ্গ করিলে।

(ঘ) কোনও অংশীদার কারবার পরিচালনায় অসদাচরণ করিলে।

(ঙ) অন্যান্য অংশীদারের অনিচ্ছাক্রমে কোন অংশীদার তাঁহার অংশ অন্যকে হস্তান্তর করিলে কিংবা দেনার দায়ে তাঁহার অংশ ক্রোক হইলে।

(চ) যখন কারবার চালাইলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

(ছ) অন্য কোন কারণে আদালত কারবার তুলিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিলে।

কারবার তুলিয়া দেওয়ার পর সম্পত্তির বিভাগ (Division of Property after Dissolution)

অংশীদারী কারবার তুলিয়া দিবার পর অংশীদারদের মধ্যে চুক্তি থাকিলেই উক্ত চুক্তি অনুযায়ী সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ নিষ্পত্তি হইবে। চুক্তির অভাবে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে উহা নিষ্পত্তি হইবে :

(১) তৃতীয় ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ।

(২) অংশীদারদের অগ্রিম পরিশোধ।

(৩) মূলধন পরিশোধ।

(৪) অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত অংশীদারগণের মধ্যে লাভ-লোকসানের হার অনুযায়ী বিভাগ।

আদর্শ স্থানীয় অংশীদারীর প্রয়োজনীয় অবস্থা (Requisites of an ideal Partnership)

একাধিক ব্যক্তির মিলিত প্রচেষ্টার ফলে অংশীদারী কারবারের পত্তন হয়। কিন্তু উক্ত প্রচেষ্টা সর্বদিক দিয়া সমান অংশে বিভক্ত নাও হইতে পারে। বরং না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, কেহ হয়ত অধিক অর্থ বিনিয়োগে সমর্থ, কেহ হয়ত অধিক অভিজ্ঞ, আবার, কেহ হয়ত অধিক শ্রমশীল ও কর্মকুশল। অংশীদারী কারবারে সাধারণত এবংবিধ বিপরীত প্রতিভার ও সামর্থ্যের মিলন ঘটিয়া থাকে। এইভাবেই বিভিন্ন অংশীদারের মিলিত প্রচেষ্টার সমাবেশ কারবারে স্থানলাভ করে এবং কারবার যথাযথভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। যদি প্রত্যেক অংশীদারের দান কারবারে সমান হইত তবে উহা অবশ্যই একটি উত্তম অংশীদারী কারবার বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে প্রচেষ্টা বা দান সমান না হইয়া উহা অসমানই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আদর্শস্থানীয় অংশীদারী কারবারের বৈশিষ্ট্য সমান প্রচেষ্টা বা দান নহে। উহার বৈশিষ্ট্য হইল নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কারবারের কাজে আত্মনিয়োগ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের বিলোপ সাধন। কারণ ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রবল হইলে পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য হইয়া পড়ে এবং কারবারের অবনতি বা ভাঙ্গন আরম্ভ হয়। সুতরাং আদর্শস্থানীয় অংশীদারী কারবার গঠন করিতে হইলে ব্যক্তিগত স্বার্থ যাহাতে প্রবল না হয় সেদিকে সতর্ক থাকিতে হইবে। এজন্য নিম্নলিখিত অবস্থা বা প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি অত্যাবশ্যক।

১। সামর্থ্য অনুযায়ী কারবারের উন্নতি ও সাফল্যের জন্য প্রত্যেক অংশীদারের যত্নশীলতা।

২। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থাভাজনতা।

৩। একে অন্যের প্রতি বিশ্বাসী ও ন্যায়পরায়ণ ভাব।

৪। যোগ্যতানুযায়ী কার্যের ভারার্পণ এবং উক্ত কার্যের ভার সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ ও সমাধান।

৫। পরস্পরের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমতা বিধান।

৬। নিজেদের মধ্যে অনৈক্যের ও ঈর্ষার অবসান।

৭। কারবারের স্বার্থে নিজের স্বার্থ বিসর্জন।

৮। কারবারের মুনাফা অর্জনে সমান আগ্রহ।

৯। কারবারের ক্ষতিসাধনে সর্বদা পরাঙ্মুখ।

১০। সর্বব্যাপারে একত্ববোধ।

মোটের উপর কথা : 'সবে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'।

এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে হইলে অংশীদার মনোনয়নের জন্য বিশেষ বিবেচনারও প্রয়োজন। প্রথম কথা, পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘদিনের পরিচয় থাকা উচিত। তাহা হইলে একে অন্যের মনোভাব জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ পাইবেন। এইভাবে একমতাবলম্বী লোক না হইলে আদর্শস্থানীয় অংশীদারী কারবার গঠন করা সম্ভব নহে। ইহার পর নিজেদের দায়, দায়িত্ব, অধিকার, কর্তব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া উচিত। উক্ত আলোচনার পর উহা লিপিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোট কথা: It is like choosing one's consort. If you be in a hurry in selecting your consort, you will repent at last. So there is need for second thought and sure knowledge in either case.

অংশীদারী চুক্তির অবসান এবং অংশীদারী কারবারের অবসানের মধ্যে পার্থক্য (Difference between the dissolution of Partnership Agreement and the dissolution of the Partnership Firm)

অংশীদারী চুক্তির অবসান এবং অংশীদারী কারবারের অবসানের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য উল্লেখযোগ্য :

অংশীদারী চুক্তির অবসান হইলে অংশীদারীত্বের বিলোপ ঘটে। অর্থাৎ অংশীদারগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল উহা আর রহিল না। ইহা সাধারণত কোন অংশীদারের মৃত্যু, দেউলিয়া অবস্থা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, বহিষ্কার, অবসর গ্রহণ ইত্যাদির ফলে ঘটিতে পারে। ইহার পর কারবার চালাইতে হইলে উহা পুনর্গঠনের প্রয়োজন হইবে। এইভাবে পুনর্গঠন দ্বারা কারবার টিকাইয়া রাখা যায়।

কিন্তু অংশীদারী কারবারের অবসান হইলে কারবারের অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে। তখন উহার আর পুনর্গঠন চলে না। কারবারের সম্পত্তি তখন দেনা পরিশোধের পর অংশীদারগণের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হইয়া যায়। উপরি-উক্ত কারণে বা অন্য কারণে কারবার ভঙ্গ বা উহার অবসান ঘটিতে পারে।

একক-মালিকানা কারবার বনাম অংশীদারী কারবার (Sole Proprietorship Business vs. Partnership Business)

অন্যান্য কারবারের তুলনায় সাংগঠনিক দিক দিয়া বিচার করিলে একক-মালিকানা কারবারের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। একক-মালিকানা কারবার সহজে প্রতিষ্ঠা করা চলে এবং ইহা অনেকাংশে জটিলতামুক্ত। মালিকের ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকিলে এরূপ কারবার স্থাপনে কোনপ্রকার বেগ পাইতে হয় না। মালিকের নিজের তত্ত্বাবধানে এরূপ কারবার পরিচালিত হইয়া থাকে। মালিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দক্ষ লোক হইলে উক্ত কাজ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতে পারে। অসীম দায়ের জন্য মালিক বিশেষ সতর্কতা, মিতব্যয়িতা ও সাবধানতার সহিত কারবার পরিচালনা

করিতে পারেন। এরূপ কারবারে মালিকের সজাগ দৃষ্টি সর্বদিকেই পরিব্যাপ্ত থাকে। এজন্য তিনি কর্মচারীদের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে পারেন, তাঁহাদের সুবিধা-অসুবিধা প্রত্যক্ষভাবে দেখিবার সুযোগ পান, তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। ইহার ফলে কারবারের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং কারবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ক্রেতাদের সহিতও মালিকের প্রত্যক্ষ যোগা-যোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়। ইহার ফলে মালিক এরূপ কারবারের সত্বর পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন এবং ক্ষিপ্রতার সহিত কাজে অগ্রসর হইতে পারেন। কারণ He is the monarch of all he surveys. এজন্য তাঁহার কাহারও পরামর্শ গ্রহণ না করিলেও চলে। সুতরাং উপরি-উক্ত পরিস্থিতি সংগঠনের দিক দিয়া বিশেষ সুবিধাজনক একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু কারবারের সংগঠন ও পরিচালনা মালিকের সুষ্ঠু পরিচালন ক্ষমতার মধ্যে যতদিন থাকে ততদিন কারবার ভালই চলে। কারবারের আয়তন বৃহৎ হইতে থাকিলে বা উহার আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে ইহার মালিককে ক্রমশঃই নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। তখন দক্ষ পরিচালন ক্ষমতার অভাব দেখা দেয়। ব্যক্তিবিশেষের সঞ্চয় ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলিয়া অধিক মূলধনের প্রয়োজন হইলে উহা সংগ্রহ করা কষ্টকর ব্যাপার হইয়া পড়ে। অসীমিত দায় বলিয়া এক ব্যক্তির পক্ষে এতটা দায়ের ঝুঁকি লওয়াও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারবার পরিচালনায় বহুমুখী প্রতিভার প্রয়োজন হইলেও এরূপ কারবার অসুবিধার সম্মুখীন হয়। মালিক খামখেয়ালী হইলে কর্মচারীদেরও অশেষ দুর্ভোগ দেখা দেয়। এই সকল অসুবিধার অনেকটা অংশীদারী কারবার দূর করিতে পারে। একজনের পক্ষে যে ঝুঁকি লওয়া কষ্টকর, একাধিক ব্যক্তির সমাবেশে উহা অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়ে। অংশীদারী কারবারে অধিকতর মূলধন সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকে এবং কারবারও বড় হওয়ার সুযোগ পায়। বিভিন্ন প্রতিভার লোকও ইহাতে পাওয়ার সুবিধা আছে। কোনপ্রকার মতানৈক্য বা অসাধুতা দেখা না দিলে একাধিক ব্যক্তির মিলিত প্রচেষ্টায় কারবারের সংগঠনশক্তি দৃঢ়তর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংগঠনের দিক দিয়া উভয় প্রকার কারবারের তুলনামূলক বিচার এইভাবে করা চলে এবং কোন্ কারবার এরূপ অবস্থায় গ্রহণযোগ্য বলা কঠিন। তবে একথা বলা চলে যে, one man control (sole proprietorship) is the best in the world if that one man (single proprietor is big enough to manage everything. কারবার ছোট হইলে সাংগঠনিক জটিলতা কম থাকে। সেখানে একক-মালিকানা অবশ্যই শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু কারবার বৃহৎ হইলে সাংগঠনিক জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং তখন অংশীদারী কারবার বা অন্য প্রকার কারবার অধিক শ্রেয়।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. Define Partnership and explain the important characteristics of partnership. [N. B. B. Com. 1969]

অংশীদারী কারবারের সংজ্ঞা দাও। উহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

2. What are the usual terms and conditions included in a Partnership Agreement ? State their importance in regulating the relationship between partners. [C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

কি কি শর্তাদি অংশীদারী চুক্তিনামায় অন্তর্ভুক্ত হয় ? অংশীদারদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে উহাদের গুরুত্ব বল।

3. Discuss at least eight important clauses to be included in a Partnership Deed. [C. U. B. Com. (Hons.) 1968]

অংশীদারী দলিলে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী অন্ততঃ আট দফার অলোচনা কর।

4. Discuss the main clauses of a Partnership Deed. [C. U. B. Com. Pass) 1969]

অংশীদারী দলিলের প্রধান দফাগুলি আলোচনা কর।

5. What are the rights, obligations and liabilities of partners in partnership business ? [C. U. B. Com. (Hons.) 1967]

অংশীদারী কারবারে অংশীদারদের অধিকার, দায় ও দায়িত্ব কি কি ?

6. How would you distinguish a Partnership business from a Joint Hindu Family business ?

অংশীদারী কারবার এবং যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য নির্ণয় করিবে ?

7. Discuss the advantages and limitations of Partnership business.

অংশীদারী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

8. What is a Limited Partnership ? Discuss its merits and demerties.

পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবার কাহাকে বলে ? উহার গুণাগুণ আলোচনা কর।

9. Is Limited Partnership Business a close substitute for Joint Hindu Family Business ? Discuss.

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার কি পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের নিকট পরিবর্ত ? আলোচনা কর

10. Discuss the requisites of an ideal partnership business.

আদর্শস্থানীয় অংশীদারী কারবারের প্রয়োজনীয় অবস্থা আলোচনা কর।

11. Do you think that sole proprietorship business is better than a partnership from the organisational point of view ? Give reasons for your answers. [C. U. B. Com. (Pass) 1966]

সাংগঠনিক দিক হইতে একক-মালিকানা কারবার কি অংশীদারী কারবার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

12. How can a firm of partnership be dissolved ?
[C. U. B. Com. (Hons.) 1967]

অংশীদারী কারবার কিভাবে ভঙ্গ হয় ?

সপ্তম অধ্যায়

যৌথ মূলধনী কারবার

(Joint Stock Company)

যৌথ মূলধনী কারবার ও উহার প্রধান বৈশিষ্ট্য (Joint Stock Company and its main features)

প্রয়োজনীয় মূলধন (Capital) শেয়ারে (Share) বিভক্ত হইয়া উক্ত শেয়ার বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে বিক্রীত অর্থ লইয়া যে কারবার গঠিত হয়, তাহাকে 'যৌথ মূলধনী কারবার' (Joint Stock Company) অথবা সংক্ষেপে যৌথ কারবার বা কোম্পানী বলে। এরূপ কারবারে বহুসংখ্যক লোকের অবদান থাকে বলিয়া ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। শেয়ারের মূল্য পর্যন্ত শেয়ার-গ্রহীতাদের দায় (Liability) সীমাবদ্ধ থাকিলে এরূপ কোম্পানীকে সীমিত কোম্পানী (Limited Company) বলে। সীমিত কোম্পানীকে সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী (Public Limited Company) এবং ঘরোয়া সীমিত কোম্পানী (Private Limited Company) এই প্রধান দুই অংশে বিভক্ত করা হয়। যৌথ কোম্পানীর মধ্যে এই জাতীয় কোম্পানীর সংখ্যাই বেশী। অধিক মূলধন লইয়া বৃহদাকারের কারবার গঠনের উদ্দেশ্যেই যৌথ কারবারের গোড়াপত্তন হয়। এরূপ কারবারের **বৈশিষ্ট্য** নিম্নলিখিত-ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১। গঠন (Formation) : ইহার গঠন বা গোড়াপত্তন প্রথমত কতিপয় ব্যক্তির চেষ্টায় হয় এবং পরে ইহার শেয়ার বিক্রয় দ্বারা সভ্য বা শেয়ার-গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ঘরোয়া কোম্পানী হইলে ২ জন এবং সার্বজনিক কোম্পানী হইলে ৭ জন ব্যক্তি লইয়া কোম্পানী গঠন করা চলে। ঘরোয়া কোম্পানীর সভ্যসংখ্যা উহার কর্মচারী শেয়ার-গ্রহীতা ছাড়া ৫০ জনের বেশী হইতে পারে না এবং সার্বজনিক কোম্পানীর সভ্যসংখ্যা উহার শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। কোম্পানী আইন (Companies Act) বা বিশেষ আইন অনুসারে এরূপ কারবার বিধিবদ্ধ হয়।

২। নিবন্ধন (Registration) : নিবন্ধন ভিন্ন এরূপ কারবার আইনসম্মত স্বীকৃতিলাভ করে না। এই নিবন্ধন কতিপয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সংঘটিত হয়। কোম্পানী আইন অনুযায়ী এই নিবন্ধনকার্য সমাধা করিতে হয়। এজন্য কোম্পানী নিবন্ধকের (Registrar) নিকট ফি সহ কোম্পানীর নাম, (উদ্দেশ্য), মূলধন প্রভৃতি সম্বলিত 'স্মারকলিপি' (Memorandum of Association), কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ কার্য-পরিচালনার নিয়মাবলী-সংবলিত 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী' (Articles of

Association) প্রভৃতি নানাবিধ দলিল পেশ করিতে হয়। উহা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত 'অভিজ্ঞানপত্রের' (Certificate of Incorporation) বলে কোম্পানী আইনসম্মত স্বীকৃতিলাভ করে।

৩। **মূলধন (Capital) :** ইহার মূলধন নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ারে বিভক্ত এবং যে-কোন ব্যক্তি উহার এক বা একাধিক শেয়ার ক্রয় করিয়া উক্ত কারবারের মালিক হইতে পারেন।

৪। **আইনসম্মত সত্তা (Legal Entity) :** নিবন্ধনের পর এরূপ কোম্পানী উহার মালিকদের ব্যক্তিগত সত্তা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আইনসম্মত সত্তা লাভ করে। তখন কোম্পানীর নামে উহার যাবতীয় দ্রব্যাদির ক্রয়, বিক্রয়, ঋণ গ্রহণ, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি চলিতে পারে।

৫। **পরিচালনা (Management) :** শেয়ার-গ্রহীতাগণ কোম্পানীর মালিক হইলেও ইহারা প্রত্যেকে কোম্পানী পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। ইহার পরিচালনব্যবস্থা গণতন্ত্রমূলক (Democratic)। শেয়ার-গ্রহীতাগণের নির্বাচিত কতিপয় প্রতিনিধি লইয়া পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) গঠিত হয়। উক্ত পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সুতরাং ইহার মালিকানা ও পরিচালনার মধ্যে পৃথকীকরণ (Separation of Ownership and Management) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে পরিচালকমণ্ডলী সম্মিলিতভাবে কোম্পানীর উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি ও নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন এবং উহাদের দ্বারা নির্বাচিত ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা জেনারেল ম্যানেজারের মাধ্যমে উহা কার্যকরী করা হয়।

৬। **শেয়ার হস্তান্তর এবং মালিকানার পরিবর্তন (Share Transfer and Change of Ownership) :** ইহার শেয়ার হস্তান্তর হইতে পারে। এই শেয়ার হস্তান্তর দ্বারা মালিকানার রদবদলও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। **দায় (Liability) :** ইহাতে প্রত্যেক শেয়ার-গ্রহীতার দায়িত্ব উহার শেয়ারের মূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ কোম্পানী ভগ্ন হইলে উহার দায়-দায়িত্বের জন্য শেয়ার-গ্রহীতা যে মূল্যের শেয়ারের মালিক সেই মূল্য কোম্পানীতে দেওয়া থাকিলে আর কোন অতিরিক্ত অর্থ তাহাকে দিতে হয় না। অংশীদারী বা একক-মালিকানা কারবারের মত ব্যক্তিগত সম্পত্তি এরূপ দায়-দায়িত্বের জন্য আটক পড়ে না।

৮। **চিরস্থায়িত্ব (Perpetual Succession) :** পৃথক সত্তা থাকায় ইহা অবিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হইলে চিরস্থায়িত্ব লাভ করে। ইহার কোন মালিক বদল হইলে বা মারা গেলে ইহার সত্তার কোন পরিবর্তন হয় না বা ইহাকে কারবার গুটাইতে হয় না। (The owner may go or the owner may come, but the company remains forever)।

৯। সাধারণ সিলমোহর (Common Seal): ইহার পৃথক সত্তা কৃত্রিম ব্যক্তির মত কাজ করিয়া থাকে। কারবারের বিভিন্ন কাজকর্মে ও দলিলপত্রাদিতে এই সাধারণ সিলমোহর কৃত্রিম ব্যক্তির পরিচয় লাভ করে।

১০। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত (Majority Decision): ইহাতে সকল বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের মতানুযায়ী কার্যনির্বাহ হইয়া থাকে। এইভাবে ইহাতে বাধ্যতামূলক ঐক্যের নীতি (Compulsory Unity of Action) অনুসৃত হয়।

১১। বার্ষিক হিসাব-নিকাশ (Annual Accounts): মালিকানা ও পরিচালনা পৃথক হইলেও ইহার বার্ষিক হিসাব-নিকাশ একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মালিকদের গোচরীভূত হয় এবং উক্ত হিসাব-নিকাশ সনদপ্রাপ্ত হিসাব-পরীক্ষক (Chartered Accountant) দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লইতে হয়।

১২। লভ্যাংশ বণ্টন (Distribution of Profit): ইহার লভ্যাংশ ডিরেক্টরদের সুপারিশ অনুযায়ী শেয়ার-গ্রহীতাদের বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে শেয়ার-গ্রহীতাদের মধ্যে বণ্টিত হয়।

বিভিন্ন প্রকার যৌথ কোম্পানী (Different kinds of Joint Stock Company)

যৌথ কারবার বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। সেজন্য বিভিন্ন প্রকার কারবার বা কোম্পানীর গঠনপ্রণালী বিভিন্ন। নিম্নে উহাদের বিশদ আলোচনা করা হইল:

১। সনদপ্রাপ্ত কোম্পানী (Chartered Company): ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্পানী আইন পাস হওয়ার পূর্বে রাজকীয় সনদ বা ঘোষণার দ্বারা 'যৌথ কারবার' গঠিত হইত। 'যৌথ কারবার' গঠনে যাঁহারা উদ্যোগী তাঁহারা রাজার নিকট এরূপ কোম্পানী গঠনের অনুমতি প্রার্থনা করিতেন। রাজকীয় সনদ বা ঘোষণার দ্বারা এরূপ অনুমতি দেওয়া হইত। এইভাবে যে কোম্পানী গঠিত হইত তাহাকে 'সনদপ্রাপ্ত কোম্পানী' (Chartered Company) বলা হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এইভাবে গঠিত হইয়াছিল। এইভাবে গঠিত ভারতের কোন নিজস্ব কোম্পানী নাই।

২। সংবিধিবদ্ধ কোম্পানী (Statutory Company): যে কোম্পানী বিশেষ আইন দ্বারা সংগঠিত তাহাকে 'সংবিধিবদ্ধ কোম্পানী' বলা হয়। রেলপথ নির্মাণ, গ্যাস সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতির জন্য যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইলে ঐ সমস্ত কোম্পানীকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করার উদ্দেশ্যে আইনসভা এরূপ কোম্পানী গঠনের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। উক্ত ক্ষমতাবলে এরূপ কোম্পানী কারবার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য জনসাধারণের জমি-জায়গা অধিকার বা ব্যবহার করিবার অধিকার পায়। ইলেকট্রিক

সাপ্লাই করপোরেশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন প্রভৃতি এই জাতীয় কোম্পানী।

৩। **রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানী (Registered Company):** কোম্পানী আইনের নিয়ম অনুযায়ী যে যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে 'রেজিষ্ট্রিকৃত কোম্পানী' বলে। ইহা আবার নিম্নলিখিত প্রকারের হইতে পারে:

(ক) অপরিমিত দায়বিশিষ্ট কোম্পানী (Unlimited Company): এই প্রকার কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার শেয়ার-গ্রহীতাগণ কোম্পানীর সমস্ত ঋণের জন্য 'অংশীদারী কারবারের মত' পৃথকভাবে ও যুক্তভাবে সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন। তবে অংশীদারী কারবারের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, কোম্পানীর শেয়ার-গ্রহীতাদের সংখ্যা ২০ জনের বেশী হইতে পারিবে এবং ইহার 'শেয়ার' হস্তান্তরযোগ্য হইতে পারিবে। এ ধরনের কোম্পানীর সংখ্যা খুব কম।

(খ) প্রত্যাভূত দায়বিশিষ্ট কোম্পানী (Company Limited by Guarantee): এরূপ কোম্পানীর কোনও শেয়ার-গ্রহীতা প্রতিশ্রুত পরিমাণ অর্থ দিয়া কোম্পানীর ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পারেন। বণিকসভা, সমাজসেবা সমিতি, ক্লাব প্রভৃতিতে এই জাতীয় কোম্পানী দেখা যায়। এরূপ কোম্পানীর সংখ্যা প্রায় ১,১৫০।

(গ) অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানী (Company Limited by Shares): এরূপ কোম্পানীর কোনও শেয়ার-গ্রহীতা যে পরিমাণ টাকার শেয়ার ক্রয় করিবেন তত টাকা পর্যন্ত কোম্পানী ঋণের জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন। ১৯৭২ সালে এরূপ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩২,৫৭৫।

রেজিষ্ট্রিকৃত কোম্পানী আবার নিম্নরূপ হইয়া থাকে:

১। **সার্বজনিক কোম্পানী (Public Company):** ইহা ৭ বা ততোধিক সদস্য লইয়া গঠিত এবং ইহার শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য। ইহাকে অন্য কথায় 'ব্যাপক মালিকানা কোম্পানী' (Widely Owned-Company) বলে। কারণ ইহার শেয়ার বিক্রয় কোনও নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। বিজ্ঞাপনীর দ্বারা ইহার শেয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের বহু লোকের বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিক্রয় হইয়া থকে।

২। **ঘরোয়া কোম্পানী (Private Company):** ইহা ২ বা ততোধিক সদস্য লইয়া গঠিত। ইহার শেয়ার-গ্রহীতাদের সংখ্যা ৫০ জনের বেশী হইবেন না (কর্মচারী শেয়ার-গ্রহীতা ভিন্ন)। ইহা কোন বিজ্ঞাপনী (Prospectus) বিলি করিতে পারিবে না এবং ইহার শেয়ার যদৃচ্ছভাবে হস্তান্তরযোগ্য নহে। ইহাকে অন্য কথায় 'সীমাবদ্ধ মালিকানা কোম্পানী' (Closely Owned-Company) বলে। কারণ ইহার শেয়ার বিক্রয় অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সাধারণত নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

আবার সকল কোম্পানীকে নিম্নলিখিত দুইভাগে ভাগ করা চলে।

১। সরকারী কোম্পানী (Government Company) : যে কোম্পানীতে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অন্ততঃ ৫১ শতাংশ শেয়ার থাকে তাহাকে সরকারী কোম্পানী (Government Company) বলে। ইহা সার্বজনিক বা ঘরোয়া কোম্পানীর মত ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রি করিতে হয়। ইহাতে সরকারী ও বেসরকারী মূলধন নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। তবে ইহার পরিচালনায় সরকারী কর্তৃত্ব পুরামাত্রায় থাকে। দেশের মধ্যে যে সকল দ্রব্যের উৎপাদন প্রচুর হওয়া আবশ্যক এবং যাহাতে লাভ লোকসানের প্রশ্নও বিশেষভাবে জড়িত সে সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী মূলধন নিয়োগের সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এরূপ কোম্পানী গঠনের কাজ সরকার গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার পরিচালনা কোম্পানী আইন অনুযায়ী হইয়া থাকে। তবে কতকগুল বিষয়ে আইনের ধারা ইহার [illegible] পৃথক করা আছে।

২। বেসরকারী কোম্পানী (Non-Government Company) : ইহা বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত কোম্পানী।

সীমিত দায়ের ধারণা (Idea of Limited Liability)

সীমিত দায় নীতি যৌথ কারবারী ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহা কারবারী ক্ষেত্রে এক যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। কারবারী ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ হওয়ায় ইহাতে মূলধন যোগান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কারবারের ব্যাপক প্রসারতা লাভ করিয়াছে। এজন্য ইহা কি এবং উহার তাৎপর্য কি এ সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। একক মালিকানা কারবারে লোকসান হইলে এবং এজন্য কারবার গুটাইতে হইলে কারবারের দেনা পরিশোধের জন্য উহাতে নিয়োজিত মূলধন ছাড়া মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও টান পড়ে অর্থাৎ কারবারের দেনা মিটাইতে উহা নিযুক্ত হয়। অংশীদারী কারবারেও প্রত্যেক অংশীদারের অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। এরূপ পরিস্থিতির জন্য অনেক কারবারীকে সর্বস্বান্ত হইতে দেখা গিয়াছে, এবং কদেউলিয়া হইতে হইয়াছে। ইহা হইতেছে অসীমিত বা অপরিমিত দায়ের (Unlimited Liability) কুফল। কারবারের এরূপ দায় দায়িত্বের ঝুঁকি লইয়া নিশ্চিন্ত মনে কারবার পরিচালনা করা কখনই সম্ভব নয়। ফলে কারবারের পরিবৃদ্ধি [illegible] বাধা পায়। কিন্তু যৌথ কারবারী ক্ষেত্রে সীমিত বা পরিমিত দায় (Limited Liability) প্রবর্তন হওয়ায় এই ঝুঁকির গুরুভার আর কাহাকেও বহন করিতে হয় না। ইহাতে শেয়ারের অভিহিত মূল্য (Face Value) বা কোন কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা থাকিলে উহার অতিরিক্ত দায়-দায়িত্বের জন্য আর কোন চিন্তা থাকে না। ফলে এরূপ কারবারে সামর্থ্য অনুযায়ী মূলধন বিনিয়োগে অনেকেই আগ্রহশীল থাকেন। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে। মনে করি, রামবাবু কোনও সীমিত যৌথ কোম্পানীর ১০ টাকা মূল্যের ১০০ খানা শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে রামবাবু যদি শেয়ারের মূল্য বাবদ—(১০০ × ১০) অর্থাৎ

১০০০ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন তবে লোকসান হওয়ার জন্য কোম্পানীর কাজ-কারবার বন্ধ হইলেও এবং উহার সমস্ত দেনা মেটানোর কাজে নিযুক্ত থাকিলেও রামবাবুকে এই ১০০০ টাকার বেশী কখনও দিতে হইবে না। রামবাবুর দায় এক্ষেত্রে ১০০০ টাকা পর্যন্ত সীমিত বলা হইবে। কোম্পানী উঠিয়া গেলে রামবাবুর ১০০০ টাকা লোকসান হইবে সত্য, কিন্তু এজন্য তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি আটক পড়িবে না। কোন কোম্পানীর দায় এরূপ সীমিত কিনা উহার নাম দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায়। কারণ এরূপ কোম্পানী সার্বজনিক হইলে উহার নামের শেষে সীমিত (Limited) এবং ঘরোয়া হইলে উহার নামের শেষে ঘরোয়া সীমিত (Private Limited) লিখিতে হয়। কেবল সেবামূলক বা সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান মুনাফা বণ্টনের অধিকার না রাখিয়া যৌথ কারবার পরিচালনা করিলে 'সীমিত' (Limited) কথাটি নাও ব্যবহার করিতে পারেন, যেমন, ভারত চেম্বার অব্ কমার্স। জাতীয় স্বার্থে কোন যৌথ কারবার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন থাকিলেও উহার নামের শেষে 'সীমিত' (Limited) কথাটি না থাকিতে পারে। যেমন, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া।

অনেক কোম্পানীর নামের শেষে সীমিত (Limited) কথাটির পূর্বে ভারত (India) কথাটির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, The Imperial Chemical Industries (India) Limited। এরূপ কোম্পানী প্রকৃতপক্ষে বিদেশী কোম্পানী এবং ভারতে নিবন্ধ হইয়া কারবার করিতেছে।

সুতরাং সীমিত দায় (Limited Liability) বা সীমিত (Limited) কথার তাৎপর্য এইভাবে বুঝিতে হইবে।

সীমিত কোম্পানী গঠন (Incorporation of a Limited Company)

সীমিত কোম্পানী গঠনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে :

১। এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কোম্পানী গঠনের জন্য উদ্যোগী হইতে হইবে। কোন ব্যক্তি কোনপ্রকার শিল্প বা ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা দেখিলে তিনি উহা তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহাদের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে 'ঘরোয়া কোম্পানীর' (Private Company) জন্য অন্ততঃ দুইজন এবং 'সার্বজনিক কোম্পানীর' (Public Company) জন্য অন্ততঃ সাতজন লইয়া কোম্পানী গঠনের কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। কোম্পানী গঠনের জন্য এরূপ ব্যক্তিদের প্রথমতঃ কতকগুলি দলিল প্রস্তুত বা সংগ্রহ করিতে হইবে এবং রেজিস্ট্রারের (Registrar) নিকট ফি সহ উক্ত দলিলগুলি দাখিল করিতে হইবে। উক্ত দলিলগুলির পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(ক) কোম্পানীর স্মারকলিপি (Memorandum of Association) : ইহাতে কোম্পানীর নাম, উদ্দেশ্য, মূলধন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়া থাকে।

(খ) কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী (Articles of Association): ইহাতে কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ কার্য পরিচালনার নিয়ম লিপিবদ্ধ থাকে। যে সমস্ত সীমিত কোম্পানী নিজেদের আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী প্রস্তুত করে না তাহাদের সম্বন্ধে কোম্পানী আইনের প্রথম তপশীলের 'এ' তালিকায় (Table A) বর্ণিত আইন-কানুন প্রযুক্ত হইবে।

(গ) যে উদ্যোক্তারা কোম্পানীর প্রথম ডিরেক্টর হইতে ইচ্ছুক তাহাদের নামের তালিকা। ঘরোয়া কোম্পানীর জন্য ইহা প্রয়োজন নাই।

(ঘ) উক্ত উদ্যোক্তাগণ যে কোম্পানীর ডিরেক্টর হইতে স্বীকৃত সে মর্মে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষরযুক্ত সম্মতিসূচকপত্র। ইহাও ঘরোয়া কোম্পানীর পক্ষে প্রযোজ্য নহে।

(ঙ) উক্ত ডিরেক্টরগণ যে তাহাদের পদের যোগ্যতা অর্জনের জন্য উযুক্ত সংখ্যক 'শেয়ার' ক্রয় করিতে স্বীকৃত তাহার চুক্তিপত্র। এ বিষয়ও ঘরোয়া কোম্পানীর জন্য প্রয়োজন নাই।

(চ) কোম্পানী রেজিষ্ট্রি করার জন্য কোম্পানী আইন অনুসারে যাহা কিছু করণীয় উহা যে করা হইয়াছে এই মর্মে হাইকোর্টের উকিল, এ্যাটর্ণি, এ্যাডভোকেট অথবা সনদপ্রাপ্ত গাননিক (Chartered Accountant) অথবা কোম্পানীর ডিরেক্টর, ম্যানেজার বা সেক্রেটারী কর্তৃক একটি ঘোষণাপত্র।

২। যৌথ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের নিকট ফি সহ উপরি-উল্লিখিত দলিলপত্রাদি পরীক্ষা করার জন্য পেশ করিলে এবং রেজিষ্ট্রারের অনুমোদন লাভ করিলে তিনি এই প্রস্তাবিত কোম্পানীর নাম যৌথ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারভুক্ত করিয়া লইবেন এবং সে মর্মে একখানা সার্টিফিকেটও দিবেন। কোম্পানীর নাম যৌথ কোম্পানীর রেজিস্টারভুক্ত করা হইয়াছে রেজিষ্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত এই সার্টিফিকেটকে অভিজ্ঞানপত্র (Certificate of Incorporation or Registration) বলে। আইনসম্মতভাবে যে কোম্পানীর গোড়াপত্তন হইল এই সার্টিফিকেটই তাহার স্বীকৃতিপত্র।

৩। উক্ত অভিজ্ঞানপত্র পাওয়ার পর ঘরোয়া কোম্পানী কারবার আরম্ভ করিতে পারে। কিন্তু সার্বজনিক কোম্পানীকে কারবার আরম্ভ করিতে হইলে **প্রচারপত্র বা বিজ্ঞাপনী (Prospectus)** প্রকাশ করিতে হইবে। ঘরোয়া কোম্পানীর বিজ্ঞাপনী প্রকাশ করার নিয়ম নাই। এই বিজ্ঞাপনীতে কোম্পানীর উদ্দেশ্য, কার্যপরিকল্পনা প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ থাকে।

৪। উক্ত বিজ্ঞাপনী জনসাধারণের মধ্যে বা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার পূর্বে উহার একটি প্রতিলিপি যৌথ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হয় এবং যৌথ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের নিকট যে উহার প্রতিলিপি দাখিল করা হইয়াছে এই মর্মে একটি বিবৃতি প্রত্যেক 'বিজ্ঞাপনীতে' থাকা চাই।

৫। যদি কোন কোম্পানী 'বিজ্ঞাপনী' প্রচার না করে তবে সেই মর্মে একটি

বিবৃতি কোম্পানীর রেজিস্ট্রারের নিকট পেশ করিতে হয়। উক্ত বিবৃতিকে 'বিজ্ঞাপনীর পরিবর্তে বিবৃতি' (Statement in lieu of Prospectus) বলে।

৬। বিজ্ঞাপনী প্রকাশ করার পর কোম্পানীর 'শেয়ার' বিক্রয় আরম্ভ হয়। যিনি 'শেয়ার' কিনিতে ইচ্ছুক তিনি একটি নির্দিষ্ট ফর্মে কোম্পানীর নিকট আবেদন পাঠাইবেন।

৭। কমপক্ষে কি পরিমাণ টাকার শেয়ার ক্রয়ের আবেদন আসিলে ডিরেক্টরগণ শেয়ার বিলি বা বণ্টন করিতে পারিবেন তাহাও বিজ্ঞাপনীতে উল্লেখ থাকে। ইহা সর্বনিম্ন চাঁদা বা বিক্রীত অংশ (Minimum Subscription) নামে পরিচিত।

৮। 'সর্বনিম্ন বিক্রীত অংশের' আবেদন আসিলে উহা রেজিস্ট্রারকে জানাইতে হয়। ডিরেক্টরগণ যে তাঁহাদের চুক্তিমত শেয়ারের মূল্য প্রদান করিয়াছেন তাহাও জানাইতে হয়।

৯। রেজিস্ট্রার এই সংবাদ অবগতির পর সার্বজনিক কোম্পানীকে **"কারবার আরম্ভ করিবার সনদ"** (Certificate of Commencement) প্রদান করিয়া থাকেন। ইহা কারবার আরম্ভের অনুমতিপত্র।

১০। এই সনদ প্রাপ্তির পর সার্বজনিক কোম্পানী কারবারের কার্য আরম্ভ করিয়া থাকে।

সুতরাং কোম্পানী গঠনের জন্য উপরি-উক্ত বিষয়গুলি মানিয়া চলিতে হইবে।

স্মারকলিপি (**Memorandum of Association**)

কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও ক্ষমতা প্রভৃতি সম্বলিত যে দলিল প্রস্তুত হয় তাহাকেই 'স্মারকলিপি' বলে। এই 'স্মারকলিপি'তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে :

(১) কোম্পানীর নাম। কোম্পানীর দায় 'সীমিত' হইলে কোম্পানীর নামের শেষে সীমিত (Limited) কথাটি যোগ করিতে হইবে, আবার কোম্পানীটি 'ঘরোয়া' হইলে সীমিত কথাটির পূর্বে ঘরোয়া (Private) কথাটিও লিখিতে হইবে। সার্বজনিক হইলে শুধু 'সীমিত' কথাটি থাকিলেই চলিবে। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ইহাই নির্দেশ। উহার পূর্বে উভয় ক্ষেত্রে 'সীমিত' কথাটি থাকিলেই চলিত। ইহাতে নাম দেখিয়া উহা ঘরোয়া কিংবা সার্বজনিক কিছুই বুঝিতে পারা যাইত না। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন দ্বারা এই অসুবিধা দূর হইয়াছে।

(২) কোম্পানীর রেজিস্ট্রিকৃত অফিসের ঠিকানা এবং কোন্ প্রদেশে উহা অবস্থিত থাকিবে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) কোম্পানীর উদ্দেশ্যসমূহ।

(৪) যেরূপ দায়বিশিষ্ট কোম্পানী তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) রেজিস্ট্রিকৃত মূলধনের পরিমাণ, উহার 'শেয়ারের' সংখ্যা ও তাহার মূল্য।

(৬) 'স্মারকলিপির' নিয়ম অনুসারে 'শেয়ার' গ্রহণ করিতে স্বীকৃত এই মর্মে প্রথম উদ্যোক্তাদের সম্মতিসূচক ঘোষণা, তাঁহাদের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর। উহাদের প্রত্যেককে অন্ততঃ একজন সাক্ষীর সমক্ষে নাম সহি করিতে হইবে। সাক্ষীদের নামও উক্ত মর্মে উহাতে স্বাক্ষরিত থাকিবে।

'স্মারকলিপি'তে উপরি-উল্লিখিত বিষয়গুলি বিভিন্ন ছত্রে উল্লেখ থাকিবে এবং উহা ছাপাইতে হইবে।

আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী (Articles of Association)

যে দলিলে কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ কার্য পরিচালনার নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ থাকে উহাকে 'কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী' বলে। 'স্মারকলিপিতে' প্রথম উদ্যোক্তা হিসাবে যাহাদের স্বাক্ষর থাকিবে এ দলিলেও তাহাদের সেরূপ স্বাক্ষর দিতে হইবে। এই দলিলে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোম্পানীর যে নিয়ম-কানুন তাহা লিপিবদ্ধ থাকে :

(১) মূলধনের পরিমাণ এবং উহা যে সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর 'শেয়ারে' বিভক্ত হইবে তাহা।

(২) উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা।

(৩) শেয়ারের জন্য আবেদন ও শেয়ার বিলি করার বিধিব্যবস্থা এবং টাকা আদায়ের ও তলবের নিয়ম।

(৪) শেয়ার হস্তান্তর ও বাতিল করার নিয়ম।

(৫) ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।

(৬) শেয়ার বিক্রয় করিবার কমিশন, দালালী ইত্যাদি।

(৭) ডিরেক্টরগণের নাম, ঠিকানা, ক্ষমতা, কর্তব্য, যোগ্যতা, পারিশ্রমিক, অযোগ্যতা, পরিবর্তন প্রভৃতি।

(৮) ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নাম, ক্ষমতা, কর্তব্য, পারিশ্রমিক ইত্যাদি।

(৯) কোম্পানীর সাধারণ সভা, বিশেষ সভা ও অতিরিক্ত সভা এবং উহাদের কার্যবিবরণী।

(১০) অংশীদারদের ভোট দেওয়ার ক্ষমতা।

(১১) হিসাব-নিকাশের ব্যবস্থা ও হিসাব-পরীক্ষক নিয়োগ।

(১২) কোম্পানীর সিলমোহর।

(১৩) সঞ্চয় তহবিল ও লভ্যাংশ ঘোষণা।

(১৪) ডিরেক্টরদের সভা ও সভার কার্যবিবরণী।

(১৫) মূলধন পরিবর্তন।

(১৬) কোম্পানী তুলিয়া দেওয়ার নিয়ম।

(১৭) নোটিশ বিলি করার নিয়ম।

(১৮) কোম্পানী পরিচালনার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইন।

যে সমস্ত 'সীমিত কোম্পানী' (Limited Company) নিজেদের এরূপ 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী' প্রস্তুত করে না তাহাদের সম্বন্ধে কোম্পানী আইনের প্রথম তপশীলের 'এ' তালিকায় (Table A) বর্ণিত আইন-কানুন প্রযুক্ত হইবে। 'এ' তালিকায় কতকগুলি আদর্শ আইন-কানুন লিপিবদ্ধ করা আছে এবং উক্ত 'এ' তালিকায় বর্ণিত আইন-কানুন ঐ সমস্ত কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী বলিয়া গণ্য হইবে।

বিজ্ঞাপনী (Prospectus)

'অভিজ্ঞানপত্র' পাওয়ার পর 'ঘরোয়া কোম্পানী' কারবার আরম্ভ করিতে পারে। কিন্তু 'সার্বজনিক কোম্পানী' হইলে তখনই কারবার আরম্ভ করা চলে না। উহাকে প্রথমতঃ **প্রচারপত্র বা বিজ্ঞাপনী** (Prospectus) প্রকাশ করিতে হয়। ঘরোয়া কোম্পানীর 'বিজ্ঞাপনী' প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই। উক্ত বিজ্ঞাপনীতে কোম্পানীর উদ্দেশ্য, কার্যপরিকল্পনা প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ থাকে। বিজ্ঞাপনীতে সাধারণত কোম্পানী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিতে হয় :

(ক) সংক্ষেপে 'স্মারকলিপি'র বিধানসমূহ।

(খ) যাঁহারা প্রথম ডিরেক্টর হিসাবে নাম সহি করিয়াছেন তাঁহাদের নাম, ঠিকানা, পদমর্যাদা, ক্রীত শেয়ারের সংখ্যা প্রভৃতি।

(গ) কি পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করিলে ডিরেক্টর হওয়া যায় এবং তাঁহাদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ ইত্যাদি।

(ঘ) মূলধনের পরিমাণ এবং শেয়ার সংখ্যা ও মূল্য।

(ঙ) কি পরিমাণ শেয়ার বিক্রয়ের জন্য আবেদন আহ্বান করা হইতেছে তাহা।

(চ) শেয়ার ক্রয় করিবার নিয়ম—অর্থাৎ কোন্ সময়ের মধ্যে কি পরিমাণ টাকা যথাক্রমে আবেদন (Application), বণ্টন (Allotment) এবং আহ্বানকালে (Call) দিতে হইবে তাহার বিবরণ।

(ছ) কমপক্ষে কি পরিমাণ টাকার শেয়ার ক্রয় করার আবেদন আসিলে ডিরেক্টরগণ শেয়ার বিলি বা বণ্টন করিতে পারেন তাহা। যে পরিমাণ শেয়ার ক্রয়ের আবেদন না আসিলে শেয়ার বিলি করা চলে না তাহাকে 'সর্বনিম্ন চাঁদা' বা বিক্রীত অংশ (Minimum Subscription) বলা হয়।

(জ) বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের বিবরণ এবং তাহাদের অধিকার, ক্ষমতা, দায়িত্ব প্রভৃতি।

(ঝ) কোম্পানী গঠনের প্রাথমিক ব্যয়ের (Preliminary Expenses) পরিমাণ বা আনুমানিক পরিমাণ।

(ঞ) ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকিলে তাঁহার পারিশ্রমিকের পরিমাণ।

(ট) বিক্রেতা (Vendors) থাকিলে তাঁহাদের পরিচয় ও তাঁহাদিগকে দেয় টাকার পরিমাণ।

(ঠ) ডিরেক্টরগণের বিশেষ কোন স্বার্থ বা আগ্রহ থাকিলে তাহার উল্লেখ।

(ড) অন্য কোনও সংস্থার সহিত কোন চুক্তিপত্র থাকিলে তাহার উল্লেখ।

(ঢ) হিসাব পরীক্ষকবর্গের (Auditors) নাম ও ঠিকানা।

(ণ) অংশীদারগণের ভোটদান ও লভ্যাংশ গ্রহণ করিবার অধিকার।

(ত) ঋণপত্র (Debenture) গ্রহণ করিবার ক্ষমতা।

(থ) শেয়ার বা ঋণপত্র 'অবলেখিত' (Underwritten) হইলে 'অবলেখনকারীদের' (Underwriters) নাম, ঠিকানা এবং তাহাদিগকে দেয় 'অবলেখন দস্তুরী' (Underwriting Commission) প্রভৃতির বিবরণ। শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য কেহ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইলে উহাকে **অবলেখন** (Underwriting) বলে। যাঁহারা এরূপ চুক্তি করেন তাঁহাদিগকে **অবলেখনকারী** এবং তাঁহারা যে দস্তুরী পাওয়ার অধিকারী তাহাকে 'অবলেখন দস্তুরী' বলে।

(দ) শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়ের সাধারণ দস্তুরী (Commission or Brokerage)।

'স্মারকলিপি' ও 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী'র মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Memorandum of Association and an Articles of Association)

'স্মারকলিপি' ও 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী'র মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি উল্লেখযোগ্য :

১। কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও ক্ষমতা 'স্মারকলিপি'তে উল্লেখ থাকে। 'স্মারকলিপি'ই কোম্পানীর ভিত্তিগত সনদ। 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী'তে কোম্পানীর কার্যপরিচালনার বিধিসমূহ সন্নিবিষ্ট থাকে এবং ঐ বিধিসমূহ কখনও 'স্মারকলিপি'তে প্রদত্ত ক্ষমতাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

২। উভয় দলিল রদ-বদল করিবার নিয়ম একরূপ নহে। 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী'তে উল্লিখিত বিধিসমূহ কোম্পানীর অংশীদারগণের একটি 'বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে' পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু 'স্মারকলিপি'র পরিবর্তন করিতে হইলে অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারের মধ্য দিয়া যাইতে হয় এবং আদালতের অনুমোদন ভিন্ন পরিবর্তন কার্যকরী হওয়া সম্ভব নয়।

৩। 'স্মারকলিপি' রেজিষ্ট্রি করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী' রেজিষ্ট্রি না করিলেও চলে।

৪। 'স্মারকলিপি' ও 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী'র মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলে 'স্মারকলিপি'র বিধানই জয়যুক্ত হইবে।

৫। 'স্মারকলিপি'তে কোন কিছু দ্ব্যর্থবোধক বলিয়া প্রমাণিত হইলে 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী' উহার দ্ব্যর্থ ভাব ঘুচাইতে পারে। কারণ সে সম্বন্ধে 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী'তে বিস্তৃতভাবেই আলোচনা থাকা সম্ভব।

৬। বহির্জগতের সহিত কোম্পানীর কোনও চুক্তির মীমাংসা 'স্মারকলিপি'র বিধানমত হইবে, কিন্তু কোম্পানীর অংশীদারগণের মধ্যে যে চুক্তি উহার বিধানসমূহ 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী'র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Joint Stock Company)

যৌথ কারবার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে:

সুবিধা :

১। **মূলধনের প্রাচুর্য (Abundant Supply of Capital):** বহু লোকের মধ্যে ইহার শেয়ার বিক্রয় হওয়ার সুযোগ-সুবিধা আছে বলিয়া ইহা অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। এজন্য বড় কারবার গঠন যৌথ কারবারের পক্ষে সম্ভব।

২। **উৎপাদন ব্যয় কম (Lower Cost of Production):** কারবার বড় হইলে কারবারের আনুপাতিক ব্যয় এবং পণ্য-উৎপাদনের ব্যয় অনেক কম পড়ে। এজন্য সম্ভোগকারিগণ এরূপ কোম্পানীর উৎপাদিত পণ্য সস্তায় কিনিবার সুযোগ পান।

৩। **কম ঝুঁকি ও হস্তান্তরযোগ্য শেয়ার (Minimum Risk and Transferable Shares):** অংশীদারগণের দায় পরিমিত থাকায় উহাদের ব্যক্তিগত ঝুঁকির মাত্রা কম। ইহার শেয়ারও হস্তান্তরযোগ্য এবং শেয়ার বাজারে ইহার ক্রয়-বিক্রয় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা থাকায় যে কেহ ইচ্ছা করিলে নিজের সুবিধামত ইহার 'শেয়ার' ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারেন।

৪। **স্বল্প মূলধন নিয়োগ সুবিধা (Facility of Small Investment):** অল্প পরিমাণ টাকা লইয়াও যে কেহ ইহার অংশ ক্রয় করিতে পারেন। কারণ যৌথ কোম্পানীর প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য যথাসম্ভব কম করিয়াই ধার্য করা হয়। অল্প টাকা নিয়োগের এরূপ সুবিধা থাকায় জনসাধারণের মধ্যে এরূপ কোম্পানী সঞ্চয় স্পৃহা জাগাইয়া তুলে।

৫। **মূলধন ও নিপুণতার সমাবেশ (Combination of Capital and Skill):** মূলধন ও ব্যবসা পরিচালনের নিপুণতা উভয়ের সমাবেশ এরূপ কারবারে সম্ভব। যাঁহাদের শেয়ার ক্রয় করার সামর্থ্য আছে তাঁহারা শেয়ার ক্রয় করিয়া মূলধনের যোগান দিয়া থাকেন। আর যাঁহাদের কারবার পরিচালনার নিপুণতা আছে তাঁহারা ডিরেক্টর, ম্যানেজার প্রভৃতি স্থলাভিষিক্ত হইয়া কারবার পরিচালনার সুযোগ ও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন।

৬। **বিভিন্ন প্রকারের শেয়ার** (**Different kinds of Share**)ঃ যৌথ কোম্পানীতে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার বিক্রয়ার্থ থাকে বলিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের শেয়ার ক্রয় করার ইচ্ছা পূরণ হইতে পারে।

৭। **স্থায়িত্ব** (**Stability**)ঃ ইহার স্থায়িত্ব পুরুষানুক্রমিক। এজন্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে বড়, ভাল ও জনকল্যাণমূলক দীর্ঘদিন স্থায়ী কারবার প্রয়োজন সেরূপ ব্যবসায়ের ঝুঁকি লইয়া এরূপ কারবার পত্তন করা চলে।

৮। **গণতন্ত্রমূলক** (**Democratic**)ঃ এরূপ কারবার পরিচালনা গণতন্ত্র-মূলক। সুতরাং নূতন ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ অনায়াসে নির্বাচন প্রার্থী হইয়া পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পান। ইহা ছাড়া সুদক্ষ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করার সামর্থ্যও এরূপ কোম্পানীর থাকে।

৯। **সাধারণের আস্থা** (**Public Confidence**)ঃ এরূপ প্রতিষ্ঠানের উপর বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ন্যায্য স্বার্থরক্ষার্থে সরকারী নিয়ন্ত্রণও যথেষ্ট আছে। এজন্য ইহা সাধারণের আস্থাভাজন হইতে পারে।

১০। **আইনসম্মত সত্তা** (**Legal Entity**)ঃ ইহার আইনসম্মত পৃথক সত্তা থাকায় ইহা কৃত্রিম ব্যক্তি হিসাবে কাজ করিতে পারে। ফলে সকলের পক্ষেই কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সুবিধা আছে।

১১। **চিরস্থায়িত্ব** (**Perpetual Succession**)ঃ এরূপ কারবার পুরুষানুক্রমে চলিতে পারে। ফলে ইহার পক্ষে দীর্ঘমিয়াদী পরিকল্পনা বা উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব।

১২। **সীমিত দায়** (**Limited Liability**)ঃ সাধারণত এরূপ কোম্পানীর প্রত্যেক শেয়ার-গ্রহীতার দায় সীমিত বলিয়া শেয়ার বিক্রয় দ্বারা মূলধন সংগ্রহের অসুবিধা হয় না।

অসুবিধাঃ

১। **ধনিকতন্ত্র** (**Capitalism**)ঃ যদিও আইনত যৌথ কোম্পানী গণতন্ত্র-মূলক কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহা ধনিকতন্ত্রের পরিচয় দিয়া আসিতেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতেই পরিচালনভার থাকিয়া যায় এবং তাঁহাদের স্বার্থের নিকট সাধারণ শেয়ার-ক্রেতাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

২। **মালিক ও কর্মচারীর মধ্যে পার্থক্য** (**Gap between Owners and Employees**)ঃ মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায় কারবার পরিচালনায় মিতব্যয়িতা অপেক্ষা অপচয়ের মাত্রা বেশী দেখিতে পাওয়া যায় এবং সস্তায় পণ্য উৎপাদন হওয়ার ব্যাপারটা নেহাৎ কল্পনামাত্র।

৩। **বিবাদ** (**Dispute**)ঃ মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায় অধস্তন ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব ঘটে। ফলে এ সমস্ত কারবারে বিবাদ, বিসম্বাদ ও ধর্মঘট প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। **স্বজনপোষণ** (Nepotism): সুদক্ষ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি নিয়োগ এ সমস্ত কারবারে কমই দেখিতে পাওয়া যায় ; বরং পরিচালকবর্গের আত্মীয়-পোষণ নীতিই এরূপ কারবারে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। **উৎসাহের অভাব** (Lack of Incentive): এরূপ কারবারে পরিচালকবর্গকে প্রকৃত উৎসাহ লইয়া কার্য পরিচালনা করিতে দেখা যায় না। তাঁহারা শুধু সভায় বসিয়া ম্যানেজার বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নির্দেশমত কোম্পানী পরিচালনার বিভিন্ন নীতি পাশ করিয়া থাকেন এবং সমস্ত ক্ষমতা উক্ত কর্মচারীদের হস্তেই ন্যস্ত করিয়া থাকেন। এভাবে কিছুদিন চলার পর তাঁহারা কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ কাজ-কারবার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া পড়েন এবং তখন পরের মুখে ঝাল বা মিষ্টি খাওয়া ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর থাকে না। সুতরাং এরূপ কারবারের যাঁহারা প্রকৃত মালিক অর্থাৎ অংশীদার তাঁহাদের স্বার্থ উপেক্ষিতই থাকে। লভ্যাংশের পরিমাণ তাঁহাদের ভাগ্যে কমই আসিয়া থাকে।

৬। **আইনের কড়াকড়ি** (Legal Hurdles): ইহার গোড়াপত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া কার্যারম্ভের ও উহার পরেও আইনের নানাবিধ বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। এরূপ বিধি-নিষেধের জন্য সুষ্ঠু পরিচালনা অনেক ক্ষেত্রেই বিঘ্নিত হয়।

৭। **অসাধু উদ্যোক্তা** (Dishonest Promoters): যৌথ কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে অনেক অসাধু উদ্যোক্তাও স্থান করিয়া লন। ফলে উহাদের মিথ্যা প্রচারে প্রলোভিত হইয়া অনেক বিনিয়োগকারী অলাভজনক কারবারে অর্থ নিয়োগ করিতে বাধ্য হন। এরূপ কোম্পানীর যখন পতন ঘটে তখন দেশের লগ্নী বাজারে ভীতি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

৮। **ফটকাবাজী** (Speculation): অনেক কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুনাফার প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখেন এবং এইভাবে শেয়ারের মূল্যের পরিবর্তন ঘটান। উক্ত শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তি শেয়ার-গ্রহীতাদের প্রবঞ্চনা করিয়া লাভবান হন।

৭

একক-মালিকানা ও অংশীদারী কারবারের তুলনায় সীমিত কোম্পানীর সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of a Limited Company as compared with Sole Traders and Partnership)

একক-মালিকানা এবং অংশীদারী কারবারের তুলনায় সীমিত কোম্পানীর সুবিধা ও অসুবিধা নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

সীমিত কোম্পানীর সুবিধার দিক দিয়া বিচার্য :

সীমিত কোম্পানী	অংশীদারী কারবার	একক-মালিকানা কারবার
১। বহু লোকের মধ্যে ইহার শেয়ার বিক্রয় করার সুযোগ-সুবিধা থাকায় ইহা অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। এজন্য বৃহদাকার কারবার গঠন ইহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত বেশী সুবিধাজনক।	১। ইহাতে ২০ জনের বেশী (ব্যাঙ্কিং কারবার হইলে ১০ জন) অংশীদার থাকে না। এজন্য ইহার মূলধন সংগ্রহের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। ফলে ইহার পক্ষে বৃহদাকার কারবার গঠন সম্ভাবনা সীমিত কোম্পানীর তুলনায় কম।	১। এখানে মালিকের সংখ্যা একজন মাত্র। এজন্য ইহার মূলধন সংগ্রহের পরিমাণ খুবই সীমাবদ্ধ। ফলে বৃহদাকার কারবার গঠনের প্রশ্ন কমই উঠে।
২। ইহার অংশীদারগণের দায় পরিমিত। এজন্য ব্যক্তিগত ঝুঁকির মাত্রা কম।	২। ইহার অংশীদারগণের দায় অপরিমিত। এজন্য ব্যক্তিগত ঝুঁকির মাত্রা বেশী।	২। এখানে একজন মাত্র মালিক থাকায় তাঁহার যেমন দায় অপরিমিত তেমন ব্যক্তিগত ঝুঁকির মাত্রাও সর্বাধিক।
৩। ইহার শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য। শেয়ার বাজারে ইহার ক্রয়-বিক্রয় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। ফলে যে কেহ তাহার ইচ্ছামত শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে।	৩। ইহার শেয়ার অংশীদারগণের অনুমতি ভিন্ন হস্তান্তরযোগ্য নহে। ফলে ইহার শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা নাই।	৩। ইহার শেয়ারের মালিক একজন। সুতরাং এখানে শেয়ার হস্তান্তরের বা বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের কোন স্থান নাই।

সীমিত কোম্পানী	অংশীদারী কারবার	একক-মালিকানা কারবার
৪। বহু লোকের সমাবেশ হওয়ায় প্রচুর মূলধন এবং উচ্চ স্তরের ব্যবসা পরিচালনের নিপুণতা ও এতদ-উভয়ের সমাবেশ এরূপ কারবারে সম্ভব।	৪। অল্প সংখ্যক লোকের সমাবেশহেতু প্রচুর মূলধন এবং উচ্চ-স্তরের ব্যবসা পরিচালনের নিপুণতা—এতদ-উভয়ের সমাবেশ এরূপ কারবারে অপেক্ষাকৃত কম।	৪। একটিমাত্র ব্যক্তি মালিক হওয়ায় প্রচুর মূলধন এবং উচ্চ স্তরের ব্যবসা পরিচালনা—এতদ-উভয়ের সমাবেশের ক্ষেত্র এখানে খুবই সীমাবদ্ধ।
৫। ইহার স্থায়িত্ব পুরুষানুক্রমিক। এজন্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে বৃহৎ ও জনকল্যাণমূলক দীর্ঘদিন স্থায়ী কারবার প্রয়োজন সেখানে ইহার স্থান অতি উচ্চে।	৫। এরূপ কারবার যে-কোন সময়ে বন্ধ হইতে পারে। ইহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। এজন্য দীর্ঘস্থায়ী, বৃহৎ ও জনকল্যাণমূলক কারবারের ঝুঁকি ইহা কমই লইতে পারে।	৫। এরূপ কারবারের স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছা, শক্তি ও সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রেও দীর্ঘস্থায়ী, বৃহৎ ও জনকল্যাণমূলক কারবারের স্থান খুবই সীমাবদ্ধ।
৬। আইনের চক্ষে ইহার পৃথক সত্তা আছে। এজন্য ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তনের ফলে কারবারের ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম।	৬। আইনের চক্ষে ইহার পৃথক সত্তা নাই। এজন্য ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তনের ফলে কারবারের ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশী।	৬। ইহারও আইনের চক্ষে পৃথক সত্তা নাই। এজন্য মালিকানা পরিবর্তনের ফলে কারবারের ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশী।

সীমিত কোম্পানীর অসুবিধার দিক দিয়া বিচার্য

সীমিত কোম্পানী	অংশীদারী কারবার	একক-মালিকানা কারবার
১। অনেকে ইহার মালিক হইলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতেই পরিচালনভার ন্যস্ত থাকে। এজন্য তাহাদের স্বার্থের নিকট অনেকের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।	১। ইহাতে মালিকদের সকলেই পরিচালনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। এজন্য কাহারও স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।	১। ইহাতে মালিকানা একক। এজন্য এক্ষেত্রে ভিন্ন স্বার্থের কোন স্থান নাই।

সীমিত কোম্পানী	অংশীদারী কারবার	একক-মালিকানা কারবার
২। ইহাতে মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ খুব কম। এজন্য অমিতব্যয়িতা ও কার্যে শৈথিল্যের সম্ভাবনা বেশী।	২। ইহাতে মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী। এজন্য অমিতব্যয়িতা ও শৈথিল্যের স্থান অপেক্ষাকৃত কম।	২। ইহাতে মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সবচেয়ে বেশী। ফলে অমিতব্যয়িতা ও শৈথিল্যের স্থানও এখানে খুব কম।
৩। ইহাতে মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে অসদ্ভাবের সম্ভাবনা বেশী।	৩। ইহাতে মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে অসদ্ভাবের সম্ভাবনা কম।	৩। ইহাতে মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে অসদ্ভাবের সম্ভাবনা খুবই কম।
৪। এরূপ কারবারে মালিকদের উৎসাহবোধ অপেক্ষাকৃত কম। কর্মচারীদের হাতে কাজের ভার দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন।	৪। এরূপ কারবারে মালিকদের উৎসাহ ও কর্মক্ষমতার প্রকাশ অপেক্ষাকৃত বেশী।	৪। এরূপ কারবারে মালিকদের উৎসাহ ও কর্মক্ষমতার প্রকাশ সর্বাধিক।
৫। ইহাতে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব সবচেয়ে বেশী।	৫। ইহাতে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের স্থান খুব কম।	৫। ইহাতে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের স্থান নাই।

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর তুলনায় অংশীদারী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Partnership over Public Limited Companies)

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর তুলনায় অংশীদারী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর তুলনায় অংশীদারী কারবারের সুবিধা :

১। অংশীদারী কারবারে মালিকদের সকলেই পরিচালনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। এজন্য কাহারও স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সার্বজনিক

কোম্পানীতে অনেকে মালিক হইলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতেই পরিচালনভার ন্যস্ত থাকে। ফলে মালিকের স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়।

২। অংশীদারী কারবারে মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর তুলনায় বেশী। এজন্য অংশীদারী কারবারে সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর তুলনায় অমিতব্যয়িতা ও শৈথিল্যের স্থান এবং মালিক ও কর্মচারী-দের মধ্যে অসদ্ভাবের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম।

৩। অংশীদারী কারবারে সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর তুলনায় মালিকদের উৎসাহ ও দক্ষতার প্রকাশ অপেক্ষাকৃত বেশী। কারণ অংশীদারগণ সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর মত কর্মচারীদের হাতে কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না।

৪। অংশীদারী কারবারে সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর তুলনায় আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের স্থান অপেক্ষাকৃত কম।

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর তুলনায় অংশীদারী কারবারের অসুবিধা নিম্নরূপ :

১। অংশীদারী কারবারে ২০ জনের (ব্যাঙ্কিং কারবার হইলে ১০ জনের) বেশী অংশীদারী থাকে না। এজন্য সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর তুলনায় ইহার মূলধন সংগ্রহের পরিমাণ কম এবং এজন্য ইহার পক্ষে বৃহদাকার কারবার গঠন সম্ভাবনা সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর তুলনায় কম।

২। অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের দায় অসীমিত। এজন্য সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর তুলনায় অংশীদারগণের ঝুঁকির মাত্রা বেশী।

৩। অংশীদারী কারবারের 'অংশ' সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর 'অংশের' ন্যায় ইচ্ছামত হস্তান্তর করা যায় না। এজন্য অংশীদারী কারবারের 'অংশ' সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর 'অংশে'র ন্যায় বাজারে কেনা-বেচার সুবিধা নাই।

৪। অংশীদারী কারবারে অল্পসংখ্যক লোকের সমাবেশ হেতু প্রচুর মূলধন এবং উচ্চস্তরের কারবার পরিচালনের নিপুণতার সমাবেশ সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর তুলনায় কম।

৫। অংশীদারী কারবার যে কোন সময় বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ইহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। ফলে ইহার পক্ষে দীর্ঘমিয়াদী বৃহৎ ও জনকল্যাণমূলক কারবারের ঝুঁকি বহন করা সম্ভব হয় না। সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর স্থায়িত্ব পুরুষানুক্রমিক। ফলে এ বিষয়ে ইহার স্থান অতি উচ্চে।

৬। অংশীদারী কারবারের আইনের চক্ষে কোন পৃথক সত্তা নাই। এজন্য ব্যক্তি-বিশেষের পরিবর্তনের ফলে কারবারের ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশী, কিন্তু সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর পৃথক সত্তা থাকায় ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তনের ফলে কারবারের ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম।

অংশীদারী এবং সীমিত যৌথ কারবারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Partnership and a Joint Stock Company with Limited Liability)

অংশীদারী এবং সীমিত যৌথ কারবারের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি উল্লেখযোগ্য :

অংশীদারী কারবার	সীমিত যৌথ কারবার
১। ১৯৩২ সালের ভারতীয় **অংশীদারী আইনের** নিয়ন্ত্রণাধীন।	১। ১৯৫৬ সালের ভারতীয় **কোম্পানী আইনের** নিয়ন্ত্রণাধীন।
২। **সদস্যের** সর্বনিম্ন সংখ্যা ২ এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ২০, ব্যাঙ্কিং ব্যবসা হইলে সর্বোচ্চ সংখ্যা ১০।	২। **সদস্যের** সর্বনিম্ন সংখ্যা ঘরোয়া কোম্পানী হইলে ২, সার্বজনিক হইলে ৭, এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ঘরোয়া কোম্পানীতে কর্মচারী সদস্য-ছাড়া ৫০ এবং সার্বজনিক হইলে শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ।
৩। পারস্পরিক চুক্তি দ্বারা **আইনের** কড়াকড়ি হ্রাস করা চলে।	৩। **আইনের** বিধানসমূহ কঠোরভাবে মানিয়া চলিতে হয়।
৪। আইনের চক্ষে পৃথক **সত্তা** নাই।	৪। আইনের চক্ষে পৃথক **সত্তা** আছে।
৫। **মূলধনের পরিমাণ** সভ্যদের ইচ্ছানুযায়ী হ্রাস-বৃদ্ধি করা চলে।	৫। স্মারকলিপিতে ঘোষিত **মূলধনের** হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে হইলে আইনের জটিল খুঁটিনাটি মানিয়া চলিতে হইবে।
৬। অংশীদারগণের দায় **অসীমিত**।	৬। অংশীদারগণের দায় **সীমিত**।
৭। প্রত্যেক অংশীদার কারবার পরিচালনায় **অংশ গ্রহণ** করিতে পারেন।	৭। অংশীদারগণ কর্তৃক নির্বাচিত 'পরিচালকবর্গ' ভিন্ন অন্য কেহ কারবার পরিচালনায় **অংশ গ্রহণ** করিতে পারেন না।

অংশীদারী কারবার	সীমিত যৌথ কারবার
৮। কোন অংশীদারের মৃত্যু হইলে বা কোন অংশীদার দেউলিয়া হইলে কারবার তুলিয়া দিতে হয়।	৮। কোন অংশীদারের মৃত্যু হইলে কিংবা কোনও অংশীদার দেউলিয়া হইলে কিংবা কাহারও শেয়ার হস্তান্তর হইলে কারবার তুলিয়া দিতে হয় না।
৯। কারবারের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত।	৯। ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে পুরুষানুক্রমে কারবার চলার কোন বাধা নাই।
১০। সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে কিংবা চুক্তিনামায় উল্লিখিত বা অংশীদারী আইনে বর্ণিত কারবার তুলিয়া দেওয়ার অবস্থার উদ্ভব হইলেই কারবার গুটাইতে হয়।	১০। কোম্পানী আইনের নির্দেশ অনুযায়ী জটিল ও বিস্তৃত অবস্থার মধ্য দিয়া কারবার তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়।
১১। দুই ব্যক্তি ব্যবসা আরম্ভ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইলেই বিনা রেজিস্ট্রিতে কারবার আরম্ভ করা চলে।	১১। রেজিস্ট্রি ভিন্ন কারবারের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না।
১২। মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ।	১২। মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে। ঘরোয়া কোম্পানী হইলে কিছুটা যোগাযোগ দেখা যায়।
১৩। অংশীদারদের সভায় প্রত্যেককেই উপস্থিত থাকিয়া ভোট দিতে হয়।	১৩। কোম্পানীর সভায় অংশীদার নিজে উপস্থিত না থাকিয়া অন্যকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারেন।
১৪। রেজিস্ট্রারের নিকট বার্ষিক লাভ-লোকসান হিসাব, উদ্বৃত্তপত্র ও হিসাব পরীক্ষকের বিবরণী দাখিল করার বাধ্যবাধকতা নাই।	১৪। রেজিস্ট্রারের নিকট বার্ষিক লাভ-লোকসান হিসাব, উদ্বৃত্তপত্র ও হিসাব পরীক্ষকের বিবরণী দাখিল করা বাধ্যতামূলক।
১৫। অংশীদারদের শেয়ার সার্টিফিকেট কিংবা শেয়ার ওয়ারেন্ট নেওয়ার রীতি নাই।	১৫। অংশীদারদের শেয়ার সার্টিফিকেট কিংবা শেয়ার ওয়ারেন্ট দেওয়ার নিয়ম আছে।

সার্বজনিক কোম্পানী এবং ঘরোয়া কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Public Limited Company and a Private Limited Company)

সার্বজনিক ও ঘরোয়া কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

সার্বজনিক কোম্পানী	ঘরোয়া কোম্পানী
১। ইহার সর্বনিম্ন সভ্য সংখ্যা ৭ এবং সর্বোচ্চ সভ্যসংখ্যা শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ।	১। ইহার সর্বনিম্ন সভ্যসংখ্যা ২ এবং সর্বোচ্চ সভ্যসংখ্যা কর্মচারী সভ্য ছাড়া ৫০।
২। ইহার নামের শেষে সার্বজনিক (Public) কথাটি যোগ করিতে হয় না।	২। ইহার নামের শেষে ঘরোয়া (Private) কথাটি যোগ করিতে হয়।
৩। ইহার শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কোন বিজ্ঞাপনী (Prospectus) বা বিজ্ঞাপনীর পরিবর্তে বিবরণ (Statement in lieu of Prospectus) প্রচার করিতে হয় বা উহা কোম্পানীর রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হয়।	৩। ইহার শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপনী বা বিজ্ঞাপনীর পরিবর্তে বিবরণ প্রচার করিতে হয় না এবং উহা প্রকাশ বা প্রচারের পূর্বে রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হয় না।
৪। ইহার সর্বনিম্ন ডিরেক্টরের সংখ্যা তিন।	৪। ইহার সর্বনিম্ন ডিরেক্টরের সংখ্যা দুই।
৫। ইহার ডিরেক্টর হইবার যোগ্যতালাভের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করার নিয়ম আছে এবং উক্ত সংখ্যক শেয়ার লইতে স্বীকৃত এরূপ সম্মতিসূচক পত্রও রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হয়।	৫। ইহার ডিরেক্টর হইবার যোগ্যতালাভের জন্য কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করার নিয়ম নাই এবং উক্ত সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এরূপ সম্মতিসূচক কোন পত্র রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হয় না।

সার্বজনিক কোম্পানী

৬। রেজিস্ট্রারের নিকট হইতে নিবন্ধনপত্র (Certificate of Registration) পাওয়ার পর ইহা সরাসরি কারবার আরম্ভ করিতে পারে না। উক্ত নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর ইহাকে সর্বনিম্ন মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। উক্ত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ হইলে এবং উক্ত সংবাদ রেজিস্ট্রারকে জানাইলে তাঁহার নিকট হইতে কারবার আরম্ভের অনুমতি পত্র (Certificate of Commencement) পাওয়া যায়।

৭। ইহার শেয়ার অবাধ হস্তান্তরযোগ্য।

৮। ইহাকে বিধিবদ্ধ সভা (Statutory meeting) আহ্বান করিতে হয় এবং উহার বিবরণী (Report) রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হয়।

৯। নিবন্ধনের সময় ইহাকে ডিরেক্টরদের নামের তালিকা এবং উহাদের সম্মতিসূচক পত্র রেজিস্ট্রারের নিকট পেশ করিতে হয়।

১০। ইহার ডিরেক্টর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে সরকারী অনুমোদন প্রয়োজন।

১১। ইহার বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করিতে সভ্যদিগকে ২১ দিনের নোটিশ দেওয়া প্রয়োজন।

১২। ইহার নিজস্ব 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী' (Articles of Association) না থাকিলেও চলে। নিজস্ব 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী' না থাকিলে কোম্পানী আইনের Table A ইহার আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী বলিয়া গণ্য হইবে।

ঘরোয়া কোম্পানী

৬। রেজিস্ট্রারের নিকট হইতে নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরই ইহা কারবার আরম্ভ করিতে পারে।

৭। ইহার শেয়ার অবাধ হস্তান্তরযোগ্য নহে।

৮। ইহাকে বিধিবদ্ধ সভা আহ্বান করিতে হয় না এবং উহার বিবরণী (Report)-ও রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হয় না।

৯। নিবন্ধনের সময় ইহাকে ডিরেক্টরদের নামের তালিকা এবং উহাদের সম্মতিসূচক পত্র রেজিস্ট্রারের নিকট পেশ করিতে হয় না।

১০। ইহার ডিরেক্টর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে সরকারী অনুমোদন প্রয়োজন নাই।

১১। ইহার বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করিতে সভ্যদিগকে ২১ দিনের নোটিশ না দিলেও চলে।

১২। ইহার নিজস্ব 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী' থাকার নিয়ম।

সার্বজনিক কোম্পানী	ঘরোয়া কোম্পানী
১৩। আবর্তন প্রথায় ডিরেক্টরদের অবসর গ্রহণের রীতি ইহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	১৩। আবর্তন প্রথায় ডিরেক্টরদের অবসর গ্রহণের রীতি ইহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
১৪। ডিরেক্টরদের পারিশ্রমিক কোম্পানী আইন অনুযায়ী হওয়া বাধ্যতামূলক।	১৩। ডিরেক্টরদের পারিশ্রমিক কোম্পানী আইন অনুযায়ী হওয়ার প্রয়োজন নাই।

কোম্পানী আইন অনুযায়ী সার্বজনিক কোম্পানীর তুলনায় ঘরোয়া কোম্পানীর সুবিধা ও অব্যাহতি (Comparative privileges and exemptions of Private Limited Companies over Public Limited Companies under the Companies Act)

কোম্পানী আইন অনুসারে সার্বজনিক কোম্পানীর তুলনায় ঘরোয়া কোম্পানী নিম্নলিখিত সুবিধা ও অব্যাহতি পাইয়া থাকে :

১। ইহাকে বিজ্ঞাপনী (Prospectus) কিংবা বিজ্ঞাপনীর পরিবর্তে বিবরণ (Statement in lieu of Prospectus) প্রচার করিতে হয় না বা রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হয় না।

২। নিবন্ধনের সময় ইহাকে ডিরেক্টরদের নামের তালিকা বা তাঁহাদের ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করিবার সম্মতিসূচক কোন পত্রাদি পেশ করিতে হয় না।

৩। অভিজ্ঞানপত্র (Certificate of Incorporation) পাওয়ার পর ইহা কারবার আরম্ভ করিতে পারে। এজন্য সর্বনিম্ন মূলধন সংগ্রহের অপেক্ষায় ইহাকে থাকিতে হয় না।

৪। ইহার ডিরেক্টর সংখ্যা দুইজন হইলেই চলে।

৫। ইহার ডিরেক্টর সংখ্যা সরকারের অনুমোদন ছাড়াই বৃদ্ধি করা চলে।

৬। ইহাকে বিধিবদ্ধ সভা (Statutory Meeting) করিতে হয় না এবং বিধিবদ্ধ বিবরণীও (Statutory Report) রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হয় না।

৭। আবর্তন প্রথায় ইহার ডিরেক্টরগণ অবসর গ্রহণ করেন না।

৮। ইহাতে সভ্যদের ভোটাধিকার শেয়ারের মূল্যানুপাতিক নাও হইতে পারে।

৯। ইহার সভ্যদের নিকট আনুপাতিক হারে শেয়ার বিক্রয়ও বাধ্যতামূলক নহে।

১০। ইহার শেয়ার যদৃচ্ছ হস্তান্তরযোগ্য নহে।

১১। ইহার পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors), ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রভৃতি নিয়োগ ব্যাপারে সরকারী নির্দেশ প্রয়োজন নাই।

১২। পরিচালকমণ্ডলীর পারিশ্রমিক ইহাতে কোম্পানী আইন অনুযায়ী না হইলেও চলে।

১৩। ইহার পরিচালন ব্যবস্থায় বা উহার পরিবর্তনে সরকার সাধারণত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

১৪। ডিরেক্টরগণ সরকারী অনুমোদন ভিন্ন কোম্পানী হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন।

১৫। ডিরেক্টরদের যোগ্যতাসূচক শেয়ার (Qualification Shares) ক্রয় করার কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

১৬। ইহার সভ্যদের নিকট পরিচালকমণ্ডলীর বার্ষিক বিবরণ এবং চেয়ারম্যানের বক্তৃতা দেওয়া বাধ্যতামূলক নহে।

১৭। ইহা প্রেফারেন্স, ডেফার্ড, ইকুইটি প্রভৃতি নানা প্রকারের শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে।

১৮। ইহা যে-কোন সময়ের জন্য যে-কোন ব্যক্তিকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে পারে।

১৯। ইহার সুবিধামত সভা আহ্বানের সময়ের রদবদল করিতে পারে। সভার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ন্যূনতম সভাসংখ্যা (Quorum) দুইজন হইলেই চলে। সভায় সভ্যের প্রতিনিধি (Proxy) সভ্যের অনুরূপ অধিকার ভোগ করিয়া থাকে।

২০। কোন পরিচালকের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকিলেও তিনি সভায় ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হন না।

২১। ইহার কোন শেয়ার হস্তান্তর হইলে পরিচালকমণ্ডলী উক্ত হস্তান্তর রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত করিতে অস্বীকার করিলে তাহার কোন প্রতিকার নাই।

যে সকল ঘরোয়া কোম্পানী সার্বজনিক কোম্পানীর সহায়ক হিসাবে কাজ করে উহারা অবশ্য উপরি-উক্ত সুবিধা ও অব্যাহতি ভোগ করিতে পারে না।

কোম্পানী আইন অনুযায়ী ঘরোয়া কোম্পানীর উপর বাধা-নিষেধ (Restrictions imposed on Private Limited Companies under the Companies Act)

কোম্পানী আইন অনুযায়ী ঘরোয়া কোম্পানীর উপর নিম্নলিখিত বাধানিষেধগুলি উল্লেখযোগ্য :

১। ইহার নামের শেষে ঘরোয়া (Private) কথাটি লেখার নিয়ম।

২। ইহাতে কমপক্ষে দুইজন পরিচালক থাকা আবশ্যক।

৩। নিবন্ধনের সময় ইহার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী (Articles of Association) রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হয়।

৪। উপযুক্ত হিসাব পরীক্ষক দ্বারা ইহার হিসাব পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক।

৫। ইহার লাভ-লোকসান হিসাব, উদ্বৃত্তপত্র, হিসাব পরীক্ষকের মন্তব্য এবং ইহার বার্ষিক বিবরণী তিন প্রস্থে রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করার নিয়ম।

৬। ইহার সভ্যসংখ্যা ৫০ জনের বেশী নহে এবং শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ইহা কোন বিজ্ঞাপনী প্রচার করে নাই এই মর্মে রেজিস্ট্রারের নিকট একটি বিবৃতি দাখিল করিতে হয়।

৭। ইহার সভ্যদের সভায় উপস্থিত হইবার জন্য কোন সভ্য তাঁহার প্রতিনিধি (Proxy) হিসাবে একাধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারে না।

৮। ইহার শেয়ার অবাধ হস্তান্তরযোগ্য নহে। এজন্য ইহা 'শেয়ার ওয়ারেণ্ট' (Share Warrant) বিক্রয় করিতে পারে না।

উপরি-উক্ত বাধা-নিষেধ ছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ঘরোয়া কোম্পানীকে সার্বজনিক কোম্পানী বলিয়া গণ্য করার নিয়মও আছে।

১। যদি ইহার আদায়ীকৃত মূলধনের অন্তত ২৫% অন্য একটি বা একাধিক কোম্পানীতে বিক্রয় হয় এবং (২) এই শেয়ার-গ্রহীতা কোম্পানীগুলির অন্তত একটি যদি সার্বজনিক কোম্পানী হয়।

কিন্তু শেয়ার-গ্রহীতা কোম্পানীগুলি যদি বৈদেশিক কোম্পানী হয় কিংবা সকল কোম্পানী যদি ঘরোয়া কোম্পানী হয় এবং উহাদের মোট সভ্যসংখ্যা ৫০ জনের বেশী না হয় তবে কোন ঘরোয়া কোম্পানীর সকল শেয়ার উহারা ক্রয় করিলেও ঘরোয়া কোম্পানী ঘরোয়াই থাকিয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় উহাকে সার্বজনিক কোম্পানী বলিয়া গণ্য করার নিয়ম নাই।

অংশীদারী কারবারগুলির সীমিত দায়যুক্ত কোম্পানীতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রবণতা (Tendency to convert Partnership type of business into Limited Liability concerns)

অংশীদারী কারবারগুলির সীমিত দায়যুক্ত কোম্পানীতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রবণতা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। এরূপ রূপান্তর অনেক ক্ষেত্রে ঘটিতে দেখা যাইতেছে এবং ভবিষ্যতে যে আরও অধিক সংখ্যায় এরূপ রূপান্তর ঘটিবে ইহাও বলা চলে। উহার কারণগুলি নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা চলে।

যখন কারবারের জন্য বিভিন্নমুখী প্রতিভার প্রয়োজন তখন উহা একক-মালিকানার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এরূপ অবস্থায় অংশীদারী কারবারের গোড়াপত্তন হইয়া থাকে। একক মালিকানার তুলনায় ইহাতে অধিক মূলধন সংগ্রহের সুযোগ থাকে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন অংশীদারের বিভিন্নমুখী প্রতিভাস্ফুরণের সুযোগও ইহাতে ঘটিয়া থাকে। এইভাবে বিভিন্ন অংশীদারগণের মিলিত প্রচেষ্টায় অংশীদারী কারবার গড়িয়া উঠে। কারবারে সফলতা আসিলে এবং উহার আয়তন বৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা থাকিলে উহার আয়তনও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যে কারবারের আয়তন বৃদ্ধির সুযোগ আছে উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে ব্যয়-সংকোচের কোন সুবিধা গ্রহণ করা যায় না এবং শ্রমবিভাগের নীতিও বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু অংশীদারী কারবার যদৃচ্ছা বৃদ্ধি

করিয়া উহার সর্বোত্তম আয়তনে আসার অনেক বিপদ আছে। প্রথম বিপদ হইতেছে দায়ের অসীমাবদ্ধতা। ইহার ফলে অংশীদারগণের সাধ্যাতীত ঝুঁকি বহন করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এরূপ ঝুঁকি গ্রহণ করা সর্বক্ষেত্রে সমীচীন নহে। তাহা ছাড়া কোন অংশীদারের মৃত্যু হইলে, কিংবা কেহ দেউলিয়া হইলে কিংবা মতানৈক্যের জন্য কেহ কারবার হইতে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা করিলে সমৃদ্ধিশালী কারবারের অবসান ঘটাইতে হয়। সুতরাং অংশীদারী কারবার সম্প্রসারণের নানাবিধ বাধা-বিপত্তি আছে। এরূপ অবস্থায় ইহাকে সীমিত দায়যুক্ত যৌথ মূলধনী কারবারে রূপান্তরিত করিলে কারবার সম্প্রসারণের এবং উহার স্থায়িত্বের কোন বাধাই থাকে না। অংশীদারগণের পক্ষে যাহা সম্ভব নয় সেরূপ মূলধন সংগ্রহেরও এখানে কোন বাধা থাকে না। অংশীদারী কারবারের স্থায়িত্বে অনিশ্চয়তা, মূলধনের সীমাবদ্ধতা এবং অসীম দায়ের জন্যই অনেক অংশীদারী কারবার সীমিত দায়যুক্ত কোম্পানীতে রূপান্তরিত হইতেছে।

অংশীদারী ও সার্বজনিক কোম্পানীর মধ্যবর্তী অবস্থান হিসাবে ঘরোয়া কোম্পানীর জনপ্রিয়তা (Popularity of Private Company as an Intermediary between a Partnership and a Public Company)

অংশীদারী কারবারে একজন অংশীদারের কাজের জন্য অন্যান্য অংশীদারও দায়ী থাকেন। ফলে একজনের নির্বুদ্ধিতার জন্য অন্য অংশীদারগণকে দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয়। মতানৈক্য, অসাধুতা, মৃত্যু, মস্তিষ্ক-বিকৃতি, দেউলিয়া প্রভৃতির জন্য সমৃদ্ধশালী কারবারেরও অবসান দেখিতে পাওয়া যায়। অংশীদারী কারবারের জন্য যে সততা, বন্ধুত্ব, বিশ্বাস প্রভৃতি প্রয়োজন উহা কারবার আরম্ভ করার সময় বর্তমান আছে বলিয়া মনের বিশ্বাস থাকিলেও পরবর্তী কালে উহাদের অভাব আসিয়া পড়ে। ইহার ফলেও বহু কারবারের পতন ঘটিতে দেখা যায়। অনেক ব্যক্তি কারবারে মূলধন নিয়োগ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চান এবং অসীমিত দায়ে ঝুঁকির বহন করিতে ইচ্ছুক নন। তাঁহাদের পক্ষে অংশীদারী কারবারে মূলধন বিনিয়োগ করা সম্ভব নহে। অসীমিত দায়ের জন্য কারবারের আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও উহা অনেকক্ষেত্রে সফল হয় না। এ সকল অসুবিধার জন্য অংশীদারী কারবারকে সীমিত যৌথ মূলধনী কারবারে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। সীমিত যৌথ কোম্পানী আবার দুই প্রকারের হইতে পারে। একটি হইল সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী (Public Limited Company) এবং অপরটি হইল ঘরোয়া সীমিত কোম্পানী (Private Limited Company)। সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীতে আইনের কড়াকড়ি খুব বেশী। যেমন, ইহাকে বিজ্ঞাপনী প্রচার করিতে হয়, নিবন্ধনের সময় ডিরেক্টরদের নামের তালিকা ও উহাদের সম্মতিসূচক পত্র দাখিল করিতে হয়, অভিজ্ঞানপত্র পাওয়ার পরও ইহা কারবার আরম্ভ করিতে পারে না। ডিরেক্টরের সংখ্যা সরকারী অনুমোদন ভিন্ন বৃদ্ধি করিতে পারে না, ইহাকে বিধিবদ্ধ সভা আহ্বান

করিতে হয়, আবর্তন প্রথায় ইহার ডিরেক্টরদের অবসর গ্রহণ করিতে হয় ইত্যাদি নানাবিধ বাধা-নিষেধ ইহার আছে। ঘরোয়া সীমিত কোম্পানীতে এ সকল বাধা-নিষেধ নাই। এজন্য ঘরোয়া সীমিত কোম্পানীই অনেকে পছন্দ করেন এবং জনপ্রিয়। ঘরোয়া সীমিত কোম্পানীর বিশেষ কতকগুলি সুবিধাও আছে। ইহা অংশীদারী কারবারের মত, অথচ ইহাতে দায় সীমিত। অংশীদারী কারবার অপেক্ষা ইহার সভ্যসংখ্যা বেশী। এজন্য অপেক্ষাকৃত অধিক মূলধন সংগ্রহের ইহার সুবিধা আছে। বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমাবেশ হওয়ারও ইহাতে কোন বাধা নাই। ইহার সভ্যরা প্রধানত পরস্পরের পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এজন্য মালিকানা হইতে নিয়ন্ত্রণের পৃথকীকরণ খুব কমই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় (The ownership of the company is not usually separated from its control)। এরূপ কারবারের স্থায়িত্বও অংশীদারের মৃত্যু, অবসর, দেউলিয়া প্রভৃতির জন্য বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা নাই। সুতরাং এরূপ কারবারের মালিকানা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে। এই সকল কারণে ইহা অংশীদারী কারবার ও সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী অপেক্ষা অধিক জনপ্রিয়। সুতরাং কারবার সংগঠনে অংশীদারী কারবার ও ব্যাপক মালিকানার সার্বজনিক কোম্পানীর মধ্যবর্তী অবস্থান হিসাবে ঘরোয়া কোম্পানী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ (Position of a private company as an intermediary form of business organisation between a partnership and a widely-owned public company is really very significant)।

ঘরোয়া কোম্পানী নানা দিক দিয়া সার্বজনিক কোম্পানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। নিম্নের আলোচনা হইতে উহা মোটামুটি বুঝিতে পারা যাইবে :

১। **গঠন প্রণালী (Method of Formation) :** এ ব্যাপারে ঘরোয়া কোম্পানী শ্রেষ্ঠতর। কারণ ঘরোয়া কোম্পানীর তুলনায় সার্বজনিক কোম্পানী গঠন বেশী জটিলতাপূর্ণ। ঘরোয়া কোম্পানী গঠনের জন্য নিম্নতম সভ্যসংখ্যা প্রয়োজন ২ জন। কিন্তু সার্বজনিক কোম্পানীর জন্য প্রয়োজন ৭ জন। ৭ জনের মিলিত প্রচেষ্টা একত্র করা অপেক্ষা ২ জনের মিলিত প্রচেষ্টা একত্র করা স্বভাবতই সহজতর। কোম্পানী গঠন ও নিবন্ধনের জন্য সার্বজনিক কোম্পানীকে প্রথম ডিরেক্টর যাঁহারা হইবেন তাঁহাদের নামের তালিকা ও সম্মতিসূচক পত্রাদি পেশ করিতে হয়। কিন্তু ঘরোয়া কোম্পানীর জন্য ইহা প্রয়োজন নাই। উক্ত প্রথম ডিরেক্টরগণ যে তাঁহাদের যোগ্যতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক 'শেয়ার' লইতে ইচ্ছুক তাহার চুক্তিপত্রও সার্বজনিক কোম্পানীকে সংগ্রহ করিতে হয়। ঘরোয়া কোম্পানীর ইহা প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞাপনী প্রচার করারও দায়িত্ব সার্বজনিক কোম্পানীর আছে। ঘরোয়া কোম্পানীর উহার প্রয়োজন নাই। অভিজ্ঞানপত্র (Certificate of Incorporation) পাওয়ার পর ঘরোয়া কোম্পানী কারবার আরম্ভ করিতে পারে

কিন্তু সার্বজনিক কোম্পানীকে সর্বনিম্ন মূলধন সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। সুতরাং ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঘরোয়া কোম্পানী গঠনের সরলতার জন্যই ইহা গঠন প্রণালীর দিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে।

২। **দায় (Liability)**: এ ব্যাপারে উভয় কোম্পানীর অবস্থা একরূপ। সাধারণত এতদ-উভয়ের শেয়ার-গ্রহীতাদের দায় সীমিত।

৩। **মূলধন সরবরাহ (Supply of Capital)**: অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহের সুযোগ-সুবিধা সার্বজনিক কোম্পানীরই বেশী। যেখানে কারবার বৃহৎ হওয়া প্রয়োজন এবং তদনুযায়ী প্রচুর মূলধন প্রয়োজন সেক্ষেত্রে সার্বজনিক কোম্পানীই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ঘরোয়া কোম্পানীর এই দিক দিয়া সুবিধা এই যে, ইহার শেয়ার অবাধ হস্তান্তরযোগ্য নয় বলিয়া সভ্যদের মধ্যে ইহা প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করিতে পারে। ফলে পরস্পরের সহযোগিতায় প্রয়োজনমত মূলধনও ইহারা সরবরাহ করিতে পারে।

৪। **পরিচালনা (Management)**: ঘরোয়া কোম্পানীর সভ্যগণ সাধারণত পরস্পরের পরিচিত এবং নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এজন্য মালিকানা ও পরিচালনার মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইতে পারে না। ফলে মালিকদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সার্বজনিক কোম্পানীর সভ্যগণ সংখ্যায় অধিক এবং বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে মালিকানা ও পরিচালনার মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয় এবং মালিকদের স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়। এইভাবে বিচার করিলে পরিচালনার দিক দিয়া ঘরোয়া কোম্পানীই শ্রেষ্ঠতর।

৫। **নিয়ন্ত্রণ (Control)**: কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণক্ষমতার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব পরিচালকমণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত। যেখানে মালিকানা ও পরিচালনার মধ্যে ব্যবধান বিরাট সেখানে নিয়ন্ত্রণেও শিথিলতা আসিয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলী শুধু সভায় বসিয়া উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নির্দেশমত বিভিন্ন নীতি ও কর্মপদ্ধতি পাশ করেন। এইভাবে কিছুদিন চলার পর উহারা কোম্পানী সম্বন্ধে অজ্ঞ হইয়া পড়েন। ফলে প্রকৃত মালিক শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। ঘরোয়া কোম্পানীতে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়াও ঘরোয়া কোম্পানী শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে।

কারবারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে যৌথ মূলধনী কারবারের জনপ্রিয়তা (Popularity of Joint Stock Company as a form of business organisation)

বেসরকারী মালিকানা কারবারের মধ্যে একক-মালিকানা, অংশীদারী কারবার এবং যৌথ মূলধনী কোম্পানী কারবারী ক্ষেত্রে বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়া আছে। উহাদের মধ্যে বর্তমান কালে সীমিত যৌথ মূলধনী কারবারই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি উহার জন্য অনেকাংশে দায়ী:

১। **গঠনগত সুবিধা** (**Facility of Formation**): কোন কারবার গঠনের দিক দিয়া সুবিধাজনক হইলে উহাই বেশী সংখ্যায় স্থাপিত হয় এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করে। একক-মালিকানা ও অংশীদারী কারবার গঠনে কোন প্রকার আইনের বিশেষ ঝামেলা নাই সত্য কিন্তু উহা গঠিত হইলেও উহার কোন নিজস্ব সত্তা আইনে স্বীকৃত হয় না। কিন্তু যৌথ মূলধনী কারবার গঠনে আইনের অনেক ঝামেলা থাকে এবং উহাকে আইনের অনেক খুঁটিনাটির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয় সত্য কিন্তু একবার গঠিত হইলে উহা আইনত পৃথক সত্তা লাভ করে এবং কৃত্রিম ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে। ইহার এই পৃথক সত্তার সুবিধার জন্য ইহা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিতে পারে এবং কৃতকার্যতার সহিত দীর্ঘমিয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে। বড় বড় যৌথ মূলধনী কারবার এইভাবেই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

২। **সীমিত দায়** (**Limited Liability**): একক-মালিকানা ও অংশীদারী কারবারে মালিকের দায় অসীমিত (Unlimited)। ফলে এরূপ কারবার বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার। অনেকেই এরূপ কারবারে অর্থ নিয়োগ করিতে ইতস্তত: করেন। অসীমিত দায়ের জন্য এরূপ কারবার বেশী বড় হইতে পারে না এবং বড় রকমের ঝুঁকির কারবারে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না। কিন্তু যৌথ মূলধনী কারবারে উহার মালিক *অর্থাৎ শেয়ার-গ্রহীতার দায় ক্রীত শেয়ারের মূল্য পর্যন্ত সীমিত*। স্বল্প পরিমাণ অর্থও এরূপ কারবারে নিয়োগ করা চলে। ইহার এই সীমিত দায়ই ইহার বিশেষ সুবিধা যাহা জনপ্রিয়তালাভে বিশেষ কার্যকরী দেখা যায়।

৩। **মূলধন সরবরাহ** (**Supply of Capital**): একক-মালিকানা ও অংশীদারী কারবারে মূলধন সরবরাহের সুবিধা কম। এজন্য কারবার বিশেষ বড় হইবার সুযোগ পায় না। যৌথ কারবারে এরূপ অসুবিধা নাই। ইহাতে প্রচুর মূলধন সরবরাহের সুবিধা আছে এবং প্রচুর মূলধন লইয়া বৃহৎ কারবার গঠনের সুযোগ-সুবিধাও আছে।

৪। **সভ্যসংখ্যা** (**Number of Members**): একক-মালিকানায় সভ্যসংখ্যা একজন এবং অংশীদারী কারবারে ২০ জনের বেশী সভ্য হওয়ার নিয়ম নাই। কিন্তু যৌথ কারবারে সভ্যসংখ্যা শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ। মোটের উপর ইহাতে সভ্যসংখ্যা অনেক। কম সংখ্যক সভ্য থাকিলে মূলধন সংগ্রহ কম হয়, কিন্তু উহারা প্রত্যক্ষভাবে কারবার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন এবং কারবারের মুনাফালাভের পরিমাণ ও যোগ্যতা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে পারেন। যৌথ কারবারে সভ্যসংখ্যা অধিক থাকায় মূলধন যোগানের সম্ভাবনা বেশী। সভ্যরা অবশ্য এখানে প্রত্যক্ষভাবে কারবারে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না এবং মুনাফালাভের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনুভব করিতে পারেন না। কারণ ইহাতে মালিকানা ও পরিচালনার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। কিন্তু যৌথ কারবারের মত বৃহৎ কারবারের পক্ষে অধিক সংখ্যায় লোক নিয়োগ করা সম্ভব এবং উহাদের মধ্যে অনেক দক্ষ ও

অভিজ্ঞ কর্মচারীও থাকে। উহাদের কর্মদক্ষতার ফলে কারবারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই ঘটিয়া থাকে এবং সভ্যগণের নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও উহারা বেশ মোটা লভ্যাংশই পাইয়া থাকেন। এজন্য এ কারবারের জনপ্রিয়তা বেশী।

৫। **মালিক ও কর্মচারীর মধ্যে নিকট সম্পর্ক (Close relationship between the Employers and the Employees):** মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে নিকট সম্পর্ক একক-মালিকানা ও অংশীদারী কারবারে যৌথ কারবারের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু এই নিকট সম্পর্ক সত্ত্বেও যে কারবারের শ্রীবৃদ্ধি ইহাতে বেশী হইয়া থাকে এরূপ দৃষ্টান্ত খুব বেশী দেখা যায় না। কারবারের উন্নতি নির্ভর করে কর্মদক্ষতা ও কর্মস্পৃহার উপর। উহা আবার নির্ভর করে কারবারের উত্তম আভ্যন্তরীণ সংগঠন, সুস্থ ও স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়া, কর্মচারীদের সন্তুষ্টিবিধানের উপযুক্ত বেতনাদি ইত্যাদির উপর। এ সকল অবস্থার সুযোগ-সুবিধা বৃহৎ কারবারে যতটা সম্ভব ছোট কারবারে সেরূপ সম্ভব নয়। বৃহৎ কারবারে এরূপ পরিস্থিতি অনেকক্ষেত্রে ভাল বলিয়াই উহা দক্ষতার সহিত মুনাফা অর্জন করিতে পারে এবং স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সাহায্যও করিতে পারে। এই সকল কারণে ইহা এতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

৬। **স্থায়িত্ব (Stability):** একক-মালিকানা কারবারের স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ও যোগ্যতার উপর অনেকটা নির্ভর করে। অংশীদারী কারবারেরও মতানৈক্য, মৃত্যু, দেউলিয়া প্রভৃতি যে কোন কারণে অবসান ঘটিতে পারে; সুতরাং উহাদের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। কিন্তু যৌথ কারবারে এই সকল অসুবিধা নাই এবং উহা পুরুষানুক্রমে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইয়া জনপ্রিয়তালাভে সক্ষম হইতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, যেখানে ব্যক্তিগত সতর্কতা ও মনোযোগ এবং খরিদ্দারদের বিভিন্ন রুচি ও ইচ্ছাপূরণ প্রয়োজন সেরূপ ক্ষেত্রে একক-মালিকানা বা অংশীদারী কারবারের সুবিধা বেশী। কিন্তু যেখানে কারবার বৃহৎ ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার প্রয়োজন সেখানে যৌথ কারবারের সীমিত দায়, প্রচুর মূলধন, পৃথক সত্তা, দক্ষ পরিচালনা ও স্থায়িত্বের জন্য উহা শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে। এজন্য কোনও কারবারী প্রতিষ্ঠান কোন্ মালিকানায় হইবে উহার বিচার করিতে হইলে উপরি-উক্ত আলোচনা কিছু সুফল প্রদান করিবে। মনে করি, **মাঝারি আকারের একটি কার্পাস বস্ত্রশিল্প স্থাপন প্রয়োজন। উহা অংশীদারী কারবার হিসাবে স্থাপিত হইবে, না সীমিত কোম্পানী হিসাবে স্থাপিত হইবে?** নিম্নের আলোচনা হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মাঝারি আকারের কারবার বলিতে যাহার মূলধন ৭½ লক্ষ টাকা হইতে ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে থাকে সাধারণত তাহাকে বুঝায়। সুতরাং মাঝারি আকারের একটি কার্পাস বস্ত্রশিল্প স্থাপন করার জন্য যে জমি-জায়গা, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন হইবে তাহাতে উক্ত ৭½ লক্ষ টাকা হইতে ২০ লক্ষ টাকার মধ্যেই উহার

মূলধন প্রয়োজন হইবে। ইহা যদি অংশীদারী কারবার হিসাবে স্থাপিত হয় তবে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে:

১। এরূপ কারবার গঠনে আইনের কড়াকড়ির মধ্যে পড়িতে হইবে না। অংশীদারগণের সমবেত প্রচেষ্টা কার্যকরী হইলেই ইহা স্থাপিত হইতে পারে। শুধু স্থান নির্ণয় ও কারখানা প্রস্তুত করিতে যাহা কিছু ঝামেলা।

২। পরস্পরের সম্মতি লইয়া ইহার প্রসারণ ও সংকোচন আনায়াসেই সম্ভব হইতে পারে।

৩। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করা বা মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে একটা সুখময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করাও ইহার পক্ষে অনায়াসে সম্ভব হইবে।

৪। ইহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে কারবার পরিচালনাও সম্ভব হইবে। কারণ ইহাকে ট্যাক্স ইত্যাদি কমই দিতে হইবে এবং ডিরেক্টর, শেয়ার-গ্রহীতা প্রভৃতি সভার ব্যয়ও নির্বাহ করিতে হইবে না।

কিন্তু উপরি-উক্ত সুবিধাগুলি থাকিলেও ইহার নিম্নলিখিত কতকগুলি অসুবিধাও আছে।

১। মতানৈক্য, মৃত্যু, দেউলিয়া প্রভৃতির জন্য হঠাৎ কারবারের অবসান ঘটিতে পারে। সুতরাং এরূপ কারবারের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। কার্পাস-বস্ত্র শিল্পের পক্ষে অবশ্য দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকাই লাভজনক।

২। অসীমিত দায়ের জন্যও এরূপ সম্প্রসারণে বিঘ্ন দেখা দিতে পারে। আইনের চক্ষে ইহার কোন পৃথক সত্তা থাকিবে না। উপরি-উক্ত অসুবিধার জন্য অংশীদারী হিসাবে এরূপ কারবার স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। কারবারের সাধারণ কাম্য জিনিস সম্প্রসারণ। যে কারবার সমাজের অভাব পূরণ করিবে উহাকে সমাজের চাহিদা বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া কারবার সম্প্রসারণের এবং স্থায়িভাবে উহা পরিচালনার সুযোগ-সুবিধা লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। সুতরাং অংশীদারী কারবারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, অসীমিত দায় এবং মূলধন সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি নানাদিক দিয়াই এরূপ কারবারের অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে। এজন্য ইহা সীমিত কোম্পানীর ভিত্তিতেই স্থাপিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে নিম্নলিখিতরূপ সুবিধাগুলি পাওয়া যাইবে:

১। ইহার সীমিত দায় কারবারের নানা প্রকার ঝুঁকি বহনের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে।

২। অনেক ব্যক্তির মধ্যে শেয়ার বিক্রয় করিয়া ইহা প্রয়োজনীয় মূলধনও সংগ্রহ করিতে পারিবে।

৩। আইনের চক্ষে ইহা পৃথক সত্তা লাভ করিবে।

৪। ইহা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবার সুবিধা পাইবে। কোন সভ্যের মৃত্যু, দেউলিয়া বা মতানৈক্যের জন্য কারবারের অবসান ঘটিবে না।

৫। ইহার পক্ষে দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করাও সম্ভব হইবে।

৬। কারবার বড় হওয়ার সুযোগ ইহাতে থাকিবে এবং কারবার বড় হইলে ইহার আনুপাতিক ব্যয় এবং পণ্য উৎপাদনের ব্যয় অনেক কম পড়িবে। ইহাতে খরিদ্দারগণ সস্তায় পণ্য ক্রয় করিতে পারিবে।

৭। সীমিত কোম্পানী গণতন্ত্রমূলক। ফলে নূতন ও বিচক্ষণ শেয়ারগ্রহীতাগণ অনায়াসে নির্বাচনপ্রার্থী হইয়া পরিচালনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। কারবারের ও সমাজের কল্যাণ এইভাবেই সাধিত হইয়া থাকে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. Define Joint Stock Company and elucidate the merits and demerits of it in comparison with other forms of business.

[N. B. B. Com. 1969]

যৌথ কোম্পানীর সংজ্ঞা দাও এবং অন্যান্য কারবারের তুলনায় ইহার সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ কর।

2. Discuss the nature of a Limited Company. Mention its different types. Do you think that a limited company can dispense with the word 'Limited' from its name ? [N. B. B. Com. 1968]

সীমিত কোম্পানীর প্রকৃতি আলোচনা কর। ইহার বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ কর। সীমিত কোম্পানী কি উহার নাম হইতে সীমিত কথাটা বাদ দিতে পারে ?

3. Explain the steps necessary to be followed in forming a public limited company. [B. U. B. Com. (Pass) 1971]

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী গঠনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা কর।

4. Limited liability idea has given a great impetus to company formation. Explain the idea of limited liability.

সীমিত দায়ের ধারণা কোম্পানী গঠনে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। সীমিত দায়ের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

5. Outline the steps leading to the formation of a Public Limited Company and issue by it of shares.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1966]

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী গঠনে এবং উহার শেয়ার বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলির বিবরণ দাও।

6. Discuss the principal contents of the Memorandum and Articles of Association of a Public Limited Company.

[B. U. B. Com. (Pass) 1971]

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর স্মারকলিপি ও আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীর বিভিন্ন দফাগুলি আলোচনা কর।

7. Discuss the principal contents of the Prospectus of a cotton mill which you want to promote as a Public Limited Company.

[C. U. B. Com. (Pass) 1968]

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী হিসাবে একটি কাপড়ের কল স্থাপন করিতে হইলে উহার বিজ্ঞাপনীতে যে বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে উহার আলোচনা কর।

8. Explain in what respects a partnership business has got some advantages as well as disadvantages over Public Limited Companies. [C. U. B. Com. (Hons.) 1967]

কোন্ কোন্ বিষয়ে সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর তুলনায় অংশীদারী কারবারের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে উহা ব্যাখ্যা কর।

9. Is there any tendency in India at present to convert Partnership type of business into Limited Liability concerns? If so, give reasons for such a change.

বর্তমানে ভারতে কি অংশীদারী কারবারগুলির সীমিত দায়যুক্ত কোম্পানীতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়? যদি তাহাই হয় তবে এরূপ প্রবণতার কারণ দর্শাও।

10. Why private limited companies are still popular in India as compared to partnership and public limited companies?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1964]

অংশীদারী কারবারের ও সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর তুলনায় ঘরোয়া সীমিত কোম্পানী এখনও বেশী জনপ্রিয় কেন?

11. It is stated that of late private limited companies are

becoming increasingly popular in India. Do you agree with this view ? Give reasons for your answer.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1966]

ইহা বলা হয় যে, ঘরোয়া সীমিত কোম্পানী ইদানীং বেশী জনপ্রিয় হইতেছে। তুমি কি ইহা সমর্থন কর ? তোমার উত্তরের যুক্তি দেখাও।

12. Analyse the significance of a private company as an intermediary form of business organisation between a partnership and a widely-owned public company.

[C. U. B. Com. (Pass) 1971]

কারবার সংগঠনে অংশীদারী কারবার ও ব্যাপকমালিকানায় সার্বজনিক কোম্পানীর মধ্যবর্তী অবস্থান হিসাবে ঘরোয়া কোম্পানীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

13. Do you think that from the point of view of method of formation, liability, supply of capital, management and control, a Private Limited Company is better than a Public Limited Company ? Give reasons for your answer.

[C. U. B. Com. (Pass) 1963]

গঠনপ্রণালী, দায়, মূলধন সরবরাহ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়া বিচার করিলে সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী অপেক্ষা ঘরোয়া সীমিত কোম্পানী কি শ্রেষ্ঠতর ? তোমার উত্তরের কারণ দর্শাও।

14. Discuss the distinctive features that have made the company form of business superior to other forms.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1970, 1973]

অন্যান্য কারবারের তুলনায় যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য কোম্পানীকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছে উহা আলোচনা কর।

15. Should a medium-sized cotton textile mill be established on a partnership basis or as a Limited Company ? Give reasons for your answer.

মাঝারি আকারের একটি কার্পাসবস্ত্র কারখানা কি অংশীদারী কারবার হিসাবে স্থাপিত হইবে, না সীমিত কোম্পানী হিসাবে স্থাপিত হইবে ? তোমার উত্তরের কারণ দর্শাও।

16. What advantages partnership firms have over Public Limited Companies ? [C. U. B. Com. (Pass) 1968]

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী অপেক্ষা অংশীদারী কারবারের কি সুবিধা ?

17. What are the advantages a sole proprietor business enjoys over partnership firms? Do you think that a Private Limited Company would be a better form of organisation? Give reasons for your answer. [C. U. B. Com. (Hons.) 1968]

অংশীদারী কারবার অপেক্ষা একক-মালিকানা কারবারের কি সুবিধা ? ঘরোয়া সীমিত কোম্পানী কি অপেক্ষাকৃত ভাল কারবারী প্রতিষ্ঠান ? তোমার উত্তরের কারণ লিখ।

18. Point out the special advantages enjoyed by Private Limited Companies in India as against Public Limited Companies. [B. U. B. Com. (Pass) 1970]

ভারতে সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর তুলনায় ঘরোয়া সীমিত কোম্পানীর বিশেষ সুবিধা উল্লেখ কর।

অষ্টম অধ্যায়

সমবায় কারবার

(Co-operative Form of Business)

সমবায় সমিতি ও উহার বৈশিষ্ট্য (Co-operative Society and its Essential Features)

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত উৎপাদক, ক্রেতা এবং শ্রমিকদের নানারূপ প্রতিযোগিতা ও সমস্যার সম্মুখীন হইতে দেখা যায়। এবংবিধ অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে তাহাদের সংঘবদ্ধ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। নিজেদের সুযোগ-সুবিধা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানাবিধ উন্নতি সাধনের জন্য পরস্পর মিলিত হইয়া সংঘবদ্ধ হইলে তাহাকে আমরা **সমবায় সমিতি** (Co-operative Society) বলিয়া থাকি। দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক, কুটিরশিল্পী অথবা ক্রেতা প্রভৃতি একক চেষ্টার দ্বারা যাহা করিতে সক্ষম নন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁহারা অনায়াসে উহা সম্পন্ন করিতে পারেন—এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু সমবায় প্রচেষ্টা কতকগুলি মৌলিক নীতির (Fundamental Principles) উপর ভিত্তি করিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে। **নীতিগুলি** সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) **একতা :** একতাই বল। সমাজের দরিদ্রতম ব্যক্তিগণও একতাবদ্ধ হইলে ধনীর অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে অনায়াসে দাঁড়াইতে পারেন এবং অনেকক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করিতে পারেন।

(২) **ঐচ্ছিক :** সমবায় প্রচেষ্টার সভ্যগণ নিজের ইচ্ছায় উহার সভ্য হইয়া থাকেন। এখানে কোন জোরজবরদস্তির প্রয়োজন হয় না।

(৩) **সাম্য :** ইহাতে প্রত্যেক সভ্যের অধিকার ও মর্যাদা সমান।

(৪) **একত্ববোধ :** এখানে প্রত্যেকেই সকলের তরে এবং সকলেই প্রত্যেকের তরে এরূপ মনোভাবের প্রয়োজন।

(৫) **মিতব্যয়িতা :** মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় তৎপ্রতি সকলের মনোযোগ দিতে হইবে।

(৬) **শান্তি :** পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ না জন্মে এবং কোনপ্রকার প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব না আসে সেদিকে দৃষ্টি দিয়া শান্তিপ্রিয়ভাবে কাজ-কারবার চালানোই ইহার অবশ্য কর্তব্য বিষয়।

উপরি-উক্ত নীতিগুলি ছাড়া এরূপ কারবারের নিম্নলিখিত **বৈশিষ্ট্যগুলি** উল্লেখযোগ্য :

(১) ইহা গঠন করার জন্য অন্তত দশজন সভ্যের প্রয়োজন হয়।

(২) ইহার শেয়ারের মূল্য যথাসম্ভব কম করার নিয়ম, যাহাতে স্বল্প আয়ের ব্যক্তিগণও ইহার সভ্য হইতে পারেন। শেয়ার-ক্রেতাগণই এরূপ সমিতির সভ্য বা মালিক। ইহার শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নহে। শেয়ার সমিতিতে ফেরতযোগ্য।

(৩) সভ্যদের দায় সীমাবদ্ধ বা অসীমিত হইতে পারে। সাধারণত পল্লী অঞ্চলের সমিতির সভ্যদের দায় অসীমিত এবং শহরাঞ্চলের সমিতির সভ্যদের দায় সীমাবদ্ধ।

(৪) এরূপ সমিতির পরিচালনা সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত থাকে। সাধারণতঃ প্রতি সভ্যের একটি করিয়া ভোট দেওয়ার অধিকার থাকে। পরিচালকমণ্ডলীর একজন সভাপতি ও কর্মসচিব থাকেন। কর্মসচিবই অফিসের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করেন, প্রয়োজনমত পরিচালকমণ্ডলীর সভা আহ্বান করেন এবং সভায় সঙ্কল্প পাশ দ্বারা নীতি-নির্দেশ গ্রহণ করেন।

(৫) প্রতি বৎসর নূতন পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়।

(৬) সভ্যদের সাধারণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই এরূপ সমিতি গঠিত হয়। ইহাতে মুনাফা অর্জনের প্রবৃত্তি কম থাকে। এরূপ সমিতির যে মুনাফা হয় উহার এক অংশ সঞ্চয় তহবিলে জমা হয়, এক অংশ সভ্যদের শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মঙ্গলবিধানের কাজে ব্যয়িত হয় এবং এক অংশ সভ্যদের ক্রীত শেয়ারের অনুপাতে লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টিত হয়।

(৭) আইনত এরূপ সমিতির পৃথক সত্তা স্বীকৃত হয় এবং স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহার কাজ-কারবার চলার কোন বাধা নাই। ইহাকে অবশ্য সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রারের নিকট রেজেস্ট্রী করাইয়া লইতে হয়। এজন্য কোন ফি দিতে হয় না।

বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতি (Different kinds of Co-operative Societies)

বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) উৎপাদকদের সমবায় সমিতি (Producers' Co-operative Societies) : শিল্পী বা শ্রমিকগণ কোনও জিনিস উৎপাদনের জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া সমবায় সমিতি গঠন করিলে উহাকে 'উৎপাদকদের সমবায় সমিতি' বলে। এক্ষেত্রে উহারা নিজেরাই মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকেন, কারবারের কাজকর্ম পরিচালনা করিয়া থাকেন এবং লাভের সমস্ত অংশই নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লন। কৃষি এবং কুটিরশিল্পে যেখানে 'বৃহৎ কারবারের' প্রতিযোগিতার ভয় নাই, সেই স্থলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদের দ্বারাই এরূপ সমিতি গঠিত হয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ভিন্ন এরূপ সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিতে পারে না।

(২) **সম্ভোগকারীদের সমবায় সমিতি** (Consumers' Co-operative Society): মধ্যস্থকারবারীর (Middleman) মুনাফার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং কম মূল্যে জিনিস পাইবার উদ্দেশ্যে সম্ভোগকারিগণ যে সমবায় সমিতি গঠন করেন তাহাকে 'সম্ভোগকারীদের সমবায় সমিতি' বলে। এরূপ সমিতিতে কোনও স্থানের ক্রেতাগণ মিলিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা পাইকারী ব্যবসায়ী ও উৎপাদকের নিকট হইতে কম দামে বেশী পরিমাণ খাঁটি ও নির্ভেজাল জিনিস ক্রয় করিয়া সমিতির বিপণিতে মজুত রাখেন। সেখান হইতে সকলে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী মাল খরিদ করিয়া থাকেন। মাল বিক্রয় অবশ্য বাজার দরেই হইয়া থাকে এবং সমিতির বাহিরের লোকজনের নিকটও বিক্রয় হইয়া থাকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় চাল, ডাল, মশলা, দুগ্ধ, ঘৃত, ষ্টেশনারী প্রভৃতি জিনিস এই সমস্ত বিপণিতে বিক্রয়ের জন্য মজুত থাকে। সমিতির সভ্যগণ প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকেন এবং কারবার পরিচালনা করিয়া থাকেন। সমিতির লাভ সভ্যদের মধ্যে বণ্টিত হয়।

(৩) **শিল্প-সংক্রান্ত সমবায় সমিতি** (Industrial Co-operatives): ইহাও একপ্রকার উৎপাদকদের সমবায় সমিতি। এরূপ সমবায় সমিতি প্রধানত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-মালিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এরূপ সমবায় সমিতি গঠনের বিশেষ উদ্দেশ্য হইতেছে যে, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্বারা বৃহদায়তন শিল্পের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্প যাহাতে ইহাদিগকে হটাইয়া না দিতে পারে তজ্জন্য সংঘবদ্ধভাবে উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করা। ইহার বিশেষ কাজ হইল ইহার সদস্যভুক্ত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা এবং উহাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। তাঁত শিল্পের মধ্যেই এরূপ সমবায় সমিতি অধিক প্রসারলাভ করিতেছে।

(৪) **ঋণদান সমবায় সমিতি** (Co-operative Credit Society): আমাদের দেশে প্রথমে যখন সমবায় সমিতির প্রচলন হয় এবং তজ্জন্য ১৯০৪ সালে একটি আইন পাশ হয়, সেই আইন অনুযায়ী কৃষক ও কুটিরশিল্পের কারিগরগণ যাহারা মহাজনদের কবলে পড়িয়া সর্বস্বান্ত হইতেছিল তাহাদিগকে ঋণ দেওয়ার জন্য এরূপ সমিতি গঠিত হয়। সমিতির সভ্যদিগকে ঋণদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সভ্যদিগের প্রবেশ মূল্য, শেয়ার-বিক্রয়ের মূল্য, সমিতি কর্তৃক গৃহীত আমানত এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত ঋণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয়। যাহার ফলে সভ্যদের আয় বৃদ্ধি হইবে এরূপ ক্ষেত্র ভিন্ন অন্য কোন বাজে খরচের জন্য সভ্যদিগকে ঋণ দেওয়া হয় না। প্রত্যেক সভ্যকে তাহার সুবিধামত কিস্তিতে ঋণ শোধ করার সুবিধা দেওয়া হয়। কোন গ্রামের বা পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের দশ বা ততোধিক সভ্য লইয়া এরূপ সমিতি গঠিত হইতে পারে। সমিতির মোট মুনাফার এক-চতুর্থাংশ সংরক্ষিত তহবিলে রাখিয়া বাকী অংশ অংশীদারগণকে লভ্যাংশ হিসাবে দেওয়ার নিয়ম আছে। ইহাদের হিসাবপত্র সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হিসাব পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত হয়। ইহাদিগকে আয়কর, ষ্ট্যাম্পকর প্রভৃতি দিতে হয় না।

(৫) **অঋণদান সমবায় সমিতি** (**Non-Credit Co-operative Society**) : ১৯১২ সালে সমবায় সম্বন্ধে যে আইন পাশ হয় তাহাতে ঋণদান সমিতি ভিন্ন অন্যান্য সমিতিও গঠন করার অনুমতি দেওয়া হয়। তাহার ফলে অঋণদান সমিতিও গঠিত হয়। ইহাদের প্রধান কাজ কৃষক সভ্যদের মধ্যে প্রয়োজন-মত বীজ, সার, চাষের যন্ত্রপাতি এবং কুটিরশিল্পীদের মধ্যে সূতা, তাঁত প্রভৃতি সরবরাহ করা এবং তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।

ইহা ছাড়া বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গঠিত হইতে পারে, যেমন, সেচপ্রণালী সমিতি, গো বীমা সমিতি, একত্রীকরণ সমিতি, পুস্তক বিক্রয় সমিতি, দুগ্ধসরবরাহ সমিতি, ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি ইত্যাদি।

(৬) **বহুমুখী সমবায় সমিতি** (**Multipurpose Co-operative Society**) : 'রয়াল কমিশন অব এগ্রিকালচারের' (Royal Commission of Agriculture) সুপারিশ অনুযায়ী আমাদের দেশে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য পৃথক পৃথক সমবায় সমিতি গঠন করার রীতিই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে কোন স্থানের বা গ্রামের লোকদের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন মিটানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার সমিতি গঠন করিয়া তাহাদের সভ্য হইতে হয়। নিরক্ষর গ্রামবাসীদের পক্ষে এরূপ বিভিন্ন প্রকার সমিতি গঠন করা অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। ফলে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি—যাহার উপর সমগ্র দেশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে, তাহা কখনই সম্ভব হইতেছে না। তাই বর্তমানকালে অনেকের মতে বহুমুখী সমিতি গঠন করা যুক্তিযুক্ত মনে হইতেছে। 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' এবং 'মাদ্রাজ কমিটি অব কো-অপারেশন' এরূপ সমিতি স্থাপনের পক্ষপাতী। অধ্যাপক সি. আর. ফে (Prof. C. R. Fay)-ও তাঁহার 'কো-অপারেশন' (Co-operation) নামক পুস্তকে জার্মানী, নিউজিল্যাণ্ড, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে এরূপ বহু সমিতি প্রকৃত জনহিতকর কাজ করিতেছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের 'ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশন'ও এরূপ সমিতি গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। এরূপ সমিতির কাজ হইবে ঋণ দেওয়া, সার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহ করা, উন্নত কৃষির ব্যবস্থা করা, উৎপন্নদ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান প্রভৃতির উন্নতি করা। গ্রামবাসীদের সর্বপ্রকার নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এই সমিতি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

সমবায় সমিতির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Co-operative Society)

যেরূপ সমিতিই হউক না কেন উহাদের মধ্যে সাধারণত নিম্নলিখিত সুবিধা ও অসুবিধাগুলি দেখিতে পাওয়া যায় :

সুবিধা :

সমবায় সমিতির সুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

(১) সমিতি হইতে কম সুদে ঋণ পাওয়ার সুবিধা থাকায় সভ্যগণ মহাজনদের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে এবং মহাজনদের প্রতিপত্তিও হ্রাস পাইয়া থাকে।

(২) ইহাতে গ্রামবাসীদের মধ্যে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়। কারণ তাহাদের স্বল্প সঞ্চয় তাহারা অনায়াসে সমিতিতে জমা রাখিয়া সুদ পাইতে পারে। চোরের ভয়ে নানাস্থানে লুকাইয়া রাখার এবং সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকার প্রয়োজন হয় না।

(৩) যেখানে সমবায় সমিতি আছে সেখানকার লোকেরা সমবায়ের কার্যকলাপ দেখিয়া যে শিক্ষা পায় তাহাতে তাহারা অধিক সংখ্যক সমবায় সমিতির সভ্য হইতে চেষ্টিত হয়। ফলে সে অঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি অনায়াসসাধ্য হয়। কারণ সমিতির মারফত তাহারা প্রয়োজনীয় ঋণ, সার, যন্ত্রপাতি, সুতা, তাঁত, অল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী এবং বস্ত্রাদি সমস্তই পাইতে পারে।

(৪) সমবায় সমিতি কোন বাজে খরচের জন্য ঋণ দেয় না। ফলে সভ্যদের মধ্যে মিতব্যয়ের অভ্যাস হয়। ইহাতে মামলা-মোকদ্দমা এবং অপব্যয়ের বদ অভ্যাস খুবই হ্রাস পায়। বহুস্থানের বিবাদ-বিসংবাদ সালিশী দ্বারা মিটাইয়া ফেলা সম্ভব হয়। শ্রাদ্ধ ও বিবাহ উপলক্ষ্যে অর্থব্যয় নিয়ন্ত্রিত হয়। সমিতির কার্যকলাপ ভালভাবে চলিলে সভ্যদিগের মধ্যে অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস, সৎপ্রবৃত্তি প্রভৃতি গুণের বিকাশ হইতে পারে।

(৫) উৎপাদকগণ তাঁহাদের পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন এবং সম্ভোগকারিগণ সস্তাদামে নির্ভেজাল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং এইভাবে সমবায় পদ্ধতির কারবার নানাভাবে সমাজের উপকার সাধন করিয়া থাকে এবং নানাবিধ সেবা পরিবেশন করিয়া থাকে।

অসুবিধা :

সমবায় সমিতির অসুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

(১) অনেক গ্রামবাসী নিরক্ষর। তাহারা সমবায়ের আদর্শ কমই বুঝিয়া থাকে। ফলে তাহাদের দ্বারা কখনই সমবায় সমিতি গঠন করা সম্ভব হয় না। যে সমস্ত সমবায় সমিতি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায় উহা অনেকক্ষেত্রে কতিপয় স্বার্থ-প্রণোদিত লোকের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। তাঁহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে সমবায় সমিতির প্রয়োজন নাই। নিরক্ষর গ্রামবাসীদের টাকা আত্মসাৎ করিবার জন্যই তাঁহারা বেশী ব্যস্ত থাকেন। সেজন্য শহরাঞ্চলের কোন কোন স্থান ভিন্ন গ্রামে ইহা বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

(২) যাঁহারা প্রকৃত কর্মকর্তা তাঁহারা পক্ষপাতিত্ব করিয়া নিজেদের দলের লোকের মধ্যেই বেশীর ভাগ ঋণ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং ঋণ শোধের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অনেকক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলে ঋণের অধিকাংশ

টাকা বাকী থাকিয়া যায় এবং সমিতির আর্থিক অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাইতে দেখা যায়।

(৩) এই সব সমিতির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ অবশ্য আছে। কিন্তু সে নিয়ন্ত্রণ শুধু সমিতির কার্য-পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সমিতির কার্য-প্রসারতায় উহা কমই সহায়ক হইয়া থাকে।

যৌথ কারবার এবং সমবায় সমিতির মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Joint Stock Company and a Co-operative Society)

যৌথ কারবার ও সমবায় সমিতির মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) কতগুলি সমবায় সমিতি সীমিত দায়িত্ব লইয়া যৌথ কারবারের আকার ধারণ করে। যৌথ কারবারের মত আইনও উহাদের পৃথক সত্তা স্বীকার করে। ইহাদের পরিচালনও যৌথ কারবারের মত নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত পরিচালকমণ্ডলীর হাতে থাকে। কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য পৃথক। যৌথ কারবার যে-কোন উদ্দেশ্যে গঠিত হইতে পারে এবং প্রধানত উহা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়। কিন্তু সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য নিজেদের অর্থনৈতিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা এবংবিধ উন্নতি বিধান করা।

(২) সমবায় সমিতির সভ্যগণের মধ্যে পরস্পর পরিচয় থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু যৌথ কারবারে সেরূপ কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।

(৩) সভ্যগণ সাধারণত বিনা পারিশ্রমিকে সমিতির কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু যৌথ কারবারে সেরূপ কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) সমবায় সমিতির শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নহে। কিন্তু যৌথ কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য।

(৫) সমবায় সমিতির মূলধন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ সরবরাহ করিয়া থাকেন। ইহার পরিমাণ কোন ক্ষেত্রেই অধিক নহে। কিন্তু যৌথ কারবার অধিক মূলধন সংগ্রহ দ্বারা বৃহৎ কারবার গঠনের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৬) সমবায় সমিতি সীমিত ও অসীমিত উভয় প্রকার দায়-বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অসীমিত যৌথ কারবার বিরল।

(৭) উহারা পৃথক আইন দ্বারা পরিচালিত। একটি 'কোম্পানী আইন' এবং অন্যটি 'সমবায় আইন' দ্বারা পরিচালিত।

(৮) সমবায় সমিতিকে আয়কর, রেজিস্ট্রেশন ফি, ষ্ট্যাম্প ডিউটি প্রভৃতি দিতে হয় না। কিন্তু যৌথ কারবারকে সবই দিতে হয়।

(৯) শেয়ারের মূল্য সমিতি হইতে ফেরত পাওয়া যায়। কিন্তু যৌথ কোম্পানী শেয়ারের মূল্য ফেরত দেয় না।

(১০) যৌথ কোম্পানীতে ধনী ব্যক্তিরাই লাভবান হয়। সমবায় সমিতিতে দরিদ্র ও স্বল্পবিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিরা লাভবান হয়।

সমবায়ের প্রসারিত ক্ষেত্র (Extended Fields of Co-operation)

দেশের কল্যাণের জন্য সমবায়ের ক্ষেত্র বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হইতে পারে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যখন কোন কারবারী সংস্থা গঠিত হয় তখন উহার উদ্দেশ্য থাকে জনসাধারণের উপকার সাধন করা। মুনাফালাভই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় না। মুনাফালাভ বে-সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কারবারেরই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা অবশ্য ইহা বুঝানো হয় না যে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে কেবল লোকসানই হইবে। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অযোগ্যতাই প্রমাণ হয়। এরূপ লোকসানের ফলে করের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কারবার মাত্রেই উহার ন্যায্য লাভ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এরূপ পরিস্থিতিতে যদি কোন সংস্থা যেমন পরিবহন বা অন্য প্রতিষ্ঠান সরকারী বা বেসরকারী পরিচালনায় লাভজনকভাবে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে উহাকে সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালনা করিলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ ব্যবস্থায় নিম্নরূপ সুবিধাগুলি দেখা দিবে :

১। সমবায়ের উদ্দেশ্য হইতেছে সাম্য, একত্ববোধ, মিতব্যয়িতা। এখানে সকলেই প্রত্যেকের জন্য এবং প্রত্যেকেই সকলের জন্য। ইহার ফলে পরিচালনায় এবং মালিকানায় পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে, সদস্যদের সাধারণ স্বার্থ সৃষ্টি হইবে এবং কারবার পরিচালনায় গণতান্ত্রিকতা বজায় থাকিবে।

২। এরূপ কারবার মূলত মুনাফাভিত্তিক হইবে না। জনসেবাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। সদস্যদের সততা ও সমষ্টির বৃহত্তর স্বার্থের সহিত ব্যক্তিগত স্বার্থের মিলন সম্ভব হইবে।

৩। যৌথ মূলধনী কারবারের মত ইহার পৃথক সত্তা থাকিবে এবং উহার পরিচালনা সরকারের পর্যবেক্ষণের অধীনে থাকিবে।

৪। সদস্য নিজেরাই এখানে শ্রমিক হিসাবে কাজ করিবে। শ্রমিকগণ নিজেরাই এরূপ প্রতিষ্ঠানের মালিক হওয়াতে কাজেও তাহাদের আন্তরিকতা দেখা দিবে। ইহার ফলে পর্যবেক্ষণ ব্যয়ও কম পড়িবে। উচ্চবেতনভুক কর্মচারীরও প্রয়োজন হইবে না। ফলে ভাড়া বা মূল্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হইবে না এবং শ্রমিক-মালিক বিরোধ দেখা দিবে না।

৫। সদস্যগণ মজুরী ও মুনাফা উভয়ই লাভ করিতে পারিবে এবং মুনাফার এক অংশ জনহিতকর কাজেও ব্যয় হইবে।

কিন্তু এরূপ কারবারের যে কোন অসুবিধা থাকিবে না এরূপ নহে। ইহার নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি উল্লেখযোগ্য :

১। আমাদের দেশে সমবায় প্রথায় কারবার আশানুরূপ অগ্রসর হইতে দেখা যাইতেছে না। সদস্যদের কারবার পরিচালনার যোগ্যতার অভাবের জন্যই

অনেকক্ষেত্রে সমবায়ের সাফল্যে বিঘ্ন উপস্থিত দেখা দিয়াছে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে যে অনুরূপ অযোগ্যতা দেখা দিবে না এরূপ মনে না করার কোন হেতু নাই।

২। পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতেই সমবায়ের সাফল্য নির্ভর করে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে এরূপ সাহায্য ও সহযোগিতার অভাবে সমবায়ে অসাফল্য দেখা দিয়াছে। সুতরাং এরূপ অসাফল্য ইহাতে দেখা দিবারও সম্ভাবনা আছে।

৩। অনেকক্ষেত্রেই বড় বড় সমবায় প্রতিষ্ঠান সাড়ম্বরে ও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মন্দা উপস্থিত হয় এবং প্রতিষ্ঠান প্রাণহীন হইয়া পড়ে। এরূপ আশঙ্কা যে ইহাতে নাই এরূপ বলা চলে না।

৪। আমাদের দেশে সেবার মনোভাব লইয়া সমবায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সংখ্যা নিতান্তই কম। যে-কোনপ্রকারে প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ করার দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। সুতরাং এরূপ পরিস্থিতিতে সমবায়ের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে এবং উহা নানাবিধ বিড়ম্বনা সৃষ্টি করিবে।

৫। ইহা প্রতিষ্ঠা করাও এক কঠিন সমস্যা। এরূপ সমিতি যাত্রী বা কর্মীদের লইয়াই গঠিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যাহাদের লইয়া ইহা গঠিত হইবে উহারা এক নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে বসবাসকারী না হইলে সমবায়ের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে সরকারের উপর বিরাট দায়িত্ব আসিয়া পড়িবে এবং ইহার জন্য যে শ্রম ও অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহাতে যে উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত হইবে সে উদ্দেশ্য এরূপ অবস্থায় ব্যর্থ হইবার বিরাট সম্ভাবনা থাকিবে।

সুতরাং ইহার অসুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া কোন সংস্থায় সমবায় প্রথা প্রবর্তিত হইলে উহা দেশের ও দশের কল্যাণসাধন করিবে এবং বর্তমানে অনেক সংস্থার অযোগ্যতা ও ক্রমাগত লোকসানের হাত হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. What is co-operative system of business organisation? What services do they render to the society at large?

[N. B. B. Com. 1969]

সমবায় পদ্ধতির কারবার সংগঠন কাহাকে বলে? উহা সমাজের কি সেবা পরিবেশন বা উপকার করিয়া থাকে?

2. We often hear of Co operative Credit Societies, Co operative Producers' Societies, Industrial Co-operatives' and Consumers' Co-operatives. Discuss the differences among these societies.

[C. U. B. Com. (Pass) 1968]

আমরা সমবায় ঋণদান সমিতি, উৎপাদকদের সমবায় সমিতি, শিল্প-সংক্রান্ত সমবায় সমিতি, সম্ভোগকারীদের সমবায় সমিতি প্রভৃতি নাম শুনিয়া থাকি। উহাদের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।

3. Discuss the advantages and disadvantages of Co operative Societies.

সমবায় সমিতির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

4. Explain a co-operative organisation and show its similarity with or difference from a company.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1970]

সমবায় সংগঠন ব্যাখ্যা কর এবং কোম্পানীর সহিত উহার সাদৃশ্য বা পার্থক্য দেখাও।

5. A State Government intends to dissolve its State Transport Corporation and run road transport operations on a co-operative basis. Do you think that the proposed changeover will be desirable ? Give reasons for your answer.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1967]

কোনও রাজ্য সরকার উহার স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক এবং সড়ক পরিবহণ সমবায় পদ্ধতিতে চালাইতে ইচ্ছুক। এই পরিবর্তন কি উচিত মনে হয় ? তোমার উত্তরের যুক্তি দেখাও।

6. Analyse the special features of the Co-operative form of business organisation. What are its advantages and disadvantages ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1972]

সমবায় পদ্ধতিতে ব্যবসায় সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ কর। ইহার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর।

7. Compare and contrast methods of formation between a company and a co operative society.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1973]

কোম্পানী ও সমবায় সমিতির গঠন-প্রণালীর মধ্যে তুলনামূলক বিচার-বিবেচনা কর।

নবম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় কারবার
(State Enterprise)

রাষ্ট্রীয় কারবার, উহার গঠন ও উদ্দেশ্য (State Enterprise—its Formation and Objects)

রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত কারবারকে রাষ্ট্রীয় কারবার (State Undertaking or State Enterprise) বলা হয়। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় তিন প্রকার মালিকানাস্বত্ব দেখিতে পাওয়া যায়: (১) ধনতান্ত্রিক (Capitalistic), (২) সমাজতান্ত্রিক (Socialistic) এবং (৩) মিশ্র (Mixed)। 'ধনতান্ত্রিক' সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদন প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থাকেন। দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত উৎপাদন-ব্যবস্থার মালিক থাকেন। অন্য কথায় উহাকে 'বে-সরকারী প্রচেষ্টা' (Private Enterprise) বলা হয়। এরূপ সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় কোন অংশ গ্রহণ করেন না এবং উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে 'হস্তক্ষেপ না-করার নীতি' (Laissez Faire Policy) অনুসরণ করেন। গ্রেটব্রিটেন ও আমেরিকা প্রধানত এই নীতির পৃষ্ঠপোষক।

'সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়' সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থাতে রাষ্ট্রই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রই সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থার মালিক এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত লোক দ্বারাই উহা পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত উৎপাদন প্রচেষ্টার স্থান এখানে নাই। এরূপ ব্যবস্থা রাশিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়।

'মিশ্র সমাজব্যবস্থায়' উৎপাদন-প্রচেষ্টায় 'রাষ্ট্র ও ব্যক্তি' উভয়ই ক্ষেত্রবিশেষে পাশাপাশি থাকিয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সরকারী এবং বে-সরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি চলে। কতকগুলি প্রচেষ্টা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং কতকগুলি প্রচেষ্টা বে-সরকারী কর্তৃত্বাধীনে চলে। ভারতে 'মিশ্র' সমাজব্যবস্থা বর্তমানে চলিতেছে।

সাধারণত নিম্নলিখিত উপায়ে রাষ্ট্রীয় কারবারের গোড়াপত্তন হয় এবং পরিচালন-কার্য চলিয়া থাকে:

(১) ইহা যৌথ কারবারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এরূপ কারবারে সরকার মোট শেয়ারের অন্ততঃ শতকরা একান্ন ভাগ ক্রয় করিয়া থাকেন। এজাতীয় কারবারকে 'সরকারী কোম্পানী' (Government Company) আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতের হিন্দুস্থান শিপ-ইয়ার্ড লিঃ, হিন্দুস্থান মেসিন টুলস্ লিঃ প্রভৃতি এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

(২) বে-সরকারী কারবারের শেয়ার ক্রয় করিয়াও রাষ্ট্রীয় কারবার সৃষ্টি হইতে পারে।

(৩) বে-সরকারী কারবারের পরিচালনায় সরকারী কর্মচারীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উহা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে।

(৪) জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে আইন প্রণয়ন করিয়াও রাষ্ট্রীয় কারবারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে ; যেমন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া।

(৫) জাতীয়করণের (Nationalisation) নীতি গৃহীত হইলে ইহার পত্তন হইতে পারে ; যেমন, ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া।

(৬) ইহা একটি সরকারী বিভাগও হইতে পারে ; যেমন, ডাক ও তার বিভাগ।

রাষ্ট্রীয় কারবারের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত রূপ :

(১) ইহার প্রধান উদ্দেশ্য জনসাধারণের কল্যাণবিধান। ইহার উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নহে। বে-সরকারী প্রচেষ্টায় অনেকক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হয় না এবং দেশের অনেক লোকই উহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেক্ষেত্রে এরূপ কারবারের উদ্দেশ্য হইবে 'অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণে উপকার করা' (to do greatest good to the greatest number)।

(২) দেশরক্ষা এবং দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যও এরূপ কারবারের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

(৩) এরূপ অনেক কারবার আছে যেখানে প্রচুর টাকার প্রয়োজন অথচ সে পরিমাণ টাকা বে-সরকারী উদ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এরূপ অবস্থায় সরকারই ঐরূপ কারবার প্রতিষ্ঠার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভারতে নূতন নূতন লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্থাপন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৪) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কারবার গঠিত হইলে সেরূপ অবস্থায় অসম-ধনবণ্টন ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। এই অসম-ধনবণ্টন ব্যবস্থা রদ করার উদ্দেশ্যেও অনেক রাষ্ট্রীয় কারবার প্রতিষ্ঠা হয়।

রাষ্ট্রীয় কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of State Undertakings)

রাষ্ট্রীয় কারবারের নিম্নলিখিত সুবিধা ও অসুবিধাগুলি দেখিতে পাওয়া যায় :

সুবিধা :

(১) প্রভূত মূলধন লইয়া যে কারবার বে-সরকারী উদ্যোগে গঠন করা সম্ভব নহে সেরূপ কারবার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় গঠিত হইলে জাতীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকে।

(২) অনুন্নত দেশের উন্নতি করিতে হইলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যে অগ্রসর হইতে হয়। পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার দায়িত্ব সাধারণত সরকারের উপর। আবার পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যে অগ্রসর হইতে হইলে বে-সরকারী প্রচেষ্টার উপর নির্ভর

করিলে পরিকল্পনামাফিক কার্যে অগ্রসর না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্র উৎপাদন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিয়া দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করিতে পারে।

(৩) রাষ্ট্রীয় কারবার পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হয় বলিয়া এখানে ফটকাবাজী বা আর্থিক দুর্গতি কারবারের অগ্রগতিকে রোধ করিতে পারে না।

(৪) মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় কারবার প্রতিষ্ঠা হয় না। এজন্য জনসাধারণ কম মূল্যে ভাল জিনিস ক্রয় করিতে পারে।

অসুবিধা :

(১) রাষ্ট্রীয় কারবারে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকে না। এজন্য ব্যয়-বাহুল্য, শৈথিল্য এবং কর্মদক্ষতার অভাব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে কম মূল্যে ভাল জিনিস পাওয়া ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

(২) নীতির দিক দিয়া বলিতে গেলে রাষ্ট্রীয় কারবার মুনাফা অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু কারবার পরিচালনায় লোকসান করার নীতিও নিশ্চয় গৃহীত হয় না। বাস্তবিকপক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিক বেতনের অনেক কর্মচারী ইহার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন বলিয়া লাভের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় কারবারে লোকসানই হইতে দেখা যায় বেশী এবং এজন্য জনসাধারণকে অধিক কর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়।

(৩) রাষ্ট্রীয় কারবার অনেকক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের এবং আইন-সভার সদস্যদের আত্মীয়পোষণের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। ফলে উপযুক্ত ব্যক্তি ইহার কার্যভার কমই গ্রহণ করিতে পারেন। এজন্য এ সমস্ত কারবার কখনই নৈপুণ্যের সহিত পরিচালিত হয় না।

(৪) সরকারী কাজকর্ম কিছু ধীর ও মন্থর গতিতেই চলিয়া থাকে। এজন্য কোন কাজই দ্রুত হইতে পারে না। এরূপ মন্থরতার দরুণ এ সমস্ত কারবারে কর্মদক্ষতার ও তৎপরতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

ীয় কারবার এবং বে-সরকারী কারবারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between State Enterprise and Private Enterprise)

রাষ্ট্রীয় কারবার এবং বে-সরকারী কারবারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) রাষ্ট্রীয় কারবারের প্রধান লক্ষ্য জনকল্যাণ। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ জনশক্তির সহায়তায় যাহাতে যথোচিতভাবে জনকল্যাণের কাজে লাগিতে পারে তজ্জন্য সুষ্ঠু উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলাই রাষ্ট্রীয় কারবারের প্রধান উদ্দেশ্য। জনসাধারণকে বিপর্যয়ে ফেলিয়া মুনাফা অর্জন করা এ সমস্ত কারবারের মোটেই উদ্দেশ্য নহে। পক্ষান্তরে বে-সরকারী কারবার মুনাফা অর্জনের মনোবৃত্তি লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কালক্রমে উক্ত কারবার মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতির করতলগত হইয়া জনসাধারণকে শোষণ করে।

(২) রাষ্ট্রীয় কারবারের মূলধন স্বয়ং সরকারই সাধারণত সরবরাহ করিয়া থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকাংশ মূলধন সরবরাহ করিয়া অবশিষ্টাংশ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করিবার সুযোগ দিয়া থাকে। কিন্তু বে-সরকারী কারবারে রাষ্ট্র কোন মূলধন নিয়োগ করে না। উহা ঐ সমস্ত কারবারের অংশীদারগণের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। প্রয়োজনবোধে ঋণ করিয়া উহা মূলধনের অভাব পূরণ করিয়া থাকে।

(৩) গণতান্ত্রিক দেশে উহার আইনসভার নিকট সরকারকে রাষ্ট্রীয় কারবারের কাজকর্মের জন্য দায়ী থাকিতে হয় এবং উক্ত আইনসভাতেই কারবারের আয় ব্যয় ও পরিচালন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়। কিন্তু বে-সরকারী কারবারে উহার পরিচালক-মণ্ডলী অংশীদারগণের নিকট তাঁহাদের বার্ষিক সভায় কোম্পানীর আয়-ব্যয় পেশ করেন এবং উহাদের কার্যের জন্য অংশীদারগণের নিকটই দায়ী থাকেন।

(৪) রাষ্ট্রীয় কারবারে ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকে না এবং উহা প্রতিযোগিতা-মূলক নহে বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে উহাতে ব্যয়-বাহুল্য, শৈথিল্য এবং কর্মদক্ষতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বে-সরকারী কারবারে ব্যক্তিগতস্বার্থ জড়িত এবং উহা প্রতিযোগিতামূলক। এজন্য উহা বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে দেখা যায়।

(৫) রাষ্ট্রীয় কারবার পরিকল্পনা অনুযায়ী জনস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত হয়। এজন্য ফট্‌কাবাজী বা কোন আর্থিক দুর্গতি ইহার অগ্রগতিকে রোধ করিতে পারে না। কিন্তু বে-সরকারী কারবারে কোন পরিকল্পনার স্থান নাই। উহা ব্যক্তিগতস্বার্থেই পরিচালিত হয়। এজন্য ফট্‌কাবাজী বা আর্থিক দুর্গতির ফলে লোকসান হইতে থাকিলে কারবার উঠিয়া যায়।

(৬) বে-সরকারী কারবার সাধারণত অপরিমিত মূলধন লইয়া কখনও গঠিত হয় না। কিন্তু প্রভূত মূলধন লইয়া যে কারবার বে-সরকারী উদ্যোগে গঠিত হয় না সেই সমস্ত কারবারই রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় গঠিত হয়।

(৭) বে-সরকারী কারবার প্রতিযোগিতামূলক। এজন্য উহা যথাসাধ্য নৈপুণ্য ও কর্মদক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়। এজন্য জনসাধারণ এরূপ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সাধারণত সস্তা দামে জিনিস পাইয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় কারবারে ব্যয়বাহুল্যহেতু খুব কম ক্ষেত্রে জনসাধারণ সস্তাদামে জিনিস পাইয়া থাকে।

রাষ্ট্রীয় কারবারের বিভিন্ন প্রকার সংগঠন ও উহাদের বৈশিষ্ট্য (Different Patterns or Forms of Organisation of State Enterprise and their Characteristics)

ভারতের সরকারী মালিকানা বা রাষ্ট্রীয় কারবারের সাংগঠনিক আকার ও পরিচালনা প্রধানত চারি প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্যসহ উহাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

১। বিভাগীয় পরিচালনা (Departmental Management): এরূপ পরিচালনায় সরকারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহা সরকারের অংশ হিসাবে একটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। ডাক ও তার বিভাগ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য:

(ক) এই বিভাগের কাজ সরকারী অন্যান্য বিভাগের মতই পরিচালিত হয় এবং একজন মন্ত্রীর অধীনে ইহার কার্য নির্বাহ হয়।

(খ) ইহার আয় সরকারী তহবিলে জমা পড়ে এবং ব্যয়ও সরকারী তহবিল হইতে নির্বাহ হয়।

(গ) ইহার সকল কর্মচারী সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হন।

২। বোর্ড শাসিত (Board Managed): এরূপ বোর্ডের সব সভ্যই সরকার কর্তৃক মনোনীত।' শুধুমাত্র অন্যান্য সরকারী বিভাগ হইতে ইহার একটা পৃথক সত্তা থাকে। রেল পরিবহণ বোর্ড ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

(ক) এই বোর্ড একজন মন্ত্রীর অধীনে কাজ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহার উপর সরকারী কর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায় থাকে।

(খ) ইহার আয়-ব্যয়ের হিসাব পৃথক্‌ভাবে আইনসভায় পেশ করা হয়। ইহার লাভের অধিকাংশ অবশ্য সরকারী তহবিলেই স্থানান্তরিত হয়।

(গ) সরকারী সভ্য ছাড়া ইহাতে কিছু বে-সরকারী সভ্যও মনোনীত হয়।

(ঘ) ইহার কর্মচারিগণ সরকারী কর্মচারীর মতই সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকেন এবং সরকারী কর্মচারী বলিয়াই স্বীকৃতিলাভ করেন।

৩। বিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory or Public Corporation): এরূপ সংস্থা আইনসভায় একটি পৃথক আইন দ্বারা সৃষ্ট হয়। ইহা পরিচালনার নিয়মাবলী উক্ত আইনের বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত হইয়া থাকে। বীমা কর্পোরেশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এই জাতীয় সংস্থা। ইহার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

(ক ইহা যৌথমূলধনী কারবারের মত, কিন্তু ইহার কোন 'আর্টিকল্‌স্‌' থাকে না।

(খ) ইহার পরিচালনা সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি পরিচালকমণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত থাকে। কিভাবে কতজন সভ্য লইয়া উহা গঠিত হইবে তাহার নির্দেশ বিধিবদ্ধ আইনের মধ্যেই লিখিত থাকে।

(গ) ইহার মূলধন সাধারণত সরকারই সরবরাহ করিয়া থাকেন।

(ঘ) ইহার পৃথক্‌ সত্তা আছে এবং সংগঠন, পরিচালনা ও আয়-ব্যয় ক্ষেত্রে ইহার স্বাতন্ত্র্য আছে।

(ঙ) ইহার কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হন না।

(চ) ইহার বার্ষিক বিবরণী বিচার করার ক্ষমতা আইনসভার থাকে।

(ছ) ইহারও একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকেন। তিনি জনস্বার্থ রক্ষার জন্য এরূপ সংস্থাকে সাধারণ আদেশ ও নির্দেশ জারি করিতে পারেন।

(জ) জনহিতকর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রধানত এরূপ সংস্থা স্থাপিত হইয়া থাকে।

৪। **সরকারী কোম্পানী (Government Company)**: ইহা কোম্পানী আইন অনুযায়ী যৌথমূলধনী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত হয়। সরকারই এরূপ কোম্পানীর মোট শেয়ারের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থান ষ্টীল কোম্পানী, হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড প্রাইভেট লিমিটেড প্রভৃতি এই জাতীয় কোম্পানী। ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য:

(ক) কোম্পানী আইন অনুসারে গঠিত যৌথমূলধনী কারবারের মত ইহা পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা শাসিত। পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ অবশ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন।

(খ) ইহার নিজস্ব স্মারকলিপি ও আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী থাকে।

(গ) ইহার বাৎসরিক হিসাবপত্র ও নিরীক্ষার বিবরণ আইনসভায় পেশ করার নিয়ম।

(ঘ) জাতীয় কল্যাণের দিক হইতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বা প্রতিষ্ঠান সাধারণত এরূপ কোম্পানীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভাবধারা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যেও বিধিবদ্ধ সংস্থা গঠন না করিয়া এরূপ কোম্পানী গঠন করা হয়।

বোর্ড পরিচালিত রাষ্ট্রীয় কারবারের সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Board Management of State Enterprise)

ভারতীয় রেলপথের পরিচালনা সরকার মনোনীত রেলওয়ে বোর্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এরূপ অন্যান্য বোর্ডও আছে। এই ব্যবস্থার নিম্নলিখিত **সুবিধাগুলি** বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

(১) ইহার উপর একচ্ছত্র সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকে। ইহার ফলে এ জাতীয় বোর্ডের মাধ্যমে সরকারের ইচ্ছামত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি অনায়াসে সাধন হইতে পারে।

(২) ইহা হইতে যে আয় হয় উহা সরকারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

(৩) ইহার বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব আইনসভায় পেশ করিতে হয়। ইহার ফলে জনসাধারণের পক্ষ হইতে আইনসভার সদস্যগণ ইহার দোষ-ত্রুটি বিচার করিতে পারেন এবং উহা যাহাতে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে পারেন।

(৪) এরূপ বোর্ডে বে-সরকারী কিছু সভ্যও থাকেন। সুতরাং বে সরকারী স্বার্থও ইহাতে ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা কম।

(৫) এরূপ বোর্ডে নিযুক্ত কর্মচারিগণ সরকারী কর্মচারী হিসাবেই গণ্য হইয়া থাকেন এবং সরকারী চাকুরীর সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ইহারা পাইয়া থাকেন।

(৬) দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদস্থ অনেক কর্মচারী ইহাতে নিযুক্ত থাকেন এবং এজন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করাও সম্ভব হয়।

কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলিও বিচার্য :

(১) ইহা বিভাগীয় পরিচালনারই একটি সংস্করণ মাত্র। এজন্য ইহাতে লাল-ফিতার (Red-Tapism) এবং আমলাতান্ত্রিক (Bureaucratism) শাসনব্যবস্থার কোন ইতর-বিশেষ দেখা যায় না।

(২) বোর্ড পরিচালিত কারবারী প্রতিষ্ঠানে সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন এবং সরকারী কার্যে নিপুণ অধিকাংশ লোকই পরিচালনায় নিযুক্ত থাকে। এই সরকারী কর্মচারীদের কারবারী নৈপুণ্য কম। সুতরাং এরূপ প্রতিষ্ঠানে কারবারে অনভিজ্ঞ উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী থাকায় ইহা গোলাকার গর্তে চতুষ্কোণ পেরেক স্থাপনের সামিল।

(৩) ইহার উপর আইনসভার কর্তৃত্ব নামমাত্র। কারণ ইহার উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীদের কারবারী জ্ঞান প্রখর না থাকিলেও আইনসভার সভ্যদের জটিল প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করিতে ইহারা খুব পটু। ইহার ফলে আইনসভার সভ্যদের অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না।

(৪) ইহার আয় সরকারের সাধারণ তহবিলেই জমা পড়ে। ফলে সরকারী অন্যান্য অনেক বিভাগের অপচয় ইহার দ্বারা পূরণ করিয়া প্রকৃত অবস্থাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলে।

(৫) বে-সরকারী কারবারী প্রতিষ্ঠান যেরূপ দক্ষতা ও উদ্যমের সহিত পরিচালিত হয় ইহাকে সেরূপ কখনও পরিচালিত হইতে দেখা যায় না। আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্যই অবশ্য ইহার জন্য দায়ী।

(৬) রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার পরিচালনার রদ-বদল দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে কারবারী নীতির হঠাৎ পরিবর্তনে ইহাকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়।

উপরি-উক্ত অসুবিধার জন্য অনেকে রেল পরিবহণকে বে-সরকারী মালিকানায় ও পরিচালনায় আনিবার পক্ষপাতী। তাঁহাদের এই অভিমতের সপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি থাকিলেও উহা নিম্নলিখিত কারণে সরকারী পরিচালনায় থাকা উচিত মনে হয় :

(১) ইহা একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। ইহার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্য, কাঁচামাল, শিল্পজাত পণ্য, সামরিক পণ্যসম্ভার প্রভৃতি পারিবাহিত হইয়া থাকে। এই সকল পণ্য পরিবহণের কাজ জাতীয় কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করা উচিত। এজন্য অগ্রাধিকার, ভাড়ার হার ইত্যাদি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জনের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া স্থির করা উচিত। সরকারী পরিচালনায় থাকিলে উহা এ সকল বিষয়ে দেশের কল্যাণের দিকে নিয়োজিত হইতে পারিবে।

(২) সামরিক বাহিনী ও পণ্যসম্ভার চলাচলে রেল পরিবহণ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সুতরাং জাতীয় প্রতিরক্ষার এই সকল মাল-মশলার পরিবহণ কখনই বে-সরকারী নিয়ন্ত্রণে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। এরূপ করিতে গেলে জাতীয় প্রতিরক্ষা দুর্বল ও অকেজো হওয়ার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে।

(৩) দেশের অনেক অঞ্চল রেল পরিবহণের অভাবে আর্থিক দিক দিয়া বিশেষ উন্নত হইতে পারিতেছে না। দেশের আঞ্চলিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং অনুন্নত অঞ্চলের কৃষি-শিল্প উন্নয়ন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য অনেক নূতন অঞ্চলে প্রথমত অলাভজনক-ভাবে রেলপথ বিস্তার প্রয়োজন। এরূপ রেলপথ বিস্তার বে-সরকারী মালিকানায় কখনই সম্ভব নয়।

(৪) প্রশাসনিক দিক হইতে এবং উদ্বৃত্ত এলাকা হইতে ঘাটতি অঞ্চলে পণ্য-চলাচল ব্যাপারেও রেল পরিবহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এদিক দিয়া বিচার করিলেও উহা সরকারী পরিচালনায় থাকা উচিত।

(৫) ভারত সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই ব্যবস্থায় অনেক কিছুর পরিচালনায় ও মালিকানায় সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কালক্রমে আরও অনেক কিছু সরকারী মালিকানায় ও পরিচালনায় আসিয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় রেল পরিবহণকে বে-সরকারী মালিকানায় ছাড়িয়া দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

সুতরাং সরকারী মালিকানা ও পরিচালনায় রাখিয়া উহা যাহাতে দোষ-ত্রুটি মুক্ত হইতে পারে এবং উহার পরিচালনায় যাহাতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

সরকারী কোম্পানীর সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Government Company)

হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুযায়ী সরকারী যৌথ কোম্পানীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এরূপ সরকারী যৌথ কোম্পানীর সুবিধা নিম্নলিখিত-ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। কোম্পানী আইন অনুযায়ী গঠিত বলিয়া ইহার একটা পৃথক সত্তা থাকে এবং সরকার মনোনীত পৃথক পরিচালকমণ্ডলীর হস্তে ইহার পরিচালনভার ন্যস্ত থাকে। ফলে কারবার পরিচালনায় এই সকল পরিচালকগণ অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে। এজন্য ইহাদের পক্ষে জাতীয় স্বার্থরক্ষা করা এবং মুনাফা অর্জনের মধ্যে নীতির সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয়।

২। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর মাধ্যমে আইনসভায় ইহার আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করিতে হয়। ফলে ইহার উপর গণ-কৈফিয়তের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। আবার অন্য দিকে ইহার দৈনন্দিন কার্যপরিচালনায় আইনসভার নিয়ন্ত্রণ নাই। ফলে ইহার পক্ষে সামাজিক দায়িত্ব ও পরিচালনার যোগ্যতা উভয়ই দেখান সম্ভব হয়।

৩। ইহার আয়-ব্যয় সরকারী আয়-ব্যয়ের সহিত মিশ্রিত করা হয় না। এজন্য কারবার পরিচালনার যোগ্যতাও ইহাতে পরিমাপ করা যায়।

৪। ইহা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। এজন্য ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের পরিবর্তনে ইহার পরিচালনায় বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয় না।

৫। কারবার পরিচালনায় আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, দীর্ঘসূত্রতা এবং লালফিতার বাঁধন ইহাতে সর্বাপেক্ষা কম দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ ইহার নীতি ও সিদ্ধান্ত সহজে পরিবর্তন করা যায়।

৬। কারবারী-ভিত্তিক বলিয়া ইহা ক্রেতাদের রুচি ও চাহিদার দিকে দৃষ্টি দিতে পারে।

৭। বে-সরকারী মালিকানার অনাচার এবং সরকারী বিভাগের স্বৈরাচার ইহাতে থাকে না।

৮। সরকারী ও বে-সরকারী মূলধন লইয়া ইহা গঠিত হওয়ার কোন বাধা নাই। সরকার কেবল এরূপ কোম্পানীর শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ারের মালিক হওয়ার নীতি গ্রহণ করিয়া থাকে।

কিন্তু এরূপ সরকারী কোম্পানীর নিম্নলিখিত ত্রুটি বা অসুবিধাগুলি উল্লেখযোগ্য :

১। ইহাতে সরকারী ও বে-সরকারী মূলধন নিয়োগের ব্যবস্থা থাকিলেও সরকারী কর্তৃত্বই পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে।

২। ইহা আভ্যন্তরীণ নীতি অনুসরণে ও পরিচালনায় অনেকটা গোপনীয়তা রক্ষা করিতে পারে। ফলে আইনসভা ইহাকে অনেক সংবাদ প্রকাশ করিতে বাধ্য করিতে পারে না। সুতরাং ইহার ফলে ইহার পক্ষে গণদায়িত্ব এড়াইয়া চলার সুযোগ ঘটে।

৩। সরকারী বিভাগের বা সরকারী কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা ইহাতে পাওয়া সম্ভব হয় না। কর্মচারীরাও সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হয় না।

৪। ইহা সরকারী কর হইতেও অব্যাহতি পায় না।

৫। যে সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইহার পরিচালনায় থাকেন উঁহারা অধিকাংশই কারবারী জ্ঞানে অনভিজ্ঞ এবং আমলাতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন। ফলে ইঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্ব এবং কারবারী যোগ্যতা প্রদর্শনে অক্ষম ও উদাসীন। এজন্য কর্মচারী বিক্ষোভ এরূপ কারবারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা কোম্পানী নামের এক বিভ্রান্তিকর রূপ। ইহা নামে গণতন্ত্রসম্মত কোম্পানী, কিন্তু কাজে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারী কারবার।

বিভাগীয় পরিচালনার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Departmental Management)

বিভাগীয় পরিচালনায় সরকারী কর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায় থাকে। এরূপ পরিচালনায় নিম্নলিখিত **সুবিধাগুলি** দেখিতে পাওয়া যায় :

(ক) ইহাতে সরকারের পূর্ণক্ষমতা থাকে এবং সরকারী নিয়মে উহা পরিচালিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য থাকে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা এবং দেশের কল্যাণসাধন করা। সুতরাং এরূপ উদ্দেশ্য সাধন দ্বারা ইহা দেশের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে।

(খ) দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের উপর ইহার কর্তৃত্বভার ন্যস্ত থাকে। ইহার ফলে একদিকে ইহা যেমন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় অন্যদিকে ইহা প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষা করিতে পারে। জাতীয় নিরাপত্তা ও উন্নতি বিধানের জন্য এরূপ গোপনীযতা অবশ্যই প্রয়োজন।

(গ) ইহাতে দায়িত্ববোধও জাগ্রত হয়, কারণ আইনসভায় ইহার পরিচালনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

(ঘ) ইহার কর্মচারিগণ সকলেই সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হন এবং উঁহারা সরকারী সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা এবং চাকুরীর নিরাপত্তা প্রভৃতি ভোগ করিয়া থাকেন।

কিন্তু ইহার কতকগুলি **অসুবিধাও** আছে। উহা নিম্নরূপ :

(ক) সরকারী বিভাগ আমলাতান্ত্রিক। উহাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য বেশী। এজন্য কাজ ও নীতি গ্রহণে ইহাতে বিলম্ব ঘটে।

(খ) কর্মচারীদের চাকুরীর নিরাপত্তা থাকায় উহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎসাহ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে ইহার কাজ-কারবার কখনই সুষ্ঠুভাবে দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না।

(গ) কর্মচারীদের প্রায়ই বদলির ফলে ইহাতে কাজের ধারাবাহিকতাও নষ্ট হইতে দেখা যায়।

(ঘ) আইনসভায় পৃথকভাবে আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করার নিয়ম না থাকায় অনেকক্ষেত্রে ইহাতে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের মাত্রা বেশী হইয়া পড়ে।

(ঙ) ক্ষমতাশীল মন্ত্রীদের রদ-বদলের ফলে ইহার নীতির হঠাৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনাও থাকে। ফলে সব কাজেই বিলম্ব ও বিড়ম্বনা আসিয়া জোটে।

(চ) ইহার কর্মচারীদের কারবারী জ্ঞান কম থাকায় কারবারী ভিত্তিতে ইহার পরিচালনা কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ব্যয় বৃদ্ধি এবং লোকসান বা কম মুনাফা লাভই প্রকাশ পায়।

উপরি-উক্ত অসুবিধার জন্য এরূপ কারবারী প্রতিষ্ঠান স্বায়ত্তশাসিত যৌথ

কোম্পানীর ভিত্তিতে কিংবা বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে পরিচালনা করার প্রস্তাবও করা হইয়া থাকে। যদিও কোন ব্যবস্থাই ত্রুটিশূন্য নহে তথাপি এরূপ ব্যবস্থা মন্দের ভাল বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

বিধিবদ্ধ সংস্থার সুবিধা ও অসুবিধা (**Advantages and Disadvantages of Statutory or Public Corporation**)

বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে গঠিত হইলে উহার নিম্নলিখিত **সুবিধাগুলি** দেখিতে পাওয়া যাইবে :

(ক) ইহা প্রধানত গঠিত হয় জনস্বার্থ রক্ষার ও জনকল্যাণ সাধনের জন্য। মুনাফা অর্জন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এরূপ কারবারের পক্ষে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করা অধিক সম্ভব। ক্রেতাসাধারণও ইহা হইতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে জিনিস বা সেবা পাইতে পারে।

(খ) ইহা কোন সরকারী বিভাগের অন্তর্গত থাকে না। ইহার একটা পৃথক সত্তা থাকে। এজন্য ইহার দৈনন্দিন কার্যকলাপে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার পক্ষে গণদায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়া চলে না। কারণ ইহার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ইহার জন্য আইনসভায় কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকেন। মোটের উপর আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা ইহাতে কম। ইহার পক্ষে এজন্য দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করাও সম্ভব হয়।

(গ) ইহা আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারেও স্বাধীনতা ভোগ করে। ইহার উপর রাজকোষের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। পক্ষান্তরে প্রয়োজনমত ইহা রাজকোষ হইতে কিংবা অন্য উপায়ে ঋণও গ্রহণ করিতে পারে।

(ঘ) ইহার স্বাধীন সত্তা থাকায় ইহাতে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মত উদ্যম ও উৎসাহের স্থান আছে। আবার গণদায়িত্ব পালনেও ইহা পরাঙ্মুখ নয়। সুতরাং এতদ্ উভয়ের মিলন এরূপ কারবারেই সম্ভব। এজন্য ইহার পক্ষে পরিচালনায় স্বাধীনতা ভোগ করা চলে।

(ঙ) ইহার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য যে আইন রচিত হয় উহা সাধারণ যৌথ কোম্পানীর আইন হইতে অনেকটা পৃথক। ফলে ইহার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয় উহা কারবারের রীতি-নীতির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই প্রণীত হয়। ফলে ইহার পক্ষে অনেক সুবিধার অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়।

(চ) ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এতদ্ উভয়ের সংমিশ্রণের ফলে যাহা কিছু ভাল তাহাই এরূপ কারবার বা সংস্থা হইতে জনসাধারণ পাওয়ার আশা রাখে।

(ছ) ইহা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান এবং এজন্য সরকারের পরিবর্তন হইলেও ইহার পরিবর্তন হয় না।

কিন্তু এরূপ সংস্থার নিম্নলিখিতরূপ **অসুবিধাগুলিরও** সম্মুখীন হইতে হয়:

(ক) ইহার কর্মচারিগণ সরকারী কর্মচারী নহেন। এজন্য ইহাতে সরকারী বিভাগের মত ইহাদের সুযোগ-সুবিধা মিলে না।

(খ) ইহা সরকারী কর বা ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি পায় না।

(গ) মুনাফা অর্জন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য না হওয়ায় এরূপ সংস্থার যোগ্যতা নিরূপণ করাও সম্ভব হয় না।

(ঘ) অনেক ক্ষেত্রে ইহার পরিচালনায় কারবারী জ্ঞানে অজ্ঞ ব্যক্তিরাও স্থান পায়। ফলে কারবারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহার দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ-সুবিধা কম।

(ঙ) ইহার কার্যপ্রণালী ও সংগঠন সহজে পরিবর্তনশীল নহে। এজন্য পরিবর্তনশীল সময়ের সহিত তাল রাখিয়া ইহা চলিতে পারে না।

(চ) ইহার স্বাধীন সত্তা নামমাত্র। ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে সরকারী কর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায়ই থাকে এবং ইহা সরকারী বিভাগীয় পরিচালনার সামান্য উন্নততর সংস্করণমাত্র।

রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সীমিত কোম্পানীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার যে সাম্প্রতিক সরকারী প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় ইহার কারণ (Reasons for the recent tendency on the part of the Government to organise State industrial undertakings as Limited Companies)

এরূপ সীমিত কোম্পানীগুলি সরকারী কোম্পানীর আওতায় পড়ে এবং ইহাতে সরকার মোট শেয়ারের অন্তত শতকরা ৫০ ভাগের বেশী গ্রহণ করিয়া থাকেন। ফলে এরূপ কোম্পানীতে বে-সরকারী মূলধন এমন কি বৈদেশিক মূলধন নিয়োগ করারও সুযোগ-সুবিধা আছে। এরূপ সরকারী কোম্পানী গঠনের প্রবণতা ও প্রচেষ্টা ইদানীং কালে বেশী দেখা যাইতেছে। নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি এরূপ প্রচেষ্টার পক্ষে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে:

১। সরকার সাধারণতঃ নির্দিষ্ট হারে সুদ দিয়া অতি কম মূলধন সংগ্রহ করিতে পারেন। কারণ মুনাফার সহিত মূলধনের সম্পর্ক না থাকিলে জনসাধারণ কারবারী ক্ষেত্রে ঋণ দিতে বিশেষ আগ্রহশীল হয় না। সরকারী কোম্পানীতে জনসাধারণকে অংশীদার হইবার সুযোগ দিলে উহাদের মূলধন যোগান দেওয়ার আগ্রহ বেশী দেখা দিবে। সুতরাং ভারতীয় মূলধন বাজারের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সরকারের পক্ষে এরূপ কোম্পানী গঠনের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। ভারতের কোম্পানী আইন বিভাগও এই মত পোষণ করেন এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত বে-সরকারী মূলধন নিয়োগের উহা পক্ষপাতী।

২। এরূপ কোম্পানীতে সরকারী কর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায়ই থাকে। সুতরাং সরকারের কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ও ইহাতে নাই।

৩। বে-সরকারী উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত অনেক কোম্পানী মূলধনের অভাবে যাইবার উপক্রম হয়। এরূপ অবস্থায় সরকার উক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া উহাকে সরকারী কোম্পানীতে রূপান্তর করিয়া থাকেন।

৪। অনেকক্ষেত্রে শিল্পপ্রসারে বে-সরকারী উদ্যম মূলধনের অভাবে কার্যকরী হইতে পারে না। সরকার এরূপ কোম্পানী গঠন করিয়া উহা লাভজনকভাবে চালু হইলে বে-সরকারী হাতে ছাড়িয়া দিতে পারেন।

৫। এরূপ কোম্পানী যখন ঘরোয়া কোম্পানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন উহা কোম্পানী আইনের অনেক বিধি-নিষেধ হইতে অব্যাহতিও পাইয়া থাকে।

৬। ইহা ছাড়া সরকার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া সরকারী কোম্পানীকে আইন দ্বারা অনেক বিপদ-আপদ ও বাধা-নিষেধের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন এবং কোম্পানী আইনের কোন্ অংশ ইহাতে প্রযুক্ত হইবে এবং কোন্ অংশ ইহাতে প্রযুক্ত হইবে না তাহাও স্থির করিতে পারেন।

৭। কারবার সরকারী হউক বা বে-সরকারী হউক—উহা মুনাফার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সরকার কোনও কারবার স্থাপন করিলে উহা লাভজনক হউক এবং সরকারী দীর্ঘসূত্রতা, শৈথিল্য প্রভৃতি ইহার মধ্যে প্রবেশ না করুক ইহাই জনসাধারণের ইচ্ছা। এইরূপ ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যেও সরকারী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কারণ যৌথমূলধনী কারবারের আকারে কোম্পানী আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা পৃথক সত্তা লাভ করে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার পরিচালকমণ্ডলী ইহার পরিচালনায় নিজস্ব স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন। ইহার পরিচালকমণ্ডলীর ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কর্মে শৈথিল্য এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব না ঘটিলে এই পৃথক সত্তাবিশিষ্ট কোম্পানীর সাফল্য অধিক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই সদিচ্ছায় প্রণোদিত হইয়াও সরকারকে এরূপ কোম্পানী গঠনে ব্রতী হইতে দেখা যায়।

৮। জাতীয় কল্যাণের দিক হইতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প স্থাপন (যেমন—লৌহ ও ইস্পাত শিল্প) করিতে হইলে সরকার উহা এরূপ কোম্পানীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন।

৯। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভাবধারাও কার্যকরী করার জন্য বিধিবদ্ধ সংস্থা গঠন না করিয়া সরকার এরূপ কোম্পানী গঠন করিয়া থাকেন।

রাষ্ট্রীয় কারবারের লোকসানের কারণ (Reasons for the loss in State Enterprises)

যে সকল কারবারে সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য থাকে উহাকে সরকারী ক্ষেত্রের কারবার বলা হয়। এরূপ কারবারের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশের সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক লোকের উপকার সাধন করা। ইহাতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য গৌণ। বর্তমানে দেশের শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের

মত শিল্পে অনুন্নত দেশের পক্ষে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কারবার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া, বে-সরকারী ক্ষেত্রে সকল কারবার স্থাপিত ও পরিচালিত হইলে সম্পদ ও আয় বণ্টনের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় কারবার এই বৈষম্য দূর করিতে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া, শিল্প বিকেন্দ্রীয়করণ, জাতীয় সম্পদের অপচয় নিবারণ, ভারী ও মূল শিল্পের উন্নয়ন, অধিক কর্মের সংস্থান প্রভৃতির জন্য রাষ্ট্রীয় কারবার সৃষ্টি হইতেছে। প্রতিরক্ষা শিল্প বা ব্যবসা এবং কিছু কিছু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ছাড়া বে-সরকারী উদ্যমের মত সরকারী উদ্যমেও উহাতে কিছুটা লাভ হইবে এরূপ আশা জনসাধারণ পোষণ করিয়া থাকে। নতুবা করের মাত্রা অযথা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রীয় কারবারের অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাভ ছাড়া লোকসানই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত কারণগুলিই যে উহার জন্য দায়ী একথা বলা চলে :

১। রাষ্ট্রীয় কারবার মুনাফা অর্জনের জন্য নয়। এ ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেক রাষ্ট্রীয় কারবার মুনাফা লাভের দিকে কোন প্রকার দৃষ্টিই দেয় না। ফলে উহাতে লোকসানই দেখিতে পাওয়া যায়।

২। সরকারী কর্মচারী যাঁহারা রাষ্ট্রীয় কারবার পরিচালনার কর্ণধার তাঁহাদের শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসা সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা খুব কম। এজন্য কারবারে সাফল্য লাভ কঠিন হইয়া পড়ে।

৩। সরকারী কর্মচারীদের স্বভাবত কর্মে উদ্যোগ ও প্রেরণা কম থাকে। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রীয় কারবারের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অযথা বিলম্ব হয়। ফলে ইহার কাজ ধীর-মন্থর গতিতে চলে। এরূপ অবস্থায় কোন কারবারই লাভজনকভাবে চলার আশা করিতে পারে না। বরং ইহাতে ব্যয় ও অপচয় বৃদ্ধি পায় এবং কারবারে লোকসান দেখা দেয়।

৪। অনেকক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকারের পরিবর্তনের ফলে কারবারের নীতি ও কর্মে পরিবর্তন দেখা দেয়। এজন্যও কারবারের অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং লাভের আশা বিনষ্ট হয়।

৫। রাষ্ট্রীয় কারবারে উচ্চ বেতনভোগী অনেক কর্মচারী থাকেন। ইহার জন্যও ব্যয়ের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং লাভের পরিবর্তে কারবারে লোকসান দেখা দেয়।

৬। যোগ্যতা অপেক্ষা আত্মীয় ও স্বজনপোষণ নীতিও রাষ্ট্রীয় কারবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে কারবার কখনই সুষ্ঠুভাবে দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে এবং লাভজনক অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে না।

উপরি-উক্ত ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও বর্তমান সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কারবারের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া যায় না। কিন্তু এইভাবে লোকসানজনকভাবে কারবার চালনাও

কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। সুতরাং ইহার ত্রুটিগুলি যাহাতে দূর হয় সেদিকে সকলের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এজন্য আমাদের মতে নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাষ্ট্রীয় কারবার পরিচালনা করিলে উহা লোকসানের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে :

১। এরূপ কারবার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া উচিত। উক্ত পরিকল্পনা ও নীতি যাহাতে জনস্বার্থ-বিরোধী না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় কারবার মুনাফা অর্জনের জন্য স্থাপিত হয় না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া লোকসান করার এবং করের মাত্রা বৃদ্ধি করার নীতি কখনই জনস্বার্থের অনুকূলে যাইতে পারে না। এজন্য বে-সরকারী সদস্যসহ একটি পর্যবেক্ষণ কমিটি থাকা প্রয়োজন।

২। রাষ্ট্রীয় কারবার পরিচালনের ভার যাঁহাদের উপর থাকিবে তাঁহাদের উপযুক্ত কারবারী জ্ঞান ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন হইতে হইবে। এরূপ কারবারে নিয়োগপন্থা আত্মীয়পোষণ অপেক্ষা যোগ্যতাই মাপকাঠি হওয়া উচিত।

৩। কর্মচারীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা, সমাজকল্যাণবোধ, একত্ববোধ প্রভৃতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন।

৪। কোন কারবারে কোন ব্যক্তিবিশেষ উপযুক্ত বিবেচিত হইলে উহাকে অন্যত্র বদলি করা উচিত নয়। কারণ তিনি নূতন পরিবেশে সেরূপ যোগ্যতা নাও দেখাইতে পারেন।

উপরি-উক্ত নিয়মগুলি প্রতিপালিত হইলে রাষ্ট্রীয় কারবার অনেক দোষ-ত্রুটি মুক্ত হইয়া সাফল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সরকারী কারবারে বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য (Differences between different forms of organisation of public enterprises)

সরকারী কারবারে যে বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামো দেখিতে পাওয়া যায় উহা নিম্নরূপ :

১। বিভাগীয় পরিচালনা (Departmental Management)।

২। বোর্ড-শাসিত পরিচালনা (Board Management)।

৩। বিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory or Public Corporation)।

৪। সরকারী কোম্পানী (Government Company)।

উহাদের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

বিভাগীয় পরিচালনা	বোর্ড-শাসিত	বিধিবদ্ধ সংস্থা	সরকারী কোম্পানী
১। ইহার কোন পৃথক্ সত্তা নাই, ইহা সরকারের শাসন ব্যবস্থার একটি বিভাগ মাত্র। ইহা কোন পৃথক্ আইনের ভিত্তিতে গঠিত হয় না।	১। ইহার পৃথক সত্তা আছে। তবে ইহা একজন মন্ত্রীর অধীনে থাকে। ইহা পৃথক আইনের ভিত্তিতে গঠিত।	১। ইহার পৃথক সত্তা আছে। তবে ইহার প্রধান কর্মকর্তা সরকার কর্তৃকই মনোনীত হয়। ইহা বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত হয়।	১। ইহার পৃথক সত্তা আছে এবং ইহার পরিচালনা সরকার মনোনীত পরিচালকমণ্ডলীর উপর থাকে। ইহা কোম্পানী আইন মতে গঠিত।
২। ইহার আয়ের সব কিছু সরকারী তহবিলে জমা পড়ে এবং ব্যয়ও সরকারী তহবিল হইতে হয়। ইহার জন্য কোন পৃথক হিসাব বা বাজেট প্রস্তুত হয় না।	২। ইহার আয়-ব্যয়ের পৃথক্ হিসাব বা বাজেট থাকে এবং উহা আইন-সভায় পেশ করিতে হয়।	২। ইহার আয়-ব্যয়েরও পৃথক হিসাব বা বাজেট থাকে।	২। ইহার আয়-ব্যয়েরও পৃথক হিসাব বা বাজেট থাকে।
৩। ইহার কর্মচারিগণ সরকারী কর্মচারী এবং উহাদের কার্যকলাপ সরকারী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	৩। ইহার কর্মচারিগণ সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হয় না যদিও ইহারা সরকারী কর্মচারীদের মত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। ইহাদের কার্যকলাপ পৃথক্ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	৩। ইহার কর্মচারিগণ সরকারী কর্মচারী নহে এবং ইহাদের কার্যকলাপ পৃথক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	৩। ইহার কর্মচারিগণ সরকারী কর্মচারী নহে এবং ইহাদের কার্যকলাপ পৃথক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
৪। ইহার পরিচালনায় কোন বে-সরকারী লোক থাকে না।	৪। ইহার পরিচালনায় কিছু বে-সরকারী লোকও থাকে।	৪। ইহার পরিচালনায়ও বে-সরকারী লোক থাকে।	৪। ইহার পরিচালনায়ও বে-সরকারী লোক থাকে।

বিভাগীয় পরিচালনা	বোর্ড-শাসিত	বিধিবদ্ধ সংস্থা	সরকারী কোম্পানী
৫। ইহার উদ্দেশ্য-সাধন ব্যাপারে সরকারী কর্তৃত্ব পূর্ণ-মাত্রায় থাকে।	৫। পৃথক্ বোর্ড-শাসিত হইলেও কোনও উদ্দেশ্য-সাধনে সরকারী কর্তৃত্ব থাকে।	৫। ইহা স্বয়ং-শাসিত সংস্থা বলিয়া পরিগণিত তবে সরকারী উদ্দেশ্য এই সংস্থার মাধ্যমেই সাধন হয়।	৫। ইহা স্বয়ং-শাসিত সংস্থা বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং সরকারী উদ্দেশ্য এই সংস্থার মাধ্যমেই পূরণ হয়।
৬। ইহার বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী সরকারী আয়-ব্যয় বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত।	৬। ইহার আয়-ব্যয়ের বার্ষিক বিবরণী পৃথকভাবেই প্রস্তুত হয়।	৬। ইহার আয়-ব্যয়ের বার্ষিক বিবরণী পৃথক্‌ভাবেই প্রস্তুত হয়।	৬। ইহার আয়-ব্যয়ের বার্ষিক বিবরণী পৃথক্‌ভাবেই প্রস্তুত হয়।
৭। ইহার আর্থিক ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কোন নীতি নাই।	৭। ইহার আর্থিক ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকাই নীতি।	৭। ইহার আর্থিক ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকাই নীতি।	৭। ইহার আর্থিক ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকাই নীতি।
৮। ইহা সরকারী আইন দ্বারা পরিচালিত।	৮। ইহা পৃথক আইন দ্বারা পরিচালিত।	৮। ইহা পৃথক্ আইন দ্বারা পরিচালিত।	৮। ইহা কোম্পানী আইন দ্বারা পরিচালিত।
৯। ইহার উদ্দেশ্য জনকল্যাণ, সরকারী তহবিল পুষ্ট করা এবং কতকগুলি ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন।	৯। ইহার উদ্দেশ্য জনকল্যাণ, সরকারী তহবিল পুষ্ট করা এবং গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে জনমত উপেক্ষা করা চলে না।	৯। ইহার উদ্দেশ্য জনকল্যাণ, সরকারী তহবিল পুষ্ট করা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নহে এবং জনস্বার্থে গোপনীয়তা রক্ষার প্রযোজন হয় না।	৯। ইহার উদ্দেশ্য জনকল্যাণ, সরকারী তহবিল পুষ্ট করা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নহে এবং জনস্বার্থে গোপনীয়তা রক্ষার প্রযোজন হয় না।
১০। ইহার উদ্দেশ্য প্রধানত উন্নয়ন-মূলক।	১০। ইহার উদ্দেশ্য কারবারী ও উন্নয়নমূলক।	১০। ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য উন্নয়ন-মূলক।	১০। ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য কারবারী অর্থাৎ উৎপাদন এবং ক্রয়-বিক্রয়মূলক কাজ-কারবার।

সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার মূল সমস্যা ও উহার প্রতিকার (Basic problems of organisation and management of public sector industrial undertakings and their remedies)

সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানই হউক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানই হউক, উহাকে সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ব্যাপারে কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। এই সমস্যাগুলির যথাযথ মীমাংসা ভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। সঠিক পথ নির্দেশের জন্য অবশ্য এ সম্পর্কে অনেক কমিটি ও কমিশন বসিয়াছে। কিন্তু উহাদের নির্দেশ ও মন্তব্য ব্যাপারটাকে জটিল ও ঘোরালো করা ভিন্ন সহজ ও সরল করিতে পারে নাই। ফলে সমস্যা সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, যে মূল সমস্যাগুলি সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ব্যাপারে সমাধান প্রয়োজন উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

১। **সংগঠন (Organisation) :** সংগঠনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, সরকার কর্তৃক পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভাগীয় সংগঠন, বোর্ড সংগঠন, বিধিবদ্ধ সংগঠন ও কোম্পানী সংগঠন কার্যরত আছে। প্রত্যেক সরকারের উদ্দেশ্য থাকে জনস্বার্থ রক্ষা করা। এই জনস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে যে-কোন একপ্রকার সংগঠন সৃষ্টি না হইয়া চারিপ্রকারের সংগঠন দেখা দিয়াছে। মূল সমস্যার সমাধান না হওয়ার জন্যই যে এরূপ বিভিন্ন সংগঠনের গোড়াপত্তন হইয়াছে একথা অনস্বীকার্য। বিভাগীয় সংগঠনের প্রধান ত্রুটি ইহা অত্যধিক আমলাতান্ত্রিক। ইহার লালফিতার দৌরাত্ম্য এবং নীতি গ্রহণ পদ্ধতি ও কার্য সম্পাদনে বিলম্ব ঘটায়। আইনসভায় ইহার কোন আয়-ব্যয়ের হিসাবও পৃথক্‌ভাবে পেশ করা হয় না, সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ কারবারী জ্ঞান থাকে না, ফলে এরূপ সংগঠনের মাধ্যমে কারবার পরিচালনা জনস্বার্থ রক্ষা করিতে পারে না। বোর্ড-শাসিত সংগঠনও অনুরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতিতে পরিপূর্ণ। এজন্য অনেকের মতে কারবারীক্ষেত্রে জনস্বার্থ রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে বিধবদ্ধ সংগঠন কিংবা কোম্পানী সংগঠন। কিন্তু বিধিবদ্ধ সংগঠনের স্বাধীন সত্তা নামমাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে সরকারী কর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং ইহা বিভাগীয় সংগঠন বা বোর্ড-শাসিত সংগঠনের সামান্য উন্নততর সংস্করণ। আমাদের ব্যবস্থাপনা বিশারদ শ্রী এ. ডি. গোরওয়ালার মতে ইহার স্বাধীন সত্তা ভ্রমাত্মক এবং ইহার বাহ্যাবরণ যাহাই থাকুক না কেন ইহার সহিত বিভাগীয় কাঠামোর কোন প্রধান পার্থক্য নাই (Its independence is illusory, and whatever the outer appearance, essentially there would seem to be no difference between this form and departmental form')। তিনি অবশ্য কোম্পানী সংগঠন প্রবর্তনের পক্ষপাতী। তাঁহার মতে যেখানে বাণিজ্য-সংক্রান্ত কাজ-কারবার সেখানে যৌথ কোম্পানীই বিশেষ উপযোগী। কারণ ইহা বিধিবদ্ধ সংস্থা অপেক্ষা অধিক নমনীয় ("where the nature of work of an authority is substantially

commercial, a joint stock company is more suitable than a public corporation and that the company form is more flexible)। যদিও সরকারী কারবারে ঘরোয়া কোম্পানী সংগঠনের প্রাবল্য বেশী দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি এ ব্যবস্থা যে ত্রুটিশূন্য একথা কেহ বলেন না। ভারতের ভূতপূর্ব অডিটর জেনারেল শ্রীনরহরি রাও বলেন—কোম্পানী আইনের এবং সংবিধানের উপর ইহা প্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছুই নহে (such government companies as a fraud on the Companies Act and on the Constitution)। প্রকৃতপক্ষে ইহা কোম্পানী নামের বিভ্রান্তিকর রূপ। ইহা নামে গণতন্ত্রসম্মত কোম্পানী, কিন্তু কাজে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারী কারবার। সুতরাং উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কোন সংগঠনই বিতর্কের উর্ধ্বে নহে। আমাদের মতে এই বিতর্ক অমূলক। সরকার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। বর্তমান কাঠামোতে যেরূপ সংগঠনই হউক না কেন উহাতে সরকারী কর্তৃত্ব থাকিবেই। সুতরাং সংগঠনের রূপ লইয়া বাদানুবাদ না করিয়া সরকারী কারবারে কোন ক্ষেত্রে কতটা স্বাধিকার দেওয়া সম্ভব উহাই বিবেচনা করা উচিত। আমাদের মতে সরকারী কারবারে এরূপ একটি কাঠামো সৃষ্টি করা উচিত যাহাতে কাজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে নিরূপণ করা চলে। যদি বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ দ্বারা সুষ্ঠু কার্য নির্বাহের ব্যবস্থা করা হয় তবেই সরকারী কারবারগুলি জনকল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হইতে পারে। এজন্য চাই প্রত্যেক কর্মচারীর জাতীয়তাবোধ এবং ক্ষমতালোলুপতা ত্যাগ। ('Let the fools contest for the form of government, but what is administered best is best')।

২। **ব্যবস্থাপনা (Management) :** ব্যবস্থাপনাকে সংগঠন হইতে পৃথক করা চলে না। কারণ সংগঠনের উপর ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। বিভাগীয় বা বোর্ড-শাসিত সংগঠন হইলে উহার মধ্যে আমলাতান্ত্রিক প্রভাব ও লালফিতার ব্যাপকতা না আসিয়া যায় না। বিধিবদ্ধ সরকারী কোম্পানী সংগঠনে অবশ্য একটা পৃথক সত্তা পাওয়া যায়। ইহাতে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা কম থাকে। তবে ইহাও সত্য কথা—যে প্রকার সংগঠনই হউক না কেন সরকারী কারবারের ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনই ইহার প্রবল সমস্যা। যাঁহারা এই কেন্দ্রীয়করণের পক্ষপাতী তাঁহাদের অভিমত—ব্যবস্থাপনার কার্যকুশলতায় যোগ্য ব্যক্তির অভাব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এরূপ যোগ্য ব্যক্তির হস্তে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন অবশ্যই প্রয়োজন। যেখানে একই নীতি ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হয় সেখানে ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ হইলে বিশেষ কোন অসুবিধা না হইতে পারে। কারবার ছোট হইলে এ ব্যবস্থা ভালভাবেই চলার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কারবার বৃহৎ হইলে এরূপ সর্বক্ষমতাসম্পন্ন কর্মাধ্যক্ষের পক্ষে সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব একাকী পালন করা সম্ভব হয় না। "Every time a further division of labour is made, every time a new branch or new department is opened, the

task of co-ordinating the separated departments becomes more and more difficult." সুতরাং কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাইলে অধস্তরে কর্তব্য ও ক্ষমতা অর্পণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহাতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্মভার লাঘব হয়। ইহাতে একনায়কতন্ত্রের পরিবর্তে গঠনতন্ত্রমূলক অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহাতে কর্মীদের মধ্যে সুষ্ঠু ও দ্রুত কার্য সম্পাদনের আগ্রহ দেখা দেয়। তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত দ্রুত সামঞ্জস্য বিধান করার পক্ষে এই বিকেন্দ্রীয়করণই উপযুক্ত ব্যবস্থা। কিন্তু সরকারী কারবারে ক্ষমতার লড়াই প্রবল থাকায় কেন্দ্রীয়করণ ও বিকেন্দ্রীয়করণের সুষ্ঠু সীমারেখা নির্ধারণ করা এক জটিল সমস্যা। আমাদের মতে এই জটিল সমস্যার সমাধান যথাসম্ভব ক্ষমতার অপব্যবহার ত্যাগ দ্বারা বিকেন্দ্রীয়করণের নীতি অনুসৃত হইলে সহজসাধ্য হইবে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. What is a State Enterprise ? How is it formed and what are its objects ?

রাষ্ট্রীয় কারবার কাহাকে বলে ? উহা কিভাবে গঠিত হয় এবং উহার উদ্দেশ্য কি ?

2. Discuss the advantages and disadvantages of State Enterprise.

রাষ্ট্রীয় কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

3. Distinguish between State Enterprise and Private Enterprise.

রাষ্ট্রীয় কারবার ও বে-সরকারী কারবারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

4. What are the various forms of organisation introduced in the Public Sectors in India ? Explain the salient features of each of them. [B. U. B. Com. 1966, 1971]

ভারতে সরকারী ক্ষেত্রে কি কি প্রকারের সংগঠন দেখিতে পাওয়া যায় ? উহাদের প্রত্যেকের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ?

5. Discuss the characteristics of the following forms of organisation for State Enterprises with illustrations :

(a) Departmental,

(b) Statutory,

(c) Public Corporations. [C. U. B. Com. (Hons.) 1969]

উদাহরণসহ রাষ্ট্রীয় কারবারের নিম্নলিখিত আকারের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর :

(ক) বিভাগীয়,

(খ) বিধিবদ্ধ,

(গ) পাব্লিক কর্পোরেশন।

6. Railways in India are operated through the Railway Board, whereas Hindustan Steel Limited is registered under the Companies Act. Enumerate the comparative merits and demerits of these two forms of organisation. [C. U. B. Com. (Pass) 1963]

রেলপথগুলি রেলওয়ে বোর্ড দ্বারা পরিচালিত এবং হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড কোম্পানী আইন দ্বারা রেজিষ্ট্রিকৃত। এই উভয় প্রকার ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ কর।

7. Railways in India are state-owned and state-managed. Would you recommend that they should be transferred to the private sector ? Give reasons for your answer.

[C. U. B. Com. (Pass) 1966]

ভারতের রেলপথগুলি রাষ্ট্রের মালিকানায় ও কর্তৃত্বে পরিচালিত। উহা কি বে-সরকারী পরিচালনায় হস্তান্তর করা উচিত ? যুক্তিসহ উত্তর লিখ।

8. Would you advocate that all Government undertakings like Railways, etc., should be managed departmentally ? If not, what other forms of management should be adopted and what are their respective advantages ? [C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

তুমি কি সমর্থন কর যে, রেলপরিবহনের মত সকল রাষ্ট্রীয় কারবার বিভাগীয় পরিচালনাধীন হইবে ? যদি সমর্থন না কর তবে অন্য কি কি প্রকারের পরিচালনা গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং উহাদের প্রত্যেকের কি সুবিধা ?

9. Discuss the reasons for the recent tendency on the part of the Government to organise State Industrial undertakings as Limited Companies. [C. U. B. Com. (Pass) 1966]

রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সীমিত কোম্পানীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার যে সাম্প্রতিক সরকারী প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় উহার কারণ আলোচনা কর।

10. Do you think it is better to run a public sector undertaking as a commercial venture under the Companies Act rather than a Departmental one ? Give reasons.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1968]

তুমি কি মনে কর যে, সরকারী ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান বিভাগীয় হিসাবে পরিচালিত হওয়া অপেক্ষা কোম্পানী আইন অনুযায়ী বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা হিসাবে পরিচালিত হওয়া ভাল? যুক্তি দেখাও।

11. Railways in India are owned and managed by the Central Government. Do you think it is desirable? Give reasons for your answer. [C. U. B. Com. (Pass) 1968]

ভারতের রেলপথগুলি সরকারের মালিকানায় ও পরিচালনায়। ইহা কি বাঞ্ছনীয়? তোমার উত্তরের যুক্তি দেখাও।

12. The public sector undertakings in India usually run at a loss. What may be the causes? Suggest steps which might improve their working. [C. U. B. Com. (Hons.) 1967]

ভারতে সরকারী ক্ষেত্রের কারবার সাধারণত লোকসানে চলে। উহার কারণ কি? উহাদের কার্যের যাহাতে উন্নতি হইতে পারে সে সম্বন্ধে প্রস্তাব কর।

13. Bring out the important differences between the different forms of organisation introduced in public enterprises in India. [C. U. B. Com. (Hons.) 1970]

ভারতে সরকারী কারবারে যে বিভিন্ন প্রকার সাংগঠনিক কাঠামো দেখিতে পাওয়া যায় উহাদের পার্থক্য নির্ণয় কর।

14. Discuss the basic problems of organisation and management of public sector industrial undertakings in India and suggest some remedies. [C. U. B. Com. (Hons.) 1970]

ভারতের সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার মূল সমস্যাগুলি আলোচনা কর এবং উহার প্রতিকারের প্রস্তাব কর।

15. Critically examine the principal forms of organisation for state enterprises in India. Give suitable examples. [C. U. B. Com. (Hons.) 1972]

রাষ্ট্রীয় কারবারের প্রধান সংগঠন কাঠামোগুলি বিচার-বিবেচনা কর। উপযুক্ত উদাহরণ দাও।

16. Distinguish between a company and a public corporation as forms of organisation. [C. U. B. Com. 1973]

সংগঠন আকারের মধ্যে কোম্পানী ও বিধিবদ্ধ সংস্থার যে পার্থক্য উহা নির্ণয় কর।

দশম অধ্যায়

যৌথ মূলধনী কারবার প্রবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়

(Different Promotional Steps of Joint Stock Company)

কোম্পানী প্রবর্তন এবং উহার প্রবর্তকের কাজ (Company Promotion and Functions of its Promoters)

যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন কোম্পানী স্থাপনের পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া উহার কার্যারম্ভ পর্যন্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে তাহাকে 'প্রবর্তক' (Promoter) নামে অভিহিত করা হয়। এইভাবে ঘরোয়া বা সার্বজনিক যৌথ কারবার স্থাপনের যাবতীয় কার্যে যিনি বা যাঁহারা লিপ্ত থাকেন তিনি বা তাঁহারা উক্ত কারবারের প্রবর্তক নামে পরিচিত। আমরা সাধারণত তিন শ্রেণীর প্রবর্তক দেখিতে পাই। উঁহারা হইতেছেন—(ক) পেশাদার-প্রবর্তক (Professional Promoters), (খ) সাময়িক প্রবর্তক (Occasional Promoters), এবং (গ) বিশেষ প্রবর্তক (Particular Promoters)। পেশাদার প্রবর্তকদের কাজ নূতন নূতন কোম্পানী স্থাপন করা। কোম্পানী নিবন্ধনের পর উঁহারা তাঁহাদের নির্ধারিত পারিশ্রমিক লইয়া কোম্পানীর সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন। সাময়িক প্রবর্তকগণ প্রয়োজনবোধে প্রবর্তকের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং এইভাবে উঁহারা এক বা একাধিক কোম্পানী গঠন করেন, কিন্তু উঁহারা কোম্পানীর সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন না। ইঁহারা কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার গ্রহণ করিয়া কোম্পানী পরিচালনায় নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। বিশেষ প্রবর্তকগণ সাধারণত একটিমাত্র কোম্পানী গঠন করেন এবং উহার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। ইঁহারা অনেকক্ষেত্রে একক-মালিকানা, অংশীদারী বা যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারকে যৌথ কোম্পানীতে রূপান্তর ঘটাইয়া কোম্পানী গঠন করেন এবং এইভাবে ব্যক্তিগত অসীম দায় (unlimited liability) এড়াইবার ব্যবস্থা করেন। ইঁহারা যে কোম্পানী প্রবর্তন করেন উহার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। ভারতে সাময়িক এবং বিশেষ প্রবর্তকদের সংখ্যাই বেশী। ভারতে ম্যানেজিং এজেন্টগণ কোম্পানী প্রবর্তনের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। তবে বর্তমানে ইঁহাদের এই ভূমিকায় আর প্রবর্তক হওয়ার নিয়ম নাই। কারণ এই ব্যবস্থা এখন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদিগকে পেশাদার প্রবর্তক আখ্যা দিলেও প্রবর্তিত কোম্পানীর সহিত ইঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিতে খুব কমই দেখা যাইত।

কোম্পানী প্রবর্তন প্রবর্তকের একটি মুখ্য কাজ। উহা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়া পরিসমাপ্তি লাভ করে। প্রবর্তকের উপরি-উক্ত পরিচয় হইতে বুঝিতে পারা যাইবে

যে, উহার কাজ ব্যাপক ও সুদূর-প্রসারী। এজন্য উহার কার্যগুলিকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। **কারবারের সম্ভাবনা উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা** (**Discovery of Idea of a Business and Planning**) : প্রবর্তকের প্রথম কাজ দেশের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করা এবং তদনুযায়ী কারবার বা শিল্প-বাণিজ্য সম্ভাবনা উদ্ভাবন করা। এই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তাঁহার পরবর্তী কাজ হইতেছে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা, তদনুযায়ী কার্যে অগ্রসর হওয়া, কারবারের প্রকৃতি নির্ধারণ ও উহার স্থান নির্বাচন করা এবং পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

২। **প্রাথমিক অনুসন্ধান** (**Preliminary Investigation**) : কারবার স্থাপনের সম্ভাবনা উদ্ভাবন এবং পরিকল্পনা প্রস্তুত করার পর প্রবর্তকের দ্বিতীয় কাজ হইতেছে কারবার সম্বন্ধে প্রাথমিক অনুসন্ধান করা। এই অনুসন্ধান দ্বারা তিনি কারবারের লাভজনক সম্ভাবনা স্থির করিবেন, তজ্জন্য তিনি প্রস্তাবিত কারবারের আয়-ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব প্রস্তুত করিবেন এবং প্রচলিত অনুরূপ কারবারের সহিত উক্ত আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক বিচার করিবেন। এইভাবে প্রস্তাবিত কারবারের আয় যদি ব্যয় অপেক্ষা সন্তোষজনকভাবে বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবেই তিনি কারবার স্থাপনের পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হইবেন।

৩। **বিস্তারিত অনুসন্ধান** (**Detailed Investigation**) : প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর প্রবর্তককে প্রস্তাবিত কারবারের বিস্তারিত অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই অনুসন্ধান দ্বারা তিনি কারবারটির জন্য প্রয়োজনীয় জমি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি, শক্তি, কাঁচামাল, শ্রমিক, পরিবহন, পরিচালক প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবেন। প্রয়োজন হইলে উক্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লইবেন, যেমন উৎপাদক-সংক্রান্ত বিষয়ে উৎপাদক ইঞ্জিনিয়ারের, পণ্যের উৎপাদন ব্যয় এবং উহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ সম্পর্কে পরিব্যয় হিসাবরক্ষকের (Cost Accountant), আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে অর্থ বিশেষজ্ঞের, বিক্রয় সমস্যা সম্পর্কে বিক্রয় বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইবেন। এই প্রসঙ্গে কারবারের সম্ভাব্য বিক্রয়ের পরিমাণ, পণ্যের চাহিদা, কারবারের মুনাফা, চলতি আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ এবং কারবার স্থাপনের প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণও স্থির করিয়া লইবেন। কি কি প্রকারের শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ হইবে তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের প্রয়োজন হইবে কিনা উহাও বিবেচনার বিষয় হইবে। শেয়ারের মূল্য কত হইবে, কিরূপ কিস্তিতে উহার টাকা আদায় হইবে, কিভাবে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় হইবে তাহারও বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন হইবে।

৪। **প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রবর্তক সমাবেশ** (**Assembly of Requisite Number of Promoters**) : অনুসন্ধান, পরিকল্পনা প্রভৃতি যাহা কিছুই করা হউক না কেন কোম্পানীর কার্য আরম্ভ করার পূর্বে উহার নিবন্ধন (Regis-

tration) প্রয়োজন। ঘরোয়া কোম্পানী হইলে ২ জন সদস্য লইয়া উহা নিবন্ধন করা চলে। কিন্তু সার্বজনিক কোম্পানীর অন্তত ৭ জন সদস্য প্রয়োজন। সাধারণত প্রথম প্রবর্তকগণ এই সদস্যের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং উঁহারাই স্মারকলিপি ও আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীতে উঁহাদের নাম স্বাক্ষর দিয়া থাকেন। সুতরাং অনুসন্ধান ও পরিকল্পনার পরে প্রবর্তকদের সমাবেশ প্রয়োজন হইবে এবং আলাপ-আলোচনার দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য লইয়া কোম্পানীর নিবন্ধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রস্তুত করিতে হইবে। উক্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে নিবন্ধনের আবেদনপত্রে উঁহাদের স্বাক্ষর লইয়া নিবন্ধকের নিকট প্রয়োজনীয় দলিলাদি পেশ করিতে হইবে।

৫। **আইনগত আনুষ্ঠানিকতা (Legal Formalities) :** কোম্পানী নিবন্ধনের জন্য যে দলিলাদি প্রয়োজন হইবে উহা কোম্পানী আইন অনুসারে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তজ্জন্য প্রবর্তকদের আইনজ্ঞের পরামর্শ লইয়া কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।

৬। **মূলধনের সংস্থান (Provision of Capital) :** নিবন্ধন হইলে ঘরোয়া কোম্পানী তখনই কাজ আরম্ভ করিতে পারে। কিন্তু সার্বজনিক কোম্পানীকে কাজ আরম্ভ করিতে হইলে সর্বনিম্ন মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া, প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য প্রবর্তকদের বিজ্ঞাপনী (Prospectus) প্রচার করিতে হইবে যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে শেয়ার ক্রয় করার আগ্রহ জন্মে এবং উহা কার্যে পরিণত হয়। তজ্জন্য প্রবর্তকদের উক্ত বিজ্ঞাপনীতে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা উজ্জ্বল চিত্র লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। উক্ত বিজ্ঞাপনীতে পরিচালকদের নাম, ঠিকানা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও অবশ্য দিতে হইবে। এইভাবে সর্বনিম্ন মূলধন সংগ্রহ করিয়া নিবন্ধকের নিকট হইতে কারবার আরম্ভের অনুমতিপত্র (**Certificate of Commencement**) গ্রহণ করিতে হইবে।

৭। **সংগঠন (Organisation) :** উপরি-উক্ত নানাবিধ ব্যবস্থা ও কার্য সমাধা করিয়া একটি উপযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে কোম্পানীর কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমি ক্রয়, বাড়ী নির্মাণ বা ভাড়া, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিক ও কর্মচারী নিয়োগ এবং উঁহাদের কার্যবিভাগ প্রভৃতির বন্দোবস্ত দ্বারা সংগঠনের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া কোম্পানীর উদ্দেশ্য সফল করিতে হইবে।

সুতরাং যৌথ কোম্পানী প্রবর্তনের জন্য অনেক কিছু প্রয়োজন। এজন্য চাই প্রবর্তকদের বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা। ইহা ভিন্ন ভাল কোম্পানী গঠন হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার।

যৌথ কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার মূলধন (Different forms of Capital of a Joint Stock Company)

যৌথ কোম্পানীর মূলধন নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্যায়ে সাধারণত বিভক্ত করা হয় :

(১) **প্রস্তাবিত বা অনুমোদিত মূলধন** (Authorised Capital): যে পরিমাণ মূলধন স্মারকলিপিতে উল্লেখ থাকে অর্থাৎ যাহা উহাতে উল্লিখিত হইয়া কোম্পানী রেজেস্ট্রী হয় সেই পরিমাণ মূলধনকে 'অনুমোদিত মূলধন' বলে। উক্ত মূলধনকে 'রেজেস্ট্রীকৃত মূলধন' (Registered Capital) বা 'নামিক মূলধন' (Nominal Capital)-ও বলা হয়।

(২) **প্রচারিত বা বিক্রয়যোগ্য মূলধন** (Issued Capital): যে পরিমাণ মূলধন স্মারকলিপিতে লিখিত থাকে সেই পরিমাণ মূলধন সাধারণত প্রথমেই জনসাধারণের নিকট শেয়ার হিসাবে বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় না। উক্ত রেজেস্ট্রীকৃত মূলধন অপেক্ষা কিছু কম পরিমাণ মূলধনের শেয়ার বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়। যে পরিমাণ মূলধন শেয়ার হিসাবে বিক্রয়ের জন্য বাজারে ছাড়া হয় তাহাকে 'বিক্রয়যোগ্য মূলধন' বলে।

(৩) **প্রতিশ্রুত বা বিক্রীত মূলধন** (Subscribed Capital): যে পরিমাণ বিক্রয়যোগ্য শেয়ার বাজারে ছাড়া হয় ঐ পরিমাণ শেয়ার প্রকৃত প্রস্তাবে জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত নাও হইতে পারে। বিক্রয়যোগ্য বা প্রচারিত মূলধনের যে পরিমাণ শেয়ার জনসাধারণ আবেদনপত্র দ্বারা ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছে এবং তজ্জন্য আবেদনপত্রের সহিত প্রয়োজনীয় অর্থও পাঠাইয়াছে সে পরিমাণ শেয়ারের জন্য আবেদন করাকেই 'বিক্রীত মূলধন' বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ প্রত্যেক আবেদনকারীকে যে শেয়ার দেওয়া হইবে উক্ত শেয়ারে অবশিষ্ট টাকা দেওয়ার জন্য তাঁহারা দায়ী থাকেন। শেয়ারের অবশিষ্ট টাকা না দিলে আবেদনপত্রের সহিত যে টাকা পাঠানো হয় তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া যায় এবং আবেদনকারী তখন আর অংশীদার স্থলভুক্ত থাকেন না। সেক্ষেত্রে তাঁহার শেয়ার অন্যত্র বিক্রয় করিবার অধিকার কোম্পানীর থাকে।

(৪) **তলবী মূলধন** (Called-up Capital): বিক্রীত মূলধনের সমস্ত টাকা কোম্পানী সাধারণত শেয়ার-গ্রহীতাগণের নিকট হইতে একযোগে আদায় করে না। বিভিন্ন কিস্তিতে উক্ত টাকা আদায় হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য কোম্পানী যে পরিমাণ টাকা যে তারিখের মধ্যে আদায়ের ইচ্ছা রাখে সেইমত শেয়ার-গ্রহীতাগণকে চিঠি দিয়া জানাইয়া থাকে। এইভাবে কোম্পানী বিক্রীত মূলধন আদায়ের তলব দিয়া থাকে। বিক্রীত মূলধনের যে পরিমাণ টাকা তলব করা হয় সেই পরিমাণ মূলধনকে 'তলবী মূলধন' বলে।

(৫) **আদায়ী মূলধন** (Paid-up Capital): তলবী মূলধনের যে পরিমাণ টাকা শেয়ার-গ্রহীতাগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে পরিশোধ করিয়াছে সেই পরিমাণ মূলধনকে 'আদায়ী মূলধন' বলে।

(৬) **অনাদায়ী মূলধন** (Unpaid Capital or Calls in Arrears): তলবী মূলধনের যে পরিমাণ টাকা শেয়ার-গ্রহীতাগণ কোনও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে

পরিশোধ করেন নাই, উক্ত তারিখে সেই পরিমাণ মূলধনকে 'অনাদায়ী মূলধন' আখ্যা দেওয়া হয়।

(৭) **অতলবী মূলধন** (Uncalled Capital) : বিক্রীত মূলধনের যে পরিমাণ মূলধন তলব করিতে বাকী আছে তাহাকে 'অতলবী মূলধন' বলে।

(৮) **মজুত মূলধন** (Reserved Capital) : বিক্রীত মূলধনের যে অংশ তলব করা হয় নাই এবং বিশেষ প্রস্তাব দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, কোম্পানী তুলিয়া দেওয়ার সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে উহা তলব করা হইবে না, মূলধনের সেই অংশকে 'মজুত মূলধন' বলা হয়।

যৌথ কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার শেয়ার (Different classes of shares of Limited Companies)

যৌথ কোম্পানীর শেয়ার বা অংশ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে :

১। **বিশেষ সুবিধাভোগী বা প্রাগ্‌দাবী অংশ** (Preference Share) : কোম্পানীর যে শ্রেণীর শেয়ার অন্যান্য শেয়ার অপেক্ষা বেশী সুযোগ-সুবিধা পাইবার অধিকারী তাহাকে 'বিশেষ সুবিধাভোগী অংশ' বলে। ইহাদের মালিকদের প্রাপ্য সুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

(ক) ইহারা অন্যান্য শেয়ার-গ্রহীতাগণের লভ্যাংশ পাওয়ার পূর্বে একটা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন।

(খ) কারবার তুলিয়া দেওয়ার সময় ইহারা অন্যান্য শেয়ার-গ্রহীতাদের তুলনায় সর্বাগ্রে মূলধন ফেরত পাইয়া থাকেন।

বিশেষ সুবিধাভোগী অংশ আবার নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে :

(ক) **সঞ্চিত সুবিধাভোগী অংশ** (Cumulative Preference Share) : কোন বৎসরে যথোপযুক্ত মুনাফা না হওয়ায় কোম্পানী যদি লভ্যাংশ ঘোষণা না করে তবে যে জাতীয় অংশের লভ্যাংশ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বৎসরের পর বৎসর নির্দিষ্ট হারে উহা জমা বা সঞ্চিত হইতে থাকে তাহাকে সঞ্চিত সুবিধাভোগী অংশ বলে। যে বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হইবে সে বৎসরে এই জাতীয় শেয়ার-গ্রহীতা-গণই সর্বাগ্রে লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন।

(খ) **অসঞ্চিত সুবিধাভোগী অংশ** (Non-cumulative Preference Share) : যে জাতীয় অংশে প্রতি বৎসরের লাভ হইতেই শুধু সর্বাগ্রে লভ্যাংশ দেওয়া হয় এবং কোন বৎসরে যথোপযুক্ত মুনাফা না হওয়ায় লভ্যাংশ না দেওয়ার ফলে অনাদায়ী লভ্যাংশ জমা বা সঞ্চিত হয় না তাহাকে 'অসঞ্চিত সুবিধাভোগী অংশ' বলে।

(গ) **পরিশোধযোগ্য সুবিধাভোগী অংশ** (Redeemable Preference Share) : যে শ্রেণীর অংশের মূলধন কোম্পানীর চালু অবস্থায় ফেরত

পাওয়া যাইতে পারে তাহাকে 'পরিশোধযোগ্য সুবিধাভোগী অংশ' বলে। এরূপ 'অংশ' বা 'শেয়ার' কেবল 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী'র অনুমোদনক্রমে কোম্পানী আইনের সর্ত অনুযায়ী বিক্রয় করা চলে। এই শ্রেণীর শেয়ারের সম্পূর্ণ টাকা গ্রহণ করার পরই শুধু উক্ত টাকা ফেরত দেওয়া চলে। যে অংশের টাকা কখনই ফেরত দেওয়া হয় না উহাকে 'অপরিশোধযোগ্য সুবিধাভোগী অংশ' (Irredeemable Preference Share) বলে।

(ঘ) **ভাগীদার সুবিধাভোগী অংশ (Participating Preference Share) :** কোম্পানী তুলিয়া দেওয়ার সময় সকল দেনাপাওনা পরিশোধ করার পর উদ্বৃত্ত (surplus) থাকিলে যে শ্রেণীর সুবিধাভোগী অংশ উহাতে ভাগ বসাইতে পারে তাহাকে 'ভাগীদার সুবিধাভোগী অংশ' বলে। এরূপ শেয়ারের শেয়ার-গ্রহীতাগণ এই অতিরিক্ত সুবিধার অধিকারী না হইলে উহাকে বলা হয় 'অভাগীদার সুবিধাভোগী অংশ' (Non-Participating Preference Share)।

কোনও 'সুবিধাভোগী অংশে' উপরি-উল্লিখিত একাধিক সুযোগ-সুবিধার উল্লেখ থাকিতে পারে।

২। **সাধারণ বা ইকুইটি অংশ (Ordinary or Equity Share) :** যে সমস্ত অংশ কোম্পানীর লাভের কিংবা মূলধন প্রত্যর্পণে বিশেষ কোন সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার পায় না এবং কেবল 'বিশেষ সুবিধাভোগী অংশে'র লভ্যাংশ দেওয়ার পর ইহার শেয়ার-গ্রহীতাগণ মুনাফার অংশ গ্রহণ করেন তাহাকে 'সাধারণ অংশ' বলে।

৩। **বিলম্বিত দাবীযুক্ত, পরিচালন কিংবা সংস্থাপক অংশ (Deferred, Management or Founders' Share) :** 'বিশেষ সুবিধাভোগী' ও 'সাধারণ' অংশের লভ্যাংশ দেওয়ার পর যে শ্রেণীর অংশ লভ্যাংশ পাইয়া থাকে তাহাকে 'বিলম্বিত দাবীযুক্ত অংশ' বলে। সাধারণত যৌথ কোম্পানীর উদ্যোক্তারা এই শ্রেণীর শেয়ারের মালিক হইয়া থাকেন। যদিও ইহারা বিলম্বে লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন, কোম্পানীর অবস্থা ভাল হইলে শেষ পর্যন্ত ইহাদের লভ্যাংশ সর্বাপেক্ষা বেশী দাঁড়ায়। এরূপ শেয়ার সার্বজনিক কোম্পানী বিক্রয় করিতে পারে না।

৪। **অধিবৃত্তিমূলক শেয়ার (Bonus Share) :** সাধারণত কোম্পানীর সমস্ত মুনাফা শেয়ার-গ্রহীতাদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করা হয় না। উহার কিছুটা সংরক্ষিত তহবিলে (Reserve Fund) জমা রাখা হয়। সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ অধিক হইলে এবং কোম্পানীর মূলধন বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে কোম্পানী শেয়ার-গ্রহীতাদের মধ্যে উহা হইতে যে শেয়ার বিলির ব্যবস্থা করে উহাকে 'অধিবৃত্তিমূলক শেয়ার' বলে। কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীতে অবশ্য এরূপ শেয়ার বিলির অধিকার থাকা চাই। এরূপ শেয়ার পূর্ণ বা আংশিক আদায়ীকৃত শেয়ার হিসাবে বিলি হইতে পারে। ইহার জন্য শেয়ার-গ্রহীতাদিগকে কোন নগদ অর্থ প্রদান করিতে হয় না। ইহা কেবল সংরক্ষিত তহবিল হইতে মূলধনে স্থানান্তর দ্বারা

কার্যকরী করা হয়। কেবল চালু কোম্পানী যাহাদের সংরক্ষিত তহবিলে শেয়ার বিলির উপযুক্ত পরিমাণ মুনাফা জমা থাকে তাহাদের পক্ষেই ইহা মূলধন বৃদ্ধির একটি সহজ পন্থা।

৫। **অধিকারযোগ্য অংশ (Right Share):** অধিকতর মূলধন সংগ্রহের জন্য কোন চালু কোম্পানী যখন শেয়ার বিলির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন উক্ত শেয়ার বর্তমান শেয়ার-গ্রহীতাদের মধ্যে সমানুপাতিক হারে বিলি করার নিয়ম। বর্তমান শেয়ার-গ্রহীতাদের নিকট উক্ত শেয়ার বিক্রয়ের প্রস্তাব ন্যূনতম ১৫ দিনের অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রহণের জন্য পেশ করিতে হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে শেয়ার-গ্রহীতাগণ শেয়ার গ্রহণে সম্মতি না জানাইলে উক্ত শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা চলে। এই অতিরিক্ত শেয়ার বিলির ফলে কোম্পানীর পরিচালনক্ষমতা যাহাতে বর্তমান শেয়ার-গ্রহীতাদের হাত হইতে বিচ্যুত না হয় তজ্জন্যই বর্তমান শেয়ার-গ্রহীতাদিগকে এই অগ্রক্রয়াধিকার (Right of Pre-emption) দেওয়া হয়।

ষ্টক ও শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Stocks and Shares)

'ষ্টক' ও 'শেয়ারের' মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

(১) উভয়েই কোম্পানীর মূলধনের অংশ। তবে ষ্টক টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয়, কিন্তু শেয়ার কোম্পানীর মূলধনের একটি অংশ বিশেষ 'অবিভাজ্য একক' (Indivisible Unit) এবং এই এককের মোট মূল্যই প্রাপ্যশোধ্য শেয়ারের মূল্য।

(২) টাকার অঙ্কে প্রকাশিত ষ্টককে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া বিক্রয় করা চলে; কিন্তু শেয়ার অবিভাজ্য। একখানার কম শেয়ার ক্রয় করা যায় না।

(৩) ষ্টকের কোন ক্রমিক নম্বর নাই, কিন্তু শেয়ারের ক্রমিক নম্বর থাকে।

(৪) যে পরিমাণ ষ্টক ক্রয় করা হইবে উহার সম্পূর্ণ মূল্য একযোগে পরিশোধ করিতে হয়, কিন্তু শেয়ারের মূল্য একযোগে না দিয়া কিস্তিতে দেওয়া চলে।

(৫) কোম্পানীর 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী'তে (Articles of Association) উল্লেখ থাকিলে শেয়ারের মোট মূল্য আদায় হইলে উহাকে ষ্টকে রূপান্তরিত করা চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোম্পানীর 'ষ্টকের' উৎপত্তি এইভাবেই হইয়া থাকে।

ঋণপত্র ও বিভিন্ন প্রকারের ঋণপত্র (Debenture and different kinds of Debenture)

কোম্পানী তাহার গৃহীত ঋণ স্বীকার করিয়া ঋণদাতাকে কোম্পানীর সিলমোহরাঙ্কিত যে দলিল দিয়া থাকে তাহাকে 'ঋণপত্র' (Debenture) বলে। উক্ত দলিলে ঋণের সুদ ও উহা গ্রহণের বিভিন্ন সর্তাবলী লিখিত থাকে। ঋণপত্রের প্রয়োজনীয়তা (Importance) অনেক। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ইহা কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহের একটি প্রধান ক্ষেত্র। কোম্পানীর উন্নতি ও প্রসারের

জন্য যে মূলধন প্রয়োজন উহা একমাত্র শেয়ার বিক্রয় করিয়া সম্ভব হয় না। ঋণপত্রের সাহায্যে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা সহজসাধ্য। ইহার জন্য যে সুদ দেওয়া হয় তাহা কোম্পানীর দেয় লভ্যাংশ অপেক্ষা সাধারণত কমই থাকে। ইহার সাহায্যে মূলধন সংগ্রহ করার ব্যয়ও বেশী নয়। যাঁহারা ঋণপত্র কিনিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে শেয়ার অপেক্ষা ইহা ক্রয় করা কম ঝুঁকির ব্যাপার। ঋণপত্রধারকগণ কোম্পানীর পাওনাদার এবং ইহারা নিয়মিত সুদ পাইয়া থাকেন। শেয়ার ক্রেতাদের 'লভ্যাংশ' প্রাপ্তি যেমন কোম্পানীর লাভের উপর নির্ভর করে ইহার ক্রেতাদের তাঁহাদের সুদ প্রাপ্তির জন্য সেরূপ নির্ভর করিতে হয় না। সুতরাং কোম্পানী ও বিনিয়োগকারী উভয়ের পক্ষ হইতেই ইহা নানাদিক দিয়া সুবিধাজনক। এই সর্ত অনুযায়ী ঋণপত্র নিম্নলিখিত বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে :

(১) **সাধারণ বা বন্ধকবিহীন ঋণপত্র (Simple or Naked Debenture):** ঋণ বা ঋণের সুদ পরিশোধ করার জন্য যখন কোন সম্পত্তি বন্ধক বা জামিন দেওয়া হয় না তখন তাহাকে 'সাধারণ ঋণপত্র' বলে।

(২) **বন্ধকী ঋণপত্র (Mortgage Debenture):** কোম্পানীর সমস্ত কিংবা আংশিক সম্পত্তি বন্ধকসহ যে ঋণপত্র দেওয়া হয় তাহাকে 'বন্ধকী ঋণপত্র' বলে।

(৩) **পরিবর্তনীয় ঋণপত্র (Floating Debenture):** কোম্পানীর পরিবর্তনীয় সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া যখন ঋণপত্র দেওয়া হয় তখন উহাকে 'পরিবর্তনীয় ঋণপত্র' আখ্যা দেওয়া হয়।

(৪) **বাহকদেয় ঋণপত্র (Bearer Debenture):** ঋণপত্র হস্তান্তর করার জন্য যখন কোন দলিলের প্রয়োজন হয় না এবং উহার ধারক বা বাহক ঋণপত্রে উল্লিখিত টাকা ও সুদ পাওয়ার অধিকারী হয় তখন সেই ঋণপত্রকে 'বাহকদেয় ঋণপত্র' বলে।

(৫) **পঞ্জীভূত ঋণপত্র (Registered Debenture):** যে ক্ষেত্রে ঋণপত্রধারকের নাম কোম্পানীর উক্ত উদ্দেশ্যে রক্ষিত খাতায় লিখিত বা পঞ্জীভূত হয় তখন উক্ত ঋণপত্রকে 'পঞ্জীভূত ঋণপত্র' বলে। এরূপ ঋণপত্র অপরকে দিতে হইলে হস্তান্তরকরণ দলিল প্রয়োজন হয় এবং নূতন ধারকের নাম কোম্পানীর খাতায় পঞ্জীভূত করিয়া লইতে হয়।

(৬) **পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র (Redeemable Debenture):** যে ঋণপত্রের টাকা নির্দিষ্ট সময় অন্তে পরিশোধযোগ্য উক্ত ঋণপত্রকে 'পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র' বলে।

(৭) **অপরিশোধযোগ্য বা স্থায়ী ঋণপত্র (Irredeemable or Perpetual Debenture):** যে ঋণপত্রের টাকা কোম্পানী গুটাইবার সময় কিংবা সুদের টাকা খেলাপ করা ভিন্ন পরিশোধযোগ্য নহে সে ঋণপত্রকে 'অপরিশোধযোগ্য ঋণপত্র' বলে।

কোম্পানীর অংশীদার ও ঋণপত্র-ধারকের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Shareholders and Debenture-holders)

কোম্পানীর অংশীদারগণ যে মূলধন যোগান দিয়া থাকেন উহা কোম্পানীর নিজস্ব মূলধন (Owned Captial), কিন্তু ঋণপত্র-ধারকদের নিকট হইতে যে মূলধন সংগ্রহ হয় উহাকে ধারকরা মূলধন (Borrowed Capital) বলে। এতদ্ উভয়ের অর্থাৎ কোম্পানীর অংশীদার ও ঋণপত্র-ধারকের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি উল্লেখযোগ্য :

কোম্পানীর অংশীদার	কোম্পানীর ঋণপত্র-ধারক
১। ইহারা কোম্পানীর মালিক।	১। ইহারা কোম্পানীর উত্তমর্ণ।
২। ইহারা লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন।	২। ইহারা নির্দিষ্ট হারে সুদ পাইয়া থাকেন।
৩। ইহারা কেবল কোম্পানীর লাভ হইলে লভ্যাংশ পান।	৩। কোম্পানীর লাভ না হইলেও ইহারা সুদ পাইয়া থাকেন।
৪। কারবার গুটাইলে ঋণপত্র-ধারকদের পাওনা মিটানোর পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবেই ইহারা পান।	৪। কারবার গুটাইলে অংশীদার-দের মূলধন ফেরত দিবার পূর্বে ইহাদের পাওনা মিটাইতে হয়।
৫। ইহাদের কোম্পানীর সভায় উপস্থিত হইবার ও ভোট দিবার অধিকার আছে।	৫। ইহাদের কোম্পানীর সভায় উপস্থিত হওয়ার বা ভোট দেওয়ার অধিকার নাই।
৬। ইহাদের প্রদত্ত টাকা মূলধন হিসাবে গণ্য হয়।	৬। ইহাদের প্রদত্ত টাকা ঋণ হিসাবে গণ্য হয়।
৭। কোম্পানী চালু অবস্থায় পরিশোধযোগ্য শেয়ার না হইলে মূলধন ফেরত দেওয়ার নিয়ম নাই।	৭। অপরিশোধযোগ্য ঋণ না হইলে কোম্পানী চালু অবস্থাতেই ঋণ পরিশোধ করার নিয়ম।

যৌথ কোম্পানীর মূলধনের উৎস (Sources of Finance of Joint Stock Companies)

যৌথ কোম্পানী পরিচালনের জন্য সাধারণত দুই প্রকার মূলধন প্রয়োজন : (১) 'স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital) এবং (২) 'কার্যকরী মূলধন' (Working Capital)। কারবার আরম্ভ করিবার জন্য জমি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য যে মূলধন প্রয়োজন উহা কোম্পানীর 'স্থায়ী মূলধন' এবং কারবার চালু রাখিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন উহাকে বলা হয় 'কার্যকরী মূলধন'। অন্য কথায় স্থায়ী মূলধনকে দীর্ঘমিয়াদী (Long time) এবং কার্যকরী মূলধনকে স্বল্প মিয়াদী (Short-time) মূলধন আখ্যা দেওয়া হয়। যৌথ কোম্পানী এই উভয়বিধ মূলধন নিম্নলিখিত উপায়ে সংগ্রহ করিয়া থাকে :

(১) **শেয়ার বিক্রয় (Sale of Shares) :** সাধারণত যৌথ কোম্পানীর মূলধন কতকগুলি 'শেয়ারে' বিভক্ত থাকে। উক্ত প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য স্বল্প মূল্যেই নির্ধারিত হয়। ইহাতে জনসাধারণ তাঁহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এক বা একাধিক 'শেয়ার' গ্রহণ করিতে পারেন। এইভাবে জনসাধারণের মধ্যে 'শেয়ার' বিক্রয় করিয়া যৌথ কোম্পানী প্রভূত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাই কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র। কারণ শেয়ার ক্রেতাগণ কোম্পানীর মালিক হন। অন্যান্য কারবারে যেমন মালিকই প্রধানত মূলধন যোগান দিয়া থাকেন এরূপ কারবারেও শেয়ার-গ্রহীতাগণ কোম্পানীর অধিকাংশ মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকেন।

(২) **ঋণ গ্রহণ (Loan) :** কোম্পানী প্রয়োজনবোধে উহার সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া মূলধনের অভাব পূরণ করিতে পারে। লাভজনক পুরাতন কোম্পানীর পক্ষেই এইভাবে মূলধন সংগ্রহ করা অধিক সুবিধাজনক। যদি কোম্পানীটি পুরাতন হয় তাহা হইলে নূতন শেয়ার বিক্রয় করিয়াও উহা দীর্ঘ বা স্বল্প-মিয়াদী পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে।

(৩) **ঋণপত্র বিক্রয় (Sale of Debentures:) :** কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া উক্ত ঋণ স্বীকারের জন্য কোম্পানী যখন উহার সিলমোহরাঙ্কিত দলিল ঋণদাতাকে প্রদান করিয়া থাকে তখন উক্ত দলিল 'ঋণপত্র' (Debenture) নামে পরিচিত হয়। মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারে শেয়ার বিক্রয়ের পরই ইহার স্থান। ঋণদাতাগণ এই ঋণপত্রের জন্য নির্দিষ্ট হারে সুদ পাইয়া থাকেন। ইহারা কোম্পানীর উত্তমর্ণ। কিন্তু শেয়ার-গ্রহীতাগণ কোম্পানীর মালিক। এজন্য এরূপ ঋণদাতাদের সহিত কোম্পানীর মুনাফা বা পরিচালন ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই। পুরাতন কোম্পানীও এইভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে।

(৪) **ব্যাঙ্ক হইতে দাদন (Advance from Bank) :** স্বল্প সময়ের জন্য মূলধনের অভাব ঘটিলে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দাদন লইয়া সে অভাব পূরণ করা চলে। এরূপ স্বল্প-মিয়াদী দাদন দেওয়া ব্যাঙ্কের একটি প্রধান ব্যবসা ও কাজ। ব্যাঙ্ক এভাবে শিল্পপ্রচেষ্টাকে সহায়তা করিয়া থাকে। সেজন্য যে দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসা যত উন্নত সে দেশে শিল্প-প্রচেষ্টাও তত সাফল্য অর্জন করিতে পারে। ব্যাঙ্ক এরূপ দাদনের নিরাপত্তার জন্য জামিন হিসাবে শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ বা কাঁচামাল প্রভৃতি দাবী করিয়া থাকে।

(৫) **নির্বাহী নিযুক্তক (Managing Agents) :** অনেকক্ষেত্রে ধনী ব্যবসায়ী অনেক যৌথ কোম্পানীর পরিচালনভার গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যবসায়ীকে 'নির্বাহী নিযুক্তক' আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতীয় যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা ও উহাদের সমৃদ্ধি অনেকাংশে এই 'নির্বাহী নিযুক্তক' দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতীয় ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প-প্রগতির ইতিহাসে ইহাদের অবদান অসামান্য। ইহাদের অবদান অসামান্য হইলেও এরূপ

ব্যবস্থা যৌথ কোম্পানীর পক্ষে সব সময় কল্যাণকর হয় নাই। ইহারা নূতন বা পুরাতন সকল কোম্পানীকেই মূলধন সরবরাহ করিতে পারেন। তবে এই ব্যবস্থা বর্তমানে বিলুপ্ত।

(৬) **আমানত (Deposit) :** বড় বড় যৌথ কোম্পানী জনসাধারণের নিকট হইতে অমানত গ্রহণ করিয়াও মূলধনের অভাব পূরণ করিয়া থাকে। বোম্বাই ও আমেদাবাদের কার্পাস শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি এইভাবে অনেকটা মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকে।

(৭) **মূলধনী সংস্থা (Finance Institute) :** ব্যাঙ্ক ছাড়া বীমা কোম্পানী ও বিভিন্ন লগ্নীকারক সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিও যৌথ কোম্পানীকে ঋণ দিয়া মূলধনের অভাব পূরণ করে। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স করপোরেশন, ষ্টেট ফিনান্স করপোরেশন, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন প্রভৃতি মূলধনী সংস্থাগুলি যৌথ কোম্পানীগুলিকে প্রয়োজনবোধে মূলধন বাবদ ঋণপ্রদান করিয়া আসিতেছে। ইহাদের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন পাওয়া পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ হইয়াছে। পুরাতন কোম্পানীর পক্ষেও স্বল্প বা দীর্ঘ মিয়াদী পরিকল্পনার জন্য ইহাদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে।

(৮) **সংরক্ষণ তহবিল (Reserve Fund) :** অনেক যৌথ কোম্পানী তাহাদের মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ মালিকদের মধ্যে বণ্টন না করিয়া সংরক্ষণ তহবিলে রাখিয়া পুনরায় উহা মূলধন হিসাবে কাজে লাগাইয়া থাকে। ইহাকে অন্য কথায় মুনাফা বিনিয়োগ (Ploughing back of profits) বলা হয়।

উন্নয়নমূলক মূলধন (Development Finance)

কোম্পানীর কাজ আরম্ভ ও চালু রাখার জন্য উপরি-উক্ত উপায়ে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করাই সাধারণ রীতিনীতি। কিন্তু কোম্পানী শুধু চালু রাখাই কোম্পানী পরিচালকদের একমাত্র কাজ নয়। কোম্পানী যাহাতে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং জনকল্যাণ সাধন করিতে পারে সে দিকেও কোম্পানীর পরি-পরিচালকদের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করাও উহাদের দায়িত্ব। অন্য কথায় উন্নয়নমূলক মূলধন (Development Finance) সংগ্রহ করার ব্যাপারেও ইহাদিগকে সচেষ্ট থাকিতে হয়। এরূপ মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারে মুনাফা বিনিয়োগ (Ploughing back of profits) বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যে কোম্পানী নিজস্ব মুনাফা ইহার উন্নতির জন্য যত ব্যয় করিতে পারে সে কোম্পানীর আর্থিক বনিয়াদ তত দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া নূতন শেয়ার বিক্রয়, ঋণপত্র বিক্রয়, আমানত, মূলধনী সংস্থাগুলি হইতে ঋণগ্রহণ প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়েও ইহা উন্নয়নমূলক মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে।

ঋণের জন্য জামিন : (Securities for Loans)

কোম্পানী ঋণ গ্রহণ করিলে উক্ত ঋণের জন্য ইহাকে জামিনের ব্যবস্থা করিতে

হয়। কারণ যিনি ঋণ প্রদান করিবেন তাঁহার ঋণের টাকা ফেরত পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। ঋণের জন্য যে জামিন গ্রহণ করা হয় উহা উক্ত ঋণের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। ঋণ-গ্রহীতার উপর ঋণ-দাতার বা ঋণ-প্রদানকারীর আস্থা থাকিলে তিনি ঋণের জন্য কোন জামিন দাবী নাও করিতে পারেন। এরূপ ঋণ 'অজামিনযুক্ত' (Unsecured Loan) বলিয়া অভিহিত। কিন্তু যে ঋণ লইলে জামিন দিতে হয় উহাকে বলা হয় 'জামিনযুক্ত ঋণ' (Secured Loan)। জামিনযুক্ত ঋণের জন্য জামিন হিসাবে যাহা সাধারণত দেওয়া হয় এবং যেভাবে দেওয়া হয় উহার প্রকৃতি (nature) নিম্নরূপ :

জামিনযুক্ত ঋণের জন্য যে জামিনের ব্যবস্থা থাকে উহা ব্যক্তিগত (Personal) বা অব্যক্তিগত (Impersonal) হইতে পারে। কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনও ঋণের জন্য যদি জামিনদার (Surety বা Guarantor) হন তবে উহাকে 'ব্যক্তিগত জামিন' (Personal Security) বলে। কিন্তু ব্যক্তিগত জামিন ছাড়া যখন ঋণের জন্য জামিন হিসাবে কোনও বস্তু প্রদান করা হয় তখন উহাকে বলা হয় 'অব্যক্তিগত জামিন' (Impersonal Security)। কোনও কারবারী প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহণের সময় এই অব্যক্তিগত জামিনই বেশী প্রদান করিয়া থাকে। ইহা ঋণের পরোক্ষ সমর্থন বা সহায়ক (collateral) হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

জামিন হিসাবে যে সকল বস্তু কাজ করিয়া থাকে উহাদের মধ্যে স্বর্ণ, [illegible], পণ্যদ্রব্য, পণ্যদ্রব্যের দলিলপত্র, স্থায়ী সম্পত্তি (জায়গাজমি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি), অস্থায়ী বা চলতি সম্পত্তি (মজুত মাল, অন্যান্য সরবরাহ সম্পত্তি) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বিভিন্ন প্রকারের বস্তু দুই প্রকারে জামিন রাখা চলে : (১) পূর্ণবন্ধক (Pledge) এবং (২) প্রতিশ্রুত বন্ধক (Hypothecation)।

জামিন হিসাবে পূর্ণবন্ধক দিলে যে বস্তু বন্ধক দেওয়া হয় উহা ঋণ প্রদানকারীর অধিকারে চলিয়া যায়। ঋণ পরিশোধ করার সময় উক্ত বস্তুর অধিকার ঋণদাতা বা ঋণপ্রদানকারীর নিকট হইতে ফেরত পাওয়া যায়।

প্রতিশ্রুত বন্ধকে জামিন হিসাবে যে বস্তু কাজ করিয়া থাকে উহা ঋণ-গ্রহীতার অধিকারেই বা নিকটেই থাকিয়া যায়। প্রতিশ্রুত মত ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে উক্ত বস্তু ঋণ-প্রদানকারীর অধিকারে চলিয়া যায় এবং ঋণ-প্রদানকারী উহার ইচ্ছামত ব্যবহার দ্বারা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া লন।

ঋণ গ্রহণের অন্য দুই প্রকার ব্যবস্থাও প্রচলিত আছে : (১) স্থায়ী অধিকার (Fixed Charge) এবং (২) চলতি অধিকার (Floating Charge)। যখন কোনও বস্তু বা সম্পত্তি জামিন হিসাবে বন্ধক দেওয়া হয় এবং ঋণ-প্রদানকারীর অনুমতি ভিন্ন উহা হস্তান্তর বা অন্যভাবে ব্যবহার করা চলে না তখন উহাকে 'স্থায়ী অধিকার' বলা হয়। আর যখন উক্ত বস্তুর ব্যবহার বা হস্তান্তর ঋণ-প্রদানকারীর অনুমতি ভিন্ন করা চলে এবং কেবল ঋণ পরিশোধের বা উহার সুদ প্রদানে খেলাপ হইলে উহাতে ঋণ-দাতার অধিকার স্থিরীকৃত হয় তখন উহা 'চলতি অধিকার' নামে পরিচিত হয়।

যৌথ মূলধনী কারবারের মূলধন সংগ্রহ ও উহার সমস্যা (Corporate Finance and the Problems of Corporate Finance)

কোনও যৌথ কোম্পানী বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান উহার কারবার বা উৎপাদন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে ইচ্ছা করিলে উহাকে স্থায়ী, চলতি, দীর্ঘমিয়াদী, স্বল্পমিয়াদী প্রভৃতি কাজ-কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করিতে হয়। এই প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহকেই যৌথ মূলধনী কারবারের মূলধন সংগ্রহ বলে।

মালিকই প্রধানত কোন কারবারের মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকেন। একক-মালিকানা বা অংশীদারী কারবারে সাধারণত উহার মালিক বা অংশীদারগণ প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান দিয়া থাকেন। কারণ এরূপ কারবারের আয়তন খুব বৃহৎ হয় না বলিয়া তাঁহাদের নিজেদের পুঁজি ও সামান্য ঋণ মূলধনের প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। কারবার বড় হইলে বিশেষত যৌথ কোম্পানীর পক্ষে কারবারের গোড়াপত্তন, স্থায়ী সম্পত্তি ও কাঁচামাল ক্রয়, চলতি ব্যয় নির্বাহ, কারবারের সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষ প্রভৃতির জন্য প্রচুর মূলধন প্রয়োজন হয়। শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের গণ্ডি যখন নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং বর্তমান কালের মত উহার জটিলতা বিস্তৃতিলাভ করে নাই তখন উহার মূলধন সংগ্রহ খুব বেশী সমস্যাসঙ্কুল ছিল না। কিন্তু সেই অবস্থার অনেক পরিবর্তন দেখা দেওয়ায় মূলধন সংগ্রহের নানাবিধ সমস্যাও দেখা দিয়াছে। কেবল মূলধন সংগ্রহ করিলেই উক্ত সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় না। কারবারের প্রয়োজনীয় মূলধন নির্ধারণ এবং উহার সুষ্ঠু বিনিয়োগও এই সমস্যার অঙ্গীভূত। **কোন্ কারবারে কি পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন উহা নির্ধারণের জন্য প্রধানত দুই পন্থা অবলম্বন করা হয়।** একটি হইতেছে, প্রকৃত ব্যয়ের অনুমান অনুযায়ী উহা স্থির করা। এই নীতিতে কারবার স্থাপনের, উহার বিভিন্ন সম্পত্তির ক্রয়মূল্যের ও কারবারের চলতি ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে ইহা স্থির করা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পন্থা হইতেছে, তুলনামূলক ব্যয়ের ভিত্তিতে উহা নির্ধারণ করা। এই নীতিতে একই আয়তনের এবং একই প্রকৃতির কয়েকটি চলতি কারবারের মূলধন ও অন্যান্য তথ্য তুলনামূলকভাবে বিচার-বিবেচনা করিয়া মূলধনের পরিমাণ স্থির করা হয়। কখনও কখনও উভয় প্রকার পদ্ধতির গড় নির্ণয় করিয়া মূলধনের পরিমাণ স্থির করা হয়।

যে প্রকার নীতিই গ্রহণ করা হউক না কেন, মোটের উপর নীতিটি কারবারের পক্ষে সুস্থ ও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া চাই। সুতরাং মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগের উপরি-উক্ত সমস্যাগুলির উপযুক্ত সমাধান ভিন্ন কোন কারবারই স্থায়ী উন্নতিলাভ করিতে পারে না। যাঁহারা কোম্পানীর কর্ণধার হইবেন তাঁহাদের পক্ষে কোম্পানী পরিচালনায় অন্যান্য সমস্যার মধ্যে মূলধনের এই বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে এবং তদনুযায়ী উহার সুষ্ঠু মীমাংসার পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এই সমস্যার সমাধান না করিতে পারিলে কারবারটি অতিরিক্ত মূলধন (Over-capitalisation) অথবা স্বল্প-মূলধন (Under-capitalisation) দোষযুক্ত হইবে। এই দুই অবস্থার

কোনটিই কোম্পানীর উন্নতির ও স্থায়িত্বের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। কোন কারবারে অতিরিক্ত মূলধন হইলে মূলধনের বিনিয়োগের অনুপাতে লাভ কম হইবে এবং বাজারে উহার শেয়ারের মূল্যে মন্দা দেখা দিবে। এরূপ অবস্থায় কোম্পানীর মালিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। পক্ষান্তরে পরিচালকগণ এই অতিরিক্ত মূলধন কোম্পানীর পক্ষে অলাভজনক কারবারে নিযুক্ত করিতে পারেন কিংবা কোম্পানীর অলাভজনক সম্প্রসারণ ঘটাইতে পারেন। আবার কারবারে স্বল্প-মূলধন দেখা দিলে কারবার কখনই লাভজনকভাবে চালানো সম্ভব হইবে না এবং উহার সম্প্রসারণের সুযোগ-সুবিধা থাকিলেও উহা মূলধনের অভাবে ব্যাহত না হইয়া যায় না। সুতরাং স্বাভাবিক মূলধন (Normal Capitalisation)-ই সুষ্ঠু কারবার পরিচালনার নীতি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কোনও কোম্পানীর প্রয়োজনীয় মূলধন স্থিরীকরণ (Determination of the capital requirements of a Company)

কোনও কারবারের জন্য স্থায়ী (Fixed) এবং চলতি (Circulating or Working) মূলধন প্রয়োজন। জমি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য যে মূলধন নিয়োজিত হয় উহাকে 'স্থায়ী মূলধন' আখ্যা দেওয়া হয়। এই মূলধন কারবারে আবদ্ধ থাকে এবং উহাকে নগদ অবস্থায় অন্য কাজে লাগান যায় না। কারবার ভঙ্গ হইলে অবশ্য জমি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিক্রয় দ্বারা বাজার দর অনুযায়ী উক্ত মূলধনের আংশিক, সম্পূর্ণ বা অতিরিক্ত ফেরত পাওয়া যায়। কারবার চালু অবস্থায় এই মূলধন এইভাবে আবদ্ধ থাকে বলিয়া উহাকে 'আবদ্ধ মূলধন' (Block Capital)-ও বলা হয়।

যে মূলধন কারবার চালু রাখার জন্য ব্যয়িত হয়, আবর্তিত হয় এবং পুনরায় কারবারে নগদ অর্থরূপে ফিরিয়া আসে উহাকে 'চলতি মূলধন' আখ্যা দেওয়া হয়। কোন্ কারবারে কি পরিমাণ স্থায়ী বা চলতি মূলধনের প্রয়োজন হইবে উহা বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে।

স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির উপর নির্ভরশীল:

১। **কারবারের প্রকৃতি (Nature of the Business):** অনেক কারবার প্রতিষ্ঠার জন্য বিরাট জায়গা, বাড়ী ও মূল্যবান যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা, গ্যাস কোম্পানী, রেলপথ নির্মাণ, ট্রাম কোম্পানী, লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা প্রভৃতি কারবার এই প্রকৃতির। উপরি-উক্ত ব্যয়ভার বহনের জন্য এরূপ কারবারে প্রচুর স্থায়ী মূলধন প্রয়োজন। বিযোজন (Analytical) শিল্পের জন্যও প্রচুর স্থায়ী মূলধন প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষুদ্র আকারের পণ্য বা ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের কারবারে স্থায়ী মূলধন কম হইলে চলে। ইহা ছাড়া সংযোজন (Assembly) শিল্পের জন্যও কম স্থায়ী মূলধন হইলে চলে।

২। **উৎপাদন পদ্ধতি (Method of Production):** দীর্ঘ ও জটিল উৎপাদন পদ্ধতিতে কারবার পরিচালিত হইলে উহাতে যন্ত্রপাতি অনেক

প্রয়োজন। এজন্য স্থায়ী মূলধনও বেশী প্রয়োজন। পক্ষান্তরে উৎপাদন পদ্ধতি সরল ও সংক্ষিপ্ত হইলে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ কম হইলে চলে।

৩। **বাণিজ্যিক কারবার** (**Commercial Undertaking**) : ইহাতে বৃহৎ ও মূল্যবান যন্ত্রপাতির প্রয়োজন বেশী হয় না। এজন্য এরূপ কারবারে স্থায়ী মূলধন কম হইলেও চলে।

৪। **কারবারের আয়তন** (**Size of the Business**): কারবারের আয়তন ছোট হইলে স্থায়ী মূলধন কম প্রয়োজন, কিন্তু কারবারের আয়তন বৃহৎ হইলে স্বভাবতই স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ বেশী প্রয়োজন।

চলতি মূলধন প্রধানত প্রয়োজন হয় কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন প্রদান, কারখানা ও অফিসের ব্যয় প্রভৃতির জন্য। যে সকল অবস্থার উপর চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ভর করে উহা নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। **উৎপাদনকালের দৈর্ঘ্য** (**Length of the Period of Production**): যদি উৎপাদন প্রক্রিয়া দীর্ঘ কালের ব্যাপার হয় তবে পণ্য বিক্রয় দ্বারা নগদ টাকা শীঘ্র ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা কম। এরূপ অবস্থায় চলতি মূলধনের পরিমাণ কিছু বেশী প্রয়োজন।

২। **বিক্রয়ের দ্রুততা** (**Rapidity of Sales**): পণ্য বিক্রয় দ্রুত হইলে নগদ টাকার আমদানী বেশী হইয়া থাকে। এজন্য চলতি মূলধনের পরিমাণ কিছু কম হইলে চলে।

৩। **ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত** (**Terms of Sales and Purchases**) : প্রচুর পণ্য ধারে বিক্রয় করার প্রয়োজন হইলে চলতি মূলধন বেশী প্রয়োজন। কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় যদি ক্রয়ও ধারে চালান যায় তবে চলতি মূলধনের পরিমাণ কম প্রয়োজন।

৪। **চলতি সম্পত্তির নগদে রূপান্তর** (**Conversion of Current Assets into Cash**): এইরূপ সুবিধা থাকিলে চলতি মূলধন কিছু কম হইলে চলে। কারণ প্রয়োজনবোধে চলতি সম্পত্তি নগদে রূপান্তর দ্বারা চলতি মূলধনের অভাব পূরণ করা চলে।

৫। **মরসুম ভেদে পণ্যের চাহিদার তারতম্য** (**Seasonal Variation in the demand for the Products**) : পণ্যের চাহিদা কোন সময়ে বেশী এবং কোন সময়ে কম হইলে যে সময়ে পণ্যের চহিদা কম তখন চলতি মূলধন বেশী প্রয়োজন। আবার পণ্যের চাহিদা যখন বৃদ্ধি পায় তখন কম চলতি মূলধন হইলে চলে।

৬। **মরসুম ভেদে কাঁচামালের মূল্যের তারতম্য** (**Seasonal Variation in the Prices of Raw Materials**): এরূপ অবস্থায় যখন কাঁচামালের মূল্য কম থাকে তখন উহা ক্রয় দ্বারা মজুত রাখার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে চলতি মূলধন কিছু বেশী প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

শেয়ার বনাম ঋণপত্র (Shares vs. Debentures)

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী মূলধন সংগ্রহের জন্য দুই প্রকারের শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে। উহা হইতেছে—সুবিধাভোগী শেয়ার (Preference Share) এবং ইকুইটি শেয়ার (Equity Share)। দুই প্রকার শেয়ার বিক্রয় করার উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকৃতির ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ করা। যিনি কেবল নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাইতেই ইচ্ছুক এবং উহার বেশী ঝুঁকি লইতে ইচ্ছুক নন তিনি স্বভাবতই সুবিধাভোগী শেয়ার ক্রয় করিবেন। কিন্তু যিনি লভ্যাংশ সম্বন্ধে আরও অধিক ঝুঁকি লইতে ইচ্ছুক তিনি স্বভাবতই ইকুইটি শেয়ার ক্রয় করিবেন। ইহা ছাড়া সুবিধাভোগী শেয়ারের লভ্যাংশ নির্দিষ্ট বলিয়া উহার মূল্য বাজারে বেশী উঠা-নামা করে না কিন্তু ইকুইটি শেয়ারের মূল্য লভ্যাংশের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। লভ্যাংশ বেশী হইলে উহার মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং লভ্যাংশ কম হইলে উহার মূল্য হ্রাস পায়। কোম্পানীর পক্ষে অবশ্য ইকুইটি শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা সুবিধাজনক। ইহাতে মূলধন ফেরত দেওয়ার প্রশ্ন নাই এবং লভ্যাংশ প্রদান সম্পর্কেও কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। এইভাবে অনেক কোম্পানীই উহার স্থায়ী মূলধনের অভাব পূরণ করিয়া থাকে। তবে শেয়ার ক্রয় করার সমস্যাও আছে। কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চয় না হইতে পারিলে কেহই শেয়ার ক্রয় করিতে আগ্রহশীল হন না। সুবিধাভোগী শেয়ারের অবশ্য এরূপ অসুবিধা কম থাকে।

কেবল শেয়ার বিক্রয় দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলে খুবই ভাল হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই শেয়ার বিক্রয় দ্বারা প্রয়োজনীয় স্থায়ী ও চলতি মূলধন সংগ্রহ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে। এজন্য অনেক কোম্পানী শেয়ার বিক্রয় ছাড়া ঋণপত্রও বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহার উপর অবশ্য নির্দিষ্ট হারে কোম্পানীকে সুদ দিতে হয়। যাঁহারা কোন প্রকার ঝুঁকি না লইয়া কেবল সুদের আশায় লগ্নি করিতে প্রস্তুত তাঁহাদের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা মন্দ নহে। তবে শেয়ার-গ্রহীতারা যেমন কোম্পানীর মালিক, ইহারা সেরূপ নন। ইহারা কেবল পাওনাদার। কোম্পানীর স্থায়ী মূলধন, দীর্ঘমিয়াদী পরিকল্পনা ও সম্প্রসারণের জন্য মূলধন এইভাবে অনেকটা সংগ্রহ করা চলে। এরূপ ঋণপত্রের দ্বারা কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হইলে সুদ বাবদ উহার ব্যয় কমই হয় এবং শেয়ার-গ্রহীতাগণ উচ্চ হারেই লভ্যাংশ পাইতে পারেন। তবে কোম্পানীর আয়ের মাত্রা কিরূপ হইবে তাহার উপরই এই মিতব্যয়িতা নির্ভর করে। কোম্পানী বেশ লাভজনক মনে হইলে ঋণপত্র দ্বারা মূলধন সংগ্রহের ব্যয় কম পড়িবে। নতুবা কোম্পানীকে ব্যয়াধিক্যের চাপ সহ্য করিতে হইবে। আবার নূতন কোম্পানীর ঋণপত্র দ্বারা মূলধন সংগ্রহ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা ও লাভের পরিমাণ মোটামুটি না জানিতে পারিলে অনেকেই ঋণপত্র ক্রয় করিতে আগ্রহশীল হইবেন না। নূতন কোম্পানী সম্বন্ধে এ সংবাদ পাওয়া সম্ভব নহে। উহা ছাড়া এই ঋণের জামিনস্বরূপ প্রচুর স্থায়ী সম্পত্তিরও প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি বিশেষ বিবেচনা করিয়াই কি উপায়ে মূলধন সংগৃহীত হইবে উহা কোম্পানীর কর্ণধারগণ স্থির করিবেন।

কারবারের মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে স্বীয় মুনাফার পুনর্নিয়োগ বা বিনিয়োগ (Ploughing back of profits as a method of business finance)

নূতন কোম্পানী ছাড়া প্রায় প্রত্যেক কোম্পানীই উহার লভ্যাংশের কিছুটা অংশ সঞ্চয় তহবিলে জমা রাখে। প্রতি বৎসর এইভাবে জমা হইয়া উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এই অবণ্টিত লভ্যাংশই কারবারে পুনর্নিয়োজিত হইয়া মূলধনের অভাব পূরণ করিয়া থাকে। ইহাই মূলধন হিসাবে স্বীয় মুনাফার পুনর্নিয়োগ। ইহার সুবিধাগুলি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। ইহাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং অত্যন্ত কম ব্যয়ে মূলধন সংগ্রহের উপায়। এই মুনাফা মূলধন হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে শুধু হিসাবের খাতায় উহা লিখিলেই চলে। কিন্তু বাহির হইতে ঋণ করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে হইলে উহাতে অনেক জটিল সমস্যা দেখা দেয়, সুদ দিতে হয় এবং ঋণ ফেরতও দিতে হয়। এ সমস্ত অসুবিধা অবণ্টিত মুনাফা সম্বন্ধে নাই।

২। এরূপ অবণ্টিত মুনাফা মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হইলে কারবারকে মন্দার জন্য কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। বরং সেই মন্দার সময় কম মূল্যে কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় এবং শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা কারবারের উন্নতি ও সম্প্রসারণ অনয়াসসাধ্য হয়।

৩। ম্যানেজিং এজেন্টদের নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহের হাত হইতেও ইহার দ্বারা রেহাই পাওয়া যাইত।

৪। বাহিরের দায় হইতে মুক্ত এরূপ মূলধন নিয়োগ দিন দিন কারবারের উন্নতিই সূচনা করে। ইহাতে শেয়ার-গ্রহীতাদের পক্ষে অধিক লভ্যাংশ পাওয়া সম্ভব হয়। অধিক লভ্যাংশ দেওয়ার ফলে বাজারে শেয়ারের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। প্রয়োজন হইলে শেয়ার-গ্রহীতাগণ উহা বিক্রয় করিয়া অধিক টাকা পাওয়ার অধিকারী হন।

৫। ইহাতে জাতীয় স্বার্থও রক্ষিত হয়। কারণ অবণ্টিত মুনাফা কোম্পানীর ঘরে মজুত থাকায় উহার দ্বারা কারবারের উন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্ভব হয়। এই উন্নতির ফলে ক্রেতাসাধারণ কম মূল্যে জিনিস পাইতে পারেন, অধিক শ্রমিক নিয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে এই মুনাফা কোম্পানীর ঘরে না থাকিয়া যদি শেয়ার-গ্রহীতাদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টিত হয় তবে উহাতে উক্ত অর্থ কতিপয় ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত হইয়া পড়ে। ফলে সেই অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হইবে বলা যায় না। কারবারের প্রয়োজন মিটাইতে উক্ত অর্থ নাও পাওয়া যাইতে পারে।

৬। এই অবণ্টিত মুনাফার ভিত্তিতেই যুক্তরাষ্ট্রে এবং গ্রেট বৃটেনে অনেক শিল্প-

কারখানা গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। আমাদের দেশে মূলধন গঠন এক বিপুল সমস্যা। সুতরাং ভারতের মত দরিদ্র দেশে অবন্টিত মুনাফার ভিত্তিতে কারবারের উন্নতি ও সম্প্রসারণ সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলিও আছে :

১। ইহাতে কতকগুলি স্বার্থান্বেষী শিল্পপতির সৃষ্টি হয় এবং ইহারা নিজেদের স্বার্থপূরণের জন্য অনেকের এই অবন্টিত লভাংশ কাজে লাগায় এবং শিল্পসাম্রাজ্য সৃষ্টির দ্বারা কতিপয় হস্তে দেশের অধিকাংশ ধন-সম্পত্তি স্থানান্তর করে।

২। শেয়ার-গ্রহীতাগণ শেয়ার ক্রয় করেন অধিক লভ্যাংশ পাওয়ার আশায়। এরূপ অবস্থায় উঁহারা আশাহত হন।

৩। কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য। সুতরাং কোন্ সময়ে কোন্ শেয়ার-গ্রহীতার শেয়ার বিক্রয় করার প্রয়োজন হইবে বলা চলে না। যিনি কম লভ্যাংশ পাওয়ার সময় শেয়ার বিক্রয় করেন তিনি দুই দিক হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হন। শেয়ারের মূল্যও কম পান এবং মুনাফাও কম পান। সুতরাং এরূপ ব্যবস্থা ইহাদের নিকট অবিচারমূলক।

৪। ক্রমাগত লভ্যাংশের অংশ অবন্টিত রাখিয়া এবং এইভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মূলধন (Over-capitalisation) বিনিয়োগ দ্বারা কর্ণধারগণ কোম্পানীর দুরবস্থা ডাকিয়া আনিতে পারেন।

৫। অনেক বৃহদাকার একচেটিয়া শিল্পসাম্রাজ্যের পতন এইভাবেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহা যে দেশের স্বার্থবিরোধী ইহা দেশের প্রত্যেক কল্যাণকামী ব্যক্তিই স্বীকার করিয়া থাকেন।

শেয়ার বিক্রয় (Marketing of Shares)

শেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিক্রয় হয়। সুবিধা ও অসুবিধাসহ নিম্নে উহাদের বিবরণ দেওয়া হইল :

১। ম্যানেজিং এজেন্টদের মারফত (Through Managing Agents) : পূর্বে ম্যানেজিং এজেন্ট সাধারণত কোম্পানীর প্রবর্তকের কাজ করিতেন। উঁহারা কোম্পানীর মূলধনের ব্যবস্থা ও পরিচালনা উভয়ই করিতেন। এই সকল পেশাদারী ম্যানেজিং এজেন্ট নিজেদের আত্মীয় ও অনাত্মীয়দের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় করিতেন। কিছু সংখ্যক শেয়ার নিজেরাও ক্রয় করিতেন। এইভাবেও অনেকক্ষেত্রে কোম্পানীর মূলধন সংগৃহীত হইত। এই ব্যবস্থার সুবিধা নিম্নরূপ :

(ক) এই ব্যবস্থা কোম্পানীর ডিরেক্টরদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক ছিল। কারণ ইহাতে উঁহাদের শেয়ার বিক্রয় করার কোন ঝুঁকি বহন করিতে হইত না।

(খ) উঁহারা পরিচালনার কাজও নির্বাহ করিতেন বলিয়া কোম্পানীর পক্ষে প্রয়োজনীয় মূলধন ঠিকমত সময়ে পাওয়া সম্ভব হইত। কারণ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে

কিংবা বাহিরের লোকের নিকট প্রয়োজনীয় শেয়ার বিক্রয় করিতে না পারিলে উহারা নিজেরাই উহা ক্রয় করিতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার অসুবিধা নিম্নরূপ ছিল :

(ক) ইহাতে শেয়ার বিক্রয়ের ব্যয় অযথা বৃদ্ধি পাইত। কারণ ইহারা উচ্চহারে শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন গ্রহণ করিতেন।

(খ) অনেক ক্ষেত্রে ইহারা শেয়ার বিক্রয়ের ছলে উহা লইয়া ফট্‌কাবাজীও করিতেন।

২। **বিজ্ঞাপনী প্রচার দ্বারা প্রত্যক্ষ বিক্রয় (Direct Sale through issue of Prospectus) :** এই পদ্ধতির দ্বারা কোম্পানী বিজ্ঞাপনীর মাধ্যমে জনসাধারণকে শেয়ার ক্রয় করিতে আহ্বান জানায়। এই আহ্বানের উত্তরে শেয়ার ক্রয় করিতে ইচ্ছুক জনগণ কোম্পানীর নিকট শেয়ার ক্রয় করার আবেদনপত্র পেশ করিয়া থাকেন। ইহার সুবিধা এই যে, এইভাবে সরাসরি শেয়ার বিক্রয় হইলে শেয়ার বিক্রয় ব্যয় খুব কম পড়ে। কারণ কোম্পানীকে এজন্য কাহাকেও কমিশন দিতে হয় না। কিন্তু ইহার অসুবিধা এই যে, ইহাতে কোম্পানীর পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শেয়ার বিক্রয় করা সম্ভব হয় না। ইহাতে শেয়ার বিক্রয় সম্বন্ধে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা থাকে।

৩। **দালালের মারফত (Through Brokers) :** কোম্পানীর শেয়ার দালালের মারফতও বিক্রয় হইতে পারে। কোন ব্যক্তিবিশেষ, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি এরূপ দালালের কাজ করিয়া থাকেন। ইহারা এজন্য কমিশন পান। ইহার সুবিধা এই যে, ইহাতে শেয়ার বিক্রয়ের অনিশ্চয়তা অনেক দূর হয় এবং ইহারা নানাভাবে কোম্পানীকে শেয়ার বিক্রয়ের যথোচিত অভিজ্ঞ পরামর্শ দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া ইহাতে যে সাধারণ কমিশন দিতে হয় উহা অন্য প্রকার কমিশন অপেক্ষা কম। তবে ইহার অসুবিধা এই যে, ইহাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় শেয়ার বিক্রয়ের কোন নিশ্চয়তা নাই।

৪। **দায়গ্রাহক মারফত (Through Underwriters) :** দায়-গ্রাহক মারফত কোম্পানীর সমগ্র বা আংশিক শেয়ার বিক্রয় হইতে পারে। ইহার জন্য অবশ্য দায়গ্রাহকগণ কোম্পানীর সহিত একটি বিশেষ চুক্তিতে আবদ্ধ থাকেন এবং চুক্তিমত শেয়ার বিক্রয়ের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার সুবিধা নিম্নরূপ :

(ক) ইহাতে কোম্পানী চুক্তিমত শেয়ার বিক্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিতে পারে এবং প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। কারণ চুক্তিমত জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় না হইলে দায়গ্রাহক নিজেই উহার অবশিষ্টাংশ ক্রয় করিয়া থাকেন। ইহাতে মূলধন সংগ্রহ দ্রুততর সম্পন্ন হয়। ফলে কোম্পানীর কার্য আরম্ভ করিতে কোন বিলম্ব হয় না।

(খ) দায়গ্রাহকগণ উঁহাদের অভিজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ পরামর্শও দিয়া থাকেন। ইহাতে কোম্পানীর যথেষ্ট উপকার সাধন হয়। খ্যাতিসম্পন্ন কোন দায়গ্রাহকের নাম

কোম্পানীর সহিত যুক্ত থাকিলে একাধারে জনসাধারণের মধ্যে যেমন শেয়ার বিক্রয়ের কোন অসুবিধা হয় না, পক্ষান্তরে উহাতে কোম্পানীর মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

(গ) শেয়ারের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত অস্থিরতা ও অস্বস্তিকর অবস্থাও ইহাতে খুব কম হয়।

(ঘ) দায়গ্রাহকগণের সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লগ্নীকারকগণের মনে নিরাপত্তাও আনিয়া দেয় এবং উঁহারা কোম্পানীর স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল চিত্র সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া শেয়ার ক্রয় করিতে পারেন।

কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে, দায়গ্রাহকগণ তাঁহাদের শেয়ার বিক্রয়ের কাজের জন্য অধিক কমিশন দাবী করিয়া থাকেন। এজন্য শেয়ার বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। তবে অবশ্য আইনত শেয়ারের মোট মূল্যের শতকরা ৫ ভাগের বেশী কমিশন ইঁহারা দাবী করিতে পারেন না। ইহা ছাড়া কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীতে এরূপ দায়গ্রহণের উল্লেখ না থাকিলে এইভাবে শেয়ার বিক্রয় করা চলে না।

৫। লগ্নিকারক সংস্থা মারফত (Through Investment Institutions): ইহাদের মাধ্যমেও শেয়ার বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণত কোম্পানীর সমগ্র শেয়ার ক্রয় করিয়া থাকে এবং পরে উহা জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহার সুবিধা হইতেছে যে, কোম্পানীর উপর শেয়ার বিক্রয়ের কোন ঝুঁকিই থাকে না এবং দ্রুততার সহিত মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারেও ইহার কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু ইহার অসুবিধার মধ্যে দেখা যায় যে, ইহাদের কমিশনের হার সাধারণ হার অপেক্ষা বেশী। এজন্য কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

৬। কর্মিবৃন্দের মধ্যে (Among Employees): অনেক কোম্পানী কর্মীদের মধ্যেও শেয়ার বিক্রয় দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই পন্থা শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতির পক্ষে এবং কর্মীদের মধ্যে কাজের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি ব্যাপারে বিশেষ সুবিধাজনক। তবে এভাবে সমগ্র শেয়ার বিক্রয় কখনই সম্ভব হয় না এবং কর্মীদের মধ্যে সকল শেয়ার বিক্রয় করাও পরিচালকদের ইচ্ছা নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে অতি অল্প সংখ্যক শেয়ারই ইহাদের মধ্যে বিক্রীত হয়। অনেক ক্ষেত্রে কর্মীদের চেষ্টায় উহাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিকটও শেয়ার বিক্রয় হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে পরিচালকগণও এইভাবে শেয়ার বিক্রয় করিয়া থাকেন। তবে মোটের উপর ইহাতে শেয়ার বিক্রয়ের ব্যয় কম পড়ে বটে, কিন্তু প্রয়োজন মত অধিক পরিমাণে এইভাবে শেয়ার বিক্রয় হয় না এবং ইহাতে শেয়ার বিক্রয় সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার হাত হইতেও রক্ষা পাওয়া যায় না।

৭। বর্তমান শেয়ার-গ্রহীতাদের মধ্যে (Among Existing Shareholders): কোন চালু কোম্পানী উহার মূলধন বৃদ্ধি করার ইচ্ছা করিলে নূতন শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে। তবে এই শেয়ার প্রথমত বর্তমান শেয়ার-গ্রহীতাদের শেয়ারের অনুপাতে উহাদের মধ্যেই বিক্রয় করার নিয়ম। এইভাবে অবশ্য

অনেকক্ষেত্রে অনেক শেয়ার বিক্রয় হইয়া থাকে। উহারা উক্ত শেয়ার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে কিংবা 'জনসাধারণের নিকট অগ্রেই বিক্রয় হউক' এরূপ বিশেষ প্রস্তাব (Special resolution) শেয়ার-গ্রহীতাগণ কর্তৃক পাশ হইলে এবং উহাদের এরূপ সাধারণ প্রস্তাব (Ordinary resolution) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে জনসাধারণের নিকট এরূপ শেয়ার বিক্রয় করা চলে। শেয়ার-গ্রহীতাদের মধ্যে এরূপ শেয়ার বিক্রয় হইলে ব্যয় কম পড়ে এবং কোম্পানী শেয়ারের টাকা সময়মত পাইতেও পারে।

মূলধন বিন্যাস বা গঠন প্রণালী (Capital Gearing or Structure) :

মূলধন বলিতে এখানে ইকুইটি শেয়ার, সুবিধাভোগী শেয়ার, ঋণপত্র প্রভৃতি বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত মূলধনকে বুঝাইতেছে। যে অনুপাতে উক্ত তিন প্রকার মূলধন সংগৃহীত হইয়া থাকে সেই অনুপাতকে এক কথায় মূলধন বিন্যাস বা গঠন প্রণালী (Capital Gearing or Structure) বলে। Gerstenberg বলেন—"By capital structure we mean the kinds of securities and their proportionate amounts that make up the capitalisation."[1] মূলধনের এই আদর্শ বা যথোপযুক্ত অনুপাত স্থির করা এক দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নাই। কারণ এই অনুপাতের তারতম্যের জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি হয় উহা কারবার পরিচালনার পক্ষে নানারূপ সমস্যার সৃষ্টি করে। যখন অন্যান্য শ্রেণীর মূলধনের তুলনায় ইকুইটি শেয়ার-মূলধনের অনুপাত কম হয় তখন উহাকে উচ্চ-বিন্যস্ত মূলধন (high-geared capital) বলা হয়। আবার অন্যান্য শ্রেণীর মূলধনের তুলনায় ইকুইটি শেয়ার-মূলধন বেশী হইলে উহাকে নিম্ন-বিন্যস্ত মূলধন (low-geared capital) বলা হয়।

মূলধনের উচ্চ-বিন্যাস থাকিলে ইকুইটি শেয়ার-গ্রহীতাগণের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ মোট মুনাফা হইতে নির্দিষ্টহারে সুবিধাভোগী শেয়ার এবং ঋণপত্র-গ্রহীতাদের লভ্যাংশ দেওয়ার পর যে অবশিষ্ট মুনাফা থাকে উহা ইকুইটি শেয়ার-গ্রহীতাদের প্রাপ্য হয়। কোম্পানী লাভজনক অবস্থায় পরিচালিত হইলে এই অবশিষ্ট মুনাফার পরিমাণ মোটেই কম হয় না এবং উহারা এজন্য সুবিধাভোগী শেয়ার এবং ঋণপত্র-গ্রহীতাদের তুলনায় উচ্চতর হারে লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন। এই অবস্থাকে অন্য কথায় 'ইকুইটির উপর কারবার' (Trading on the Equity) বলা হয়। কিন্তু এরূপ অবস্থায় উক্ত শেয়ার লইয়া ফটকা কারবার চলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। আবার মূলধনের নিম্ন-বিন্যাস হইলে উহার বিপরীত অবস্থা দেখা দেয় এবং ইকুইটি শেয়ার বাজারে মন্দার সৃষ্টি হয়। সুতরাং আদর্শ মূলধন বিন্যাস কোম্পানীর সাংগঠনিক স্থিতিশীলতা (Organisation stability)-র জন্য অবশ্য কাম্য। কিন্তু এই আদর্শ মূলধন বিন্যাস কোন অবস্থাতেই প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না।

1. Financial Organisation and Management of Business, P. 166.

কেবল কতকগুলি অবস্থা বিবেচনা করিয়া উহার আদর্শ অবস্থায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়। এই অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিবেচনা করা হয়:

(ক) কারবারের প্রকৃতি, (খ) উহার আয়তন, (গ) প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ, (ঘ) সুদের হার, (ঙ) জামিন দেওয়ার মত সম্পত্তি, (চ) পণ্যের বাজারের অবস্থা, (ছ) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, (জ) বাণিজ্য-চক্র (Trade Cycle) এর বিভিন্ন পর্যায় ও প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। মূলধন বিন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে—যথাসম্ভব ব্যয়-সঙ্কোচ দ্বারা সুষ্ঠুভাবে কোম্পানী পরিচালনা করা।

সাধারণভাবে বলা চলে—কোম্পানীর প্রাথমিক অবস্থায় যখন মুনাফালাভ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা থাকে না, কিন্তু ভবিষ্যতে মুনাফালাভের সম্ভাবনা থাকে তখন ইকুইটি শেয়ার বিক্রয় দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করাই অধিকতর শ্রেয় মনে করা উচিত। কারণ মুনাফার অবস্থা না জানিয়া সুবিধাভোগী শেয়ার বা ঋণপত্রের সুদের ভার কোম্পানীর উপর চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত নয়। এরূপ বোঝা বা ভার কারবারের শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায়। তাহা ছাড়া আর্থিক বাজারের অবস্থাও বিবেচ্য। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি দেখা দিলে লগ্নিকারকগণ আশাবাদী হন। তখন নির্দিষ্ট আয়ের সুবিধাভোগী শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয় অপেক্ষা ইকুইটি শেয়ার ক্রয়েই উঁহারা বেশী আগ্রহান্বিত থাকেন। যখন আবার লগ্নি ও উহার আয়ের নিরাপত্তা সম্পর্কে উঁহারা বিশেষ সতর্ক হইতে চান তখন সুবিধাভোগী শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়েই উঁহারা আগ্রহান্বিত থাকেন। মন্দার বাজারে অবশ্য লগ্নিকারকেরা শেয়ার বা দীর্ঘমিয়াদী ঋণপত্র ক্রয়ে ইচ্ছুক থাকেন না। তখন স্বল্পমিয়াদী ঋণ গ্রহণ করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। সুতরাং লগ্নিকারকদের ঝোঁক এবং উঁহাদের লগ্নির নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মূলধন বিন্যাস প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আয়ের স্থিরতা সম্বন্ধে যদি কোম্পানী নিশ্চিত থাকে তবে উহা অল্প সুদে মূলধন সংগ্রহের জন্য ঋণপত্র বা সুবিধাভোগী শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে। মোটের উপর কোম্পানীর মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা এবং সুদের হারের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

দায়গ্রাহক ও উঁহাদের ভূমিকা (Underwriters and the Role of Underwriters)

কোম্পানীর লগ্নিপত্র (Securities) অর্থাৎ শেয়ার, ঋণপত্র প্রভৃতি নানাভাবে বিক্রীত হইতে পারে। দায়গ্রাহক উহা বিক্রয়ের একটি মাধ্যম। দায়গ্রাহকগণ কোম্পানীর শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য উহার সহিত একটি চুক্তিবদ্ধ হন। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইঁহারা জনসাধারণের নিকট শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়ের ঝুঁকি গ্রহণ করেন এবং অবিক্রীত শেয়ার বা ঋণপত্র নিজেরাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়ের যে দায়, উহার ঝুঁকি বহন করেন বলিয়া উঁহাদিগকে দায়গ্রাহক বলা হয়। ইঁহারা শেয়ারের বিলিকৃত মূল্যের ৫ শতাংশ এবং ঋণপত্রের বিলিকৃত মূল্যের ২½ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন পাইতে পারেন। একটি নির্দিষ্ট সময়ের

মধ্যে উহারা লগ্নিপত্র বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোম্পানী উহার লগ্নিপত্র দায়গ্রাহকের মাধ্যমে বিক্রয় করার ইচ্ছা করিলে কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীতে এবং বিজ্ঞাপনীতে উহা উল্লিখিত থাকিবে।

শিল্পোন্নয়নের জন্য কোম্পানী গঠন এবং উহার মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারে ইহারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য দেশের শিল্পোন্নতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহারা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দেশে ইহাদের সেরূপ গুরুত্বপূর্ণ অবদান দেখিতে পাওয়া না গেলেও ইহারা যে কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন—ইহা অনস্বীকার্য।

খ্যাতিসম্পন্ন দায়গ্রাহকগণ শেয়ার বাজার এবং কারবারী জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ থাকেন। নূতন কোম্পানী গঠন ব্যাপারে তাঁহাদের এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান। এই অমূল্য অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া অনেক প্রবর্তক কোম্পানী গঠনে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। কোন্ প্রকার শেয়ার বা ঋণপত্র কি মূল্যে কতটা বিক্রয় করা উচিত প্রবর্তকগণ সে সম্পর্কেও দায়গ্রাহকগণের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। এইভাবে তাঁহাদের অভিজ্ঞ পরামর্শ কোম্পানীর যথাযথ মূলধন বিন্যাসেও যথেষ্ট সহায়তা করে। প্রবর্তকগণের পক্ষে দায়গ্রাহকগণের সহিত অগ্রিম চুক্তিবদ্ধ হইয়াও কোম্পানী গঠনের কাজে মন দেওয়া সম্ভব হয়। কারণ এই প্রবর্তকগণ দায়গ্রাহকগণের নিকট হইতে পরামর্শ লইয়া এবং লগ্নিপত্র বিক্রয় ও মূলধন সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি পাইয়া কাজে অগ্রসর হইতে পারেন। প্রয়োজনবোধে প্রবর্তকগণ চুক্তি সম্পাদনের পরই কিছু টাকা দায়গ্রাহকগণের নিকট হইতে অগ্রিম লইতে পারেন এবং বাকী টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার সম্পর্কেও নিশ্চিত থাকিতে পারেন। ফলে কোম্পানীর কাজ আরম্ভ করিতে প্রবর্তকগণের কোন বেগ পাইতে হয় না। উহারা নিশ্চিন্ত মনে সুপরিকল্পিত পথে কোম্পানীর কাজে অগ্রসর হইতে পারেন। কারণ জনসাধারণের নিকট লগ্নিপত্র বিক্রয় হউক বা না হউক দায়গ্রাহকগণের নিকট হইতে উহার জন্য দেয় সম্পূর্ণ টাকা পাওয়া যায়। কোম্পানীর লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয়ে অনেক ঝুঁকি আছে। কিন্তু যে কোম্পানীর এরূপ অভিজ্ঞ খ্যাতিসম্পন্ন দায়গ্রাহক থাকে জনসাধারণের নিকট উহার লগ্নিপত্র বিক্রয়েরও কোন প্রকার অসুবিধা হয় না এবং ঝুঁকির মাত্রাও কম থাকে। কারণ যিনি লগ্নিপত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তিনি এরূপ খ্যাতিসম্পন্ন দায়গ্রাহকদের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিলে কোম্পানীর স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। সুনাম অর্জনকারী দায়গ্রাহকগণ কোম্পানীর অনুকূলে এবং উহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশ করেন বলিয়া এরূপ আস্থা ও বিশ্বাস আসিয়া যায়। সুতরাং দায়গ্রাহকদের চেষ্টায় লগ্নিপত্র বাজারে উহার ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে কোন প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ সাধারণত এরূপ কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থাকিলে দায়গ্রাহকগণ উহার লগ্নিপত্র বিক্রয়ের ঝুঁকি গ্রহণ করেন না। কিন্তু অভিজ্ঞ দায়গ্রাহক

ছাড়া শুধু নূতন ও অনভিজ্ঞ প্রবর্তকগণ লগ্নিপত্র বিক্রয়ে মনোনিবেশ করিলে উহার ক্রয়-বিক্রয় বাজারে নানারূপ শঙ্কা উপস্থিত হয়। ফলে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং কোম্পানীর লগ্নিপত্র বিক্রয় এজন্য নানাভাবে ব্যাহত হয়। সুতরাং শিল্পোন্নয়নক্ষেত্রে নূতন কোম্পানী গঠন ব্যাপারে দায়গ্রাহকগণের চেষ্টা ও পরামর্শ বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা যে শিল্পোন্নয়নের পথ সুগম করিয়া থাকে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

শেয়ার বাজারে লগ্নিপত্র তালিকাভুক্তি (Listing of Securities on a Stock Exchange)

কোনও নির্দিষ্ট অনুমোদিত শেয়ার বাজারে কোন কোম্পানীর লগ্নিপত্র বিক্রয় করিতে হইলে উহার কর্তৃপক্ষদের অনুমতি প্রয়োজন। উক্ত অনুমতির জন্য কোম্পানীর লগ্নিপত্রগুলি উক্ত বাজারের লগ্নিপত্র তালিকাভুক্ত করিয়া লইতে হয়। এজন্য অবশ্য নিয়মমাফিক কিছু কাজ করিতে হয়। এই নিয়ম হইতেছে লগ্নিপত্র তালিকাভুক্তির জন্য বিজ্ঞাপনী (Prospectus) প্রকাশের দশম দিন পার হওয়ার পূর্বে শেয়ার বাজারের কর্তৃপক্ষের নিকট এই অনুমতির জন্য আবেদন করা। উক্ত অনুমতি আবার প্রথম চার সপ্তাহের মধ্যে কিংবা বর্ধিত সময় সাত সপ্তাহের মধ্যে গ্রহণ করিতে হয়। শেয়ার বাজারের কর্তৃপক্ষগণ অবশ্য আবেদন করিলেই অনুমতি প্রদান করেন না। উঁহারা এজন্য অবশ্য কোম্পানীর বিজ্ঞাপনী বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন এবং নানাবিষয় অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করিয়া এই অনুমতি দিয়া থাকেন। যাহাতে দুর্নীতিপরায়ণ অবাঞ্ছিত কোম্পানী গঠিত না হয় তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা। প্রতিটি অনুমোদিত শেয়ার বাজারের পরিচালকমণ্ডলীতে একজন করিয়া সরকারী প্রতিনিধি থাকার নিয়ম। আবার লগ্নিপত্র তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করিতে হইলে অন্তত ৪৯ শতাংশ লগ্নিপত্র জনসাধারণের মধ্যে বিলি করিতে হয়। লগ্নিপত্র তালিকাভুক্তির এই উভয়বিধ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য নিয়মাবলী ভাল কোম্পানী গঠনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কারণ উপরি-উক্ত নিয়মের কড়াকড়ির জন্য অবাঞ্ছিত কোম্পানী অধিক সংখ্যায় গঠিত হইতে পারে না।

মূলধন সংগ্রহ নিয়ন্ত্রণ (Capital Issues Control)

মূলধন সংগ্রহ নিয়ন্ত্রণ ১৯৪৩ সালে মে মাসে যুদ্ধের সময় ভারত রক্ষা আইন অনুযায়ী যুদ্ধকালীন অর্থনীতিতে প্রথম প্রবেশ করে। তখন ইহার উদ্দেশ্য ছিল—যুদ্ধপ্রচেষ্টার সাহায্যার্থে এবং জনসাধারণের চাহিদা মিটাইতে অত্যাবশ্যক দ্রব্য উৎপাদন এবং সেবার যোগান দেওয়ার জন্য যাহাতে যথার্থভাবে মূলধন বিনিয়োগ হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা। যুদ্ধোত্তর কালে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, দেশের সম্পদসমূহের সুষম বণ্টন, অপরিহার্য পণ্য ও সেবার অব্যাহত উৎপাদন এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যথাযথ রূপায়ণের উদ্দেশ্যে এই মূলধন সংগ্রহ নিয়ন্ত্রণ (Capital Issues Control) ব্যবস্থা চালু রাখা হয়। ১৯৫০ সালে অস্থায়ী আইনের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বলবৎ

রাখা হয় এবং ১৯৫৬ সালে উক্ত আইনকে পাকাপাকি রূপ দেওয়া হয়। এই আইন অনুযায়ী বর্তমানে কোন ভারতীয় কোম্পানী বা ব্যক্তির শেয়ার বিলি দ্বারা ২৫ লক্ষ টাকার অধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইলে উহাকে মূলধন সংগ্রহ নিয়ামকের (Controller of Capital Issues) অনুমতি লইতে হয়। এই অর্থের পরিমাণ প্রথমে ৫ লক্ষ টাকা, পরে ১০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর হইতে ২৫ লক্ষ টাকা করা হয়। ইহা উক্ত মূলধন সংগ্রহের আবেদনপত্রের সহিত কোম্পানীর বিজ্ঞাপনার অনুলিপিও পেশ করিতে হয়। এই আইন ভারতের সর্বত্র এবং ভারতে বা ভারতের বাহিরে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভারতে গঠিত কোম্পানী বিদেশ হইতে মূলধন সংগ্রহ করিলেও এই আইনের আওতায় আসিয়া যায়। মূলধন সংগ্রহকারী কোম্পানী বা ব্যক্তি ছাড়াও এই আইন মূলধন সরবরাহকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও প্রযোজ্য। শেয়ার, ঋণপত্র, দলিল প্রভৃতির মাধ্যমে যদি সংগৃহীত অর্থের বা মূলধনের পরিমাণ ক্রমিক ১২ মাসের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার অধিক দাঁড়ায় তাহা হইলে এই অনুমতি ছাড়া উক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে উহা বেআইনী বলিয়া গণ্য হয়। মূলধনের পরিমাণ নগদ টাকায় না হইলেও উহা বেআইনী হইবে এবং মূলধনের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন 'বোনাস শেয়ার' সম্পর্কেও এই অনুমতি প্রয়োজন। অবশ্য ব্যাঙ্কিং কোম্পানী, বীমা কোম্পানী, অর্থ-সংস্থানকারী বিশেষ কর্পোরেশন প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানকে এই আইনের আওতা হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। এই মূলধন সংগ্রহ নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করার জন্য অনধিক ৫ জন সদস্য লইয়া একটি উপদেষ্টা কমিটি (Advisory Committee)-ও গঠিত হইয়াছে। মূলধন সংগ্রহের অনুমতি দিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ বিবেচনা করা হয়:

(ক) বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী কতটা অর্থের বা মূলধনের প্রয়োজন এবং সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার সম্ভাবনা আছে কিনা।

(খ) লগ্নিপত্রগুলি সমমূল্যে (At par) না অধিক মূল্যে (At a Premium) বিক্রয় হইবে।

(গ) দায়গ্রাহকদিগকে কিংবা দালালদিগকে লগ্নিপত্র বিক্রয়ের জন্য কি হারে কমিশন দেওয়া হইবে।

(ঘ) ইকুইটি শেয়ার এবং নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদেয় শেয়ারের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার জন্য যে হারে মূলধন গঠিত হইয়াছে।

(ঙ) ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের সর্তগুলি ঠিকমত পালিত হইয়াছে কিনা।

সাধারণত কোন শিল্পস্থাপন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে না থাকিলে উহাকে এরূপ মূলধন সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হয় না। নূতন মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে ঘরোয়াভাবে অন্ততঃ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত না হইলেও এই অনুমতি পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া বিষয়-সম্পত্তির পুনর্মূল্যনির্ধারণ (Revaluation) কিংবা

সংরক্ষিত তহবিল (Reserve Fund) হ্রাস দ্বারা বোনাস শেয়ার বিলি করার অনুমতিও প্রত্যাখ্যান করা হয়।

ভারত সরকারের ১৯৬৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীর এক বিজ্ঞপ্তিতে শেয়ার বিক্রয় দ্বারা মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে উপরি-উক্ত বিধিনিষেধ অনেকটা শিথিল করা হইয়াছে। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী 'বোনাস ইস্যু' (Bonus Issue) এবং সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর প্রিমিয়ামসহ শেয়ার ছাড়া অন্যপ্রকার শেয়ার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইয়াছে। একমাত্র জনসাধারণের কাছে বিক্রয়ার্থ শেয়ার ছাড়ার ক্ষেত্র ব্যতিরেকে ঘরোয়া সীমিত কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও সরকারী কোম্পানীগুলির উপর অবশ্য এ ব্যাপারে পূর্বের মতই কোন নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না।

এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বার মাস সময়ের মধ্যে যে সকল সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী অনূ্যন ২৫ লক্ষ টাকার শেয়ার ছাড়িবে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। আর যে সকল সার্বজনিক কোম্পানী বার মাস সময়ের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার বেশী শেয়ার ছাড়িবে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত শেয়ার ছাড়ার তারিখের অন্তত ত্রিশদিন পূর্বে কণ্ট্রোলারের নিকট তাহাদের শেয়ার ছাড়ার প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে একটি বিবৃতি পেশ করিলেই চলিবে। প্রস্তাবগুলি অবশ্য কারবারী মহল কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত মান অনুযায়ী হইলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলি কণ্ট্রোলারের সম্মতি না লইয়াই তাহাদের শেয়ার ছাড়িতে পারিবে।

এই বিজ্ঞপ্তিতে নিয়ম-কানুনগুলি অবশ্য দেওয়া হইয়াছে। উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম উল্লেখযোগ্য :

১। ঋণ ও সাধারণ শেয়ারের আনুপাতিক হার ২ : ১ হইতে হইবে।

২। শেয়ার সমমূল্যে ছাড়িতে হইবে।

৩। লভ্যাংশের হার-সমন্বিত সুবিধাভোগী শেয়ার বা সুদের হারসহ ঋণপত্র সংগ্রহ (Issue) নির্দেশিত সীমার মধ্যে রাখিতে হইবে। এই সীমাগুলি হইতেছে সুবিধাভোগী শেয়ারের বর্তমান লভ্যাংশ ৯·৫০ শতাংশ এবং ডিবেঞ্চারের সুদের হার ৭·৭৫ শতাংশের বেশী হইতে পারিবে না। এই সীমাগুলি অবশ্য মাঝে মাঝে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পরিবর্তন করা যাইতে পারিবে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. What are the steps necessary for the promotion of a Public Limited Company? [C. U. B. Com. 1956]

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী প্রবর্তনের জন্য কি কি পর্যায় প্রয়োজন ?

2. What are the functions of Promoters of a Public Limited Company? [C. U. B. Com. (Pass) 1967

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী প্রবর্তকের কি কাজ ?

3. Discuss the steps a Promoter shall have to take in floating a Private Limited Company. [C. U. B. Com. 1958]

একটি ঘরোয়া সীমিত কোম্পানী চালু করিতে হইলে একজন প্রবর্তকের যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে উহার আলোচনা কর।

4. Give an idea of the different forms of Capital of a Joint Stock Company.

যৌথ কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার মূলধন সম্পর্কে একটি ধারণা জন্মাও।

5. Give an account of the different kinds of shares of a Joint Stock Company.

যৌথ কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের বিবরণ দাও।

6. Discuss the different classes of shares which a Public Limited Company may issue. Is it necessary to take prior consent of Government for issuing any shares ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1967]

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের বিবরণ দাও। কোনও শেয়ার বিলি করার জন্য পূর্ব হইতে কি সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হয় ?

7. Distinguish between Stocks and Shares.

স্টক ও শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

8. What is a Debenture ? Describe different types of Debentures.

ঋণপত্র কাহাকে বলে ? বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্রের বিবরণ দাও।

9. Distinguish between shareholders and debenture-holders.

শেয়ার-গ্রহীতা ও ঋণপত্র-ধারকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

10. What are the factors upon which the amount of capital of a Joint Stock Company depends ? [N. B. B. Com. 1969]

যৌথ কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ কি অবস্থার উপর নির্ভর করে ?

11. What are the ways in which a Public Limited Company may raise funds in India ? [C. U. B. Com. (Pass) 1965 ; 1971]

একটি সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী কি কি উপায়ে ভারতে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে ?

12. What are the usual methods followed by a Public Limited Company for raising capital ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1966]

সাধারণত কি কি উপায়ে সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী উহার মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে ?

13. What are the different sources from which a Public Limited Company can raise both long-term and short-term finance.
[C. U. B. Com. (Hons.) 1963 ; 1966]

কি কি বিভিন্ন উৎস হইতে সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী উহার দীর্ঘ ও স্বল্প-মিয়াদী মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে ?

14. "A business requires both long and short-term finances.' How are these raised ? [C. U. B Com. (Hons.) 1967]

"কারবারে দীর্ঘ ও স্বল্প-মিয়াদী মূলধন প্রয়োজন।" কিভাবে ইহা সংগৃহীত হইয়া থাকে ?

15. How can a Public Limited Company raise its capital ? In this context, mention the advantages of different types of shares that may be offered. [C. U. B. Com. (Hons.) 1968]

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী কিভাবে মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকে ? এ প্রসঙ্গে যে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ছাড়া যাইতে পারে উঁহাদের সুবিধাগুলি উল্লেখ কর।

16. What do you understand by Corporate Finance ? Discuss briefly the problems of Corporate Finance.

যৌথ মূলধনী কারবারের মূলধন সংগ্রহ কাহাকে বলে ? উহার সমস্যা আলোচনা কর।

17. Discuss the factors which determine the capital requirements of a Company.

কোনও কোম্পানীর প্রয়োজনীয় মূলধন যেভাবে স্থির করা হয় উহা আলোচনা কর।

18. A Public Limited Company gets capital partly by issuing shares and partly by issuing debentures or entirely by issuing shares ? What would be your suggestions in this regard ? Discuss fully. [C. U. B. Com. (Hons.) 1966]

কোনও সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী শেয়ার বিক্রয় এবং ঋণপত্র বিক্রয় অথবা কেবল শেয়ার বিক্রয় দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করে। এ সম্পর্কে তোমার কি মত ? বিস্তৃত আলোচনা কর।

19. Discuss the relative merits and demerits of ploughing back of profits as a method of business finance.

কারবারের মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে স্বীয় মুনাফার পুনর্নিয়োগ প্রথার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

20. How are shares (securities) marketed ? Discuss each method with merits and demerits.

শেয়ার বা লগ্নিপত্র কিভাবে বিক্রয় হয় ? প্রত্যেক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসহ আলোচনা কর।

21. What is Capital Gearing ? Explain it and state the factors on which it depends.

মূলধন বিন্যাস কাহাকে বলে ? ইহার ব্যাখ্যা দাও এবং যে অবস্থার উপর উহা নির্ভর করে উহা উল্লেখ কর।

22. Who are Underwriters ? Discuss the role of Underwriters in the marketing of securities.

দায়গ্রাহক কাহারা ? লগ্নিপত্র বিক্রয়ে উহাদের ভূমিকা আলোচনা কর।

23. What is listing of securities on a Stock Exchange ? Discuss its importance.

শেয়ার বাজারে লগ্নীপত্র তালিকাভুক্তি কি জিনিস ? ইহার গুরুত্ব আলোচনা কর।

24. Give a short account of the Capital Issues Control.

মূলধন সংগ্রহ নিয়ন্ত্রণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

25. Enumerate in chronological order the steps required to be taken in forming a widely-owned public company up to the stage of commencement of business. [C. U. B. Com. (Hons.) 1972]

ব্যাপক-মালিকানার সার্বজনিক কোম্পানী গঠনে কারবার আরম্ভ করা পর্যন্ত যে বিভিন্ন পর্যায় প্রয়োজন উহা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ কর।

26. Distinguish between owned capital and borrowed capital of a joint stock company. State the nature of securities which a company generally offers for raising loans.

[C. U. B. Com. (Pass) 1972]

যৌথ মূলধনী কারবারের নিজস্ব মূলধন ও ধার করা মূলধনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। কোম্পানী ঋণ লইবার জন্য যে প্রকার জামিন দিয়া থাকে উহার প্রকৃতি উল্লেখ কর।

27. Analyse the capital structure of a Company and discuss the relative importance of different forms of capital from the point of view of organisational stability. [C. U. B. Com. (Hons) 1973]

কোম্পানীর মূলধন গঠন প্রণালী বিশ্লেষণ কর এবং সাংগঠনিক স্থিতিশীলতার জন্য বিভিন্ন মূলধনের গুরুত্ব আলোচনা কর।

একাদশ অধ্যায়

কোম্পানী পরিচালনা
(Company Management)

কোম্পানী পরিচালনা পদ্ধতি (Nature of Company Management)

শেয়ার-গ্রহীতাগণ কোম্পানীর মালিক। এই মালিকগণেরই একক-মালিকানা বা অংশীদারী কারবারের মত কোম্পানী পরিচালনার জন্য দায়ী থাকার কথা। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে কোম্পানীর মালিকানা ব্যাপক অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলের বহুলোকের মধ্যে উহার শেয়ার বিক্রীত সেরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শেয়ার-গ্রহীতার পক্ষে কোম্পানী পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া শেয়ার-গ্রহীতাদের সত্তা হইতে কোম্পানীর একটা পৃথক সত্তা আছে। এই সকল কারণে প্রত্যেক শেয়ার-গ্রহীতাকে সক্রিয়ভাবে কোম্পানী পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার কোম্পানী আইনে দেওয়া হয় নাই। ফলে কোম্পানীর মালিকানা ও পরিচালনার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পৃথকীকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। 'শেয়ার-গ্রহীতাগণ কোম্পানী পরিচালনার জন্য উহাদের মধ্য হইতে কতিপয় প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। ঐ প্রতিনিধিগণ 'পরিচালকমণ্ডলী' (Board of Directors) নামে পরিচিত এবং প্রত্যেক প্রতিনিধিকে বলা হয় 'পরিচালক' বা 'ডিরেক্টর'। কোম্পানী পরিচালনার সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ইঁহাদের উপর অর্পিত হয়। উঁহারা সমষ্টিগত-ভাবে এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এককভাবে এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব করিবার অধিকার সাধারণত ইঁহাদের থাকে না। মোটের উপর পরিচালকমণ্ডলীই কোম্পানী পরিচালনার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ (Chief Executives)। শেয়ার-গ্রহীতাগণ উঁহাদের সাধারণ, বিশেষ বা অতিরিক্ত সভায় মিলিত হইয়া কেবল কোম্পানীর মূলনীতি ও পরিকল্পনা স্থির বা অনুমোদন করিয়া থাকেন। সুতরাং কোম্পানী পরিচালনা ও মালিকানা একসূত্রে গ্রথিত নয়। উহা স্বতন্ত্র ও পৃথক। যৌথ কারবারের ইহা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

আবার কারবারের আকার ছোট হইলে পরিচালকমণ্ডলীই কোম্পানী পরিচালনার সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু কারবার বৃহৎ হইলে সমষ্টিগত-ভাবে কোম্পানী পরিচালনা অনেকক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। সেরূপ অবস্থায় কোম্পানীর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরিচালকমণ্ডলীর অধীনে একজন প্রধান কার্য-নির্বাহক (Chief Executive) নিয়োগ করা হয়। তিনি পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক নির্ধারিত কর্মপন্থা ও নীতিগুলি যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করিয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষে যখন সমুদয় কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয় না তখন তিনি তাঁহার ক্ষমতা ও

কর্তৃত্বের কিয়দংশ কোম্পানীর বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের উপর অর্পণ করিয়া থাকেন। এইভাবে কোম্পানী পরিচালনায় শেয়ার-গ্রহীতাগণের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রথমে পরিচালকমণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত হয়। পরে উহা প্রয়োজনবোধে পরিচালকমণ্ডলী হইতে প্রধান কার্য-নির্বাহক, প্রধান কার্য-নির্বাহক হইতে বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান এবং বিভাগীয় প্রধানদের হইতে সংগঠনের সকল স্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। প্রধান কার্য-নির্বাহক যিনিই হউক না কেন তিনি পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কিংবা উহার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইভাবেই কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ কার্য পরিচালনা (Internal Management of a Company)-র কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভারতীয় কোম্পানী আইনে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার কার্য-নির্বাহক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে :

১। ডিরেক্টরদের কার্য-নির্বাহক কমিটি (Executive Committee of Directors)

২। ম্যানেজার (Manager)

৩। ম্যানেজিং ডিরেক্টর (Managing Director

৪। সেক্রেটারিজ এণ্ড ট্রেজারার্স (Secretaries and Treasurers)

৫। ম্যানেজিং এজেণ্ট (Managing Agent)।

তবে ১৯৭০ সালের ৩রা এপ্রিল হইতে ম্যানেজিং এজেণ্ট ও উহার সহিত সেক্রেটারিজ এণ্ড ট্রেজারার্স প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন কোম্পানী পরিচালনায় অবশিষ্ট তিন প্রকার কার্য-নির্বাহকদের মধ্যে যে কোন একটি নিযুক্ত করা চলে। সুতরাং কোম্পানী পরিচালনার সাংগঠনিক রূপ বর্তমানে সাধারণত নিম্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায় :

শেয়ার-গ্রহীতাগণ (Shareholders)

|

পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors)

|

ডিরেক্টরদের কার্য-নির্বাহক কমিটি (Executive Committee of Directors) বা ম্যানেজার (Manager) বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর (Managing Director)

মালিকানা ও পরিচালনায় পার্থক্য থাকিলেও কোম্পানী পরিচালনার কাজ সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইলে কোন সমস্যাই দেখা দেয় না। নতুবা শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors)

যৌথ কোম্পানীর প্রকৃত মালিক উহার শেয়ার-গ্রহীতাগণ (Shareholders)। সুতরাং কোম্পানীর পরিচালনার অধিকার তাঁহাদেরই। কিন্তু কোম্পানী পরিচালনায় অংশীদারী কারবারের (Partnership Business) মত প্রত্যেক শেয়ার-গ্রহীতা (Shareholder) প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন না বা সম্ভব না। ইহা গণতন্ত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। শেয়ার-গ্রহীতাগণ কোম্পানীর সাধারণ সভায় কোম্পানী পরিচালনার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে কয়েক ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন। এই নির্বাচিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেককে **পরিচালক বা ডিরেক্টর** বলা হয়। এই ডিরেক্টরগণকে একযোগে বলা হয় পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors)। ডিরেক্টরগণ এককভাবে কাজ করিতে পারেন না যদি তাঁহাদিগকে পৃথকভাবে বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ না করা হয়। এই পরিচালকমণ্ডলীই কোম্পানীর সর্ববিধ কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং যৌথ কোম্পানীতে 'মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ' পৃথক দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ যাহাকে আমরা বলি divorce between ownership and control. ডিরেক্টরগণ পরিচালকমণ্ডলীর অংশস্বরূপ। কিন্তু কোম্পানী আইনে ডিরেক্টর বা পরিচালকদের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই। যে বা যাঁহারা কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং বহন করিবেন তিনি বা তাঁহারাই পরিচালক বলিয়া গণ্য হইবেন। কোন শক্তিশালী শেয়ার গ্রহীতা যদি পরিচালকদিগকে প্রভাবিত করিয়া কোম্পানী পরিচালনার উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন তাঁহাকেও পরিচালক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তবে কোম্পানীর সলিসিটর (Solicitor) বা হিসাব নিরীক্ষক (Auditor)-কে এরূপ কল্পনা করা যায় না। কোম্পানী আইনে ২৫২ ধারা হইতে ৩২৩ ধারা পর্যন্ত মোট ৭০টি ধারায় পরিচালকদের সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। সে যাহা হউক উহাদের কার্য নিম্নলিখিত উপায়ে বর্ণনা করা যাইতে পারে:

(১) পরিচালক কোম্পানীর প্রতিনিধি (Agent) এবং অছির (Trustee) মত। তবে সাধারণত প্রতিনিধি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা অপেক্ষা পরিচালকমণ্ডলীর ক্ষমতা কোম্পানী আইন বলে কিছু বেশী। পরিচালকমণ্ডলীর হস্তে কোম্পানীর যাবতীয় সম্পত্তির দেখাশুনার ভার থাকে। এরূপ ভারপ্রাপ্ত হইলেও উহাদিগকে পূর্ণমাত্রায় কোম্পানীর অছি বলা চলে না। কারণ অছির ন্যায় পরিচালকমণ্ডলীর নামে কোম্পানীর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় না। মোটের উপর কথা—উঁহারা প্রতিনিধি ও অছির মত কাজ করিলেও উঁহাদের সহিত কোম্পানীর সম্পর্ক পূর্ণপ্রত্যয়ের সম্পর্ক (fiduciary relationship) বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। কোম্পানীর 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী'তে (Articles of Association) উল্লিখিত যে বিষয়গুলি শেয়ার-গ্রহীতাগণের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা সে বিষয়গুলি ভিন্ন সমস্ত বিষয় সম্বন্ধেই ইঁহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।

(২) কোম্পানীর হইয়া ইঁহারা তৃতীয় পক্ষের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারেন।

(৩) ইঁহারা কোম্পানীর ব্যবসা-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া থাকেন।

(৪) ইঁহারাই শেয়ার-গ্রহীতাগণের সভা আহ্বান করেন ও যাবতীয় নথিপত্র প্রস্তুত করেন, কোম্পানীর কার্যবিবরণী প্রস্তুত করেন এবং উহা শেয়ার-গ্রহীতাগণের সভায় পেশ করেন এবং কোম্পানীর যাবতীয় হিসাবপত্র রাখিয়া থাকেন।

(৫) ইঁহারা শেয়ার সংক্রান্ত নানবিধ কাজ-কারবারের অধিকারী। যেমন, ইঁহারা শেয়ার বিলি (Issue) ও আবণ্টন (Allotment) করিয়া থাকেন, শেয়ারের তলবী অর্থ (Call Money) আহ্বান করেন, শেয়ার নথিভুক্ত করেন, শেয়ার হস্তান্তর মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করেন এবং শেয়ার গ্রহণ বা বাজেয়াপ্ত করেন।

(৬) কোম্পানীর কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত ইঁহারাই করিয়া থাকেন।

(৭) কোম্পানীর সাধারণ সভা আহূত হইবার পূর্বে ডিরেক্টরের কিংবা হিসাব-পরীক্ষকের পদ শূন্য হইলে ইঁহারাই নিয়োগ করিয়া থাকেন।

(৮) শেয়ার-গ্রহীতাগণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ইঁহারা সততার সহিত কার্য পরিচালনা করিবেন। এজন্য তাঁহাদের কতকগুলি বিধিনিষেধ, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিয়া চলিতে হয়। এজন্য ইঁহারা নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে পারেন না :

(ক) তাঁহাদের নিজেদের জন্য ঋণগ্রহণ এবং মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর সহিত কোন চুক্তি সম্পাদন করিতে পারেন না এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে কোম্পানীর সম্পত্তি ব্যবহার করিতে পারেন না।

(খ) তাঁহাদের কর্তব্যের অবহেলার জন্য কোম্পানীর কোন ক্ষতি হইলে উঁহারা দায়ী থাকেন।

(গ) ইঁহারা আইনের অনুমোদন ভিন্ন সাধারণ অবস্থায় মূলধন ভাঙ্গিয়া লভ্যাংশ বণ্টন কিংবা সুদ প্রদান করিতে পারেন না কিংবা অংশতঃ আদায়ীকৃত (Partly Paid-up) শেয়ার সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত (Fully Paid-up) শেয়াররূপে বিক্রয় করিতে পারেন না।

(ঘ) শেয়ার-গ্রহীতাদের সাধারণ সভার অনুমতি ভিন্ন ইঁহারা কোম্পানীর সম্পত্তির কোন অংশ বা সমগ্র অংশ ইজারা (Lease) দিতে কিংবা বিক্রয় করিতে পারেন না, কোম্পানীর কোন সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রাস্ট শেয়ার ছাড়া অন্য কোন কিছুতে লগ্নি করিতে পারেন না, কোম্পানীর কোন ঋণ পরিশোধের জন্য দেনাদারকে সময় দান করিতে পারেন না বা ঐরূপ কোন বিরোধের মীমাংসা করিতে পারেন না, আদায়ীকৃত মূলধন এবং সংরক্ষিত পুঁজি অপেক্ষা অধিক ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন না এবং কোম্পানীর উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করার অধিকার থাকিলেও একমাত্র প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারেন না।

(৯) ইহারা কোম্পানীর দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী'র অনুমোদনক্রমে তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন 'পরিচালনাধ্যক্ষ' (Managing Director) স্থির করিয়া তাঁহার হস্তে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারেন।

ইহাই কোম্পানী পরিচালনার সাধারণ নিয়ম। কারণ প্রকৃতপ্রস্তাবে পরিচালক-মণ্ডলী কিছুদিন পরপর কোম্পানীর নীতি নির্ধারণের জন্য সভায় আহূত হন। নীতি নির্ধারণ ছাড়া উপরি-উক্ত বিভিন্ন বিষয়ে কতটা কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে উহার বিবরণ পরিচালনাধ্যক্ষের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। পরিচালনাধ্যক্ষ তাঁহার অধীনস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের সহায়তায় পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশিত পথে কোম্পানীর যাবতীয় কার্য নির্বাহ করেন। সুতরাং নীতি নির্ধারণসহ কার্য সম্পাদনের মণ্ডলী (Policy-cum-Functional Board) বৃহৎ কারবারী প্রতিষ্ঠানে দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ পরিচালকমণ্ডলী বহুবচনাত্মক কার্যনির্বাহী (Plural Executive) বলিয়া উহাদের পক্ষে সমবেতভাবে নীতিনির্ধারণ ও কার্য-সম্পাদন এই উভয়বিধ কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা অসুবিধাজনক। ইহা কেবল বিশৃঙ্খলপূর্ণ অবস্থারই সৃষ্টি করিতে পারে।

শেয়ার-গ্রহীতাদের সর্বাপেক্ষা অধিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেওযাই পরিচালকদের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইহাদিগকে নিজেদের সদ্বুদ্ধি ও বিবেচনামত কোম্পানীর পরিচালনার কার্য নির্বাহ করিতে হয়। আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীতে (Articles of Association) লিখিত ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহারই ইহাদের বিবেচনাধীন। উহার অপব্যবহার, বিশ্বাসভঙ্গ, কর্তব্যে অবহেলা প্রভৃতির জন্য কোম্পানীর ক্ষতি হইলে ইহারা দায়ী থাকেন। একজন পরিচালক অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহ-পরিচালক-দের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য বা ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য দায়ী থাকেন না। আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীতে লিখিত ক্ষমতা তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে হস্তান্তরিত হইতে পারে কিন্তু তজ্জন্য তাঁহারা দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পান না।

ইহারা কোম্পানীর কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হন না। এজন্য ইহারা বেতন পাওয়ার অধিকারী নন। তবে পরিচালকমণ্ডলীর সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ইহারা একটা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন। সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত পরিচালক অবশ্য বেতন পাওয়ার অধিকারী এবং তিনি কোম্পানীর কর্মচারীদের পর্যায়ভুক্ত। এজন্য অন্যান্য কর্মচারীদের মত তাঁহাকে প্রত্যহ কোম্পানীর কার্যালয়ে উপস্থিত থাকিতে হয়। যাঁহারা সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত নন তাঁহাদের কোম্পানীর কার্যালয়ে প্রত্যহ উপস্থিত হইতে হয় না। সাধারণ সভার অনুমতি ভিন্ন কোন পরিচালক কোম্পানীর কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন না।

কোম্পানীর সহিত পরিচালকদের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চুক্তি আছে কিনা বা উচ্চপদস্থ কোন কর্মচারীর সহিত উঁহাদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা ইহা প্রকাশ করা

পরিচালকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। কোম্পানীর কোন চুক্তিতে পরিচালকদের কিংবা উঁহাদের কোন আত্মীয়ের স্বার্থ জড়িত আছে কিনা উহাও প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক এবং এরূপ কোন চুক্তি সম্পর্কে সভায় আলোচনার সময় সংশ্লিষ্ট পরিচালক কোন অংশ গ্রহণ করিতে ও ভোট দিতে পারেন না। পরিচালকমণ্ডলী উঁহাদের ক্ষমতার ও কোম্পানীর আইন-কানুনের বহির্ভূত কোন কাজ করিলে উঁহারা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন। যেমন, কোম্পানীর নামে কোন চুক্তিতে ব্যক্তিগতভাবে জামিন (security) থাকিলে, কোম্পানীর অর্থ ক্ষমতাতিরিক্ত কাজে ব্যয় বা নিয়োগ করিলে, তহবিল তছরূপ করিলে, কর্তব্যে অবহেলা দেখাইলে, কোম্পানী সম্পর্কে মিথ্যা ও প্রতারণা-মূলক প্রচার করিলে, নিজের ক্রীত শেয়ারের মূল্য প্রদান না করিলে, পুঁজি ভাঙ্গিয়া লভ্যাংশ বণ্টন করিলে এবং আইনবিরুদ্ধ এবংবিধ কোন কাজ করিলে পরিচালকগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন। কোম্পানী আইনের ৩২২ ধারা অনুযায়ী স্মারকলিপিতে উল্লেখ করিয়া পরিচালকদিগকে কোম্পানী পরিচালনার কাজে নিযুক্ত অবস্থায় উহার যাবতীয় কাজের জন্য ব্যক্তিগতভাবে অসীম (unlimited) দায়ের জন্য আবদ্ধ করা চলে। উপরি-উক্ত নানাবিধ বিধি-নিষেধ মানিয়া সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর (Public Limited Company) পরিচালকদিগকে কার্যে অগ্রসর হইতে হয়। তবে পূর্ণ-বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করিয়া গেলে অযথা হয়রানি হইবার বা অভিযুক্ত হইবার বিরুদ্ধে প্রত্যেক পরিচালকের আত্মরক্ষা করিবার অধিকার আইনে স্বীকৃত আছে।

পরিচালকদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা (Qualifications and Disqualifications of Directors)

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর পরিচালকদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১। কোম্পানীর যে কোনও শেয়ার-গ্রহীতা উহার পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত হইতে পারেন। তবে তাঁহাকে সুস্থ মস্তিষ্কবিশিষ্ট হইতে হইবে এবং দেউলিয়া বা গুরুতর নৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হইলে চলিবে না। ইহা ছাড়া যোগ্যতামূলক শেয়ার (Qualification Shares) লওয়ার বিধান থাকিলে উহা লইতে হইবে। কিন্তু যোগ্যতামূলক শেয়ারের মূল্য কখনই পাঁচ হাজার টাকার বেশী হইবে না। যদি একটিমাত্র শেয়ারের মূল্য পাঁচ হাজারের বেশী হয়, তবে একটি শেয়ার লইতে হয়। বাহকদেয় শেয়ার অবশ্য ইহার মধ্যে ধরা হয় না। নির্বাচিত হওয়ার সময় যোগ্যতা-মূলক শেয়ার গ্রহণ করা না হইলে দুই মাসের মধ্যে উহা গ্রহণ করিতে হইবে।

২। এক সঙ্গে এক ব্যক্তি ২০টির অধিক কোম্পানীর পরিচালক নিযুক্ত হইতে পারেন না। পরিচালক নির্বাচিত হইবার এক মাসের মধ্যে তাঁহার পূর্ণ পরিচয় এবং পরিচালক হিসাবে কাজ করিবার প্রতিশ্রুতিপত্র নিবন্ধকের নিকট পেশ করিতে হয়।

৩। প্রতি বৎসর এক-তৃতীয়াংশ পরিচালকদের চক্রাকারে (by rotation) অবসর গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহারা এইভাবে অবসর গ্রহণ করিবেন তাঁহারা ইচ্ছা

করিলে পুনর্নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারেন। দুই-তৃতীয়াংশ পরিচালকদের এইভাবে অবসর গ্রহণ করার নিয়ম। বাকী এক-তৃতীয়াংশ অবসর গ্রহণ নাও করিতে পারেন। তাঁহারা সাধারণত ডিবেঞ্চার মালিক বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিচালক। সুতরাং প্রত্যেক সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীতে নির্বাচিত ও মনোনীত দুইপ্রকার পরিচালক থাকিতে পারেন। প্রত্যেক পরিচালক নির্বাচনের জন্য পৃথক প্রস্তাব প্রয়োজন।

৪। সাধারণত একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট (single transferable vote) বা পুঞ্জীভূত ভোট (cumulative vote) বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ভোট (proportional representation vote) প্রথায় পরিচালকগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

৫। অবসর গ্রহণকারী পরিচালক ছাড়া অন্য কোন শেয়ার-গ্রহীতা পরিচালক হিসাবে নির্বাচনপ্রার্থী হইতে ইচ্ছুক হইলে সেই প্রস্তাব নোটিশের মাধ্যমে সভার অন্তত ১৪ দিন পূর্বে কোম্পানীর নিকট পৌঁছানোর নিয়ম। আবার এই সকল প্রস্তাব শেয়ার-গ্রহীতাদের নিকট সভার অন্তত ৭ দিন পূর্বে পৌঁছানোর নিয়ম।

৬। কোম্পানী গঠন করার সময় প্রবর্তকগণ কিংবা স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারিগণ প্রথম পরিচালকদের নিয়োগ করেন। উঁহাদের পারিশ্রমিকও তাঁহারা স্থির করিয়া দিয়া থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবর্তক বা স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারিগণই প্রথম পরিচালক হন। এরূপক্ষেত্রে অবশ্য তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের নিয়োগ করেন এবং পারিশ্রমিক স্থির করেন। প্রথম পরিচালকদের নাম আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীতে (Articles of Association) এবং বিজ্ঞাপনীতে (Prospectus) উল্লেখ থাকে। প্রথম পরিচালক এইভাবে নিয়োগের পর প্রতি বৎসর শেয়ার-গ্রহীতাদের সাধারণ সভায় উঁহাদের দ্বারা পরিচালক নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং পরিচালকদের পারিশ্রমিকও স্থির হইয়া থাকে।

৭। সাধারণ সভার পূর্বে কোন পরিচালক পদত্যাগ করিলে বা অন্য কারণে কোনও পরিচালকদের পদ খালি হইলে পরিচালকগণ অস্থায়িভাবে উহা পূরণ করিতে পারেন। কোনও পরিচালক তিন মাসের অধিককাল সভায় অনুপস্থিত হইলেও তাঁহার স্থলে পরিচালকগণ পরিপূরক পরিচালক নিয়োগ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া ডিবেঞ্চার মালিকগণ ও সরকারও প্রয়োজনবোধে পরিচালক মনোনীত করিতে পারেন। কেবল ব্যক্তি বিশেষই পরিচালক হইতে পারেন। কোন সংস্থা বা সমিতিবদ্ধ কারবার পরিচালক নিযুক্ত হইতে পারে না।

৮। নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট পরিচালকদের পদত্যাগ করা বাধ্যতামূলক:

(ক) নির্বাচিত হওয়ার দুই মাসের মধ্যে যোগ্যতামূলক শেয়ার ক্রয় না করিলে,

(খ) মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিলে,

(গ) দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হইলে বা তজ্জন্য আবেদন করিলে,

(ঘ) ফৌজদারী আইনে অপরাধী হইয়া ছয় মাসের অধিক দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে,

(ঙ) শেয়ারের তলবী অর্থ প্রদানের দিন হইতে উক্ত অর্থ ছয় মাসের মধ্যে প্রদানে অক্ষম হইলে,

(চ) পরিচালকমণ্ডলীর অনুমতি ভিন্ন পর পর তিনটি সভায় বা তিন মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত সকল সভায় অনুপস্থিত থাকিলে (ইহার মধ্যে যেটি দীর্ঘ সেইটি ধরা হইবে),

(ছ) কোম্পানীর সহিত কোনও চুক্তিতে তাঁহার গোপন স্বার্থ ধরা পড়িলে,

(জ) তিনি নিজে কিংবা যে অংশীদারী কারবারের তিনি অংশীদার সেই কারবার কিংবা যে ঘরোয়া কোম্পানীর তিনি পরিচালক সেই কোম্পানী ঋণ গ্রহণ করিলে,

(ঝ) শেয়ার-গ্রহীতাদের সাধারণ সভায় তাঁহাকে অবসর গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিলে,

(ঞ) আদালত কর্তৃক কোন কারণে কাহাকেও পরিচালক হইবার অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিলে।

পরিচালকদের পারিশ্রমিক (Remuneration of the Directors)

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর পরিচালকদের পারিশ্রমিক নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া চলে :

১। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া মাসে মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়া চলে কিংবা কোম্পানীর বিশেষ সংকল্পের দ্বারা নীট মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ দেওয়া চলে।

২। তবে উক্ত পারিশ্রমিক নীট মুনাফার (Net Profit) শতকরা তিনভাগের বেশী হইবে না।

৩। কোন কোম্পানীতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ম্যানেজার থাকিলে ডিরেক্টরদের পারিশ্রমিক নীট মুনাফার শতকরা একভাগের বেশী হইবে না।

৪। পরিচালকদের প্রত্যেকে প্রতি সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ২০০ টাকা পর্যন্ত পাইতে পারেন।

৫। ম্যানেজিং ডিরেক্টর নীট মুনাফার শতকরা পাঁচভাগ পর্যন্ত পাওয়ার অধিকারী। একাধিক ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকিলে যুগ্মভাবে নীট মুনাফার শতকরা দশভাগ পাইতে পারেন।

যেভাবে বা যে আকারেই পারিশ্রমিক দেওয়া হউক না কেন, এমনকি বিনা ভাড়ায় বাড়ী বা গাড়ী প্রভৃতি অন্যান্য উপরি-সুবিধা (Perquisites) দেওয়া হইলেও এজন্য মোট ব্যয় নীট মুনাফার উপরি-উক্ত শতকরা হারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়।

ডিরেক্টরদের কার্যনির্বাহক কমিটি (Executive Committee of Directors)

ইহা পরিচালকমণ্ডলীর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। অল্প সংখ্যক ডিরেক্টর (সাধারণত ২।৩ জন) লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors)

এই কমিটির উপর কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া থাকে এবং প্রধান কর্মকর্তার মত অধিকারও এরূপ কমিটিকে দেওয়া হয়। এরূপ অবস্থায় পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও নীতি নির্দেশ করিয়া থাকে, বাজেট পাস করে, ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির করে এবং কোম্পানীর কার্য পরিচালনায় কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে এই কমিটির নিকট উহার জবাব তলব করে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এই কমিটির ডিরেক্টরগণ যৌথ দায়িত্বে কোম্পানীর বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পাদনের কাজ নির্বাহ করেন। ইঁহারা সর্বক্ষণের জন্য কোম্পানীর কর্মচারী। ডিরেক্টরদের মধ্যে কারবারীজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়াই ইহা গঠিত হয়। ফলে ইঁহারা দক্ষ ব্যক্তি হিসাবে সুষ্ঠু কোম্পানী পরিচালনায় উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু ইঁহাদের দায়িত্ব যৌথ থাকায় এবং অনেকক্ষেত্রে মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় কোম্পানীর কর্ম সম্পাদনে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ইহা ছাড়া ইঁহাদের মিলিত হইয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে অযথা বিলম্ব দেখা দেয়। সুতরাং ম্যানেজার বা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের তুলনায় ইহা কোন অধিকতর সুবিধাজনক ব্যবস্থা নহে বলিয়া অনেকের অভিমত।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর (Managing Director)

কোম্পানীর কার্য-নির্বাহক হিসাবে পরিচালনা নির্দেশক বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হইতে পারেন। কোম্পানী আইনে ইহার সংজ্ঞা নিম্নরূপ দেওয়া হইয়াছে :

কোম্পানীর সহিত চুক্তির বলে অথবা কোম্পানীর সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বলে কিংবা ডিরেক্টরদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বলে কিংবা স্মারকলিপি বা আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীর বলে যে ডিরেক্টরের উপরে কোম্পানী পরিচালনার সারবান ক্ষমতা অর্পিত হয় যাহা তিনি সাধারণভাবে ব্যবহারের অধিকারী নন তাহাকে পরিচালক নির্দেশক বলা হয়। ("A director who, by virtue of an agreement with the company or of a resolution passed by the company in general meeting, or by its Board of Directors or by virtue of its Memorandum or Articles of Association, is entrusted with substantial powers of management which would not otherwise be exercisable by him, and includes a Director occupying the position of a managing director by whatever name called.") ইঁহার প্রধান কার্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। ইনি পরিচালকমণ্ডলীর গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিয়া থাকেন।

২। উক্ত নীতি ও সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদিগকে তিনি যথাযথ নির্দেশ দান করিয়া থাকেন।

৩। কোম্পানীর দৈনন্দিন কার্যাবলী স্থির করা, উহা কার্যে পরিণত করার নির্দেশ

দান এবং উহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৪। সকল স্তরের কোম্পানীর কর্মচারীর নেতৃত্ব করা এবং উহাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করাও ইঁহার কাজ।

৫। কোম্পানীর বিভিন্ন কার্যাবলীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা, পারিচালকমণ্ডলার নিকট নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোম্পানীর ক্রমোন্নতি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে হিসাব ও প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান পেশ করাও উঁহার অন্যতম কাজ।

৬। প্রত্যেক উর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করা এবং উহার প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা নির্দেশ করাও ইঁহার কাজ।

৭। কর্মচারীদের দ্বারা প্রস্তুত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করা, উহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা এবং উহা গ্রহণীয় বা বর্জনীয় কিনা সে সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন করাও ইঁহার কাজ।

৮। সংগঠনের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং প্রত্যেকেই যাহাতে তাঁহার নিজ নিজ পদে অবস্থান করিয়া ঠিকভাবে কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন ও সুষ্ঠু কার্য সম্পাদন দ্বারা উচ্চতর পদের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারেন তাহার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাও ইঁহার বিশেষ কাজ।

৯। যে নীতিতে কোম্পানীর কাজ চলিয়া আসিতেছে উহার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন প্রভৃতি প্রয়োজন হইলে এবং নূতন নীতি প্রবর্তন করার প্রয়োজন হইলে উহা প্রস্তুত করা এবং পরিচালকমণ্ডলীর অনুমোদন লাভ করাও ইঁহার অন্যতম কাজ।

১০। নিয়মিতভাবে উৎকৃষ্ট পণ্য ন্যায্যমূল্যে সম্ভোগকারীদিগকে সরবরাহ করা এবং উহাতে যাহাতে তাহাদের সন্তুষ্টিবিধান হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা ইঁহার কাজ।

১১। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে কেহ নীতি ও সিদ্ধান্ত বহির্ভূত কাজে লিপ্ত থাকিলে উহার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ সম্পর্কে কোন মতবিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করাও ইঁহার কাজ।

১২। সরকারী বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত ঠিকমত যোগাযোগ স্থাপন করা এবং হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাও ইঁহার কাজ।

১৩। ইনি পদাধিকার বলে কোম্পানীর সকল প্রকার কমিটির সভ্যপদে অধিষ্ঠিত। এজন্য ইনি কোম্পানীর সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত হইতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন কমিটির সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার কাজেও ইঁহাকে লিপ্ত থাকিতে হয়।

১৪। বিশ্বাস ভঙ্গ, প্রতারণামূলক কার্য, ইচ্ছাকৃত ত্রুটি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে যাহাতে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী না হন এবং কর্তব্যে অবহেলা, কোম্পানীর অর্থের অপব্যবহার, উপযুক্ত ক্ষমতা ছাড়া কোম্পানীর সম্পত্তি বিক্রয় করা প্রভৃতি নীতি

বিগর্হিত কাজে যাহাতে ইনি লিপ্ত না হইয়া পড়েন সেদিকেও দৃষ্টি রাখিয়া ইঁহাকে কোম্পানী পরিচালনার কাজ নির্বাহ করিতে হয়।

ইঁহার **কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব** হইতেছে—কোম্পানীর সহিত চুক্তিবলে ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া এবং পরিচালকমণ্ডলীর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণে থাকিয়া সাধারণত উপরি-উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পন্ন করিবেন, কোম্পানীর কার্যাবলীর সমীক্ষা করিবেন এবং সেই সমীক্ষার বিবরণী পরিচালকমণ্ডলীর নিকট পেশ করিবেন এবং উহার নিকট ইহার কার্যের ত্রুটির জন্য কৈফিয়ত দিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

নির্বাহী নিযুক্তক বা ম্যানেজিং এজেণ্ট (Managing Agent)

কোম্পানী আইনে ম্যানেজিং এজেণ্টের সংজ্ঞা নিম্নরূপ দেওয়া হইয়াছে :

Managing Agent is "an individual, firm or body corporate entitled, subject to the provisions of this Act, to management of the whole, or substantially the whole, of the affairs of the company, by virtue of an agreement with the company, or by virtue of its Memorandum or Articles of Association and includes any individual, firm or body corporate occupying the position of a managing agent, by whatever name called." সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা কোম্পানী অপর কোনও কোম্পানীর সহিত চুক্তিবলে উক্ত কোম্পানী পরিচালনের সমস্ত কিংবা অধিকাংশ বিষয় নির্বাহের দায়িত্ব ও ক্ষমতা লাভ করে তবে উক্ত ব্যক্তি, সংস্থা বা কোম্পানীকে 'নির্বাহী নিযুক্তক' বলা হয়। আইন অনুযায়ী পরিচালকমণ্ডলীর (Board of Directors) নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশমত 'নির্বাহী নিযুক্তক' কোম্পানী পরিচালন করিতে বাধ্য। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে চুক্তির বলে ইঁহারা 'পরিচালকমণ্ডলী'র নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ ছাড়াও অনেক কাজ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। বর্তমানে অবশ্য এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থা যখন ছিল তখন ইহার কাজ নিম্নলিখিত রূপ ছিল :

(১) নূতন কোম্পানী গঠনে উদ্যোক্তার কাজ (Work of Pioneering and promoting new companies) : যৌথ কোম্পানী গঠন করিতে হইলে প্রথমত কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগী হইয়া কোম্পানী রেজেষ্ট্রি করার জন্য অনেক কিছু করিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ইঁহারা এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করিতেন এবং কোম্পানী গঠন ব্যাপারে ইঁহারা যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন এবং তজ্জন্য বিশেষ ঝুঁকিও বহন করিতেন ইহা বলাই বাহুল্য।

(২) অর্থের যোগান (Supply of Finance) : আমাদের দেশে যৌথ কোম্পানী গঠনের প্রধান অসুবিধা হইতেছে মূলধন সংগ্রহ। অধিকাংশ ব্যক্তি যাঁহারা অর্থবান, তাঁহারা শিল্পসংস্থানে অর্থ লগ্নি করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নহেন। এক কথায় আমরা বলি—'Indian Capital is proverbially shy'. কিন্তু এই 'নির্বাহী

নিযুক্তকগণ' কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করিতেন। ইঁহারা কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতেন। কোম্পানীকে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ঋণও দিতেন। তাহা ছাড়া ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, জনসাধারণ ও পরিচিত অর্থবান ব্যক্তিদের নিকট কোম্পানীর পক্ষ হইয়া ঋণ গ্রহণ করিতেন এবং উক্ত ঋণ পরিশোধের সর্বপ্রকার দায়িত্বও স্কন্ধে লইতেন। এইভাবে নানাবিধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে ইঁহারা কোম্পানীর আর্থিক অভাব-অনটন মোচন করিতেন।

(৩) **পরিচালনার কাজ** (**Work of Management**) : উক্ত দুই প্রকার দায়িত্ব ছাড়া ইঁহারা পরিচালনার প্রত্যক্ষ দায়িত্বও গ্রহণ করিতেন। ইহাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও নৈপুণ্যের জন্য ইঁহারা এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করিতে পারিতেন এবং ইহার ফলে কোম্পানী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইত।

ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পোন্নতিতে ইঁহাদের দান অসামান্য। ভারতের বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প, লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, শর্করাশিল্প, চা বাগান প্রভৃতির গোড়াপত্তন ও বর্তমান উন্নতি 'নির্বাহী নিযুক্তকদের' কর্ম-প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হইয়াছে একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

কর্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষ বা সেক্রেটারিজ এণ্ড ট্রেজারার্স (Secretaries and Treasurers)

কোম্পানীর কার্য-নির্বাহক হিসাবে কোম্পানী আইনে 'কর্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষ' নিয়োগের ব্যবস্থাও ছিল। ইহা ম্যানেজিং এজেন্টের বিকল্প ব্যবস্থা। কোম্পানী আইনে ইহার সংজ্ঞা নিম্নরূপ দেওয়া হইয়াছে :

Secretaries and Treasurers may be "any firm or body corporate (not being the managing agents) which, subject to the superintendence, control and direction of the Board of Directors, has the management of the whole or substantially the whole, of the affairs of the company and includes any firm or body corporate occupying the position of secretaries and treasurers, by whatever name called."

সুতরাং ইঁহাদের কার্যাবলী ম্যানেজিং এজেন্টদের মত। তবে সেক্রেটারিজ এবং ট্রেজারার্সের পদে অবশ্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের নিয়োগ হইতে পারিত না। কোন অংশীদারী কারবার কিংবা যৌথ কারবার এই পদে নিযুক্ত হইতে পারিত। ইঁহারা কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর তদারকি, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণাধীনে কোম্পানী পরিচালনার সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন।

ইঁহাদের কার্যাবলীর নমুনা ও দায়িত্ব সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

কোম্পানীর সকল প্রকার পরিচালনার কাজ বিধিসম্মতভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে

সম্পাদন করা ইহাদের মুখ্য কাজ ছিল। এই কাজ নির্বাহের জন্য ইহাদিগকে সম্পাদকীয় ও সচিব সংক্রান্ত কার্যাবলী করিতে হইত। ফলে কোম্পানীর কাগজপত্র, দলিল প্রভৃতি প্রস্তুত করা, কোম্পানীর বিভিন্ন সভা আহ্বান করা, সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা, শেয়ার বিলি ও উহার অর্থ আদায় করা, শেয়ার হস্তান্তর লিপিবদ্ধ করা, কোম্পানীর সহিত তৃতীয় পক্ষের বিভিন্ন চুক্তিতে স্বাক্ষর ও সিলমোহর দেওয়া প্রভৃতি ইহাদের উল্লেখযোগ্য করণীয় কাজ ছিল।

ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার (Manager)

কোম্পানী আইনে ব্যবস্থাপকের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

Manager is "an individual (not being the Managing Agent) who subject to, the superintendence, control and direction of the Board of Directors has the management of the whole or substantially the whole, of the affairs of a company and includes Director or any other person occupying the position of Manager, by whatever name called and whether under a contract of service or not."

ম্যানেজিং এজেন্ট নন এরূপ যে ব্যক্তি পরিচালকমণ্ডলীর তদারক, নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ মানিয়া কোম্পানী পরিচালনার সমগ্র বা প্রায় সমগ্র দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে 'ব্যবস্থাপক' বলে। চুক্তিবলে হউন বা অন্যভাবে হউন বা যে কোন নামে অভিহিত হউন পরিচালক বা ব্যবস্থাপক পদে আসীন ব্যক্তি মাত্রকে ব্যবস্থাপক বলা হইবে। সুতরাং ব্যবস্থাপক ব্যক্তিবিশেষমাত্র হইবেন। কোন অংশীদারী কারবার বা যৌথ কোম্পানী ব্যবস্থাপক হইতে পারে না। ব্যবস্থাপকের নিয়োগ, গুণাবলী, কার্যকালের মিয়াদ, পারিশ্রমিক প্রভৃতিও আইনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাপক একাদিক্রমে ৫ বৎসরের অধিককালের জন্য নিযুক্ত হইতে পারেন না। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব অনুযায়ী একই ব্যক্তি একই সঙ্গে দুই কোম্পানীর ব্যবস্থাপক থাকিতে পারেন। একই ব্যক্তি দুইয়ের অধিক কোম্পানীর ব্যবস্থাপক হইতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি প্রয়োজন। ব্যবস্থাপকের পারিশ্রমিক নীট আয়ের ৫ শতাংশের বেশী হইতে পারে না। উঁহার কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে উঁহাকে বিদায় দিলে তিনি তিন বৎসরের প্রদেয় পারিশ্রমিক পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ হিসাবে দাবী করিতে পারেন। ব্যবস্থাপকের প্রধান কাজ, দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) ইনি পরিচালকমণ্ডলীর নীতিগুলি ব্যাখ্যা করিবেন এবং তদনুযায়ী কার্যনির্বাহের জন্য বিভিন্ন বিভাগগুলিকে নির্দেশ দিবেন।

(২) বিভিন্ন বিভাগের কার্যের মধ্যে সহযোগিতার দ্বারা যাহাতে সমন্বয় সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিবেন।

(৩) প্রত্যেক কর্মী ও কর্মের দায়িত্ব, কর্মের পরিধি সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করিবেন।

(৪) কর্মীদের কাজে যাহাতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) সকল কার্যের সমীক্ষা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করিবেন।

৬) কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও জনসংযোগের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

এইভাবে দৈনন্দিন কার্যনির্বাহ করিবেন এবং কোম্পানীর কাজে যাহাতে কোন বিঘ্ন বা ক্ষতি না হয় তাহার জন্য দায়ী থাকিবেন।

ম্যানেজিং এজেন্সী এবং সেক্রেটারিজ এণ্ড ট্রেজারার্সের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Managing Agency and Secretaries and Treasurers)

কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা কোম্পানী যৌথ কোম্পানীর সহিত চুক্তিবলে উক্ত কোম্পানী পরিচালনার সমগ্র বা প্রায় সমগ্র বিষয়ের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা লাভ করিলে উক্ত ব্যক্তি, সংস্থা বা কোম্পানীকে ম্যানেজিং এজেণ্ট বলা হইত।

কিন্তু ম্যানেজিং এজেণ্ট ছাড়া কোন সংস্থা বা কোম্পানী যৌথ কোম্পানীর তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশে উক্ত কোম্পানী পরিচালনার সমগ্র বা প্রায় সমগ্র বিষয়ের ভার প্রাপ্ত হইলে উক্ত সংস্থা বা কোম্পানীকে সেক্রেটারিজ এণ্ড ট্রেজারার্স বলা হইত।

ভারতের শিল্পোন্নয়নের প্রথম দিকে শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব কম ছিল। ম্যানেজিং এজেণ্টগণ এই অবস্থায় অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন, উহার অর্থের যোগান ও পরিচালনার কাজ করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে উঁহারা ভারতের শিল্পোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কালক্রমে এই ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রবেশ করে এবং ইঁহারা স্বার্থান্বেষী দলভুক্ত হইয়া পড়েন। এজন্য আইন দ্বারা উঁহাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হয় এবং ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে ইঁহাদের উপর বহু প্রকার বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। ফলে বিকল্প ব্যবস্থারও প্রয়োজন দেখা দেয় এবং উক্ত কোম্পানী আইনে কোম্পানী পরিচালনা ব্যাপারে 'সেক্রেটারীজ এণ্ড ট্রেজারার্স' সংস্থা স্বীকৃতি লাভ করে। মোটের উপর 'সেক্রেটারিজ এণ্ড ট্রেজারার্স' কোম্পানী পরিচালনা ব্যাপারে ম্যানেজিং এজেন্সীর প্রতিদ্বন্দ্বী। কোম্পানী আইনে ইঁহাদের স্বীকৃতি দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার ত্রুটিসমূহ হইতে ইঁহাদিগকে মুক্ত রাখা এবং কোম্পানী পরিচালনায় ম্যানেজিং এজেন্সীর অভাব পূরণ করা। মূলত এতদ্ উভয়ের কাজের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। যে পার্থক্যগুলি উহাদের মধ্যে দেখা যাইত তাহা নিম্নরূপ :

ম্যানেজিং এজেন্ট	সেক্রেটারিজ এণ্ড ট্রেজারার্স
১। ব্যক্তিবিশেষ, অংশীদারী কারবার বা কোম্পানী—এই তিন শ্রেণীর মধ্যে যে কেহ ম্যানেজিং এজেন্ট হইতে পারিত।	১। কেবল অংশীদারী কারবার বা কোম্পানী সেক্রেটারীজ এণ্ড ট্রেজারার্স হইতে পারিতেন। কোন ব্যক্তিবিশেষ এই পদ পাইতে পারিত না।
২। ইঁহারা কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীতে এক হইতে দুই জন পর্যন্ত পরিচালক মনোনয়ন করিতে পারিতেন।	২। ইঁহারা কোন পরিচালক মনোনয়ন করিতে পারিতেন না।
৩। কেন্দ্রীয় সরকার কোন শিল্পে প্রয়োজন হইলে ইঁহাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করিতে পারিত। ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী বা সরকারী কোম্পানীতে ইঁহাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ ছিল।	৩। ইঁহাদের এরূপ কোন বিধি-নিষেধ ছিল না।
৪। ইঁহারা নীট লাভের শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত পারিশ্রমিক পাইতে পারিত।	৪। ইঁহারা নীট লাভের শতকরা ৭½ ভাগ পর্যন্ত পারিশ্রমিক পাইতে পারিত।
৫। ইঁহারা একসঙ্গে ১০টির বেশী কোম্পানীর পরিচালনভার গ্রহণ করিতে পারিত না।	৫। ইঁহারা যে-কোন সংখ্যক কোম্পানীর পরিচালনভার গ্রহণ করিতে পারিত।
৬। ইঁহারা কয়েকটি গণ্ডীর মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে পারিত।	৬। কোম্পানীর নিকট হইতে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে ইঁহারা ইঁহাদের পরিচালনাধীন কোম্পানীর পণ্যদ্রব্য বিক্রয় বা কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে পারিত না।

উপরি-উক্ত ক্ষেত্র ছাড়া কোম্পানী আইনে পরিচালনা সম্পর্কীয় বিষয়গুলি এবং তৎসম্পর্কীয় বিধি-নিষেধ উভয়ের পক্ষেই প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। তবে যদিও সেক্রেটারিজ এণ্ড ট্রেজারার্স 'ম্যানেজিং এজেন্টে'র বিকল্প ব্যবস্থা, এই বিকল্প ব্যবস্থা আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইঁহারা ম্যানেজিং এজেন্ট ব্যবস্থার রূপান্তর মাত্র। কেবল আইনের কড়াকড়ি হ্রাস পাওয়ার উদ্দেশ্যে অনেকক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্ট সেক্রেটারিজ এণ্ড ট্রেজারার্স পদাভিষিক্ত হইয়াছেন। যে উদ্দেশ্যে মুখ্য কার্য-নির্বাহক হিসাবে সেক্রেটারিজ এণ্ড ট্রেজারার্সের পদ সৃষ্টি হইয়াছিল সে উদ্দেশ্যে সফল হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হওয়ায় ম্যানেজিং এজেন্সীর সহিত এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ম্যানেজারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Managing Director and Manager)

কোম্পানীর সহিত চুক্তির বলে কিংবা শেয়ার-গ্রহীতাদের সাধারণ সভায় বা পরিচালকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বলে অথবা কোম্পানীর স্মারকলিপি এবং আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীর ক্ষমতাবলে যদি কোন পরিচালক কোম্পানী পরিচালনার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতায় অধিকারী হন যাহা তিনি সাধারণভাবে ব্যবহারের অধিকারী নন তবে উক্ত পরিচালককে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলা হয়। সুতরাং ম্যানেজিং ডিরেক্টর পরিচালকমণ্ডলীরই একজন সভ্য। শুধু অন্যান্য ডিরেক্টরের তুলনায় তিনি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। ম্যানেজারের সংজ্ঞাও অনুরূপ। তবে তিনি ডিরেক্টরও হইতে পারেন। উহাদের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে :

ম্যানেজার	ম্যানেজিং ডিরেক্টর
১। কোন ব্যক্তিবিশেষ ভিন্ন ম্যানেজার হইতে পারেন না।	১। কোন ব্যক্তিবিশেষ ভিন্ন ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইতে পারেন না।
২। ইনি পরিচালকমণ্ডলীর একজন সদস্য বা বাহিরের লোক হইতে পারেন।	২। ইনি পরিচালকমণ্ডলীর একজন সদস্য।
৩। ইনি যে-কোন প্রকার কোম্পানীতে নিযুক্ত হইতে পারেন।	৩। ইনি যে-কোন প্রকার কোম্পানীতে নিযুক্ত হইতে পারেন।
৪। ইনি সাধারণত একসঙ্গে দুইটি কোম্পানীর বেশীতে নিযুক্ত হইতে পারেন না।	৪। ইনি সাধারণত এক সঙ্গে দুইটি কোম্পানীর বেশীতে নিযুক্ত হইতে পারেন না।
৫। ইনি একবারে পাঁচ বৎসরের অধিক সময়ের জন্য নিযুক্ত হইতে পারেন না।	৫। ইনি একবারে পাঁচ বৎসরের অধিক সময়ের জন্য নিযুক্ত হইতে পারেন না।
৬। ইহার পারিশ্রমিক কোম্পানীর নীট লাভের ৫ শতাংশের বেশী হইতে পারে না।	৬। ইঁহার পারিশ্রমিক কোম্পানীর নীট লাভের ৫ শতাংশের বেশী হইতে পারে না।

ভারতের শিল্পোন্নয়নে ম্যানেজিং এজেন্টদের ভূমিকা (The role of the Managing Agents in the industrial development of India)

ভারতের শিল্পোন্নয়নে ম্যানেজিং এজেন্টদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহাদের সক্রিয় চেষ্টায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত শিল্প-উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তখন পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের দেশে প্রোমোটিং হাউস (Promoting House), ইস্যু হাউস (Issue House), আণ্ডাররাইটার (Underwriter) প্রভৃতি কোন

কিছুই ছিল না। অধিকাংশ ব্যক্তি যাঁহারা অর্থবান তাঁহারা শিল্পে অর্থনিয়োগ করিতে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন না। এক কথায়, Indian Capital was proverbially shy. শিল্প বাণিজ্যে অর্থ লগ্নী করিলে উহা লোকসান যাওয়ার ভয় তখন প্রবল ছিল। ম্যানেজিং এজেন্টরাই তখন শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হন। উঁহারা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া নূতন নূতন কোম্পানী গঠন, উহাতে মূলধন নিয়োগ এবং উহার পরিচালনা আরম্ভ করেন। তৎকালীন ভারতে অবস্থিত বৃটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিই প্রথম ভারতে শিল্প সম্ভাবনার সুযোগ দেখিয়া থাকেন এবং নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং উহার উন্নতির জন্য চেষ্টা আরম্ভ করেন। পরবর্তী কালে, উঁহারাই ম্যানেজিং এজেন্টদের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং এই নামেই পরিচিত হইতে থাকেন। ইঁহাদের চেষ্টায় এবং আনুকূল্যে ভারতের যে যে শিল্পগুলি বিশেষ উন্নতির পথে অগ্রসর হয় উহাদের মধ্যে চা, বস্ত্র, চিনি, কাগজ, পাট, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা এই সকল শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতিতে বিশেষ যোগ্যতারও পরিচয় দিয়াছেন। ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, উঁহারা এরূপ উদ্যোগী না হইলে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে অনেক শিল্পই প্রতিষ্ঠিত হইত না। ইঁহারা নিজেরাই কেবল কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় দ্বারা শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করেন নাই। ইঁহাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদিগকেও ইঁহারা শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ক্রয় করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং উহাতে সাফল্যলাভও করিয়াছেন। এইভাবে ইঁহারা ভারতের শিল্পজগতে খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ বলিয়া পরিচিত হইতে থাকেন। এরূপ খ্যাতিসম্পন্ন ম্যানেজিং এজেন্টের নাম কোনও কোম্পানীর বিজ্ঞাপনীতে (Prospectus) উল্লিখিত হইলে কোম্পানীর শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে বিক্রীত হওয়ার আগ্রহও দেখা দিত। এইভাবে দেশের অর্থবান ব্যক্তিগণ শিল্পে অর্থ নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। যে সকল ব্যক্তি কৃষিতে অর্থ বিনিয়োগ করিতে অধিকতর আগ্রহশীল ছিলেন তাঁহারাও উত্তরোত্তর শিল্পে মূলধন সরবরাহ করার আকর্ষণ বোধ করেন। এইভাবে ম্যানেজিং এজেন্টগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের শিল্পোন্নতির পথ প্রশস্ত করেন। সুতরাং শিল্পোন্নতিতে ইঁহাদের দান অসামান্য।

ম্যানেজিং এজেন্টরা ভারতের শিল্পের উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কালক্রমে ইঁহাদের মধ্যে নানা প্রকার দুর্নীতি প্রবেশ করে। ফলে এই ব্যবস্থায় নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়। সংক্ষেপে ইহা নিম্নরূপ :

১। ইঁহাদের মালিকানায় বংশানুক্রমিকতা আসিয়া দেখা দেয়। এজন্য অনেক সময় অযোগ্য হস্তে কোম্পানীর পরিচালনভার আসিয়া পড়ে। এই সমস্ত অযোগ্য ব্যক্তি অর্থবান, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কোম্পানী পরিচালনের দক্ষতা ও নৈপুণ্য নিতান্তই কম।

২। অনেক ক্ষেত্রে ইঁহাদের একই সংস্থার উপর অনেকগুলি কোম্পানীর পরি-

চালনভার আসিয়া পড়ে। এভাবে এতগুলি কোম্পানীর পরিচালন কাজ সমান সুষ্ঠু-ভাবে কখনই চলা সম্ভব নয়। অধিকন্তু ইঁহারা এক কোম্পানীর টাকা অন্য কোম্পানীর কাজে লাগাইয়া প্রথম কোম্পানীর যথেষ্ট ক্ষতিসাধনও করিয়া থাকেন।

৩। নানা উপায়ে ইঁহারা কোম্পানীর অধিকাংশ মুনাফা আত্মসাৎ করেন। ফলে প্রকৃত মালিক শেয়ার-গ্রহীতাদের ভাগে মুনাফার অংশ খুব কম পড়ে।

৪। অনেকক্ষেত্রে ইঁহারা কোম্পানীর ক্রয়-বিক্রয় লেন-দেনে গোপনে দস্তুরী লইয়া থাকেন।

৫। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইঁহারা কোম্পানীর 'পরিচালকমণ্ডলীর' মধ্যে নিজেদের লোক ঢুকাইয়া থাকেন। ফলে প্রকৃত কর্তৃত্ব ইঁহাদের হাতেই চলিয়া যায়।

৬। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইঁহারা কোম্পানীর শেয়ার লইয়া 'ফটকা কারবার' করেন।

৭। নিজেদের হাত হইতে ক্ষমতা চলিয়া যাওয়ার ভয়ে অনেক সময় অতি প্রয়োজনের সময়ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে ইঁহারা অনিচ্ছুক থাকেন।

৮। প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন কারবার পরিচালনভারও ইঁহাদের হাতে থাকে।

ইঁহাদের এই ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ইঁহারা বিরূপ সমালোচনার বস্তু হইয়াছেন। ফলে এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার গুরুত্ব হ্রাসে অন্যান্য ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি (Gradual Development of other Agencies to reduce the importance of Managing Agency System)

ভারতে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা উহার শিল্পোন্নয়নে বিশেষ সহায়তা করে। ম্যানেজিং এজেন্টগণ কোম্পানী গঠন, উহার ঝুঁকি বহন, মূলধন সংগ্রহ এবং পরিচালনা প্রভৃতি ব্যাপারে অতীতে বিশেষ কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দেয়। কালক্রমে ইঁহাদের মধ্যে নানাবিধ দুর্নীতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রবেশ করে।

ইঁহাদের এরূপ দুর্নীতির জন্য অনেকেই এই প্রথার উচ্ছেদ দাবী করেন এবং ইহার উপযোগিতা শেষ হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। অন্যদিকে ম্যানেজিং এজেন্টদের দলভুক্ত বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ইঁহাদের সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখাইয়া এই প্রথার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বিভিন্ন কমিশন, কমিটি এই প্রথার জটিল সমস্যার বিশ্লেষণ করেন কিন্তু উক্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের সুস্পষ্ট পথ ও মতামত দিতে পারেন নাই। এই বিভিন্নমুখী অভিমত থাকা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থার গুরুত্ব হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে কি ব্যবস্থা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে নিম্নের আলোচনা হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে:

১। ইঁহাদের প্রথম ভূমিকা কোম্পানীর প্রবর্তক হিসাবে। ইঁহারা অতীতে

অনেক কোম্পানীর প্রবর্তন করিলেও বিলুপ্তির সময় এই ভূমিকায় ইঁহাদের স্থান অতি নগণ্য ছিল। এই প্রথার সমর্থকগণও ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। বর্তমানে অনেক কোম্পানীই অন্যান্য প্রবর্তকদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সুতরাং ম্যানেজিং এজেন্টগণ এই ভূমিকা হইতে অপসারিত হইলে কোম্পানী প্রবর্তন বিশেষ ব্যাহত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

২। ইহার দ্বিতীয় ভূমিকা হইতেছে কোম্পানীর প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেওয়া বা উহা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। এককালে ইঁহারা এজন্য অনেক কিছুই করিয়াছেন। ইঁহারা নিজেরা অর্থের যোগান দিয়াছেন, নিজেদের চেষ্টায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং বৈদেশিক মূলধন আকৃষ্ট করিতেও কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু বিলুপ্তির পূবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অর্থের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র ইঁহারা নিজেদের তহবিল হইতে দিতেন। জন-সাধারণের বা কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারেও ইঁহাদের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সুনামের বিশেষ প্রয়োজন হইত না। ইহা ছাড়া সরকারী প্রচেষ্টায় গঠিত বিভিন্ন মূলধনসংস্থা বিভিন্ন কোম্পানীর প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ সংগ্রহের উপযোগী প্রতিষ্ঠানও আছে। সুতরাং অর্থসংগ্রহকারীর ভূমিকায় যে ইঁহারা অপরিহার্য এরূপ দৃঢ় অভিমত পোষণ করার সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

৩। অনেকে মনে করেন যে, ইঁহাদের বিলোপ সাধন করিলে উঁহাদের নিজস্ব সম্পদ হইতে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হইবে। এই যুক্তির সারবত্তাতেও আমাদের সন্দেহ আছে। উঁহারা ম্যানেজিং এজেন্টের ভূমিকায় শিল্পে অবশ্যই অর্থ নিয়োগ করিতেন। কিন্তু উঁহাদের সঞ্চিত অর্থ নিশ্চয় উঁহারা সিন্দুকে বন্ধ করিয়া কিংবা মাটির নীচে লুকাইয়া রাখিবেন না। সুতরাং যে ভাবেই উক্ত অর্থ বিনিয়োগ হউক না কেন উহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিল্পে নিয়োজিত না হওয়ার কোন কারণ নাই।

৪। ইঁহাদের তৃতীয় ভূমিকা হইতেছে ব্যবস্থাপক হিসাবে। অনেক ম্যানেজিং এজেন্ট কোম্পানী ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার ও অজ্ঞতার পরিচয়ও যে উঁহাদের অনেকে দেখান নাই একথা বলা চলে না। ইহা ছাড়া অনেক কোম্পানী বিশেষত বীমা, ব্যাঙ্কিং ও রাষ্ট্রীয় কারবার ম্যানেজিং এজেন্ট ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। দেশের অনেক যুবকই এখন ব্যবস্থাপক হিসাবে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। দেশে ও বিদেশে যে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে উহারাও সুদক্ষ ব্যবস্থাপকের চাহিদা ক্রমে ক্রমে পূরণ করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এজন্য ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রেও ম্যানেজিং এজেন্টগণ অপরিহার্য একথা বলা চলে না।

সুতরাং উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে শিল্পোন্নয়নে ম্যানেজিং এজেন্ট অপরিহার্য ছিল না। এজন্য সরকার

ইহার উচ্ছেদসাধন সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৩রা এপ্রিল হইতে ইহার বিলোপ সাধন ঘটিয়াছে।

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার বিকল্প হিসাবে উপদেশমূলক সংগঠন (Consultancy Organisations in place of Managing Agency System)

আমাদের দেশে উপদেশমূলক সংগঠন ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ না করিলেও পাশ্চাত্যদেশে ও আমেরিকায় এরূপ সংগঠন ব্যবস্থাপনাকার্যের দক্ষ উপদেষ্টা হিসাবে বিশেষ কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইহাদের সাহায্য খুবই উপযোগিতা সৃষ্টি করিয়া থাকে। উপদেশমূলক ভূমিকায় ইহারা নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। ইঁহারা অবশ্য যে সংগঠনকে উপদেশ বা পরামর্শ দিয়া থাকেন উহা হইতে পৃথক সংস্থা। কোনও সংগঠন ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক ব্যাপারে কোন সমস্যার সম্মুখীন হইলে এবং সংগঠনের অভ্যন্তরস্থ দক্ষ কর্মচারিগণ উহার সমাধান করিতে অপারগ হইলে এরূপ উপদেশমূলক সংগঠনের শরণাপন্ন হওয়া চলে। এরূপ সংগঠন নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন পরামর্শ দিয়া থাকে। এরূপ সংগঠন ব্যবস্থাপনা-বিশারদ হিসাবে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে উপদেশ বা পরামর্শ দিয়া থাকে। যে যে ক্ষেত্রে ইঁহাদের দক্ষ পরামর্শ পাওয়া যাইতে পারে উহাদের মধ্যে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস, সুষ্ঠু ক্রয়-বিক্রয়, হিসাবরক্ষণ, আইন, শ্রমিক, বাজেট প্রস্তুত প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় উল্লেখযোগ্য। এ সকল ব্যাপারে ইহারা দক্ষতা বৃদ্ধি ও জটিল সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

ম্যানেজিং এজেন্টদের ভূমিকা অবশ্য ইহাদের কার্যকলাপ হইতে কিছুটা পৃথক ছিল। ম্যানেজিং এজেন্টদের কাজ ছিল ত্রিবিধ—(ক) প্রবর্তন (Promoting), (খ) অর্থ সংস্থান (Financing) ও (গ) ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা (Management)।

যৌথ কোম্পানী গঠন করিতে হইলে প্রথমত কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগী হইয়া কোম্পানী গঠনের নানাবিধ কাজে লিপ্ত থাকিতে হয়। ম্যানেজিং এজেন্ট এরূপ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বহু কোম্পানী গঠন করিয়াছে। এরূপ কোম্পানী গঠিত হওয়ার পর উহার কার্য আরম্ভ ও পরিচালনার জন্য অর্থের অবশ্যই প্রয়োজন। ম্যানেজিং এজেন্টগণ এরূপ কোম্পানী গঠনের পর উহার শেয়ার বিক্রয় ও অন্যান্য উপায়ে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। উপরি-উক্ত দ্বিবিধ দায়িত্ব পালন ছাড়া ইঁহারা কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করিতেন এবং নিজেদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য দিয়া কোম্পানী পরিচালনার কাজ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করিতেন। ভারতে যৌথ কোম্পানী গঠন, উহার প্রসার ও উন্নতির মূলে ম্যানেজিং এজেন্টদের দান অনস্বীকার্য। কোম্পানী গঠন, অর্থের সংস্থান ও পরিচালনায় ইঁহারা প্রত্যক্ষ-

ভাবেই অংশ গ্রহণ করিতেন। উপদেশমূলক সংগঠনও এরূপ ভূমিকায় কাজ করিতে পারে। কিন্তু এরূপ সংগঠনকে প্রত্যক্ষভাবে এ সকল ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায় না। ইঁহারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কেহ কোম্পানী গঠনে উদ্যোগী হইলে তাঁহাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন। প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানী গঠনের ও পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণ এই উদ্যোক্তাদের করিতে হয়। ম্যানেজিং এজেণ্টদের সহিত উপদেশমূলক সংগঠনের এইখানেই পার্থক্য। ম্যানেজিং এজেণ্টদের মত বিভিন্ন সক্রিয় ভূমিকায় উপদেশমূলক সংগঠনকে কাজ করিতে দেখা যায় না। প্রয়োজন হইলে ম্যানেজিং এজেণ্টগণও ইঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিত। তবে ম্যানেজিং এজেন্সীর সক্রিয় ভূমিকার সময় ইহাদের ভূমিকা খুবই স্তিমিত ছিল। কারণ ম্যানেজিং এজেণ্টগণ এরূপ সংগঠনের তুলনায় নিজেদের দক্ষতা কম বলিয়া অতি অল্পক্ষেত্রেই মনে করিত। তবে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা উঠিয়া যাওয়ার পর কোম্পানী গঠন, উহার অর্থসংস্থান ও পরিচালনায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে সেই শূন্যতা পূরণের পরামর্শদাতা হিসাবে এরূপ সংগঠন বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। কারণ বর্তমানে অনেক কোম্পানীই বিভিন্ন উদ্যোক্তার চেষ্টায় গঠিত হইতেছে। অনেক লগ্নিকারক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহারা অর্থের সংস্থান ছাড়া দায়গ্রাহকের কাজও করিয়া আসিতেছে। দেশের মধ্যে লোকের সঞ্চয়স্পৃহা ও ক্ষমতা এবং সঞ্চিত অর্থ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ব্যাপারে আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের অনেক যুবক এখন ব্যবস্থাপক (Manager) হইবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষা গ্রহণও করিতেছে, দেশে ও বিদেশে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের যে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে উহারাও সুদক্ষ ব্যবস্থাপকের চাহিদা পূরণে সহায়তা করিতেছে। সুতরাং এরূপ পরিস্থিতিতে উপদেশমূলক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ম্যানেজিং এজেণ্টদের পরিবর্তে পরিচালকমণ্ডলী ও সুদক্ষ ব্যবস্থাপকদের মিলিত প্রচেষ্টায় নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন ও পরিধি অগ্রগতি লাভ করিতেছে। ইহার সহিত শ্রমিকদের নবজাগরণ ও উহাদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে সচেতন ভাব দেখা দেওয়ায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় জটিলতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় উপদেশমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইঁহাদের সুদক্ষ পরামর্শ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জটিল সমস্যা সমাধানে বিশেষ উপযোগিতা সৃষ্টি করিবে।

ইঁহাদের দক্ষ ও সৎপরামর্শ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শান্তিস্থাপন, উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যয় হ্রাস, কমমূল্যে ভাল পণ্য বিক্রয় ও সম্ভোগকারীদের প্রয়োজন মিটানো ও সন্তুষ্টিবিধান প্রভৃতি সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এই উপদেশমূলক সংগঠনের অগ্রগতি, কার্যকরী প্রভাব ও সাফল্য কতকগুলি অবস্থার উপর অবশ্য নির্ভরশীল। উহা নিম্নরূপ :

(ক) যেখানে ইহাদের পরামর্শের প্রয়োজন হইবে সেখানে ইহাদের সর্বপ্রথম কাজ হইবে উহার মূল সমস্যা এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা। ইহাদের

পরামর্শ শুধু ব্যবস্থাপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদান না করা হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে পরামর্শ প্রদান করা হইবে উহা যেন বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত করা সম্ভব হয়।

(খ) অনেক ক্ষেত্রে এরূপ উপদেশমূলক সংগঠনের সহিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরস্থ দক্ষ কর্মচারীদের বিরোধ দেখা দেয়। কারণ দক্ষ কর্মচারিগণ মনে করেন যে, তাঁহাদের কার্যের ও ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনার জন্যই ইহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। ফলে উভয়ের মধ্যে যে সহযোগিতার প্রয়োজন উহার অভাব দেখা দেয়। এই মনোভাব যাহাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন আছে এবং পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া যে সমস্যা সমাধান হইতে পারে না উভয় পক্ষের সে বিষয়ে অবহিত থাকা অবশ্য কর্তব্য কাজ।

শেয়ার-গ্রহীতাগণের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন (Provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the interests of shareholders)

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে শেয়ার-গ্রহীতাদের অধিকার এবং কার্যকরী ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পরিচালকমণ্ডলীর ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। ঐ সমস্ত বিধিব্যবস্থা বা নিয়ম নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। কোম্পানীর কার্যাবলীর পূর্ণ বিবরণ জানিবার অধিকার (Right to know full information of all activities of the Company) : শেয়ার-গ্রহীতাদের অবগতি ও আলোচনার জন্য কোম্পানীর সকল কার্যের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা কোম্পানীর আইনে আছে। এতদ্ উদ্দেশ্যে বার্ষিক সাধারণ সভার অন্তত ২১ দিন পূর্বে প্রত্যেক শেয়ার-গ্রহীতাকে উক্ত সভার বিজ্ঞপ্তি ও তৎসহ কোম্পানীর লাভ-লোকসান হিসাব উদ্বৃত্তপত্র, হিসাব পরীক্ষকের বিবৃতি, পরিচালকমণ্ডলীর বিবরণী এবং সভাপতির ভাষণ পাঠাইতে হয়। ইহার অন্যথা হইলে দায়ী ব্যক্তিগণ আইন-নির্দিষ্ট দণ্ড ভোগ করিবেন।

২। শেয়ারের মূল্যানুপাতিক ভোটাধিকার (Right to vote according to the value of Shares) : ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের পূর্বে সার্বজনিক যৌথ কোম্পানী সুবিধাভোগী, সাধারণ ও বিলম্বিত শেয়ার বিলি করিতে পারিত এবং উক্ত শেয়ারের ভোটাধিকার মূল্যানুপাতিক ছিল না। যেমন, বিলম্বিত শেয়ারের (Deferred Share) অভিহিত মূল্য (Face Value) অপেক্ষা উহার ভোটাধিকার অধিক ছিল। উহার ফলে কতিপয় ব্যক্তির হস্তে কোম্পানীর পরিচালনভার রাখা সম্ভব হইত এবং সুবিধাভোগী ও সাধারণ শেয়ার-গ্রহীতাদের ন্যায্য দাবী উপেক্ষিত হইত। কিন্তু বর্তমান আইনে এই বৈষম্য দূর হইয়াছে। সার্বজনিক

কোম্পানী এখন কেবল সুবিধাভোগী (Preference) এবং সাধারণ বা ন্যায্য (Equity) শেয়ার বিক্রি করিতে পারে এবং শেয়ারের মূল্যের অনুপাতে অধিক ভোটের অধিকার-যুক্ত কোন শেয়ার বিক্রি করিতে পারে না। এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়াছে, কারণ শেয়ারের মূল্য অনুযায়ী কোম্পানী পরিচালনায় পরিচালক নিয়োগ ব্যাপারে ইঁহারা ভোটদানের অধিকারী।

৩। **পুঞ্জিত ভোট প্রথা (Cumulative Voting System):** ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের পূর্বে শেয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী ভোটের সংখ্যা নির্ধারিত হইত। ইহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারের মালিকগণ নিজেদের পছন্দমত কিছু সংখ্যক পরিচালক নির্বাচন করিতে পারিতেন। কিন্তু পুঞ্জিত ভোট প্রথায় সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ার-মালিকগণও তাঁহাদের পছন্দমত কিছু সংখ্যক পরিচালক নির্বাচন করিতে পারেন। এই ভোট প্রথায় প্রত্যেক শেয়ার-গ্রহীতার ভোটের সংখ্যা স্থির হয় শেয়ারের সংখ্যাকে পরিচালক সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া। এই ব্যবস্থানুযায়ী কোন শেয়ার-গ্রহীতা তাঁহার সবগুলি ভোট কোন একজন পরিচালক পদপ্রার্থীকে দিতে পারেন। ইহার ফলে শেয়ার-গ্রহীতাগণ আনুপাতিক হারে পরিচালক মনোনয়ন করিতে পারেন। ইহা সংখ্যালঘিষ্ঠ (Minority) শেয়ার গ্রহীতাদের স্বার্থরক্ষারও একটি পন্থা। প্রয়োজন মনে করিলে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা আবশ্যিক করিতে পারেন।

৪। **শেয়ার-গ্রহীতাদের সমিতি (Shareholders' Association):** শেয়ার-গ্রহীতাগণ নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে সমিতি গঠন করিতে পারেন। ইহাতে অন্য কিছু না হউক প্রতিনিধি ভোট (Proxy Vote) ব্যবস্থার দুর্নীতি দূর করা এবং উহা অধিকতর কার্যকরী করা সম্ভব হইবে। এই সমিতি শেয়ার-গ্রহীতাদের সমষ্টিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিবে এবং ব্যক্তিগতভাবে সভায় উপস্থিত না থাকিয়াও যাহাতে ঠিকমত প্রতিনিধি ভোট দেওয়া হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে।

৫। **তদন্তের অধিকার (Right of Investigation):** কোম্পানীর পরিচালন ব্যবস্থায় অনাচার, অযোগ্যতা ও অব্যবস্থা দেখা দিলে শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কোম্পানী আইনে নানাপ্রকার তদন্তের ব্যবস্থা আছে। প্রথমত, নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার-গ্রহীতাদের আবেদনক্রমে বা কোম্পানীর নিবন্ধকের (Registrar) বিবরণের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যবেক্ষক (Inspector) নিযুক্ত করিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপের বিস্তৃত তদন্তের ব্যবস্থা করিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, কোম্পানী তদন্তের জন্য বিশেষ প্রস্তাব (Special Resolution) গ্রহণ করিলে বা আদালত তদন্তের নির্দেশ দিলে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যবেক্ষক নিয়োগ দ্বারা তদন্ত করিতে বাধ্য থাকেন। তৃতীয়ত, মালিকানা স্বত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার মধ্যে যদি বিশেষ পার্থক্য দেখা দেয় বা কোন অদৃশ্য হস্ত কাজ করে তবে উহা বন্ধ করার উদ্দেশ্যও বিশেষ তদন্তের এবং স্বার্থপর গোষ্ঠীদের অপসারণ করার ব্যবস্থা আছে। চতুর্থত, অযোগ্যতা, দুর্নীতি ও

অব্যবস্থা লক্ষ্য করিলে উহা যাহাতে সত্বর দূর হয় তজ্জন্য বিশেষ হিসাব পরীক্ষার এবং দলিলপত্র অন্বেষণের বা আটকের ব্যবস্থাও আইনে আছে। পঞ্চমত, ১৯৬৫ সালে কোম্পানী আইন সংশোধন দ্বারা যে কর্মকুশলতা নিরীক্ষা (Efficiency Audit) এবং পরিব্যয় হিসাব নিরীক্ষার (Audit of Cost Account) ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে উহাতেও শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে।

৬। **আদালতের ক্ষমতা (Power of the Court):** পরিচালন ব্যবস্থায় অযোগ্যতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার-গ্রহীতাদের উৎপীড়ন বন্ধ করার জন্যও আদালতকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতার বলে আদালত কোন কোম্পানীর কার্য পরিচালনার জন্য নূতন বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন, কোন শেয়ার-গ্রহীতার শেয়ার বাধ্যতামূলকভাবে অন্য শেয়ার-গ্রহীতাকে হস্তান্তরকরণ, মুখ্য-কার্যনির্বাহক বা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সহিত চুক্তির পরিবর্তন বা অবসান, স্মারকলিপি ও আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীর কোন বিষয়ের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে পারেন। শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই আদালতকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

৭। **কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা (Power of the Central Government):** সংখ্যাগরিষ্ঠদের উৎপীড়ন বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনবোধে কোম্পানী ট্রাইবুনালের মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের যে-কোন ব্যবস্থাপককে অপসারণ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া যে-কোন দুই-ব্যক্তিকে তিন বৎসরের জন্য পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারেন, আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে পরিচালক নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন ও অন্তর্বর্তী কালের জন্য দুইজন অতিরিক্ত পরিচালক নিযুক্ত করিতে পারেন এবং বর্তমান পরিচালকমণ্ডলীর কোন পরিবর্তন নিষিদ্ধ করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ক্ষমতা সংখ্যালঘিষ্ঠ শেযার-গ্রহীতাদের স্বার্থের রক্ষাকবচ।

৮। **হিসাব পরীক্ষকদের স্বাধীনতা (Freedom of Auditors):** কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষকদের কাজ শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থরক্ষার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া হিসাব পরীক্ষা করা। কিন্তু এই সকল হিসাব পরীক্ষকগণ ম্যানেজিং এজেণ্ট বা অন্য মুখ্য কার্য-নির্বাহকের স্বৈরাচারের ফলে সত্য ও নির্ভুল বিবৃতি দিতে পারিতেন না। সেরূপ অবস্থায় ইঁহাদের পদচ্যুতির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বর্তমান আইনে হিসাব পরীক্ষকদের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে এবং চাকুরীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার পূর্বের 'সততা ও নির্ভুলতার' পরিবর্তে এখন হিসাব পরীক্ষকদের 'ন্যায় ও সততার বিবরণী দিতে হয়। ইহার ফলে ইঁহাদের পক্ষে শেয়ার-গ্রহীতাদের যথাযথ স্বার্থরক্ষার সুযোগ ঘটিয়াছে।

৯। **অন্যান্য ব্যবস্থা (Other Measures):** উপরি-উক্ত ব্যবস্থা ছাড়া শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থ রক্ষার্থে আরও নানাপ্রকার বিষয় কোম্পানী আইনে লিপিবদ্ধ আছে। উহাদের মধ্যে উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপকদের নিয়োগ, পুনর্নিয়োগ প্রভৃতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন, উহাদের ক্ষমতা ও পারিশ্রমিক সম্পর্কে কঠোরতা, মুখ্য কার্য-নির্বাহকদের কার্যকালের নির্দিষ্ট মিয়াদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মোটের উপর নূতন কোম্পানী আইন নানাভাবেই শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিয়াছে। প্রকৃত স্বার্থরক্ষা অবশ্য নির্ভর করে শেয়ার-গ্রহীতাদের নির্লিপ্তভাব ত্যাগ, কোম্পানী পরিচালনা ব্যাপারে সক্রিয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং সতর্ক দৃষ্টি। ইহা ভিন্ন শুধু আইন সব কিছু করিতে পারে না।

সীমিত কোম্পানীর কার্যকলাপের উপর ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণ (Control of the Government of India over the activities of Limited Companies)

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের মাধ্যমে ভারত সরকার ভারতীয় যৌথ কোম্পানীর কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। সুতরাং কোম্পানী আইনের যে যে বিষয়গুলি এই নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করিয়া থাকে নিম্নের বিবরণ হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে:

১। **ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরিচালনযোগ্য কোম্পানীর সংখ্যা নির্দেশ। (Specification in regard to the number of companies which can be managed by the person or firm in charge of management):** কোম্পানীর উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের মধ্যে একই সময়ে প্রত্যেক পরিচালক ২০টি কোম্পানীতে পরিচালক হিসাবে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ম্যানেজার উক্ত পদাধিকারবলে ২টি কোম্পানীতে থাকিতে পারেন। এই নিয়ম অমান্য করিলে আইনে গুরুতর দণ্ডের বিধান আছে। উপরি-উক্ত নিয়ম দ্বারা যদৃচ্ছ সংখ্যক কোম্পানী পরিচালনার দ্বারা অযোগ্যতা প্রকাশ ও ক্ষমতার অপব্যবহার দূর করার চেষ্টা হইয়াছে।

২। **পারিশ্রমিকের হার নির্ধারণ (Fixing of the rate of remuneration):** উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ সমষ্টিগতভাবে নীট মুনাফার ১১ শতাংশ পর্যন্ত কিংবা মুনাফা কম হইলে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী। যে কোম্পানীতে কোন মুখ্য কার্য-নির্বাহক নাই তথায় পরিচালকবর্গ একত্রে নীট মুনাফার ৩ শতাংশ পর্যন্ত পারিশ্রমিক পাইতে পারেন। অন্যথায় উহাদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ হইবে নীট মুনাফার ১ শতাংশ। একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকিলে তাঁহার পারিশ্রমিক হয় নীট মুনাফার ৫ শতাংশ এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সংখ্যা একাধিক হইলে উহারা যৌথভাবে নীট মুনাফার ১০ শতাংশ পাইতে পারেন। ম্যানেজার পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন নীট মুনাফার ৫ শতাংশ। উক্ত বিভিন্ন হারের অধিক পারিশ্রমিক দিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি প্রয়োজন। কোম্পানী আইন এইভাবে ব্যবস্থাপকদের মুনাফা আত্মসাৎ করা সম্পর্কে নিষেধ-নিষেধ আরোপ করিয়াছে।

৩। **উচ্চ পর্যায়ের কার্য-নির্বাহকদের কার্যকাল (Period of Service of the High Level Executives):** পরিচালকগণ তিন বৎসরের জন্য

নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ম্যানেজারদের নিয়োগ কাল ৫ বৎসর। ইঁহাদের নিয়োগ ও পুনর্নিয়োগ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ। এইভাবে ইঁহাদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

৪। **মুখ্য কার্য-নির্বাহকদের অপসারণ (Removal of the Chief Executives):** ইহারা কোনপ্রকার প্রতারণা, কার্যে অবহেলা, বিশ্বাসভঙ্গ, দুর্নীতি ও অব্যবসায়িক কার্যকলাপে লিপ্ত হইলে কোম্পানী ট্রাইবুনালের বিচার ও পরামর্শ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ইঁহাদিগকে বরখাস্ত করিতে পারেন। তখন ইঁহারা পরবর্তী ৫ বৎসরের জন্য কোন কোম্পানীতে নিযুক্ত হইতে পারেন না এবং এই বরখাস্ত হওয়ার দরুণ কোন ক্ষতিপূরণও দাবী করিতে পারেন না।

৫। **হিসাব পরীক্ষকদের ক্ষমতা ও কর্তব্য (Powers and Duties of the Auditors):** ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের পূর্বে হিসাব পরীক্ষকদের ক্ষমতা ও কর্তব্য বিশেষ বিস্তৃত ছিল না। পক্ষান্তরে উঁহারা অপসারণের ভয়ে কোম্পানীর হিসাবে গলদ থাকিলেও ব্যবস্থাপকদের বিরুদ্ধে কোন বিবরণ দিতেন না। কিন্তু এই নূতন আইনে উঁহাদের অপসারণ দুরূহ করা হইয়াছে এবং ১৯৬৫ সালে উহার সংশোধন দ্বারা উঁহাদের কর্তব্য, ক্ষমতা ও দায়িত্বের পরিধি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা হিসাব পরীক্ষকদের উপর কোম্পানীর আয়, ব্যয়, দায়, সম্পত্তি প্রভৃতির ঠিকমত হিসাব ও মূল্য নির্ধারণ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে এবং কোন লেন-দেনের ব্যাপারে কোম্পানীর স্বার্থ বিপন্ন হইবার আশঙ্কা থা কলে বা উহার পরিপন্থী হইলে উহা পৃথকভাবে বিবরণীতে উল্লেখ করার দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতাও সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং এই ব্যবস্থার দ্বারা কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের উপর আইনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৬। **কর্মকুশলতা ও পরিব্যয়-সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষা (Efficiency and Cost Accounting Audit):** ১৯৬৫ সালে কোম্পানী আইনের সংশোধন দ্বারা এই নূতন বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। শিল্প-সংক্রান্ত কোম্পানীতেই এই বিধান কার্যকর করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কর্ম-কুশলতা নিরীক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে, কোন কোম্পানীতে শিল্প-সংক্রান্ত ব্যাপারে কাঁচামাল ও শ্রমের উপযুক্ত ও যথাযথ ব্যবহার হইয়াছে কিনা উহা নিরূপণ করা। এজন্য নিবন্ধক (Registrar) কিংবা অন্য কোন অধিকারিক কোন সংবাদ না দিয়া কোম্পানীতে উপস্থিত হইতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও হিসাব বহি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে পারেন। আবার পরিব্যয় হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিয়মিত হিসাব পরীক্ষক ছাড়া পৃথক নিরীক্ষক নিযুক্ত করার ব্যবস্থা আছে। ইঁহার ক্ষমতা ও দায়িত্ব সাধারণ হিসাব পরীক্ষকের অনুরূপ। এই ব্যবস্থার দ্বারা কাঁচামাল ও শ্রমের অপব্যবহার ও অপচয় দূর করার উপর আইনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৭। **বিজ্ঞাপনীতে বিশদ বিবরণ (Full Particulars in the Prospectus):** সুদৃঢ় ভিত্তিতে কোম্পানী গঠনের উদ্দেশ্যে কোম্পানী আইনে

বিজ্ঞাপনীতে বিশদ বিবরণ দেওয়া বাধ্যতামূলক হইয়াছে। কারণ এই বিবরণ হইতে বিনিয়োগকারিগণ কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সাফল্য ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হইতে পারেন। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আইনে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

৮। **কোম্পানী আইন প্রশাসন (Company Law Administration) :** যৌথ কোম্পানীকে নিয়ন্ত্রণ করা কোম্পানী আইনের উদ্দেশ্য। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণ উহার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং কোম্পানী আইন বলবৎ করার জন্য ভাবা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার নিজ হস্তে কোম্পানী আইনের প্রশাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন এবং এজন্য তিনটি স্তর-বিশিষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই প্রশাসন ব্যবস্থার নিম্নস্তরে আছেন নিবন্ধক (Registrar)। তিনি নূতন কোম্পানী গঠনের দলিল-পত্রাদি বিচার-বিবেচনা করিয়া কোম্পানী গঠনের নিবন্ধকপত্র (Certificate of Incorporation) এবং কারবার আরম্ভের অনুমতিপত্র (Certificate of Commencement) দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া যে সমস্ত কোম্পানী পঞ্জীভূত (Registered) হইয়াছে উহাদের দলিল ও নথিপত্র সংরক্ষণ করেন, উহাদের বিভিন্ন বিবৃতি ও বিবরণী ঠিকমত দাখিল হইয়াছে কিনা উহা পর্যবেক্ষণ করেন এবং দাখিলী বিবৃতি ও বিবরণীর বিষয়বস্তু আইনানুমোদিত কিনা উহা বিশ্লেষণ করেন। এইভাবে তিনি কোম্পানী গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে সতর্ক প্রহরীর মত সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন।

মধ্যম স্তরে ৪টি আঞ্চলিক অধিকরণ (Regional Directorates) অবস্থিত। ইহাদের কাজ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে এবং কেন্দ্রীয় বোর্ড ও নিবন্ধকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। ইহাদের অধিকর্তা নিবন্ধকদিগকে প্রয়োজনীয় আদেশ-নির্দেশও দিয়া থাকেন।

সর্বোচ্চ স্তরে কোম্পানী-সংক্রান্ত বিভাগ (Department of Company Affairs) অবস্থিত। এই বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কোম্পানী আইন প্রশাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। ইহা ছাড়া এই বিভাগ অর্থ সংস্থানকারী কর্পোরেশন ও শেয়ার বাজারও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নতি এবং কোম্পানী-সংক্রান্ত মন্ত্রকের (Ministry of Industrial Development and Company Affairs) অধীনে এই বিভাগ কাজ করিয়া থাকে।

ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার বা কোম্পানী-সংক্রান্ত বিভাগকে কোন স্থিরীকৃত বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার জন্য ১৯৬৫ সালের কোম্পানী আইন সংশোধন দ্বারা কোম্পানী আইন-সংক্রান্ত একটি উপদেষ্টা কমিটিও (Company Law Advisory Committee) স্থাপিত হইয়াছে।

এইভাবে উপরি-উক্ত বিভিন্ন উপায়ে কেন্দ্রীয় সরকার হিসাবপত্র তলব, চরম অব্যবস্থায় পরিদর্শক নিয়োগ, হিসাবপত্রে নির্ভুলতা বিচার করিবার জন্য বিশেষ হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ, সংখ্যালঘু শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থ রক্ষার্থে পরিচালক নিয়োগ,

আদালতের সাহায্যে কোম্পানীর উপর নূতন আইনকানুন আরোপ, ব্যবস্থাপকদের সহিত কোম্পানীর চুক্তি সংশোধন ও বাতিল, বিশেষ কোন শিল্প-বাণিজ্যে ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগ নিষিদ্ধ এবং প্রয়োজনবোধে বাধ্যতামূলকভাবে পুঞ্জীভূত ভোটাধিকার প্রয়োগ দ্বারা কোম্পানীর উপর নিয়ন্ত্রণ-নিয়মনিষ্ঠা ও নির্দেশ কার্যকরী করিয়া থাকেন এবং আইন লঙ্ঘনকারীকে আইনানুমোদিত দণ্ড দানের ব্যবস্থা করেন।

৯। কোম্পানী আইন ঘরোয়া কোম্পানীর উপর নিম্নলিখিতভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

(১) নিবন্ধনের সময় ইহার পক্ষে পৃথকভাবে আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী (Articles of Association) পেশ করা বাধ্যতামূলক।

(২) উক্ত আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীতে ঘরোয়া কোম্পানীর হিসাবে তিনটি প্রধান শর্ত লিপিবদ্ধ করিতে হয়। এই শর্ত তিনটি হইতেছে—(ক) ইহার শেয়ার-গ্রহীতাদের সর্বোচ্চ সংখ্যা (কর্মচারী শেয়ার-গ্রহীতা ছাড়া পঞ্চাশ) নির্ধারণ করা, (খ) অবাধ শেয়ার হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ এবং (গ) জনগণকে উহার শেয়ার ক্রয় করার আহ্বান নিষিদ্ধকরণ।

(৩) ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে ইহার উপর নিম্নলিখিত নূতন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও হইয়াছে :

(ক) ইহার নামের শেষে 'প্রাইভেট' (Private) কথাটি যোগ করিতে হয়।

(খ) ইহাকে আইনসম্মত হিসাব-পরীক্ষক নিয়োগ করিতে হয়।

(গ) ইহার পরিচালক সংখ্যা অন্ততঃ দুইজন থাকা চাই।

(ঘ) ইহার বাৎসরিক উদ্বৃত্তপত্র, লাভ-লোকসান হিসাব ও বিবরণী নিবন্ধকের নিকট পেশ করিতে হয়।

(৪) ইহা সার্বজনিক কোম্পানী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। তাহা হইলে ইহা সার্বজনিক কোম্পানী বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) যে সকল ঘরোয়া কোম্পানীর অন্তত ২৫ শতাংশ আদায়ীকৃত মূলধন এক বা একাধিক কোম্পানী সরবরাহ করিয়া থাকে উহারা সার্বজনিক কোম্পানী বলিয়া পরিগণিত হইবে। তবে এরূপ কোম্পানীর দুইজন পরিচালক ও উহার সভায় অন্ততঃ দুইজন সদস্য উপস্থিত থাকিলে চলে।

পুঞ্জীভূত ভোটপ্রথা (**Cumulative Voting**)

পুঞ্জীভূত ভোটপ্রথায় প্রত্যেক শেয়ার-গ্রহীতার ভোটের সংখ্যা স্থির করা হয় শেয়ারের সংখ্যাকে পরিচালক পদের সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া। যেমন, কোন শেয়ার-গ্রহীতা যদি ১০টি শেয়ার ক্রয় করেন এবং কোম্পানীর পরিচালক সংখ্যা যদি ৫ জন হয় তবে উহার ভোটের সংখ্যা দাঁড়াইবে ১০ × ৫ = ৫০। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার সবগুলি ভোটই একজন পরিচালক পদপ্রার্থীকে দিতে পারেন। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে সার্বজনিক কোম্পানীর পরিচালক নির্বাচনের জন্য পুঞ্জীভূত ভোটপ্রথা গ্রহণের

অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ার-গ্রহীতাদিগকে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক পরিচালক নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া। কিন্তু পুরাতন ব্যবস্থায় শেয়ার প্রতি একটি ভোট থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল চিরকালই সমস্ত পরিচালক নির্বাচনের সুযোগ পাইত। পুঞ্জীভূত ভোটপ্রথায় কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ার-গ্রহীতাগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার-গ্রহীতাদের সমান সংখ্যক পরিচালকও নির্বাচন করিতে পারেন। যেমন, কোন কোম্পানীতে যদি ৫০০ শেয়ার থাকে এবং ১০ জন পরিচালক নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় তবে ২৫১টি শেয়ারের মালিকগোষ্ঠী পুরাতন ভোটপ্রথায় ১০ জন পরিচালকই নির্বাচন করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু পুঞ্জীভূত ভোটপ্রথায় অন্যরূপ অবস্থা দেখা দিবে। সংখ্যালঘিষ্ঠদল অন্ততঃ ৫ জন পরিচালক নির্বাচন করিতে পারিবেন। কারণ এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ভোটের সংখ্যা যদি (২৫১ × ১০) = ২৫১০ হয় তবে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের ভোটের সংখ্যা দাঁড়াইবে (২৪৯ × ১০) = ২৪৯০। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল উহাদের মোট ভোট ৫ জন প্রার্থীর মধ্যে বণ্টন করিলে প্রত্যেক প্রার্থী ৫০২টি ভোট পাইবেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল উহাদের মোট ভোট ৫ জনের মধ্যে বণ্টন করিলে প্রত্যেক প্রার্থী ৪৯৮টি ভোট পাইবেন। এরূপ ভোট বণ্টনে উভয় পক্ষই লাভবান হইবেন। এই ভোটপ্রথায় অবশ্য সব পরিচালক নির্বাচন একত্রে হওয়া প্রয়োজন। এজন্য কোম্পানী আইনে তিন বৎসর অন্তর পুঞ্জীভূত ভোটপ্রথায় পরিচালক নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া আছে। অন্তর্বর্তীকালীন শূন্যপদ পূরণের জন্য অবশ্য পরিচালকমণ্ডলীকেই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা (Provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the interests of the minority shareholders)

কোম্পানীর গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের উপর বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর হয়। এরূপ অবস্থায় সংখ্যা-গরিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থের পরিপন্থী হইলেও উহা মানিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। ইহা সত্ত্বেও ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষার্থে কিছুটা রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে। উক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থাগুলি দুই অংশে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে:

১। **কোম্পানী ট্রাইবুনালের ক্ষমতা (Powers of the Companies Tribunal):** কোম্পানীর অব্যবস্থা এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর অত্যাচারমূলক সিদ্ধান্ত দেখা দিলে যে-কোন শেয়ার-গ্রহীতা নিম্নলিখিত মর্মে কোম্পানী ট্রাইবুনালের নিকট আবেদন করিতে পারেন:

(ক) কোম্পানীর সিদ্ধান্ত কোন শেয়ার-গ্রহীতার প্রতি অত্যাচার বা অবিচার-মূলক। এরূপ অবস্থায় কোম্পানী ভঙ্গ হওয়া উচিত। কিন্তু উক্ত ব্যবস্থা শেয়ার-গ্রহীতার পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকারক।

(খ) যেভাবে কোম্পানী পরিচালনা হইতেছে উহা কোম্পানীর পক্ষে ক্ষতিকারক।

(গ) কোম্পানীর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। এরূপ পরিবর্তনের ফলে কোম্পানীর পরিচালনা কোম্পানীর পক্ষে ক্ষতিকারক।

যদি কোম্পানী ট্রাইবুনাল উপরি-উক্ত যে-কোন অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হন তবে উহা দূরীকরণের জন্য কোম্পানীকে যে-কোন নির্দেশ দিতে পারেন।

কোম্পানী ট্রাইবুনাল শেয়ার-গ্রহীতাদের এরূপ আবেদনের বিষয় কোম্পানী ল বোর্ড (Company Law Board)-কে, বর্তমানে কোম্পানী-সংক্রান্ত বিভাগ (Department of Company Affairs)-কে অবশ্য জানাইবেন। উপরি-উক্ত অবস্থায় কোম্পানী-সংক্রান্ত বিভাগ ইচ্ছা করিলে কোম্পানীর ত্রুটি দূর করার জন্য কোর্টে (Court) আবেদন করিতে পারেন কিংবা শেয়ার-গ্রহীতাকেও এরূপ আবেদন করিতে নির্দেশ দিতে পারেন।

২। **কোম্পানী-সংক্রান্ত বিভাগ (Department of Company Affairs)**: উপরি-উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হইলে এই বিভাগ 'কোর্টে' আবেদন ছাড়া সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থরক্ষার্থে নিম্নলিখিত যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

(ক) তিন বৎসরের জন্য দুইজন ডিরেক্টর নিয়োগ করিতে পারেন।

(খ) সমানুপাতিক ভোটাধিকার (Proportional Representation) দ্বারা দুইজন পর্যন্ত ডিরেক্টর নিয়োগ করিতে পারেন।

উপরি-উক্ত ডিরেক্টরদের কোন শেয়ার যোগ্যতা (Share Qualification) প্রয়োজন হইবে না এবং উহারা আবর্তন (Rotation) প্রথায় অবসর গ্রহণ করিবেন না।

কিন্তু কোম্পানী-সংক্রান্ত বিভাগে যে সকল শেয়ার-গ্রহীতা আবেদন করিবেন উহারা আদায়ীকৃত মূলধনের অন্ততঃ এক-দশমাংশের মালিক হইবেন, নতুবা উহাদের সংখ্যা ১০০ কিংবা শেয়ার সংখ্যা এক-দশমাংশ যাহা কম তাহা হইলে চলিবে। যে সকল কোম্পানীতে শেয়ার নাই সে সমস্ত ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের সংখ্যা মোট সভ্য সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ হওয়া চাই।

উপরি-উক্ত ব্যবস্থা ছাড়া কোম্পানী আইনে নিম্নলিখিত উপায়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে:

(ক) উদ্দেশ্য পরিবর্তন, মূলধন হ্রাস প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষেত্রে কোর্টের অনুমোদন প্রয়োজন।

(খ) কোম্পানী শেয়ার হস্তান্তর অগ্রাহ্য করিলে উহার বিরুদ্ধে কোম্পানী ট্রাইবুনালের নিকট অভিযোগ করার অধিকার শেয়ার-গ্রহীতাদের আছে।

(গ) সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ার-গ্রহীতাগণ কোম্পানীর বিষয় অনুসন্ধানের জন্যও কোম্পানী-সংক্রান্ত বিভাগের নিকট আবেদন করিতে পারেন।

(ঘ) একজনমাত্র শেয়ার-গ্রহীতাও কোম্পানীর কার্য-নির্বাহকদের পদচ্যুতির জন্য কোম্পানী-সংক্রান্ত বিভাগের নিকট আবেদন জানাইতে পারেন।

(ঙ) একজনমাত্র শেয়ার-গ্রহীতাও ন্যায়ের দাবীতে কোর্টে কোম্পানী ভঙ্গের জন্য আবেদন পেশ করিতে পারেন।

(চ) কোন শেয়ার-গ্রহীতার অংশ ক্রীত না হইলে তিনি কোম্পানীর পরিবর্তন বা একত্রীকরণে বাধা দিতে পারেন।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. The power of the Company management is generally delegated by the Board of Directors to the Chief Executive of the company. What then becomes the role and function of the Board and the Chief Executive ? [B. U. B. Com. (Hons.) 1971]

কোম্পানী পরিচালনায় পরিচালকমণ্ডলী প্রধান কর্মকর্তার উপর ক্ষমতা অর্পণ করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলী ও প্রধান কর্মকর্তার ভূমিকা ও কাজ কি ?

2. Explain the causes of separation between ownership and management in a widely owned public company. Does it appear as a serious problem of a company management ?

[B. U. B. Com. 1965]

ব্যাপক মালিকানার সার্বজনিক কোম্পানীর মালিকানা এবং পরিচালনার মধ্যে যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কারণ বর্ণনা কর। ইহা কি কোম্পানী পরিচালনার গুরুতর সমস্যা বলিয়া মনে হয় ?

3. Discuss the management pattern of any Public Limited Company with which you are familiar.

[C. U. B. Com. Hons.) 1964]

কোনও পরিচিত সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর পরিচালনা কাঠামো আলোচনা কর।

4. The Board of Directors of many Public Limited Companies consists of Managing Directors and Directors. What are their respective functions and responsibilities ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1964]

অনেক সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ডিরেক্টর থাকেন। উঁহাদের প্রত্যেকের কাজ ও দায়িত্ব কি ?

5. Discuss the functions and responsibilities of the Board of Directors of a Company. [B. U. B. Com. (Pass) 1971 ;
C. U. B. Com. (Pass) 1973]

কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর কাজ ও দায়িত্ব আলোচনা কর।

6. Discuss the duties and responsibilities of the Managing Directors of a Public Limited Company.
[B. U. B. Com. (Pass) 1966]

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীতে ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের কর্তব্য ও দায়িত্ব আলোচনা কর।

7. Discuss the duties and responsibilities of Managing Directors of a Public Limited Company under the Companies Act, 1956. [C. U. B. Com. (Pass) 1968]

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের কর্তব্য ও দায়িত্ব আলোচনা কর।

8. Outline the principal alternative forms of company management to be available after abolition of the Managing Agency System. [C. U. B. Com. (Pass) 1970]

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর কোম্পানী পরিচালনার জন্য যে প্রধান বিকল্প প্রথা পাওয়া যাইবে উহাদের পরিচয় দাও।

9. Public Limited Companies in India may be managed by Managing Agents or by Secretaries and Treasurers. What are the differences, if any, in their functions?
[C. U. B. Com. (Pass) 1965—Part II, 1968, 1969]

ভারতে সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী ম্যানেজিং এজেন্ট কিংবা সেক্রেটারী ও ট্রেজারারদের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে। উহাদের কার্যের মধ্যে পার্থক্য কি?

10. Do you think abolition of the Managing Agency System will hinder the growth of industries in India? Give reasons for your answer. [C. U. B. Com. (Pass) 1966]

ম্যানেজিং এজেন্ট প্রথার অবলুপ্তিতে কি ভারতের শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইবে? যুক্তিসহ উত্তর লিখ।

11. Discuss how the development of various agencies has reduced the importance of the Managing Agency system so that the system is no longer considered as vital in business.
[C. U. B. Com. (Hons.) 1970]

কিভাবে বিভিন্ন প্রথার উন্নতিতে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে যাহার ফলে উহা আর কারবারে অপরিহার্য নয়, উহার আলোচনা কর।

12. Abolition of Managing Agency System has now been finally decided upon by the Government. Discuss fully the pros and cons of this decision. [C. U. B. Com. (Hons.) 1968]

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার বিলোপ করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। উহার সপক্ষের ও বিপক্ষের মতামত আলোচনা কর।

13. Do you think that the abolition of the Managing Agency system will be a right step on the part of the Government? Give reasons for your answer. [C. U. B. Com. (Hons.) 1969]

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার বিলোপ সাধন কি সরকারের পক্ষে ঠিক পন্থা বলিয়া বিবেচনা কর? যুক্তিসহ উত্তর লিখ।

14. State the measures adopted in the Companies Act for ensuring sound company formation in India.

[B. U. B. Com. (Hons.) 1971]

ভারতে সুস্থ কোম্পানী গঠনের জন্য কোম্পানী আইনে যে ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হইয়াছে উহার উল্লেখ কর।

15. What are the provisions of the Companies Act, 1956, for safeguarding the interests of shareholders?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে কি নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে?

16. How does the Companies Act, 1956, help to create control over limited companies, both public and private?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1963]

সার্বজনিক ও ঘরোয়া কোম্পানীর উপর নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করার জন্য ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন কিভাবে সাহায্য করিয়া থাকে?

17. How does the Government of India control, regulate and guide the activities of Public Limited Companies?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর কার্যকলাপের উপর ভারত সরকার কিভাবে নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিতকরণ ও নির্দেশ দান করিয়া থাকেন?

18. Discuss how Government of India exercise control over companies registered under the Companies Act.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1969]

কোম্পানী আইনানুসারে রেজেস্ট্রীকৃত কোম্পানীগুলিকে ভারত সরকার কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন আলোচনা কর।

19. What is Cumulative Voting ? Discuss its significance.

পুঞ্জীভূত ভোটপ্রথা কাহাকে বলে ? উহার তাৎপর্য আলোচনা কর।

20. What are the provisions of the Companies Act, 1956, for safeguarding the interests of the minority shareholders.

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা আছে ?

21. Discuss how far consultancy organisations can replace erstwhile managing system in India. [C. U. B. Com. (Hons.) 1972]

ভারতে উপদেশমূলক সংগঠন পূর্বেকার ম্যানেজিং প্রথার বিকল্প হিসাবে কিভাবে কাজ করিতে পারে আলোচনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

কোম্পানী কর্মসচিব-সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি

(Company Secretarial Practice)

কোম্পানীর কর্মসচিব এবং তাঁহার কাজ ও ক্ষমতা (Company Secretary and his functions and powers)

যৌথ কোম্পানীর কর্মসচিব কোম্পানী আইন অনুযায়ী নিযুক্ত যৌথ কারবারের একজন বেতনভোগী কর্মচারী। কোম্পানী আইনে উহার সংজ্ঞা নিম্নরূপ দেওয়া হইয়াছে: Secretary is "any individual, firm or body corporate appointed to perform the duties which may be performed by a secretary under this Act and any other purely ministerial or administrative duties."

কোম্পানীর কর্মসচিব পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি পরিচালকমণ্ডলীর কর্তৃত্বাধীনে কাজ করিয়া থাকেন। আইনত তিনি কোম্পানীর কর্মচারী ভিন্ন কেহ নহেন। এজন্য তাঁহাকে যথোপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়া না থাকিলে কোম্পানীর পক্ষ হইতে কোন ব্যাপারে তিনি প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন না। তবে কোম্পানী আইনে তাঁহাকে কতকগুলি কাজ করিবার দায়িত্ব ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এজন্য তাঁহাকে কোম্পানীর কর্মচারী এবং আইনেরও কর্মচারী আখ্যা দেওয়া হয় (He is not only the servant of the company but he is also the servant of law)। সুতরাং যৌথ কোম্পানীর কর্মসচিব কোম্পানীর কার্য-নির্বাহ ব্যাপারে উহার কর্ণধারদের আদেশ-নির্দেশ মত কাজ করিলেও এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। তাঁহার কাজের ব্যাপকতাও এজন্য সুদূরপ্রসারী। নিম্নে উহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল:

১। কোম্পানী গঠনের পূর্বে স্মারকলিপি, আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী, বিজ্ঞাপনী এবং অন্যান্য দলিলপত্র প্রস্তুত বা সংগ্রহ করার ভার কর্মসচিবের উপর থাকে। উদ্যোক্তাদের সভা আহ্বান তিনিই করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার কাজও তাঁহার উপরই থাকে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হইতেছে কিনা উহার প্রতিও দৃষ্টি কর্মসচিবের রাখিতে হয়। কারণ উদ্যোক্তাগণ কিংবা পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানী-সংক্রান্ত যে সকল নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন উহার যথাযথ প্রয়োগ করা কর্মসচিবের অন্যতম দায়িত্ব।

২। কোম্পানী গঠনের জন্য উপরি-উক্ত দলিলাদি ফি সহ জমা দিয়া যাহাতে কোম্পানী গঠনের অভিজ্ঞানপত্র (Certificate of Incorporation) পাওয়া যায়

তাহার ব্যবস্থাও ইঁহাকে করিতে হয়। সুতরাং কোম্পানী গঠনের অনেক কিছু দায়িত্ব কর্মসচিবকে বহন করিতে হয়।

৩। কোম্পানী গঠিত হইলে উহার বিজ্ঞাপনী প্রচার, শেয়ারের আবেদনপত্র (Application) গ্রহণ, উহা বিলি করার জন্য পরিচালকমণ্ডলীর (Board of Directors) সভা আহ্বান, রেজিষ্ট্রারের নিকট আইনগত দলিলাদি জমা দেওয়ার কাজ ইঁহাকে করিতে হয়।

৪। পরিচালকদের (Directors) শেয়ার বিলি করা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, শেয়ার আবেদনকারীদিগকে ঠিকমত সময়ে জানান, শেয়ারের টাকা ঠিকমত সময়ে আদায় এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব কর্মসচিবের উপর ন্যস্ত থাকে।

৫। কোম্পানীর বিভিন্ন সভার কার্য সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করার জন্য চেয়ারম্যানকে ইঁহার সাহায্য করিতে হয় এবং ইঁহাকে সভার কার্যবিবরণী ঠিকমত লিখিয়া রাখিতে হয়।

৬। কোম্পানীর অফিসের নানাবিধ কাজও কর্মসচিবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এজন্য যে চিঠি-পত্রাদি আদান-প্রদান হইয়া থাকে তাহা কর্মসচিবের স্বাক্ষরে প্রেরিত হইয়া থাকে। এই সকল চিঠিপত্র সাধারণত উত্তমর্ণ, অধমর্ণ, অংশীদার, ঋণপত্রধারক, পৃষ্ঠপোষক ও জনসাধারণের মধ্যে বিনিময় হইয়া থাকে। উহাদের অভাব-অভিযোগের সুষ্ঠু মীমাংসা কর্মসচিবই করিয়া থাকেন।

৭। ইনি পরিচালকমণ্ডলীর এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মুখপাত্র। তজ্জন্য অধস্তন কর্মচারীদের সহিত উর্ধ্বতন কর্মচারীদের এবং কোম্পানীর কর্ণধারদের সহিত যোগাযোগ ইঁহার মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৮। কোম্পানীর নানাবিধ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে কোম্পানী আইন, আয়কর আইন, শ্রমিক-সংক্রান্ত আইন, হিসাব-সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি তাঁহাকে জানিতে হয়। কারণ এ সমস্ত ব্যাপারে তিনিই কোম্পানীর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। সকলেই এ সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধীয় আইন-কানুন প্রয়োজনবোধে তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিবেন বলিয়া আশা রাখেন। সুতরাং কোম্পানী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন-সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করার দায়িত্বও তাঁহার উপর।

৯। সমস্ত কাজ যথাযথভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে কর্মসচিবের উচ্চমানের সাধারণ শিক্ষা থাকা আবশ্যক। এজন্য তাঁহার অন্ততঃ স্নাতকোত্তর উপাধিতে ভূষিত থাকা উচিত। ইহা ছাড়া সরল ও অমায়িক হওয়া এবং ভালমন্দ বিচার করিয়া সঠিক ও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যোগ্যতাও থাকা অবশ্য প্রয়োজন।

১০। কর্মসচিবের একার পক্ষে দুরূহ এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নহে। এজন্য তাঁহাকে অনেক কর্মচারীর সাহায্য লইতে হইবে এবং তাঁহাদের কাজের উপর নির্ভর করিতে হইবে। যাঁহাদের উপর তিনি নির্ভর করিবেন তাঁহাদের আস্থাভাজন হওয়াও তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন। এরূপ আস্থাভাজন হইলে তাঁহাদের সহযোগিতালাভ

সহজসাধ্য হইবে এবং কোম্পানীর কাজ সুষ্ঠুভাবে ও তৎপরতার সহিত সম্পন্ন হওয়ার কোন বাধা থাকিবে না।

যৌথ কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার সভা (Different kinds of meeting of a Joint Stock Company)

যৌথ কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার সভার বিবরণ নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। **বাধ্যতামূলক বা বিধিবদ্ধ সভা (Statutory Meeting):** প্রত্যেক সীমিত দায়যুক্ত সার্বজনিক কোম্পানীকে (Public Limited Company) উহার কারবার আরম্ভ করার অন্ততঃ একমাস পরে এবং ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কোম্পানীর শেয়ার-গ্রহীতাগণের (Shareholders) একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিতে হয়। এই প্রথম সাধারণ সভাকে 'বিধিবদ্ধ সভা' (Statutory Meeting) বলে। এই সভায় কোম্পানীর প্রারম্ভিক কার্যকলাপ আলোচিত হয়। তজ্জন্য পরিচালকবর্গকে একটি 'বিধিবদ্ধ বিবরণী' (Statutory Report) উক্ত সভায় দাখিল করিতে হয়। এই বিধিবদ্ধ বিবরণীতে বিলিকৃত অংশের বিবরণ, টাকা প্রাপ্তি, কোনও প্রকার সম্পাদিত চুক্তি, পরিচালকবর্গ, হিসাব পরীক্ষক প্রভৃতির নাম, ঠিকানা ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে এবং উক্ত বিবরণ হিসাব পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করাইয়াও লইতে হয়। এই বিধিবদ্ধ বিবরণী অন্ততঃপক্ষে সভা হইবার ২১ দিন পূর্বে প্রত্যেক শেয়ার-গ্রহীতার নিকট পাঠাইতে হয়। যদি উক্ত সভা আহ্বানে ও বিবরণী দাখিল করিতে পরিচালকবর্গ অসমর্থ হন তবে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ১৪ দিন পর শেয়ার-গ্রহীতাগণ ইচ্ছা করিলে বাধ্যতামূলকভাবে কারবার গুটাইবার জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারেন।

২। **বার্ষিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting):** প্রত্যেক কোম্পানীতে আইন অনুসারে বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া উহার শেয়ার-গ্রহীতা-গণের সাধারণ সভা আহ্বান করিতে হয়। এই সভাকে 'বার্ষিক সাধারণ সভা' (Annual General Meeting) বলে। এই সভা আহ্বান ব্যাপারে নিম্নলিখিত আইন প্রযোজ্য :

(১) প্রত্যেক নূতন কোম্পানীকে কারবার আরম্ভ করার তারিখ হইতে ১৮ মাসের মধ্যে এরূপ সভা আহ্বান করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক পুরাতন কোম্পানীকে বৎসরের একটি সভা হইয়া যাইবার অন্ততঃ ১৫ মাসের মধ্যে পরবর্তী বৎসরে সভাটি আহ্বান করিতে হইবে। তবে সভাটি কোম্পানীর আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার ৯ মাসের মধ্যে হওয়া চাই।

(৩) এই সভায় ডিরেক্টর নির্বাচন, হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ, লভ্যাংশ ঘোষণা, হিসাব পরীক্ষকের বিবরণী আলোচনা, ডিরেক্টরদের বার্ষিক বিবরণী আলোচনা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

(৪) শেয়ার-গ্রহীতাগণকে উপরি-উক্ত বিবরণীগুলির কপি (Copy) সভার নির্দিষ্ট তারিখের ২১ দিন পূর্বে পাঠাইতে হইবে।

৩। **বিশেষ সাধারণ সভা (Extraordinary General Meeting) :** কোম্পানী-সংক্রান্ত কোনও জরুরী বিষয়ের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হইলে এবং উক্ত বিষয়ের আলোচনা 'বার্ষিক সাধারণ সভা'র তারিখ পর্যন্ত স্থগিত রাখা সম্ভব না হইলে ডিরেক্টরগণ নিজে কিংবা এক-দশমাংশ মূলধন প্রদানকারী শেয়ার গ্রহীতাগণের নির্দেশক্রমে সভা আহ্বান করিতে পারেন। এরূপ সভাকে 'বিশেষ সাধারণ সভা' আখ্যা দেওয়া হয়। উক্ত শেয়ার-গ্রহীতাদের নির্দেশক্রমে যদি ডিরেক্টরগণ ২১ দিনের মধ্যে সভা আহ্বান না করেন তবে উক্ত শেয়ার-গ্রহীতাগণই এরূপ সভা আহ্বান করিতে পারেন।

বিভিন্ন প্রকার সংকল্প (Different kinds of Resolution)

কোম্পানী-সংক্রান্ত কোনও বিষয় সভায় আলোচনার জন্য এবং সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য উপস্থাপিত প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহাকে 'সংকল্প' (Resolution) বলে। এই 'সংকল্প' গৃহীত হওয়ার নিম্নলিখিত রীতিগুলি উল্লেখযোগ্য :

১। **সাধারণ ভোটাধিক্যে গৃহীত সংকল্প (Resolution passed by a simple majority) :** কোম্পানীর সাধারণ কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রস্তাব এইভাবে গৃহীত হইয়া থাকে।

২। **বিশেষ বিজ্ঞপ্তির দ্বারা গৃহীত সংকল্প (Resolution requiring special notice) :** যিনি এরূপ কোন সংকল্প গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকে কোম্পানীর সভা আহ্বানের জন্য কোম্পানীকে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হইবে। কোম্পানী আবার উহার সভ্যদিগকে সভার ৭ দিন পূর্বে নোটিশ দিবে। নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে 'সংকল্প' গ্রহণ করার জন্য এরূপ সভা প্রয়োজন :

(১) অবসর গ্রহণে ইচ্ছুক হিসাব পরীক্ষক ভিন্ন অন্য হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করিতে হইলে,

(২) কোনও বিশেষ শ্রেণীর ডিরেক্টর নিয়োগ না করার জন্য,

(৩) কোনও ডিরেক্টরকে তাঁহার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে পদচ্যুত করার জন্য,

(৪) নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে পদচ্যুত ডিরেক্টরের স্থলে অন্য ডিরেক্টর নিয়োগের জন্য।

৩। **বিশেষ সংকল্প (Special Resolution) :** এরূপ 'সংকল্প' গ্রহণের জন্য কমপক্ষে তিন-চতুর্থাংশ সভ্যের ভোটাধিক্য প্রয়োজন। এরূপ সংকল্প গ্রহণের সভাও অন্ততঃ ২১ দিনের নোটিশ দিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। তবে শতকরা ৯৫ হইতে ১০০ জন সভ্য যদি কম সময়ের নোটিশে স্বীকৃত হয় তাহা হইলেও চলিবে।

এরূপ 'সংকল্প' গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে উহার একটি প্রতিলিপি রেজিস্ট্রার মহোদয়ের নিকট দাখিল করিতে হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য 'বিশেষ সংকল্প' প্রয়োজন :

(১) কোম্পানীর নাম, রেজিস্ট্রী অফিস এবং উদ্দেশ্য পরিবর্তনের জন্য,

(২) 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী' পরিবর্তনের জন্য,

(৩) মূলধন হ্রাস করার জন্য,

(৪) 'সংরক্ষিত মূলধন' রাখার জন্য,

(৫) কোনও ডিরেক্টরের দায়িত্ব অসীমিত করার জন্য,

(৬) আদালত কর্তৃক কোম্পানী গুটাইবার নির্দেশের জন্য.

(৭) কোম্পানীর বাড়ীঘর ইত্যাদি নির্মাণকালে আদায়ীকৃত মূলধনের উপর সুদ দিতে হইলে,

(৮) ইনস্পেক্টরের দ্বারা কোম্পানীর কার্য পরিচালনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন হইলে।

ভোটদান প্রতিনিধি (Proxy)

কোম্পানীর কোন সভ্য নিজে উপস্থিত না হইয়াও ভোট দিতে পারেন। এজন্য তিনি লিখিতভাবে অপর কোনও ব্যক্তিকে তাঁহার পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করিতে পারেন। যে সভ্যকে এরূপ ভোট দেওয়ার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয় তাঁহাকে 'ভোটদান প্রতিনিধি' বলে। অবশ্য কোম্পানীর 'আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী'তে এরূপ ব্যবস্থার অনুমোদন থাকা চাই। এরূপ ভোটদানের ক্ষমতাপত্র সভার তারিখের অন্ততঃ তিনদিন পূর্বে কোম্পানীর রেজিস্ট্রীকৃত অফিসে দাখিল করিতে হয়।

স্মারকলিপি ও আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী পরিবর্তনের পদ্ধতি (Procedure for alteration of Memorandum and Articles of Associations)

স্মারকলিপি পরিবর্তন : এই পরিবর্তন কোম্পানী আইনের ১৬ ধারামতে করার নিয়ম। উক্ত নিয়ম অনুযায়ী উহার বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তন নিম্নলিখিত উপায়ে করিতে হয় :

১। **নাম (Name):** নাম পরিবর্তন করিতে হইলে তজ্জন্য শেয়ার-গ্রহীতাদেরও একটি বিশেষ প্রস্তাব (Special Resolution) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি প্রয়োজন। নূতন নাম কার্যকরী করার জন্য নিবন্ধকের (Registrar) নিকট হইতে নূতন নিবন্ধন পত্র (Certificate of Incorporation) গ্রহণ করিতে হয়। এরূপ নাম পরিবর্তনের ফলে কোম্পানীর ক্ষমতা বা দায়ের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

২। **নিবন্ধিত কার্যালয় (Registered Office):** এক রাজ্য হইতে অন্য

রাজ্যে ইহা স্থানান্তর প্রয়োজন হইলে শেয়ার-গ্রহীতাদের 'বিশেষ প্রস্তাব' এবং আদালতে আবেদন প্রয়োজন। আবেদন মঞ্জুর হইলে দুই রাজ্যের নিবন্ধকের নিকট হইতে পরিবর্তিত 'নিবন্ধন পত্র' গ্রহণ করিতে হয়।

নিবন্ধিত কার্যালয় একই রাজ্যে অন্য শহরে স্থানান্তর প্রয়োজন হইলে কেবল শেয়ার-গ্রহীতাদের 'বিশেষ প্রস্তাব' হইলেই চলে। তবে এই মর্মে নিবন্ধকের নিকট ২৮ দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হয়।

৩। উদ্দেশ্য (Object): উদ্দেশ্যের পরিবর্তন নিম্নলিখিত নানাকারণে প্রয়োজন হইতে পারে:

(ক) অধিকতর দক্ষতার সহিত কারবার পরিচালনার জন্য।

(খ) কারবারে কোন নূতন বা উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য।

(গ) কারবারের কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য।

(ঘ) বর্তমান কারবারের সহিত অন্য কোন নূতন বা লাভজনক কারবারের বা ব্যক্তি সংঘের সহিত সংযুক্তির জন্য।

(ঙ) স্মারকলিপির কোন উদ্দেশ্যের সংকোচন, প্রসারণ বা বর্জনের জন্য।

(চ) কারবারের বা উহার কোন অংশ বিক্রয়ের জন্য।

(ছ) অন্য কোন নূতন কারবার আরম্ভের জন্য।

যে কারণেই হউক না কেন, উদ্দেশ্য পরিবর্তনের জন্য প্রথমত প্রয়োজন শেয়ার-গ্রহীতাদের বিশেষ প্রস্তাব। উহার পর পাওনাদারদের দায়ের নিরাপত্তা বিধান করিয়া আদালতে আবেদন করিতে হয়। আদালতে অনুমতি পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে সংশোধিত স্মারকলিপির মুদ্রিত প্রতিলিপি এবং আদালত হইতে প্রাপ্ত অনুমতিপত্রের নকল নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হয়। নিবন্ধক এই নূতন স্মারকলিপি নিবন্ধিত করিয়া নূতন নিবন্ধন পত্র প্রদান করিবেন। তখন হইতে এই সংশোধিত স্মারকলিপিই কোম্পানীর নূতন স্মারকলিপি বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। মূলধন (Capital): কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীতে বিধান থাকিলে কোম্পানীর শেয়ার-গ্রহীতাদের সাধারণ সভায় একটি সাধারণ প্রস্তাব এবং উহাতে বিধান না থাকিলে বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মূলধন সম্পর্কে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সাধন করা চলে:

(ক) নূতন শেয়ার বিলি দ্বারা মূলধন বৃদ্ধি।

(খ) মূলধন পুনর্বিন্যাস দ্বারা স্বল্পমূল্যের শেয়ার অধিক মূল্যে বা অধিক মূল্যের শেয়ার স্বল্পমূল্যে বিভক্ত করা।

(গ) শেয়ারকে স্টকে এবং স্টককে শেয়ারে পরিবর্তন করা।

(ঘ) অবিক্রীত শেয়ার বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় শেয়ার বাতিল করা।

এই পরিবর্তন এক মাসের মধ্যে নিবন্ধককে জানাইতে হয় এবং সংশোধিত মূলধনের বিবরণ প্রত্যেক স্মারকলিপিতে উল্লেখ করিতে হয়।

আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী পরিবর্তন: স্মারকলিপির ক্ষমতার বহির্ভূত না হইলে আদালতের অনুমতি ছাড়া শেয়ার-গ্রহীতাদের বিশেষ সংকল্প দ্বারা আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী পরিবর্তন করা চলে। তবে উক্ত পরিবর্তন আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীর সকল প্রতিলিপিতেই উল্লেখ করিতে হইবে।

যৌথ কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার বহি (Different kinds of books maintained by a Joint Stock Company)

যৌথ কোম্পানী যে সকল বহি বা খাতাপত্র রাখিয়া থাকে তাহা দুই শ্রেণীর—(১) বিধিবদ্ধ বহি (Statutory Books) এবং (২) পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত বহি (Statistical Books)। কোম্পানী আইন অনুসারে এই সকল বহি বা খাতাপত্র প্রত্যেক কোম্পানীকেই রাখিতে হয়। যে সকল বিধিবদ্ধ বহি প্রত্যেক কোম্পানী রাখিতে বাধ্য উহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল:

(১) সূচীপত্রসহ সদস্যতালিকার বহি (Register of Members with Index); (২) সূচীপত্রসহ ঋণপত্রধারকদের তালিকা বহি (Register of Debenture-holders with Index); (৩) বন্ধক ও জামানতের বহি (Register of Mortgages and Charges); (৪) পরিচালক ও মুখ্য কার্যনির্বাহকদের তালিকা বহি (Register of Directors and Chief Executives); (৫) চুক্তিসমূহের বহি (Register of Contracts); (৬) বিনিয়োগ বহি (Register of Investments); (৭) পরিচালকদের শেয়ারতালিকা বহি (Register of Directors' Share-holding); (৮) সভার কার্যবিবরণী বহি (Minute Book); (৯) শেয়ার-গ্রহীতাদের বার্ষিক তালিকা এবং সংক্ষিপ্ত মূলধনের বিবরণী বহি (Annual List and Summary Book); (১০) হিসাব বহি (Account Books)।

পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত বহির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য:

(১) শেয়ার আবেদন, আবণ্টন ও তলব বহি (Share Application. Allotment and Call Book); (২) শেয়ার হস্তান্তর বহি (Share Transfer Book); (৩) শেয়ার সার্টিফিকেট বহি (Share Certificate Book); (৪) শেয়ার ওয়ারেন্ট বহি (Share Warrant Book), (৫) লভ্যাংশ ও ঋণপত্রের সুদ বহি (Dividend and Debenture Interest Book); (৬) কোম্পানীর সিলমোহর বহি (Company's Common Seal Book); (৭) সভার বিষয়সূচী বহি

(Agenda Book) ; (৮) পরিচালকদের উপস্থিতি বহি (Directors' Attendance Book)।

যৌথ কোম্পানীর শেয়ার-বিক্রয় পদ্ধতি (Share-selling procedure of Joint Stock Company)

কোন কোম্পানীর শেয়ার-বিক্রয় পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। শেয়ারের সমগ্র মূল্য এক সঙ্গে গৃহীত হইতে পারে কিংবা কিস্তিতে গৃহীত হইতে পারে। এই কিস্তিগুলি আবেদন (Application), আবণ্টন (Allotment) এবং তলব (Call) নামে অভিহিত।

২। শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কোম্পানী প্রথমত বিজ্ঞাপনী (Prospectus) প্রচার করিয়া থাকে। বিজ্ঞাপনী দেখিয়া কেহ শেয়ার ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলে কোম্পানীতে উহার জন্য আবেদনপত্র পাঠাইতে হয়। শেয়ারের মূল্য একসঙ্গে প্রদেয় হইলে আবেদনপত্রের সহিত সমগ্র টাকা পাঠাইতে হয়। নতুবা বিজ্ঞাপনীতে উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী আবেদনপত্রের সহিত কিছু টাকা পাঠাইতে হয়।

৩। কোম্পানীর বিজ্ঞাপনীতে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য উল্লেখ থাকে। উহাকে শেয়ারের 'অভিহিত মূল্য' (Face Value) বলে। বাজারে অবশ্য শেয়ার অভিহিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কিংবা কম মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। অধিক মূল্যে বিক্রয়কে অধিহার (At a Premium) এবং কম মূল্যে বিক্রয়কে অবহার (At a Discount) বিক্রয় বলে। অভিহিত মূল্যে বিক্রয়কে বলা হয় সমমূল্যে (At Par) বিক্রয়। শেয়ার অধিহারে বিক্রয়ের জন্য যে অধিমূল্য পাওয়া যায় উহার হিসাব পৃথক রাখিতে হয় এবং বিশেষ উদ্দেশ্য ভিন্ন উহা ব্যয় করা যায় না। কিন্তু শেয়ার অবহারে বিক্রয় কোম্পানীর কার্যারম্ভের এক বৎসর পূর্বে করা যায় না এবং তজ্জন্য কোম্পানীর সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত এবং আদালতের অনুমতি প্রয়োজন। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ভিন্ন দশ শতাংশের অধিক অবহারে শেয়ার বিক্রয় করা চলে না।

৪। বিভিন্ন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে শেয়ার ক্রয়ের আবেদনপত্র আসিলে কোম্পানীর পরিচালকদের কাজ উহা যথাযথভাবে আবণ্টন (Allotment) করা। কোম্পানী আইনে অবশ্য শেয়ার আবণ্টনের একটি নিম্নতম সময় স্থির করা আছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত শেয়ার ক্রয়ের আবেদন আসিলেও বিজ্ঞাপনী (Prospectus) প্রচারের পঞ্চম দিবসের পূর্বে কোন শেয়ার আবণ্টন করার নিয়ম নাই। এই সময়কে 'শেয়ার আবেদনের উন্মুক্ত সময়' (Time of opening of the subscription list) বলা হয়। এই সময়ের পূর্বে শেয়ার আবণ্টন হইলে অবশ্য উহা অগ্রাহ্য হয় না তবে এজন্য কোম্পানী এবং উহার মুখ্য কার্যনির্বাহকগণ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন।

৫। ন্যূনতম চাঁদা বা মূলধন (Minimum Subscription) সংগৃহীত না হইলে সার্বজনিক কোম্পানী শেয়ার আবণ্টন করিতে পারে না। বিজ্ঞাপনী প্রচারের ১২০ দিনের মধ্যে 'ন্যূনতম মূলধন' সংগৃহীত না হইলে পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে আবেদনকারীদের সমস্ত টাকা বিনা সুদে ফেরত দেওয়ার নিয়ম। ইহার অধিক বিলম্ব হইলে পরিচালকগণ একক ও যৌথভাবে বার্ষিক শতকরা ছয় টাকা সুদ সহ উক্ত অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য দায়ী থাকেন।

৬। বিজ্ঞাপনীতে যে ন্যূনতম মূলধনের উল্লেখ থাকে উহা শেয়ার আবেদন-কালীন দেয় অর্থ হইতে সংগ্রহ করিতে হয় এবং আবেদনকালীন দেয় অর্থ শেয়ারের অভিহিত মূল্যের (Face Value) অন্তত ৫ শতাংশ হওয়া চাই।

৭। কারবার আরম্ভের অনুমতিপত্র (Certificate of Commencement) না পাওয়া পর্যন্ত আবেদনকারীদের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ কোন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়।

৮। কোন কোম্পানীর শেয়ার বা ঋণপত্র কোন শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার উল্লেখ থাকিলে বিজ্ঞাপনী প্রচারের দশম দিনের পূর্বে তজ্জন্য আবেদন করিতে হয়। এরূপ আবেদনের শেষ তারিখ হইতে ৪ সপ্তাহের মধ্যে কিংবা বর্ধিত সময় হিসাবে ৭ সপ্তাহের মধ্যে শেয়ার তালিকাভুক্তির অনুমতি না পাইলে বিজ্ঞাপনী অনুযায়ী শেয়ার আবণ্টন বাতিল করিতে হয়। বিজ্ঞাপনীতে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কোম্পানী যদি শেয়ার তালিকাভুক্তির আবেদন না করে বা উহার আবেদন অগ্রাহ্য হয়, তবে নির্দিষ্ট সময়ের পরবর্তী ৮ দিনের মধ্যে আবেদনকারীদিগকে উহাদের সমস্ত টাকা ফেরত দিতে হয়।

৯। মিথ্যা নামে শেয়ার আবেদন করা বা শেয়ার আবেদন প্ররোচিত করার জন্য দায়ী ব্যক্তিগণ ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন। ১৯৬৫ সালের সংশোধনী আইনে এরূপ দণ্ড বিধানের উল্লেখ আছে এবং বিজ্ঞাপনীতে এই দণ্ডনীয় অপরাধের বিষয় উল্লেখও করিতে হয়।

১০। বিজ্ঞাপনী প্রচারের পঞ্চম দিবস হইতে চার মাসের মধ্যে শেয়ার আবেদনের যে-কোন নির্দিষ্ট সময়ের পর শেয়ার আবণ্টন করিতে হয়। শেয়ার আবণ্টনের তিন মাসের মধ্যে বা শেয়ার হস্তান্তরের পর নূতন শেয়ার-গ্রহীতাদের নাম নথিভুক্ত করার আবেদনের দুই মাসের মধ্যে 'শেয়ার সার্টিফিকেট' (Share Certificate) বিলি করার নিয়ম। ইহাতে শেয়ার-গ্রহীতার নাম, ঠিকানা, পরিচয়, শেয়ারের ক্রমিক সংখ্যা ও শ্রেণী, উহার অভিহিত মূল্য, প্রদত্ত অর্থ প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং কোম্পানীর নামাঙ্কিত সিলমোহর-যুক্ত ইহাই শেয়ার মালিকানার মুখ্য প্রমাণপত্র। শেয়ার সার্টিফিকেট সম্প্রদেয় দলিল (Negotiable Instrument) নহে। কিন্তু ইহা স্বাক্ষর ও অর্পণ (Endorsement and Delivery) দ্বারা সহজেই হস্তান্তর করা যায়।

১১। শেয়ারের সম্পূর্ণ টাকা আদায় হইলে এবং আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী

(Articles of Association)-তে উল্লেখ থাকিলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া 'শেয়ার সার্টিফিকেটে'র পরিবর্তে 'শেয়ার ওয়ারেণ্ট' (Share Warrant) বিলি করা চলে। শেয়ার ওয়ারেণ্টে শেয়ার-গ্রহীতার কোন নাম-ঠিকানার উল্লেখ থাকে না। ইহাতে কোম্পানীর সিলমোহর ও শেয়ারের বিবরণ থাকে। ইহা 'সম্প্রদেয় দলিল' বলিয়া গ্রাহ্য হয় এবং বাহক মাত্রই ইহার মালিক বলিয়া গণ্য হন। বাহকের পক্ষে লভ্যাংশ পাওয়ার সুবিধার জন্য ইহাতে কিছু কুপন (Coupon) যুক্ত থাকে। ইহার বাহকগণ অবশ্য কোম্পানীর সদস্য নন। উহাদের নাম কোম্পানীর সদস্যতালিকাভুক্ত থাকে না। সদস্যতালিকার বহিতে শুধু শেয়ারের বিবরণ ও উহা বিলি করার তারিখ লিখিত থাকে। আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকিলে উহার বাহক উক্ত ওয়ারেণ্ট কোম্পানীতে জমা দিয়া তাঁহার নাম সদস্যতালিকাভুক্ত করিয়া লইতে পারেন।

শেয়ার ওয়ারেণ্ট এবং শেয়ার সার্টিফিকেটের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Share Warrant and Share Certificate)

শেয়ার সার্টিফিকেট এবং শেয়ার ওয়ারেণ্টের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

শেয়ার ওয়ারেণ্ট	শেয়ার সার্টিফিকেট
১। শেয়ারের সম্পূর্ণ মূল্য আদায় না হইলে ইহা বিলি করা চলে না।	১। শেয়ারের আংশিক মূল্য আদায় হইলেও ইহা বিলি করা চলে।
২। ইহার মালিকের নাম কোম্পানীর সদস্য তালিকাভুক্ত থাকে না।	২। ইহার মালিকের নাম কোম্পানীর সদস্যতালিকাভুক্ত থাকে।
৩। ইহার মালিকের কোন ভোটাধিকার থাকে না।	৩। ইহার মালিকের ভোটাধিকার থাকে।
৪। ইহা শুধু অর্পণ (delivery) দ্বারা হস্তান্তর করা যায়।	৪। ইহা বিক্রয়নামা (Sale deed) বা হস্তান্তরনামা (Transfer deed) ছাড়া হস্তান্তর হয় না।
৫। পরিচালকদের যোগ্যতা-সূচক শেয়ার হিসাবে ইহা ধরা হয় না।	৫। পরিচালকদের যোগ্যতা-সূচক শেয়ারের মধ্যে ইহা অবশ্যই ধরা হয়।
৬। কোম্পানীভঙ্গের আবেদনে ইহাদের মালিকের কোন স্থান নাই।	৬। কোম্পানীভঙ্গের আবেদনে ইহাদের মালিকের স্থান অবশ্যই আছে।
৭। আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীতে উল্লেখ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ভিন্ন ইহা বিলি করা যায় না।	৭। ইহাতে এরূপ কোন নিয়ম নাই। কারণ প্রত্যেক শেয়ার-গ্রহীতাকে শেয়ার ওয়ারেণ্ট না দিলে চলে কিন্তু শেয়ার সার্টিফিকেট না দিলে চলে না।

শেয়ার হস্তান্তর ও মালিকানান্তর (Transfer and Transmission of Shares)

এক হাত হইতে অন্য হাতে শেয়ারের মালিকানা বদল হইতে পারে। বিক্রয় দ্বারা শেয়ারের মালিকানা বদল হইলে উহাকে বলা হয় 'শেয়ার হস্তান্তর' (Transfer of Shares)। আর উত্তরাধিকারসূত্রে বা দেউলিয়া হওয়ার ফলে শেয়ারের মালিকানা বদল হইলে উহাকে বলা হয় মালিকানান্তর (Transmission of Shares)।

বিক্রয়ের দ্বারা শেয়ার হস্তান্তর দুইভাবে হইতে পারে। একটি হইতেছে নথিবদ্ধ হস্তান্তর (Registered Transfer) এবং অপরটি হইতেছে ফাঁকা হস্তান্তর (Blank Transfer)। নথিবদ্ধ হস্তান্তরের জন্য উপযুক্ত স্ট্যাম্পসহ স্বাক্ষরিত হস্তান্তরনামা, শেয়ার সার্টিফিকেট বা শেয়ারের আবেদনপত্র কোম্পানীতে জমা দিতে হয়। উক্ত হস্তান্তরনামায় ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম, ঠিকানা, বিক্রয়ের তারিখ প্রভৃতি লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু ফাঁকা হস্তান্তরে ক্রেতার নাম, ঠিকানা, বিক্রয়ের তারিখ প্রভৃতি কিছুই লিখিতে হয় না। হস্তান্তরনামার ঐসব ঘর ফাঁকা থাকে। শুধু বিক্রেতার স্বাক্ষর প্রয়োজন। এরূপ ফাঁকা হস্তান্তরে ক্রেতার নাম লিখিত থাকে না বলিয়া কোম্পানীর সদস্যতালিকায় ক্রেতার নাম লেখা পড়ে না। ফলে এই ফাঁকা হস্তান্তরের ফলে একই দলিলের ভিত্তিতে উক্ত শেয়ার বারংবার হস্তান্তর হইতে পারে এবং যে-কোন ব্যক্তি উহাতে নাম-ঠিকানা লিখিয়া কোম্পানীর সদস্যতালিকাভুক্ত হইতে পারেন। সুতরাং এরূপ 'ফাঁকা হস্তান্তরে' ঝুঁকি বেশী। কারণ এরূপ দলিল হারাইয়া গেলে উহার প্রকৃত মালিক স্থির করা কঠিন হইয়া পড়ে যদিও হস্তান্তরের জন্য বারংবার স্ট্যাম্প না দেওয়ার ইচ্ছা লইয়াই এরূপ হস্তান্তর দলিল প্রস্তুত করা হয়। ১৯৬৫ সালের সংশোধনী আইনে এই ফাঁকা হস্তান্তরের উপর কিছুটা বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। ইহার ফলে শেয়ার বাজার বা কোম্পানী নিবন্ধকের প্রদত্ত তারিখ ছাড়া শেয়ার হস্তান্তর গ্রাহ্য হয় না এবং শেয়ার হস্তান্তরের ছয় মাসের মধ্যে কোম্পানীতে হস্তান্তরনামা জমা দিয়া ক্রেতার নাম নথিভুক্ত করার নিয়ম হইয়াছে।

শেয়ার বাজেয়াপ্ত (Forfeiture of Shares)

কোম্পানীর কোন শেয়ার-গ্রহীতার নিকট হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেয়ার আবণ্টন (Allotment) কিংবা তলব (Call) মূল্য না পাইলে উক্ত শেয়ার বাজেয়াপ্ত করার অধিকার রাখে। ১৪ দিনের নোটিশ দিয়া এবং পরিচালকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত দ্বারা শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা চলে। এইভাবে শেয়ার বাজেয়াপ্ত হইলে উক্ত শেয়ারের গ্রহীতাগণ শেয়ারের মূল্য বাবদ যে টাকা প্রদান করিয়াছেন উহা বাজেয়াপ্ত হইয়া যায় এবং তিনি আর কোম্পানীর শেয়ার-গ্রহীতা হিসাবে গণ্য হন না। কোম্পানীর ইচ্ছা অনুযায়ী উক্ত শেয়ার অন্য কাহাকেও বিলি করা চলে।

গণপূর্তি বা সর্বনিম্ন সদস্য (Quorum)

কোন সভার কার্য আইনসম্মতভাবে পরিচালনা করিতে হইলে উহাতে ন্যূনতম সদস্য সংখ্যার উপস্থিতি প্রয়োজন। এই ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন সদস্য বা গণপূর্তি (Quorum) নামে অভিহিত। আভ্যন্তীরণ নিয়মাবলীতে অন্য বিধান না থাকিলে সার্বজনিক কোম্পানীর সভার জন্য অন্ততঃ পাঁচজন এবং ঘরোয়া কোম্পানীর সভার জন্য অন্ততঃ দুইজন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন।

বার্ষিক বিবরণী (Annual Return)

বার্ষিক সাধারণ সভার ৬০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক কোম্পানীকে একটি বার্ষিক বিবরণী কোম্পানী নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হয়। উক্ত বিবরণীর নির্ভুলতা প্রমাণের জন্য উহাতে একজন পরিচালক এবং মুখ্য কার্যনির্বাহকের সহি দিতে হয়। ঘরোয়া কোম্পানী হইলে উহার পরিচালক হিসাবে যে তিনটি সর্ত মানিয়া চলা হইতেছে এবং কোম্পানী আইনের ৪৩এ ধারা অনুযায়ী যে উহা সার্বজনিক কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয় নাই এই মর্মে বিবৃতি দিতে হয়।

বার্ষিক বিবরণীতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পেশ করিতে হয়

১। কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয়ের (Registered Office) ঠিকানা।

২। ঠিকানাসহ শেয়ার-গ্রহীতাদের এবং ঋণপত্রধারকদের তালিকা বহির অবস্থান।

৩। শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়লব্ধ মূলধনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৪। বন্ধকী ও জামানতী ঋণের বিবরণ।

৫। প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যদের নাম-ঠিকানা, পরিচয় প্রভৃতির বিবরণ।

৬। পরিচালক ও মুখ্য কার্য নির্বাহকদের নাম, ঠিকানা, পরিচয় ও জন্মতারিখ সহ বিবরণ।

কোম্পানী সভার সভাপতির কার্য এবং সভা পরিচালনা পদ্ধতি (Functions of the Chairman of a company meeting and the procedure for such a meeting)

আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীতে সাধারণত স্থায়ী সভাপতির বিধান থাকে। তিনি সভায় উপস্থিত না থাকিলে বা এরূপ কোন বিধান না থাকিলে সভায় উপস্থিত সভ্যগণের মধ্য হইতে সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সভার কার্য-পরিচালনায় এরূপ সভাপতি মুখ্য প্রাধিকারী (Chief Authority) বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকেন। সুতরাং সভাপতির কর্ম ও ক্ষমতা ব্যাপক। সংক্ষিপ্তাকারে উহা নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১। ইহার প্রথম কাজ শৃঙ্খলার সহিত কর্মসূচী (Agenda) অনুযায়ী সভার কার্য

পরিচালনা করা। প্রয়োজনবোধে তিনি কর্মসূচীর ক্রমিক আলোচনার রদ-বদল করিতে পারেন।

২। যে সকল প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত হইবে উহা যথাযথভাবে গৃহীত হইল কিনা এবং উহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ মিলিল কিনা তাহা নির্ধারণ করা ইঁহার প্রধান কাজ।

৩। আইনসম্মতভাবে উক্ত কার্যগুলি পরিচালনা করার পূর্বে সভার আইনসঙ্গতাও তাঁহাকে দেখিতে হইবে। এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তিসহ সভা আহ্বান এবং সভায় ন্যূনতম সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি।

৪। উপরি-উক্ত বিষয়গুলির সুষ্ঠু সমাধানের পর কোন প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে তিনি উহার ফলাফল ঘোষণা করিবেন, প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট হইলে তিনি 'নির্ণেয় ভোট' (Casting Vote) দিবেন, প্রয়োজন হইলে সভার কাজ মুলতুবী রাখিবেন, উচ্ছৃঙ্খল সদস্যকে সভাগৃহ ত্যাগের নির্দেশ দিবেন, বক্তা ও বক্তব্য বিষয়ের ক্রমপর্যায় স্থির করিবেন, প্রয়োজনবোধে অবাঞ্ছিত বিষয়বস্তুর আলোচনা নিষিদ্ধ করিবেন।

৫। প্রয়োজন মনে করিলে সভায় নিজস্ব ভাষণ দিতে পারিবেন।

সভাপতি যাহাতে সভার কার্য সুষ্ঠুভাবে ও আইনসম্মতভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহাকে সভা পরিচালনার কতকগুলি পদ্ধতি মানিয়া চলিতে হয়। সভার এই পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ :

১। উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তিসহ সভা আহ্বান।
২। ঠিক সময়ে সভা আরম্ভ।
৩। সভায় উপস্থিত সদস্যদের হাজিরা গ্রহণ।
৪। গণপূর্তি নির্ধারণ।
৫। ভোটদান প্রতিনিধি নির্ধারণ।
৬। ভোটদান পদ্ধতি স্থিরীকরণ।
৭। ভোট গণনাকারী (Teller) দ্বারা ভোটের ফলাফল নির্ধারণ।
৮। গৃহীত প্রস্তাব লিপিবদ্ধকরণ এবং উহাতে সভাপতির স্বাক্ষর প্রদান।
৯। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি জ্ঞাপন।

কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভার একটি বিজ্ঞপ্তি (Notice of the Annual General Meeting of a Company)

কোম্পানীর সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তির একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল :

ইণ্ডিয়ান ট্রেডার্স লিমিটেড
৫, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা।
(বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৯৭৩ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় উল্লিখিত কোম্পানীর উপরি-উক্ত ঠিকানায় কোম্পানীর শেয়ার-গ্রহীতাগণের বার্ষিক সাধারণ সভা হইবে। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে।

(১) ডিরেক্টরদের রিপোর্ট, লাভ-লোকসান হিসাব, উদ্বৃত্তপত্র এবং হিসাব-পরীক্ষকদের রিপোর্ট বিবেচনা ও গ্রহণ।

(২) ডিরেক্টরদের সুপারিশমত লভ্যাংশ বণ্টন।

(৩) ডিরেক্টর নির্বাচন।

(৪) হিসাব-পরীক্ষক নিয়োগ ও তাঁহাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

(৫) বিবিধ।

এতদ্দ্বারা আরও জানান যাইতেছে যে, ১০ই অক্টোবর হইতে ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত কোম্পানীর 'ট্রান্সফার বুক' বন্ধ থাকিবে।

কলিকাতা
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশক্রমে
ডি. বোস
সেক্রেটারী

কোম্পানীর কোনও সভায় ডিরেক্টরদিগকে আমন্ত্রণ জানাইয়া কর্মসূচীসহ সভার একখানি বিজ্ঞপ্তি (Notice with agenda inviting the Directors to a meeting of a company)

অল বেঙ্গল টি ট্রেডিং কোং লিঃ
১৬, মিশন রো, কলিকাতা-১
২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি
ডিরেক্টর মহোদয় সমীপেষু
সবিনয় নিবেদন,

আগামী ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৩ তারিখে কোম্পানীর অফিসে বেলা ৫ ঘটিকার সময় কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর একটি সভা হইবে। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচিত হইবে। আপনার উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ইতি—

নিবেদক
এস. সেন
সেক্রেটারী

কর্মসূচী (Agenda):

(১) গত অধিবেশনের কার্যবিবরণীর (Minutes) সমর্থন (Confirmation)।

(২) গতমাসে আবেদনকৃত শেয়ারের বিলিকরণ।
(৩) কারবার সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ বিবেচনা।
(৪) বিবিধ।
(৫) পরবর্তী সভার দিন স্থিরীকরণ।

কোম্পানীর ডিরেক্টরদের সভার একটি কার্যবিবরণী (Minutes of the meeting of the Board of Directors of a Company)

কোনও প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের কিংবা উহার পরিচালকমণ্ডলীর কোন সভা হইলে উক্ত সভায় যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় তাহাকে **সভার কার্যবিবরণী** (Minutes of a Meeting) বলে। সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার জন্য পৃথক পুস্তক থাকে। উক্ত পুস্তককে **সভার কার্যবিবরণী বহি** (Minute Book) বলে।

সভার কার্যবিবরণীর প্রয়োজনীয়তা অশেষ। কারণ সভায় যে যে বিষয় আলোচিত হইল এবং সে সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল উক্ত বিবরণী হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। ইহারই ভিত্তিতে কোম্পানীর কার্য পরিচালিত হয়। যে বহিতে ইহা লিপিবদ্ধ করা হয় তাহা কোম্পানীর স্থায়ী দলিলের কাজ করিয়া থাকে। কার্যবিবরণী না লিখিয়া রাখিলে সভার সিদ্ধান্ত জানার কোন উপায় থাকে না। নিম্নে সভার কার্যবিবরণীর একটি নমুনা দেওয়া হইল:

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, তারিখে মিডল্ ইস্ট সিপিং কোং লিঃ-এর অফিসে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠিত উক্ত কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর সভার কার্যবিবরণী:

১। উপস্থিত ডিরেক্টরগণ:
(ক) শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস, চেয়ারম্যান
(খ) শ্রীঅপরেশ লাহিড়ী
(গ) শ্রীকমলেশ রায়
(ঘ) শ্রীহৃষিকেশ রায়
(ঙ) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

২। গত ২০।৭।৭৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সমর্থিত।

৩। গত মাসে যে সমস্ত শেয়ারের আবেদনপত্র গৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে ১০ টাকা মূল্যের ১৫টি শেয়ার শ্রীফণীন্দ্র দেবকে এবং ২৫টি শেয়ার শ্রীহরিশ ঘোষকে বিলি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল এবং উক্ত বিলিকরণ সংবাদ দেওয়ার জন্য সেক্রেটারী মহোদয়কে অনুরোধ করা হইল।

৪। শ্রীউমেশ সেনকে কোম্পানীর ডিরেক্টর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

৫। কোম্পানীর কারখানা সংলগ্ন জমি ক্রয় করার বিষয় পরবর্তী সভায় স্থির হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

৬। পরিচালকমণ্ডলীর পরবর্তী সভা ২২।১২।৭৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল।

৭। সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক অন্তকার সভার কার্য শেষ হইল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস,
চেয়ারম্যান
২৯।৯।৭৩

কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী (Minutes of the Annual General Meeting of a Company)

নিম্নে কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর একটি নমুনা দেওয়া হইল :

১৯৭৩ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে ১৫, নেতাজী সুভাষ রোডস্থিত কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয়ে উমেশচন্দ্র উলেন মিলস লিমিটেডের শেয়ার-গ্রহীতাগণের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১। শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী—সভাপতি
২। শ্রীপ্রদ্যোতকুমার গোস্বামী—সহঃ সভাপতি
৩। শ্রীঅসিতকুমার গুহ—পরিচালক
৪। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভদ্র— „
৫। শ্রীঅমর সেনগুপ্ত— „
৬। শ্রীতপনকুমার চক্রবর্তী—„
৭। শ্রীবিমানকুমার জানা— „
৮। শ্রীদোস্ত মহম্মদ—নিরীক্ষক
৯। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল—সলিসিটর
১০। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় —কর্মসচিব
১১। শ্রীমন্মথকুমার মিত্র—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এবং আরও ১০০ জন শেয়ার-গ্রহীতা যাঁহাদের নাম এই বিবরণীর শেষের দিকে লিখিত হইয়াছে।

আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্ত :

১। অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কর্মসচিব কর্তৃক পঠিত হয়।

২। সভাপতির অনুরোধে পরিচালকগণ কর্তৃক উপস্থাপিত ১৯৭৩ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়ের কোম্পানীর কার্যাবলীর বিবরণ, উদ্বৃত্তপত্র,

লাভ-লোকসানের হিসাব যাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে তাহা সভায় পঠিত হইল বলিয়া গণ্য করা হয়।

৩। সভাপতির অনুরোধে ১৯৭৩ সালের ১৭ই আগস্ট তারিখযুক্ত কোম্পানীর নিরীক্ষকদের বিবরণ নিরীক্ষক কর্তৃক পঠিত হয়।

৪। সভাপতি কোম্পানীর বাৎসরিক অগ্রগতির একটি তথ্যবহুল সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করেন। উক্ত বিবরণীর মুদ্রিত প্রতিলিপি সভায় উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে বিতরিত হয়।

৫। সভাপতি নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি সভায় উপস্থাপিত করেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীতপনকুমার চক্রবর্তী। প্রস্তাব—"১৯৭৩ সালের ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে উক্ত সময়ের কার্যাবলী সম্পর্কে কোম্পানীর পরিচালকগণের বিবরণ, তৎসংক্রান্ত নিরীক্ষিত লাভ-লোকসান হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্র অনুমোদিত ও গৃহীত হইল।" সভাপতি এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা আহ্বান করেন। আলোচনা শেষে প্রস্তাবটির উপর ভোট গ্রহণ করা হয় এবং উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৬। লভ্যাংশ সম্পর্কে সভাপতি নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং শ্রীঅমর সেনগুপ্ত উহা সমর্থন করেন। প্রস্তাব—"এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল যে, সুবিধাভোগী শেয়ারের প্রতি ১০০ টাকা উপর ৬ টাকা হারে এবং ইকুইটি শেয়ারের উপর প্রতি ১০ টাকায় ১ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হউক। ১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসে শেয়ার-গ্রহীতাদের তালিকায় যাঁহাদের নাম ছিল তাঁহাদিগকেই শুধু এই লভ্যাংশ দেওয়া হউক। লভ্যাংশ ২রা জানুয়ারী (১৯৭৪) হইতে দেওয়া আরম্ভ হউক।" উক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৭। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল যে, পর্যায়ক্রমে অবসরগ্রহণকারী পরিচালক শ্রীতপনকুমার চক্রবর্তীর স্থলে শ্রীজিতেশ লাহিড়ী পরিচালক নিযুক্ত হইলেন এবং তিনি পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণ করিবেন। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন স্বয়ং সভাপতি এবং সমর্থন করেন শ্রীবিমানকুমার জানা। উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৮। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, কোম্পানীর বর্তমান নিরীক্ষক শ্রীদোস্ত মহম্মদ ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য পুনরায় নিরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে পারিশ্রমিক দেওয়া স্থির হইল ২,০০০ টাকা।

৯। অতঃপর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য শেষ হইল।

৩১।১০।৭৩ } শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি
সভাপতি

কোম্পানীর বিধিবদ্ধ সভার নোটিশ ও বিধিবদ্ধ বিবরণী (Notice and Statutory Report of the Statutory Meeting of a Company)

বিধিবদ্ধ সভার নোটিশ

ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ১৬৫ ধারা অনুযায়ী উপরি-উক্ত কোম্পানীর বিধিবদ্ধ সভা ১৯৭৩ সালের ২রা মে বেলা ৪ ঘটিকায় কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয়—২৩, নেতাজী রোড, কলিকাতাতে অনুষ্ঠিত হইবে।

কোম্পানী আইনের ১৬৫ ধারা অনুযায়ী যাহা পেশ করিতে হয় সেই বিধিবদ্ধ বিবরণীর একটি প্রতিলিপি এই নোটিশের সহিত পাঠান হইল।

২৩, নেতাজী রোড — পরিচালকবর্গের নির্দেশক্রমে
কলিকাতা — শ্রীহরিশ মুখার্জি
২রা এপ্রিল, ১৯৭৩ — সেক্রেটারী

বিধিবদ্ধ সভার বিবরণী

ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানীর নাম—ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড

যে কোম্পানীর বিধিবদ্ধ বিবরণী—ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড।

১৬৫ (৫) ধারা অনুযায়ী নথিভুক্ত।

দাখিলকারী—শ্রীঅনিমেষ চ্যাটার্জি।

বিধিবদ্ধ সভার তারিখ ও স্থান—২রা মে (১৯৭৩) এবং কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয়।

১৬৫ ধারা অনুযায়ী পরিচালকমণ্ডলী নিম্নলিখিত বিধিবদ্ধ বিবরণটি শেয়ার-গ্রহীতাগণের নিকট পেশ করিতেছেন :

১। আবণ্টিত শেয়ারের সংখ্যা—২২,৭৫০।

২। উক্ত আবণ্টিত শেয়ারের ২২,৭৫০ অভিহিত মূল্যে নগদ ক্রয়ের ভিত্তিতে আবণ্টিত। প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০ টাকা।

৩। কোন শেয়ার পূর্ণ আদায়ীকৃত মূল্যে বিলি হয় নাই।

৪। নগদ মূল্য ছাড়া কোন শেয়ার বিলি হয় নাই।

৫। যে সমস্ত শেয়ার বিলি করা হইয়াছে উহা হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ—২,১১,০০০ টাকা।

৬। কোম্পানীর আয় ও ব্যয়ের মূলধনী হিসাবের প্রতিলিপি ইহার সহিত যুক্ত হইল। উহাতে ২৫শে মার্চ (১৯৭৩) পর্যন্ত হিসাব দেখান হইয়াছে ।

৭। ২৫শে মার্চ হাতে যে অর্থ আছে উহার পরিচয় নিম্নরূপ :

স্টেট্ ব্যাঙ্ক—৬,১৫,০০'০০
ম্যানেজিং ডিরেক্টরের
নিকট— ২,৭৫০'০০

৮। দায়গ্রহণকারীদের সহিত কোন চুক্তি হয় নাই ।

৯। পরিচালকদের নিকট শেয়ার বাবদ কোন অর্থ পাওনা নাই এবং তাঁহাদিগকে কোন কমিশন দেওয়া হয় নাই ।

১০। নিম্নে পরিচালকদের নাম, ঠিকানা ও পরিচয় দেওয়া হইল :

নাম	ঠিকানা	পরিচয়
১। শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৫, রসা রোড কলিকাতা	মহাজন
২। শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী	শ্রীরামপুর	"
৩। শ্রীমণীন্দ্র মুখার্জি	ব্যারাকপুর	ব্যবসায়ী
৪। শ্রীকুমার গুপ্ত	দমদম	"
৫। শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়	বরাহনগর	অধ্যাপক

এতদ্দ্বারা আমরা উক্ত বিবরণ সত্য বলিয়া প্রত্যয়ন করিতেছি ।

শ্রীকুমার গুপ্ত
শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়
পরিচালক

১১। হিসাব নিরীক্ষকের নাম ও ঠিকানা :

নাম	ঠিকানা	পরিচয়
শ্রীপ্রফুল্ল মুখার্জি	৪১, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড কলিকাতা-২৬	সনদপ্রাপ্ত গাণনিক

ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড

২৫শে মার্চ (১৯৭৩) পর্যন্ত

আয়-ব্যয়ের হিসাব

আয়	টাকা	ব্যয়	টাকা
মূলধন	৯,১১,০০০	নিবন্ধন ব্যয়	২,০০০
আবেদন ফি	২২,৭৫০	অন্যান্য প্রাথমিক ব্যয়	৭,০০০
ম্যানেজিং ডিরেক্টর	১০,০০০	ছাপা ও কাগজপত্র	২০০
		ডাক খরচ	১০০
		আসবাবপত্র	৫,০০০
		ম্যানেজিং ডিরেক্টর	৩,০০০
		অফিস ব্যয়	৩,৭০০
		পরিচালকদের ফি	১,০০০
		টেলিফোন	৫০০
		ইলেকট্রিক	২০০
		উকিল ব্যয়	৫০০
		বিজ্ঞাপন	৮০০
		অফিস ভাড়া	২,০০০
		জমি ক্রয়	৩,০০,০০০
		স্টেট ব্যাঙ্ক	৬,১৫,০০০
		ম্যানেজিং ডিরেক্টর	২,৭৫০
	৯,৪৩,৭৫০		৯,৪৩,৭৫০

শ্রীকুমার গুপ্ত
শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়
পরিচালক
২৫।৩।৭৩

এই বিবরণীতে কোম্পানীর আবণ্টিত শেয়ার ও তজ্জন্য প্রাপ্ত অর্থ ও আয়-ব্যয় সম্পর্কে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে এতদ্দ্বারা উহা আমি সত্য বলিয়া প্রত্যয়ন করিতেছি।

শ্রীপ্রফুল্ল মুখার্জি
হিসাব নিরীক্ষক
২৫।৩।৭৩

কোনও কোম্পানীর একটি স্মারকলিপি (Memorandum of Association of a Company)

ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেডের স্মারকলিপি

১। এই কোম্পানীর নাম "ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড"।

২। এই কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয় পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।

৩। ভারতের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন কাঁচামালের ক্রয়-বিক্রয় এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি নির্বাহ করাই এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য।

৪। ইহার সভ্যগণের দায় সীমিত।

৫। ইহার নামিক মূলধন দশ লক্ষ টাকা এবং উহা প্রতিটি দশ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত।

আমরা নিম্নলিখিত নামের ও ঠিকানার বিভিন্ন ব্যক্তিগণ এই স্মারকলিপি অনুযায়ী একটি কোম্পানী গঠনে ইচ্ছুক এবং কোম্পানীর মূলধন হইতে আমাদের প্রত্যেকের নামের পাশে লিখিত শেয়ার ক্রয় করিতে আমরা সম্মত আছি।

নাম ও পরিচয়	ঠিকানা	গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা
১। শ্রীকমলকুমার রায়চৌধুরী ব্যবসায়ী	গোলপার্ক, কলিকাতা	৩০০
২। শ্রীমনতোষ গাঙ্গুলী ব্যবসায়ী	কবি পার্ক, কসবা	৫০০
৩। শ্রীমতিলাল সেন মহাজন	শ্যামবাজার, কলিকাতা	৫০০
৪। শ্রীসুনীল গুহ মহাজন	বড়বাজার, কলিকাতা	৩০০
৫। শ্রীরামলাল দত্ত জমিদার	শোভাবাজার, কলিকাতা	৩০০
৬। শ্রীবীরেন চট্টোপাধ্যায় জমিদার	শালকিয়া, হাওড়া	২০০
৭। শ্রীঅমর সেনগুপ্ত অধ্যাপক	বরাহনগর, কলিকাতা	১০০
		২,২০০

২৭শে মার্চ ১৯৭৩।

সাক্ষী : শ্রীসুরেশচন্দ্র ভেদজ্ঞ, টালিগঞ্জ, কলিকাতা।

পরিচালকমণ্ডলীর বিবরণী (Directors' Report)

ইগিল লিমিটেড কোম্পানীর সদস্যদের প্রতি উক্ত কোম্পানীর ১৯৭২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বৎসর শেষের উপর পরিচালকমণ্ডলীর বিবরণী।

মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আমরা আপনাদের কোম্পানীর পরিচালক হিসাবে ১৯৭২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বৎসর শেষের বিবরণী এই সভায় পেশ করিতেছি এবং আশা করি উহা আপনাদের অনুমোদনলাভে বঞ্চিত হইবে না।

১। এ বৎসরে কোম্পানীর নীট মুনাফা দাঁড়াইয়াছে ২,৫০,০০০ টাকা। গত বৎসরের উদ্বৃত্ত উহার সহিত একত্র করিলে উহা দাঁড়াইবে ৩,২৫,০০০ টাকা। আপনাদের পরিচালকমণ্ডলী নিম্নলিখিতভাবে উক্ত মুনাফা বণ্টন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন :

	টাকা	টাকা
মোট মুনাফা	—	৩,২৫,০০০
আয়কর ও অন্যান্য কর	২৫,০০০	
সঞ্চয় তহবিল	৫০,০০০	
লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিল	১০,০০০	
লভ্যাংশ তহবিল	২৫,০০০	
অন্যান্য	১৫,০০০	
উদ্বৃত্ত	২,০০,০০০	
	৩,২৫,০০০	৩,২৫,০০০

এই উদ্বৃত্ত মুনাফা পরিচালকমণ্ডলী লভ্যাংশ হিসাবে নিম্নলিখিতরূপ সুপারিশ রিতেছেন :

		টাকা
(ক)	প্রাগ্‌দাবী শেয়ার প্রতি ১০ টাকা আয়করমুক্ত লভ্যাংশ	৫০,০০০
(খ)	ইকুইটি শেয়ারে শেয়ারে প্রতি ১৫ টাকা আয়-করমুক্ত লভ্যাংশ	১,৪০,০০০
(গ)	দান বাবদ	১০,০০০
		২,০০,০০০

২। আপনাদের বর্তমান পরিচালক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীর ৫১ ধারা অনুযায়ী অবসর গ্রহণ করিতেছেন এবং তিনি পুনর্নির্বাচনযোগ্য বলিয়া পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী।

৩। কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষক (Auditor) শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ সেন অবসর গ্রহণ করিতেছেন এবং তিনি পরবর্তী বৎসরে হিসাব পরীক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। ১৯৭১ সাল সাধারণভাবেই ব্যবসা মন্দার বৎসর ছিল। এই মন্দার হাত হইতে আপনাদের কোম্পানীও রেহাই পায় নাই। ১৯৭২ সালে অবশ্য উক্ত অবস্থার অনেকটা উন্নতি দেখা দিয়াছে এবং কোম্পানী যে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে এ আশা পোষণ করা কোন প্রকারে অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

৫। কোম্পানীর তরফ হইতে আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমাদের বিবরণী পাঠ শেষ করিতেছি।

কলিকাতা
২রা মার্চ, ১৯৭৩

আপনাদের বিশ্বস্ত
শ্রীসুধাকর বসু
শ্রীচিত্তরঞ্জন সেন
শ্রীহুবিমল মুখার্জি
পরিচালকমণ্ডলী

কোম্পানী গুটানো বা বিলুপ্তি (Liquidation or Winding up of the Company)

কোনও কোম্পানী উহার কারবারে সাফল্যলাভ করিতে অসমর্থ হইলে উহার বিলুপ্তি প্রয়োজন হয়। কোম্পানী গুটানো বা বিলুপ্তির অর্থ হইতেছে যে, উহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা এবং ঐ অর্থ পাওনাদার এবং শেয়ার-গ্রহীতাদের মধ্যে বণ্টন করা। কিভাবে কোন কোম্পানী গুটানো বা উহার বিলুপ্তি ঘটানো চলে উহা কোম্পানী আইনে বিধিবদ্ধ আছে। উক্ত আইনে কোম্পানী গুটানোর বিধিব্যবস্থা নিম্নলিখিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে :

১। আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে কোম্পানী গুটানো (Compulsory winding up of the Company by the Court) : নিম্নলিখিত অবস্থায় আদালত কোম্পানী গুটানোর অনুমতি বা আদেশ দিয়া থাকেন :

(ক) কোম্পানী উক্ত মর্মে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে।

(খ) সার্বজনীন কোম্পানী নিবন্ধকের নিকট বিধিবদ্ধ বিবরণী (Statutory Report) পেশ করিতে অসমর্থ হইলে কিংবা বিধিবদ্ধ সভা (Statutory Meeting) আহ্বান করিতে অসমর্থ হইলে।

(গ) কোম্পানী গঠনের একবৎসরের মধ্যে উহা কারবার আরম্ভ না করিলে বা উহার কারবার একবৎসর বন্ধ থাকিলে।

(ঘ) কোম্পানী উহার পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করিতে না পারিলে।

(ঙ) উহার সদস্যসংখ্যা ঘরোয়া কোম্পানীর পক্ষে দুইজনের এবং সার্বজনিক কোম্পানীর পক্ষে সাতজনের কম হইলে।

(চ) ইহা ছাড়া অন্য কোন কারণে আদালত কোম্পানী গুটানো উপযুক্ত বিবেচনা করিলে।

২। **স্বেচ্ছাকৃত বিলুপ্তি (Voluntary Winding up) :** নিম্নলিখিত অবস্থায় কোন কোম্পানী স্বেচ্ছাকৃতভাবে কারবার গুটাইতে পারে :

(ক) কোনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোম্পানী গঠিত হইলে উক্ত সময় অতিক্রম করিলে।

(খ) কোনও ঘটনা ঘটিলে কারবার গুটানো হইবে এই মর্মে আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীতে উল্লিখিত থাকিলে এবং উক্ত ঘটনা ঘটিলে।

(গ) কোম্পানীর সাধারণ সভায় কোম্পানী গুটানো প্রস্তাব গৃহীত হইলে।

(ঘ) কোম্পানী স্বেচ্ছাকৃতভাবে কারবার গুটানো সম্পর্কে বিশেষ সংকল্প (Special Resolution) গ্রহণ করিলে।

স্বেচ্ছাকৃত বিলুপ্তি অবশ্য দুইপ্রকারে হইতে পারে :

(ক) সদস্যগণের দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত বিলুপ্তি (Members' Voluntary Winding up) : যদি কোম্পানীর অবস্থা সচ্ছল থাকে এবং তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত দেনাপাওনা পরিশোধ করিতে সক্ষম হয় তবে এই মর্মে ঘোষণা দ্বারা এবং উহার প্রতিলিপি নিবন্ধকের নিকট পেশ করিয়া সদস্যগণ কারবার গুটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

(খ) পাওনাদারদের স্বেচ্ছাকৃত বিলুপ্তি (Creditors' Voluntary Winding up) : যদি কোম্পানীর অবস্থা অসচ্ছল হইয়া পড়ে তবে পাওনাদারদের সভায় কোম্পানীর দেনা-পাওনার বিবরণ পেশ করিয়া এবং হিসাব-নিষ্পত্তিকারক (Liquidator) নিযুক্ত করিয়া কোম্পানী কারবার গুটাইতে পারে।

৩। **নিবন্ধক কর্তৃক বিলুপ্তি (Winding up by the Registrar) :** কোম্পানীর নিবন্ধক (Registrar of Companies) যদি দেখেন যে, কোন কোম্পানী কারবারে লিপ্ত নাই তবে উহার নাম তালিকা হইতে অপসারণ করিয়া উহার বিলুপ্তি ঘটাইতে পারেন।

৪। **আদালতের তত্ত্বাবধানে কোম্পানী বিলুপ্তি (Winding up subject to the Supervision of the Court) :** স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোম্পানী বিলুপ্তির প্রস্তাব গৃহীত হইলে কোম্পানীর সদস্য, পাওনাদার, কোম্পানীর

বিলুপ্তির অর্থ প্রদায়ক (Contributory), কিংবা হিসাব-নিষ্পত্তিকারক (Liquidator) প্রভৃতির আবেদনক্রমে আদালত কোম্পানীর বিলুপ্তির জন্য তত্ত্বাবধায়ক হইতে পারেন এবং এরূপ অবস্থায় হিসাব-নিষ্পত্তিকারক আদালতের নির্দেশ ও উপদেশমত কোম্পানীর বিলুপ্তির কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

প্রদায়ক (Contributory)

যাঁহারা কোম্পানী বিলোপসাধনের সময় কোম্পানীর তহবিলে কিছু অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য থাকেন তাঁহারা প্রদায়ক (Contributory) নামে পরিচিত হন। এই অর্থে শেয়ার-গ্রহীতাগণও প্রদায়কের পর্যায়ে পড়েন যদিও তাঁহারা তাঁহাদের দেয় পুঁজির সমস্তটাই দিয়া থাকেন।

কর্মে বিরত কোম্পানী (Defunct Company)

যখন কোন কোম্পানী কারবার বন্ধ করে এবং উহার শেয়ার-গ্রহীতাগণ উক্ত কারবার চালু করার কোন আগ্রহ দেখান না তখন উহাকে কর্মে বিরত কোম্পানী (Defunct Company) বলে। প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও কোম্পানী কারবার বন্ধ করিয়াছে কিনা উহা জানিবার জন্য নিবন্ধক প্রথমে কোম্পানীর নিবন্ধিত অফিসে (Registered Office) পত্র দিয়া থাকেন এবং পরে উক্ত কোম্পানীর পরিচালকদের ব্যক্তিগত ঠিকানায়ও পত্র দিয়া থাকেন। উহাদের নিকট হইতে কোন সদুত্তর না পাইলে নিবন্ধক কোম্পানীর কর্মবিরতি সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারেন এবং উক্ত কোম্পানীর নাম তালিকা হইতে কাটিয়া দিয়া গেজেটে উক্ত সংবাদ প্রকাশ করেন। এরূপ নাম কাটা হইলেও উহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ২০ বৎসরের মধ্যে কোম্পানীকে পুনর্জীবিত করার অর্থাৎ পুনরায় চালু করার অধিকার থাকে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. Who is a Company Secretary ? What are his functions and powers ?

কোম্পানীর কর্মসচিব কে ? তাঁহার কাজ ও ক্ষমতা কি ?

2. Give an account of the different kinds of meeting of a Joint Stock Company.

যৌথ কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার সভার বিবরণ দাও।

3. What is a Resolution ? Describe different kinds of Resolutions a company may pass ?

সংকল্প কাহাকে বলে ? কোন কোম্পানী যে বিভিন্ন প্রকার সংকল্প গ্রহণ করিতে পারে তাহার বিবরণ দাও।

4. Describe briefly the procedure for the alteration of the Memorandum and Articles of Associations of a Joint Stock Company.

স্মারকলিপি ও আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী পরিবর্তনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

5. Mention the different kinds of books maintained by a Joint Stock Company.

যৌথ কোম্পানী যে সকল বহি রাখিয়া থাকে উহার উল্লেখ কর।

6. Give a short account of the share-selling procedure of a Joint Stock Company.

কোন যৌথ কোম্পানীর শেয়ার-বিক্রয় পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

7. Distinguish between Share Certificate and Share Warrant.

শেয়ার সার্টিফিকেট এবং শেয়ার ওয়ারেন্টের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

8. Write short notes on:—Transfer and Transmission of Shares, Forfeiture of Shares, Quorum, Annual Return, Proxy.

সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও: শেয়ার হস্তান্তর ও মালিকানান্তর, শেয়ার বাজেয়াপ্ত, সর্বনিম্ন সদস্য, বার্ষিক বিবরণী, ভোটদান প্রতিনিধি।

9. Discuss the functions of the Chairman of a company meeting and the procedure for conduct of such a meeting.

কোম্পানীর সভার সভাপতির কাজ ও সভা-পরিচালনা পদ্ধতি আলোচনা কর।

10. Draft the notice of the Annual General meeting of a Company.

কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভার একটি বিজ্ঞপ্তি রচনা কর।

11. Draft a suitable notice with agenda inviting the Directors to a meeting of a Company.

কোম্পানীর কোনও সভায় ডিরেক্টরদের আমন্ত্রণ জানাইয়া কর্মসূচীসহ সভার একখানা বিজ্ঞপ্তি রচনা কর।

12. What are Minutes of a meeting and what is their importance? Draft the Minutes of the meeting of the Board of Directors of a Company.

সভার কার্যবিবরণী কাহাকে বলে? উহার প্রয়োজনীয়তা কি? কোম্পানীর ডিরেক্টরদের সভার একটি কার্যবিবরণী লিখ।

13. Draft the Minutes of the Annual General Meeting of a Company.

কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী লিখ।

14. Draft the Notice and Statutory Report of the Statutory Meeting of a Company.

একটি কোম্পানীর বিধিবদ্ধ সভার নোটিশ এবং বিধিবদ্ধ বিবরণী প্রস্তুত কর।

15. Draft the Memorandum of Association of a Company

কোনও কোম্পানীর একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত কর।

16. Draft a Directors' Report.

পরিচালকমণ্ডলীর বিবরণী লিখ।

17. How a Company may be wound up ?

কোম্পানী কিভাবে কারবার গুটাইতে পারে ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কারবারী জোট

(Business Combination)

কারবারী জোটের কারণ (Causes of Business Combination)

একই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যখন কতকগুলি সমস্বার্থবিশিষ্ট পৃথক পৃথক কারবারী সংস্থা মিলিত ও একত্রিত হয় তখন উহাকে কারবারী জোট বা জোটবন্ধন (Business Combination) বলে।

কারবারী জোটের কারণ নানাবিধ। নিম্নের আলোচনা হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে :

১। **প্রতিযোগিতা (Competition) :** কারবারের গোড়াপত্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহারা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেই প্রথম জন্মলাভ করে। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টায় প্রথমে কারবার আরম্ভ হয়। তখন উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে মোটামুটি কিছুটা সামঞ্জস্য ছিল। পৃথক পৃথক কারবারী সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলেও উহা ততটা তীব্র ছিল না। কিন্তু কালক্রমে বিশেষত যৌথ কারবারের আবির্ভাব হওয়ায় এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইতে থাকে। কারবারী জগতে অবশ্য প্রতিযোগিতা একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। ইহা সমাজের পক্ষে কল্যাণকরও বটে। ইহার ফলে জনসাধারণ ন্যায্য মূল্যে ভাল জিনিস পাইবার আশা রাখে। কিন্তু প্রতিযোগিতা তীব্র হইলে কারবারের পক্ষে উহা অশান্তিকর হইয়া পড়ে। এই প্রতিযোগিতার ফলে প্রত্যেক কারবারী সংস্থা পণ্যের মূল্যে হ্রাস করিতে বাধ্য হয়। পণ্যের মূল্য এইভাবে হ্রাস পাইতে পাইতে উহা উৎপাদন মূল্যকেও ছাড়াইয়া যায়। বিক্রয়মূল্য উৎপাদনমূল্য অপেক্ষা কম হইলে কারবার কখনই লাভজনকভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। এরূপ অবস্থা প্রত্যেক কারবারী সংস্থার পক্ষে সমূহক্ষতিকর। অনেক কারবারী সংস্থা প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারায় কারবার বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। আবার চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া অনেক অবিক্রীত পণ্য গুদামজাত হইয়া পচিতে থাকে। বড় বড় কারবারী প্রতিষ্ঠান উহাদের মূলধন ও সংগঠনের জোরে কিছুদিন টিকিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ছোট কারবারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কারবার গুটানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এবং অসাধু প্রতিযোগিতার হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য উক্ত প্রতিযোগিতা পরিহার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ফলে বিভিন্ন কারবারী সংস্থা জোটবন্ধন দ্বারা এই প্রতিযোগিতা পরিহার করে। এজন্য বলা হয় প্রতিযোগিতা জোটবন্ধন সৃষ্টি করে

(Competition leads to Combination)। তবে প্রতিযোগিতাই জোটবন্ধনের একমাত্র কারণ নহে। ইহা যে একটি প্রধান কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অন্যান্য যে যে কারণের জন্য জোটের সৃষ্টি হয় নিম্নের বিবরণ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

২। **বৃহদায়তন সংগঠনের সুবিধা (Economies of large-scale organisation):** কারবার বৃহদায়তন হইলে কারিগরী সুবিধা, পরিচালন দক্ষতা, ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা, পরিবহনের সুবিধা প্রভৃতি লাভ করা সম্ভব হয়। ইহার ফলে কারবারের অনেক ব্যয়-সঙ্কোচ হয়। এরূপ সুবিধালাভের জন্য অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারবারী সংস্থা মিলিত হইয়া জোট গঠন করিয়া থাকে এবং বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হয়।

৩। **পণ্যের উৎপাদন ও চাহিদার সমন্বয় (Adjustment between production and demand of goods):** প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অনেক স্থলেই পণ্যের উৎপাদন ও উহার চাহিদার সহিত সমন্বয় রক্ষা করা সম্ভব হয় না। একে অন্যের উৎপাদনের পরিমাণ না জানায় অনেক কারবারী সংস্থা অধিক বিক্রয়ের আশায় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ফলে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশী হইয়া পড়ে এবং পণ্যের বিক্রয়মূল্য স্বভাবতই উহার উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাও হ্রাস পায়। এরূপ পরিস্থিতিতে অনেক কারবারী সংস্থা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এরূপ অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি পণ্যের উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে সমন্বয় রক্ষা এবং পণ্যের মূল্য একটা নির্দিষ্ট স্তরে রাখার উদ্দেশ্যে জোট বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

৪। **বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে আত্মরক্ষা (Self-defence against foreign competition):** এককভাবে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এরূপ অবস্থায় জোটবন্ধনের দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা অনেকস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। **প্রতিযোগিতার ক্ষমতাবৃদ্ধি (Increase of competitive strength):** অনেকক্ষেত্রে ছোট ছোট কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহৎ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য এই ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি জোটবন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। এই জোটের মাধ্যমে ইহারা নানাপ্রকার কারবারী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারে। ফলে ইহাদের প্রতিযোগিতার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৬। **বাণিজ্যচক্র (Trade Cycle):** বাণিজ্যচক্র অর্থাৎ কারবারে সমৃদ্ধি ও মন্দা অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। সমৃদ্ধির সময় কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি অতিরিক্ত, আশাবাদী হইয়া পড়ে। তখন কারবারের পরিধি, উৎপাদন ক্ষমতা, পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহা ছড়া নূতন নূতন কারবারী প্রতিষ্ঠানেরও আবির্ভাব হয়। কিন্তু যখন কারবারে মন্দা দেখা দেয় তখন এই সকল প্রতিষ্ঠান নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আশংকিত হইয়া পড়ে। তখন কারবারী অবস্থার মধ্যে স্থিরতা আনার, প্রতিযোগিতার অবসানের এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উহারা জোটভুক্ত হয়।

৭। **শুল্কনীতির প্রভাব** (Influence of Tariff Policy) : অনুন্নত ও শিশু শিল্পগুলিকে প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষার জন্য সরকার সাধারণত উহাদিগকে সংরক্ষণ শিল্পেরও আওতায় আনিয়া থাকেন। এই শুল্কপ্রাচীরের মধ্যে অবস্থান করিয়া ইহারা উন্নতিলাভে সমর্থ হয় এবং প্রতিযোগিতার ক্ষমতালাভ করে। তখন সরকার স্বভাবতই শুল্কপ্রাচীর তুলিয়া দিবার মনস্থ করেন। কিন্তু তখন শুল্কাশ্রিত শিল্পগুলি নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে জোটবন্দী হইয়া শুল্কপ্রাচীর তুলিয়া দিবার বিরোধিতা করে।

৮। **আর্থিক ও বাণিজ্যিক নীতি** (Economic and Commercial Policy) : সরকারের আর্থিক ও বাণিজ্যিক নীতি অনেকক্ষেত্রে কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থের পরিপন্থী হয়। ইহার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ গড়িয়া তোলার জন্য উহারা জোটবন্দী হইয়া পড়ে।

৯। **সরকারী নির্দেশ** (Government Directive) : জনস্বার্থের খাতিরে অনেক ছোট ছোট কারবারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর করিয়া উহাদের শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। জোটবন্ধন ছাড়া এই শক্তি ও সামর্থ্যলাভ অনেকক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। কিন্তু বিবদমান প্রতিষ্ঠানগুলি হয়ত এই জোট গঠনে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতে না পারে। তখন সরকারের পরামর্শ ও নির্দেশে উহারা জোট গঠনে বাধ্য হয়।

১০। **পেটেণ্ট আইন** (Patent Laws) : এই আইনের বলে বিশেষ নামাঙ্কিত কতকগুলি পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যাপারে অনেক কারবারী প্রতিষ্ঠান একচেটিয়া অধিকার পাইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রেও এই বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের বিভিন্ন পণ্যের উপর একচ্ছত্র অধিকার, পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও উহার বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য জোটভুক্ত হয়।

১১। **প্রবর্তক ও লগ্নীকারীর চাপ** (Pressure from Promoters and Investors) : প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অসাধু প্রতিযোগিতার ফলে উহারা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রবর্তকগণ এরূপ অবস্থায় মধ্যস্থ হইয়া উহাদিগকে জোটবন্ধনে আবদ্ধ করেন। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য লগ্নীকারক সংস্থাগুলি তাহাদের লগ্নীকৃত অর্থের নিরাপত্তার জন্য দুর্বল ও বিবদমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনেকক্ষেত্রে জোটবন্ধনে বাধ্য করে।

১২। **পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি** (Improvement of Transport and Communication) : বর্তমানকালে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন বাজারের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং সুদূরে অবস্থিত দেশগুলির মধ্যেও যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হইয়াছে। ফলে

পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশীয় ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক কারবারী জোটের সৃষ্টি হইয়াছে।

১৩। সম্প্রসারিত পণ্যের বাজার (Expanded market for goods): পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হইলে অনেক কারবারী প্রতিষ্ঠানের বিশেষত ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঐ সব বাজারে পণ্য বিক্রয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই অসুবিধা দূর করার জন্যও অনেক প্রতিষ্ঠান জোটবদ্ধ হয়।

১৪। বিক্রয়ের একাধিপত্য ও ক্ষমতার লোভ (Monopoly in Sale and Love of Power): বাজারে একাধিপত্য বিস্তার এবং পণ্যের একচেটিয়া মূল্য আদায় করার ইচ্ছা প্রত্যেক কারবারী প্রতিষ্ঠানেরই থাকে। এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করার জন্যও অনেক জোটবন্ধন হইয়া থাকে। কারবারের আয়তন বৃদ্ধি পাইলে উহার প্রভাব এবং প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পায়। ফলে সামাজিক সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হয়। এইরূপ অবস্থায় সরকারের উপরও প্রভাব বিস্তার করা যায়। এই ক্ষমতালোভে মত্ত হইয়াও বহু কারবারী প্রতিষ্ঠান জোটবন্ধন দ্বারা একত্রিত হয়।

১৫। সম্পদের দুষ্প্রাপ[illegible] Scarcity of Resources): প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন টিন, রবার, খনি[illegible]তল, প্রভৃতির দুষ্প্রাপ্যতার জন্যও জোটবন্ধন সৃষ্টি হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকারের জোটবন্ধন (Different kinds of combination)

জোটবন্ধনের আকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন প্রকারের। নিম্নে উহাদের মোটামুটি বিভাগ দেখানো হইল:

১। সাধারণ সমিতিবদ্ধতা (Simple Association):
- (ক) ব্যবসায়ী সমিতি (Trade Association)
- (খ) বণিক সভা (Chambers of Commerce)
- (গ) শ্রমিক সংঘ (Trade Unions)
- (ঘ) অলিখিত বা অনুষ্ঠান-বর্জিত চুক্তি (Informal Agreement)

২। কারবারী সংঘ (Business Federation):
- (ক) উৎপাদন সংঘ বা পুল (Pool)
- (খ) বিক্রয়কারী সংঘ বা কার্টেল (Cartel)
- (গ) কারবারী চক্র (Business Ring or Corner)

৩। আংশিক সংহতি (Partial Consolidation):
- (ক) ট্রাস্ট (Trust)
- (খ) সমস্বার্থ গোষ্ঠী (Community of Interest)
- (গ) হোল্ডিং কোম্পানী (Holding Company)

৪। পূর্ণ সংহতি (Complete Consolidation) :

(ক) একত্রীকরণ (Amalgamation)

(খ) অন্তর্ভুক্তি (Merger)

কারবারী জোট বা জোটবন্ধনকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতেও ভাগ করা চলে :

১। পূর্বাপর জোট (Vertical Combination)

২। সমান্তরাল জোট (Horizontal Combination)

৩। পার্শ্বিক জোট (Lateral Combination)

৪। আঞ্চলিক জোট (Territorial Combination)

৫। বৃত্তাকার জোট (Circular Combination)

৬। কোণাকুণি জোট (Diagonal Combination)

৭। স্বেচ্ছামূলক জোট (Voluntary Combination)

৮। বাধ্যতামূলক জোট (Compulsory Combination)

কারবারী জোটের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Business Combination)

কারবারী জোটের সুবিধা ও অসুবিধা নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে :

সুবিধা :

১। বৃহদায়তন কারবারের সুবিধা (Economies of large-scale business) : জোটের ফলে কারবার বৃহদাযতন হইলে উহা নানাপ্রকার সুবিধা ভোগ করে। ইহা উৎকৃষ্ট মানের কাঁচামাল সুবিধাজনক শর্তে ও কম পরিবহন ব্যয়ে সংগ্রহ করিতে পারে, যৌথ পরিচালনার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করিতে পারে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও আলোচনার মাধ্যমে ব্যয়-সংকোচ করিতে পারে, বিশিষ্ট মানের পণ্য উৎপাদন করিতে পারে, বিক্রয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিজ্ঞাপন, পরিবহন, বিক্রেতাদের পারিশ্রমিক প্রভৃতির ব্যয়-সংকোচ করিতে পারে, সহজ শর্তে অর্থ বা ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে।

২। অতি-উৎপাদনের ঝুঁকি কম (Minimum risk of over-production) : জোটের ফলে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকায় ইহার পক্ষে চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়। এইভাবে সম্ভাব্য চাহিদা স্থির দ্বারা অতি-উৎপাদনের ঝুঁকি ইহাকে কম বহন করিতে হয়। ফলে ইহাকে কারবারের মন্দার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।

৩। অদক্ষ কারবারের উচ্ছেদ (Closing down of inefficient firms) : জোটের ফলে জোটভুক্ত কারবারের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পণ্য উৎপাদন ব্যয়

হ্রাস পায়। এজন্য জোটের বাহিরে দুর্বল ও অদক্ষ কারবার ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না। ফলে উহাদের দরজা বন্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না এবং এইভাবে ইহাদের বিলুপ্তি ঘটে।

৪। **সস্তায় পণ্য ক্রয়** (**Buying goods at cheaper rates**): জোটের ফলে একাধিক কারবারের মিলিত প্রচেষ্টায় মূলধন, যন্ত্রপাতি, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা প্রভৃতির ফলে যে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ঘটে উহার জন্য জনসাধারণ সস্তায় পণ্য ক্রয় করার সুবিধা পায়।

৫। **পরস্পরের সমস্যা সমাধান** (**Successful tackling of common problems**): জোটের ফলে যে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতার সূত্র সৃষ্টি হয় তাহাতে পরস্পরের সমস্যাগুলির সমাধান সহজসাধ্য হয়। ফলে কারবারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়।

৬। **জনহিতকর কার্য** (**Public utility services**): জনহিতকর প্রতিষ্ঠান যেমন, রেল পরিবহন, পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতিতে প্রতিযোগিতা ক্ষতিকর। এখানে জোটবন্ধন দ্বারা একটি এলাকায় একটি প্রতিষ্ঠান কার্যকর থাকা সর্বথা বাঞ্ছনীয়। একই এলাকায় এরূপ একাধিক প্রতিষ্ঠান অলাভজনক এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী। সুতরাং জনহিতকর কার্যে জোটবন্ধন বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে।

৭। **শেয়ারের উপযুক্ত মূল্য** (**Better value of securities**): ইহার আর্থিক সঙ্গতি বেশী থাকায় এবং কারবার পরিচালনায় দক্ষতা প্রকাশ পায় বলিয়া ইহার শেয়ার উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। শেয়ার-গ্রহীতাগণও উহাদের বিনিয়োগে উপযুক্ত পরিমাণ লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন।

৮। **বেকার সমস্যা** (**Unemployment problem**): প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক দুর্বল প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং উহার দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে অধিকতর বেকার সমস্যা দেখা দেয়। কারবারী জোট ইহা কিছুটা এড়াইয়া চলিতে পারে।

৯। **গবেষণার সুবিধা** (**Research facilities**): জোটের ফলে আর্থিক সঙ্গতি অবশ্যই বৃদ্ধি পায়। ফলে ইহাদের পক্ষে অধিক ব্যয়ে গবেষণাকার্য চালান সম্ভব হয় এবং ইহার ফলে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি, উৎপাদন কলা-কৌশল প্রদর্শন ও পণ্য সরবরাহ সহজসাধ্য হয়।

১০। **কারিগরি জ্ঞান ও পেটেন্ট বিনিময়** (**Exchange of technical knowledge and patents**): কারবারী জোট বিভিন্ন দেশী-বিদেশী কারবারের মধ্যে গঠিত হইলে কারিগরি জ্ঞান ও পেটেন্ট বিনিময় হইতে পারে। ইহার ফলে কারবারী প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণ উভয়েই লাভবান হয়।

অসুবিধা :

১। **উচ্চমূল্য (High prices) :** কারবারী জোট উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে বটে, এবং ইহার ফলে জনসাধারণ কম মূল্যে জিনিস পাইতে পারে সত্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বেশী মুনাফা লাভের জন্য ইহারা সাধারণত পণ্যের মূল্য উচ্চ-হারেই ধার্য করিয়া থাকে। সুতরাং কম মূল্যে জিনিস পাওয়া অলীক কল্পনা মাত্র।

২। **অসাধু উপায় (Unfair practices) :** কারবারী জোটের দ্বারা প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রতিযোগিতা রোধ করা হয় এবং জোটভুক্ত কারবারী সংস্থাগুলির ক্ষমতা ও সঙ্গতি অধিক থাকায় অসাধু উপায়ে উহারা কারবারী ক্ষেত্রে নূতন প্রতিযোগীদের প্রবেশ বন্ধ করিয়া থাকে।

৩। **রাজনৈতিক কলুষতা (Political corruption) :** কারবারী জোটের প্রচুর আর্থিক সঙ্গতি থাকায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাসনযন্ত্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারী-দিগকে প্রভাবিত করিয়া আইন এবং বিচারকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করে। ইহা ছাড়া দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জোট সৃষ্টি হইলে সংকীর্ণ মুনাফার লোভে জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

৪। **জাতীয় সম্পদের অসম বণ্টন (Unequal distribution of national resources) :** জোট বন্ধনের ফলে ইহারা অতিরিক্ত মুনাফা লাভের অধিকারী হয় এবং এইভাবে জাতীয় সম্পদের একটা মোটা অংশ ইহাদের হস্তগত হয়। জাতীয় সম্পদের অসম বণ্টনের জন্য জনসাধারণের স্বার্থ বিপন্ন হয়।

৫। **শোষণ মনোভাব (Exploitation motive) :** জোট বন্ধনের ফলে সুবিধামত শর্ত আদায় করার ক্ষমতার অধিকারী থাকায় ইহারা কাঁচামাল উৎপাদন-কারীদিগকে কম মূল্য এবং শ্রমিকদিগকে কম মজুরী দিয়া থাকে। ইহাতে ইহাদের শোষণের মনোভাবই প্রকাশ পায়।

৬। **সম্ভাব্য অদক্ষতা (Possible inefficiency) :** কারবারী জোট প্রথমে অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যেই গঠিত হয়। কিন্তু ইহার পর বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপিত হইতে থাকিলে ইহাদের মনে একটা নিশ্চিন্তভাব আসিয়া যায়। তখন বিভিন্নক্ষেত্রে শৈথিল্য আসিয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত কারবারের দক্ষতা নষ্ট হয়। ইহা ছাড়া উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব আরম্ভ হইলে অনেকে গোপনে জোটের চুক্তি ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করে এবং কালক্রমে জোট আর টিকিয়া থাকিতে পারে না। এইভাবে ভাঙ্গন ধরার ফলে কারবার পরিচালনায় অদক্ষতা চরমে উঠে। তাহা ছাড়া প্রতিযোগিতার অভাব এবং শৈথিল্য একত্রে অনেকক্ষেত্রে কারবারের অগ্রগতি রুদ্ধ করে এবং উহার স্থিতাবস্থা (stagnation) আনয়ন করে।

৭। **ব্যবস্থাপনার ত্রুটি** (**Managerial difficulties**): অনেকক্ষেত্রে জোটের ফলে কারবারে একচেটিয়া আধিপত্য আসিয়া যায়। ইহার ফলে আবার ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিগণ কারবারের আয়তন অযথা বৃদ্ধির দিকেই মনঃসংযোগ করেন। ইহাদের চেষ্টায় কারবার বড় আকার ধারণ করে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত আয়তন বৃদ্ধির ফলে ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি দেখা দেয় ও ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে।

৮। **অতি-মূলধন ও ফটকাবাজীর বিপদ** (**Danger of over-capitalisation and speculation**): অনেক সময় কারবারী জোটের ফলে অতিরিক্ত মূলধন সংগৃহীত হইয়া পড়ে। তখন উক্ত মূলধনের সুষ্ঠু বিনিয়োগ সমস্যা দেখা দেয়। ইহাতে মুনাফা কমিতে থাকে এবং শেয়ার লইয়া ফটকাবাজী আরম্ভ হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের ও জাতির স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়।

৯। **সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এবং সরকারী আইন** (**Anti-social activities and government regulation**): ইহারা অনেকক্ষেত্রে বাজার ভাগাভাগি করিয়া লয়, বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া পণ্যের দাম অযথা বৃদ্ধি করে, উৎপাদন বেশী হইলে মূল্য হ্রাসের আশঙ্কায় উহার একাংশ নষ্ট করিয়া ফেলে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় জাতীয় সম্পদের অপচয় ঘটায়। তখন সরকারী আইন দ্বারা এই সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করা এবং জোট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

পূর্বাপর ও সমান্তরাল জোটের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও সুবিধা (Nature, Object and Economies of Vertical and Horizontal Combinations)

কারবারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ (Expansion) একটি সাধারণ নিয়ম। এই সম্প্রসারণ দুইভাবে সংঘটিত হয়—(ক) আভ্যন্তরীণ (Internal) এবং (খ) বাহ্যিক (External)। কারবারের নিজস্ব সম্পদ এবং ক্রমোন্নতির ফলে যে সম্প্রসারণ উহাকে বলা হয় আভ্যন্তরীণ সম্প্রসারণ। আর অন্য প্রতিষ্ঠানের সহিত জোটবন্ধনে যে সম্প্রসারণ ঘটে উহাকে বলা হয় বাহ্যিক সম্প্রসারণ। সুতরাং বাহ্যিক সম্প্রসারণ ও জোটবন্ধন একই অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। জোটবন্ধন বা বাহ্যিক সম্প্রসারণের প্রকৃতি ও পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ। তন্মধ্যে পূর্বাপর ও সমান্তরাল জোট বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্বাপর জোট (Vertical Combination)

সাধারণত পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কাঁচামাল কয়লা, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে ও পরিচালনায় উৎপাদিত হইতে পারে

এবং ঐ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় লৌহ আকরিক, কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যোগান দিতে পারে। কিন্তু উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় যদি একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে বা মালিকানায় থাকে তবে উহাকে পূর্বাপর জোট বলে। এখানে যদি কয়লা, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতির উৎপাদন এবং লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে বা মালিকানায় থাকে, তবে উহা পূর্বাপর জোটের উদাহরণ হইবে। মোটের উপর কোন পণ্য উৎপাদনে কাঁচামালের উৎপাদন, সরবরাহ ও পণ্য উৎপাদন সব ব্যবস্থা একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকিলে উহা পূর্বাপর জোট হইবে। যেখানে XYZ Steel Company Limited কাঁচামাল সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল সেখানে কাঁচামালের উৎপাদন, সরবরাহ ও ইস্পাত উৎপাদন একই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বাধীনে। ইহা পূর্বাপর জোট বা বাহ্যিক সম্প্রসারণ। অনুরূপ বস্ত্র উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় যেমন, কার্পাস উৎপাদন, সুতা প্রস্তুত, কাপড় বোনা, রং করা প্রভৃতি পর্যায় একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকিলে উহাকেও পূর্বাপর জোট বলা হইবে। অন্য কথায় ইহাকে 'ভিন্নশিল্প জোট'ও বলা যাইতে পারে। টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী একটি পূর্বাপর জোটের উদাহরণ। পূর্বাপর জোট আবার সম্মুখগামী (Forward) কিংবা পশ্চাৎগামী (Backward) হইতে পারে। যখন কোন কাঁচামাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয় তখন উহাকে বলা হয় সম্মুখগামী পূর্বাপর জোট। আর যখন পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত কাঁচামাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয় তখন উহাকে বলা হয় পশ্চাৎগামী পূর্বাপর জোট। সুতরাং জোটের **প্রকৃতি** ((Nature) হইতেছে উৎপাদনের সব কিছু, অধিকাংশ বা কতকাংশ একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে আনা।

ইহার **উদ্দেশ্য** (Object) হইতেছে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় জিনিস সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হওয়া যাহাতে উহার প্রাপ্তি, মূল্য প্রভৃতি সম্পর্কে কোনপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়।

পূর্বাপর জোটের **সুবিধা** (Economies or advantages) নিম্নরূপ :

(ক) ইহাতে পণ্য ক্রয় ও উৎপাদন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দূর হয়।

(খ) ইহার ফলে সুষ্ঠুভাবে পণ্য উৎপাদন হইতে পারে এবং উহাতে পণ্য উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পায়।

(গ) ইহাতে পণ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়, পরিচালনার ও করণকৌশলের সুবিধা হয় এবং ক্রয়, বিক্রয় ও উৎপাদনক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায়।

(ঘ) ইহাতে মধ্য-ব্যবসায়ী প্রয়োজন হয় না এবং উহার জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়।

(ঙ) পণ্য উৎপাদনের জন্য অযথা অধিক পরিমাণে কাঁচামাল মজুত করার প্রয়োজন হয় না।

(চ) ইহা উৎপাদন ব্যবস্থায় আত্মনির্ভরশীল বলিয়া ইহাকে বাণিজ্যচক্রের মন্দার বেগ সহ্য করিতে হয় না।

(ছ) কাঁচামাল সরবরাহের জন্য ইহাকে প্রতিষ্ঠানের অসুবিধাজনক নিয়ন্ত্রণ সহ্য করিতে হয় না এবং কাঁচামাল প্রাপ্তি সম্পর্কে ইহাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

কিন্তু পূর্বাপর জোটের **অসুবিধা** (Diseconomies or disadvantages) নিম্নরূপ :

(ক) ইহাতে অত্যধিক মূলধন প্রয়োজন হয়। একই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এরূপ মূলধন সংগ্রহ করা এক গুরুতর সমস্যার কারণ হয়।

(খ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদনের ভার থাকিলে যে উচ্চ স্তরের কারিগরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেখান সম্ভব হয় একই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেরূপ দেখান অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কারণ প্রত্যেক স্তরের মধ্যে যে সংযোজনা ও ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজন হয় ইহাতে উহার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) ইহার কোন স্তরে কোন বিঘ্ন বা গোলমাল উপস্থিত হইলে সমুদয় কার্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

(ঘ) কাঁচামালের সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইলেও এবং প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিলেও ইহার পণ্য বিপণনে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়।

(ঙ) জোটের অন্যান্য অসুবিধাও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

(চ) ইহা বৃহৎ কারবারের সুবিধা বিশেষ ভোগ করিতে পারে না। কারণ ইহার মধ্যে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনের প্রকৃতি বিভিন্ন।

সমান্তরাল জোট (Horizontal Combination)

ইহাকে অন্য কথায় 'সমশিল্প জোট'-ও বলা যাইতে পারে। সুতরাং একই পণ্য উৎপাদনে বা সেবা পরিবেশনে নিযুক্ত কিংবা উৎপাদন সেবার একই স্তরে অবস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইলে তাহাকে সমান্তরাল জোট বলা হয়। এইভাবে একাধিক ইক্ষু-শিল্প বা কার্পাস শিল্প একত্রিত হইলে উহাকে সমান্তরাল জোট বলা হইবে। এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানী একটি সমান্তরাল জোটের উদাহরণ।

সমান্তরাল জোটের **প্রকৃতি** (Nature) হইতেছে সমগোষ্ঠীর একাধিক প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণ। ইহার ফলে ইহাতে ঐ জাতীয় কারবারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাস পায়। ইহার **উদ্দেশ্য** (Object) হইতেছে—তীব্র প্রতিযোগিতা হ্রাস, বাজার ভাগাভাগি, বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন ব্যয় হ্রাস এবং উৎপাদন বা সেবা নিয়ন্ত্রণ এবং পণ্যের পরিমাণে ও মূল্যে স্থিরতা আনয়ন।

ইহার **সুবিধাগুলি** (Economies or advantages) নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(ক) প্রধান সুবিধার মধ্যে ইহার উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখযোগ্য অর্থাৎ ইহার জোটভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটে, পণ্যের বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন ব্যয় হ্রাস হয়, উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণে ও মূল্যে স্থিরতা দেখা দেয় এবং পণ্য বিক্রয় সহজসাধ্য হয়।

(খ) বিদেশী পণ্যের সহিত ইহার প্রতিযোগিতার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। এইভাবে প্রবল প্রতিযোগিতাক্ষেত্রেও ইহা আত্মরক্ষার সুযোগ পায়।

(গ) মন্দার বাজারেও ইহার বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

(ঘ) একচেটিয়া কারবার ও তজ্জন্য প্রচুর মুনাফা লাভ করারও ইহার সুযোগ ঘটিয়া থাকে।

(ঙ) ইহার স্বার্থ বিপন্ন হওযার সম্ভাবনা থাকিলে বা কাঁচামাল সরবরাহ সম্পর্কে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িলে ইহারা সংঘবদ্ধভাবে উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে।

(চ) অনেকগুলি কারবার একত্রিত হইলে বৃহৎ কারবারের পরিচালনা, মূলধন ও ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা ইহা পাইতে পারে। অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তি নিযোগ করাও ইহাদের পক্ষে সম্ভব হয়। গবেষণার সুফল লাভ করাও ইহার পক্ষে সম্ভব হয়।

(ছ) পূর্বাপর জোট অপেক্ষা ইহা গঠন করা আধক সহজসাধ্য।

তবে সমান্তরাল জোটের নিম্নলিখিত **অসুবিধাগুলিও** (Diseconomies or disadvantages) আছে :

(ক) এরূপ জোটের ফলে একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ইহাতে ক্রেতা ও শ্রমিকদের স্বার্থ বিপন্ন হওযার ভয় থাকে। এরূপ অবস্থায় ক্রেতাকে অধিক মূল্যে জিনিস কিনিতে হয় এবং শ্রমিকদিগকে কম মজুরী লইয়া কাজ করিতে হয়।

(খ) ইহাতে বে-আইনী কার্যকলাপ ও শোষণের নীতিই বেশী কার্যকরী দেখা যায়।

(গ) মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা ইহা দেশের রাজনীতি ও সরকারের উপর অবৈধ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং করিয়া থাকে।

(ঘ) কাঁচামাল প্রাপ্তি সম্পর্কে ইহা নিশ্চিত হইতে পারে না। ফলে ইহাকে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য অযথা অধিক পরিমাণে মাল মজুত রাখিতে হয়। এজন্য প্রচুর মূলধন আটক থাকিয়া যায়।

উপরি উক্ত দুই প্রকারের জোট ছাড়া এখানে অন্য প্রকারের জোটের বিবরণ নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া যাইতে পারে :

পার্শ্বিক জোট (Lateral Combination)

কোন প্রতিষ্ঠান উহার কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট কিন্তু ভিন্ন জাতীয় পণ্য উৎপাদনে বা কার্যে নিযুক্ত অপর কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইলে উহাকে পার্শ্বিক জোট বলে।

উদাহরণস্বরূপ রেল কোম্পানীর সহিত হোটেল, স্টীমার বা বাস সার্ভিসের সংযুক্তিকে পার্শ্বিক জোট বলা চলে। একই কাঁচামাল হইতে বিভিন্ন পণ্যাদি উৎপাদন বা বিভিন্ন দ্রব্য দ্বারা একটি সমগ্রপণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তিকেও পার্শ্বিক জোট বলা হয়। যেমন, কাঁচামাল চামড়া উৎপাদনের কারখানার সহিত জুতা, স্যুটকেশ, ব্যাগ, গদি ও নানাপ্রকার সৌখিন দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণের কারখানার জোট কিংবা মৎস্য ধরার বিভিন্ন সরঞ্জাম প্রস্তুত কারখানার জোটও পার্শ্বিক জোটের উদাহরণ। ঝুঁকি বিস্তার, অধিক মুনাফা লাভ এবং একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করাই এরূপ জোটের মুখ্য উদ্দেশ্য। পার্শ্বিক জোটকে কেহ কেহ 'কর্ণ বা কোণাকুণি জোট' (Diagonal Combination) বলিয়া থাকেন।

আঞ্চলিক জোট (Territorial Combination)

(পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা খুলিয়া কিংবা সমজাতীয় অপর প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত হইয়া বিক্রয় বাজার সম্প্রসারণ করার উদ্দেশ্যে গঠিত জোটকে আঞ্চলিক জোট বলে। বিভিন্ন অঞ্চলে ও দেশে বাটার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন আঞ্চলিক জোটের একটি উদাহরণ। বিভিন্ন বাজারে আধিপত্য বিস্তার এবং পরিবহন ব্যয় হ্রাস করাই এরূপ জোটের মুখ্য উদ্দেশ্য।)

বৃত্তাকার জোট (Circular Combination)

(সমশিল্প বা ভিন্নশিল্প ছাড়া কোন গৌণ সম্পর্কের ভিত্তিতে জোট গঠিত হইলে উহাকে বৃত্তাকার জোট বলে) যেমন, ম্যানেজিং এজেন্সীর মাধ্যমে চা-বাগান ও পাটকলের মধ্যে সংযুক্তি। ইহাদের মধ্যে উৎপাদন ব্যাপারে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। কিন্তু উভয়ই রপ্তানিক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে এই গৌণ সম্পর্কই এরূপ জোটের মূলভিত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। (এইভাবে কানপুরের বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনের মাধ্যমে কার্পাস বস্ত্র, পশম বস্ত্র, ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, চামড়া দ্রব্য প্রস্তুতের প্রতিষ্ঠানগুলির সংযুক্তি, আমেরিকার জেনারেল মোটরস-এর মাধ্যমে বহুবিধ দ্রব্য উৎপাদনের কারখানার সংযুক্তি প্রভৃতি বৃত্তাকার জোটের উদাহরণ।)

সাধারণ সমিতিবদ্ধতা (Simple Association)

(প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি যখন উৎপাদন, বাজার, মূল্য, লাভ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের উদ্দেশ্যে লিখিত বা অলিখিত বা অনুষ্ঠানবর্জিত চুক্তি সম্পাদন করে তখন এই প্রকার জোট দেখা দেয়। লিখিত ও মৌখিক চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী সকলেই চুক্তিমত অঙ্গীকার রক্ষা করিবে ইহাকে ভিত্তি করিয়া এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ইহারা এরূপ চুক্তিবদ্ধ হন। ইহারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া উপরি-উক্ত কোন-না-কোন বিষয়ে

একই পন্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব এই চুক্তিদ্বারা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় না। প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিলেও উহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা থাকে না। সুতরাং এই প্রকারের চুক্তির বন্ধন বড়ই শিথিল এবং ইহার স্থায়িত্ব সম্পর্কেও কোন নিশ্চয়তা নাই। তৈল কোম্পানীগুলি যে একই মূল্যে তৈল বা পেট্রোল বিক্রয় করে উহা সাধারণ সমিতিবদ্ধতা (Simple Association)-র মধ্যে লিখিত বা অলিখিত কিন্তু অনুষ্ঠানবর্জিত চুক্তি (Informal Agreement) সম্বলিত কারবারী জোট। ইহার **সুবিধা** নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(ক) এ চুক্তির ফলে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর হয়।

(খ) এরূপ চুক্তি সম্পাদন সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। কারণ এরূপ চুক্তি করিতে হইলে আইনের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ইহার গঠন স্বেচ্ছামূলক।

(গ) চুক্তিবদ্ধ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইহাদের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকে। উহা বিপন্ন হইবার বা এক প্রতিষ্ঠানের উপর অন্যের প্রভাব বিস্তার করার কোন অধিকার থাকে না।

(ঘ) বাজার বণ্টিত থাকিলে সদস্যদের নিজস্ব পণ্য বিক্রয় সম্বন্ধেও উহারা নিশ্চিত থাকিতে পারেন।

(ঙ) ইহাতে অতি উৎপাদনের ঝুঁকিও কম হইয়া যায়। কারণ বাজার বণ্টিত থাকিলে চাহিদার পরিমাণ স্থির করা বিশেষ অসুবিধা হয় না।

(চ) ইহারা মূল্য সম্পর্কে যেমন একমত হইয়া থাকেন, উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কেও একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন।

(ছ) মূল্য সম্পর্কে একমত হইতে হইলে উৎপাদনের মান যাহাতে একরূপ হয় তাহার চেষ্টাও ইহারা করিয়া থাকেন।

(জ) ইহার ফলে ক্রেতা নির্দিষ্ট মূল্যে একটা নির্দিষ্ট মানের জিনিস পাওয়া সম্পর্কেও নিশ্চিত থাকিতে পারেন।

তবে এরূপ চুক্তিবদ্ধতার কতকগুলি **অসুবিধাও** আছে। উহা সাধারণতঃ নিম্নরূপ :

(ক) ইহার গঠন স্বেচ্ছামূলক এবং তজ্জন্য সহজ ও সরল সন্দেহ নাই, কিন্তু এই চুক্তি বড়ই শিথিল। ইহা যে-কোন সময়ে ভঙ্গ হইতে পারে। সুতরাং ইহার স্থায়িত্বের কোন নিশ্চয়তা নাই।

(খ) ইহাতে একচেটিয়া ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়। একই মূল্যে সদস্যগণ পণ্য বিক্রয় করেন সত্য, কিন্তু উক্ত মূল্য কখনই প্রতিযোগিতামূলক নহে। ফলে ক্রেতাদিগকে মূল্য কিছু বেশীই দিতে হয়। বাজার বণ্টিত থাকিলেও ক্রেতাদের এই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অধিকন্তু এইভাবে বণ্টিত হওয়ার ইচ্ছা থাকিলেও ক্রেতারা ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পণ্য ক্রয় করার সুবিধা পান না। সুতরাং পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে সন্দেহ থাকিলেও কোন কিছু প্রতিকারের উপায় থাকে না।

(গ) এই চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দক্ষতা ও অদক্ষতার কোন পার্থক্য নির্ণয় করা হয় না। সুতরাং অদক্ষ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতেই পণ্য মূল্য নির্ধারণ হইয়া থাকে। ফলে ক্রেতাদিগকে উচ্চ মূল্যেই জিনিস ক্রয় করিতে হয়।

(ঘ) সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকায় অদক্ষ প্রতিষ্ঠান অদক্ষই থাকিয়া যায়। দক্ষ প্রতিষ্ঠান হইতে সুষ্ঠু পরিচালনা বা কর্মকুশলতার অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান ইহারা আহরণ করিতে পারেন না।

(ঙ) এরূপ চুক্তি অনেকক্ষেত্রেই কার্যকর হয় না। মূল্য স্থির থাকিলেও গোপনে কম মূল্যে বিক্রয় ধরা পড়িলেও উহা প্রতিকারের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা যায় না। সেরূপ অবস্থায় চুক্তিভঙ্গ ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না।

(চ) ইহারা একচেটিয়া কারবার করার মনোবৃত্তি লইয়া অগ্রসর হন বলিয়' সমাজ-বিরোধী আখ্যা পাইয়া থাকেন। ফলে ইহাদের পিছনে সামাজিক সমর্থন থাকে না।

বর্তমানে যে বিভিন্ন প্রকার কারবারী জোট কার্যরত দেখিতে পাওয়া যায় উহারা অনেকেই সমাজ-বিরোধী ও মুনাফাবাজী আখ্যা পাইয়া থাকেন। এরূপ পরিস্থিতিতে 'অনুষ্ঠানবর্জিত চুক্তির' পরিবর্তে সম্ভোগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে অন্য কোনপ্রকার কারবারী জোটের প্রস্তাব করা 'ভাজার কড়াই হইতে আগুনে' (From frying pan to fire) ঝাঁপ দেওয়ার সামিল হইবে। সুতরাং ন্যায্য মূল্যে উপযুক্ত মানের পণ্য যাহাতে সম্ভোগকারিগণ পাইতে পারেন তজ্জন্য সরকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

উৎপাদক সংঘ (Pool)

প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের উৎপাদন, বাজার, মূল্য, লাভ প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের উদ্দেশ্যে যখন সংঘবদ্ধ হয় তখন উহাকে উৎপাদক সংঘ (Pool) আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গঠিত হয় বলিয়া ইহাকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে :

(ক) উৎপাদন সংঘ (Output Pool): ইহার উদ্দেশ্য অতি-উৎপাদন দূর করা। এজন্য সমস্বার্থবিশিষ্ট বিভিন্ন কারবারিগণ উহাদের পণ্যের চাহিদা মোটামুটি স্থির করিয়া সংঘের প্রত্যেক সদস্যার উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করিয়া দিয়া থাকেন। সুতরাং সংঘের সভ্যগণ চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের জন্য একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে আসিয়া যান।

(খ) বাজার সংঘ (Market Pool): ইহার দ্বারা পণ্যের বিভিন্ন বাজার নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। ফলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য বিক্রয়ের এক একটি নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারিত থাকে। যাহার জন্য উহা নির্দিষ্ট হইযাছে সেই প্রতিষ্ঠান ভিন্ন অন্য সদস্যের উক্ত এলাকায় পণ্য বিক্রয়ের অধিকার থাকে না।

(গ) মুনাফা সংঘ (Profit Pool) : এরূপ সংঘে পণ্যের নিম্নতম মূল্য নির্ধারিত থাকে এবং উক্ত মূল্যে হইতে যতটা অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা সম্ভব সে অধিকার দেওয়া থাকে। তবে নিম্নতম মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য সেই পরিমাণ অর্থ বা মুনাফা প্রত্যেক সদস্যকে সংঘে জমা দিতে হয়। উক্ত অর্থ পরে উৎপাদন অনুযায়ী সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

(ঘ) আয় সংঘ (Income Pool)) : এরূপ সংঘে সদস্যগণ তাহাদের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ সংঘের তহবিলে জমা দিয়া থাকেন। ইহাতেও অবশ্য পণ্যের নিম্নতম মূল্য নির্ধারিত থাকে। উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়া পরে উক্ত অর্থ সদস্যদের মধ্যে উৎপাদন অনুযায়ী বণ্টন করা হয়।

(ঙ) অর্থ সংঘ (Money Pool) : ইহার দ্বারা একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হয়। উক্ত সংস্থা ক্রেতাদের নিকট হইতে অর্ডার সংগ্রহ করে। সংস্থার সদস্যদের মধ্যে উক্ত অর্ডার বণ্টন করা হয়। সংস্থা অবশ্য পণ্যের নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দেয় এবং উক্ত নিম্নমূল্যের ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য উহাই সংঘের আয়। সদস্যদের মধ্যে উক্ত আয় নির্দিষ্ট হারে বণ্টন করা হয়।

(চ) যাত্রী-সম্পর্কীয় সংঘ (Traffic Pool) : এরূপ সংঘ পরিবহন সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর করার জন্য গঠিত হয়। ইহার দ্বারা পরিবহণের সমস্ত এলাকা বা রুটগুলি (Routes) সংঘের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া হয়। প্রতিটি রুটের ভাড়াও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

(ছ) পেটেন্ট সংঘ (Patent Pool) : পেটেন্ট অধিকার-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই এরূপ সংঘ গড়িয়া উঠে। ইহার দ্বারা সংঘের সদস্যগণ চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের পেটেন্টের একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন এবং ইহার ফলে আশানুরূপ বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ার চেষ্টায় থাকেন।

(জ) মিশ্র সংঘ (Mixed Pool) : উপরি-উল্লিখিত একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেমন, উৎপাদন, বাজার, মূল্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সংঘ গঠিত হয় উহাকে 'মিশ্র সংঘ' বলে।

মোটের উপর এই জোটগুলি শিল্পজাত **পণ্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ** (**Combination to Control Sales**) করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত।

এরূপ বিভিন্ন প্রকার 'উৎপাদক সংঘের' **বৈশিষ্ট্য** প্রায় একপ্রকার। এরূপ সংগঠন ইচ্ছাধীন। ইহাতে আইনের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। চুক্তি অনুযায়ী কেবল সংঘের নিয়ম বা শর্ত পালনের জন্য ইহারা প্রতিশ্রুত হন। ইহাতে সদস্যদের পৃথক সত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না বা ইহাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। শর্ত ভঙ্গ হইলে কিছু জরিমানার ব্যবস্থা থাকে। তবে সংঘের বাঁধন দৃঢ় নয়। যে-কোন সদস্যের যে-কোন সময়ে সংঘের বন্ধন মুক্ত হওয়ার অধিকার থাকে।

এরূপ সংঘের **সুবিধা** নিম্নরূপ :

(ক) এরূপ চুক্তির ফলে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর হয়।

(খ) এরূপ চুক্তি সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে। কারণ এরূপ চুক্তিবদ্ধতা স্বেচ্ছাধীন। ইহাতে আইনের কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

(গ) সদস্য-প্রতিষ্ঠানের নিজেদের আভ্যন্তরীণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ইহারা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে সংঘের কিংবা এক সদস্যের উপর অন্য সদস্যের অযথা কোন চাপ বা নিয়ন্ত্রণ সহ্য করিতে হয় না।

(ঘ) ইহাতে মূলধন-আধিক্যের (over capitalisation) ভয় থাকে না।

(ঙ) বৃহদায়তন না হইলেও এরূপ সংঘ গঠনের ফলে একযোগে কাঁচামাল ক্রয় ও পরিবহন ব্যয় সম্পর্কে কিছুটা সুবিধা ইহা ভোগ করিতে পারে।

(চ) সদস্যদের মধ্যে বাজার বণ্টন দ্বারা নিকটবর্তী বাজারে পণ্য-বিক্রয় হইলে পরিবহন ব্যয় কম পড়ে বলিয়া পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায় না।

কিন্তু এরূপ সংঘের **অসুবিধা** নিম্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায় :

(ক) ইহার গঠন স্বেচ্ছামূলক এবং এজন্য ইহা সহজেই গঠিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু এরূপ সংঘের বাঁধন বড়ই শিথিল। কারণ ইহা যে-কোন সময় ভঙ্গ হইতে পারে। ফলে ইহার দায়িত্ব সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নাই।

(খ) ইহাতে একচেটিয়া কারবারের সূত্রপাত হয়। ফলে মুনাফালাভই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় এবং ক্রেতাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। ফলে ক্রেতাগণ অত্যধিক মূল্যে জিনিস ক্রয় করিতে বাধ্য হন।

(গ) এরূপ সংঘের সদস্যদের পণ্যের যে নিম্নতম বিক্রয়-মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হয় উহা অদক্ষ কারবারের উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতেই স্থির করা হয়। ফলে ইহাতে দক্ষ ও অদক্ষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয় না। এই নিম্নতম মূল্য প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রেতাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্থির করা হয় না।

(ঘ) ইহার সদস্যদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকায় এবং প্রতিযোগিতা দূর হওয়ায় অদক্ষ প্রতিষ্ঠান অদক্ষই থাকিয়া যায়। তাহাদের উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থা ইহাতে নাই।

(ঙ) এরূপ চুক্তি অনেকক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। গোপনে সদস্যগণ চুক্তির নানারূপ শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন।

(চ) ইহারা একচেটিয়া কারবার করার মনোবৃত্তি লইয়া অগ্রসর হন। ফলে ইহারা সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকেন।

ট্রাস্ট (Trust)

যদি এক বা একাধিক যৌথ কোম্পানীর শেয়ার-গ্রহীতাগণ উক্ত কোম্পানী পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নিজেদের শেয়ারের অধিকাংশ বা সম্পূর্ণ অংশ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের হস্তে অর্পণ করেন তবে উক্ত হস্তান্তরের দ্বারা যে প্রতিষ্ঠান

গঠিত হয় উহাকে **ট্রাস্ট** বলা হয়। এই শেয়ার হস্তান্তরের পরিবর্তে শেয়ার-গ্রহীতাগণ ট্রাস্টের নিকট হইতে সার্টিফিকেট পান। উক্ত সার্টিফিকেট ট্রাস্ট সার্টিফিকেট নামে পরিচিত। এইভাবে শেয়ার অর্পণ বা হস্তান্তরের ফলে ট্রাস্টের পরিচালকবর্গ (Board of Trustees) উক্ত এক বা একাধিক কোম্পানীর পরিচালনার কর্তৃত্ব অর্জন করেন। ট্রাস্ট সার্টিফিকেটের বলে শেয়ার-গ্রহীতাগণ ট্রাস্ট হইতে কোম্পানীর লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন।

ট্রাস্টের বিশেষ **বৈশিষ্ট্য** নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

এরূপ শেয়ার হস্তান্তরের ফলে যে কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তরিত হইল উহার পৃথক সত্তা নষ্ট হয় না। ট্রাস্টের পরিচালকবর্গ এক বা একাধিক কোম্পানীর মালিকও হন না। ইহার দ্বারা কেবল উক্ত কোম্পানীর উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার পান। এই কর্তৃত্ব অবশ্য বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে এবং তদনুসারে ট্রাস্টেরও বিভিন্ন নাম হইয়া থাকে। অনেক শেয়ারের ভোটাধিকার কেবল হস্তান্তর করা হয়। উক্ত ভোটাধিকারের বলে ট্রাস্টের পরিচালকবর্গ সদস্যভুক্ত কোম্পানীগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতে পারেন। এরূপ ভোটাধিকার প্রাপ্ত ট্রাস্টকে 'ভোটিং ট্রাস্ট' (Voting Trust) বলে। আবার কারবার পরিচালনার অধিকারী হইলে উহাকে বলা হয় 'কারবারী ট্রাস্ট' (Business Trust) এবং শেয়ার বিনিময়ের অধিকার পাইলে উহাকে বলা হয় 'শেয়ার বিনিময় ট্রাস্ট' (Share Exchange Trust)। ইহা ছাড়া জোটবন্ধন ট্রাস্ট (Combination Trust)-ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে একটি কোম্পানীর পরিবর্তে কতকগুলি কোম্পানীর শেয়ার ট্রাস্টের পরিচালকবর্গের হস্তে স্থানান্তরিত হয় এবং উহার ফলে উহারা ঐ কোম্পানীগুলির উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ট্রাস্টের বিশেষত জোট বন্ধন ট্রাস্টের জন্মস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। জোটবন্ধনের ট্রাস্ট অবশ্য সেখানে বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। তখন উহার পরিবর্তে হোল্ডিং কোম্পানীর প্রবর্তন হয়।

ট্রাস্টের **সুবিধাগুলি** নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(ক) ইহাও প্রতিযোগিতা হ্রাসের একটি পন্থা। কারণ যাহারা ট্রাস্টের অন্তর্গত তাহাদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এক।

(খ) পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এক হস্তে সমর্পিত হওয়ায় সকলের পক্ষে একই প্রকার নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজসাধ্য হয়।

(গ) ইহা এইভাবে দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ বলিয়া ইহার স্থায়িত্ব লাভের সম্ভাবনা বেশী থাকে। ফলে ইহার পক্ষে দীর্ঘমিয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় এবং নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী কার্যে অগ্রসর হওয়াও সম্ভব হয়।

(ঘ) ইহাতে এইভাবে বিভিন্ন কোম্পানীর একত্রীকরণ ঘটে বলিয়া ইহার পক্ষে পর্যাপ্ত মূলধনের উপর কর্তৃত্ব করা সম্ভব হয়।- এজন্য ইহা বৃহদায়তন উৎপাদন ও বণ্টনের সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে।

(ঙ) উৎপাদনের উপর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব থাকায় ইহা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে। এইভাবে ইহা পণ্যের মূল্যের উপরও নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করিতে পারে।

(চ) উপরি-উক্ত সুবিধার দরুণ ইহা শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব কেন্দ্রীকরণ সৃষ্টি করিতে পারে।

কিন্তু ইহার নিম্নলিখিত **অসুবিধাগুলিও** আছে।

(ক) ইহার অভূতপুর্ব কেন্দ্রীয়করণের অর্থ হইতেছে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করা এবং জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে উৎসাহ সৃষ্টি করা।

(খ) ইহার গঠনও বিশেষ জটিলতাপূর্ণ। এজন্য ইহাতে অযথা অনেক অর্থব্যয় হয়।

(গ) অনেকক্ষেত্রে ইহাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধনের সংস্থান ঘটে এবং উহার সুষ্ঠু বিনিয়োগ প্রবল সমস্যার সৃষ্টি করে।

(ঘ) ইহা উহার সদস্য কোম্পানীগুলির উপর নানাভাবে যে প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করিয়া থাকে তাহাতে ইহা পণ্যের মূল্য উচ্চ হারে ধার্য করিয়া জনস্বার্থ-বিরোধী অতিরিক্ত মূনাফা অর্জন করে।

কার্টেল (Cartel)

উৎপাদক সংঘ অর্থাৎ 'পুল' বিক্রয়ের বাজারের উপর সন্তোষজনক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। সুতরাং যখন সরবরাহ ও বিক্রয় বাজারের উপর একাধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি মিলিত হয় এবং পণ্য বিক্রয়ের জন্যও বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তখন উহাকে 'কার্টেল' বা বিক্রয়কারী সংঘ আখ্যা দেওয়া হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে 'পুল' ও 'কার্টেলের' মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। আমেরিকায় যাহা 'পুল', জার্মানীতে তাহা 'কার্টেল'। 'পুলের' মত ইহাও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গঠিত হইতে পারে এবং উদ্দেশ্যভেদে উহাদের পৃথক পৃথক নামকরণও হইয়া থাকে। নিম্নে উহা উল্লিখিত হইল :

(ক) শর্ত কার্টেল (Condition Cartel): এরূপ সংঘ পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে নানারূপ শর্ত আরোপ করিয়া থাকে। এই শর্তের মধ্যে বাট্টার হার, ধারের মিয়াদ, পণ্য বিলির পদ্ধতি কিরূপ হইবে তাহা উল্লিখিত থাকে এবং উক্ত শর্তগুলি সদস্যদের অবশ্য পালনীয়।

(খ) গুণগত কার্টেল (Quality Cartel): এরূপ সংঘের কাজ বিক্রয়যোগ্য পণ্যের গুণগত মান এবং বিভিন্ন মানের পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা এবং সদস্য-দিগকে উক্ত মান ও বিক্রয়মূল্য বজায় রাখার জন্য বাধ্য করা হয়।

(গ) উৎপাদন কার্টেল (Output Cartel): চাহিদার সহিত উৎপাদনের সমতা যাহাতে বজায় থাকে তজ্জন্য এরূপ সংঘ মোট উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করিয়া

সদস্যদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট হারে বণ্টন করিয়া দেয়। ইহা 'Output Pool'-এর অনুরূপ।

(ঘ) বাজার বা আঞ্চলিক কার্টেল (Market or Territorial Cartel): এরূপ সংঘ পণ্যের বাজারকে কতকগুলি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া লয় এবং এক-একটি অঞ্চলে এক-একটি সদস্যকে পণ্য বিক্রয়ের পূর্ণ অধিকার দিয়া দেয়। পণ্যের নিম্নতম মূল্যও স্থির করিয়া দেওয়া সংঘের কাজ। ইহা Market Pool-এর অনুরূপ।

(ঙ) ট্রাফিক সিণ্ডিকেট (Traffic Syndicate): ইহা Traffic Pool-এর অনুরূপ এবং ইহাতে পরিবহনের বিভিন্ন রুট (Route) সদস্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকায় নির্দিষ্ট ভাড়ায় যান চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

(চ) বিক্রয় সিণ্ডিকেট (Selling Syndicate): এরূপ কার্টেলে একটি নির্দিষ্ট নিম্নতম মূল্যে সদস্যগণ উহাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় বিক্রয় সিণ্ডিকেট বা কার্টেল উক্ত পণ্য খরিদ্দারদের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। উক্ত বিক্রয়-জনিত মুনাফা সদস্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাতে বণ্টিত হয়।

কার্টেল জোটও প্রধানত **পণ্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের** (Combination to Control Sales) উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। যে প্রকারের কার্টেলই হউক না কেন উহাদের নিম্নলিখিত **বৈশিষ্ট্য** উল্লেখযোগ্য।

কার্টেল কতকগুলি কারবারী প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইলেও উহার সদস্যগণের পৃথক সত্তা নষ্ট হয় না। মালিকানা ও পরিচালনায় উহাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। কার্টেল সদস্যদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। অন্যান্য বিষয় ছাড়া কার্টেলের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে সদস্যদের উৎপাদন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং একত্রিতভাবে বিক্রয় ব্যবস্থা পরিচালনা করা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার্টেল গঠিত হইতে দেখা যায়। ভারতের সিমেণ্ট মার্কেটিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া একটি কার্টেলের উদাহরণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লৌহ ও ইস্পাত, তাম্র এবং রাসায়নিক শিল্পে কার্টেলের অগ্রগতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের স্টীল ওয়ার্কস্ আন্তর্জাতিক কার্টেলের একটি উদাহরণ।

কার্টেলের ও পুলের মধ্যে আঙ্গিক মিল থাকিলেও উভয়ের মধ্যে কিছুটা গুণগত পার্থক্য আছে। পুল অপেক্ষা কার্টেলের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক অধিকতর নিবিড়। পুল নিজস্ব বিক্রয়কারী সংস্থা সম্পর্কে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করিতে পারে নাই। তজ্জন্য এরূপ ক্ষেত্রে পুল প্রতিযোগিতা বিশেষ হ্রাস করিতে পারে নাই। কার্টেল নিজস্ব বিক্রয়কারী সংস্থা স্থাপন দ্বারা প্রতিযোগিতা হ্রাসে পুল অপেক্ষা অধিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে। কার্টেল জোট পুল অপেক্ষা কিছুটা উচ্চস্তরের।

কার্টেলে নিম্নলিখিত **সুবিধাগুলি** দেখিতে পাওয়া যায়:

(ক) ইহার গঠন স্বেচ্ছাধীন। ইহাতে আইনের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ফলে

ইহার গঠনে কোন জটিলতা নাই। ইহা সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে গঠিত হইতে পারে। ইহার ফলে ইহার গঠনে কোন ব্যয়-বাহুল্যও নাই।

(খ) ইহাতে সদস্যদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। ইহাদের নিজস্ব সত্তাও ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয় না।

(গ) ইহাতে মূলধন আধিক্যের (Over-capitalisation) ভয় থাকে না।

(ঘ) বৃহদায়তন হইলেও এরূপ সংঘ গঠিত হইলে ইহা একযোগে কাঁচামাল ক্রয় ও পরিবহন ব্যয় সম্পর্কে কিছুটা সুবিধা ভোগ করে।

(ঙ) প্রতিযোগিতা হ্রাসে ইহা বিশেষ কার্যকরী। চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া এবং বিক্রয়কারী সংস্থা স্থাপন দ্বারা ইহা প্রতিযোগিতা হ্রাস ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়া থাকে।

(চ) কার্টেল পণ্যের উৎকর্ষ সাধনেও সদস্যদিগকে বিশেষ উৎসাহ দিয়া থাকে। কারণ ইহা পণ্যের গুণাগুণ বিচার করিয়াই সদস্যদের মধ্যে মুনাফা বণ্টন করিয়া থাকে।

(ছ) ইহার সদস্যগণ পণ্য বিক্রয়ের দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া উৎপাদন দক্ষতায় মনোনিবেশ করিতে পারে। আবার বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কার্টেল বাজারে স্থিরতা আনিতে পারে এবং বিক্রয়-ব্যয়ও হ্রাস করিতে পারে।

কিন্তু কার্টেলের নিম্নলিখিত **অসুবিধাগুলিও** আছে :

(ক) স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে ইহা গঠিত হয় বলিয়া অনেকক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠানকে ইহাতে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কার্টেল যোগানের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করিতে পারে না এবং প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ অবসান ঘটাইতে পারে না।

(খ) ইহার গঠন স্বেচ্ছামূলক। এজন্য ইহার গঠন সহজসাধ্য হইলেও ভাঙ্গনও সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। ফলে ইহার দায়িত্ব সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নাই।

(গ) কার্টেল বিশেষ কার্যকরী হইলে একচেটিয়া কারবারের সূত্রপাত হয়। ফলে মুনাফালাভই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় এবং ক্রেতাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে চড়া দামে জিনিস ক্রয় করিতে বাধ্য হন।

(ঘ) কার্টেল গঠনে আবার শিথিলতা দেখা দিলে কার্টেল বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানগুলি নানা উপায় উদ্ভাবন দ্বারা প্রতিযোগিতা তীব্র করিয়া তোলে। এরূপ অবস্থায় সদস্যগণকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখাও সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়ায়। কারণ অনেক সদস্য গোপনে বেশী উৎপাদন করিয়া কমমূল্যে বিক্রয় দ্বারা নিজেদের মুনাফা বাড়াইতে চেষ্টা করে। ইহাতে কার্টেলের স্থায়িত্ব ও বাজারের স্থিরতা কোনটাই বিশেষ কার্যকরী হয় না।

(ঙ) ইহার সদস্যদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকায় কার্টেল উহাদের পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি বা ব্যয়-সঙ্কোচ ব্যাপারে কোন কিছুই করিতে পারে না।

হোল্ডিং কোম্পানী (Holding Company)

যে কোম্পানী অন্য একাধিক কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ারের মালিক হইয়া উক্ত কোম্পানীগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে উহাকে 'হোল্ডিং কোম্পানী' বলে।

হোল্ডিং কোম্পানীর **বৈশিষ্ট্য** নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

ইহাকে অন্য কোম্পানীর অন্তত ৫১ শতাংশ শেয়ারের মালিক হইতে হইবে, কিংবা ইহার পরিচালকমণ্ডলী গঠনপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকিবে। শেয়ারের সহিত অন্তত ৫১ শতাংশ ভোটাধিকারও থাকার প্রয়োজন। ইহার অধীন কোম্পানীগুলির সত্তা ও অস্তিত্ব পৃথকই থাকে। উহারা নামে পৃথক হইলেও কার্যত হোল্ডিং কোম্পানীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। কোন নূতন কোম্পানী গঠন দ্বারা হোল্ডিং কোম্পানী স্থাপিত হইতে পারে, কিংবা কোন পুরাতন কোম্পানী শেয়ার ক্রয়দ্বারা হোল্ডিং কোম্পানীতে রূপান্তরিত হইতে পারে। কয়েকটি যৌথ কোম্পানী মিলিত হইয়াও হোল্ডিং কোম্পানী গঠন করিতে পারে। এইভাবে গঠিত হোল্ডিং কোম্পানী সাধারণ ব্যবসাকার্য চালাইতে পারে কিংবা শুধু হোল্ডিং কোম্পানী হিসাবে কাজ করিতে পারে। ইহা নিজ শেয়ার বিনিময় দ্বারা অন্য কোম্পানীর শেয়ারের মালিক হইতে পারে কিংবা নগদমূল্যে উক্ত শেয়ার ক্রয় করিতে পারে। যে সকল কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডিং কোম্পানী ক্রয় করিয়া থাকে উক্ত কোম্পানীগুলিকে হোল্ডিং কোম্পানীর 'অধীন কোম্পানী' (Subsidiary Companies) বলে।

হোল্ডিং কোম্পানী নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে :

(ক) অবিমিশ্র হোল্ডিং কোম্পানী (Pure Holding Company) : এরূপ হোল্ডিং কোম্পানী কোন উৎপাদন কার্যে লিপ্ত থাকে না। ইহাদের আয়ের উৎস হইতেছে অধীন কোম্পানীগুলি হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ। ইউনাইটেড স্টেটস্ স্টীল কর্পোরেশন এ জাতীয় হোল্ডিং কোম্পানীর উদাহরণ।

(খ) মিশ্র হোল্ডিং কোম্পানী (Mixed Holding Company) : ইহাদের আয়ের উৎস দ্বিবিধ। ইহারা উৎপাদন কার্যেও লিপ্ত থাকে এবং অধীন কোম্পানীগুলি হইতে লভ্যাংশও পাইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ইহার উদাহরণ। ইহাকে কার্যনির্বাহক হোল্ডিং কোম্পানী (Operating, Trading or Management Holding Company)-ও বলা যায়।

(গ) প্রাথমিক হোল্ডিং কোম্পানী (Primary Holding Company) : হোল্ডিং কোম্পানী আবার বিভিন্ন স্তরের থাকিতে পারে। স্তর ভেদে ইহাদের বিভিন্ন নামকরণ হইয়া থাকে। একটি মূল হোল্ডিং কোম্পানীর অধীনে অনেকগুলি কোম্পানী থাকিতে পারে। আবার এই অধীন কোম্পানীগুলির অধীনে একাধিক কোম্পানী থাকিতে পারে। এক্ষেত্রে উপরতন মূল হোল্ডিং কোম্পানীকে বলা হয় প্রাথমিক হোল্ডিং

কোম্পানী। আবার এই প্রাথমিক হোল্ডিং কোম্পানীর অধীন কোম্পানীগুলিকে বলা হয় মধ্যবর্তী হোল্ডিং কোম্পানী (Intermediate Holding Company)। এই মধ্যবর্তী হোল্ডিং কোম্পানী উহার অধীন কোম্পানীগুলির হোল্ডিং কোম্পানী কিন্তু প্রাথমিক কোম্পানীর ইহা অধীন কোম্পানী (Subsidiary Company)।

(ঘ) আদি বা সৃজক হোল্ডিং কোম্পানী (Parent Holding Company): যদি কোন হোল্ডিং কোম্পানী উহার অর্থ বিনিয়োগের জন্য উহার অধীনে একাধিক কোম্পানী সৃষ্টি করে তখন সৃষ্টিকারক হোল্ডিং কোম্পানী আদি বা সৃজক হোল্ডিং কোম্পানী বলিয়া অভিহিত হয়।

(ঙ) সম্মিলিত হোল্ডিং কোম্পানী (Consolidated or Offspring Holding Company): যখন একাধিক যৌথ কোম্পানী উহার অধিকাংশ শেয়ার হস্তান্তর দ্বারা কোন নূতন হোল্ডিং কোম্পানী গঠন করে তখন এই হোল্ডিং কোম্পানীকে সম্মিলিত হোল্ডিং কোম্পানী বলে।

হোল্ডিং কোম্পানীর **সুবিধাগুলি** নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

(ক) ইহা সহজেই গঠিত হইতে পারে। কারণ ইহাতে অধীন কোম্পানীর কোন মতামত প্রয়োজন হয় না। বাজার হইতে অধীন কোম্পানীগুলির শেয়ার ক্রয় করিয়া ইহা অনায়াসে গঠন করা চলে। সুতরাং ইহা শুধু শেয়ার ক্রয় দ্বারা সমৃদ্ধশালী কোম্পানীর মালিক হইতে পারে।

(খ) ইহা প্রকৃতপ্রস্তাবে যৌথ কোম্পানী। এজন্য ইহার পক্ষে যৌথ কোম্পানীর সুবিধা ভোগ করাও সম্ভব হয়।

(গ) অনেকগুলি কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা, বিপণন ও অর্থসংস্থান ব্যাপারে ইহা কর্তৃত্ব করিতে পারে। ইহার ফলে ইহা বৃহদায়তন কারবারের সুবিধা ভোগ করিতে পারে এবং নানাবিধ ব্যয়সঙ্কোচও করিতে পারে। নিজস্ব ও অধীন কোম্পানীর আর্থিক দিক দিয়া ইহা একটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠান।

(ঘ) প্রয়োজনবোধে অধীন কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া দিয়া উক্ত কোম্পানীর লোকসানের ঝুঁকিও ইহা অনায়াসে এড়াইতে পারে।

(ঙ) ইহা অর্থ বিনিয়োগের তুলনায় বিশাল সম্পদের উপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারে।

(চ) ইহার সাহায্য ও সহযোগিতায় অধীন কোম্পানীগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয়। ইহা ছাড়া প্রয়োজনবোধে এক কোম্পানী হইতে অন্য কোম্পানীতে অর্থ বিনিয়োগও করা চলে।

(ছ) অধীন কোম্পানীগুলি তাহাদের নিজেদের পৃথক সত্তা ও অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে এবং উহাদের নিজস্ব সুনামও ভোগ করিতে পারে।

(জ) আপাতদৃষ্টিতে ইহা একচেটিয়া সংস্থা বলিয়া মনে হয় না। এজন্য

ইহাকে সমাজের বা রাষ্ট্রের বিরোধিতা সহ্য করিতে হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাস্ট বেআইনী ঘোষিত হইলে উহা এইভাবে হোল্ডিং কোম্পানীতে রূপান্তরিত হওয়ার সুবিধা ভোগ করে।

(ঝ) ইহা নানাভাবে বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে এবং নিন্দনীয় কাজ-কারবারে লিপ্ত থাকিয়াও নিজের অনিন্দ্যরূপ প্রকাশ করিতে পারে। যেমন মিশ্র কোম্পানীর পক্ষে উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্য উৎপাদক হিসাবে নিজের সুনাম বজায় রাখিতে পারে। পক্ষান্তরে উহার অধীন কোম্পানীর মাধ্যমে নিকৃষ্ট মানের সস্তা পণ্য উৎপাদন করিয়া কিংবা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অন্য দ্রব্য উৎপাদন করিয়া বাজারের সম্প্রদারণ ঘটাইতে পারে।

কিন্তু ইহার কতকগুলি অসুবিধাও আছে। নিম্নের বিবরণ হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে:

(ক) ইহা বিশাল সম্পদের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে কিন্তু এই কর্তৃত্ব দায়িত্বহীন।

(খ) ইহাতে প্রকৃতপ্রস্তাবে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে এবং আপাতদৃষ্টিতে একচেটিয়া মনে না হইলেও উহা যে একচেটিয়া কারবারের উৎসাহ ও প্রশ্রয় দেয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(গ) ইহা অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন অধীন কোম্পানীর মধ্যে আর্থিক লেনদেন দ্বারা হিসাবের গরমিল সৃষ্টি করে

(ঘ) ইহাতে অধীন কোম্পানীর সংখ্যালঘু শেয়ার-গ্রহীতাদের স্বার্থ বা বক্তব্য উপেক্ষিত হইতে দেখা যায়।

(ঙ) আধিপত্য বিস্তারের লোভ ইহাতে সময় সময় এতটা পাইয়া বসে যে, ইহার আয়তন ইহার ফলে অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অথচ অধীন কোম্পানীগুলিকে আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখিতে হয়। এরূপ অবস্থায় ইহাকে ব্যবস্থাপনার ত্রুটি, বিশৃঙ্খলা, কর্মচারীদের অসাধু আচরণ, ব্যয়-বাহুল্য প্রভৃতির সম্মুখীন হইতে হয়।

(চ) অনেকক্ষেত্রে ইহা শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারের লোভে মত্ত হইয়া চড়া সুদে অর্থ সংগ্রহ করে। কিন্তু উক্ত অর্থের সুদ দিতেই সব মুনাফা ফুরাইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় ইহার উন্নয়ন ও রক্ষণমূলক ব্যয় পরিহার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ফলে ইহা আর্থিক সঙ্কটের বিপদজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

(ছ) সাধারণত অধীন কোম্পানীগুলি কোম্পানীর পরিচালনার অনেক ব্যাপারে অজ্ঞ থাকিয়া যায়। যে দ্রব্যাদি বা সম্পত্তি অধীন কোম্পানীর প্রয়োজন উহা পূর্বেই হোল্ডিং কোম্পানী কম মূল্যে ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে অধীন কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অধীন কোম্পানীর শেয়ার লইয়া ইহাকে ফটকাবাজি করিতেও দেখা যায়।

(জ) উপরি-উক্ত উপায় ছাড়া আরও বিভিন্ন উপায়ে উহা অধীন কোম্পানীগুলিকে শোষণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ, আত্মীয় পোষণ ও

উহাদিগকে উচ্চ বেতনে নিয়োগ, অত্যধিক হারে মুনাফা বণ্টন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ট্রাস্ট ও কার্টেলের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Trust and Cartel)

ট্রাস্ট ও কার্টেলের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

ট্রাস্ট	কার্টেল
১। ট্রাস্ট গঠন ব্যয়সাপেক্ষ ও জটিল। ইহাতে অনেকপ্রকার আইন-গত আনুষ্ঠানিকতা প্রয়োজন হয়।	১। কার্টেল গঠনের ব্যয় অল্প। ইহার গঠন সহজ ও সরল। ইহাতে আইনগত আনুষ্ঠানিকতা নাই। কেবল একটা সাধারণ চুক্তির সাহায্যে ইহা গঠিত হইতে পারে।
২। ইহা সাধারণত কোন পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জোট। এরূপ অবস্থায় ইহা পূর্বাপর জোটের পর্যায়-ভুক্ত হইয়া পড়ে।	২। ইহা সাধারণত একই প্রকার পণ্য উৎপাদনে এবং একই স্তরে অবস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জোট। এরূপ অবস্থায় ইহা সমান্তরাল জোটের পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে।
৩। কেবল যৌথ কারবারই ট্রাস্টে যোগদান করিতে পারে।	৩। যে-কোন প্রকার মালিকানা প্রতিষ্ঠান ইহাতে যোগদান করিতে পারে।
৪। ইহাতে যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীভূত হয়।	৪। ইহাতে যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা ও ব্যবস্থা-পনা কেন্দ্রীভূত নহে। শুধু বিক্রয়-ব্যবস্থা ইহাতে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে।
৫। ইহাতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে না।	৫। ইহাতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে।
৬। ইহার আয়ুষ্কাল সাধারণত দীর্ঘ ও স্থায়ী দেখিতে পাওয়া যায়।	৬। ইহার আয়ুষ্কাল সাধারণত স্বল্প ও অস্থায়ী দেখিতে পাওয়া যায়।
৭। ইহার জোট সাধারণত দৃঢ় সংঘবদ্ধ এবং ইহাতে চুক্তি অমান্য করিবার সুবিধা থাকে না।	৭। ইহার জোট সাধারণত শিথিল। তবে চুক্তি অমান্য করিলে সদস্যপদ খারিজ করিয়া দেওয়া ছাড়া অন্য শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা নাই।

ট্রাস্ট	কার্টেল
৮। উৎপাদন ও বিক্রয় উভয় প্রকার কার্যের উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যেই ইহা গঠিত হয়।	৮। উৎপাদন ব্যাপারে ইহারা আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ভোগ করে। কেবল বিক্রয়ের উপর উহা পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।
৯। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের ব্যয়-সঙ্কোচের নীতি ইহার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব।	৯। ইহাতে বিক্রয়ক্ষেত্রে কেবল ব্যয়-সঙ্কোচ সম্ভব। অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। কারণ প্রত্যেকেই অন্য ব্যাপারে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন।
১০। ইহাতে যোগদানকারী কোন প্রতিষ্ঠান ইহা হইতে সহজে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। এজন্য ট্রাস্টের সদস্যসংখ্যা সাধারণত খুব কম থাকে।	১০। ইহাতে যোগদানকারী কোন প্রতিষ্ঠান ইহা হইতে সহজে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। এজন্য ইহার সদস্যসংখ্যা সাধারণত অধিক হয়।
১১। ইহাতে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সদস্য-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উন্নতিমূলক প্রতিযোগিতা থাকে না। ফলে কারবারের উদ্দীপনার হ্রাস ঘটে।	১১। পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রত্যেকের পৃথক থাকে বলিয়া সদস্য-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উন্নতিমূলক প্রতিযোগিতার কোন অবসান হয় না। ফলে কারবারের উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।
১২। ইহার আয়তন ও পরিধি সাধারণত দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।	১২। ইহার আয়তন ও পরিধি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইতে পারে।
১৩। ইহার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে।	১৩। ইহার জন্ম জার্মানীতে।
১৪। জোটবন্ধনের ট্রাস্ট যুক্তরাষ্ট্রে বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।	১৪। ইহা জার্মানীতে বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয় নাই।
১৫। ইহার আয়তন ও পরিধি সীমাবদ্ধ বলিয়া ইহা পণ্যের বাজারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে খুব কমই পারে।	১৫। ইহার আয়তন ও পরিধি খুব বিস্তৃত বলিয়া ইহা পণ্যের বাজারের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারে এবং উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে।

ট্রাস্ট ও হোল্ডিং কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Trust and Holding Company)

ট্রাস্ট ও হোল্ডিং কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

ট্রাস্ট	হোল্ডিং কোম্পানী
১। ইহা গঠনে সকল সদস্য কোম্পানীর সম্মতি প্রয়োজন। এজন্য ইহা গঠন অপেক্ষাকৃত জটিল।	১। ইহা গঠনে ইহার অধীন কোম্পানীগুলির সম্মতি প্রয়োজন হয় না। এজন্য ইহা গঠন অপেক্ষাকৃত সরল।
২। ইহা অছিমণ্ডলী (Board of Trustees) দ্বারা পরিচালিত।	২। ইহা পরিচালকমণ্ডলীর (Board of Directors) দ্বারা পরিচালিত।
৩। ইহা একটি অছি সংস্থা।	৩। ইহা একটি যৌথ কোম্পানী।
৪। সদস্য কোম্পানীর শেয়ারের বিনিময়ে ইহার ট্রাস্ট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।	৪। ইহাতে অধীন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা হয়।
৫। ইহাতে যে শেয়ার সমর্পণ করা হয় তাহাতে ইহার মালিকানা স্বত্ব আসে না।	৫। ইহাতে যে শেয়ার ক্রয় করা হয় তাহাতে ইহার মালিকানা স্বত্ব আসিয়া যায়।
৬। ট্রাস্ট নিজস্ব লাভ বা অর্থ উপার্জনের জন্য গঠিত হয় না। এজন্য ইহার কোন নিজস্ব আয়ও নাই এবং ইহাকে আয়কর দিতে হয় না।	৬। ইহা নিজস্ব লাভ বা অর্থ উপার্জনের জন্য গঠিত হয়। এজন্য ইহার নিজস্ব আয় থাকে এবং ইহার উপর আয়কর দিতে হয়।
৭। ইহা চুক্তিবলে শেয়ার হস্তান্তর দ্বারা সৃষ্টি হয়।	৭। ইহা আইনের বলে শেয়ার ক্রয় দ্বারা সৃষ্টি হয়।
৮। ইহার চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে বিলোপ সাধন হয় না।	৮। ইহা যে-কোন সময়ে শেয়ার বিক্রয় করিয়া বিলোপসাধন ঘটাইতে পারে।
৯। ইহার জন্মস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং তথায় উহা বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।	৯। ট্রাস্ট বেআইনী ঘোষিত হওয়ার পর ইহা স্থাপিত হয় এবং ইহা তথায় বা ভারতে বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয় নাই।

পরস্পর সংযুক্ত পরিচালকগোষ্ঠী (Interlocking of Directorates)

যখন কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অনেকগুলি কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীতে আসন লাভ করে তখন 'পরস্পর স যুক্ত পরিচালকগোষ্ঠীর' সৃষ্টি হয়। টাটা ও বিড়লার মত নয়টি পরিবারে এই জাতীয় 'পরস্পর সংযুক্ত পরিচালকগোষ্ঠী' দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা ৬০০ পরিচালক পদের অধিকারী। এক একজনের পক্ষে ১৫ হইতে ২০টি কোম্পানীর পরিচালক হওয়া সাধারণ রীতি। কেহ কেহ ৩০ হইতে ৫০টি কোম্পানীর পরিচালকও ছিলেন। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, যুক্তরাজ্যে ১০টি এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৯টি কোম্পানীর বেশীতে কেহ পরিচালক নিযুক্ত হন নাই।

ইহাতে সুবিধার মধ্যে দেখা যায় যে, পরিচালকমণ্ডলীতে স্থানলাভের পর ইহারা পরস্পর বুঝাপড়ার দ্বারা একই নীতির দ্বারা ঐ সকল পৃথক কোম্পানীগুলির পরিচালনা করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাতে পরস্পরের মধ্যে একটা সহযোগিতার মনোভাব গড়িয়া উঠে। ফলে কারবারের সমস্যা উহারা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিতে পারেন এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত একই নীতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে শিল্পোন্নতি একটি নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারে। শিল্পের পক্ষে উহা কল্যাণকরই হয়। ইহারা ইহাতে পণ্যের উৎপাদন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের সুবিধা পান। কিন্তু এই ব্যবস্থা অনেকের নিকট অত্যন্ত সমালোচনার বস্তু। অনেকে এই ব্যবস্থা মোটেই পছন্দ করেন না। কারণ ইহা জোটবন্ধনের নানাপ্রকার ত্রুটিপূর্ণ। এই ব্যবস্থার ফলে কোম্পানীগুলির পক্ষে নানাপ্রকার ব্যয়সংকোচ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু এই ব্যয়-সংকোচের সুবিধা শ্রমিক বা সম্ভোগকারিগণ কমই ভোগ করিতে পারেন। ইহাতে পণ্যের মূল্য অযথা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন অযথা নিয়ন্ত্রিত হয়। মুনাফালাভের প্রবৃত্তি ইহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে এবং সম্ভোগকারীদের ও শ্রমিকদের সুবিধার দিকে দৃষ্টি দেওয়া ইহারা মোটেই প্রয়োজনবোধ করেন না। ইহাদের সম্পদ ও প্রভুত্বের দাপটে অন্য প্রতিযোগীরা দাঁড়াইতে পারেন না। ইহার ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হস্তে জাতীয় সম্পদের অধিকাংশ স্থানান্তরিত হয়। নূতন রক্ত এরূপ শিল্পে প্রবেশ-লাভ করিতে পারে না। ইহা নূতন কারবার গঠনে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া থাকে। মোটের উপর ইহারা একচেটিয়া ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়া পড়ে। ভারতে এই জাতীয় ব্যবস্থা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য ইহার কুফল ভারতকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে হইতেছে। ইহার কুফল কিরূপ মারাত্মক দুই একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। ভারতের টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া, সিন্‌হানিয়া, থাপর, ওয়ালচাঁদ প্রভৃতি দশটি শিল্প পরিবার ১৯৫১ সালে ৮৭৬টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করিত। উহাদের মোট আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ২০২ কোটি টাকা। ১৯৫৮ সালে উহাদের ঐ নিয়ন্ত্রণ দাঁড়ায় ৯২৯টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর এবং উহাতে মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৯৭ কোটি টাকা। এইভাবে বিভিন্ন উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, ভারতে অল্পসংখ্যক পরিবার অধিকাংশ শিল্প-বাণিজ্য

প্রতিষ্ঠানের মালিক বা ভাগ্যনিয়ন্তা। সুতরাং অল্পসংখ্যক লোকের হাতে যে ভারতের অধিকাংশ সম্পদ কেন্দ্রীভূত তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ইহা যে জনস্বার্থবিরোধী ভয়াবহ চিত্র—একথা বলাই বাহুল্য। এজন্য ইহা তীব্র সমালোচনার বস্তু। ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার জন্যই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে একথাও বলা চলে। সুতরাং কোম্পানীগুলি যদি ম্যানেজিং এজেন্টদের পরিচালনাধীন থাকিত তবে পরস্পর সংযুক্ত পরিচালকগোষ্ঠীর অবসান ঘটিত বা উহা এড়ান যাইত ইহা বলা দুষ্কর। তবে কোম্পানী আইনে ম্যানেজিং এজেন্টদের উপর নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছিল। এখন কোন ব্যক্তি ২০টির অধিক কোম্পানীর পরিচালক হইতে পারেন না এবং কোন ম্যানেজিং এজেন্টও ১০টি কোম্পানীর অধিক পরিচালনা করিতে পারিত না। ইহাতে পরস্পর 'সংযুক্ত পরিচালকগোষ্ঠীর' তীব্রতা কিছুটা লাঘব হইত এরূপ বলা যাইতে পারে।

স্বেচ্ছামূলক এবং বাধ্যতামূলক জোটের তুলনামূলকভাবে সুবিধা ও অসুবিধা (Comparative advantages and disadvantages of Voluntary and Compulsory Combination)

যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে স্বেচ্ছায় জোট গঠন করে তখন উহাকে 'স্বেচ্ছামূলক জোট' আখ্যা দেওয়া হয়। এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোং লিঃ, মার্টিন বার্ণ লিঃ এজাতীয় জোটের উদাহরণ। কিন্তু যখন সরকারী নির্দেশে বা মধ্যস্থতায় জাতীয় স্বার্থরক্ষার্থে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জোট গঠন করিতে বাধ্য হয় তখন তাহাকে বলা হয় 'বাধ্যতামূলক জোট'। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর সহিত ষ্টীল কর্পোরেশনের একত্রীকরণ একটি বাধ্যতামূলক জোটের উদাহরণ। উভয় প্রকার জোটের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা নিম্নলিখিত উপায়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক জোটের **সুবিধা :**

(ক) ইহার ফলে বৃহদায়তন কারবারের সুবিধা ভোগ করা যায়।

(খ) অতি-উৎপাদনের ঝুঁকিও ইচ্ছামত ইহাতে কম থাকে।

(গ) ইহাতে অদক্ষ কারবারের উচ্ছেদ ঘটে।

(ঘ) ইহার পক্ষে সস্তায় পণ্য বিক্রয় করা সম্ভব হয়।

(ঙ) ইহার ফলে পরস্পরের সমস্যা সমাধানের সহযোগিতা সৃষ্টি হয়।

(চ) এরূপ কারবার জনহিতকর কার্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা দূর করিয়া অপচয় বন্ধ করে।

(ছ) ইহার শেয়ার উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে।

(জ) ইহা দুর্বল প্রতিষ্ঠানের পতন রোধ করিয়া বেকার সমস্যা কিছুটা এড়াইতে পারে।

(ঝ) ইহাতে গবেষণা, কারিগরি জ্ঞান ও পেটেণ্ট বিনিময় প্রভৃতির সুবিধা হয়।

সুতরাং উভয় প্রকার জোটের সুবিধা প্রায় একই প্রকার। তবে 'বাধ্যতামূলক জোট' জাতীয় স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জোটের সুবিধাগুলি ভোগ করিতে চেষ্টা করে। ইহার চেষ্টায় জাতীয় সম্পদের অপচয় দূর হয় এবং মুনাফা লাভ ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় না। কিন্তু স্বেচ্ছামূলক জোট জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা মুনাফালাভকে প্রাধান্য দিয়া সুবিধাগুলিকে ভোগ করিতে চেষ্টা করে। তুলনামূলকভাবে এতদ উভয়ের সুবিধার মধ্যে এখানেই ইহাদের পার্থক্য।

স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক জোটের **অসুবিধা :**

(ক) ইহার ফলে প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্যয় হ্রাস হয় বটে, কিন্তু পণ্যের মূল্য কমে না। সুতরাং সম্ভোগকারীদের উচ্চমূল্যেই জিনিস ক্রয় করিতে হয়।

(খ) ইহার ফলে অনেকক্ষেত্রে অসাধু উপায়ে নূতন প্রতিযোগীদের এরূপ কারবার-ক্ষেত্রে প্রবেশ বন্ধ হয়।

(গ) ইহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাসকমণ্ডলীকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া নিজেদের সুবিধামত আইন পাশ করিয়া লয়।

(ঘ) ইহাতে জাতীয় সম্পদের অসম বণ্টন ঘটে।

(ঙ) ইহাতে শোষণ মনোভাব বৃদ্ধিই পায় এবং শ্রমিক বিক্ষোভ তীব্রতর হয়।

(চ) ইহাতে একচেটিয়া আধিপত্যের সুযোগ ঘটে এবং সম্ভাব্য অদক্ষতাও আরম্ভ হয়।

(ছ) কারবার বৃহদায়তন হইলে ব্যবস্থাপনার ত্রুটিও আরম্ভ হয়।

(জ) ইহাতে অতি মূলধন ও ফটকাবাজারের অসুবিধাও দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঝ) ইহাদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপের জন্য ইহাদিগকে অনেকক্ষেত্রে আইনের কড়াকড়ির মধ্যে পড়িতে হয়।

সুতরাং জোটবন্ধনের সুবিধা জনসাধারণ কমই ভোগ করিয়া থাকে। মুনাফা প্রবৃত্তিই জোটভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পাইয়া বসে। বাধ্যতামূলক জোট রাজনৈতিক কলুষতা বৃদ্ধিতে স্বেচ্ছামূলক জোটের তুলনায় একধাপ উপরেই চলে। এজন্য যে জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক জোট সৃষ্টি হয় উহা কালক্রমে সে স্বার্থ কমই রক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং জোটের সৃষ্টি হইলেই যে উহা জনকল্যাণমূলক হইবে একথা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। উহাদের কার্য দেখিয়া উহা বিচার করিতে হইবে।

সংহতি (Consolidation)

একাধিক কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান উহাদের পৃথক সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া

সম্পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া যে জোটের সৃষ্টি করে উহাকে 'পূর্ণ একীকরণ' বা 'সংহতি' (Consolidation) বলে। পূর্ণসংহতি দুই প্রকারে সংঘটিত হইতে পারে—(১) একত্রীকরণ (Amalgamation) এবং (২) অন্তর্ভুক্তি (Merger)। যখন কোন নবগঠিত কোম্পানীতে মিলনে ইচ্ছুক কোম্পানীগুলি মিলিত হয় তখন উহাকে বলা হয় 'একত্রীকরণ'। আর কোন চালু কোম্পানীর সহিত যদি এক বা একাধিক কোম্পানী মিলিত হয় তখন উহাকে বলা হয় 'অন্তর্ভুক্তি'। এই গঠনপদ্ধতির বিভিন্নতা ছাড়া ইহাদের সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

সুতরাং ছোট ছোট কোম্পানীগুলির যদি একত্রীকরণ বা অন্তর্ভুক্তি হয় তবে উহাতে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি দেখিতে পাওয়া যাইবে :

(ক) ইহাতে কোম্পানীগুলির স্বাতন্ত্র্য ও পৃথক সত্তার বিলোপ ঘটে। ফলে ইহার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীভূত হয়। ইহাতে সকলের পক্ষে একই নীতি গ্রহণ করা এবং চালু করার সুবিধা হয়।

(খ) ইহাতে ব্যয়-সঙ্কোচ হয়, নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর হয়, অদক্ষ কারবার বন্ধ হয় এবং সুষ্ঠুভাবে কারবার পরিচালনায় কোন মতানৈক্যের স্থান থাকে না।

(গ) অন্যান্য জোটে যেমন ক্ষমতা কয়েকজনের হাতে থাকে কিন্তু দায়িত্ব অনেকের হাতে থাকে, এরূপ জোটে সেরূপ কোন অসুবিধা নাই। এখানে ক্ষমতা ও দায়িত্ব একই হস্তে ন্যস্ত থাকে। ফলে ইহার নির্দিষ্ট পথে চলিবার কোন অসুবিধা ঘটে না।

(ঘ) ট্রাস্ট বা হোল্ডিং কোম্পানীতে যেমন একনায়কতন্ত্রের প্রভাব বেশী এখানে তেমনই গণতন্ত্রের প্রভাব বেশী।

(ঙ) ইহাতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে না। ইহার বাহিরে এ জাতীয় অনেক কোম্পানী থাকিয়া যায়। তবে ইহার ফলে সৎ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং সম্ভোগকারিগণ কম মূল্যে পণ্য এবং শ্রমিকগণ ন্যায্য মজুরী পাওয়ার সুবিধা ভোগ করে।

(চ) আর্থিক এবং আইনের দিক দিয়া ইহা একটি সুসংহত ও সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান।

সুতরাং ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষত কয়লাখনিগুলির একত্রীকরণ কিংবা অন্তর্ভুক্তি হইলে উপরি-উক্ত সুবিধাগুলি লাভ হইতে পারিবে। কিন্তু কোন্ অবস্থায় একত্রীকরণ এবং কোন অবস্থায় অন্তর্ভুক্তি কাম্য উহার মীমাংসাও অবশ্য প্রয়োজন। সাধারণত যে অঞ্চলে অর্থনৈতিক আয়তনের বৃহৎ কয়লাখনির নিকট অর্থনৈতিক আয়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কয়লার খনি অবস্থিত সেরূপক্ষেত্রে উক্ত বৃহদায়তন খনির সহিত উপযুক্ত সংখ্যক ক্ষুদ্রায়তনের খনিগুলির অন্তর্ভুক্তি (Merger) এবং যে অঞ্চলে কেবল অর্থনৈতিক আয়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তনের খনি অবস্থিত সেরূপ অবস্থায় উহাদের একত্রীকরণ (Amalgamation) কাম্য। ভারতের অনেকগুলি কয়লাখনির আয়তন উহাদের 'অর্থনৈতিক আয়তন' (Economic Size) অপেক্ষা ছোট। রাণীগঞ্জ ও

ঝরিয়াতে বিশেষত এই প্রকার খনির সংখ্যা অনেক। এজন্য যে সকল খনি প্রতিমাসে অন্ততঃ ১০ হাজার টন কয়লা উত্তোলন করে না এবং যাহাদের ১০০ একরবিশিষ্ট কয়লাখনি নাই তাহাদের একত্রীকরণের জন্য ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত মেহতা কমিটির রিপোর্টে সুপারিশ পাওয়া যায়। উক্ত কমিটি একটি Statutory Collieries Amalgamation Commission স্থাপন ও একত্রিত কয়লাখনিকে অর্থ সাহায্য দেওয়ারও সুপারিশ করেন। ভারত সরকার স্বেচ্ছামূলক একত্রীকরণের জন্য একটি কমিটিও স্থাপন করেন। কিন্তু উহা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। এজন্য সরকার বাধ্যতামূলক একত্রীকরণের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। যাহা হউক, একত্রীকরণ বা অন্তর্ভুক্তি হইলে যে প্রতিষ্ঠানগুলির সকল সমস্যা দূর হইবে এরূপ মনে করার কোন সঙ্গত যুক্তি নাই। কারণ একত্রীকরণ বা অন্তর্ভুক্তির পথেও নানা বাধা-বিপত্তি আসিয়া পড়ে এবং একত্রিত হওয়ার পরেও ইহাদিগকে নানারূপ অসুবিধারও সম্মুখীন হইতে হয়। উহার এরূপ অসুবিধাগুলি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(ক) এরূপ একত্রীকরণ বা অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের অভাবের জন্য ইহা কার্যকরী করা সম্ভব হয় না।

(খ) ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলির সুনাম ইহাতে নষ্ট হয়। প্রতিযোগিতার বাজারে আবার এই নূতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পূর্বের ন্যায় সুনাম অর্জন করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য ছোট প্রতিষ্ঠানের এ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না।

(গ) যে সকল প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইবে তাহাদের মালিকগণ অনেকে বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। এজন্য একত্রিত হওয়ার প্রস্তাব কার্যকরী হয় না।

(ঘ) ইহাতে বাজার বিভাগের কোন সুবিধা নাই। কারণ একত্রিত হওয়ার ফলে ইহা একটি পৃথক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজেদের পৃথক সত্তা ইহাতে অবলুপ্ত হয়। ভবিষ্যতে মতানৈক্য হইলে কারবার ভঙ্গ করা চলে কিন্তু পৃথক করা চলে না।

(ঙ) একত্রিত প্রতিষ্ঠানের নমনীয়তা (flexibility) নষ্ট হয় এবং ইহা অনেকক্ষেত্রে স্থানীয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে না।

(চ) ইহাতে দুর্বল ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকে ত্যাগ করা চলে না, আবার একত্রিত কোম্পানীগুলির প্রতিষ্ঠাধিকারও থাকে না।

(ছ) ইহা কোন প্রকার দায়িত্ব বা ঝুঁকি এড়াইতে পারে না এবং অনেকক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে ইহার উপর চাপিয়া বসে।

(জ) ইহা অনেকক্ষেত্রে অত্যধিক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ফলে ইহা অতি-মূলধনের ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অসুবিধা ভোগ করে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মধ্যেও সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

উপরি-উক্ত অসুবিধার জন্য কয়লাখনিগুলির একত্রীকরণ বিশেষ কার্যকরী হইতেছে না। আবার ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান বলিতে কেবল দুর্বল ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান-গুলিকেই বুঝায় না। অনেক ছোট প্রতিষ্ঠান লাভজনকভাবেও পরিচালিত হয়। সুতরাং জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন না হইলে সকল ছোট প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণ সুপারিশ করা যায় না। এজন্য একত্রীকরণ নীতি বিশেষ বিবেচনার সহিত গ্রহণ করা উচিত।

কার্টেল ও একত্রীকরণ (Cartel and Amalgamation)

কার্টেল এবং একত্রীকরণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে, কার্টেল একত্রীকরণের তুলনায় নিকৃষ্টতর জোট। ইহার সুবিধা শুধু গঠনে। ইহা স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান। এজন্য ইহা সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে অল্প ব্যয়ে গঠিত হইতে পারে। কিন্তু গঠন সহজসাধ্য হইলেও ভাঙ্গনও অনুরূপ সহজসাধ্য ব্যাপার। ইহাতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় না। ফলে যে-কোন অল্প সময়ের মধ্যে ইহা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। এজন্য ইহার স্থায়িত্ব সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নাই। ইহা ছাড়া ইহার অন্যবিধ অসুবিধাও আছে। ইহা একচেটিয়া কারবারের সূত্রপাত করে। উৎপাদন ব্যাপারে ইহা কোন ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে পারে না। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য যোগান ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা অর্জন। সম্ভোগকারীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে ইহা কমই কর্ণপাত করে। কালক্রমে ইহা সমাজবিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইতে থাকে। তখন সরকারী হস্তক্ষেপ ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কানপুর সুগার সিণ্ডিকেটের কুকীর্তি এবং অবশেষে সরকারী হস্তক্ষেপে উহার অবলুপ্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পক্ষান্তরে একাধিক কোম্পানীর স্বাতন্ত্র্য ও পৃথক সত্তা বিসর্জন দিয়া একত্রীকরণের সৃষ্টি হয়। একত্রীকরণের ফলে নানাপ্রকার সুবিধা দেখা দেয়। সাধারণত বাজারে যতগুলি প্রতিষ্ঠান ভালভাবে চলিতে পারে ইহাতে ততগুলি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। ইহার ফলস্বরূপ উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে, দুর্বল ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলির বিলোপ সাধন হয় এবং ইহা বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের নানাপ্রকার সুবিধা ভোগ করে। ইহাতে ক্ষমতা ও দায়িত্বের সমাবেশ ঘটে, গণতন্ত্রের প্রভাব বিস্তার লাভ করে, প্রতিযোগিতার বিলোপ হয় না এবং সম্ভোগকারিগণ কম মূল্যে জিনিস পাইতে পারে ও শ্রমিকগণ ন্যায্য মজুরী পাইতে পারে। তবে ইহাকে আইন নির্ধারিত পথে অগ্রসর হইতে হয়, ইহার গঠনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় এবং নানাবিধ বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়।

সুতরাং উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, উভয়ের উদ্দেশ্য এক নয়। মুনাফালাভ উভয়ের উদ্দেশ্য হইলেও পন্থা বিভিন্ন। প্রতিযোগিতার উচ্ছেদ সাধন করিয়া উচ্চ মূল্য আদায় দ্বারা মুনাফা লাভ করা কার্টেলের মুখ্য উদ্দেশ্য। অপর পক্ষে বিবিধ ব্যয়-সঙ্কোচ ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস দ্বারা মুনাফা লাভ একত্রীকরণের মুখ্য

উদ্দেশ্য। কার্টেলের পরিধি ও ব্যাপকতা দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত। একত্রীকরণের পরিধি সীমিত এবং দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদিও উভয় জোটবন্ধনে জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে তথাপি একত্রীকরণ অপেক্ষা কার্টেলের জনস্বার্থ-বিরোধী কাজ বেশী মারাত্মক। তবে দুইটি জোটের প্রকৃতি একরূপ নয়। কার্টেল সংহতিবিহীন কারবারী সংঘ। একত্রীকরণ পূর্ণসংহতি। এজন্য ইহাদের উদ্দেশ্য এক হইতে পারে না। যেখানে পূর্ণসংহতির অভাব সেখানে সুযোগ-সুবিধা পূর্ণসংহতির তুলনায় স্বাভাবিকভাবেই কিছু কম হইবে। ফলে কার্টেলের তুলনায় একত্রীকরণ কিছুটা বেশী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবে।

কার্টেল ও একীকরণের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Cartel and Consolidation)

কার্টেল ও একীকরণের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে :

কার্টেল	একীকরণ
১। ইহাতে ইহার সদস্যদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে।	১। ইহাতে ইহার সদস্যদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়।
২। ইহা সদস্যদের আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করে না।	২। ইহা সদস্যদের আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করে।
৩। সম্পূর্ণ একচেটিয়া কারবার করা ইহার উদ্দেশ্য।	৩। আংশিক একচেটিয়া কারবার করা ইহার উদ্দেশ্য।
৪। ইহাতে মালিকানা হস্তান্তর হয় না।	৪। ইহাতে মালিকানা হস্তান্তর হয়।
৫। ইহাতে অতি মূলধনের ভয় থাকে না।	৫। ইহাতে অতি-মূলধনের ভয় থাকে।
৬। সদস্যদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হইতে পারে।	৬। সদস্যদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হইতে পারে না।
৭। ইহাতে বিক্রয় ভিন্ন কেন্দ্রীভূত পরিচালনার কোন স্থান নাই।	৭। ইহাতে কেন্দ্রীভূত পরিচালনা স্থান পাইয়া থাকে।
৮। ইহা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর বলিয়া গণ্য হয়।	৮। ইহা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর বলিয়া গণ্য হয় না।
৯। ইহা শিথিল ও অস্থায়ী।	৯। ইহা সুসংবদ্ধ ও স্থায়ী।
১০। ইহার পরিধি দেশ-বিদেশে বিস্তৃত।	১০। ইহার পরিধি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
১১। ইহা সাধারণত সমান্তরাল জোট।	১১। ইহা পূর্বাপর ও সমান্তরাল উভয় জোটই হইতে পারে।
১২। ইহা মন্দার সময়েই বেশী গঠিত হয়।	১২। ইহা মন্দা অথবা তেজী উভয় সময়েই গঠিত হয়।

কারবারী চক্র (Business Ring or Corner)

ইহা কারবারী সংঘের (Business Federation) একটি অঙ্গ। যখন প্রয়োজন-বোধে কোনও সময়ে কিছু সংখ্যক কারবারী একত্রিত হইয়া কোনও পণ্যের যোগানকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের আয়ত্তে আনিয়া উহার কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে তখন উহাকে 'কারবারী চক্র' আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা সাময়িক জোট এবং অল্পকাল স্থায়ী। কার্যসিদ্ধির পর ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। প্রয়োজনবোধে পুনরায় ইহার সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত মুনাফালাভই এরূপ চক্রের উদ্দেশ্য। যখন কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তখন ঐ দ্রব্যের যোগান নিজেদের করায়ত্তে আনিয়া ইচ্ছানুযায়ী বাজারে অল্প অল্প যোগান দিয়া ইহা উচ্চ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে এবং প্রচুর মুনাফা লাভ করে। ইহা ফটকাবাজীর নামান্তর মাত্র। সাধারণত পূজার সময় কলিকাতার বস্ত্র ব্যবসায়িগণ 'বস্ত্রের চক্র' সৃষ্টি করিয়া প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। পাট, তুলা প্রভৃতি কাঁচামালের এরূপ চক্রও দেখিতে পাওয়া যায়।

সমস্বার্থগোষ্ঠী (Community of Interest)

ইহা আংশিক সংহতির একটি উদাহরণ। যখন একাধিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মালিক এরূপ একদল ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পরের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া একযোগে কাজ করে তখন উহাকে বলা হয় 'সমস্বার্থগোষ্ঠী'। ইহার কোন সাংগঠনিক রূপ নাই। ইহা শুধু গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির স্বার্থ বজায় রাখিয়া বিভিন্ন কারবার পরিচালনার বন্ধন। আমেদাবাদ বস্ত্রকল মালিকদের গোষ্ঠী ইহার একটি দৃষ্টান্ত। ইহা সাধারণত তিনটি রূপ পরিগ্রহ করে : (১) পরস্পর সংযুক্ত পরিচালকগোষ্ঠী Interlocking of Directorates), (২) ব্যবস্থাপক সংক্রান্ত গোষ্ঠী (Managerial Integration), (৩) অর্থ-সংক্রান্ত গোষ্ঠী (Financial Integration)। কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটির পরিচালক-মণ্ডলীতে কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আসনলাভ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত পরিচালকগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়। কতকগুলি যৌথ কারবার একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হইলে উহাকে বলা হয় ব্যবস্থাপক-সংক্রান্ত গোষ্ঠী। ম্যানেজিং এজেন্সী ইহার দৃষ্টান্ত। একই আর্থিক সংস্থার অধীনে কতকগুলি যৌথ কারবার থাকিলে উহাকে বলা হয় অর্থ-সংক্রান্ত গোষ্ঠী। সমস্বার্থগোষ্ঠী যে রূপই পরিগ্রহ করুক না কেন ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে নিজেদের পছন্দমত পরিচালক নির্বাচন এবং নিজেদের স্বার্থ সাধিত হয় এরূপ নীতি গ্রহণ।

ব্যবসায়ী সমিতি (Trade Association)

যখন একই জাতীয় ব্যবসায়ে লিপ্ত বিভিন্ন কারবারী প্রতিষ্ঠান নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একই নীতি গ্রহণ করার জন্য সমিতিবদ্ধ হয় তখন উহাকে 'ব্যবসায়ী সমিতি' আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা সাধারণ সমিতিবদ্ধতা

(Simple Association)-র দৃষ্টান্ত। ব্যবসায়ী সমিতির সভ্য হওয়া ইচ্ছাধীন। ইণ্ডিয়ান ফ্লাওয়ার মিলস্ এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন, বেঙ্গল অয়েল মিলস্ এসোসিয়েশন প্রভৃতি এই জাতীয় সমিতি।

বণিক সভা (Chambers of Commerce)

যখন সকল জাতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সাধারণ স্বার্থরক্ষার জন্ম কোন সমিতি গঠিত হয় তখন উহাকে বণিক সভা বলে। ইহার প্রধান কাজ কারবারী নীতি নিজেদের অনুকূলে আনা, পণ্যের বাজার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করা। বণিক সভার সদস্য হওয়া ইচ্ছাধীন এবং সদস্যরা সভার নির্দেশ অমান্য করিলে উহাদের সদস্যপদ নাকচ করিয়া দেওয়া ছাড়া অন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা ইহার নাই। মোটের উপর ইহা সাধারণ সমিতিবদ্ধতা (Simple Association)। বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীজ, ন্যাশনাল চেম্বার্স অব কমার্স, ভারত চেম্বার্স অব কমার্স প্রভৃতি এই জাতীয় বণিক সভা।

শ্রমিক সংঘ (Trade Union)

যখন কারবারের শ্রমিকগণ উপযুক্ত মজুরী, চাকুরির নিরাপত্তা ও চাকুরী-সংক্রান্ত সুখ-সুবিধা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সমিতিবদ্ধ হয় তখন উহাকে শ্রমিক সংঘ বলে। সংঘের সদস্য হওয়া অবশ্য ইচ্ছাধীন। হিন্দ মজদুর সভা, ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রভৃতি শ্রমিক সংঘের উদাহরণ।

ভারতীয় শিল্পে জোটবন্ধন (Combination in Indian Industries)

ভারত এখনও শিল্পে খুব উন্নত নয়। এজন্য শিল্পে উন্নত দেশগুলির মত জোটবন্ধন এখানে বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। ইহার যাহা কিছু অগ্রগতি উহা এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ মন্থর অগ্রগতির বিশেষ কিছু কারণও আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ আমলে ভারতে যে শিল্প-প্রসার হইয়াছে উহাতে অবাধ প্রতিযোগিতার অভাব ছিল। প্রতিযোগিতাই অবশ্য জোটগঠনের অন্যতম প্রধান প্রেরণা। তখন অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক ছিল বিদেশীরা। উহা তাহাদের স্বার্থেই পরিচালিত হইত। পরে ভারতীয়রা শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে কিছুটা প্রতিযোগিতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ম্যানেজিং এজেন্সীর মাধ্যমে এক ধরনের জোট সৃষ্টি হইতে থাকে। ফলে প্রতিযোগিতায় স্তিমিতভাব আসিয়া যায়। ইহা ছাড়া ব্যবসায়িগণের মধ্যে প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবও প্রবল ছিল। শিল্পগুলির আবার বিক্ষিপ্ত অবস্থান এবং ক্ষুদ্র আয়তন আনুষ্ঠানিকভাবে জোটবন্ধনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে শিল্পোন্নতির প্রথম যুগে ভারতে জোটবন্ধনের বিশেষ সার্থক প্রচেষ্টা করা হয় নাই। পরে অবশ্য শিল্পোন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে এবং ব্যবসায়িগণের

মধ্যে জোটবন্ধনের মনোভাব প্রকাশ পাইতে থাকে। এজন্য বিগত দুই-তিন দশকের মধ্যে ভারতে জোটবন্ধন কিছুটা প্রাধান্যলাভ করে। ইহার ফলে যে বিভিন্ন প্রকার জোট ভারতে দেখিতে পাওয়া যায় উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :

১। সমিতিবদ্ধতা (Simple Association) : ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে এরূপ সমিতির এখন অভাব নাই। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি, বণিক সভা, শ্রমিক সংঘ ইত্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত।

২। পুল ও কার্টেল (Pool and Cartel) : এজাতীয় জোটবন্ধন কিছু কিছু আছে। পাট, সিমেন্ট, চিনি, কাগজ প্রভৃতি শিল্পে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন, এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী, ইণ্ডিয়ান পেপার মেকার্স এসোসিয়েশন প্রভৃতি ইহাদের উদাহরণ। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন উক্ত শিল্পের প্রায় ৯০ শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। ডালমিয়া সংঘ সহ এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী প্রায় ৮০ শতাংশ সিমেন্ট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। ইণ্ডিয়ান পেপার মেকার্স এসোসিয়েশন সরকারী অর্ডারভুক্ত মোট উৎপাদনের ২৫ শতাংশের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। তৈলশোধন ও জাহাজী কারবারেও এরূপ সংঘ দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। হোল্ডিং কোম্পানী (Holding Company) : এজাতীয় জোটও কয়লা, তামাক, চা প্রভৃতি শিল্পে দেখিতে পাওয়া যায়। শ ওয়ালেস কোম্পানী, ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানী, ইকুইটেবল কোল কোম্পানী প্রভৃতি এই জাতীয় জোট। ম্যানেজিং এজেণ্টদের উদ্যোগেই প্রধানত ইহারা গড়িয়া উঠিয়াছে। শ ওয়ালেস কোম্পানী কোন কোন চা, কয়লা, কার্পাস; ময়দা শিল্পের ৯৯ শতাংশ শেয়ারের মালিক রহিয়াছে। ইস্পাত শিল্পের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত Steel Authority of India Limited (SAIL) হোল্ডিং কোম্পানী হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৪। পরস্পর সংযুক্ত পরিচালকগোষ্ঠী (Interlocikng of Directorates) : ইহার প্রভাব ভারতে বিশেষ দেখা যায়। ম্যানেজিং এজেণ্টদের প্রভাবেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের মনোনীত একই ব্যক্তি বিভিন্ন কোম্পানীর পরিচালক নিযুক্ত হন। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে এইভাবে নয়টি পবিবারের মধ্যে ৬০০ পরিচালক পদ বণ্টিত হয়, ১০০ জন উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তি ১৭০০ পরিচালক পদ অলঙ্কৃত করেন এবং ১৭টি ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান ৩৫৯টি কোম্পানী পরিচালনা করিতেন। ইহা ছাড়া ম্যানেজিং এজেণ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দুইটি প্রতিষ্ঠান পাট শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতার ২৫ শতাংশ, ছয়টি প্রতিষ্ঠান ৬৬টি চা বাগান, চারিটি প্রতিষ্ঠান ৩০টি কয়লাখনি এবং দুইটি প্রতিষ্ঠান ২০টি সিমেণ্ট কারখানা পরিচালনা করিত।

৫। একত্রীকরণ ও (Amalgamation) অন্তর্ভুক্তি (Merger) : এ জাতীয় সংহতি ভারতে বিশেষ বিস্তার লাভ করে নাই। এরূপ জোট ক্ষেত্রে যাহা

কিছু দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই ম্যানেজিং এজেন্টদের এবং সরকারী প্রচেষ্টায় কার্যকরী হইয়াছে। এরূপ সংহতি কার্পাস, দিয়াশলাই, লৌহ ও ইস্পাত, ব্যাঙ্ক ব্যবসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। বাকিংহাম কর্ণাটিক মিলস, ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড এই জাতীয় সংহতির উদাহরণ।

জোট যেভাবেই গঠিত হউক পূর্বে ইহার প্রভাব ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ অনুভূত না হইলেও সম্প্রতি ইহার কুফল অনেকেই অনুভব করিতেছেন। এতদিন ইহার কুফল দূরীকরণে সরকারও বিশেষ যত্নবান ছিলেন না। সরকারী হস্তক্ষেপে কানপুর সিণ্ডিকেটের অবলুপ্তি একটি বিশেষ ঘটনা। আবার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে জোটের প্রযোজন হইলে সেক্ষেত্রেও সরকারের ভূমিকা খুব প্রসারলাভ করে নাই। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে সরকারী প্রচেষ্টায় ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর সহিত বেঙ্গল স্টীল কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্তি। ইদানীং কালে জোটবন্ধন ক্ষেত্রে সরকারী তৎপরতা কিছুটা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তজ্জন্য কয়েকটি আইনও পাশ হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ন্যায্য মূল্যের জন্য Essential Commodities Act, একচেটিয়া কারবার রোধ করার জন্য The Industries (Development and Regulation) Act, অধিক সংখ্যক কোম্পানীর পরিচালক হওয়া রোধ করার জন্য Companies Act, আর্থিক সংহতি রোধ করার জন্য Capital Issues Act এবং Banking Companies Act উল্লেখযোগ্য। শিল্পক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কতটা কেন্দ্রীভূত করে এবং উহার ফলে একচেটিয়া প্রভাব কিরূপ দেখা যায় তাহার তথ্যানুসন্ধানের জন্য সরকার ১৯৬০ সালে ডঃ পি. সি. মহলানবীশের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। উক্ত কমিটির রিপোর্ট হইতে ভারতে একচেটিয়া কারবারের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। উহাতে ৬৬৩টি ব্যাঙ্কের মধ্যে ১৫টি ব্যাঙ্ক আমানতের ৭৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকারী ক্ষেত্রে নিয়োজিত মূলধনের এক-চতুর্থাংশ ৯০৯টি বেসরকারী কোম্পানীর হাতে—এরূপ নানাবিধ তথ্যবহুল সংবাদ পাওয়া যায়। উক্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এরূপ অবস্থার প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৬৪ সালের মিঃ কে. সি. দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে 'একচেটিয়া অনুসন্ধান কমিশন' (Monopolies Inquiry Commission) গঠন করেন এবং উক্ত কমিশনের রিপোর্ট ১৯৬৫ সালে অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের হস্তগত হয়। ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে একচেটিয়া প্রভাব প্রকট ইহা হইতে উহা জানিতে পারা যায়। ভারত সরকার এখন আইন প্রণয়ন দ্বারা একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় আছেন।

ভারতে শিল্প নিয়ন্ত্রণ (Control of Industries in India)

ভারতে শিল্প নিয়ন্ত্রণের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাইবে যে, বিড়লা, টাটা প্রভৃতি এক ডজন কারবারী প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে।

জোটবন্ধনের ফলেই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। এরূপ পরিস্থিতি কখনই বাঞ্ছিত হইতে পারে না। কারণ ইহাতে একচেটিয়া কারবার প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কুফল হিসাবে জনসাধারণ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। যে যে অসুবিধা ইহার ফলে দেখা দিয়াছে এবং দিতে পারে নিম্নের বিবরণ হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে:

১। **জাতীয় সম্পদের অসম বণ্টন (Unequal distribution of National Resources):** এরূপ একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি হওয়ায় ইহারা অতিরিক্ত মুনাফালাভের অধিকারী হইয়াছে। এইভাবে জাতীয় সম্পদের একটা মোটা অংশ মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের হস্তগত হইয়াছে। জাতীয় সম্পদের এই অসম বণ্টনের ফলে জনসাধারণের স্বার্থ বিপন্ন হইয়াছে। ইহাতে ধনী অধিক ধনী হওয়ার সুযোগ পাইতেছে এবং দরিদ্র ক্রমে দরিদ্রতর হইতেছে। ফলে দেশের মধ্যে দারিদ্র্য ও বেকারসমস্যা অধিকতর বিস্তার লাভ করিতেছে।

২। **শোষণ মনোভাব (Exploitation Motive):** এরূপ একচেটিয়া কারবারী পরিস্থিতির জন্য এই সকল কারবারী প্রতিষ্ঠান সুবিধামত শর্ত আদায় করার অধিকারী হইতেছে। এজন্য কাঁচামাল উৎপাদনকারীরা তাহাদের পণ্যের কম মূল্য এবং শ্রমিকগণ কম মজুরী পাইতেছে। ফলে দরিদ্রকে শোষণ করার মনোভাবই ইহাতে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে।

৩। **উচ্চ মূল্য (High Prices):** ইহাদের অধীনে অনেক বড় বড় কারবারী বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে। উহারা বৃহদায়তনের জন্য উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। ফলে জনসাধারণ কম মূল্যে ভাল জিনিস পাওয়ার আশা করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বেশী মুনাফা অর্জনের লোভে ইহাদিগকে পণ্যের মূল্য উচ্চ হারেই ধার্য করিতে দেখা যায়। সুতরাং ইহাদের নিকট কম মূল্যে জিনিস পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র।

৪। **প্রতিযোগীর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ (Control of entry of Competitors):** জাতীয় সম্পদের অধিকাংশ ইহাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ইহারা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া পড়িয়াছে। উহারা এই ক্ষমতা ও আর্থিক সঙ্গতির দ্বারা অসাধু উপায়ে উহাদের কারবারী ক্ষেত্রে নূতন প্রতিযোগীদের প্রবেশ বন্ধ করিয়া আসিতেছে।

৫। **রাজনৈতিক কলুষতা (Political Corruption):** ইহাদের প্রচুর আর্থিক সঙ্গতি থাকায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলকে প্রচুর অর্থ দিয়া থাকে। ইহার ফলে উক্ত দল ইহাদের বশীভূত হইয়া আসিতেছে এবং শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে যে সকল আইন পাশ হয় প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা উহাদের অনুকূলেই আসিয়া যাইতেছে। ভারতের শাসনব্যবস্থায় এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে টাটা-বিড়লার যে কোন প্রভাব নাই একথা কেহ বলিতে পারে না।

৬। **অদক্ষতা** (Inefficiency) : শিল্পক্ষেত্রে এরূপ পরিস্থিতির জন্য যে জোটের সৃষ্টি হইয়াছে উহাতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র খুবই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে ইহারা যাহা কিছু উৎপাদন করে উহাই বাজারে বিক্রয় হয়। উহার গুণাগুণ বিচার করার সুবিধা ক্রেতাগণ মোটেই পায় না। বাজারে ইহাদের একচেটিয়া কারবারে আধিপত্য স্থাপিত হওয়ায় পণ্যের উৎকর্ষ সাধন করার চেষ্টা ইহাদের আর থাকে না। আত্মীয়-পোষণ-নীতি অনুসৃত হওয়ায় দক্ষতার বিচার-বিবেচনা আর হয় না। ফলে কারবারের দক্ষতাও নষ্ট হইতেছে।

৭। **ব্যবস্থাপনার ত্রুটি** (Managerial Difficulties) : এই একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিগণ কারবারের আয়তন অযথা বৃদ্ধি পাইলেও সেদিকে কোন মনঃসংযোগ করেন না। ফলে অতিকায় কারবার ব্যবস্থাপনার ত্রুটি আসিয়া দেখা দেয়। দক্ষ ব্যক্তি নিয়োগের অভাবে এই ত্রুটি আর দূর হয় না। ইহার কুফল হিসাবে ইহাদের উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে কোন দিনও সুনাম অর্জন করিতে পারিতেছে না এবং বিদেশের প্রতিযোগিতায় ইহাদের হটিয়া আসিতে হইতেছে।

৮। **অতি-মূলধন ও ফটকাবাজীর বিপদ** (Danger of Over-capitalisation and Speculation) : এই ব্যবস্থার ফলে কয়েকটি পরিবারের হাতে প্রচুর মূলধন সমাবেশ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে শিল্পক্ষেত্রে সুষ্ঠু মূলধন নিয়োগ ব্যাহত হইতেছে। অনেকক্ষেত্রে কোন কোন কারবারে অতিরিক্ত মূলধনের যোগানও দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত কোম্পানীগুলির মুনাফা স্বভাবতই মূলধনের তুলনায় কম হইয়া পড়ে। ফলে শেয়ার লইয়া এই সকল বিত্তশালী ব্যক্তিগণ ফটকাবাজী আরম্ভ করেন এবং ইহার দ্বারা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ও জনস্বার্থ উভয়ই ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে।

৯। **সমাজবিরোধী কার্যকলাপ** (Anti-social Activities) : ইহাদিগকে অনেকক্ষেত্রে বাজার ভাগাভাগি করিয়া লইতে দেখা যায়। ইহা ছাড়া ইহাদিগকে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিতে, পণ্যের মূল্য অযথা বৃদ্ধি করিতে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় জাতীয় সম্পদের অপচয় করিতে দেখা যায়। এই প্রকার নানাবিধ সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে ইহারা লিপ্ত থাকে।

সুতরাং দেশের স্বার্থে এই জোট ভঙ্গ করা উচিত এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে যে সমাজ গড়িয়া উঠার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে এই জোটের অবলুপ্তি না হইলে সব কিছুই বানচাল হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। উপরি-উক্তি প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশ মূলধন প্রধান (Capital intensive)। ফলে বেকার সমস্যা তীব্রতর হইতেছে। ইহার জন্য প্রয়োজন শ্রমিক প্রধান (Labour intensive) শিল্প কারখানার বিস্তার। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলেও উহাদের জোট ভঙ্গ করা উচিত।

বড় কারবার (Big Business)

মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক বিত্তশালী হইয়া যখন দেশের শিল্প-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে তখন তাহাদিগকে বৃহৎ কারবারী বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন, টাটা, বিড়লা, ফোর্ড, রকফেলার প্রভৃতি। ইহাদের নিয়ন্ত্রণে যে কারবারগুলি পরিচালিত হয় উহাই বৃহৎ কারবারের পর্যায়ে পড়ে। ইহাদের নিয়ন্ত্রণে যে প্রচুর মূলধন ও সম্পদ বিশিষ্ট কারবার সৃষ্টি হইয়াছে উহাও বৃহৎ কারবার বলিয়া পরিচিত। ইহা ছাড়া ভারতে সরকারী মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণেও কিছু বৃহৎ কারবার সৃষ্টি হইয়াছে, যদিও আমেরিকাতেই বেসরকারী প্রচেষ্টায় এরূপ কারবারের অস্তিত্ব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানেই 'বৃহৎ কারবার' কথাটির নামকরণ এই শতাব্দীর প্রথম দিকে হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক দেশে বড় বড় বিত্তশালী ব্যক্তি তাঁহাদের কারবারের আয়তন বৃদ্ধির জন্য সদাসর্বদা চেষ্টিত। ইঁহারা কখনও প্রচুর মূলধন নিয়োগ করিয়া, কখনও কারবারী জোট সৃষ্টি করিয়া, অবার কখনও বা দক্ষ পরিচালনার দ্বারা কারবারের আয়তন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এরূপ প্রচেষ্টা অনেকক্ষেত্রেই সাফল্যমণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতেও এরূপ প্রচেষ্টার কোন অভাব নাই। দুই একটি উদাহরণ দিলে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। ১৯৫১ সালে ভারতে ১০টি শিল্পপতি পরিবার ৮৭৬টি শিল্প-কারখানার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। উক্ত শিল্প কারখানাগুলির আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ২০২ কোটি টাকা। ১৯৫৮ সালে উক্ত শিল্পপতিগণ ২৯৭ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগে ৯২৯টি কোম্পানীর উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। এই মূলধন সরকারী কারবারে নিযোজিত মোট মূলধনের এক-চতুর্থাংশ। ভারতে প্রায় ৩৬৩টি যৌথমূলধনী ব্যাঙ্ক আছে। উহাদের মধ্যে ১৫টির প্রত্যেকের আমানতের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে। উক্ত আমানত মোট আমানতের ৭৮ শতাংশ। কারবারের আয়তন বৃদ্ধি বা জোট সৃষ্টি হইলে নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধা কারবারিগণ ভোগ করিতে পারেন। ইহাতে পরিচালন দক্ষতা, ব্যয় সঙ্কোচ, পণ্য মূল্য হ্রাস প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে কারবারী, সম্ভোগকারী, রাষ্ট্র, সমাজ সকলেরই উপকৃত হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এরূপ কোন সুবিধা কারবারিগণ ছাড়া অন্য কেহ ভোগ করিতে পারিতেছেন কিনা আমাদের জানা নাই। জোটবন্ধনের ফলে এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে আমরা উচ্চ মূল্যে পণ্য কিনিতে বাধ্য হইতেছি। সুতরাং বৃহৎ কারবার সমাজের মঙ্গল বিধানে নিযুক্ত থাকিলে সকলে ইহাকে সমাজের পক্ষে শ্রেয় বলিয়াই মনে করিবেন। যাহাই হউক কারবার কেন বড় হয় এবং কি কারণে উহা বড় হয় তাহার সপক্ষে আমরা নিম্নলিখিত তিনটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি :

(ক) অনেকক্ষেত্রে প্রচুর মূলধন নিয়োগ দ্বারা প্রথম হইতেই কারবার বৃহৎ আকারে গঠিত হইতে পারে। হিন্দুস্থান মোটরস, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। সুতরাং ইহারা বৃহৎ হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

(খ) ক্রমে ক্রমে প্রচুর মূলধনের সংস্থান ও পরিচালন দক্ষতার ফলে অনেক কারবার ক্ষুদ্র আকার হইতে বৃহৎ আকারে পরিণত হয়। টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। সুতরাং কোন কোন কারবার কালক্রমে বৃহৎ আকার ধারণ করে।

(গ) কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা হ্রাস ও একচেটিয়া কারবার করার উদ্দেশ্যে জোট সৃষ্টি হয়। ইহা স্বেচ্ছামূলকও হইতে পারে কিংবা বাধ্যতামূলকও হইতে পারে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী, এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানী, বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। সুতরাং প্রয়োজনীয় চাপের ফলেই ইহারা বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

সুতরাং এক কথায় বলা চলে, "Some businesses are born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them" অর্থাৎ কোন কোন কারবার বৃহৎ আকারেই জন্মগ্রহণ করে, কোন কোন কারবার বৃহৎ আকার অর্জন করে এবং কোন কোন কারবারের উপর বৃহৎ আকার চাপাইয়া দেওয়া হয়।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. What are the causes of Combination ?

[B. U. B. Com. 1966]

জোটবন্ধনের কারণ কি ?

2. "Competition leads to Combination." Discuss. In this context, mention the types of Combination in India.

[C. U. B. Com. (Pass) 1967]

প্রতিযোগিতা জোটবন্ধন সৃষ্টি করে। আলোচনা কর। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার জোটবন্ধনের নাম উল্লেখ কর।

3. What do you understand by Vertical and Horizontal Combinations ? Give examples. What are their respective advantages ? [C. U. B. Com. (Pass) 1965]

পূর্বাপর ও সমান্তরাল জোটবন্ধন কাহাকে বলে ? উহাদের উদাহরণ দাও। উহাদের প্রত্যেকের কি সুবিধা ?

4. XYZ Steel Company Limited are more or less self-sufficient in regard to raw materials. What type of business expansion you would like to call it and what are its advantages ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1966 , 1970]

XYZ ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড মোটামুটিভাবে উহার কাঁচামাল সম্পর্কে আত্ম-নির্ভরশীল। ইহা-কি প্রকারের কারবার সম্প্রসারণ এবং উহার কি সুবিধা ?

5. The Oil Companies in India have got the same price policy. What type of combination would you call it ? Would you suggest any change in the interests of consumers ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1964]

ভারতের তৈল কোম্পানীগুলি একই মূল্যনীতি গ্রহণ করিয়াছে। উহা কি জাতীয় জোটবন্ধন ? সম্ভোগকারীদের স্বার্থে তুমি কি উহার কোন পরিবর্তন প্রস্তাব কর ?

6. All the Oil Companies in India sell petrol at the same price. What type of combination would you call it and what are its advantages and disadvantages from sellers' and consumers' point of view ? [C. U. B. Com. (Pass) 1966]

ভারতের সব তৈল কোম্পানী একই মূল্যে পেট্রোল বিক্রয় করে। উহা কি জাতীয় জোটবন্ধন এবং বিক্রেতা ও ক্রেতার পক্ষে ইহাতে কি সুবিধা ও অসুবিধা ?

7. Why is the system of interlocking of directorates criticized ? Can such interlocking be avoided when such companies are managed by managing agents

[C. U. B. Com. (Hons.) 1966]

পরস্পর সংযুক্ত পরিচালকগোষ্ঠীর সমালোচনা করা হয় কেন ? এই সকল কোম্পানী ম্যানেজিং এজেণ্ট দ্বারা পরিচালিত হইলে কি এই পরস্পর সংযুক্ত পরিচালক-গোষ্ঠী এড়ান চলে ?

8. Explain the comparative advantages and disadvantages of compulsory combination. Cite at least one instance of the latter type of combination in India. [C. U. B. Com. (Pass) 1965]

স্বেচ্ছামূলক এবং বাধ্যতামূলক জোটের তুলনামূলকভাবে সুবিধা ও অসুবিধা বিশ্লেষণ কর। ভারতের অন্তত একটি বাধ্যতামূলক জোটবন্ধনের উদাহরণ দাও।

9. Would Amalgamation of small units of an industry be always encouraged ? [C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

কোন শিল্পের ছোট প্রতিষ্ঠানগুলির একত্রীকরণ সব সময় উৎসাহ দেওয়া উচিত কি ?

10. India has got a large number of small collieries. Would you advocate their merger or allow the present position to continue ? [C. U. B. Com. (Hons.) 1966]

ভারতে অনেক ছোট ছোট কয়লার খনি আছে। উহাদের অন্তর্ভুক্তি কি সমর্থন কর, না উহারা বর্তমানে যেমন আছে তেমনই থাকিবে ?

11. What is Amalgamation? Does it differ from Merger? In this context, state with reasons which one you will prefer for small collieries in India. [C. U. B. Com. (Hons.) 1969]

একত্রীকরণ কাহাকে বলে? উহা কি অন্তর্ভুক্তি হইতে পৃথক? এই প্রসঙ্গে ভারতের ছোট ছোট কয়লা খনির জন্য তুমি উহার কোন্‌টা পছন্দ কর কারণসহ উত্তর লিখ।

12. Explain the chief differences between Cartel and Consolidation. [B. U. B. Com. 1964]

কার্টেল ও একত্রীকরণের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

13. Indicate the extent of combination movement in Indian industries. Briefly mention the Government Policy on combination in India. [B. U. B. Com. (Hons.) 1966]

ভারতীয় শিল্পে জোটবন্ধন কিরূপ অগ্রসর হইয়াছে বর্ণনা কর। ভারতে জোটবন্ধন সম্পর্কে সরকারী নীতি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

14. In India a dozen business houses control majority of industries. Do you think it a desirable state of affairs? Give reasons for your answer. [C. U. B. Com. (Hons.) 1966]

ভারতে এক ডজন কারবারী প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা কি বাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি? তোমার উত্তরের যুক্তি দেখাও।

15. What is understood by industrial combination to control sales? Explain its features, effects and limitations.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1970]

বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের জন্য শিল্পজোট কাহাকে বলে? উহার বৈশিষ্ট্য, ফল ও ত্রুটি ব্যাখ্যা কর।

16. Analyse the principal causes responsible for the growth of combinations in modern business. Mention the principal forms of such combination in India. [C. U. B. Com, (Hons.) 1972]

আধুনিক কারবারে যে যে প্রধান কারণে জোটবন্ধনের সৃষ্টি হয় উহা বিশ্লেষণ কর। ভারতে বিভিন্ন প্রকার জোটবন্ধনের উল্লেখ কর।

17. Explain the characteristics and advantages of vertical combination. Illustrate your answer.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1973]

পূর্বাপর জোটের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

কারবারের প্রশাসনিক সংগঠন

(Administrative Organisation in Business)

কারবারের প্রশাসনিক সংগঠন এবং উহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য (Administrative Organisation in business and its special features)

কারবার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সংগঠন অবলম্বন করা হয় উহাকে 'প্রশাসনিক সংগঠন' বলে। কারবারের সামগ্রিক নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করা এবং সংগঠনের মাধ্যমে উহা বাস্তবে রূপায়িত করা প্রশাসন (Administration) বা ব্যবস্থাপনার (Management) কাজ। সুতরাং সংগঠন ও প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিকট ও নিবিড়। ইহারা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। কারণ সুষ্ঠু সংগঠন ভিন্ন যেমন প্রশাসনের কার্য চলিতে পারে না, আবার সুষ্ঠু প্রশাসন-ব্যবস্থা ভিন্ন সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ সংগঠন কাঠামো প্রস্তুত করা যায় না।

কারবারের সাংগঠনিক রূপ এবং প্রশাসন-ব্যবস্থা কারবারের প্রকৃতি, আয়তন ও উৎপাদন-পদ্ধতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। কারবারের আয়তন ছোট হইলে উহার সাংগঠনিক কাঠামো এবং প্রশাসন-ব্যবস্থা সরল ও সহজ প্রকৃতির হয়। কিন্তু কারবারের আয়তন বড় হইলে উহার সাংগঠনিক কাঠামো বৃহৎ হয় ও প্রশাসন-ব্যবস্থাও জটিল আকার ধারণ করে। এরূপ অবস্থায় ইহাদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যও পরিলক্ষিত হয়। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে :

১। ইহার প্রথম বৈশিষ্ট্য হইতেছে—কারবারের প্রয়োজনীয় সমুদয় কার্যাবলী মোটামুটি ঠিক করা ও উক্ত কার্যাবলীর স্বরূপ নির্ণয় করা।

২। কার্যের স্বরূপ নির্ণয়ের পর উহাদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য অনুযায়ী উহা সুবিন্যস্ত করা এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগে উহাদিগকে বিভক্ত করা।

৩। কারবার বৃহৎ হইলে মালিক বা প্রধান কার্য-নির্বাহকের পক্ষে এই সকল কার্য একাকী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা কখনই সম্ভব নয়। এজন্য সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী মালিক বা প্রধান কার্য-নির্বাহক তাঁহার কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার এবং কর্তব্য বা দায়িত্বের কিয়দংশ তাঁহার অধস্তন কর্মচারী এবং বিভাগীয় ও উপবিভাগীয় প্রধানদের উপর অর্পণ করিয়া থাকেন। মোটের উপর কোনও পদ্ধতি অনুযায়ী ভারার্পণের নীতি (Principles of Delegation) গৃহীত হয়। ইহার দ্বারা ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর ক্ষমতা

ও দায়িত্বের (Authority and Responsibility) কিছুটা বা অনেকটা অধস্তন কর্মচারীদের নিকট হস্তান্তরিত হয় সত্য, কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, উর্ধ্বতন কর্মচারী যাহা সম্পাদনে অক্ষম তাহাই অধস্তন কর্মচারীর নিকট হস্তান্তরিত হইবে। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে—উর্ধ্বতন কর্মচারীদের ব্যক্তিগত প্রতিভা ও ক্ষমতাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য উহাদিগকে অতিরিক্ত কর্তব্য ও কাজের চাপ হইতে কিছুটা মুক্তি দেওয়া। ইহার ফলে উহারা অধিকতর মনোযোগ সহকারে এবং সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতে পারেন। ইহাতে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দায়িত্ব বোধ ও কর্তব্য পালনে বাধ্যবাধকতাও সৃষ্টি হয়। যিনি কর্তব্যমুক্ত হইলেন তাঁহার অবশ্য ইহার ফলে নিজ দায়িত্ব হ্রাস পায় না। কারণ কর্তব্য হস্তান্তর হইলেও দায়িত্ব কখনই হস্তান্তর হয় না। বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত কর্মচারীদের কর্তৃত্ব, কর্তব্য, দায়িত্ব ও কার্যের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহাদের পদের নামকরণও হইয়া থাকে। এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি পরস্পরের সহিত বিভিন্ন কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বৃহৎ কারবারের সুষ্ঠু প্রশাসনিক সংগঠন গড়িয়া তোলেন। সুতরাং বৃহৎ কারবারে কর্মবিভাগ এবং ক্ষমতা অর্পণ অপরিহার্য কার্যক্রম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

৪। বৃহৎ কারবারের প্রশাসনিক সংগঠনে ক্ষমতা ও দায়িত্ব (Authority and Responsibility) উর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট হইতে ক্রমশ অধস্তন কর্মচারীকে হস্তান্তব করার সময উক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করিয়া দেওযা হয়। আবার অর্পিত দায়িত্ব যাহাতে ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের সমান হয় সে দিকেই দৃষ্টি দিতে হয়। কারণ যিনি ভারার্পণ করেন তিনি নিজের ক্ষমতা ও দায়িত্বের অধিক কিছু অর্পণ করিতে পারেন না। নতুবা ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটিবে এবং ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এইভাবে প্রত্যেক পর্যায়ের উপর অর্পিত ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব এবং কর্তব্য বা দায়িত্বের জন্য তিনি তাঁহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকেন। ইহার ফলেই ব্যবস্থাপনার মধ্যে সামগ্রিক শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় এবং প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়। তবে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব অর্পণ সমান হইলেও অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে অর্পিত কর্তৃত্বের তুলনায় দায়িত্ববোধ অধিক হওয়া সর্বদাই বাঞ্ছনীয়।

৫। কারবার বৃহৎ হইলে এবং বিভিন্ন শাখায বিভক্ত হইলে বিকেন্দ্রীয়করণ (Decentralisation) নীতি অনুসরণ করা হয়। এই নীতি কার্যকরী করিতে অবশ্য কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ক্ষমতা হ্রাসের প্রয়োজন হয়। ইহার ফলে বিভিন্ন বিভাগ নিজেদের কার্য পরিচালনায় অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করে এবং সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী কর্তৃত্ব (Decision-making Authority) কার্যস্থলের নিকটেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে অধস্তন কর্মচারিগণের মধ্যে তাঁহাদের উদ্যোগ প্রদর্শনের সুযোগ ও উৎসাহ সৃষ্টি করা হয় এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত নিজেদের কার্যাবলীর দ্রুত সামঞ্জস্য রক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা ঠিকমত চালু থাকিলে উচ্চতম ক

নির্বাহকদের পক্ষে দৈনন্দিন নির্দেশদানের কার্যে ব্যস্ত না থাকিয়া কারবারের উন্নতির জন্য দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম প্রস্তুতকরণ, কর্মপন্থা-নির্ধারণ, বিভিন্ন কার্যের মান নির্ণয় প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কার্যে মনোনিবেশ করা সহজসাধ্য হয়। কিন্তু বিকেন্দ্রীয়করণের ফলে বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে যাহাতে কোন অসঙ্গতি ও বিরোধ উপস্থিত না হয়, বিভিন্ন বিভাগীয় স্বাধীনতা ভোগের ফলে কারবারের সামগ্রিক স্বার্থ যাহাতে উপেক্ষিত না হয় এবং উহাদের কার্যের নির্দিষ্ট সীমাপ্রাচীর যাহাতে লঙ্ঘিত না হয় তজ্জন্য বিকেন্দ্রীয়করণের সহিত উপযুক্ত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণও থাকা অত্যাবশ্যক। ইহাকে অন্য কথায় বলা হয় 'সংযোজিত বিকেন্দ্রীয়করণ' (Co-ordinated Decentralisation)। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয়করণ (Centralisation) এবং বিকেন্দ্রীয়করণ (Decentralisation)-এর মধ্যে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য 'সংযোজিত বিকেন্দ্রীয়করণ' ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এইভাবেই বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়।

কিন্তু এই সংযোজিত বিকেন্দ্রীয়করণের সাফল্য নির্ভর করে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে সংবাদ 'আদান-প্রদান ব্যবস্থা' (Communication)-র উপর। এই 'আদান-প্রদান ব্যবস্থা' আবার চতুর্মাত্রিক (Four Dimensional)। এই চতুর্মাত্রিকের প্রথম মাত্রার কাজ হইতেছে কারবার-সংক্রান্ত ব্যাপারে অনুসৃত নীতি ও সিদ্ধান্তগুলি সর্বোচ্চস্তর হইতে সর্বনিম্নস্তর পর্যন্ত বিজ্ঞাপিত করা। ইহার দ্বিতীয় মাত্রার কাজ হইতেছে সর্বনিম্নস্তর হইতে সর্বোচ্চস্তরে কর্মচারীদের অভাব, অভিযোগ, নানাবিধ বক্তব্য বিষয় পৌছাইয়া দেওয়া। এই দ্বিমাত্রিক আদান প্রদানের ব্যবস্থা অবশ্য উধ্বাধ (Vertical)। কিন্তু তৃতীয় মাত্রার কাজ অবশ্য সমস্তর-বিশিষ্ট (Horizontal or at the same level)। এই মাত্রার কাজ হইতেছে সমস্তরে অবস্থিত বিভিন্ন কর্মচারীদের মধ্যে যথাযথ সংবাদাদির আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা। চতুর্থ মাত্রার কাজ হইতেছে গভীরতা (depth) বিচার করা অর্থাৎ কারবারের সকল শ্রেণীর ও অংশের মধ্যে উচ্চ মনোবল প্রতিষ্ঠা এবং সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যে সকল নীতি (Principles), কর্মপন্থা (Policies), কার্যক্রম (Programme) ও কার্যপদ্ধতি (Methods) গৃহীত হয় তৎসম্পর্কে বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মচারীদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (action and reaction) অনুধাবন ও অনুসন্ধান করা। এই চতুর্মাত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা বিভিন্ন অংশের মধ্যে যথাযথ সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বৃহৎ কারবারের প্রশাসনিক সংগঠন কাঠামোকে সুদৃঢ় করা হয়।

৬। ভারার্পণ (Delegation) দ্বারা যে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বণ্টন করা হয় উহা যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখার জন্য উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ (Control) প্রয়োজন। কিন্তু কার্যকর নিয়ন্ত্রণের (Effective Control) জন্য ভারার্পণ পরিধি বা নিয়ন্ত্রণ (Span of Delegation or Control) ৬ হইতে ১০ ব্যক্তির মধ্যে বদ্ধ থাকা উচিত। ইহা ছাড়া কারবারের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি সামগ্রিক

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (machinery for overall control) থাকা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠানেই সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা জেনারেল ম্যানেজার থাকিবেন। বিভাগীয় প্রধানগণ তাঁহাদের অধীন কর্মচারীদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং জেনারেল ম্যানেজার সকল বিভাগীয় প্রধানদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিবেন। ইহা ছাড়া সর্বাঙ্গীণ ও সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি অর্থ (Finance), উৎপাদন (Production), উৎকর্ষ (Quality), বণ্টন (Distribution) প্রভৃতি বিষয়ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

বৃহদায়তন কারবারের সংগঠন ও প্রশাসনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপরি-উক্ত ভিত্তিতেই প্রধানত রচিত। কর্তৃত্ব অর্পণ ও দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণের বিভিন্নতা অনুসারে প্রশাসনিক সংগঠন নিম্নলিখিত যে-কোন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে :

(১) রৈখিক সংগঠন বা নিয়ন্ত্রণ (Line Organisation or Control); (২) কর্মী সংগঠন বা নিয়ন্ত্রণ (Staff Organisation or Control); (৩) কার্যভিত্তিক সংগঠন বা নিয়ন্ত্রণ (Functional Organisation or Control); (৪) রৈখিক ও কর্মী সংগঠন বা নিয়ন্ত্রণ (Line and Staff Organisation or Control)।

রৈখিক সংগঠন ও উহার গুণাগুণ (Line Organisation and its Merits and Demerits)

যে সংগঠনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তাঁহার অধীন কর্মচারীদের মধ্যে আদেশদান ও আদেশপালনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় উহাকে 'রৈখিক সংগঠন' (Line Organisation) বলে। এই আদেশদানের ক্ষমতা সংগঠনের সর্বোচ্চস্তর হইতে ধাপে ধাপে (step by step) সর্বনিম্নস্তরে নামিয়া আসে এবং কাজের হিসাবও অনুরূপভাবে ধাপে ধাপে সর্বনিম্নস্তর হইতে সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছায়। অন্য কথায় ইহার কর্মনীতি, কর্মপদ্ধতি, আদেশ ও নির্দেশ নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হয় এবং কর্মিগণের অভাব-অভিযোগ, কর্মের উন্নতি ও অগ্রগতির বিবরণ ঊর্ধ্বমুখে চালিত হয়। এইভাবে প্রতিস্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁহার উপর অর্পিত কার্যের জন্য তাঁহার উপরিতন কর্মচারীর নিকট দায়ী থাকেন এবং উক্ত কার্যসম্পাদনের জন্য তাঁহার অধীন কর্মচারীদের কার্যের তদারক করেন। সুতরাং সমগ্র কাঠামোতে বিভিন্ন পর্যায়ে ঊর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্ক স্থাপন দ্বারা কার্য সম্পাদন করাই রৈখিক সংগঠনের মূলনীতি। লম্বরেখার ন্যায় পর্যায়ক্রমে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব প্রবহমান বলিয়া ইহাকে 'রৈখিক সংগঠন' বলা হইয়া থাকে। ইহা অনেকটা সামরিক সংগঠনের অনুরূপ। এজন্য ইহাকে 'সামরিক সংগঠন' (Military Organisation)-ও আখ্যা দেওয়া হয়। প্রাচীনকাল হইতে এরূপ সংগঠনের উদ্ভব এবং ইহাতে পর্যায়ক্রমে অনেক ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সমাবেশ থাকে বলিয়া ইহাকে 'পরম্পরাগত' (Traditional এবং 'যাজক-তন্ত্র' (Hierarchical) সংগঠন নামেও অভিহিত করা হয়।

এরূপ সংগঠনের **বৈশিষ্ট্য** নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(ক) প্রথমত এরূপ সংগঠন কতকগুলি সুস্পষ্ট বিভাগে বিভক্ত থাকে এবং প্রত্যেক বিভাগ নিজের কর্মক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকে।

(খ) এই বিভাগগুলির শীর্ষে একজন 'জেনারেল ম্যানেজার' থাকেন। এক বিভাগের সহিত অপর বিভাগের যোগাযোগ কেবল জেনারেল ম্যানেজারের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(গ) জেনারেল ম্যানেজারের উপর মালিক থাকেন। মালিক জেনারেল ম্যানেজারের উপর কর্তৃত্বভার অর্পণ করেন এবং জেনারেল ম্যানেজার তাঁহার কাজের জন্য মালিকের নিকট দায়ী থাকেন। কারবারটি যৌথ কোম্পানী হইলে জেনারেল ম্যানেজারের উপরে ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকেন। কোম্পানীর মালিক শেয়ার-গ্রহীতাগণের প্রতিনিধি এবং সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ পরিচালকমণ্ডলীর (Board of Directors) আদেশ-নির্দেশ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মাধ্যমে জেনারেল ম্যানেজারের উপর অর্পিত হয়। জেনারেল ম্যানেজার তাঁহার কাজের জবাবদিহি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিকট পেশ করিতে বাধ্য থাকেন।

(ঘ) প্রত্যেক বিভাগের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী থাকেন। তিনি নিজের বিভাগের এবং তাঁহার অধীন কর্মচারীদের কাজের জন্য জেনারেল ম্যানেজারের নিকট দায়ী থাকেন।

(ঙ) একজন বিভাগীয় প্রধানের অধীনে আবার একাধিক উপবিভাগের জন্য পৃথক পৃথক ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী থাকিতে পারেন। তাঁহারা নিজেদের উপবিভাগের উপর কর্তৃত্ব করেন এবং বিভাগীয় প্রধানের নিকট দায়ী থাকেন।

(চ) প্রতি পর্যায়ে কার্যনির্বাহের জন্য উহার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে উপযুক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। উক্ত লব্ধ ক্ষমতার প্রয়োগ এবং দায়িত্ব সম্পাদন এবং তজ্জন্য জবাবদিহি ছাড়া মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ও কর্মচারীদের অন্য কিছু বিশেষ করিবার থাকে না। পরপৃষ্ঠার ছক হইতে রৈখিক সংগঠনের স্বরূপ স্পষ্ট হইবে :
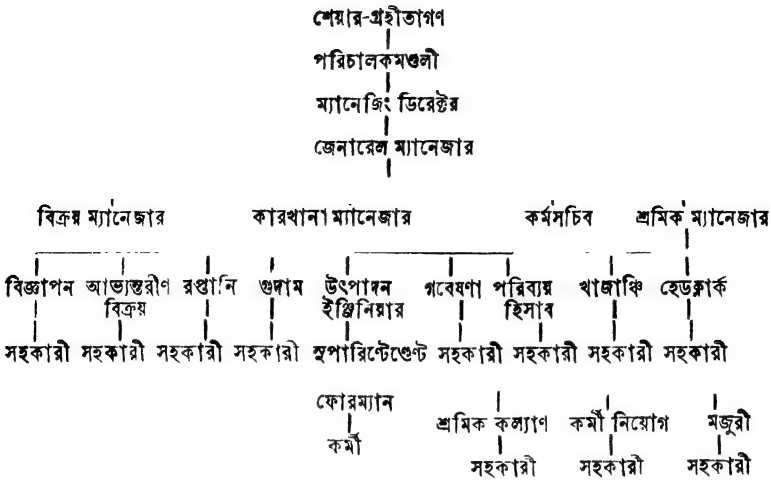
বৈখিক সংগঠনের গুণ বা সুবিধা :

(ক) ইহা প্রাচীনতম, সহজ ও সরল প্রকৃতির সংগঠন।

(খ) ইহা ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি-সমন্বিত নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক কার্য-রত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে খুবই উপযুক্ত।

(গ) ইহাতে প্রত্যেকের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সুস্পষ্ট রেখায় বিভক্ত। ফলে শৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষে ইহা বিশেষ কার্যকরী।

(ঘ) ইহাতে প্রত্যেক পর্যায়ের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে উহার ভারপ্রাপ্ত প্রধানের পূর্ণ ক্ষমতা থাকে। এজন্য কোন সমস্যা বা করণীয় বিষয় সম্পর্কে ইহা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। সমস্যা বা করণীয় বিষয় সম্পর্কে শীঘ্র অবগত হওয়াও ইহার পক্ষে সম্ভব। ফলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনে এবং উহার জন্য দ্রুত কার্য সম্পাদনে এই সংগঠন বিশেষ কার্যকরী।

(ঙ) এরূপ সংগঠনের ব্যয়ও কম। কারণ ইহা দলবদ্ধভাবে কাজ করিবার সুবিধা সৃষ্টি করে। উহার ফলে কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

(চ) ইহাতে কর্মীদের নিম্নস্তর হইতে শীর্ষস্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ-সুবিধা বেশী থাকে।

(ছ) এরূপ সংগঠন ভারপ্রাপ্ত প্রধানগণ বিশেষ পছন্দ করেন। কারণ ইহারা অনেক কর্মীর উপর প্রভুত্ব জাহির করিতে পারেন এবং প্রভুত্বের মহিমা ইহাদিগকে কর্মে প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়া থাকে।

(জ) এরূপ সংগঠনই একমাত্র স্থান যেখানে শৃঙ্খলা ও বাধ্যতা (discipli

and obedience)-বোধ শিক্ষা লাভ হয় এবং বিভিন্ন কার্যে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে উপযুক্ত সংখ্যক ম্যানেজার বা কার্যনির্বাহক সৃষ্টি হয়।

কিন্তু বৈখিক সংগঠনের নিম্নলিখিতরূপ **অসুবিধাগুলি** দেখিতে পাওয়া যায় :

(ক) ইহা অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিনির্ভরশীল সংগঠন। কারণ ইহার প্রতি স্তরে বা পর্যায়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধানের উপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত ও কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে ইহাতে একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচার আত্মপ্রকাশ না করিয়া পারে না এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা বা সুষ্ঠু কার্য সম্পাদনের পরিবর্তে খামখেয়ালির রাজত্ব আসিয়া পড়ে।

(খ) ইহা আদেশ-নির্দেশ পালন করার স্থান। ফলে ইহাতে কর্মীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রকাশ করার সুযোগ থাকে না।

(গ) ইহাতে একই ব্যক্তির উপর নানাপ্রকার কার্যের ভার অর্পণ করা হয়। ফলে ইহাতে কোন বিশেষীকরণের (Specialisation) স্থান থাকে না।

(ঘ) জেনারেল ম্যানেজারের মাধ্যম ছাড়া বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ সাধন ইহাতে সম্ভব নহে। ফলে কর্মসমন্বয়ে বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

(ঙ) বাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষত কারবার বৃহৎ হইলে বিশেষীকরণের প্রয়োজন হয়। কারণ এরূপ কারবারে বিভিন্ন বিভাগকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে গেলে উহা পরিচালনার জন্য সর্বগুণসমন্বিত ব্যক্তির অভাব ঘটিয়া থাকে।

(চ) এরূপ সংগঠনে আমলাতান্ত্রিক লাল-ফিতার (Bureaucratic red-tapism) গলদ প্রবেশ করে। ফলে পরিবর্তনশীলতার সহিত ইহা সহজে খাপ খাওয়াইতে পারে না।

(ছ) ইহাতে ভাল কাজের জন্য পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তি উভয়েরই সুযোগ কম।

(জ) ইহাতে আত্মীয়পোষণ, অনুগ্রহ প্রদর্শন, তোষামোদ, স্তুতিবাদ প্রভৃতি বেশী দেখা যায়।

(ঝ) ইহাতে কোন বিভাগীয় প্রধানকে অনেক কাজ করিতে হয়। ফলে তিনি সব কাজই কিছু কিছু জানেন কিন্তু কোন কাজ ভালভাবে জানেন না (Jack of all trades, master of none)। ইহাতে কাজ কখনই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। ফলে ইহাতে বিশৃঙ্খলাই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্মী সংগঠন এবং উহার সুবিধা ও অসুবিধা (Staff Organisation and its Advantages and Disadvantages)

যে সংগঠনে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ কর্মী থাকেন উহাকে কর্মী সংগঠন (Staff Organisation) বলে। যে কারবারে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রয়োজন তথায় প্রত্যেক বিভাগকে বা সকল বিভাগকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য অন্তত

একজন করিয়া বিশেষজ্ঞও নিযুক্ত করা হয়। এরূপ সংগঠনের বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিত-ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(ক) ইহাতে আদেশ বা নির্দেশ দেওয়ার কোন ক্ষমতা নাই। বিশেষজ্ঞগণ শুধু পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন।

(খ) ইহার কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ। উক্ত কর্তৃত্ব বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের উপর ন্যস্ত থাকে এবং উক্ত বিশেষজ্ঞের বিভাগেই সীমাবদ্ধ থাকে।

(গ) ইহার কর্তৃত্ব ঊর্ধ্বগামী। কিন্তু উক্ত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিবার অধিকার বিশেষজ্ঞদের থাকে না।

(ঘ) এরূপ সংগঠনে কর্মরত ব্যক্তিগণ সাধারণত দুই অংশে বিভক্ত থাকেন। উহা হইতেছে বিশেষ (Special) এবং ব্যক্তিগত (Personal)। বিশেষ ব্যক্তিগণ (Special Staff) উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে নিযুক্ত বিভিন্ন রৈখিক কর্মকর্তাদিগকে (Line Authority) বা পদস্থ ব্যক্তিদিগকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন, হিসাবরক্ষক (Accountant)। এই বিশেষ ব্যক্তি হিসাব-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মচারীদিগকে পরামর্শ দিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কর্মী (Personal Staff) প্রতিষ্ঠানের কতিপয় উচ্চস্তরের কর্মীদের ব্যক্তিগতভাবে সেবা পরিবেশন বা পরামর্শ দিয়া থাকেন। যেমন, জেনারেল ম্যানেজারকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার এক বা একাধিক ঘরোয়া সচিব (Private Secretary or Personal Assistant) থাকিতে পারে।

(ঙ) এই কর্মীভিত্তিক কর্তৃত্ব (Staff Authority) বড়ই বিচিত্র। কারণ তিনি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার নিজ বিভাগ ভিন্ন অন্যান্য বিভাগকে পরামর্শ প্রদান ব্যতীত উহাদের উপর অন্য কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারেন না। কেবল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে থাকেন এবং তাঁহাদের আস্থাভাজন বলিয়াই অন্যান্য কর্মীরা তাঁহাদিগকে সমীহ করিয়া থাকেন। তবে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর পক্ষে সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করা সম্ভব নয় বলিয়া এরূপ কার্যভিত্তিক কর্মীদের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইঁহারা নিজেদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার বলে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

এরূপ সংগঠনের সুবিধা নিম্নরূপ :

(ক) ইহার ফলে বিশেষীকরণের সুবিধা পাওয়া যায়। বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কার্যনির্বাহকদের ইহাতে বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ, নিজেদের পক্ষে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য যে নানাপ্রকার জ্ঞানের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন তাহা ইহাদের মধ্যে কমই থাকে। সুতরাং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লইয়া উঁহারা সে জ্ঞান পূর্ণ করিতে পারেন এবং সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদনে অগ্রসর হইতে পারেন।

(খ) ইঁহারা যে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করেন তাহার জন্য ইঁহারা রৈখিক কর্তৃত্বের

উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। এরূপ নিয়ন্ত্রণ প্রভাব কারবারের সুষ্ঠু পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে।

কিন্তু ইহার নিম্নরূপ **অসুবিধাও আছে :**

(ক) ইহার পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু উক্ত পরামর্শ কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার অধিকার নাই। ফলে প্রয়োগকর্তাদের সহিত প্রায়ই ইহাদের বিরোধ জন্মে।

(খ) এরূপ সংগঠনে স্বভাবতই ব্যয়াধিক্য ঘটে। কারণ প্রয়োগকর্তা ও পরামর্শদাতা উভয় শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের এবং উঁহাদের জন্য বিভিন্ন বিভাগ স্থাপনের প্রয়োজন হয়। ইহার ফলে ব্যয়াধিক্য আসিয়া পড়ে।

কার্যভিত্তিক সংগঠন ও উহার গুণাগুণ (Functional Organisation and its Merits and Limitations)

যেরূপ সংগঠনে কার্যানুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি হয় এবং এরূপ প্রত্যেক বিভাগের ভার উক্ত কাজে বিশেষজ্ঞ এক একজন কর্মচারীর হস্তে অর্পণ করা হয় সেরূপ সংগঠনকে 'কার্যভিত্তিক সংগঠন বলে। রৈখিক সংগঠনের সহিত ইহার প্রধান পার্থক্য এই যে, রৈখিক সংগঠনে কোন একটি বিভাগের যাবতীয় কাজ একজন বিভাগীয় প্রধানের উপর ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু কার্যভিত্তিক সংগঠনে একাধিক বিভাগের একই ধরনের কাজ একজন বিশেষজ্ঞের উপর ন্যস্ত করা হয়। সুতরাং কার্যভিত্তিক নিয়মে কোন কোম্পানীতে যখন কোন ক্রয়-বিভাগ থাকে তখন উক্ত ক্রয়-বিভাগের কর্মকর্তার কাজ হইবে কারবারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য ক্রয় করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ F.W. Taylor রৈখিক সংগঠনের ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে এই কার্যভিত্তিক সংগঠন উদ্ভাবন করেন। ইহার **বৈশিষ্ট্যগুলি** নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(ক) প্রথমত, কার্যানুযায়ী সমগ্র সংগঠনকে প্রয়োজনীয় বিভাগে বিভক্ত করা, যেমন, পরিকল্পনা বিভাগ, উৎপাদন বিভাগ, ক্রয়-বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, শ্রমিক নিয়োগ বিভাগ, গবেষণা বিভাগ, ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ ইত্যাদি। প্রয়োজনমত ইহাদের উপবিভাগও থাকিতে পারে।

ইহা ছাড়া Taylor-এর মতে কোনও কারখানার কাজ সম্পন্ন করিতে আট প্রকারের প্রক্রিয়া (Process) প্রয়োজন হয়। এই আট প্রকারের প্রক্রিয়ার উপর আটজন তত্ত্বাবধায়ক (Foreman) নিযুক্ত রাখাও তিনি আবশ্যক বোধ করেন। উহাদের মধ্যে চারজন থাকিবেন উপর মহলে (upper level) এবং চারজন থাকিবেন নীচের মহলে (lower level)। ইহারা যথাক্রমে (১) সময় ও ব্যয় করণিক (Time and Cost Clerk), (২) নির্দেশদানের কার্ড প্রস্তুতকারক (Instruction Card Man), (৩) কার্যক্রমের করণিক (Route Clerk), (৪) কারখানার শৃঙ্খলারক্ষক

(Shop Disciplinarian), (৫) কর্মীগোষ্ঠী তদারক (Gang Boss), (৬) কর্মের গতি তদারক (Speed Boss), (৭) যন্ত্রপাতি মেরামত তদারক (Repair Boss) ও (৮) পরিদর্শক (Inspector)।

(খ) ইহার প্রত্যেকটি বিভাগ অন্যান্য সকল বিভাগের সেবা করিয়া থাকে, যেমন, শ্রমিক বিভাগ সকল বিভাগের শ্রমিক নিয়োগ করিয়া থাকে। রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ সকল বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করিয়া থাকে।

(গ) এরূপ ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও সহযোগিতা স্থাপিত হয়।

(ঘ) প্রত্যেক বিভাগের ভার একজন বিশেষজ্ঞের হাতে ন্যস্ত থাকে। তিনি সকল বিভাগকে পরামর্শ দান এবং উহাদের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ উভয়ই করিয়া থাকেন।

(ঙ) বিভিন্ন বিভাগকে সেবা ও পরামর্শদান অবশ্য কাজ অনুযায়ী সম্পাদিত হইয়া থাকে।

(চ) ইঁহারা পরামর্শদান ও সেবার কার্য ছাড়া নিজ নিজ বিভাগের সুষ্ঠু কার্য পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন।

কার্যভিত্তিক সংগঠনের সুবিধা নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

(ক) ইহাতে বিশেষীকরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। কারণ যিনি এরূপ কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন তিনি সর্বসময় একটি বিশেষ কাজেই আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। ফলে তিনি ইহাতে বিশেষ বিশেষজ্ঞ হইয়া পড়েন। ইহাতে নিজের এবং বিভাগের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(খ) প্রত্যেক বিভাগ প্রয়োজনমত বিশেষজ্ঞের সেবা ও পরামর্শ পাইয়া থাকে। ফলে প্রত্যেক বিভাগের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(গ) ইহা শুধু পরামর্শদান ও সেবাই করিয়া থাকে না। প্রয়োজনবোধে ইহার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার অধিকারও থাকে। ফলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য-সম্পাদন দ্বারা কারবারের উন্নতির পথ সুগম হইয়া থাকে।

(ঘ) একদিকে বিশেষীকরণ এবং অন্যদিকে শ্রমের দক্ষতা মিলিত হয় বলিয়া ব্যাপক উৎপাদনের পক্ষে এরূপ সংগঠন বিশেষ উপযোগী।

(ঙ) এরূপ সংগঠনে মস্তিষ্কের কাজ এবং কায়িকশ্রমের পৃথকীকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে বিশেষীকরণ উচ্চস্তরে পৌছানোর সুযোগ পায়।

(চ) এখানে প্রত্যেকেই তাহার নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশের সুযোগ পান।

কিন্তু এরূপ সংগঠনের নিম্নলিখিত **অসুবিধাগুলিও** দেখিতে পাওয়া যায়:

(ক) ইহাতে একাধিক বিশেষজ্ঞের অধীনে একটি বিভাগকে কাজ করিতে হয় বলিয়া উহাদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় জটিলতা সৃষ্টি হয়।

(খ) কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির অধীনে বিভাগীয় কর্মীদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকে না বলিয়া কর্মে শৈথিল্য, অবহেলা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(গ) ইহাতে সমমর্যাদাসম্পন্ন বিভাগীয় প্রধানদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(ঘ) বিভাগীয় প্রধানদের উহাদের নিজ নিজ বিভাগ পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে না বলিয়া বিভাগীয় কাজ-কর্মে অদক্ষতা প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(ঙ) কার্যবিভাগও একটি জটিল সমস্যা। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কোন কর্ম-ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

(চ) ইহাতে অযথা নানাপ্রকার কাজের সৃষ্টি হয় এবং দ্বি-আনুগত্যের জন্য কাজের দ্রুততা বিঘ্নিত হয়।

(ছ) এরূপ সংগঠনে কর্মসমন্বয় এক বিরাট সমস্যা।

(জ) এরূপ কার্যভিত্তিক সংগঠনের জন্য ইহাতে বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন উপযুক্ত কার্যনির্বাহক বা ব্যবস্থাপক পাওয়ার অসুবিধাও থাকে।

রৈখিক এবং কর্মী সংগঠন ও উহার গুণাগুণ (Line and Staff Organisation and its Merits and Demerits)

রৈখিক সংগঠন এবং কর্মী সংগঠন এতদ্ উভয়ের সংমিশ্রণে যে সংগঠন সৃষ্টি হয় উহাকে 'রৈখিক ও কর্মী সংগঠন' বলে। রৈখিক সংগঠনে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। এরূপ সংগঠনে কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধানকে উক্ত বিভাগের যাবতীয় কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব বহন করিতে হয়। কিন্তু কারবারের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উহাতে নানাপ্রকার জটিলতা দেখা দেয়। তখন একজন কর্মাধ্যক্ষ বা জেনারেল ম্যানেজারের পক্ষে কারবারের যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনা করা, বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন এবং তদনুযায়ী সর্বদিকে সমান দৃষ্টি রাখিয়া কারবার পরিচালনা করা এক দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। বিভাগীয় প্রধানদেরও অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। এই অবস্থা দূর করার জন্য 'কার্যভিত্তিক সংগঠন' প্রতিষ্ঠা করা চলে। কিন্তু ইহাতে অতিমাত্রায় বিকেন্দ্রীয়করণ প্রশ্রয় পায়। ফলে উহাতে দায়িত্ব নির্দিষ্ট না থাকায় কর্মে শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই উভয়প্রকার সংগঠনের ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে রৈখিক সংগঠনের সহিত বিশেষজ্ঞ নিয়োগের অর্থাৎ কর্মী সংগঠন যুক্ত করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই বিশেষজ্ঞ কর্মিগণ ম্যানেজার ও বিভাগীয় প্রধানদিগকে প্রয়োজনীয় নানাবিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ দিয়া থাকেন। বৃহৎ কারবারে উৎপাদন, বিক্রয় প্রভৃতি বাঁধাধরা কাজ ছাড়া গবেষণা, পণ্যের মান উন্নয়ন, উপাদন-ব্যয়-নিরূপণ প্রভৃতি নানাবিধ কাজের প্রয়োজন হয়। ইহার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। কারবারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ইঁহারা নানা পন্থা উদ্ভাবন করেন। ম্যানেজার ও তাঁহার অধীন কর্মাধ্যক্ষগণ ঐ পন্থাগুলির রূপদান করেন। এইভাবে 'রৈখিক ও কর্মী সংগঠনের' উৎপত্তি বা উদ্ভব হয়।

এরূপ সংগঠনের বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা চলে :

(ক) ইহাতে রৈখিক সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে একজন করিয়া কর্মাধ্যক্ষ থাকেন এবং কর্তৃত্ব প্রবাহ উপর হইতে ধাপে ধাপে নীচে চলিয়া আসে এবং কাজের হিসাবও অনুরূপভাবে নীচ হইতে উপরে চলিয়া যায়।

(খ) উপর হইতে নীচ পর্যন্ত প্রতি পর্যায়ের কর্মাধ্যক্ষকে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য একাধিক বিশেষজ্ঞ কর্মী (Staff Officer) থাকেন।

(গ) এই সকল বিশেষজ্ঞ কর্মীর পদমর্যাদা সমান এবং ইহাদের মধ্যে ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন হিসাবে কোন শ্রেণীবিভাগ থাকে না। ইহাদের কাজ হইল প্রয়োজনমত বিভিন্ন পর্যায়ের কার্য ও কার্যপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা এবং উঁহাদের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা, প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ দান করা। পরামর্শ ও সাহায্য ছাড়া ইঁহাদের কর্তৃত্ব করার কোন অধিকার থাকে না। রৈখিক কর্মাধ্যক্ষগণ ইচ্ছা করিলে উঁহাদের পরামর্শ কার্যকরী নাও করিতে পারেন। সুতরাং বিশেষজ্ঞ কর্মী রৈখিক সংগঠনের অনুপূরক মাত্র।

(ঘ) কিন্তু কারবার পরিচালনায় ইঁহাদের কার্যের গুরুত্ব কোন দিক দিয়াই কম নয়। ইঁহারা নানাবিধ তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ, সরবরাহ, অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা, গবেষণা প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত থাকেন। ইহা ছাড়া নিয়ন্ত্রণ ও কর্মসমন্বয়ে, সাংগঠনিক বিষয়ে, কার্যনির্বাহে এবং কার্যপদ্ধতি নির্ণয়েও ইঁহারা বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন।

নিম্নে চিত্রের সাহায্যে 'রৈখিক ও কর্মী সংগঠনের' একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল :

প্রধান বাস্তুকার (Chief Engineer)	—	সাধারণ ব্যবস্থাপক (General Manager)	—	কর্মী সম্পর্কীয় পরামর্শদাতা (Personnel Adviser)
		|		
বাস্তুকার (Engineer)	—	কারখানা ব্যবস্থাপক (Works Manager)	—	গবেষণা কর্মাধ্যক্ষ (Research Officer)
		|		
কার্যকারী ফোরম্যান (Operational Foreman)	—	সাধারণ ফোরম্যান (General Foreman)	—	উৎপাদন ফোরম্যান (Production Foreman)
		|		
		সাধারণ শ্রমিক (General Workers)		

এখানে সাধারণ ব্যবস্থাপক হইতে পর পর সাধারণ শ্রমিক পর্যন্ত 'রৈখিক সংগঠনের' অন্তর্ভুক্ত। প্রধান বাস্তুকার, কর্মী সম্পর্কীয় পরামর্শদাতা, বাস্তুকার, গবেষণা কর্মাধ্যক্ষ, কার্যকারী ফোরম্যান 'কর্মী সংগঠনের' অন্তর্ভুক্ত।

'রৈখিক ও কর্মী সংগঠনের' **সুবিধা** নিম্নরূপ :

(ক) ইহাতে উভয় সংগঠন যুক্ত হওয়ায় একদিকে কর্তব্য, দায়িত্ব ও ক্ষমতার সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। ইহাতে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং শীঘ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সরল ও সহজ পদ্ধতিতে কার্যনির্বাহের কোন অসুবিধা হয় না। পক্ষান্তরে ইহাতে রৈখিক কর্মাধ্যক্ষদের যাবতীয় বিষয়ের গুরুভার লাঘব করার জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, সাহায্য, গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ, অনুসন্ধান প্রভৃতি কোন কিছুর অভাব হয় না। ফলে বিশেষীকরণ ও কর্মদক্ষতার সুযোগও থাকে।

(খ) ইহাতে একশ্রেণীর উপর চিন্তা করার কাজ (thinking function) এবং অপর শ্রেণীর উপর কার্য করার (doing function) ভার থাকায় কার্যের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার সুবিধা হয়।

(গ) ইহা পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কেও উন্নতি সাধন করিতে পারে।

(ঘ) উভয় প্রকার সংগঠনের ভাল দিকটা গ্রহণ এবং দুর্বলতা পরিহার করার উদ্দেশ্য থাকায় ইহাতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এবং কর্মাধ্যক্ষদের বিচক্ষণতার সংমিশ্রণ ঘটে। এজন্য কারবারের উন্নতি ঠিকপথে অগ্রসর হইতে পারে।

কিন্তু ইহার নিম্নলিখিতরূপ **অসুবিধাগুলিও** আছে :

(ক) ইহাতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ফলে ব্যয়বাহুল্য দেখা দেয়। এজন্য বৃহৎ কারবার ভিন্ন ইহা কার্যকরী করা সম্ভব হয় না।

(খ) যদিও বিশেষজ্ঞদের কোন কর্তৃত্ব করার অধিকার ইহাতে স্বীকৃত হয় না তথাপি বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের পরামর্শ আদেশের সমতুল্য মনে করেন। ইহাতে রৈখিক কর্মাধ্যক্ষদের সহিত ইঁহাদের অনেকক্ষেত্রে বিরোধ উপস্থিত হয়। আবার বিরোধ উপস্থিত না হইলেও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন না করিয়া উঁহাদের মধ্যে কর্মে নিশ্চেষ্টতা দেখা দেয় এবং পরিশেষে এরূপ সংগঠন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

(গ) বিশেষজ্ঞদের কোন দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব না থাকায় উঁহারা পরামর্শ ও সাহায্য-দানে অনেকক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রকাশ করেন। রৈখিক কর্মাধ্যক্ষগণও এরূপ অবস্থায় বিশেষজ্ঞদের উপর দোষ চাপাইয়া কর্মে শৈথিল্য প্রকাশ করেন।

(ঘ) রৈখিক কর্মাধ্যক্ষদের এরূপ পরনির্ভরতা কারবারের উন্নতি ও অগ্রগতিকে প্রতি পদেই ব্যাহত করে।

কর্মী কর্তৃত্ব এবং রৈখিক কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Staff Authority and Line Authority)

কর্মী কর্তৃত্ব এবং রৈখিক কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

কর্মী কর্তৃত্ব	রৈখিক কর্তৃত্ব
১। এই কর্তৃত্বের দ্বারা কোন আদেশ দান বা আদেশ পালনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। ইঁহারা বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিভিন্ন বিভাগকে পরামর্শ দিয়া থাকেন।	১। এই কর্তৃত্বের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তাঁহার অধীন কর্মচারীদের মধ্যে আদেশ দান ও আদেশ পালনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।
২। ইহার মাধ্যমে যে পরামর্শ বিতরণ হয় তাহার দ্বারা রৈখিক কর্তৃত্বের উপর ইহা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ প্রভাব বিস্তার কবিতে পারে।	২। ইহার মাধ্যমে যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার ফলে ইহা কর্মী কর্তৃত্বের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।
৩। রৈখিক কর্তৃত্ব নানাবিধ কার্যভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়িলে ইহাদের সাহায্য ও পরামর্শ প্রয়োজন হয়।	৩। রৈখিক কর্তৃত্ব নানাবিধ কার্যভারে প্রপীড়িত হইলেও কর্মী কর্তৃত্বের পরামর্শ ও সাহায্য ইহার নিকট বাধ্যতামূলক নয়।
৪। ইহার পরামর্শ দেওযার ক্ষমতা আছে কিন্তু উক্ত পরামর্শ কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার অধিকার নাই।	৪। ইহা কর্মী কর্তৃত্বের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য কিন্তু সেই পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে ইহা বাধ্য নয়। ইহা পরামর্শ উপেক্ষাও করিতে পারে।
৫। এরূপ ব্যবস্থায় সংগঠনের ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।	৫। শুধু এরূপ কর্তৃত্ব কোন সংগঠনে থাকিলে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পায় না।
৬। ইহা কোন একক সংগঠন ব্যবস্থা নহে। ইহার সহিত রৈখিক কর্তৃত্ব যোগ করার প্রয়োজন হয়।	৬। ইহা একক সংগঠন ব্যবস্থা। কর্মী কর্তৃত্ব ছাড়াও ইহা চলিতে পারে।
৭। ইহাতে একটি কাজ ভাল-ভাবে সম্পন্ন করার বিশেষ জ্ঞান থাকে।	৭। ইহাতে সব কাজই কিছু কিছু জানার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। একটি কাজ করার মত বিশেষ জ্ঞান ইহাতে কমই থাকে।
৮। ইহার কর্তৃত্ব সমান্তরাল।	৮। ইহার কর্তৃত্ব উর্ধ্বাধ।
৯। ইহাদের মধ্যে উর্ধ্বতন ও অধস্তন কোন শ্রেণীবিভাগ থাকে না।	৯। ইহাতে উর্ধ্বতন ও অধস্তন শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্ট।
১০। ইহাদের কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ।	১০। ইহাদের কর্তৃত্ব ব্যাপক।

সুতরাং রৈখিক কর্তৃত্বের কাজ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন কর্মপন্থা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া এবং উক্ত কর্মপন্থা অনুযায়ী কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে কিনা সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ দ্বারা মূল উদ্দেশ্য সাধন করা। এজন্য ইহাদের কার্যধারার মধ্যে ভারার্পণ ও আদেশ-নির্দেশের কড়াকড়ি দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু কর্মী কর্তৃত্বের কাজ রৈখিক কর্তৃত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে প্রতিষ্ঠানের কার্য সুষ্ঠুভাবে নির্বাহের জন্য সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়া। প্রতিষ্ঠানের কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ হইতেছে কি না তাহা দেখাও ইহার অন্যতম কাজ। এই সাহায্য ও পরামর্শ-দানের কাজ নির্বাহের জন্য ইহাকে নানাবিধ তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করিতে হয়, অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা, গবেষণা প্রভৃতি কাজেও লিপ্ত থাকিতে হয়। ইহা রৈখিক কর্তৃত্বের পরিপূরক হিসাবেই কাজ করিয়া থাকে।

রৈখিক কর্তৃত্ব এবং কর্মী কর্তৃত্বের মধ্যে একক সম্পর্ক স্থাপনের অসুবিধা এবং উহাদের মধ্যে যাহাতে একক সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে তৎসম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা (Difficulties in maintaining a harmonious relationship between Line Authority and Staff Authority and measures that will maintain a harmonious relationship between Line Authority and Staff Authority)

কোন প্রতিষ্ঠানের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে রৈখিক কর্তৃত্বের প্রাধান্য এবং কর্মী কর্তৃত্বের পরামর্শ অত্যাবশ্যক। ছোট প্রতিষ্ঠানে শুধু রৈখিক কর্তৃত্ব হইলে চলে কিন্তু বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে উভয়ের সংমিশ্রণ বিশেষ প্রয়োজন। পরস্পরের মধ্যে সাহায্য ও সখ্যতার মনোভাব লইয়া কাজ করা খুবই সমীচীন। কারণ একটি ভিন্ন অপরটির কাজ ভালভাবে চলা কঠিন। ইহারা একে অন্যের পরিপূরক। এজন্য ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক একত্ববোধ স্থাপন করা উচিত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কারণে এই সম্পর্ক স্থাপনে নানাবিধ বিঘ্ন বা অসুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়:

(ক) রৈখিক কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের কিছুটা আত্মম্ভরিতা আছে। কারবারের সাফল্য ইহাদের চেষ্টার ফলেই সম্ভব—এরূপ ধারণা ইহাদের মধ্যে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য কর্মী কর্তৃত্বের ব্যক্তিদিগকে ইহারা কারবারের সাফল্যের অংশভাগী করিতে চান না। এজন্য রৈখিক কর্তৃত্বের ব্যক্তিগণ কর্মী কর্তৃত্বের সাহায্য ও পরামর্শ অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নন। আর পরামর্শ গ্রহণ করিলেও উহা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন না।

(খ) কর্মী কর্তৃত্বের সাহায্য ও পরামর্শ অনেকক্ষেত্রে অবাস্তব। উক্ত সাহায্য ও পরামর্শ লইয়া রৈখিক কর্তৃত্বের ব্যক্তিগণ কার্যে অগ্রসর হইলে নানাপ্রকার অসুবিধায়

পতিত হন এবং কারবারের মূল উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হন না। ফলে ইহাদের সাহায্য ও পরামর্শ ইহারা আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন না।

(গ) অনেক ক্ষেত্রে কর্মী কর্তৃত্বের পরামর্শ ও সাহায্য রৈখিক কর্তৃত্বের নিকট অনধিকারচর্চা বা উহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করেন।

(ঘ) উভয় কর্তৃত্বের অধিকার, কর্তৃত্ব ও কর্তব্যের পরিধি সব সময়ে ঠিক থাকে না এবং সাধারণভাবে বিভক্ত থাকিলেও অনেকক্ষেত্রে উহা সুস্পষ্ট নহে এবং শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োগও ইহাতে সবসময় দেখিতে পাওয়া যায় না।

সুতরাং সুষ্ঠু কারবার পরিচালনার জন্য উপরি-উক্ত অসুবিধাগুলি দূর করা অবশ্যই প্রয়োজন। এজন্য নিম্নলিখিত কার্যকরী ব্যবস্থা সুপারিশ করা যাইতে পারে :

১। কারবারের বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থই বড় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ তুচ্ছ—এই মনোভাব উভয় কর্তৃত্বের মধ্যে সৃষ্টি করা উচিত।

২। কর্মী কর্তৃত্বে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ করা উচিত। তাহা হইলে অবাস্তব পরামর্শ ও সাহায্যের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে।

৩। ইহাদের পরামর্শ ভিন্ন কারবারের অগ্রগতি ও উন্নতি সম্ভব নহে এবং ইহাদের সাহায্য ও পরামর্শ যে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ইহা হৃদয়ঙ্গম করার ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

৪। কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ইহাদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ রৈখিক কর্তৃত্বের উপর বাধ্যতামূলক করা উচিত।

৫। উভয়ের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৬। মাঝে মাঝে উভয়পক্ষের ব্যক্তিবর্গের মিলিত হওয়া উচিত এবং কারবার পরিচালন ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য ভাবের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

ভারার্পণ (Delegation)

কারবার বৃহৎ হইলে উর্ধ্বতন কর্মচারীর পক্ষে তাঁহার উপর অর্পিত সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সকলক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তখন উঁহার নিজের কর্তব্য কাজের কিছুটা বা অধিকাংশ উঁহার অধস্তন কর্মচারীর উপর অর্পণ করার প্রয়োজন হয়। উক্ত অধস্তন কর্মচারীর কর্তব্য কাজের কিছুটা বা অনেকটা তাঁহার অধীন কর্মচারীর উপর অর্পণ করার প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং একের কাজ অন্যের উপর চাপানোকে ভারার্পণ (Delegation) আখ্যা দেওয়া হয়। বৃহৎ কারবার পরিচালনার ইহা একটি নীতি, প্রক্রিয়া বা মূলবস্তু। ইহার দ্বারাই কোন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে কার্যপরিচালনার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। একজনের পক্ষে যাহা সম্ভব নহে এইভাবে ভারার্পণ দ্বারা একাধিক ব্যক্তির সাহচর্য ও সহযোগিতায় উহার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হয়। এই ভারার্পণের দ্বারা কোন সংগঠন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে এবং কে কোন্ কাজ করিবে তাহা নির্ধারিত হয়। এইভাবে সংগঠন মধ্য হইতে বিশৃঙ্খলা,

আনুগত্যহীনতা ও বিভ্রান্তি দূর হয়। ফলে কর্মীদের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার আগ্রহ জন্মে, নিজেদের আত্মসম্ভ্রমবোধ জাগরিত হয় এবং উহাদের কাজের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নিজেদের কাজের খুঁটিনাটি ব্যাপার হইতে মুক্ত হইয়া ঊর্ধ্বতন কর্মচারিগণও তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রতিভা ও দক্ষতার পূর্ণবিকাশের সুযোগ পান। এই সুযোগ তাঁহাদিগকে অধিকতর মনোযোগ সহকারে এবং সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতে সাহায্য করে।

যখন কোন কর্মচারীর উপর কোন কার্যসম্পাদনের ভার অর্পণ করা হয় তখন উক্ত কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার কর্তব্য ও দায়িত্ব আসিয়া তাঁহার উপর পড়ে। তিনি যখন তাঁহার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ ও ইচ্ছানুযায়ী উক্ত কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি উহার নিকট জবাবদিহি করার জন্যও বাধ্য থাকেন। কোনও ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁহার ঊর্ধ্বতন কর্মচারী কর্তৃক অর্পিত কার্যসম্পাদনের জন্য বাধ্য থাকিলেও উক্ত কাজ তিনি একাকী কখনও সম্পন্ন করিতে পারেন না। তাঁহার অধীন কর্মচারীদের সাহায্যে উহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। অন্য কথায় বলা চলে—তিনি তাঁহার অধীন কর্মচারীদের দ্বারা উহা সম্পন্ন করাইয়া লন। অন্যের দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন করাইতে হইলে তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও থাকা প্রয়োজন। এই কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার বলে তিনি তাঁহার অধীন কর্মচারীকে কার্যসম্পাদনে বাধ্য করিতে পারেন। এই ক্ষমতা না থাকিলে তাঁহার অধীন কর্মচারী কার্যে অবহেলা প্রদর্শন করিলে উপরিতন কর্মচারীর কিছুই করিবার থাকে না এবং তিনি যে কার্যের জন্য অপরের নিকট দায়ী তাহাও তিনি ঠিকমত পালন করিতে পারেন না। ইহার ফলে ভারার্পণের নীতি কার্যকরী করা যায় না। এজন্য কাজের ভার অর্পণ করার সহিত কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা অর্পণ করিতে হয়। সুতরাং ভারার্পণের অন্যতম নীতি হইতেছে অধস্তনের উপর কর্তব্য ও কর্তৃত্ব উভয়ই অর্পণ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন কর্তব্য সম্পাদন সম্ভব নহে। এজন্য বলা হয়—কর্তৃত্ব ছাড়া কর্তব্য ভারার্পণ অর্থহীন। সুতরাং সুষ্ঠু কর্তব্য পালনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃত্ব অর্পণ করাও অবশ্য প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন কর্তব্য সম্পাদন যে নানাভাবে বিঘ্নিত হইবে তাহা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ভারার্পণের প্রথম উপাদান হইতেছে কর্তব্য অর্পণ (delegation of duty)। ভারার্পণকারী তাঁহার নিজ কর্তব্য একাকী সম্পূর্ণ করিতে না পারিলে উক্ত কর্তব্যের কতকাংশ তাঁহার অধীন ব্যক্তিকে অর্পণ করিয়া থাকেন। এই কর্তব্য অবশ্য নির্দিষ্ট আকারেই প্রদান করিতে হয়। এই নির্দিষ্ট আকার কর্তব্যে নিশ্চয়তা আনিয়া দেয়।

ভারার্পণের দ্বিতীয় উপাদান হইতেছে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা প্রদান (Grant of authority)। এই কর্তৃত্বই কার্যসম্পাদনের মূল অস্ত্র।

ভারার্পণের তৃতীয় উপাদান হইতেছে—দায়িত্ব পালন (discharge of respon-

sibility)। অধস্তন কর্মচারী কর্তব্যপালন এবং তজ্জন্য কর্তৃত্বলাভ করিলে উক্ত কর্তব্য পালনের দায়িত্বও উহার উপর আসিয়া পড়ে। এজন্য তিনি তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য দায়ী থাকেন।

ভারার্পণের চতুর্থ উপাদান হইতেছে—হিসাব প্রদান (Accountability)। অধস্তন কর্মচারী তাঁহার কর্তব্য ও কর্মের কতটা দায়িত্ব পালন করিলেন উক্ত কাজের হিসাব পেশ ভিন্ন উহা স্থির করা যায় না। সুতরাং কার্যের ভার গ্রহণ করিলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত কার্যসম্পাদনের একটা হিসাবও দিতে হয়। So duty, authority, responsibility and accountability are inter-linked and inter-woven in delegation. ইহাদের একত্র সমাবেশই সুষ্ঠু কার্য সম্পাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া থাকে এবং ভারার্পণ ফলপ্রদ (effective) হইয়া থাকে।

কর্তব্য, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও হিসাব ভারার্পণের বিভিন্ন উপাদান। ইহার একটি ভিন্ন অপরটি অকার্যকর বা নিষ্ফল বিবেচিত হয়। কোন প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্মাধ্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সমুদয় কর্তব্য ও পূর্ণ কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা স্থাপন করা হয়। তিনিই সব কিছুর জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং হিসাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন। কারবার ছোট হইলে সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব হয়ত তিনি একাকী পালন করিতে পারেন। কিন্তু কারবার বৃহৎ হইলে একজনের পক্ষে এই গুরুদায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। ফলে কর্তব্য-বিভাজন প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আবার শুধু কর্তব্য-বিভাজন দ্বারা সুষ্ঠু কার্যসম্পাদন কখনই সম্ভব নহে। এজন্য প্রয়োজন কর্তৃত্বের সহিত দায়িত্ব অর্পণ। কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যসম্পাদনের আদেশ দিয়া অধস্তন কর্মচারীদের দ্বারা উহা সম্পন্ন করানোর ক্ষমতা থাকে। অধস্তন কর্মচারী যে কাজ করেন তিনি তাঁহার উপরিতন কর্মচারীর আদেশ-নির্দেশ ও ইচ্ছানুযায়ীই উহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অন্য কথায় উপরিতন কর্মচারী অধস্তন কর্মচারীর উপর যে কর্তৃত্ব স্থাপন করেন উহার ফলে কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্বও অর্পণ করেন। সুতরাং কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব (authority and responsibility) পাশাপাশি অবস্থান করে। একটির বিনিময়ে অপরটি পালনের বাধ্যবাধকতা আসিয়া যায়। কর্তৃত্ব ও দায়িত্বকে একসূত্রে গ্রথিত করাই প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনের একটি বিশেষ কর্মপন্থা। ইহাতে একটি উর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্ক (Superior-subordinate relationship) স্থাপিত হয়। কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা নিম্নগামী এবং দায়িত্ব উর্ধ্বগামী অর্থাৎ উর্ধ্বতন কর্মচারী উহার অধস্তন কর্মচারীর উপর কর্তৃত্ব অর্পণ করেন এবং অধস্তন কর্মচারী উহার উর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট দায়িত্ব পালনের জন্য বাধ্য থাকেন। এইভাবে উর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দায়িত্ব ছাড়া কর্তৃত্ব অর্পণ করিলে কর্তৃত্বের সদ্ব্যবহার হয় না এবং উর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট হিসাব পেশ করারও কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। ইহার ফলে কোন্ কাজ কতটা সম্পূর্ণ হইল বা সম্পাদিত

হইল না। তাহার কোন পরিমাপ করাও কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং কর্তৃত্বের সহিত দায়িত্বের সমাবেশ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যসম্পাদনের উপযুক্ত হাতিয়ার। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে। কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) জেনারেল ম্যানেজারকে উক্ত প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করিয়া থাকেন। তিনি হয়ত উক্ত ক্ষমতার কতকাংশ শ্রমিক পরিচালনার জন্য 'পারসোনেল ম্যানেজার'কে অর্পণ করিয়া থাকেন। কোন কারণে শ্রমিক-বিরোধ উপস্থিত হইল। এক্ষেত্রে কি কারণে শ্রমিক-বিরোধ উপস্থিত হইল উহার জবাবদিহির এবং বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব কাহার? পারসোনেল ম্যানেজারকে কর্তৃত্ব দেওয়ার সহিত যদি দায়িত্ব অর্পণ না করা হয় তবে বিরোধের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিবেন এবং উহা ব্যাপকতা লাভ করিবে। কিন্তু তাঁহাকে যদি কর্তৃত্বের সহিত দায়িত্বও অর্পণ করা হয় তবে তিনি আর এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন না এবং তাঁহাকে এজন্য জেনারেল ম্যানেজারের নিকট জবাবদিহি করিতে হয় এবং বিরোধ মীমাংসার পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। আবার কর্তৃত্বের সহিত দায়িত্ব অর্পিত থাকিলে জেনারেল ম্যানেজারও এই বিরোধের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না। কেননা, তাঁহাকে পরিচালকমণ্ডলীর নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে। সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব অর্পিত থাকিলে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পথ সুগম হয়। কেহ কাহারও নিকট দায়ী নহে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইলে বিশৃঙ্খলা, আনুগত্যহীনতা প্রভৃতি যে দেখা দিবে উপরের উদাহরণ হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, দায়িত্ব ভিন্ন কর্তৃত্ব অকার্যকর ও নিষ্ফল এবং সুষ্ঠু কারবার পরিচালনার পরিপন্থী। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঊর্ধ্বতন কর্মচারী তাঁহার কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব অধস্তন কর্মচারীকে অর্পণ করিলেও তাঁহার নিজের দায়-দায়িত্ব ইহাতে হ্রাস পায় না। কর্মসম্পাদন ও কর্তব্য পালনের সর্বশেষ (ultimate) দায়-দায়িত্ব কর্তৃত্ব অর্পণকারীর উপরই থাকিয়া যায়।

প্রশাসনিক কার্যে বিকেন্দ্রীয়করণের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Limitations of Decentralisation in Administrative Functions)

প্রশাসনিক কার্যে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার অভিব্যক্তি দুই প্রকারে প্রকাশ পায়—(১) কেন্দ্রীয়করণ (Centralisation) এবং (২) বিকেন্দ্রীয়করণ (Decentralisation)। কোন সংগঠনে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কার্যালয়ের হস্তে অধিকাংশ কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিলে উহাকে কেন্দ্রীয়করণ বলে। আর উক্ত ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অধিকাংশ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানান্তরিত হইলে উহাকে বিকেন্দ্রীয়করণ বলে। অন্য কথায়—'Everything which goes to increase the importance of the

subordinate's rule is decentralisation, everything which goes to reduce it is centralisation.'[1] অর্থাৎ যাহা কিছু অধস্তনদের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার গুরুত্ব বৃদ্ধি করে উহাই বিকেন্দ্রীয়করণ এবং যাহা কিছু উহা হ্রাস করে তাহাই কেন্দ্রীয়করণ। বিকেন্দ্রীয়করণ অধিক পরিমাণে ভারার্পণ ব্যবস্থার (delegation) নামান্তর মাত্র। অধিক পরিমাণে কর্তৃত্ব একস্থানে পুঞ্জীভূত হইলে কেন্দ্রীয়করণ সৃষ্টি হয়। কিন্তু উহা বিভিন্ন স্থানে, বিভাগে বা পর্যায়ে ছড়াইয়া থাকিলে বিকেন্দ্রীয়করণ সৃষ্টি হয়। সুতরাং ভারার্পণ অপেক্ষা বেশী ক্ষমতা সংরক্ষিত থাকিলে কেন্দ্রীয়করণের উদ্ভব হয়, আর সংরক্ষণ অপেক্ষা বেশী ক্ষমতার ভারার্পণ হইলে বিকেন্দ্রীয়করণের উদ্ভব হয়।

বিকেন্দ্রীয়করণের **সুবিধা** নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

১। ইহাতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্মভার লাঘব হয়। কারবার বৃহৎ হইলে এবং কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীয়করণ না হইলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কিংবা কেন্দ্রীয় কার্যালয়কে অত্যধিক কাজের চাপ সহ্য করিতে হয়। ফলে ইহাদের দক্ষতা নষ্ট হয়।

২। ইহাতে একনায়কতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্রমূলক ভাব সৃষ্টি হয়। ফলে কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব বেশী সৃষ্টি হয় এবং অধস্তনদের মধ্যে উপযুক্তভাবে কর্তৃত্ব করার দক্ষতা দেখা দেয়।

৩। কারবার বৃহৎ হইলে, বিভিন্ন প্রকার পণ্য উৎপাদিত হইলে, উহাদের বাজার বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হইলে, কারখানাগুলি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত হইলে এবং প্রয়োগবিদ্যা (Technology) প্রসারের ফলে কর্তৃত্ব হস্তান্তর অপরিহার্য বিবেচিত হইলে বিকেন্দ্রীয়করণ নীতি ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কারণ তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত দ্রুত সামঞ্জস্য বিধান করার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত ব্যবস্থা।

৪। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ইহাতে দৈনন্দিন কার্যের নির্দেশ দানের কাজে ব্যস্ত না থাকিয়া কারবারের উন্নতির জন্য নানাবিধ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারেন।

কিন্তু বিকেন্দ্রীয়করণের একটি সীমাও আছে এবং উহার নানাপ্রকার **অসুবিধাও** আছে। নিম্নে উহাদের উল্লেখ করা হইল:

১। ক্ষুদ্রায়তন কারবারের পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা নাই। বরং ইহাতে নানাপ্রকার অসুবিধা দেখা দেয়। ফলে অযথা ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

২। ইহাতে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা নষ্ট হয় এবং অধস্তন কর্মচারীরা অতিমাত্রায় স্বাধীন হইয়া কারবারের সুনাম ও দক্ষতা নষ্ট করে।

৩। ইহার ফলে কারবারের কার্যক্রমের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করার

---

1. Henri Fayol, General and Industrial Management (1949), P. 34.

অসুবিধা দেখা দেয়। এই নিয়ন্ত্রণ শিথিলতার দরুণ কারবারের বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বিপন্ন হয় এবং পরিশেষে কারবার উঠাইয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

৪। যখন একই নীতি ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন তখন ইহা প্রবল বাধার সৃষ্টি করে।

কেন্দ্রীয়করণের বিপরীত অবস্থা হইতেছে বিকেন্দ্রীয়করণ। সুতরাং যাহা বিকেন্দ্রীয়করণের সুবিধা উহাই কেন্দ্রীয়করণের অসুবিধা এবং যাহা বিকেন্দ্রীয়করণের অসুবিধা উহাই কেন্দ্রীয়করণের সুবিধা।

বিকেন্দ্রীয়করণ ও সংযোজনা (Decentralisation and Co-ordination)

কারবার বৃহৎ হইলে এবং বিভিন্ন শাখায়, বিভাগে বা পর্যায়ে বিভক্ত হইলে বিকেন্দ্রীয়করণ অবশ্য প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বিকেন্দ্রীয়করণ কার্যকর করিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয় বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনেক ক্ষমতা হ্রাস করিতে হয়। বিকেন্দ্রীয়করণ হইলে বৃহৎ কারবার নানাপ্রকার সুবিধা ভোগ করে। ইহাতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দৈনন্দিন কার্যে ব্যস্ত না থাকিয়া দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা নির্ধারণে অধিক মনোনিবেশ করিতে পারেন। ইহাতে ইহার কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের অনেকটা লাঘব ঘটে। আর বিভিন্ন বিভাগ নিজেদের কার্যপরিচালনায় অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃত্ব কার্যসম্পাদনের নিকটেই অবস্থিত থাকে। ফলে তৎপরতার সহিত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। অধস্তন কর্মীদের উদ্যোগ ও উৎসাহ প্রদর্শনের সুযোগ ঘটে এবং দক্ষতার সহিত কার্য সম্পাদন হয়। ইহাতে একনায়কতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার অধস্তনের মধ্যেও থাকে বলিয়া নিম্নস্তরেও দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করারও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিকেন্দ্রীয়করণের ফলে নানাপ্রকার অসুবিধা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা যে থাকে না এরূপ নহে। ইহাতে কারবার সুষ্ঠুভাবে চালিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অধস্তন কর্মচারীরা অতিমাত্রায় স্বাধীন হইয়া কারবারের সুনাম ও দক্ষতা নষ্ট করিতে পারেন। বিভিন্ন বিভাগের কার্যের মধ্যেও ইহাতে কর্মসমন্বয় বা সংযোজনার অভাব দেখা দিতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে যাহাতে কোন অসঙ্গতি দেখা না দেয়, বিভিন্ন বিভাগীয় স্বাধীনতা যাহাতে কারবারের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী না হয় এবং উহাদের কার্যের সীমা-প্রাচীর লঙ্ঘিত না হয় তজ্জন্য বিকেন্দ্রীয়করণের সহিত কেন্দ্রীয় শাসন বা নিয়ন্ত্রণ যুক্ত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। ইহাই অন্য কথায় সংযোজিত বিকেন্দ্রীয়করণ (Co-ordinated decentralisation)। বিকেন্দ্রীয়করণের অসুবিধা দূর করার জন্যই ইহা প্রয়োজন। ইহা না হইলে কারবারের স্বার্থও ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং পরিশেষে কারবার গুটান ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। সুতরাং উপরি-উক্ত কারণে বিকেন্দ্রীয়করণে সংযোজনার কার্যকরী ব্যবস্থা

অবলম্বন করা অবশ্য প্রয়োজন। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও বুঝিতে সুবিধা হইবে।

যেমন, হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড একটি সরকারী যৌথ মূলধনী কারবার। এজন্য যৌথ কোম্পানীর সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ইহার পরিচালকমণ্ডলী আছে। কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় রাঁচিতে অবস্থিত, কিন্তু ইহার ইস্পাত কারখানাগুলি দুর্গাপুর, রূঢ়কেলা ও ভিলাইতে অবস্থিত। এজন্য ইহাকে বিকেন্দ্রীয়করণের নীতি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই বিকেন্দ্রীয়করণের নীতি অনুসারে হেড অফিসের হাতে কর্মচারী নিয়োগ, উহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বিদেশের সহিত যোগাযোগের দায়িত্ব সংরক্ষিত আছে। প্রত্যেক কারখানার জেনারেল ম্যানেজারকে কারখানা পরিচালনার ভারার্পণ করা হইয়াছে। উহাদিগকে কর্মপন্থা স্থির করা এবং আর্থিক ব্যাপারে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিকেন্দ্রীয়করণে জেনারেল ম্যানেজারদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে উহার অপব্যবহারের সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। হিন্দুস্থান স্টীলের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান মিঃ এম. এস. রাওয়ের মতে এই ব্যবস্থা ভাল ফল দিতে পারিতেছে না। ইহার কুফল সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন জেনারেল ম্যানেজার কর্মীদের কর্মোন্নতি (Promotion) ব্যাপারটা নিজ হস্তে রাখিয়াছেন এবং নিজের ইচ্ছামত কর্মীদিগকে কর্মে উন্নীত করিতেছেন। এজন্য ঊর্ধ্বতন পরিদর্শকদের (Top Supervisory Staff) পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ইহা ছাড়া নূতন নূতন পদ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বোর্ডের পরামর্শ ছাড়া বেতনের হার পরিবর্তন করিয়াছেন। এই পরিস্থিতি বোর্ডের চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য সাংগঠনিক কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এই নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী বোর্ডে সর্বক্ষণের জন্য (full-time) একজন চেয়ারম্যান, দুইজন ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং তিনজন কার্যভিত্তিক ডিরেক্টর থাকিবেন। ইহা ছাড়া পাঁচজন আংশিক সময়ের (part-time) ডিরেক্টরও থাকিবেন। উহাদের মধ্যে দুইজন হইবেন সরকারী এবং তিনজন হইবেন শিল্প-বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। ভিলাই, দুর্গাপুর ও রূঢ়কেলার কারখানার জেনারেল ম্যানেজারগণও এই বোর্ডের সভ্য থাকিবেন।

ইহা ছাড়া প্রত্যেক কারখানায় উপদেষ্টা বোর্ড (Advisory Board)-ও থাকিবে। এই উপদেষ্টা বোর্ডের কাজ হইবে পুনর্বাসন, বাস্তুহীন ও স্থানীয় লোকদের নিয়োগ, অধিকৃত জমির সদ্ব্যবহার এবং সহায়ক শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে সাহায্য করা (to help the plant management in matters like rehabilitation, employment of displaced persons and other local people, utilisation of land acquired for the plant and development of ancillary industries.)। তবে প্রত্যেক কারখানার জেনারেল ম্যানেজার উক্ত উপদেষ্টা বোর্ডের সভাপতি থাকিবেন। উপদেষ্টা বোর্ডে অবশ্য রাজ্যসরকারের ও কর্মীদের

প্রতিনিধি এবং দুইজন কিংবা তিনজন শিল্প-বাণিজ্যে অভিজ্ঞ বেসরকারী প্রতিনিধি থাকিবেন।

পরিচালকমণ্ডলীর তিনজন কার্যভিত্তিক ডিরেক্টর তিনটি বিষয়ে দেখাশুনা করিবেন। উক্ত বিষয় তিনটি হইতেছে, কর্মী ও শিল্প সম্পর্ক (Personnel including Industrial Relations), বাণিজ্যিক কাজকারবার (Commercial Activities) এবং অর্থ (Finance)। রেলওয়ে বোর্ডের অনুরূপ দায়িত্ব-বণ্টন নীতিই ইহাতে গৃহীত হইয়াছে।

উপরি-উক্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থার দ্বারা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীয়করণ কার্যকরী করার নীতি গৃহীত হইয়াছে এবং কার্যকরী সংযোজনা স্থাপন করাও সম্ভব হইবে।

শিল্পে প্রয়োগবিদ্যার পরিবর্তনে সাংগঠনিক সমস্যা (Organisational problems arising out of technological change in an industry)

যে কাঠামোর মাধ্যমে কাজ ও কর্মীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় উহাকে সংগঠন বলা হয়। নির্ধারিত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন কর্মী ও কার্যের মধ্যে একটি পারস্পরিক কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সম্পর্ক গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যেই সংগঠনের গোড়াপত্তন হয়। সংগঠন কারবারের ভিত্তিপ্রস্তর। ইহার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার কার্যাদি রূপ পরিগ্রহ করে, কারবারের যাবতীয় কার্য কর্মীদের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং কে কোন্ কাজ করিবে উহা নির্দিষ্ট থাকে। এই নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে যে যাহার কাজ সম্পন্ন করিতে থাকিলে কোন কারণে যদি উহার পরিবর্তন প্রয়োজন হয় তবে সংগঠন কাঠামোতে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেওয়া কোন আশ্চর্যজনক ব্যাপার নহে। এ পরিবর্তন দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় প্রায়ই কোন-না-কোন কারণে উপস্থিত হয়। কারবার ছোট হইলে সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান অল্লায়াসে সম্ভব। কিন্তু কারবার বৃহৎ হইলে সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং উহার সুষ্ঠু সমাধান বিঘ্নিত হয়। কারণ বড় কারবার—"a series of wheels within wheels, an elaborate hierarchy, in which every decision requires the consulting of this man, the referring to that man, the permission of a third, the agreement of a fourth." ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের কাজ কারবারের আয়তন বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি পায়। Every time a further division of labour is made, every time a new branch or department or a new machinery is introduced, the task of co-ordinating the different departments becomes more and more difficult. এরূপ পরিস্থিতিতে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ-বিদ্যার পরিবর্তন (technological change) দেখা দিলে যে সকল সাংগঠনিক (orga-

nisational) সমস্যা উপস্থিত হইতে পারে নিম্নের আলোচনা হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে :

১। **বিকেন্দ্রীয়করণ ব্যবস্থা রক্ষার সমস্যা (Problem of maintaining Decentralisation) :** শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃহৎ হইলে বিকেন্দ্রীয়করণ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহাতে কিছু কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীয়ের কাজ যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হয়। এরূপ অবস্থায় প্রয়োগবিদ্যার পরিবর্তন দেখা দিলে এই বিকেন্দ্রীয়করণ ব্যবস্থারও পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই পরিবর্তন বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে হঠাৎ আনয়ন করা সহজসাধ্য নহে। ফলে সাংগঠনিক কাঠামোতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়।

২। **প্রয়োজনীয় ভারসাম্য রক্ষার সমস্যা (Problem of maintaining needed Balance) :** একটি সুস্থ বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিপরীতমুখী কার্যধারার মধ্যে আদেশ ও নির্দেশদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। কিন্তু এরূপ পরিস্থিতিতে প্রয়োগবিদ্যার পরিবর্তনে এই আদেশ ও নির্দেশদানের শৃংখলা রক্ষারও কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ফলে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য রক্ষার ব্যতিক্রম ঘটে এবং নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়।

৩। **কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সমতা রক্ষার সমস্যা (Problem of maintaining parity between authority and responsibility) :** বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংগঠনে যে শ্রমবিভাগ প্রবর্তন হয় উহা বিশেষীকরণ, যান্ত্রিকতা ও সংযোজনার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। প্রয়োগবিদ্যার পরিবর্তনে শ্রমবিভাগে কিছুটা রদবদল প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ভারার্পণ, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব ব্যবস্থার মধ্যেও এই পরিবর্তন অনুপ্রবেশ না করিয়া পারে না। ফলে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে সমতা রক্ষা করার গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৪। **শৃংখলা রক্ষার সমস্যা (Problem of maintaining discipline) :** প্রয়োগবিদ্যার পরিবর্তনের ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতির আঙ্গিক পরিবর্তন ও পৃথকীকরণ প্রয়োজন হইতে পারে। ইহার পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী যে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সমতা সৃষ্টি হইয়াছিল উহাতেও বিপর্যয় সৃষ্টি না হইয়া পারে না। এরূপ বিপর্যয় বিশৃংখলার নামান্তর মাত্র। ফলে শৃংখলা রক্ষার সমস্যা দেখা দেয়।

৫। **রৈখিক ও কর্মী সম্পর্কে সংঘাত সমস্যা (Problem of conflict between line and staff relationship) :** রৈখিক ও কর্মী সম্পর্ক অত্যন্ত সংবেদনশীল (highly sensitive)। প্রয়োগবিদ্যার পরিবর্তন দেখা দিলে এই সংবেদনশীলতা অধিক বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পরের মধ্যে যে কার্যসম্পর্ক উহা ভুলিয়া যায়। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘাত সমস্যা প্রবলতর হইয়া পড়ে।

৬। **প্রধান কর্মকর্তার গুরুদায়িত্ব সমস্যা (Problem of heavy responsibility of the chief executive) :** প্রয়োগবিদ্যার পরিবর্তন দেখা

দিলে প্রধান কর্মকর্তার উপর অতিরিক্ত বোঝা ও গুরুদায়িত্ব আসিয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে অনেকক্ষেত্রে ভারসাম্য হারাইতে দেখা যায় এবং এরূপ পরিস্থিতিতে যে ধৈর্য ও স্থিরতা প্রয়োজন তাহার পরিবর্তে তিনি বিচার-বিবেচনাহীন, অপরিণামদর্শী ও কল্পনাশক্তিহীন হইয়া পড়েন। ইহাও প্রয়োগবিদ্যা পরিবর্তনের এক গুরুতর সমস্যা।

৭। **অনমনীয় সমস্যা (Problem of inflexibility) :** কোনও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যে সংগঠন কাঠামো প্রবর্তন হয় উহার পরিবর্তন সাধন এক দুরূহ সমস্যা। কারণ অনেক কর্মাধ্যক্ষই স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী এবং কোন পরিবর্তনে অনমনীয় ভাব দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়া থাকেন। দূরদৃষ্টির অভাবেই এই অনমনীয় মনোভাব দেখা দেয় এবং প্রয়োগবিদ্যার পরিবর্তনে উহা গুরুতর সমস্যায় পরিণত হয়।

৮। **অপ্রস্তুত সমস্যা (Problem of unpreparedness) :** প্রয়োগ-বিদ্যার যখন পরিবতন আসে তখন অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সময়োপযোগী দৃষ্টি উহাতে নিবদ্ধ নাও হইতে পারে। ফলে অপ্রস্তুত অবস্থায় ও অলক্ষ্যে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয় এবং মুনাফা অর্জন বিঘ্নিত হয়। এই সমস্যার ফলে অনেক কারবার উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

৯। **বিশেষ জ্ঞানের সমস্যা (Problem of specialised knowledge) :** নূতন প্রয়োগবিদ্যা প্রবর্তনের জন্য পণ্য উৎপাদন ও উহার ক্রয়-বিক্রয়ে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় উহার মোকাবিলার জন্য বিশেষ জ্ঞানের অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু স্থিতাবস্থার সংগঠনে এই জ্ঞানের অভাব এবং তজ্জনিত সমস্যা প্রকট হইয়া পড়ে।

১০। **বেকার সমস্যা (Problem of unemployment) :** নূতন প্রয়োগবিদ্যা প্রবর্তনের ফলে যে যন্ত্রপাতির ব্যবহার আরম্ভ হয় উহাতে শ্রম-সংক্ষেপ, সময় সংক্ষেপ প্রভৃতি দেখা দেয়। ইহাতে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক শ্রমিক দ্বারা অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। ফলে অনেক শ্রমিক ছাঁটাই হয় এবং যে অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় সেই অনুপাতে শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। ইহাতে উত্তরোত্তর বেকার সমস্যা প্রবলতর আকার ধারণ করে। প্রয়োগবিদ্যা পরিবতনের ইহাই বৃহত্তম সমস্যা। আজ পর্যন্ত কোন দেশে এই সমস্যার সুষ্ঠুভাবে সমাধান হয় নাই। এজন্য কর্মীদের বিরোধিতা ইহাতে বেশী এবং শ্রমিক-মালিক সমস্যা স্বাভাবিক পরিণতি।

সুতরাং নূতন প্রয়োগবিদ্যা প্রবর্তনে এই সমস্যার অনুধাবন করা অবশ্যই প্রয়োজন এবং বিভিন্ন সমস্যার উপযুক্ত মোকাবিলা দ্বারা সময়ের সহিত তাল রাখিয়া কারবার পরিচালনায় অগ্রসর হওয়া উচিত।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. What is Administrative Organisation in business? Discuss the special features of organisation and administration of a large-scale business.

কারবারের প্রশাসনিক সংগঠন কাহাকে বলে ? বৃহদায়তন কারবারের সংগঠন এবং প্রশাসনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

2. Explain the following types of structural forms of an industrial undertaking :—(a) Line organisation, (b) Line and staff organisation, (c) Functional organisation. [N. U. B. Com. 1968]

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিম্নলিখিত গঠনগত কাঠামো ব্যাখ্যা কর :—(ক) রৈখিক সংগঠন, (খ) রৈখিক ও কর্মী সংগঠন, (গ) কার্যভিত্তিক সংগঠন।

3. Give an idea of Line and Staff Organisation. Also state its merits and demerits. [C. U. B. Com. (Hons.) 1968]

রৈখিক ও কর্মী সংগঠনের একটা ধারণা জন্মাও। ইহার সুবিধা ও অসুবিধাও উল্লেখ কর।

4. Discuss the merits of 'Line and Staff' Organisation. How has it originated ? [C. U. B. Com. (Pass) 1965]

রৈখিক ও কর্মী সংগঠনের সুবিধা আলোচনা কর। ইহার উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে ?

5. 'Line and Staff' type of Organisation has been borrowed from the army. Do you think this could be adopted satisfactorily by business enterprises ? Give reasons for your answer. [C. U. B. Com. (Hons.) 1969]

রৈখিক ও কর্মী সংগঠন সৈন্যবাহিনী হইতে লওয়া হইয়াছে। ইহা কি সন্তোষজনকভাবে কারবারী সংগঠনগুলি গ্রহণ করিতে পারে ? উত্তরে যুক্তি দেখাও।

6. Distinguish between Staff Authority and Line Authority and explain their respective functions. [B. U. B. Com. 1963]

কর্মী কর্তৃত্ব ও রৈখিক কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর এবং উহাদের উভয়ের কার্য বিশ্লেষণ কর।

7. What are the difficulties in maintaining a harmonious relationship between Line Authority and Staff Authority ? Suggest measures that will maintain a harmonious relationship between Line Authority and Staff Authority. [B. U. B. Com. 1966]

রৈখিক কর্তৃত্ব এবং কর্মী কর্তৃত্বের মধ্যে একক সম্পর্ক স্থাপনের অসুবিধাগুলি কি ? উহাদের মধ্যে যাহাতে একক সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে তৎসম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা প্রস্তাব কর।

What is meant by Delegation ? How would you make Delegation effective ? [C. U. B. Com. (Pass) 1962]

ভারার্পণ কাহাকে বলে ? ভারার্পণকে কিভাবে ফলপ্রদ করিবে ?

9. 'Delegation without Authority is meaningless.' Discuss.
[C. U. B. Com. (Hons.) 1963]

কর্তৃত্ব ছাড়া ভারার্পণ অর্থহীন। আলোচনা কর।

10. Authority without responsibility is ineffective. Comment.
[C. U. B. Com. (Hons.) 1969]

দায়িত্ব ভিন্ন কর্তৃত্ব নিষ্ফল। সমালোচনা কর।

11. What are the advantages and limitations of Decentralisation of administrative functions?
[C. U. B. Com. (Hons.) 1963]

প্রশাসনিক কার্যে বিকেন্দ্রীয়করণের কি কি সুবিধা ও অসুবিধা?

12. Decentralisation demands effective Co-ordination. Why?
[C. U. B. Com. (Pass) 1964]

বিকেন্দ্রীয়করণে কার্যকরী সংযোজনা প্রয়োজন কেন?

13. Hindustan Steel Limited has got three units at three different places with its Head Office at Ranchi. Give an idea of the organisational structure of this undertaking.
[C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেডের তিন স্থানে তিনটি প্রতিষ্ঠান আছে এবং উহার প্রধান কার্যালয় রাঁচিতে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর একটি বিবরণ দাও।

14. What are the different kinds of authority relationship that prevail between management members of an organisation structure? Explain the nature and working of line-staff relationship.
[B. U. B. Com. (Hons.) 1971]

সংগঠন কাঠামোতে ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত সদস্যদের মধ্যে কি কি বিভিন্ন প্রকারের কর্তৃত্ব সম্পর্কীয় সম্বন্ধ আছে? রৈখিক-কর্মী সম্পর্কের প্রকৃতি ও কার্য-পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

15. Discuss the organisational problems that arise out of technological change in a industry.
[C. U. B. Com. (Hons.) 1970]

কোন শিল্পে প্রয়োগবিদ্যার পরিবর্তনে যে সাংগঠনিক সমস্যার উৎপত্তি হইতে পারে উহা আলোচনা কর।

16. Explain the importance of co-ordinated decentralisation in a large business organisation. [C. U. B. Com. (Hons.) 1972]

বৃহৎ কারবার সংগঠনে সংযোজিত বিকেন্দ্রীয়করণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, শিল্প-সংস্কার এবং উৎপাদিকাশক্তি

(Scientific Management, Rationalisation and Productivity)

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management)

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে উহার দুই-একটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন, কেহ বলিয়াছেন—"বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ভিত্তিতে কোন সূত্র আবিষ্কার হইলে সেই সূত্র শিল্প পরিচালনায় প্রয়োগ করাকে 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা' বলে"। আবার কেহ বলিয়াছেন —"বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যের সম্পর্ক বিচার-বিবেচনা, পর্যালোচনা ও পুনঃ-সংগঠনের সুচিন্তিত ফল বিচক্ষণতার সহিত শিল্প পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োগ করাকে 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা' বলে।" ইহা হইতে মোটের উপর বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তথ্য অনুসন্ধান, সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা দ্বারা কতকগুলি মৌলিক সূত্র আবিষ্কার এবং উহাদিগকে উৎপাদন ও পরিচালনাক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করাকে 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা' আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং উৎপাদন ও পরিচালনাক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূলকথা এবং এই দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই আবিষ্কৃত মৌলিক সূত্রগুলির প্রয়োগ হইয়া থাকে। আবার উক্ত মৌলিক সূত্রগুলি অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান বলিতে অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার দ্বারা কোন মৌলিক সূত্র আবিষ্কারকেই বুঝায়। সুতরাং ব্যবস্থাপনায় এরূপ মৌলিক সূত্রের আবিষ্কার ও প্রয়োগ হওয়ার জন্য উহার নামকরণ হইয়াছে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। এরূপ অবস্থায় আমরা ব্যবস্থাপনাকে বিজ্ঞান (Science) বলিতে পারি। ইহাতে আবিষ্কৃত সূত্রের প্রয়োগ কলা-কৌশলও দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য ব্যবস্থাপনা একটি কলা (Art)-ও বটে।

বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকার বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার এফ্. ডব্লিউ. টেলর (F. W. Taylor) শিল্প সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের প্রবর্তন করেন। তিনি নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত মৌলিক নীতি শিল্প-ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ করেন এবং যুক্তিসঙ্গতভাবেই এরূপ ব্যবস্থাপনার নাম দেন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। এই ব্যবস্থা উদ্ভাবনের পূর্বে পুরাতন রীতি-নীতি ও সাধারণ বিচার-বুদ্ধিই শিল্প ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ হইত। এরূপ অবস্থায় ব্যবস্থাপনায় কোনরূপ দক্ষতাই দেখা দেয় নাই। ফলে সময়, অর্থ এবং নানাপ্রকার জিনিস ও যন্ত্রপাতির অপচয় ঘটিত। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই পুরাতন পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা সম্পূর্ণ

অকার্যকর হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য নূতন চিন্তাধারা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রয়োগ অনিবার্য হইয়া পড়ে। এইপ্রকার সুচিন্তিত ও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা প্রয়োগের ফলে সর্বক্ষেত্রেই দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অধিক মজুরী দিয়াও কম ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন সম্ভব হইতে থাকে। টেলরের মতে এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিজ্ঞানসম্মত মৌলিক নীতিগুলি (fundamental principles) নিম্নরূপ :

(ক) কার্য আরম্ভ করার পূর্বে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন।
(খ) প্রতিটি কার্যের জন্য নির্দিষ্ট সময় (Standard time) নির্ধারণ।
(গ) প্রতিটি কার্যের সময় ও গতি নিরীক্ষণ (Time and motion study)।
(ঘ) নির্দিষ্ট মানের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও মালমসলার ব্যবহার।
(ঙ) প্রতিটি কার্যের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি নিয়োগ এবং উহাদের শিক্ষাদান।
(চ) মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সন্তোষজনক সম্পর্ক স্থাপন।
(ছ) শ্রমিকদের উৎসাহব্যঞ্জক মজুরী প্রবর্তন।
(জ) কার্য-ভিত্তিক (Functional) কর্তৃত্ব স্থাপন।
(ঝ) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য কার্যনিধারণ।

অবশ্য কালের অগ্রগতির সহিত নীতিসমূহের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং টেলরের অনুগামিগণ নূতনভাবে অনেক নীতি প্রবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু ব্যবস্থাপনা যে একটি বিজ্ঞান উহা উপরি-উক্ত বিশ্লেষণ হইতে প্রমাণিত হইবে। টেলর স্বয়ং এবং উহার অনুগামিগণ অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা এরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুফলও দেখাইয়াছেন। ইহার ফলে শিল্পে অপচয় বন্ধ হইয়াছে, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে, শ্রমিকের দক্ষতা ও মজুরী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শ্রমিক-মালিক-সম্পর্কের অনেক উন্নতি দেখা দিয়াছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ব্যবস্থাপনা একটি সামাজিক বিজ্ঞান। এজন্য এই বিজ্ঞানের কিছুটা সীমাবদ্ধতা (limitations) আছে। ইহা রসায়ন বা পদার্থবিজ্ঞানের মত অচল ও অনড় নয়। কারণ কারবারের ব্যবস্থাপনায় মানুষের আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রবণতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা লইয়া কারবার। ইহা সততই বিভিন্নমুখী ও পরিবর্তনশীল। যেমন, একটি লোকের প্রবণতা অপর লোকের প্রবণতা হইতে বিভিন্ন। ফলে ব্যবস্থাপনায় সর্বদা কোনও মৌলিক নীতি (fundamental principles) অবলম্বন করিয়া সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করা যায় না। এখানেই ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের পার্থক্য।

বর্তমান সমাজব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল। ইহার সহিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ পরিস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে কারবার পরিচালনা এক প্রবল সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল প্রতিষ্ঠানের একমাত্র চিন্তা কিভাবে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস দ্বারা পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎকর্ষ সম্ভব হয়। "কিন্তু

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এই অবস্থার সুষ্ঠু সমাধান কখনই সম্ভব নহে। ব্যবস্থাপনা কার্যকলাপ মানব-ইতিহাসের মতই সুপ্রাচীন। কিন্তু এই ব্যবস্থাপনাকার্যে গত শতাব্দীর শেষের দিকে ছাড়া কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করা হয় নাই। চিরাচরিত প্রথাই তখন পর্যন্ত কারবার পরিচালনায় প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। গত শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিক্ষেপ হইতে থাকে। এই ব্যবস্থার পথিকৃৎ হিসাবে এফ্. ডব্লিউ. টেলরের নাম পুরোভাগে অবস্থিত বলা চলে। তিনিই নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা ব্যবস্থাপনার বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করেন এবং শিল্পে ইহার প্রয়োগ আরম্ভ করেন। তাঁহার এই গবেষণার সুফল আমেরিকার শিল্পপ্রধানদের সম্মুখে তিনি নানাভাবে উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করেন এবং তাঁহার এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর নামকরণ করেন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। এজন্য ইঁহাকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক (father of scientific management) বলা হয়। টেলর ১৮৭৮ সালে সামান্য শ্রমিক হিসাবে আমেরিকার মিডভেল ষ্টীল কোম্পানীতে কাজ আরম্ভ করেন এবং নিজের প্রতিভাবলে ক্রমাগত পদোন্নতি লাভ করেন এবং ১৮৮৪ সালে প্রধান বাস্তুকার (Chief Engineer) পদে অধিষ্ঠিত হন। ব্যবস্থাপনাক্ষেত্রে তাঁহার দান অবিস্মরণীয়। এক্ষেত্রে উঁহার দান নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত, তিনি দেখিতে পান শ্রমিকরা যাহা উৎপাদন করে তাহা উঁহাদের সামর্থ্যের তুলনায় খুবই কম। এজন্য তিনি গবেষণা আরম্ভ করেন এবং সময় নিরীক্ষণ (Time Study), গতি নিরীক্ষণ (Motion Study) এবং শ্রান্তি নিরীক্ষণ (Fatigue Study) দ্বারা শ্রমিকদের জন্য প্রেরণামূলক মজুরী ব্যবস্থা (Incentive Wage System) প্রবর্তন করেন। ইহার ফলে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিকগণও অধিক মজুরী পাইতে আরম্ভ করে। ইহার পর তিনি তাঁহার গবেষণার ফল বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ করিতে থাকেন। তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ ১৮৯৫ সালে কার্যহারের ভিত্তিতে (A Piece Rate System) শ্রমিকদের মজুরী দেওয়া সম্পর্কে প্রকাশ হয়। ১৯০৩ সালে তিনি 'কারখানা ব্যবস্থাপনা' (Shop Management) নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁহার 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা নীতি' (Principles of Scientific Management) নামক পুস্তক ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। এই বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন নীতি বিশ্লেষণ করেন।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient Features of Scientific Management)

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুফল পাইতে হইলে টেলরের মতে উহার কতকগুলি অবস্থা (conditions) মানিয়া চলিতে হইবে। উক্ত অবস্থাগুলি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূল সূত্র (basic principles), উহার উপাদান (elements), বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য

(features)। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক আছে। নিম্নের বিবরণ হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে :

প্রথমত, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূলসূত্র দুইদিকে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। উহারা হইতেছে মানবীয় দিক (Human aspects) এবং অমানবীয় দিক (Non-human aspects)।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূলসূত্রের মানবীয় দিক নিম্নরূপ :

১। **শ্রমিক নিয়োগ (Recruitment of Labour):** শ্রমিক নিয়োগ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার একটি বিশেষ কাজ। এই কাজে সাফল্য আনিতে হইলে শ্রমিকের মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা নির্ণয়ের প্রয়োজন। কারণ শ্রমিকের মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা ঠিকমত না থাকিলে সে কখনই কার্যে দক্ষতা দেখাইতে পারিবে না এবং উৎপাদনেও সাফল্য দেখা দিবে না। সুতরাং শ্রমিক নিয়োগ বা নির্বাচন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ ব্যবস্থা।

২। **শ্রমিক সংস্থাপন (Placement of Labour):** শ্রমিক নির্বাচন ও নিয়োগের পর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় উহার উপযুক্ত সংস্থাপন প্রয়োজন অর্থাৎ যে শ্রমিক যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন উৎপাদনে দক্ষতা আসা সম্ভব না। কোন্ শ্রমিক কোন্ কাজের উপযুক্ত উহা স্থির করার জন্য পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কার্যকরী করিতে হইলে এদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

৩। **শ্রমিক প্রশিক্ষণ (Training of Labour):** শ্রমিকের মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা এবং সংস্থাপন উহার দক্ষতার একমাত্র মাপকাঠি নহে। কর্মে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উহার প্রশিক্ষণও প্রয়োজন। বিজ্ঞান এবং প্রয়োগবিদ্যার উন্নতির ফলে উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরিবর্তনের সহিত খাপ খাওয়ানোর জন্যও শ্রমিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় কাজ করিতে করিতে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের (Training within Industry) ব্যবস্থাও থাকে।

৪। **সময় নিরীক্ষণ (Time Study) :** ইহা পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করিয়া দিয়া থাকে। ইহাতে সময়ের অপচয় নিবারণ হয়।

৫। **গতি নিরীক্ষণ (Motion Study) :** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় গতি নিরীক্ষণের উদ্দেশ্য হইতেছে যতদূর সম্ভব কম অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা কার্য সম্পাদন করা। ইহাতে সময় ও শ্রমের অপচয় দুই-ই দূর হয়। পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের দ্বারা অবশ্য শ্রমিকের অঙ্গ-সঞ্চালনের গতি স্থির করিয়া দেওয়া হয়।

৬। **শ্রান্তি নিরীক্ষণ (Fatigue Study) :** বিশ্রাম ছাড়া একটানা অনেকক্ষণ কাজ করিলে শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক অবসাদ দেখা দেয়।

ইহার ফলে শ্রমিকের কার্যদক্ষতা হ্রাস পায়। সুতরাং এইভাবে শ্রমিকের দক্ষতা যাহাতে হ্রাসপ্রাপ্ত না হয় এবং উৎপাদন ব্যাহত না হয় তজ্জন্য কার্যকালের মাঝে মাঝে শ্রমিককে বিশ্রাম দেওয়ার ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার একটি অঙ্গ। কতক্ষণ পর কোন্ শ্রমিকের শ্রান্তিহরণের জন্য বিশ্রাম প্রয়োজন উহা শ্রান্তি নিরীক্ষণ দ্বারা স্থির করা হয়।

৭। **প্রেরণামূলক মজুরী ব্যবস্থা (Incentive Wage System):** যাহাতে দক্ষতার সহিত বেশী কাজ করিলে অধিক মজুরী পাওয়া যায় প্রেরণামূলক মজুরী ব্যবস্থার ইহাই অন্যতম উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় টেলর (Taylor) ইহা প্রথম প্রবর্তন করেন এবং ইহাকে 'পার্থক্যমূলক কার্যহার' (Differential piece rate) মজুরী বলা হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী মজুরীর হার দুই প্রকারের হইয়া থাকে। নির্ধারিত কার্য (Standard Task) বা তাহার বেশী কার্য সম্পাদনের জন্য উচ্চহারে এবং নির্ধারিত কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে নিম্নহারে মজুরী দেওয়া হয়।

৮। **শ্রমিক ও পরিচালকের মধ্যে সহযোগিতা ও মৈত্রী সম্পর্ক (Co-operation and harmonious relationship between Labour and Management):** উৎপাদনে উৎকর্ষ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ও পরিচালকের মধ্যে সহযোগিতা ও মৈত্রী সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। এই সহযোগিতা ও মৈত্রী সম্পর্ক নির্ভর করে শ্রমিকদের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখার উপর। সুতরাং শ্রমিকদের মতামত উপেক্ষা না করা, তাহাদিগকে আদেশ পালনকারী যন্ত্র হিসাবে গণ্য না করা, তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলসাধনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিশেষ অঙ্গ।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অমানবীয় দিকসমূহ নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

১। **যন্ত্রপাতি (Machines and Tools):** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নূতন এবং সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার নিয়ম, কারণ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উহার উৎকর্ষ ইহা ভিন্ন সম্ভব নহে।

২। **কাঁচামাল (Raw Materials):** সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির ন্যায় উপযুক্ত কাঁচামালও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জন্য অপরিহার্য। ইহা ভিন্ন উৎপাদনে উৎকর্ষলাভ, অপচয় রোধ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি কখনই সম্ভব নয়।

৩। **কারখানার পরিবেশ (Factory Environment):** কারখানার পরিবেশ সুখকর না হইলে শ্রমিকের দক্ষতা কখনও বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এজন্য চাই কারখানার ভিতরে প্রচুর আলো-বাতাস, প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য নির্দিষ্ট আয়তনের স্থান (Space), বিশ্রাম স্থান, সুবিধাদরে আহার প্রাপ্তির ব্যবস্থা, স্নানাগার, শৌচাগার প্রভৃতি। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নিয়ম এদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া।

৪। **কার্যভিত্তিক কর্তব্য বণ্টন (Functionlisation):** কার্যভিত্তিক

কর্তব্য বণ্টন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সমস্ত কাজকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয় এবং এক একজনের উপর এক একটি কাজের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

৫। **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা (Central Planning):** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বিভাগ রাখার নিয়ম। এই বিভাগ সমগ্র ব্যবস্থাপনার মস্তিষ্কের মত কাজ করিয়া থাকে এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। এই বিভাগ বিশেষজ্ঞদিগকে লইয়া গঠিত হয় এবং ইঁহারা কারবারের যাবতীয় বিষয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, বিভিন্ন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও তথ্য সযত্নে রক্ষা করেন, বিবিধ তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান দ্বারা বৈজ্ঞানিক সূত্র বাহির করেন এবং উহার প্রয়োগ দ্বারা কারবারের সর্ববিধ উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন।

সুতরাং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার দ্বারা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি নানাপ্রকার সুবিধা লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার নানাপ্রকার সুবিধা থাকিলেও ইহা ত্রুটিহীন এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে একথা বলা চলে না। নিম্নের বিবরণ হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার দোষ-গুণ (Merits and Demerits of Scientific Management)

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন ও পরিচালনা ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সঠিক তাৎপর্য। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্ভব হইলে উহা শিল্পজগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহা দক্ষতা বৃদ্ধির প্রমাণ দেয়। যে নীতি ইহাতে অনুসৃত হয় তাহার ফলে কতকগুলি সুবিধাও পাওয়া যায়। ইহার সুবিধাগুলি সাধারণত নিম্নরূপ :

১। ইহাতে প্রথমত প্রত্যেক শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে সামগ্রিকভাবে কারবারের দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকগণও উহাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অধিক মজুরী পাইয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়।

২। যে শ্রমিক যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজে নিযুক্ত করার ফলে শ্রমিক তাহার কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বোধ করে।

৩। ইহার সময়, গতি ও শ্রান্তি নিরীক্ষণ একদিকে শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক শক্তির অপচয় দূর করে এবং অন্যদিকে কারবারেও সময়ের অপচয় দূর করিয়া কার্যের মাত্রা বৃদ্ধি করে।

৪। সর্বক্ষেত্রে গবেষণা ও নিরীক্ষণের ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়, নানাদিকে ব্যয় সংকোচ ঘটে এবং উৎপাদনে উৎকর্ষ দেখা দেয়। ইহার ফলে কারবারের প্রতিযোগিতা-ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায় এবং ফলে সম্ভোগকারিগণ কম মূল্যে ভাল জিনিস পাইয়া থাকেন।

৫। ইহাতে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিবর্তে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় কারবারের পরিবেশ সুখকর হয়, শ্রমিকদের সর্বপ্রকার সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। ইহাতে শ্রমিক মালিক সংঘর্ষের পরিবর্তে উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা ও মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

৬। গবেষণা ও নিরীক্ষণের ফলে ইহা নূতন নূতন যন্ত্রাদি ও উন্নত ধরনের করণ-কৌশল আবিষ্কারের ও প্রয়োগের সুযোগ-সুবিধা পায়।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নানাপ্রকার সুবিধা থাকিলেও ইহার নিম্নলিখিত **অসুবিধাগুলিও** উল্লেখযোগ্য:

১। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা উদ্ভব হওয়ায় প্রথমদিকে অনেক শিল্প-মালিক ইহাতে মুগ্ধ হন এবং উহার প্রয়োগে যত্নশীল হন। কিন্তু পরবর্তী কালে অনেক শিল্প-মালিক ইহা অপছন্দ করিতে থাকেন। তাঁহাদের মতে ইহার কার্যক্রম অনুসরণ করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ফলে ইহা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

২। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও করণকৌশল আবিষ্কারের ফলে ইহার কার্যক্রমে পরিবর্তন সাধন করিতে হয়। এক ব্যবস্থা হইতে অন্য ব্যবস্থা যেমন ব্যয়বহুল, পক্ষান্তরে উহা নানাবিধ বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া ইহার কার্যক্রমে ধারা-বাহিকতাও নষ্ট হয়।

৩। ইহাতে উচ্চ বেতনের নানাপ্রকারের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে হয়। ইহার ফলেও ব্যয় বৃদ্ধি হয়।

৪। ইহাতে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় সত্য এবং তাহার ফলে কর্মের গতি ও বেগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহাতে শ্রমিকের দেহ ও মনের উপর অযথা চাপ পড়ে। ফলে শ্রমিকরা বিশেষত শ্রমিকসংঘ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিরোধিতা করিয়া থাকে।

৫। শ্রমিকদের ইহাতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখানোর সুবিধা নাই। তাহাদিগকে পরিকল্পনা অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্মচারীর খেয়ালমত যন্ত্রবৎ কাজ করিয়া যাইতে হয়। এরূপ পরিস্থিতি শ্রমিক-কল্যাণের পরিপন্থী এবং অ-গণতান্ত্রিক।

৬। ইহাতে পার্থক্যমূলক কার্যহারের (Differential piece rate) ব্যবস্থা থাকায় বিভিন্ন শ্রমিক বিভিন্নরূপ মজুরী পাইয়া থাকে। ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও ঈর্ষা দেখা দেয় এবং উহাদের ঐক্যবদ্ধতা নষ্ট হয়। শ্রমিকদের মতে প্রকৃতপ্রস্তাবে মুনাফার অধিকাংশ মালিকগণই ভোগ করিয়া থাকে। কারণ কোন কোন শ্রমিক কিছু বেশী মজুরী পাইলেও অন্যভাবে ইহাদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করা হয়।

৭। ইহাতে কাজের একঘেঁয়েমি ভাব বেশী। ফলে শ্রমিকগণ স্বভাবতই কার্যে নিরুৎসাহ বোধ করে এবং নিজেদের সত্তা হারাইয়া ফেলে।

৮। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি এবং করণকৌশল প্রয়োগের ফলে শ্রমিকদের বেকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৯। কিছু সংখ্যক শ্রমিক অনেকটা সুযোগ-সুবিধা পায় বলিয়া তাহাদের উপর শ্রমিকনেতার প্রভাব কমিয়া যায় এবং শ্রমিক আন্দোলন দুর্বল হয়।

সুতরাং মালিক ও শ্রমিকদের উপরি-উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিলে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সমর্থন মেলে না। কিন্তু ইহার প্রতি এরূপ বিরূপ মনোভাব থাকিলেও ইহা ভিন্ন শিল্পে দক্ষতা অর্জন সম্ভব নহে। সুতরাং বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনায় ইহার প্রয়োগ অপরিহার্য। তবে প্রয়োজনমত পরিবর্তন দ্বারা ইহার ত্রুটিগুলি যথাসম্ভব দূর করিলে শিল্পক্ষেত্রে ইহা অবশ্যই সুফল প্রদান করিবে। এইভাবে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইহার প্রয়োগ করা উচিত। কারণ ভারতীয় শিল্পে যে দক্ষতা ও উৎকর্ষের অভাব একথা সর্বজনগ্রাহ্য। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কোনও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য। এজন্য শিল্পের সামগ্রিক উন্নতির জন্য ইহার সহিত শিল্পসংস্কার (Rationalisation) এবং উৎপাদনশীলতা বা উৎপাদিকা-শক্তি (Productivity) যুক্ত হওয়া উচিত।

শিল্পসংস্কার (Rationalisation)

জার্মান শব্দ *Rationalisierung* হইতে Rationalisation কথাটির উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। উহার অর্থ Putting reason into industry. প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে জার্মানীর অনেক শিল্প বিধ্বস্ত হয়। ঐ শিল্পগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য জার্মানীতে প্রথম Rationalisation অর্থাৎ শিল্পসংস্কার নীতি গ্রহণ করা হয়। ইহার ফলে জার্মানীর শিল্পগুলি অতি মন্দার বাজারেও অভাবনীয় সাফল্য ও উন্নতি লাভ করে। তখন সমস্ত বিশ্বে ইহার প্রভাব বিস্তার হইয়া পড়ে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, জাপান ও আমেরিকা ইহার প্রয়োগ দ্বারা শিল্পের উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়।

শিল্পসংস্কারের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন ব্যাপার। কারণ ইহার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এক কথায় কোন শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থাই শিল্পসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। ফলে পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে নূতন ও আধুনিকতম উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োগ, পণ্যের নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ, বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন, অদক্ষ শ্রমিকের পরিবর্তে দক্ষশ্রমিক নিয়োগ, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন, অদক্ষ প্রতিষ্ঠানের বিলোপ সাধন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জোট গঠন, আধুনিকতম বিজ্ঞাপন ও প্রচার-পদ্ধতি অনুসরণ, পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহার, উৎপাদন পদ্ধতির যথাসম্ভব সরলীকরণ, চাহিদার সহিত উৎপাদনের সামঞ্জস্য বিধান, বণ্টন ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিশেষীকরণ সুযোগ প্রভৃতি দ্বারা পণ্যের উৎপাদন ব্যয়-সংকোচ এবং উহার উৎকর্ষ সাধনই শিল্পসংস্কার।

ইহা কোন শিল্পের কোন এক প্রতিষ্ঠানে শুধু প্রয়োগ বুঝায় না। কোন শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই ইহার যথাযথ প্রয়োগ বুঝায়। ইহার দুইটি দিক আছে

—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। আভ্যন্তরীণ শিল্পসংস্কারে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে প্রধানত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি প্রযুক্ত হয়। বাহ্যিক দিকে ইহা শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জোটবন্ধন দ্বারা প্রতিযোগিতা হ্রাস করে, বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে, সংঘবদ্ধভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ করে, কারিগরি গবেষণা এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে।

শিল্পসংস্কারের ফলে যে কতকগুলি সুবিধা লাভ হয় ইহা অনস্বীকার্য। উহার **সুবিধাগুলি** নিম্নরূপ :

ইহার ফলে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হয়, বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়-সংকোচ সুবিধা ঘটে, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিশেষীকরণ ও আধুনিকীকরণ স্থান পায়, শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার হয় এবং উহার অপচয় বন্ধ হয়, উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি হয়, শ্রমিকের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, উহারা নানাবিধ আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। ইহাতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উৎকর্ষ দেখা দেয়, পণ্যের মান উন্নত হয় এবং মূল্য হ্রাস পায়, সম্ভোগ-কারিগণ কম মূল্যে ভাল জিনিস পায়, পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, অধিক মুনাফালাভ সম্ভব হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, রপ্তানি বৃদ্ধি পায়, বাণিজ্যের গতি অনুকূলে আসে, জীর্ণ শিল্পের নবজীবন লাভ হয় এবং এক কথায় শিল্পের সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, দেশের আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় হয় ও সমগ্র সমাজ উপকৃত হয়।

কিন্তু ইহার যে কোন অসুবিধা নাই এরূপ নহে। ইহার **অসুবিধাগুলি** নিম্নরূপ :

ইহাতে একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি হয়, পণ্যমূল্য অযথা বৃদ্ধি পায়, নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে অনেক শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে, যন্ত্রপাতির পুনঃপুনঃ পরিবর্তনের ফলে মূলধনের অপচয় ঘটে, উৎপাদনের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ইহার প্রবর্তনে প্রচুর মূলধনও প্রয়োজন হয়, বিশেষজ্ঞ নিয়োগে ব্যয়বাহুল্য দেখা দেয়, দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিচালকেরও অভাব অনুভূত হয়, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির অনুপাতে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পায় না এবং শ্রমিক অশান্তি লাগিয়াই থাকে। শ্রমিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগও এখানে কম থাকে এবং কাজের একঘেঁয়েমি বৃদ্ধি পায়। ফলে অনেক শিল্পপতিই ইহার কল্যাণকর রূপ দেখিতে পান না।

সুতরাং শিল্পসংস্কারের সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। তবে ইহার অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধাই বেশী। এজন্য **ভারতের বিভিন্ন শিল্পে** বিশেষত কার্পাস, পাট প্রভৃতি শিল্পে ইহার আশু প্রবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন। এই সকল শিল্পে পুরাতন প্রথায় উৎপাদন অনেকক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে ইহাদের উৎপাদন ব্যয় কোন-ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে না। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ইহাদিগকে হটিয়া আসিতে হইতেছে। দেশের মধ্যেও অধিবাসিগণ অধিক মূল্যে জিনিস ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। শিল্পসংস্কার প্রবর্তনের যে কোন সমস্যা নাই এরূপ নহে। ইহার জন্য

প্রয়োজন হইবে প্রচুর মূলধন এবং প্রচুর টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি এবং তজ্জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রাচুর্য। ইহা ছাড়া প্রয়োজন দক্ষ কারিগর এবং শিল্পপতিদের মনোভাবের পরিবর্তন। সর্বোপরি ইহার প্রবর্তনে বেকার সমস্যা প্রবলাকার ধারণ করার আশঙ্কা আছে। কিন্তু শিল্পসংস্কার না হইলেও যে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। শিল্পসংস্কার না হইলে অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠা সম্ভব হইবে না। ফলে অনেক কারখানা বন্ধ হইয়া যাইবে। তখন বেকার সমস্যা আরও তীব্রতর হইবে। এরূপ অবস্থায় সাময়িক বেকারত্ব স্বীকার করিয়া ভবিষ্যতে অধিক শ্রমিক নিয়োগের পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে পাট অনুসন্ধান কমিশনের (Jute Enquiry Commission) অভিমত উল্লেখযোগ্য—'Rationalisation might temporarily cause unemployment, but it is lesser evil compared to permanent damage to the industry and labour and to the growers who depend on it if the industry should be allowed to perish'. বেলফোর কমিটির মতে—'Rationalisation in its early stages may involve an increase in the number of the wholly unemployed, but considers that in the long run the industries which have regained their prosperity will more than be able to re-absorb those who have been displaced.' তবে বেকারত্ব বেশী বৃদ্ধি করিয়া জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করাও বাঞ্ছনীয় নহে। বেকার শ্রমিকদের অন্যত্র কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া এবং প্রয়োজন হইলে বেকার বীমা (Unemloyment Insurance) চালু করিয়া শিল্পসংস্কার প্রবর্তন করাই আমরা অধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি।

ভারতীয় শিল্পে শিল্পসংস্কারের অগ্রগতি (Progress of Rationalisation in Indian Industries)

শিল্পসংস্কার বর্তমান যুগে শিল্পোন্নয়নের একটি বিশেষ ব্যবস্থা। অনেক শিল্পসমৃদ্ধ দেশ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি শিল্পোন্নতির জন্য এই কৌশল অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। ভারতীয় শিল্পেও যে ইহার প্রভাব দেখা যাইতেছে না এরূপ নহে। তবে ইহার অগ্রগতি এখনও মন্থর বলিয়া মনে হয়। এই আন্দোলনের ইতিহাসও বেশী দিনের নহে। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষের দিকে এবং চতুর্থ দশকের প্রথম দিকে বিশ্বব্যাপী মন্দা আত্মপ্রকাশ করে। ইহার ফলে ভারতীয় শিল্পজাত পণ্যের চাহিদাও হ্রাস পায়। তখন ব্যয়সংকোচ দ্বারা মূল্যহ্রাসের প্রতিক্রিয়া কাটাইবার চেষ্টায় শিল্পসংস্কারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯৩২ সালে ট্যারিফ বোর্ড যখন সূতীবস্ত্র শিল্পের সংরক্ষণের আবেদন বিবেচনা করেন, তখন ভারতের বস্ত্রকলগুলি জাপান বা ইংলণ্ডের তুলনায় মূলধনের একক পিছু দশগুণ বেশী

শ্রমিক ব্যবহার করে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। ফলে ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী বোম্বাইয়ে বস্ত্রকল সমিতি সুতীবস্ত্রশিল্পে শিল্পসংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। ভারতীয় শিল্পে শিল্পসংস্কারের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। ইহার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় উক্ত প্রচেষ্টা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। যুদ্ধ শেষে এবং স্বাধীনতা লাভের পর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ভারত সরকারও এ সম্পর্কে উৎসাহদানের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। সকল বস্ত্রশিল্পে শিল্পসংস্কার চালু করিতে ৮০০ শত কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। National Industrial Development Corporation ইহার জন্য অর্থ সাহায্য করিতেছিলেন। কিছু সংখ্যক কাপড়ের কলে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি, রিং-স্পিনিং (Ring-spinning) এবং রিং-উইভিং (Ring-weaving), স্বয়ং-ক্রিয় (Automatic) তাঁত, কারখানায় তাপ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সরলীকরণ, নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন এবং শিল্পসংস্কারের অন্যান্য দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। শিল্পসংস্কার ব্যাপারে বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিল মালিকগণই বেশী তৎপরতা দেখাইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বেলঘরিয়াতে অবশ্য TEXMACO নামক কারখানায় স্বয়ংক্রিয় তাঁত ও বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইতেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাতেই ইহার অগ্রগতি বেশী দেখা দিয়াছে। ১৯৬২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত NIDC হইতে কার্পাসবস্ত্র শিল্পের সংস্কারের জন্য ১৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর হয়। কিন্তু ১৯৬৪ সালে Industrial Development Bank of India স্থাপিত হওয়ার পর NIDC-র এই ঋণ দেওয়ার নীতি বন্ধ হয়। তবে এই শিল্পসংস্কারের জন্য এখনও অনেক কিছু করিবার আছে।

স্বাধীনতা লাভের পর পাটশিল্পে শিল্পসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় পাটকলগুলিতে পুরাতন যন্ত্রপাতি নিযুক্ত থাকায় স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডীর কলগুলির ও পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) নব-নির্মিত পাট কল-গুলির সহিত ভারত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রায় ২৫টি পাটকলে শিল্পসংস্কার আরম্ভ হয়। ভারতীয় পাটকল সমিতির মতে ইহার শিল্পসংস্কারের জন্য প্রয়োজন ৭০ কোটি টাকা। ১৯৫৯ সালে এড-হক কমিটি হিসাবে বিগত দশ বৎসরে ইহাতে শিল্পসংস্কারের জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯৬২ সালের ৩১শে মার্চ অবধি NIDC হইতে প্রায় ৭ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে মঞ্জুর হয়। এ ক্ষেত্রে, Industrial Development Bank of India স্থাপিত হওয়ার পর এরূপ ঋণ দেওয়া বন্ধ হয়। কিছুসংখ্যক পাটকলে নূতন নূতন বৈদ্যুতিক যন্ত্র বসানো হইয়াছে। ভারতীয় পাটকল সমিতি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণেও সমর্থ হইয়াছে এবং গবেষণার দ্বারা রকমারি দ্রব্য উৎপাদন দ্বারা প্রতিযোগিতা এড়ান হইতেছে। পাটকলগুলিতে যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণে প্রায় ৭৫ ভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে। আশা করা যায় শীঘ্রই এই শিল্পে শিল্পসংস্কার পূর্ণ সাফল্যলাভ করিবে।

ভারতীয় শর্করা শিল্প সংরক্ষণের আওতায় বর্ধিত হইলেও ইক্ষুর নিকৃষ্টতা, উপজাতদ্রব্য উৎপাদনের স্বল্পতা, কলগুলির পুরাতন যন্ত্রপাতি ও ক্ষুদ্রায়তন, ইক্ষু উৎপাদন ক্ষেত্রের দূরত্ব প্রভৃতির জন্য শর্করা শিল্পে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাইতেছে না। এই শিল্পে শিল্পসংস্কার আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু ইহার বেগ দ্রুততর হওয়া প্রয়োজন। Shroff Committeeর নিকট ভারতীয় চিনিকল সমিতি যে স্মারকলিপি পেশ করেন তাহাতে এই শিল্প আধুনিকীকরণের জন্য ২৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে। উক্ত টাকার অর্ধাংশ কলগুলিই সংগ্রহ করিবে। কিন্তু শর্করা উন্নয়ন কাউন্সিলের মতে মোট প্রয়োজন হইবে ৬০ কোটি টাকা। NIDC এই শিল্পকে আধুনিকীকরণের জন্য সাহায্য করিতেছে। Institute of Sugar Technology and Sugar Cane Research সংস্থা এই শিল্প সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত আছে।

কয়লা-শিল্পেও শিল্পসংস্কার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দেশী প্রথায় কয়লা উত্তোলিত হয় বলিয়া উৎপাদন ব্যয় অধিক হইতেছে। ইহা ছাড়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা ধৌত বা শোধন করার প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার অভাব এবং কয়লাখনিগুলির ক্ষুদ্রায়তন এই শিল্পের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিতেছে। সরকার কয়লা শিল্পের সমস্যা দূরীকরণের জন্য ক্ষুদ্রায়তন খনিগুলিকে একত্রীকরণে উৎসাহ দিতেছেন। মেহতা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্বেচ্ছামূলক একত্রীকরণে সাহায্য করার জন্য Amalgamation Committeeও স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বাধ্যতামূলক একত্রীকরণ ভিন্ন স্বেচ্ছামূলক একত্রীকরণ বিশেষ কার্যকরী হইতেছে না। ধানবাদের Fuel Research Institute উৎপাদন পদ্ধতির উৎকর্ষের জন্য গবেষণায় লিপ্ত আছে। সরকার কর্তৃক স্থাপিত National Coal Development Corporation কয়েকটি কয়লার খনিতে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যান্য সংস্কারমূলক ব্যবস্থার মধ্যে বালুকা সংস্থাপন (Sand stowing) এবং দুর্গাপুর, কারাগোলি, দুগ্দা, পাথরডিহি প্রভৃতি স্থানের সরকারী Coal Washing Plant উল্লেখযোগ্য। কয়লা সংরক্ষণ ও কয়লার ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের নানাবিধ ব্যবস্থা সরকারী প্রচেষ্টায় গৃহীত হইতেছে। কয়লা-শিল্পের সংস্কারের উপর ভারতের শিল্পোন্নয়ন অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পে এবং সিমেন্ট-শিল্পে অবশ্য শিল্পসংস্কার বহুলাংশে কার্যকরী হইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পে গত ২৫ বৎসরে শিল্পসংস্কার বিশেষ অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। সরলীকরণ (Simplification), বিশেষীকরণ, লৌহ নিষ্কাশন পদ্ধতির উন্নয়ন, বর্জিত লৌহ টুকরার (Scrap Iron) পুর্ণ ব্যবহার, কয়লার উন্নততর ব্যবহার প্রভৃতি এই শিল্পসংস্কারের দৃষ্টান্ত। অপচয় নিবারণের উদ্দেশ্যে Tariff Commission-এর সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৩ সালে Indian Iron and Steel Company-র সহিত Steel Corporation of Bengal-এর সংযুক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন শিল্পে সংস্কার-সাধন কিছুটা অগ্রসর হইলেও কতকগুলি সমস্যা এখনও তীব্র

থাকায় ইহার অগ্রগতি ব্যাহত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে অর্থের অপ্রাচুর্য, শ্রমিক ছাঁটাই, কারিগরি বিদ্যা, কারখানার আভ্যন্তরীণ সুবন্দোবস্ত, গবেষণা, সাধারণ মানের পণ্য উৎপাদন, উপজাত দ্রব্য উৎপাদন, কারখানার সর্বোত্তম আয়তন নির্ধারণ-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সুষ্ঠু সমাধান অবশ্য নির্ভর করে শ্রমিক, মালিক ও সরকারী সহযোগিতার উপর। কিন্তু এই সহযোগিতা সর্বক্ষেত্রে সমতালে অগ্রসর হইতেছে না। এজন্য শিল্পসংস্কারেও আশানুরূপ অগ্রগতি দেখা যাইতেছে না।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা এবং শিল্পসংস্কারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Scientific Management and Rationalisation)

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা এবং শিল্পসংস্কারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা	শিল্পসংস্কার
১। ইহা একটি প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক সংস্কার-সাধন।	১। ইহা একই জাতীয় সকল প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সংস্কার-সাধন।
২। ইহার পরিধি সীমাবদ্ধ।	২। ইহার পরিধি ব্যাপক।
৩। ইহাতে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।	৩। ইহাতে শ্রমিক, উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, অর্থসংস্থান, পরিবহণ প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
৪। ইহা আভ্যন্তরীণ।	৪। ইহা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক।
৫। ইহাতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্র কম।	৫। ইহাতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ, সহযোগিতা, জোটবন্ধন প্রভৃতির প্রয়োজন।
৬। ইহা কারবার বিশেষের অপচয় নিবারণে ব্যাপৃত।	৬। ইহা শিল্প-সংক্রান্ত যাবতীয় অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা দূরীকরণে ব্যাপৃত।
৭। ইহার উদ্দেশ্য পণ্যের বাজারের সহিত কারবারের সামঞ্জস্য বিধান।	৭। ইহার উদ্দেশ্য শিল্পের সমগ্র উৎপাদনের সহিত ভোগের সামঞ্জস্য বিধান।
৮। ইহা অংশমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী।	৮। ইহা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী।
৯। ইহা কোনও নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় থাকে।	৯। ইহা জাতীয় স্তরে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় থাকে।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা	শিল্পসংস্কার
১০। জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য কোন অদক্ষ প্রতিষ্ঠানের বিলোপ-সাধন ইহার অধিকারের বাহিরে।	১০। জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য ইহা কোন অদক্ষ প্রতিষ্ঠানের বিলোপ-সাধন করাইতে পারে।
১১। ইহাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা বন্ধ হয় না।	১১। ইহা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস করিতে বা বন্ধ করিতে পারে।
১২। ইহাতে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংস্কার বুঝায়।	১২। ইহা নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দিকেও দৃষ্টি দিয়া থাকে।

শিল্পসংস্কার এবং জাতীয়করণের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Rationalisation and Nationalisation)

শিল্পসংস্কার এবং জাতীয়করণের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শিল্পসংস্কার	জাতীয়করণ
১। ইহাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত নাও হইতে পারে।	১। ইহাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।
২। ইহা শিল্পোন্নয়ন পদ্ধতি।	২। ইহা রাষ্ট্রায়ত্ত করার নীতি।
৩। প্রতিযোগিতা হ্রাস বা দূর করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য ইহা গৃহীত হয়।	৩। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে এই নীতি গৃহীত হয়।
৪। কোন শিল্পের অর্থ নৈতিক সমস্যা সমাধান এবং অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ইহা গৃহীত হয়।	৪। ইহা জাতীয় অর্থ নৈতিক সমস্যা সমাধান এবং জাতীয় অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়।
৫। ইহার উদ্দেশ্য কোন শিল্পের সামগ্রিক উন্নতি-সাধন।	৫। ইহার উদ্দেশ্য দেশের সামগ্রিক উন্নতি-সাধন।
৬। ইহাতে বেসরকারী মালিকানা বিলুপ্ত হয় না।	৬। ইহাতে বেসরকারী মালিকানা বিলুপ্ত হয়।
৭। ইহা সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইহাতে বেসরকারীর সহিত সরকারের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ থাকে।	৭। ইহা সর্বৈব সরকারী ব্যাপার এবং ইহার সহিত শিল্পসংস্কারও যুক্ত থাকিতে পারে।
৮। ইহা প্রযুক্ত হয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত ব্যক্তিগত কারবারের দুর্বলতা দূর করার জন্য।	৮। ইহা প্রযুক্ত হয় ব্যক্তিগত কারবার উচ্ছেদের জন্য।

উৎপাদিকাশক্তি (Productivity)

বর্ধিত উৎপাদন এবং বর্ধিত উৎপাদিকাশক্তি এক জিনিস নহে। উৎপাদন বলিতে মোট উৎপাদিত পণ্যকে বুঝায়। উৎপাদনের উপকরণ বেশী পরিমাণে নিয়োজিত হইলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহা বর্ধিত উৎপাদন (increased production)। পূর্বে যে উপকরণের সাহায্যে ১০ মণ উৎপন্ন হইত, বর্তমানে উহা অপেক্ষা বেশী উপকরণের সাহায্যে ১০ মণের বেশী উৎপন্ন করা সম্ভব। ইহা বর্ধিত উৎপাদনের উদাহরণ।

কিন্তু বর্ধিত উৎপাদিকাশক্তি ভিন্ন জিনিস। উৎপাদন বেশী হইলে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে বা নাও পাইতে পারে। উৎপাদনে যে সকল উপকরণ বা উপাদান নিযুক্ত হয় উহার ফলে যে উৎপাদিত দ্রব্য পাওয়া যায় তাহার সহিত উক্ত উপকরণের যে অনুপাত তাহাই উৎপাদিকাশক্তি।

সুতরাং $$\text{উৎপাদনশক্তি} = \frac{\text{উৎপাদিত দ্রব্য}}{\text{নিয়োজিত উপকরণ}}$$ ।

উৎপাদনের উপকরণ কতটা দক্ষতার সহিত নিয়োজিত হইয়াছে তাহার মাপকাঠি হইতেছে উৎপাদিকাশক্তি। একই পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করিয়া যদি পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন হয় তবে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা চলে। ইহাই বর্ধিত উৎপাদিকাশক্তি (increased productivity)। কিন্তু একই পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করিয়া যদি পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন হয় তবে উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। আর যদি উৎপাদনের পরিমাণ একই থাকে তবে উৎপাদিকাশক্তি স্থির ও নির্দিষ্ট আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

উৎপাদিকাশক্তি উৎপাদনের দক্ষতা নিরূপণের জন্যই ব্যবহৃত হয়। উৎপাদনের উপাদানগুলি দক্ষতা ও বিজ্ঞতার সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা তাহার পরিমাণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের দক্ষতা বিচার করা চলে। আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিকাশক্তি দেখিয়া উহাদের তুলনামূলক বিচার করা চলে। ইহা ছাড়া প্রত্যেকটি উৎপাদনের উৎপাদিকাশক্তিও ইহার সাহায্যে নির্ণয় করা চলে। যেমন শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি নির্ণয় করার নিয়ম—

$$\frac{\text{উৎপাদিত পণ্য}}{\text{শ্রম ঘণ্টা অর্থাৎ মোট শ্রমিক} \times \text{কাজের ঘণ্টা}} = \text{শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি।}$$

উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি (steps) গ্রহণ করা যাইতে পারে। উহারা উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় (means) বা যন্ত্র (tools)।

(ক) সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ।

(খ) কারবারের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ও অবস্থার প্রয়োজনবোধে পুনর্বিন্যাস এবং উহার উৎকর্ষ সাধন।

(গ) সময় ও গতি নিরীক্ষণ দ্বারা দ্রুততর ও উন্নততর উপায়ে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন কার্যের উৎকর্ষ বিধান।

(ঘ) প্রেরণামূলক মজুরী প্রথা প্রবর্তন, শ্রমিককল্যাণের উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি বিধান।

(ঙ) উৎপাদনব্যবস্থার সরলীকরণ ও বিশেষীকরণ এবং উৎপাদিত পণ্যের মান নির্ধারণ।

(চ) পণ্যের উৎপাদন ব্যয়-সঙ্কোচ, উহার উৎকর্ষসাধন ও গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ, মজুত নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ছ) উৎপাদনে বিভিন্ন পর্যায়ে যোগ্য ও উপযুক্ত কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগ এবং উহাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা।

(জ) পণ্য ও পণ্যের উৎপাদনের ক্রমোন্নতির জন্য গবেষণার সুবন্দোবস্ত।

উৎপাদিকাশক্তির বিভিন্ন দিক (Different Aspects of Productivity)

উৎপাদিকাশক্তি সম্বন্ধে ধারণা সহজে জন্মিলেও ইহার পরিমাপ করা মোটেই সহজ নয়। সাধারণত সংখ্যা, ওজন বা মূল্য দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ স্থির করা হয়। কিন্তু সাদৃশ্যবিহীন বিভিন্ন উপাদানের পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। এজন্য শ্রম, কাঁচামাল, মূলধন প্রভৃতি যে কোন একটি উৎপাদনের ভিত্তিতে উৎপাদিকাশক্তির হার নির্ণয় করা হয়। কিন্তু ইহার ফলে উৎপাদিকাশক্তির হার নির্ণয়ে ত্রুটি অবশ্যই থাকিয়া যায়। তবে এই ত্রুটি অনেকটা দূর হয় যদি উৎপাদনের মধ্যে যে উপাদানের গুরুত্ব সর্বাধিক তাহার সহিত উৎপাদিত পণ্যের অনুপাত বাহির করা হয়। এজন্য সাধারণত উন্নত দেশে শ্রম এবং অনুন্নত দেশে মূলধন উৎপাদিকা-শক্তির হার নির্ণয়ের ভিত্তি হইয়া থাকে।

অধিকাংশক্ষেত্রে 'উৎপাদিকাশক্তি' কথাটি 'শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি' (labour productivity) বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। শ্রমের যোগানের স্বল্পতার দরুণ শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শ্রমশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার প্রধান সমস্যা বলিয়া শ্রমশক্তির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তদনুযায়ী উৎপাদিকাশক্তির হার নির্ণয় করা হয়। ইহাতে যে কোন ত্রুটি নাই এরূপ বলা চলে না। ইহাতে দক্ষ ও অদক্ষ, অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ শ্রমিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা হয় না। ফলে ইহা অবাস্তব হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ছাড়া শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি শুধু শ্রমিকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। কারিগরি বিদ্যার উন্নতি, কাঁচামাল ও অন্যান্য জিনিসের যোগান, শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সম্পর্ক, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ প্রভৃতি নানাবিষয়ের উপর উহা নির্ভর করে।

সমষ্টিগত উৎপাদিকাশক্তি 'আনুকূল্য বিধায়ক মূল্য' (Contributed value) নিরূপণ দ্বারাও নির্ণয় করার রীতি প্রচলিত দেখা যায়। উৎপাদনের মোট ব্যয় হইতে প্রতিষ্ঠানের বাহির হইতে সংগৃহীত সম্পদের মূল্য বাদ দিয়া ইহা নির্ণয় করা হয়। ইহাই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত সম্পদের অবদান বা প্রতিদান বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু ইহার সাহায্যে পরিমাণাত্মক (Quantitative) বিষয়গুলির পরিমাপ করা চলে, কিন্তু গুণাত্মক (Qualitative) বিষয়গুলির পরিমাপ করা চলে না। কিন্তু উৎপাদন সহায়ক হিসাবে গুণাত্মক বিষয়গুলির গুরুত্বই বেশী।

সুতরাং উৎপাদিকাশক্তির পরিমাপ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু ইহার মূলসূত্রের উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করেন না। উৎপাদনে বস্তুসম্পদ ও জনসম্পদ উভয়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বস্তুসম্পদের উৎপাদিকাশক্তি একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু জনসম্পদের উৎপাদিকাশক্তির কোন নির্দিষ্ট মান নাই। সুতরাং জনসম্পদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং উহাদের মাধ্যমে বস্তুসম্পদের যথাযথ প্রযোগের উপরই উৎপাদিকাশক্তির উৎকর্ষ নিভর করে ইহা সর্বজনস্বীকৃত। এজন্য জনসম্পদের সদ্ব্যবহার ভিন্ন যে ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ আসিতে পারে না ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইযা অগ্রসর হইলে উৎপাদিকাশক্তির আলোচনা সার্থকরূপ পরিগ্রহ করিবে:

উৎপাদিকাশক্তির সুফল দুইটি পর্যায়ে প্রয়োগ করা চলে—প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে (Unit level) এবং জাতীয় পর্যায়ে (National level)। প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে উৎপাদিকাশক্তি নির্ধারণ দ্বারা কারবারের সাফল্য নির্ণয় করা যায়। ইহার সূচক-সংখ্যা দ্বারা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক বিভাগের এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যদক্ষতা নির্ণয় করা চলে এবং তদনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অগ্রসর হইতে পারে। ইহার দ্বারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও পরিমাপ করার সুবিধা হয। ইহার ফলে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়ার যৌক্তিকতা বিচার করা চলে, শিল্পসংস্কার, পুনর্গঠন, নবীকরণ প্রভৃতির কার্যকারিতা নিরূপণ করা সম্ভব হয়।

জাতীয় পর্যায়ের উৎপাদিকাশক্তি বলিতে দেশের উৎপাদন এবং উহাতে নিয়োজিত উপাদানের সম্পর্ককেই বুঝায়। ইহা ছাড়া ইহা দ্বারা শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি কিংবা যাবতীয় উৎপাদিত পণ্য ও সেবাকর্মের সহিত জাতীয় সম্পদের অনুপাতকেও বুঝাইতে পারে। ইহার দ্বারা যাহাই বুঝান হউক না কেন জাতীয় পর্যায়ের উৎপাদিকাশক্তির সূচক নানাভাবে দেশের কল্যাণ সাধনে সহায়তা করিতে পারে। ইহার সাহায্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা, শিল্পসংরক্ষণ, দেশের কর ও রাজস্বনীতি নির্ধারণ, শ্রমকল্যাণ ব্যবস্থা গ্রহণ, বর্তমানে শিল্পোন্নতি এবং উহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিরূপণ, দ্রব্যমূল্য, কর্মসংস্থান, মজুরী নির্ধারণ প্রভৃতির সুষ্ঠু মীমাংসা সম্ভব হইতে পারে।

উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক (Contributories to Increased Productivity)

উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি বিশেষ অবস্থা বা সহায়ক প্রয়োজন। ঐ অবস্থাগুলি উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। নিম্নে উহাদের উল্লেখ করা হইল :

১। **ব্যবস্থাপনার অবস্থা (Management Factor) :** সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। যে কারবারে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা যত বেশী সে কারবারে উৎপাদিকাশক্তিও তত বেশী। এজন্য প্রত্যেক কারবারে উৎসাহী, উদ্যোগী, শিক্ষিত, অভিজ্ঞ, সুদক্ষ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য।

২। **কারিগরি অবস্থা (Technological Factor) :** কারিগরি বিদ্যা উন্নত না হইলে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। যে দেশ কারিগরি বিদ্যায় যত উন্নত সে দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদিকাশক্তিও তত বেশী। কারিগরি বিদ্যা উন্নত হইলে নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কার সম্ভব হয় এবং উক্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োগ হইলে উৎপাদিকাশক্তিও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

৩। **আর্থিক অবস্থা (Financial Factor) :** উন্নত যন্ত্রপাতি ও সুদক্ষ ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হইলে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এজন্য কারবারের আর্থিক সঙ্গতি ভাল হওয়া প্রয়োজন। কারণ উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন না থাকিলে উন্নত যন্ত্রপাতি, উৎকৃষ্ট কাঁচামাল, সুদক্ষ ব্যবস্থাপক প্রভৃতি নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং আর্থিক সঙ্গতিও কারবারের উৎপাদিকাশক্তির সহায়ক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

৪। **সামাজিক অবস্থা (Social Factor) :** সামাজিক সংগঠন ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপরও কারবারের উৎপাদিকাশক্তি অনেকটা নির্ভর করে। সমাজ প্রগতিশীল হইলে, উহার জাতীয়তাবোধ প্রবল থাকিলে, উহার লোকদের আর্থিক সঙ্গতি ভাল থাকিলে এবং শিল্পোন্নয়নের আগ্রহ ও প্রবণতা থাকিলে তাহারা শিল্পোন্নতির সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে পারে। এইভাবে সামাজিক পরিস্থিতি উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হইয়া থাকে।

৫। **প্রাকৃতিক অবস্থা (Natural Factor) :** যে দেশে নানাপ্রকার প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য আছে, জলবায়ু ও অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থা শিল্প প্রচেষ্টার অনুকূল সে দেশে শিল্পোন্নতি ত্বরান্বিত হওয়ার সুযোগ-সুবিধাও বেশী এবং উন্নত প্রণালী প্রবর্তনের ফলে শিল্পের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পায়। এজন্য অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা উৎপাদিকাশক্তির সহায়ক হইয়া থাকে।

৬। **সরকারী নীতি (Government Policy):** শিল্পোন্নতির দিকে সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে এবং উহার আমদানি-রপ্তানি নীতি, করনীতি, মুদ্রানীতি, প্রশাসনিক নীতি প্রভৃতি শিল্পের অনুকূল হইলে উহার উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি সহজসাধ্য হয়। এজন্য সরকারী নীতিও উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

ভারতের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির আন্দোলন (Productivity Movement in India)

একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতে শিল্পের উৎপাদিকাশক্তি অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় কম। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করিতে এবং শিল্পের যথাযথ উন্নতি সাধন করিতে উহার আশানুরূপ উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধিও প্রয়োজন। ইহা না হইলে শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি বা উন্নততর জীবনযাত্রা কোনটাই সম্ভব হইবে না এবং দেশের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ইহা উপলব্ধি করিয়া স্বাধীনতা লাভের পর হইতে শিল্পের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার সচেষ্ট আছেন এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতেই এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। শিল্পে উৎপাদিকাশক্তি পর্যবেক্ষণের জন্য ১৯৫২ সালে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা' (International Labour Organisation)-র ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ চারিজনের এক প্রতিনিধিদল ভারতে আসেন। ইঁহাদের অনুসন্ধান ও সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার একটি 'জাতীয় উৎপাদিকাশক্তি কেন্দ্র' (National Productivity Centre) প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এজন্য 'আন্তর্জাতিক শিল্প-সংস্থার' আর একটি বিশেষজ্ঞ দল ভারতে আসেন। ইহারা বোম্বাই, আমেদাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি শহরে কয়েকটি শিল্পকারখানা পরিদর্শন করেন এবং ভারতীয় শিল্পের উৎপাদিকাশক্তির বর্তমান অবস্থা, শ্রমিকের দক্ষতা ও মজুরী, পরিচালন ব্যবস্থা প্রভৃতি পর্যালোচনা করিয়া ভারতে উৎপাদিকাশক্তি পরিষদ (Productivity Council) গঠনের প্রস্তাব করেন। ইহার পর ১৯৫৬ সালে ড. সারাভাইয়ের নেতৃত্বে এক ভারতীয় প্রতিনিধি-দল জাপানে শিল্প পরিদর্শন করিতে যান। উঁহারা ফিরিয়া আসিয়া ১৯৫৭ সালে তাঁহাদের সুপারিশসহ এক বিবরণী পেশ করেন। উঁহাদের সুপারিশ মত ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর উৎপাদিকাশক্তি সম্পর্কে এক সম্মেলন আহ্বান করেন এবং সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫৮ সালে ভারতে স্বয়ংশাসিত এক জাতীয় উৎপাদিকাশক্তি পরিষদ (National Productivity Council) গঠিত হয়।

এই পরিষদ সরকার, শিল্পপতি, শ্রমিক ও অন্যান্য গোষ্ঠীর ৬০ জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। দিল্লীতে ইহার প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। ইহাকে সাহায্য করিবার জন্য কলিকাতা, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কানপুর, লুধিয়ানা প্রভৃতি স্থানে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়। ইহা ছাড়া অনেক শিল্পকেন্দ্রে স্থানীয় উৎপাদিকাশক্তি পরিষদও

স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে জাতীয় উৎপাদিকাশক্তি পরিষদের প্রথম সভা হয়। উহাতে নিম্নলিখিত ৮ দফা কার্যসূচী গৃহীত হয়: (১) বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদিকাশক্তির বিভিন্ন বিনিময় দ্বারা উৎসাহ সৃষ্টি। (২) উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। (৩) বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। (৪) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক ভিত্তিতে পরিদর্শন। (৫) বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনয়ন। (৬) গবেষণা ব্যবস্থা। (৭) বিদেশে শিল্পকারখানা পরিদর্শন। (৮) স্থানীয় ও আঞ্চলিক পরিষদগুলিতে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান। ইহার পর ১৯৬০ সালে ইহার একটি সভায় ১৫ দফা কার্যক্রম রচিত হয়। উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির জন্য 'এশীয় উৎপাদিকা সংস্থার' (Asian Productivity Organisation) সভ্য হিসাবেও ভারত যোগদান করিয়াছে। সুতরাং এই বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয় শিল্পের উৎপাদিকাশক্তি আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. What is Scientific Management ? Scientific Management implies that Management is a Science. Do you think it is really a science ? If so, why ? [C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কাহাকে বলে? বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাতে বুঝাইয়া থাকে যে, ব্যবস্থাপনা একটি বিজ্ঞান। তুমি কি মনে কর যে, সত্যই ইহা বিজ্ঞান? যদি তাহাই হয় তবে কেন?

2. Why is F. W. Taylor described as the Father of Scientific Management ? Describe his contributions to this sphere.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1963]

এফ্. ডব্লিউ. টেলরকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয় কেন? এক্ষেত্রে তাঁহার কি অবদান?

3. What are the important elements of Scientific Management ? Do you think Scientific Management is above criticisms ? Give reasons for your answers. [C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রধান উপাদান কি? বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাকে কি তুমি সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে কর? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

4. Taylor laid down certain conditions for securing results by the application of Scientific Management in industry. What are those conditions ? [C. U. B. Com. (Pass) 1967]

শিল্পে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির দ্বারা ফললাভের জন্য টেলর কতকগুলি অবস্থার নির্দেশ দিয়াছেন। উক্ত অবস্থাগুলি কি?

5. Discuss the salient features of Scientific Management. What are its defects, if any ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1966, 1968]

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। যদি উহার ত্রুটি থাকে তবে সেগুলি কি ?

6. Discuss the features and principles of Scientific Management as propounded by F. W. Taylor. What are the criticisms of Scientific Management ? [B. U. B. Com. (Hons.) 1971]

এফ্. ডব্লিউ. টেলরের প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য ও নীতি আলোচনা কর। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সমালোচনা কি কি ?

7. It is suggested that Indian businessmen should introduce Scientific Management in their enterprises. Do you agree with this suggestion ? Give reasons for your answer.

[C. U. B. Com. (Pass) 1958]

ইহা প্রস্তাব করা হয় যে, ভারতীয় কারবারিগণের তাঁহাদের কারবারী প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা উচিত। তুমি কি এই প্রস্তাব সমর্থন কর ? যুক্তি-সহ উত্তর লিখ।

8. What do you understand by Rationalisation ? Do you think it is desirable to introduce it in old established industries in India ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1965]

শিল্পসংস্কার বলিতে কি বুঝ ? ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতন শিল্পগুলিতে কি শিল্প-সংস্কার প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় মনে কর ?

9. Do you think Rationalisation of old industries like Cotton or Jute is desirable when India is faced with a huge unemployment problem ? [C U. B. Com. (Hons.) 1963]

ভারতে বেকার সমস্যার প্রবলতা সত্ত্বেও কি কার্পাস বা পাটের মত পুরাতন শিল্প-গুলিতে শিল্পসংস্কার গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় মনে কর ?

10. What are the arguments for and against the Rationalisation of industries in India ? [B. U. B. Com. 1966]

ভারতের শিল্পগুলিতে শিল্পসংস্কার প্রবর্তনের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি কি ?

11. What is meant by Rationalisation ? Discuss if it is desirable to introduce it in old industries like cotton, jute or mining.

[C. U. B. Com. (Pass) 1968]

শিল্পসংস্কার কাহাকে বলে ? কার্পাস, পাট অথবা খনিজ শিল্পের মত পুরাতন শিল্পে উহা প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয় কি না আলোচনা কর।

12. What is the difference between 'increased productivity' and 'increased production'? What steps are usually advocated for increasing productivity? [C. U. B. Com. (Hons) 1967]

বর্ধিত উৎপাদিকাশক্তি বা বর্ধিত উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য কি? উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির জন্য কি ব্যবস্থা সাধারণত গৃহীত হইতে পারে?

13. Is there any difference between increased production and increased productivity? *Discuss fully.*

[C. U. B. Com. (Pass) 1966]

বর্ধিত উৎপাদন এবং বর্ধিত উৎপাদিকাশক্তির মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? বিস্তারিত আলোচনা কর।

14. Explain the concept of Productivity. Enumerate the contributories to increased productivity.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1968 ; 1971]

উৎপাদিকাশক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা কর। উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির সহায়কগুলি উল্লেখ কর।

15. What is understood by the term Rationalisation? How does Rationalisation differ from Scientific Management?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1970]

শিল্পসংস্কার কাহাকে বলে? শিল্পসংস্কার ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য কি?

16. What is understood by the term 'Productivity'? What factors are considered important for raising Productivity?

[C. U. B. Com (Pass) 1972]

শিল্পে 'উৎপাদনশীলতা' বলিতে কি বুঝায়? উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কি কি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়?

17. What are the notable features of 'Scientific Management'? Enumerate its advantages. [C. U B. Com. (Pass) 1973]

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? উহার সুবিধাগুলি বর্ণনা কর।

ষোড়শ অধ্যায়

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংগঠন

(Organisation of Manufacturing Undertaking)

কারখানার স্থান নির্বাচন (Selecting the site for a factory)

কারখানার স্থান নির্বাচন এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কারণ সকল বিষয় বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবেচনা না করিয়া স্থান নির্বাচন করিলে শিল্পে সাফল্যলাভ করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। যে যে বিষয়গুলি সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে উহা নিম্নে দেওয়া হইল। উহাদিগকে মুখ্য (Primary) এবং গৌণ (Secondary) এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে :

১। **মুখ্য বিষয় (Primary Factors):** কারখানা স্থাপনের জন্য যে বিষয়গুলি সম্পর্কে অগ্রাধিকার দিতে হইবে উহা মুখ্য বিষয়ের অন্তর্গত। উহা নিম্নরূপ :

(ক) কাঁচামাল (Raw Materials): কারখানার স্থান নির্বাচনের জন্য কাঁচামালের সহজলভ্যতার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। কাঁচামাল প্রথমত দুই শ্রেণীর দেখিতে পাওয়া যায়—সর্বব্যাপী (ubiquitous) যেমন, জল, বালুকা, মৃত্তিকা প্রভৃতি এবং স্থানীকৃত (localised) যেমন, লৌহ, কয়লা, পাট, তুলা প্রভৃতি। কারখানার স্থান নির্বাচনের উপর সর্বব্যাপী কাঁচামাল বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু উহার স্থান নির্বাচনে স্থানীকৃত কাঁচামাল বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য এই কাঁচামাল প্রাপ্তির নিকটবর্তী স্থানেই কারখানা স্থাপিত হওয়া উচিত। ইহাতে কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যয় কম পড়ে এবং উহার নিয়মিত সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। স্থানীকৃত কাঁচামাল আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বিশুদ্ধ (Pure) যেমন, পাট, তুলা, পশম এবং স্থুল (Gross) যেমন, লৌহ আকরিক, কয়লা, ইক্ষু প্রভৃতি। পাট, তুলা, পশম প্রভৃতি বিশুদ্ধ কাঁচামাল শিল্পিত পণ্যে রূপান্তরিত হইলেও ওজনের দিক দিয়া বিশেষ পার্থক্য দেখা দেয় না। পরিবহনের অসুবিধা না থাকিলে কারখানা হইতে দূরে এরূপ কাঁচামাল অবস্থিত থাকিলেও চলে। কিন্তু স্থুল কাঁচামাল যেমন, লৌহ আকরিক, ইক্ষু প্রভৃতি শিল্পিত পণ্যে রূপান্তরিত হইলে ওজনের দিক দিয়া অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ফলে এরূপ কাঁচামালের নিকটবর্তী স্থানে কারখানা স্থাপন সর্বদিক দিয়াই বাঞ্ছনীয়। নতুবা পরিবহন ব্যয় অত্যধিক পড়ে এবং শিল্পিত পণ্যের মূল্যও অযথা বৃদ্ধি পায়। প্রতিযোগিতার বাজারে এরূপ পরিস্থিতি কারখানার সাফল্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

(খ) শক্তিসম্পদ (Power Resources): কারখানা পরিচালনার জন্য শক্তিসম্পদ অপরিহার্য। এজন্য যে শিল্পে প্রচুর শক্তিসম্পদ প্রয়োজন উহা শক্তিসম্পদের

নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে শক্তিসম্পদের পরিবহন ব্যয় কম পড়ে এবং উহা প্রাপ্তি সম্বন্ধেও অনেকটা নিশ্চিত থাকা যায়। কয়লা প্রধানত যখন শক্তিসম্পদের প্রয়োজন মিটাইত তখন কয়লাখনির নিকটবর্তী অঞ্চলেই শিল্পকারখানা আকৃষ্ট হইত। কারণ কয়লার পরিবহন ব্যয় পেট্রোলিয়াম বা জলবিদ্যুতের তুলনায় বেশী। বর্তমানে দূরবর্তী স্থান হইতে নলযোগে পেট্রোলিয়াম এবং তারের মাধ্যমে জলবিদ্যুৎ প্রাপ্তির সুবিধা আছে বলিয়া অনেক শিল্প শক্তিসম্পদের নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত না হইয়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতে পারিতেছে। সুতরাং শক্তিসম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী কারখানার স্থান নির্বাচন অবশ্য প্রয়োজন।

(গ) **শ্রমিক (Labour) :** যে সকল স্থানে কম মজুরিতে প্রচুর দক্ষ ও সাধারণ শ্রমিক প্রাপ্তির সুবিধা আছে সেই সকল স্থানেই কারখানা স্থাপন করা উচিত। এজন্য জনবহুল অঞ্চলে কারখানা স্থাপিত হইলে শ্রমিক সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকা যায় এবং মজুরিও কম পড়ে। তবে এ সম্বন্ধে কিছুটা ব্যতিক্রমও আছে। শ্রমিক উহার স্থানত্যাগে বিমুখ থাকিলে যেখানে শ্রমিকের সংখ্যা বেশী সেইখানে কারখানা স্থাপিত হইয়া থাকে। শ্রমিকের একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে কোন বাধা না থাকিলে দূরবর্তী স্থান হইতেও শ্রমিক সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে কারখানার নিকটে শ্রমিকদের বাসোপযোগী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(ঘ) **পরিবহন (Transport) :** কাঁচামাল সংগ্রহ ও শিল্পিত পণ্য বাজারে প্রেরণের জন্য কম ব্যয়ে উত্তম পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন। এজন্য পরিবহনের সুবিধাযুক্ত স্থানেই কারখানা স্থাপিত হওয়া উচিত।

(ঙ) **বাজার (Market) :** শিল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজারের নিকটবর্তিতাও কারখানা স্থাপনের জন্য বিবেচনা করা উচিত। পচনশীল, ভঙ্গুর, ভারী ও বৃহৎ আয়তনের পণ্যের কারখানা উহার বাজারের নিকটেই স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নতুবা পরিবহন ব্যয় অত্যধিক পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে যে জিনিস শিল্পিত পণ্যে রূপান্তরিত হওয়ার পরেও ওজনে বিশেষ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না উহার কারখানা পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা থাকিলে বাজার হইতে দূরেও অবস্থিত হইতে পারে।

(চ) **জাতীয় স্বার্থ ও সামরিক গুরুত্ব (National Interest and Strategic Consideration) :** উপরি-উক্ত বিষয়গুলির সুবিধা-অসুবিধা ছাড়াও বর্তমানে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য ও সামরিক গুরুত্বের জন্য শিল্প কারখানা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও নিরাপদ স্থানে স্থাপিত হওয়ার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং শিল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে। পরিবহনের বিস্তার ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া সুপরিকল্পিতভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা বর্তমানে অনেকক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

২। **গৌণ বিষয় (Secondary Factors) :** কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজন হইলেও ইহাদের প্রভাব গৌণ। ইহারা নিম্নরূপ :

(ক) জলবায়ু (Climate) : কৃষিজাত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল অনেক শিল্প অনুকূল জলবায়ু ভিন্ন ভালভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। যেমন, কার্পাস শিল্পের জন্য আর্দ্র কিন্তু ময়দা শিল্পের জন্য শুষ্ক জলবায়ু প্রয়োজন। এজন্য এরূপ শিল্পস্থাপন জলবায়ু-ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে কারখানার ভিতর শিল্পের উপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি করা যায় সত্য, কিন্তু উহাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। আবার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে কারখানা স্থাপিত হইলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং ইহার ফলে উহাদের কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। এজন্য কারখানা স্থাপনে অনুকূল জলবায়ুর দিকেও দৃষ্টি রাখা উচিত।

(খ) আর্থিক সুবিধা (Financial Advantages) : অর্থ ভিন্ন শিল্প কারখানা চলিতে পারে না। সুতরাং কারখানা স্থাপনে অর্থপ্রাপ্তির সুবিধাও বিবেচনা করিতে হইবে। এজন্য যেস্থানে ব্যাঙ্ক ও অর্থনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান থাকে সেস্থান কারখানা স্থাপনের অনুকূল বিবেচিত হইয়া থাকে।

(গ) জমির মূল্য (Cost of Land) : জমির মূল্য কম হইলে কারখানার জন্য অধিক পরিমাণ জমি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় এবং কারখানা সম্প্রসারণেরও সুযোগ-সুবিধা ঘটে। অন্যথায় জমির মূল্য বেশী হইলে অধিক মূলধন বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। সুতরাং জমির মূল্য, খাজনা, কর প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্থান নির্বাচন করা উচিত। এই বিবেচনায় শহরের মধ্যে অপেক্ষা শহরের আশে-পাশে কারখানা স্থাপিত হইলে ভাল হয়।

(ঘ) পরিপূরক শিল্প (Complementary Industries) : যে অঞ্চল শিল্পসমৃদ্ধ সে অঞ্চলে নানাপ্রকার পরিপূরক শিল্পও গড়িয়া উঠে। এই পরিপূরক শিল্পগুলি নানাভাবে প্রধান শিল্পকে সাহায্য করিয়া থাকে এবং অনেক জিনিসের যোগান দিয়া থাকে। ইহাতে প্রধান শিল্পের পক্ষে নানাদিক দিয়া ব্যয়-সংকোচ সম্ভব হয়। সুতরাং পরিপূরক শিল্পের সুবিধাও স্থান নির্বাচনে বিবেচনা করা উচিত।

(ঙ) সম্প্রসারণ (Expansion) : কারখানা স্থাপনের প্রথম অবস্থায় কম স্থান হইলে চলিতে পারে। কিন্তু কারখানা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর স্থানের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে যাহাতে অধিক স্থান সংগ্রহে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকেও স্থান নির্বাচনের সময় দৃষ্টি দিতে হইবে।

(চ) স্থানের সুনাম (Goodwill of the Localities) : বিশেষ বিশেষ শিল্প বিশেষ বিশেষ স্থানে স্থাপিত হইয়া স্থানের সুনাম ভোগ করিয়া থাকে। ইহা শিল্পের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক। এজন্য এরূপ সুপ্রসিদ্ধ স্থানে কারখানা স্থাপিত হইলে সুনামের জোরে অল্পকাল মধ্যে শিল্পে খ্যাতিলাভ করা সম্ভব হয়। সুতরাং স্থান নির্বাচনে ইহাও বিবেচনার বিষয়।

(ছ) সরকারী নীতি (Government Policy) : বর্তমানে ইচ্ছামত স্থানে অনেক শিল্প স্থাপন করা যায় না। উহা সরকারী নীতির আওতায় আসিয়া যায়। সুতরাং নিজের স্বার্থে ও জাতীয় স্বার্থে স্থান নির্বাচনে সরকারী নীতির দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কারখানার স্থান নির্বাচনের জন্য নানাবিধ বিষয় আলোচিত হইল। কোনও একটি বিষয়কে বা সবগুলি বিষয়কে ভিত্তি করিয়া স্থান নির্বাচন করা চলে না। সব বিষয় বিবেচনা করিয়া যেগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে বেশী সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে উহাদিগকে ভিত্তি করিয়া স্থান নির্বাচন করিতে হইবে।

কারখানা ছাড়া নানাবিধ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যেমন, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ইত্যাদির অফিসের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনও কারবারের সাফল্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। কতকগুলি বিষয়ে কারখানা ও অফিসের স্থান নির্বাচনের অবস্থাগুলি প্রায় একরূপ থাকিলেও উহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন সমস্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্থান নির্বাচন করিতে হয়। যেমন, একটি **ব্যাঙ্কের স্থান নির্বাচনে** নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচ্য :

(ক) পরিবহন সুবিধা, (খ) অর্থবিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা, (গ) ব্যবসা-মুখর স্থান, (ঘ) আমানতকারীদের সুযোগ-সুবিধা, (ঙ) সম্প্রসারণের উপযুক্ত স্থান, (চ) বন্দরের সান্নিধ্য, (ছ) স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, (জ) মাল মজুত রাখার মত গুদামের সুবিধা, (ঝ) কর্মচারীদের এবং ব্যাঙ্কের কাজ-কারবারে লিপ্ত ব্যক্তিদের ন্যায্যমূল্যে জলযোগ বা পানীয় গ্রহণ করার সুবিধা প্রভৃতি। সুতরাং অফিসের স্থান নির্বাচনে কোন বাঁধাধরা নিয়ম না থাকিলেও উপরি-উক্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য।

ভারতের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থান বিবেচনা করিলে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের শিল্পাঞ্চলগুলিতে উহাদের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিকেন্দ্রীয়করণের নীতি অনুসৃত হওয়ায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও অনেক শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের প্রাধান্য এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের অবস্থান নির্বাচনের প্রয়োজনীয় অনুকূল অবস্থা যে ইহার জন্য দায়ী একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন, **বাস্তুশিল্পে** (Engineering Industries) বোম্বাইয়ের তুলনায় কলিকাতার প্রাধান্য অনেক দিন হইতে। নিম্নলিখিত অনুকূল অবস্থাগুলি যে উহার জন্য দায়ী সেকথা নিঃসন্দেহে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) কাঁচামাল (লৌহ), (২) শক্তিসম্পদ (কয়লা, বিদ্যুৎ-শক্তি, তৈল), (৩) শ্রমিক (স্থানীয়, বিহার ও উড়িষ্যা হইতে আগত), (৪) পরিবহন (রেলপথ, জলপথ ও রাস্তা), (৫) বাজার (স্থানীয় ও বৈদেশিক), (৬) মূলধন (ব্যাঙ্ক ও ধনীব্যক্তিদের সান্নিধ্য), (৭) পরিপূরকশিল্প, (৮) বন্দরের সান্নিধ্য প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাট-শিল্পের স্থান নির্বাচনের অনুকূল অবস্থা—

ভারতে চট বা পাটকল প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের রিষড়ায় ১৮৫৫ সালে স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে ইহা বিস্তারলাভ করিতে থাকিলে উহার অধিকাংশ কলগুলিই হুগলী নদীর উভয় তীরে বৃহত্তর কলিকাতায় স্থাপিত হইতে থাকে। বর্তমানে ভারতে ৯৫টি পাটকল কার্যরত আছে। উহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর কলিকাতায় ৮৪টি, বিহারে ৩টি, অন্ধ্রে ৪টি, উত্তরপ্রদেশে ৩টি এবং মধ্যপ্রদেশে ১টি পাটকল দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বৃহত্তর কলিকাতাতেই অধিকাংশ পাটকলগুলি কেন্দ্রীভূত। নিম্নলিখিত কারণগুলিই উহার জন্য দায়ী :

(১) উত্তরবঙ্গ হইতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (পাট) প্রাপ্তির সহজলভ্যতা, (২) কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্যের বৈদেশিক চাহিদা এবং কলিকাতা বন্দরের উপযোগিতা, (৩) স্থান নির্বাচনে ও পাটকল স্থাপনে স্কটল্যাণ্ডবাসী শিল্পপতিদের প্রথম প্রচেষ্টায় এই স্থানের প্রাধান্য, (৪) শিল্পস্থাপনের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, যেমন, কলিকাতার নিকটবর্তী রাণীগঞ্জের কয়লা, জলপথে, স্থলপথে ও রেলপথে কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিবহন সুবিধা, স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি হইতে সুলভ শ্রমিক প্রাপ্তির সুবিধা, কলিকাতা বন্দর মারফত যন্ত্রপাতি আমদানি ও পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি সুবিধা, প্রয়োজনীয় মূলধন প্রাপ্তির সহজলভ্যতা, হুগলী নদীর জল ও উহার তীরবর্তী অঞ্চলের এই শিল্পের উপযোগী আর্দ্র জলবায়ু প্রভৃতি।

বর্তমানে জাতীয় স্বার্থ, সামরিক গুরুত্ব, অর্থনৈতিক অসাম্য প্রভৃতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইলেও শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ব্যাপারে উপরি-উক্ত বিষয়গুলি অবশ্যই বিবেচ্য।

কারখানার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস (Layout of a Factory)

পণ্য উৎপাদনের জন্য কারখানার ভিতর উহার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের যথাযথ স্থাপন কৌশলকে 'কারখানার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস' (Factory Layout) বলে। ইহার উদ্দেশ্য থাকে সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে সর্বাধিক উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদন। ইহার ফলে কাঁচামাল ও পণ্যের অপচয় দূর হয়, উৎপাদনে বিলম্ব হ্রাস ঘটে এবং সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন কার্য অগ্রসর হইতে পারে। সুতরাং নিম্নলিখিত বিশেষ অবস্থাগুলি বিবেচনা করিয়া 'কারখানার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস' স্থির করিতে হয়।

(ক) **শিল্পের প্রকৃতি (Nature of the Industry) :** শিল্পের প্রকৃতির উপর কারখানার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস অনেকাংশে নির্ভর করে। শিল্পের প্রকৃতি নানাপ্রকারের হইতে পারে। বস্ত্র, কাগজ, সুতা প্রভৃতি উৎপাদনের শিল্পে একদিকে কাঁচামাল গৃহীত হয় এবং পর পর কতকগুলি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া অন্যদিকে পণ্যটি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়া বাহির হয়। এরূপ শিল্পকে বলা হয় অবিরাম শিল্প (continuous industries)। এরূপ শিল্পে যন্ত্রপাতিগুলি উৎপাদন প্রক্রিয়া

অনুযায়ী পর পর সাজাইতে হয়। আবার মোটর গাড়ী, রেল ইঞ্জিন প্রভৃতি শিল্পে প্রথমে কতকগুলি পৃথক অংশ প্রস্তুত করিতে হয় এবং পরে উহাদিগকে একত্রিত করিয়া সম্পূর্ণ দ্রব্যটি প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে সবিরাম বা একত্রীকরণ শিল্প (intermittent or assembling industries) বলে। এরূপক্ষেত্রে যন্ত্রপাতিগুলি সাধারণত কাছাকাছি স্থাপন করিতে হয়। সুতরাং শিল্পের প্রকৃতিভেদে কারখানার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। মোটের উপর পণ্য উৎপাদনের এক প্রক্রিয়া হইতে অন্য প্রক্রিয়ায় যাহাতে সহজে ও স্বচ্ছন্দে যাওয়া যায় এবং যাহাতে ক্রমপর্যায় (sequence) বজায় থাকে তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

(খ) **পণ্যের প্রকৃতি (Nature of the Product):** পণ্যের প্রকৃতির উপরও কারখানার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস নির্ভর করে। পণ্যটি ভারী হইলে একপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং হাল্কা হইলে অন্যরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

(গ) **উৎপাদনের পরিমাণ (Quantity of Production):** কারখানা বৃহৎ হইলে অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন হইয়া থাকে। কিন্তু কারখানাটি ছোট হইলে পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ স্বভাবতই কম হইবে। সুতরাং এই পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ বিভিন্ন রূপ হইলে কারখানার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস একরূপ হইতে পারে না।

(ঘ) **উৎপাদন-প্রক্রিয়ার প্রকৃতি (Nature of the Productive Operation):** শিল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী উহার উৎপাদন প্রক্রিয়া স্থির হইয়া থাকে। এজন্য কোন উৎপাদন-প্রক্রিয়া অবিরাম (Continuous), কোনটা বিশ্লেষণাত্মক (Analytical), কোনটা সংযোগাত্মক (Synthetical) আবার কোনটা একত্রীকরণ (Assembling)। সুতরাং উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিভিন্নতার দরুণ কারখানার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস একরূপ হইতে পারে না।

(ঙ) **উৎপাদনের প্রকৃতি (Nature of Production):** উৎপাদনের প্রকৃতি অনুযায়ী কারখানার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস স্থির করিতে হয়। সাধারণত তিন প্রকারের উৎপাদন প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়—(১) স্বতন্ত্র পণ্য উৎপাদন (job production), (২) দলবদ্ধ পণ্য উৎপাদন (batch production), (৩) বহুল পণ্য উৎপাদন (mass production)। সামান্য ঠিকা বা খুচরা কাজের ভিত্তিতে যে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন হয় উহাকে বলা হয় 'স্বতন্ত্র পণ্য উৎপাদন'। ঠিকা বা খুচরা কাজের ভিত্তিতে কতকগুলি পণ্য উৎপাদন হইলে উহাকে বলা হয় 'দলবদ্ধ পণ্য উৎপাদন'। সমমানের একই পণ্যের যে বিরামহীন প্রচুর উৎপাদন উহাকে বলা হয় 'বহুল পণ্য উৎপাদন'। স্বতন্ত্র পণ্য উৎপাদন ও দলবদ্ধ পণ্য উৎপাদনে 'সাধারণার্থক যন্ত্রপাতি' (general purpose machines) ব্যবহৃত হয় এবং এজন্য ভিন্ন ভিন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য যন্ত্রবিন্যাসের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। কিন্তু 'বহুল পণ্য উৎপাদনে' 'বিশেষার্থক যন্ত্রপাতি' (special purpose machines) ব্যবহৃত হয় এবং সমমানের একই প্রকার পণ্য উৎপাদনের জন্য যন্ত্রবিন্যাসের কোন পরিবর্তন প্রয়োজন

হয় না। সুতরাং কারখানায় আভ্যন্তরীণ বিন্যাসের সময় এদিকেও সতর্ক দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

(চ) শ্রমিকের প্রকৃতি (Nature of Labour): শ্রমিক দক্ষ, অদক্ষ, নারী, পুরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির হইতে পারে। এই প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্য কারখানার আভ্যন্তরীণ বিন্যাসও বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

উপরি-উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে কারখানার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস বিভিন্ন রূপ হইতে বাধ্য। এই বিভিন্নতার মধ্যে নিম্নলিখিত দুই প্রকারের বিন্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১। পণ্যগত বিন্যাস (Product or Line Layout): ইহাতে উৎপাদনের স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সারিবদ্ধভাবে সাজান থাকে এবং উহার একদিকের যন্ত্রে কাঁচামাল প্রবেশ করাইলে উহা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যন্ত্রের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয় এবং পর পর বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া অবশেষে সম্পূর্ণ দ্রব্যে পরিণত হয়। ইহা বহুল পণ্য উৎপাদন, বিশ্লেষণাত্মক ও সংযোগাত্মক শিল্পের পক্ষে উপযুক্ত।

এরূপ বিন্যাসের সুবিধা হইতেছে—ইহাতে উৎপাদনের গতি অব্যাহত থাকে, সময়ের সংক্ষেপ হয়, স্থানের সদ্ব্যবহার করা চলে, কাঁচামাল স্থানান্তর করা হয়, উৎপাদনে বিঘ্ন কম ঘটে এবং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণও সহজসাধ্য হয়।

কিন্তু ইহার অসুবিধা হইতেছে—ইহাতে কোন যন্ত্র বিকল হইলে উৎপাদন ব্যবস্থায় অযথা বিরতি ঘটে, পুরাতন দ্রব্যের পরিবর্তে নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে বিন্যাসের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়, উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট না হইলে যন্ত্রপাতির পূর্ণ ব্যবহার হয় না, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিও করা যায় না এবং পর্যবেক্ষণ ব্যাপারে বিশেষীকরণ স্থান পায় না।

২। প্রক্রিয়াগত ও ক্রিয়াগত বিন্যাস (Process or Functional Layout): ইহাতে উৎপাদনের প্রক্রিয়া বা ক্রিয়া অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তবে একইরূপ কার্যগুলির জন্য উহাতে নিযুক্ত যন্ত্রগুলি একই স্থানে বা বিভাগে সন্নিবিষ্ট করা হয়। যেমন সকল 'ওয়েল্ডিং' কাজের যন্ত্রপাতি 'ওয়েল্ডিং বিভাগে', সকল 'ড্রিলিং' কাজের যন্ত্রপাতি 'ড্রিলিং বিভাগে' থাকে। এইভাবে ইহাতে লেদ (Lathe), ড্রিলিং (Drilling), গ্রাইণ্ডিং (Grinding), পেইন্টিং (Painting), ওয়েল্ডিং (Welding), বোরিং (Boring), মিলিং (Milling), পলিশিং (Polishing), এসেম্ব্লিং (Assembling) প্রভৃতি বিভাগ বা কর্মশালার সৃষ্টি হয়। স্বতন্ত্র পণ্য উৎপাদন, দলবদ্ধ পণ্য উৎপাদন, একত্রীকরণ প্রভৃতির জন্য এরূপ বিন্যাস সুবিধাজনক। ইহার সুবিধা হইতেছে—ইহার পরিবর্তনশীলতা বেশী, পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেও ইহাতে কোন অসুবিধা হয় না, যন্ত্রপাতির পূর্ণব্যবহারও সহজসাধ্য, পর্যবেক্ষণে ও শ্রমের বিশেষীকরণ অনায়াসে স্থান পায়, অল্প সংখ্যক যন্ত্রের দ্বারা অধিক পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয় এবং মূলধনের বিনিয়োগ কম হইলেও চলে।

কিন্তু ইহার অসুবিধা হইতেছে—ইহাতে উৎপাদনের গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা যায় না, বেশী স্থানের প্রয়োজন হয়, আভ্যন্তরীণ মাল চলাচলেও ব্যয় বেশী পড়ে, একটি পণ্য উৎপাদনের জন্য বেশী সময় লাগে, কাজ জমিয়া থাকে এবং উৎপাদনের গতি নিয়ন্ত্রণেও অসুবিধা দেখা দেয়।

যন্ত্রপাতির বিন্যাস ছাড়া ইহাতে অন্যদিকেও মনোযোগ দিতে হয়। পণ্য খালাস ও পণ্য বোঝাই, ইহার অফিস ঘর, বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মচারীদের বসিবার স্থান, বিভিন্ন বিভাগগুলির সাজ-সজ্জা, মনোরম ও স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। যেমন, পণ্যগ্রহণ ও প্রেরণ বিভাগ কারখানার প্রবেশদ্বারে বা উহার বাহিরে অবস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

অফিসের আভ্যন্তরীণ বিন্যাস (Layout of an Office)

অফিসের চেম্বার, টেবিল, আলমারি, বিভিন্ন বিভাগ, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বসিবার স্থান এবং অন্যান্য বিষয়ের স্থাপন কৌশলকে অফিসের আভ্যন্তরীণ বিন্যাস বলে। উক্ত বিন্যাসের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে :

কোনও কারবারের অফিস উক্ত কারবারের স্নায়ুকেন্দ্র। উহার শৃঙ্খলা, পারিপাট্য, সময় ও অর্থের সাশ্রয়, দক্ষতা প্রভৃতির উপর অফিসের সুনাম নির্ভর করে। অফিসের সুনামের উপর ব্যবসায়ের সুনাম অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং অফিস পরিচালনা সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর সতর্ক দৃষ্টি থাকা উচিত। কিভাবে অফিসের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে সে সম্বন্ধেও ব্যবসায়ীর বা উহার কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কোন্ অফিস কিভাবে পরিচালিত হইবে তাহার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। উহা ব্যবসায়ের প্রকৃতি, আয়তন, পরিধি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। একটি ছোট অফিস পরিচালনা করিতে উহার মালিকের হয়ত কোনও বেগ পাইতে হইবে না, কিন্তু যেখানে অফিসটি বড হইবে, যেখানে শত শত বা হাজার হাজার লোক কাজ করিবে সেখানে অফিস পরিচালনার কাজ মোটেই সহজসাধ্য নয়। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, দক্ষতা প্রভৃতি দ্বারাই সুষ্ঠু অফিস পরিচালনায় সুনাম অর্জন করা সম্ভব। তবে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মনে রাখিলে উক্ত কাজের সহায়তা হইতে পারে :

(১) অফিসকে 'কাজ' (function) অনুযায়ী বা অন্য কোন উপায়ে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। একই প্রকারের 'কাজ' একই বিভাগে সাধারণত থাকিবে এবং ঐ বিভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে এবং তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিবার ভার ও দায়িত্ব একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

(২) নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের কাজ তদারকের ব্যবস্থা থাকিবে এবং একজনের কাজ অপর একজনের হাত দিয়া যাহাতে পরীক্ষিত হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে।

(৩) চেয়ার, টেবিল, আলমারি প্রভৃতি এমনভাবে বিন্যস্ত করিতে হইবে যাহাতে অনায়াসে চলাফেরা করার কোন বাধা না থাকে এবং অযথা জায়গা আটকাইয়া না থাকে। যে সমস্ত কর্মচারীর মধ্যে কাজের জন্য যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন তাহা যাহাতে ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন করা যায় তৎপ্রতিও দৃষ্টি দিতে হইবে। আবার কর্মচারিগণ অযথা গল্প করিয়া সময় নষ্ট না করেন, তজ্জন্য উপরওয়ালার দৃষ্টি যাহাতে পড়িতে পারে সেদিকেও সতর্ক হইতে হইবে। আবার আসবাবপত্র এমনভাবে বসান উচিত যাহাতে প্রয়োজনীয় খাতাপত্র, কাগজ, ফাইল প্রভৃতি প্রয়োজনের সময় অনায়াসলভ্য হয়। অফিসের মধ্যে যাহাতে আলো-হাওয়া প্রবেশ করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। অফিস ঘর সব সময়ই সাজানো-গোছানোভাবে রক্ষিত হওয়া উচিত এবং দেওয়ালগুলির চুনকাম ও আসবাবপত্রের বার্ণিশ মলিন হওয়ার পূর্বেই উহার সংস্কার প্রয়োজন। ইহাতে কর্মচারীদের কাজ করিবার যেমন একটা তৃপ্তিপূর্ণ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবে অপরপক্ষে বাহিরের লোকের নিকটও ইহা মর্যাদা আদায় করিতে পারিবে।

(৪) প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা এবং নিভৃততা রক্ষার জন্য পর্দা ও সীমা প্রাচীর (partition) দেওয়ার বন্দোবস্তও থাকা প্রয়োজন। স্নানাগার ও শৌচাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকাও আবশ্যক।

(৫) বাহিরের লোকদের বসিবার ব্যবস্থা এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৬) প্রয়োজনমত আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে হইবে। ইহা সময়, শ্রম ও অর্থের লাঘব ঘটাইবে, পরন্তু শুদ্ধ কাজ সম্বন্ধেও নিশ্চয়তা আনিয়া দিবে। কিন্তু এ সমস্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার পূর্বে উহার ব্যয়, চালনা-করার কলা-কৌশল, মেরামত ব্যয়, দ্রুততা, গুণাগুণ, কার্যক্ষম থাকার সময় প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রত্যেকটি যন্ত্র যাহাতে পূর্ণভাবে ব্যবহার করা চলে তদনুযায়ী কার্যের ব্যাপকতা এবং অন্যান্য অফিসে উক্ত যন্ত্রের কার্যকারিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যন্ত্রের ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা না থাকিলে উহা কখনও ক্রয় করা উচিত নয়।

(৭) যোগ্যতা হিসাবে কাজবণ্টন ও কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতন, উন্নতির সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি ব্যবস্থা থাকাও অফিস পরিচালনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

কারবারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ (Different Departments of a Business Organisation)

কারবারের কার্যাবলীর সাধারণত দুই দিক। প্রথমত, ইহার উৎপাদনের দিক। কারখানা পরিচালনা এবং উৎপাদনের আনুষঙ্গিক কাজ ইহার অন্তর্গত। দ্বিতীয় হইতেছে ইহার বাণিজ্যিক দিক। কাঁচামাল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়-সংক্রান্ত কাজ ইহার অন্তর্গত। উপরি-উক্ত কার্যগুলি

সুষ্ঠু সমাধানের জন্য উহার কারখানা ও অফিস থাকে এবং কার্যে দক্ষতা, পণ্য উৎপাদনে বিশেষীকরণ, খরিদ্দারদের সন্তুষ্টিবিধান প্রভৃতির প্রয়োজনে কারবারী প্রতিষ্ঠানের কারখানা ও অফিস সাধারণত নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায় :

১। **পরিকল্পনা বিভাগ (Planning Department) :** কি পণ্য উৎপাদন হইবে, কিভাবে উহার উৎপাদন কার্য সম্পন্ন হইবে এবং তজ্জন্য কি কি প্রয়োজন হইবে প্রভৃতি বিষয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এই বিভাগের কাজ।

২। **উৎপাদন বিভাগ (Production Department) :** এই বিভাগই কোন শিল্পীয় কারবারের প্রাণকেন্দ্র এবং কার্যস্থল। কারবারের মূল অন্যান্য বিভাগগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার সহায়ক বা সেবাকারী বিভাগ (Service Departments)। উৎপাদন বিভাগের কাজ উৎপাদনের সর্ববিধ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।

৩। **নগদান বিভাগ (Cash Department) :** এই বিভাগের মারফত টাকা আদান-প্রদান হইয়া থাকে। যিনি এরূপ টাকা আদান-প্রদান করেন তাঁহাকে 'খাজাঞ্চী' (Cashier) বলা হয়। বৃহৎ কারবার হইলে একাধিক 'খাজাঞ্চী' থাকিতে পারে। সেক্ষেত্রে একজন প্রধান 'খাজাঞ্চীর' অধীনে এবং পরিচালনায় অন্যান্য 'খাজাঞ্চী' কাজ করিয়া থাকেন। খাজাঞ্চীকে টাকা গ্রহণ করিবার সময় দাতাকে রসিদ (Receipt) দিতে হয় এবং টাকা প্রদান করিবার সময় গ্রহীতার নিকট হইতে রসিদ লইতে হয়। টাকা গ্রহণ অপেক্ষা টাকা প্রদান সম্পর্কে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। গ্রহীতা টাকা পাওয়ার যোগ্য কিনা এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী উক্ত টাকা প্রদান করার নির্দেশ দিয়াছেন কিনা প্রভৃতি দেখিয়া লইতে হইবে। টাকা প্রাপ্তির রসিদ (Voucher) বিশেষ যত্নসহকারে রাখিয়া দিতে হইবে। নগদান বহিতে (Cash Book) উক্ত লেন-দেন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া রাখিতে হইবে। দিনের শেষে অফিস ছুটি হওয়ার সময় টাকা লেন-দেনের রসিদ, লিখিত লেন-দেন প্রভৃতি দৃষ্টে 'হাতে নগদান' (Cash in hand) মিলাইয়া এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কর্তৃক পরীক্ষা করাইয়া খাজাঞ্চীকে অফিস হইতে সেদিনের মত বিদায় লইতে হয়।

৪। **হিসাব-রক্ষণ বিভাগ (Accounts Department) :** এই বিভাগ ব্যবসায়ের প্রত্যেক লেন-দেনের (Transaction) যাবতীয় হিসাবপত্র রাখিয়া থাকে এবং তৎসংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনা করিয়া থাকে। এজন্য এ বিভাগকে অন্যান্য বিভাগের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয় এবং প্রত্যেক বিভাগ হইতে হিসাব রক্ষার সমস্ত মালমশলা সংগ্রহ করিতে হয়। এই বিভাগের কার্যদক্ষতার ফলে কারবারের লাভ-লোকসানের গতিপ্রকৃতি পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যায়। নির্দিষ্ট সময় অন্তে লাভ-লোকসানের হিসাব (Profit and Loss Account) এবং উদ্বৃত্ত

পত্র (Balance Sheet) প্রস্তুত করাও এই বিভাগের কাজ। কারবার বৃহৎ হইলে একাধিক হিসাব-রক্ষক (Accountant) থাকিতে পারে। সেক্ষেত্রে একজন প্রধান হিসাব-রক্ষকের (Chief Accountant) অধীনে ও পরিচালনায় অন্যান্য হিসাব-রক্ষকগণ কাজ করিয়া থকেন।

৫। **ক্রয়-বিভাগ (Purchase Department)**: বিভিন্ন স্থান হইতে সস্তায় ভাল জিনিস ক্রয় করা এই বিভাগের কাজ। উৎপাদনের পণ্যদ্রব্য, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, স্টেশনারী প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করার ভার এই বিভাগের উপর থাকিতে পারে। এই বিভাগকে কারবারের প্রয়োজন এবং বাজারের গতি উভয়ই ভালভাবে বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। এজন্য বাজার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ও অভিজ্ঞ লোকদের দ্বারা এই বিভাগ পরিচালিত হওয়া উচিত। কোথা হইতে কখন কি পরিমাণ জিনিস ক্রয় করিতে হইবে তাহা না জানিতে পারিলে এ বিভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। কারবারে প্রকৃত লাভ লোকসান এই বিভাগের উপর অনেকটা নির্ভর করে। ভাণ্ডার (Stores) পরিচালন বিভাগের এবং কারখানা হইলে উৎপাদন (Production) বিভাগের সহিত এই বিভাগের যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। কারবার বৃহৎ হইলে একাধিক কর্মচারী এই বিভাগে নিযুক্ত থাকিবে এবং সেক্ষেত্রে উক্ত বিভাগের একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অধীনে এবং নির্দেশমত ইহারা কাজ করিবেন।

৬। **বিক্রয়-বিভাগ (Marketing or Sales Department)**: ক্রীত বা উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা এই বিভাগের কাজ। বিক্রয় পাইকারী বা খুচরা হইতে পারে। এজন্য পণ্যদ্রব্য বিপণিতে সাজানোর প্রয়োজন হইতে পারে। বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়ার্থ পণ্যদ্রব্য পাঠানোর কাজও এই বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকিতে পারে। উপযুক্ত মূল্যে যথেষ্ট পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করাই এই বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য। কারবারের লাভ এই বিভাগের দক্ষতার উপরও নির্ভরশীল। পণ্যদ্রব্য ক্রেতাদের মধ্যে বিজ্ঞাপন বা বিক্রয় উদ্যোগীদ্বারা (Salesman) প্রচার করারও প্রয়োজন আছে। সেজন্য অন্য বিভাগও থাকিতে পারে বা এই বিভাগের কার্যও হইতে পারে। মাল প্যাক করা, রেলে, জাহাজে বা মোটরে বিভিন্ন স্থানে উহা প্রেরণ করাও ইহার কাজ হইতে পারে। কোন্ পথে কিভাবে মাল পাঠাইলে কম খরচে অল্প সময়ে ক্রেতার নিকট উহা পৌঁছাইতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। এই বিভাগের কাজকর্ম অধিক হইলে একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কার্য নির্বাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

৭। **টাইপ বিভাগ (Type Section)**: এই বিভাগের কাজ যাবতীয় চিঠিপত্র, বিবরণী, চালান প্রভৃতি পরিষ্কার ও নিখুঁতভাবে টাইপ করা। কাজের পরিমাণ অনুযায়ী একাধিক টাইপিষ্ট (Typist) নিযুক্ত হইতে পারে। হাতে লেখা অপেক্ষা টাইপ করা চিঠিপত্রাদির মর্যাদা অধিক। ইহাছাড়া অল্প সময়ে অনেক লেখার

কাজ টাইপ দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। প্রাপকের পক্ষেও টাইপ করা পত্রাদি পড়িবার কোন অসুবিধা হয় না।

৮। **বিলিবণ্টন বিভাগ (Despatch Section) :** বিভিন্ন বিভাগের চিঠিপত্র বা কারবারের পণ্য বিভিন্ন স্থানে পাঠানো এই বিভাগের কাজ। যে সমস্ত চিঠিপত্র বা পণ্য পাঠানো হইল তাহা সমস্তই একটি খাতায় লিখিয়া রাখিতে হয়। সমস্ত কিছুই ঠিকমত সময়ে পাঠানো এই বিভাগের প্রধান কর্তব্য।

৯। **রেকর্ড বিভাগ (Record Section) :** যে সমস্ত চিঠিপত্র আসে উহার কাজ শেষ হইলে এবং যে সমস্ত চিঠিপত্র বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয় উহাদের অনুলিপি এবং কারবার-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি গচ্ছিত রাখা এই বিভাগের কাজ। বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনমত উহা যোগান দেওয়া এবং পুনরায় গ্রহণ করাও ইহার অন্যতম কাজ। কোন খাতায় বা বহিতে এসমস্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া রাখিতে হয়। কারবার-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র এমনভাবে সাজাইয়া-গোছাইয়া রাখিতে হইবে যেন, প্রয়োজনের সময় উহা বাহির করিতে অযথা বিলম্ব না হয়।

১০। **চিঠিপত্রাদি নথিবদ্ধকরণ বিভাগ (Filing Section) :** এ বিভাগের কাজ চিঠিপত্রাদি নথিবদ্ধকরণ। চিঠিপত্রাদি 'নথিবদ্ধকরণ' পদ্ধতি বিভিন্ন। যে অফিসে যেরূপ পদ্ধতি চালু আছে সেইমত চিঠিপত্রাদি রাখিতে হইবে। কোনও অফিস যে পদ্ধতিই অবলম্বন করুক না কেন প্রয়োজনের সময় উহা বাহির করিয়া লইতে অযথা বিলম্ব না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

১১। **মালগুদাম বিভাগ (Store Department) :** উৎপাদনের কাঁচামাল বা উৎপাদিত বা ক্রীত পণ্য প্রথমে গুদামজাত করা হয়। এই গুদাম হইতে প্রয়োজন-মত মাল সরবরাহ করা হয়। সুতরাং যে সমস্ত মাল ক্রয় করা হইয়াছে উহা পরীক্ষা করিয়া রাখা এবং প্রয়োজনমত উহা ছাড় করা এই বিভাগের প্রধান কাজ। যে মাল গুদামে জমা হইল এবং যে মাল ছাড় করা হইল উহার হিসাব এই বিভাগকে রাখিতে হয়। কোন্ সময়ে কত মাল মজুত আছে ঐ হিসাব দৃষ্টে উহা স্থির করা হয়। কোন মাল ফুরাইয়া আসিলে উহা ক্রয় করার সংবাদও এই বিভাগ দিয়া থাকে। গুদামে মজুত মালের কোন ক্ষতি না হয় সেদিকেও এই বিভাগের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

১২। **বিজ্ঞাপন ও প্রচার বিভাগ (Advertisement and Publicity Department) :** পণ্যবিক্রয় কার্যে সহায়তা করিবার জন্য এই বিভাগ প্রয়োজন। পণ্যদ্রব্যের প্রচার ভিন্ন বিক্রয়কার্য ভালভাবে চলে না। সুতরাং কিভাবে কোন্ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলে বা অন্য কি উপায়ে পণ্যের প্রচার করিলে বিক্রয়ে সাফল্যলাভ হইতে পারে এই বিভাগ উহা স্থির করিবে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবে। এজন্য মালের বাজার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ প্রয়োজন। তবে এই বিভাগের ব্যয়বাহুল্যের জন্য কারবার ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১৩। সংবাদ ও অর্থসংগ্রহ বিভাগ (Intelligence and Collection Department) : বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ খরিদ্দারগণের আর্থিক সঙ্গতি এবং সুনাম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সাংবাদাদি সংগ্রহ করা এবং খরিদ্দারদিগের নিকট হইতে পাওনা টাকা আদায় করা ব্যাপারে সাহায্য করা এই বিভাগের কাজ। হিসাব-রক্ষণ বিভাগ খরিদ্দারদের নিকট যে টাকা পাওনা আছে তাহার একটি তালিকা এই বিভাগকে সময় সময় দিয়া থাকে এবং উক্ত তালিকা দৃষ্টে সময়মত তাগিদ দিয়া টাকা আদায়ের ব্যবস্থা এই বিভাগ করিয়া থাকে।

১৪। পরিব্যয় বিভাগ (Costing Department) : উৎপাদনের ব্যয় কোন্ স্তরে কিরূপ পড়িতেছে এবং কি পরিমাণে কোন্ জিনিস লইয়া উৎপাদনে সর্বাধিক লাভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে উহা নির্ধারণ করা এই বিভাগের কাজ।

১৫। শ্রমিক-কর্মচারী-সংক্রান্ত বিভাগ (Personnel Department) : কারবারের কারখানা ও অফিসের সকল বিভাগের কর্মচারী ও শ্রমিকদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, ছাঁটাই এবং উহাদের সর্বপ্রকার সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টি দেওয়া এই বিভাগের কাজ।

১৬। আইন ও কেন্দ্রীয় পত্রালাপ-সংক্রান্ত বিভাগ (Legal Matters and Central Correspondence Department) : কারবার বৃহৎ হইলে এরূপ বিভাগের প্রয়োজন খুবই অনুভূত হয়। সরকার, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সহিত কারবারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পত্রালাপ, আইনগত পরামর্শ প্রদান এবং কারবারের বিভিন্ন বিভাগের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা এই বিভাগের কাজ।

নথিবদ্ধকরণ এবং সূচীপত্রকরণ (Filing and Indexing)

ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয়ে প্রত্যহ যে সমস্ত চিঠি, দলিল এবং নানাবিধ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আদান-প্রদান হয় উহার উপযুক্ত স্থানে সুষ্ঠু সংরক্ষণকে 'নথিবদ্ধকরণ' (Filing) বলা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে আবশ্যকীয় চিঠিপত্রাদি যাহাতে অনায়াসে প্রয়োজনমত পাওয়া যায় তাহার উদ্দেশ্যেই 'নথিবদ্ধকরণ' ব্যবস্থা প্রত্যেক অফিসেই দেখিতে পাওয়া যায়।

অফিসের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ব্যাপারে নথিবদ্ধকরণের প্রয়োজন এবং গুরুত্ব (Importance) অশেষ। ব্যবসায়ের দক্ষতা ও সুনাম ইহার উপর অনেকটা নির্ভর করে। অফিসের সমস্ত কাগজপত্রই মূল্যবান। এক টুকরা কাগজ খুঁজিয়া পাইতে দেরী হইলে কিংবা হারাইলে ব্যবসায়ীর হয়ত অনেক টাকা ক্ষতি হইতে পারে। একখানি নির্দেশপত্র হারাইলে হয়ত কোন কর্মচারীর চাকুরী চলিয়া যাইতে পারে। সুতরাং ব্যবসায়ী এবং কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার্থে চিঠি-পত্রাদির সুশৃঙ্খল সংরক্ষণ-ব্যবস্থা থাকা প্রত্যেক অফিসেরই নিতান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনের সময় ইহাদের না পাওয়া গেলে উহাতে কার্যে বিঘ্ন এবং কারবারের বিপত্তি উভয়ই দেখা দিতে পারে। কারবার

ছোট হইলে অফিসের অধ্যক্ষ হয়ত সব কিছুই মনে রাখিতে পারেন। কিন্তু বৃহৎ কারবারের পক্ষে ইহা কখনই সম্ভব নহে। কারবার ছোট হউক আর বড় হউক—প্রয়োজনের সময় চিঠিপত্রাদি অনায়াসে খুঁজিয়া পাওয়ার জন্য প্রত্যেক অফিসে কোন-না-কোন প্রকারের নথিবদ্ধকরণ চালু থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। কাজের সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অবিলম্বে পাওয়া গেলে ইহাতে ঘটনা-পরম্পরার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত জানার সুবিধা হয়, পুরাতন সমস্যাগুলি কিভাবে সমাধা হইয়াছে তাহা জানিয়া নূতন সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, ব্যবসায়ের উন্নতি-অবনতির ধারা বুঝিতে পারা যায় এবং ক্ষিপ্রতার সহিত কার্যসমাধা সম্ভব হয়। সুতরাং ব্যবসায়ের উন্নতি, কর্মদক্ষতা এবং সুষ্ঠু পরিচালনা যে নথিবদ্ধকরণের উপর অনেকটা নির্ভর করে—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

চিঠিপত্রাদি 'নথিবদ্ধ' করিতে সাধারণত দুইটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়—একটি হইল নীতি (Principle) এবং অপরটি হইল সাজসরঞ্জাম (Equipment)। বস্তুতপক্ষে উক্ত দুইটি বিষয়ের একত্রীকরণই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, নথিবদ্ধকরণে সাধারণত নিম্নলিখিত যে-কোন একটি বা একাধিক নীতি (Principle) গ্রহণ করা হয়।

(১) **তারিখ অনুযায়ী** (**In order of date or chronologically**): যেখানে চিঠিপত্রের তারিখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেখানে এই নীতিতে তারিখ অনুযায়ী উহা সুসজ্জিত থাকে।

(২) **বর্ণানুক্রমে** (**Alphabetical Order**): এই নীতিতে ব্যক্তি, বিষয় বা স্থানের আদ্যক্ষর অনুযায়ী চিঠিপত্রাদি নথিবদ্ধ করা হইয়া থাকে।

(৩) **বিষয়ানুসারে** (**According to Subject-matter**): এই নীতি অনুযায়ী প্রধানত চিঠিপত্রাদি বিষয়ানুযায়ী কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং তদনুযায়ী উহা নথিবদ্ধ করা হয়।

(৪) **সংখ্যানুযায়ী** (**According to Numerical Order**): এই নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক চিঠিপত্রে ক্রমিক সংখ্যার ছাপ দেওয়া হয় এবং সংখ্যার ক্রম অনুসারে উহা নথিবদ্ধ করা হয়।

(৫) **অঞ্চলানুযায়ী** (**According to Territory**): যে স্থান হইতে আগত বা যে স্থানে প্রেরিত হয় সেই স্থানের নাম অনুসারে এই নীতিতে চিঠিপত্রাদি নথিবদ্ধ করা হইল।

নথিবদ্ধকরণে যে সমস্ত **সাজসরঞ্জাম** (**Equipment**) ব্যবহৃত হয় নিম্নে তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইল :

(১) চিঠিপত্রাদি গাঁথিয়া রাখার জন্য সাধারণ 'ফাইল' ব্যবহৃত হইতে পারে। আঠা দিয়া কিংবা ধাতুনির্মিত ছিদ্রবিশিষ্ট ফাইলে তারিখ অনুযায়ী চিঠি-

পত্রাদি গাঁথিয়া রাখা চলে। আঠা দিয়া আটকানো থাকিলে চিঠি খুলিয়া আনা যায় না এবং ছিদ্রপথে প্রবেশ করানো ফাইলে উপরের চিঠি না সরাইয়া ভিতরের চিঠি পৃথক করা যায় না।

(২) পায়রার খোপের (Pigeon hole) মত লৌহনির্মিত কিংবা কাষ্ঠনির্মিত প্রকোষ্ঠও চিঠিপত্রাদি রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণত 'বর্ণানুক্রমে' (Alphabetical order) চিঠিপত্রাদি সাজানো থাকে।

(৩) বাক্সের মত একপ্রকার ফাইলেও চিঠিপত্রাদি রাখা হয়। এরূপ ফাইলে চিঠিপত্রাদি আল্‌গা অবস্থায় থাকে এবং ইহাতে এরূপ স্প্রিং থাকে যাহার ফলে উহা স্থানচ্যুত হইতে পারে না।

(৪) শ্যানন ফাইল (Shannon File) নামক একপ্রকার ফাইলও চিঠিপত্রাদি রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এরূপ ফাইলে চিঠিপত্রাদি রাখিতে হইলে প্রত্যেক চিঠিতে ছিদ্রযন্ত্রদ্বারা দুইটি ছিদ্র করিয়া লইতে হয়। তাহার পর নির্দিষ্ট স্থানে চিঠিখানা প্রবেশ করাইয়া ঐ ছিদ্রপথে ফাইলের সহিত সংলগ্ন শিকে পরাইয়া দিতে হয়। উহাতে স্প্রিং এমনভাবে লাগান থাকে যে, চিঠি প্রবেশ করার পর চাপ দিলে উহা আটকাইয়া যায়। এরূপ ফাইল হইতে নির্দিষ্ট চিঠি অন্য চিঠি না সরাইয়া বাহির করিয়া আনা যায় না।

(৫) আধুনিক অফিসে সাধারণত উল্লম্ব (Vertical) ধরনের ফাইল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে চিঠিগুলি লম্বভাবে দেরাজের ভিতর বসানো থাকে। দেরাজগুলি এমনভাবে প্রস্তুত করা থাকে যাহাতে একখানা চিঠির অগ্রভাগ অন্য চিঠিখানার অগ্রভাগ অপেক্ষা পর পর কিছুটা উপরে বাড়ানো থাকে। ঐ বাড়ানো অংশে চিঠির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (নাম, ঠিকানা, তারিখ, বিষয়বস্তু প্রভৃতি) লেখা থাকে। ফলে কোন চিঠি বাহির ক'রতে কোন অসুবিধা হয় না। চিঠির অগ্রভাগে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হয় উহাকে পত্রানদর্শন (Docketing) বলা হয়।

কোন চিঠি বা দলিল লিখিত হওয়ার পর উহার অনুলিপি কোন্ স্থানে আছে জানার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এজন্য উক্ত চিঠিপত্রাদির একটি তালিকা এমনভাবে প্রস্তুত রাখিতে হয় যাহাতে উক্ত সংবাদ সহজে জানিতে পারা যায়। এরূপ তালিকা প্রস্তুতকরণকে **'সূচীপত্রকরণ'** (Indexing) বলে। বড় বড় কারবারে সূচীপত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এজন্য বিভিন্ন নীতিও অনুসৃত হয়। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল :

(১) **বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র (Alphabetical Index) :** এরূপ সূচীপত্রে উঁহার নাম এবং যে পৃষ্ঠায় উক্ত ব্যক্তির নিকট লিখিত পত্রের অনুলিপি আছে তাহা ও

তাঁহার নাম সোজাসুজি লেখা থাকে। উক্ত ব্যক্তির নিকট একাধিক পত্র লিখিত হইয়া থাকিলে পত্রগুলির অনুলিপির পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি ও তাঁহার নাম সোজাসুজি পর পর লিখিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন পত্রের অনুলিপি সহজে বাহির করার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য প্রত্যেক অনুলিপির উপর এককোণে 'মিথোনির্দেশ' (Cross-reference) দেওয়া থাকে। যেমন, কোনও পত্রের অনুলিপির উপরে '৪০।৬০' এরূপ লিখিত আছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে—ঐ সংক্রান্ত পত্রের পূর্বের অনুলিপি ৪০ পৃষ্ঠায় আছে এবং পরবর্তী অনুলিপি ৬০ পৃষ্ঠায় আছে।

(২) **সাধারণ সূচীপত্র (Ordinary Index):** ইহাতে সূচীপত্রের বহি বা খাতাতে A, B, C প্রভৃতি বর্ণগুলি এক একটি পৃষ্ঠার উপর দিকে ডান কোণে লিখিত থাকে। বর্ণানুক্রমে পত্রগ্রহীতাদের নাম ও পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উহাতে লিখিত হইয়া থাকে। বর্ণগুলি এমনভাবে সাজানো থাকে যে বহি খুলিলে প্রায় সমস্ত বর্ণগুলি একসঙ্গে দৃষ্টিগোচর হয়।

(৩) **স্বরবর্ণঘটিত সূচীপত্র (Vowel Index):** ইহাতে সূচীপত্রের বহি বা খাতার প্রত্যেক পৃষ্ঠা A, E, I, O, U এবং Y এই ছয় অংশে বিভক্ত থাকে এবং পত্রগ্রহীতার নামের প্রথম স্বরবর্ণ লইয়া নামগুলি লিখিত থাকে।

(৪) **কার্ড সূচী (Card Index):** ইহাতে প্রত্যেক পত্রগ্রহীতার সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত হইয়া থাকে। 'কার্ডগুলি' দেরাজে বর্ণানুক্রমে বা সংখ্যানুক্রমে সাজানো থাকে। বর্তমানে এই প্রথায় সূচীপত্র-করণ' বেশী প্রচলিত।

সময় সংক্ষেপ যন্ত্রাদি (Labour Saving Devices)

বর্তমানে অফিসের কাজকর্ম তৎপরতার সহিত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নানা-প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহাতে শ্রম, অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় ঘটে। ঐ সমস্ত সময় ও শ্রম সংক্ষেপকারী (Time and labour saving) যন্ত্রাদি নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১। লিখিত বিষয় প্রস্তুতকরণ যন্ত্রাদি (Appliances for production of written communication):

(ক) **টাইপ-রাইটার (Type-writer):** এই যন্ত্র ছোট-বড় প্রায় সকল অফিসেই দেখিতে পাওয়া যায়। চিঠিপত্রাদি অতি অল্প সময়ে সুন্দরভাবে প্রস্তুত করার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কার্বন কাগজ (Carbon paper) ব্যবহার করিলে একসঙ্গে ৪।৫ খানা কপি টাইপ হইতে পারে। ইহাতে যে টাইপ থাকে তাহাতে ছাপার অক্ষরের মত লেখা পড়ে। তাহার ফলে টাইপ করা চিঠি কাহারও পক্ষে পড়িবার কোন অসুবিধা হয় না। হাতে লেখা চিঠির হস্তাক্ষর সুন্দর বা পরিষ্কার না হইলে অনেকের পক্ষেই বুঝিবার অসুবিধা হয়। তাহা ছাড়া টাইপ করা চিঠিপত্রাদি অফিসের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

(খ) ডুপ্লিকেটিং যন্ত্র (Duplicating Machines) : এই যন্ত্রের সাহায্যে কোনও চিঠিপত্রের প্রতিলিপি একসঙ্গে অনেকগুলি প্রস্তুত হইতে পারে। কোনও চিঠিপত্রের অনেকগুলি কাপ প্রয়োজন হইলে হাতে লেখা সময়সাপেক্ষ। টাইপ করিলেও ৪।৫ কপির বেশী একসঙ্গে ভালভাবে হইতে চায় না। ২।৪ হাজার কপির প্রয়োজন হইলে ছাপানো চলে। কিন্তু ২।১ শত কপির প্রয়োজন হইলে এই যন্ত্রের সাহায্যে উহা সম্পন্ন করা চলে। ইহাতে ছাপানোর ব্যয় ও সময় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এ জাতীয় যন্ত্র নানাপ্রকারের হইতে পারে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :

(i) Roneo-letter copier-এর সাহায্যে কপিং কালিতে লিখিত বা টাইপ করা বিষয়বস্তুর একসঙ্গে অল্পসময়ে অনেক প্রতিচ্ছবি (facsimiles) পাওয়া যায়।

(ii) Stencil Duplicator-এর সাহায্যে চিঠিপত্র, রেখাচিত্র, ম্যাপ, নক্শা প্রভৃতির অনেক প্রতিলিপি প্রস্তুত করা যায়।

(iii) Lithography and Printing যন্ত্রের সাহায্যে অঙ্কিত ও লিখিত বিষয়বস্তুর ইচ্ছামত প্রতিলিপি প্রস্তুত করা যায়।

(iv) Photostat-এর সাহায্যে চিঠিপত্র, দলিল প্রভৃতির অবিকল প্রতিচ্ছবি তোলা যায়।

২। মৌখিক আলাপ-আলোচনা ও উহা লিপিবদ্ধ করার যন্ত্রাদি (Verbal communication and their automatic recording machines) :

(ক) টেলিফোন (Telephone) : এই যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী লোকের সহিত প্রয়োজনীয় কথাবার্তা অফিসে বসিয়াই চলিতে পারে। ইহাতে দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান করা সম্ভব হয় এবং ব্যবসায়ের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অফিসের বিভিন্ন বিভাগের সহিত কথাবার্তা চালাইতে হইলে আভ্যন্তরীণ টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থা করিয়া লওয়া চলে।

(খ) ইপ্সোফোন (Ipsophone) : টেলিফোন বাজিয়া উঠিলে কেহ উহা তখন ধরিবার না থাকিলে এই যন্ত্রের সাহায্যে টেলিফোন ধরার কাজ এবং যিনি টেলিফোন করিতেছেন তাঁহার নাম, ঠিকানা ও বক্তব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করার সুবিধা থাকে। উক্ত লিপিবদ্ধ বিষয় হইতে কে টেলিফোন করিয়াছিল এবং কি সংবাদ পরিবেশন হইল তাহা পরে জানার সুবিধা হয়। সুতরাং এই যন্ত্র থাকিলে টেলিফোন ধরার জন্য কোন লোক প্রয়োজন হয় না।

(গ) ডিক্টাফোন (Dictaphone) : এই যন্ত্রের সাহায্যে চিঠিপত্রের উত্তর এবং অন্যান্য কাজকর্মের নির্দেশ মুখে উচ্চারণ করিয়া বাণীবদ্ধ করিয়া রাখা চলে। পরে প্রয়োজনমত উক্ত বাণী শুনিয়া লওয়া যায়। ইহা গ্রামোফোন রেকর্ডের মত

কাজ করিয়া থাকে। অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ পুনঃপুনঃ নিম্নস্তরের কর্মচারীদিগকে নির্দেশ লওয়ার জন্য না ডাকিয়া এই যন্ত্রের সাহায্যে সুবিধামত সময়ে নিজেদের বক্তব্য বিষয় বাণীবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। অধস্তন কর্মচারিগণ আবার তাঁহাদের সুবিধামত উক্ত যন্ত্র ঘুরাইয়া বক্তব্য বিষয় শুনিয়া লন এবং তদনুযায়ী কার্য সম্পাদন করেন। টেলিফোনের সহিত এই যন্ত্রের সংযোগ স্থাপনও করা চলে এবং টেলিফোনের আলাপ-আলোচনাও বাণীবদ্ধ করিয়া রাখা চলে।

(ঘ) স্পিকোফোন (Speakophone): অফিসের বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে নিজ নিজ আসনে বসিয়া আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হইলে এই যন্ত্রের সাহায্যে উহা করা চলে।

৩। হিসাব প্রস্তুতের ও গণনার যন্ত্রাদি (Accounting and Calculating Machines):

(ক) কম্পটোমিটার (Comptometer): এই যন্ত্রের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি কার্য অতি দ্রুত নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হইতে পারে।

(খ) বিলিং যন্ত্র (Billing Machines): ইহা টাইপ-রাইটার ও কম্পটোমিটার যন্ত্রের কাজ করিয়া থাকে এবং ইহার সাহায্যে অতি দ্রুত বিল মুদ্রণ করা যায়। বড় বড় কারবার যেমন, ইলেকট্রিক কোম্পানী ছাড়া এ যন্ত্রের ব্যবহার খুব কম দেখা যায়।

(গ) বুক-কিপিং যন্ত্র (Book-keeping Machines): ইহার সাহায্যে হিসাব বহিতে হিসাবের অঙ্ক যেখানে বসান প্রয়োজন সেখানে বসান চলে এবং যোগ-বিয়োগ ইত্যাদির দ্বারা চূড়ান্ত হিসাবও নির্ণয় করা চলে।

৪। দেখা-শুনা-সংক্রান্ত যন্ত্রাদি (Audiovisual Machines): চলচ্চিত্র (Motion picture), স্লাইড (Slide films), টেলিভিশন (Television) প্রভৃতি দেখা-শুনা-সংক্রান্ত যন্ত্রাদি বড় বড় কারবারে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। অন্যান্য যন্ত্রাদি (Other Machines):

(ক) টাইম রেকর্ডিং মেসিন (Time Recording Machine): এই যন্ত্রের সাহায্যে সাধারণত কারখানার শ্রমিকদের হাজিরা লেখা হয়। শ্রমিকের নাম লিখিত কার্ড ইহাতে প্রবেশ করাইলে হাজিরার সময় লিপিবদ্ধ হইয়া যায়।

(খ) অটো-অ্যাবস্ট্রাক্ট (Auto-Abstract): এই যন্ত্রের দ্বারা বিষয়বস্তু পাঠ করা ও উহা সংক্ষেপ করার কাজ চলে। সুতরাং সময় অভাবে যে সমস্ত কর্মচারী উক্ত কাজ সমাধা করিতে পারেন না তাঁহাদের পক্ষে এই যন্ত্র খুবই কার্যকরী। ইহা একটি ইলেকট্রোনিক যন্ত্র (Electronic Machine) এবং

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের International Business Machine Corporation-এর দান।

(গ) **টেলিরাইটার (Tele-writer) :** এই যন্ত্রের সাহায্যে হস্তলিখিত বার্তা তারের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে অবিকল পাঠানো চলে। ডাক বিভাগ হইতে লাইসেন্স লইয়া এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়।

(ঘ) **টেলিপ্রিণ্টার (Teleprinter) :** ইহা টেলিফোন ও টাইপ-রাইটার যন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত। ইহাতে কোন স্থানে টাইপ-রাইটার যন্ত্রে কোন কিছু টাইপ হইলে উহা অবিকল দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত এরূপ টাইপ-রাইটার যন্ত্রে আপনা-আপনি মুদ্রিত হইয়া যায় সংবাদপত্র অফিসেই এই যন্ত্রের সমধিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঙ) **ফ্রাঙ্কিং মেশিন (Franking Machine) :** এই যন্ত্রের সাহায্যে চিঠির খামের উপর প্রয়োজনীয় ডাকটিকিটের ছাপ মারা চলে।

(চ) **এ্যাড্রেসিং মেশিন (Addressing Machine) :** অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি ঠিকানা লেখার প্রয়োজন হইলে এই যন্ত্র ব্যবহার করা চলে।

(ছ) **এনভেলপ সিলিং এণ্ড ওপেনিং মেশিন (Envelope Sealing and Opening Machine) :** এই যন্ত্রের সাহায্যে খামের মুখ খোলা ও আটকানো চলে। যেখানে বেশী সংখ্যক চিঠিপত্র আদান প্রদান হইয়া থাকে তথায় ইহার ব্যবহার করিলে শ্রম ও সময় উভয়ই সংক্ষেপ হয়।

(জ) **পাঞ্চিং, ডেটিং এণ্ড নাম্বারিং মেশিন (Punching, Dating and Numbering Machines) :** ফাইলে রাখার উদ্দেশ্যে নথিপত্র ছিদ্র করার জন্য Punching Machine, প্রাপ্ত চিঠিতে উহা প্রাপ্তির তারিখ দেওয়ার জন্য Dating Machine এবং কাগজপত্রে ক্রমিক সংখ্যা বসানোর জন্য Numbering Machine ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতা (Automation)

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বা কম্পিউটার (Computer) আধুনিক বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার। শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রাত্যহিক কাজে ইহার ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে কারণ ইহার ব্যবহারের ফলে কাজের গতি ও ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ফলে অনেক দ্রুত কার্য সম্পন্ন হয়, পরিশ্রমের লাঘব হয় এবং অপচয় দূর হয়। ইহার সাহায্য গ্রহণ করিলে অনেক লোকের কাজ অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। বর্তমানের উৎপাদন ব্যবস্থা এক জটিল সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে এবং এমনকি উৎপাদন পরিকল্পনা নিরূপণে অনেক সূক্ষ্ম গাণিতিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়। এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে উহার সুষ্ঠু মীমাংসা অনায়াসে অতি অল্প সময়ে সম্ভব হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের উন্নতি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত এবং উহা

বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিস্তারলাভ করিয়াছে। মূল ও কারিগরি গবেষণার ক্ষেত্র অনুরূপভাবে প্রসারিত হওয়ায় বহু জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং এজন্য প্রযোজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং তজ্জন্য গাণিতিক হিসাব-নিকাশ এক দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির যে মৌলিক এবং কারিগরি গবেষণার দায়িত্ব আছে—একথা কেহ অস্বীকার করেন না। আমাদের দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ক্ষেত্র অধিক দূর প্রসারলাভ করে নাই সত্য, কিন্তু উহা যে প্রসারলাভ করিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বিস্তারলাভ করিবে একথাও কেহ অস্বীকার করেন না। সুতরাং কাজের গতিবেগ ও উহার ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি, পরিশ্রমের লাঘব এবং অপচয় দূর করিতে হইলে এই যন্ত্রের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্য প্রয়োজন। ইহাতে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে এবং অর্থনৈতিকক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ফলভোগ করা সম্ভব হইবে। ইহা আমাদের মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি করিতে পারিবে, জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে পারিবে, অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করিবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে ইহাকে মানবজাতির পক্ষে এক বিরাট আশীর্বাদ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

কিন্তু এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার হইতে নানাবিধ সুবিধা পাওয়া গেলেও ইহা যে সর্বৈব কল্যাণকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া থাকে একথাও বলা চলে না। ইহার নানাবিধ অসুবিধাও আছে। শিল্পোন্নত দেশে যেখানে বেকারসমস্যা ও কর্মসংস্থানের সমস্যা খুব কম সে সকল দেশে ইহার ব্যবহার কল্যাণকর হইতে পারে একথা স্বীকার করা চলে। কিন্তু ভারতের মত দেশে ইহার অকল্যাণকর রূপই প্রকট হইয়া পড়িতেছে। বৈজ্ঞানিক দিক দিয়া ইহার ব্যবহার সমর্থন করা গেলেও দেশের অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক কল্যাণের দিক বিচার করিলে ইহার ব্যবহার সমর্থনযোগ্য নহে। ইহার সাহায্যে সময় ও পরিশ্রম উভয়ের লাঘব হয় সত্য, কিন্তু ইহার ব্যবহারের ফলে যখন অনেক জনের কাজ স্বল্প জন দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় তখন অনেক জনের বেকার হইয়া পড়ার সম্ভাবনা থাকে। ভারত বর্তমানে বেকার সমস্যায় প্রপীড়িত ও জর্জরিত। সুতরাং এই বাড়তি বেকার সমস্যা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে আরও দুর্বল করিয়া ফেলিবে। অনেকক্ষেত্রে এরূপ আশ্বাস দেওয়া হয় যে, ইহার ব্যবহারের ফলে যাঁহারা বেকার হইবেন তাঁহাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। যে সকল স্থানে ইহার ব্যবহার হইয়াছে সেখানে এরূপ বিকল্প কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। আর ভারতের মত অনুন্নত দেশে এরূপ বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয় এবং উহা সম্ভবও নয়। সুতরাং দেশের বেকার সমস্যার সমাধান না করিয়া এবং দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত না করিয়া এরূপ যন্ত্রের ব্যবহার গুরুতর বিপর্যয় সৃষ্টি না করিয়া পারে না।

অন্য একটি বিষয়ও এ সম্পর্কে মনে রাখা উচিত। এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র অধিকাংশ বিদেশ

হইতে আমদানি করিতে হইতেছে। আমাদের দেশে এখনও ইহা তৈয়ারী হইতেছে খুব কম। এই আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যয় অবশ্যম্ভাবী। আবার যখন এরূপ কোন যন্ত্র আমদানি করা হয় উহা বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই বসানো ও চালু করা হয় এবং উহা রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিক্রেতার হাতেই থাকে। ফলে এরূপ কোন যন্ত্রের তদারকির জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ প্রয়োজন হইবে, নতুবা উহাতে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে বিদেশী বিশেষজ্ঞ আমদানি ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না। এই উভয়বিধ অবস্থায় কোন ক্রমে দেশের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং ইহার ব্যবহার আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপ হইয়া দাড়াইবে।

এজন্য উপসংহারে বলা চলে যে, ইহার ব্যবহারে সময় ও পরিশ্রম লাঘব হইলেও এবং প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও বেকার সমস্যার ভয়াবহতার জন্য উহার ব্যবহার বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রবর্তন করিতে হইবে। অর্থনৈতিক উন্নতি এবং বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য ইহার প্রবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাটাই বন্ধ করিয়া বেকার সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। কাজের নৈপুণ্য কমাইয়া বেকার সমস্যার সমাধান করিতে গেলে, ছাপাখানা বন্ধ করিয়া পুথিপত্র হাতে লিখিয়া চালু করিতে গেলে, কিংবা টেলিফোনের বদলে সংবাদ-বাহক নিযুক্ত করিয়া কাজ চালাইতে গেলে উহাতে কর্মের সংস্থান কিছু বৃদ্ধি পাইতে পারে সত্য, কিন্তু ইহাতে প্রগতির ধারা বা শিল্প-বিপ্লবের মূলমন্ত্র অস্বীকার করা হইবে। এরূপ পরিস্থিতি দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। সুতরাং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য চাই উপযুক্ত পরিকল্পনা, যাহার ফলে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইবে না, পক্ষান্তরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহারের সুফলও পাওয়া যাইবে। মোটের উপর কথা, এই যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে যাহাদের বেকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে তাহাদিগকে অন্যত্র নিয়োগ এবং নিয়োগ-সাপেক্ষে বেকার ভাতার বা বীমার ব্যবস্থার দ্বারা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহারের উপযোগিতা সৃষ্টি করিতে হইবে।

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (Production Control)

পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে সর্বোত্তম উপায়ে এবং সর্বনিম্ন ব্যয়ে নির্দিষ্ট মানের পণ্য উৎপাদনের গতিপ্রবাহের নির্দেশ ও পরিচালনাকে 'উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ' বলে। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে উৎপাদনের গতি, মান, পরিমাণ ও ব্যয় ঠিকভাবে পরিচালনা করা। কারণ ইহা ভিন্ন যথাসময়ে যথাযোগ্য মানের পণ্য উৎপাদন সম্ভব নহে। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয় :

১। **উৎপাদন পরিকল্পনা (Production Planning) :** উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন্ কাজ কোথায়, কখন এবং কিভাবে সম্পন্ন হইবে তাহা পূর্ব হইতে জানা প্রয়োজন। পরিকল্পনাই কাজের এরূপ নির্দেশ দিয়া থাকে। এজন্য উৎপাদন'

নিয়ন্ত্রণের জন্য উৎপাদন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় ও উহা অনুসরণ করা হয়। এই পরিকল্পনা উদ্দেশ্য, নীতি ও কার্য সম্পাদনের যাবতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে।

২। **পথ-নির্দেশ (Routing):** পণ্য উৎপাদন বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা কার্যক্রমের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা কার্যক্রমের মধ্য দিয়া পণ্য উৎপাদন অগ্রসর হইতেছে কিনা উহা দেখা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের অন্যতম কাজ। কিন্তু এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পথ-নির্দেশ প্রয়োজন। পণ্য উৎপাদন কিভাবে কোন্ পথে অগ্রসর হইবে উহা 'পথ-নির্দেশ' নির্ধারণ করিয়া থাকে। এজন্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে পথ-নির্দেশের প্রয়োজন হয়।

৩। **সময়-নিরূপণ (Scheduling):** কোনও পণ্য উৎপাদন কোন্ সময়ে আরম্ভ হইবে এবং কখন শেষ হইবে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য ইহাও অত্যাবশ্যক। 'সময়-নিরূপণ' দ্বারা পণ্য উৎপাদনের সময় তালিকা পূর্ব হইতেই স্থির করা হয়। উক্ত সময় তালিকা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনের কাজ অগ্রসর হয় এবং 'উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ' উক্ত তালিকা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন অগ্রসর হইতেছে কিনা দেখিয়া থাকে এবং ব্যতিক্রম দেখা দিলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সুতরাং 'সময়-নিরূপণ' করা থাকিলে 'উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ' সহজ ও সরল হয়।

৪। **কার্যারম্ভের নির্দেশ (Despatching):** পরিকল্পনা, পথ-নির্দেশ, সময়-নিরূপণ প্রভৃতি পণ্য উৎপাদনের পূর্ব-নির্দেশ। উক্ত পূর্ব-নির্দেশ অনুযায়ী কার্য আরম্ভের জন্য অনুমতি প্রয়োজন। ইহা হইতে 'উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ' জানিতে ও বুঝিতে পারে কখন কার্যটি আরম্ভ হইয়াছে এবং পূর্ব-নির্দেশ অনুযায়ী কার্য অগ্রসর হইতেছে কিনা তাহাও দেখিতে পারে।

৫। **পরিদর্শন (Inspection):** দ্রব্যের মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত কাজের সকল প্রক্রিয়া পরিদর্শন দ্বারা পরীক্ষা করা হয় এবং নিম্নমানের দ্রব্যাদি বাতিল করা হয়। উৎপন্ন দ্রব্য যাহাতে বাতিলের জন্য অযথা অপচয় না হয় তাহার জন্যই উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণে এই পদ্ধতি গৃহীত হইয়া থাকে।

৬। **দ্রুতকরণ (Expediting):** পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যারম্ভ ও উহার অগ্রগতি সাধিত হয় সত্য, কিন্তু কাজের অগ্রগতির মধ্যে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে ভিন্ন পন্থা বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া কাজের গতিবেগ রক্ষা করাই দ্রুতকরণের উদ্দেশ্য। সুতরাং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে এরূপ ব্যবস্থাও যে অত্যাবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই।

৭। **পরিসাংখ্যিক দ্রব্যমান নিয়ন্ত্রণ (Statistical Quality Control):** বিরামহীন বহুল-উৎপাদন ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। ইহা পরিদর্শনের মত দ্রব্যমান নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। পরিদর্শন দ্রব্যের নক্সা (design) অনুযায়ী উহার মান নির্ণয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়া থাকে। কিন্তু পরিসাংখ্যিক

দ্রব্যমান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য আরও গভীর ও নিবিড়। ইহা নমুনা পরীক্ষা (Sample test) দ্বারা দ্রব্যের মান নির্ণয় করে, যে যন্ত্রে দ্রব্য উৎপাদন হয় উহার নিকটেই পরীক্ষা কার্য চালায়, এজন্য তালিকা (Chart) প্রস্তুত করে এবং মানের ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। অতিরিক্ত অপচয় হওয়ার পূর্বেই ইহা মান বজায় রাখার কাজ সম্পন্ন করে।

৮। **অনুসরণ (Follow up):** পরিকল্পিত পথে বিভিন্ন কার্যক্রম অগ্রসর হইতেছে কিনা উহা দেখা অনুসরণের কাজ। এই অনুসরণ দ্বারা পরিকল্পনা মত কার্যক্রম বজায় রাখা হয় এবং কর্মে সাফল্য আনয়ন করা হয়। সুতরাং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ইহাও একটি বিশেষ অঙ্গ।

কোন সংগঠনের দক্ষতা বিচার (Tests applied to check up the efficiency of an organisation)

সংগঠনের দক্ষতা কারবারের দক্ষতার সামিল। উহার দক্ষতা পরীক্ষা বা পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল :

১। **বাজেট দ্বারা নিয়ন্ত্রণ (Budgetary Control):** সরকারী আয়-ব্যয় বরাদ্দকে 'বাজেট' বলিলেও কারবারীক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ আরও ব্যাপক। অতীতে সম্পাদিত কার্যের মান ও ফলাফল বিবেচনা করিয়া আগামী বৎসরে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইবার উপযোগী অর্থ, শ্রম, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি সম্ভাব্য মালমসলার ব্যয়-বরাদ্দের হিসাবকে কারবারী 'বাজেট' বলা হয়। প্রথমত এরূপ বাজেট বিভাগীয় স্তরে প্রস্তুত করা হয় এবং বিভিন্ন বিভাগীয় বাজেটের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া কারবারের জন্য একটি সামগ্রিক বাজেট (Master Budget) প্রস্তুত করা হয়। এই কারবারী বাজেট আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা ক্রয়, বিক্রয়, উৎপাদন, আর্থিক প্রভৃতি। এই বাজেটের দ্বারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইবার যে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাহার দ্বারা ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে এবং কারবারের দক্ষতা পরীক্ষা ও পরিমাপ করা চলে।

২। **ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ (Cost Control):** উন্নত ব্যবস্থার দ্বারা ব্যয় হ্রাস করার এবং ব্যয়ের ঊর্ধ্বসীমা স্থির করা ব্যয়-নিয়ন্ত্রণের মুখ্য উদ্দেশ্য। উৎপাদন কার্যারম্ভের সময় ব্যয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ফোরম্যানকে (Foreman) জানাইয়া দেওয়া হয়। ফলে ইহার ভিত্তিতে উহার এবং উহার অধীন শ্রমিকদের কার্যের দক্ষতা বিচার করা চলে এবং সামগ্রিক কারবার বা সংগঠনের যোগ্যতাও বিচার হইয়া থাকে।

৩। **আর্থিক নিয়ন্ত্রণ (Financial Control):** এই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হিসাবরক্ষণ, লাভ-লোকসান হিসাব ও উদ্বৃত্ত পত্র প্রস্তুত এবং বিচার দ্বারা কারবারের দক্ষতা পরীক্ষা বা পরিমাপ করা হয়।

৪। **পরিসাংখ্যিক নিয়ন্ত্রণ (Statistical Control) :** কার্যসম্পাদনের জন্য বিভিন্ন তথ্য, পরিসংখ্যান, তালিকা প্রভৃতি সরবরাহ দ্বারা কারবারের অগ্রগতি ও দক্ষতা এবং ব্যক্তিবিশেষের দায়িত্ব পালনের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় এবং এইভাবে কারবারের বা সংগঠনের দক্ষতা বিচার করা হয়।

৫। **কাজের পরিমাপ ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (Works Measurement and Production Control) :** এই ব্যবস্থার দ্বারা শ্রমিকদিগকে কম পরিশ্রমে অধিক উৎপাদনের প্রেরণা দেওয়া হয় এবং প্রতি কাজের একটা মান স্থির করিয়া দিয়া শ্রমিকদের দক্ষতা পরীক্ষা করা হয়।

৬। **গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ (Quality Control) :** ইহার দ্বারা কাজের ব্যতিক্রম দেখা দিলে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় এবং অত্যধিক ভুল-ত্রুটি প্রতিরোধ করিয়া কাজের মান বজায় রাখা হয়।

৭। **ব্যয়-নির্বাহক পণ্যবিক্রয় তালিকা (Break-even Chart) :** এই তালিকার দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিলে মোট ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে উহা দেখান হয়। পণ্য বিক্রয় উহা হইতে কম হইলে লোকসান এবং উহা হইতে বেশী বিক্রয় হইলে লাভ হইবে—উক্ত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং দক্ষতার সহিত বিক্রয়ে উদ্যোগী হওয়ার ইহা একটি উৎকৃষ্ট পন্থা এবং বিক্রয়ের পরিমাণ দেখিয়া কারবারের দক্ষতা পরিমাপ করার সুবিধা হয়।

৮। **লগ্নির উপর আয় (Return on Investment) :** যে পরিমাণ মূলধন কারবারে লগ্নি হইল উহার উপর কিরূপ আয় বা লাভ হইল উহা দেখিয়াও কারবারের দক্ষতা বিচার করা চলে। ইহা সাধারণত নিম্নলিখিত উপায়ে স্থির করা হয়।

$$\text{লগ্নির উপর আয়} = \frac{\text{লাভ}}{\text{বিক্রয়}} \times \frac{\text{বিক্রয়}}{\text{নিয়োজিত মূলধন}} \times ১০০$$

প্রথম অনুপাত দ্বারা বিক্রয়ের উপর কিরূপ মুনাফা লাভ হইল তাহা মোটামুটি ধারণা করা যায়। দ্বিতীয় অনুপাত দ্বারা কিরূপ দক্ষতার সহিত বিক্রয় কার্যে মূলধন নিয়োজিত হইল তাহা মোটামুটি পরিমাপ করা যায়।

৯। **অনুপাত বিশ্লেষণ (Ratio Analysis) :** ইহার দ্বারা কারবারের বিভিন্ন কার্যক্রমের দক্ষতা নিরূপণ করা যায়। এজন্য এরূপ অনুপাত বিশ্লেষণ অনেক প্রকারের হইতে পারে। নিম্নে উহাদের ২।১টির উদাহরণ দেওয়া হইল :

(ক) $\text{ক্রয়-দক্ষতা} = \frac{\text{পণ্য সংগ্রহের ব্যয়}}{\text{পণ্যের মোট মূল্য}} \times ১০০$

(খ) $\text{উৎপাদনে পণ্য ব্যবহারের দক্ষতা} = \frac{\text{পণ্যের মোট মূল্য}}{\text{মোট উৎপাদন ব্যয়}} \times ১০০$

১০। **বিভিন্ন সম-কারবারী প্রতিষ্ঠানের সহিত তুলনা (Comparisons with different businesses of the same type):** ইহার সাহায্যে কারবারের দক্ষতা নির্ণয় করা হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতার বাজারে এরূপ তুলনামূলক বিচার দক্ষতা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হইয়া থাকে।

১১। **উৎপাদিকাশক্তির তুলনা (Productivity Comparisons)** উৎপাদিকাশক্তি উৎপাদিত পণ্য এবং উহা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানগুলির সম্পর্ক নির্দেশ করে। ইহার সাহায্যে উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাইতেছে কি হ্রাস পাইতেছে তাহা নির্ণয় করা যায়। ফলে ইহার দ্বারা কারবারের দক্ষতা পরিমাপ করা চলে।

১২। **ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণ (Management Audit):** ইহার দ্বারা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বিচার করা চলে। এই নিরীক্ষণ দ্বারা কারবারের অভ্যন্তরের বিভিন্ন পরিবেশ অনুধাবন করা হয় এবং কোন পরিবেশ কারবারে দক্ষতার প্রতিকূল বলিয়া বিবেচিত হইলে উহার উত্তর প্রদানের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা দক্ষতার পরিমাপ করা হয়।

পরিব্যয় (Costing)

শিল্প-কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের একক পিছু উৎপাদন ব্যয় হিসাব করাকে 'পরিব্যয়' (Costing) বলে। ইহা বিশ্লেষণমূলক। ইহার দ্বারা প্রতি পণ্যের বা কার্যের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হিসাব করা হয় এবং এইভাবে প্রতি এককের মোট উৎপাদন ব্যয় বাহির করিয়া বিক্রয়মূল্য ধার্য করা হয়।

ইহার সহিত আর্থিক হিসাবের (Financial Accounts) কিছুটা সম্পর্ক থাকিলেও উভয়ই পৃথক্। প্রথমত, আর্থিক হিসাব বিশ্লেষণমূলক নয়। ইহা শুধু কারবারের মোট আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিয়া কারবারের লাভ-লোকসান নির্ণয় করে।

পরিব্যয়ের (Costing) সুবিধা নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(ক) প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করা প্রত্যেক কারবারের অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজ। পরিব্যয় হিসাব (Cost Accounting or Costing) ভিন্ন এই অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজ কখনই সম্ভব হয় না। এজন্য আধুনিক কারবারে ইহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

(খ) ইহার সাহায্যে প্রত্যেক পণ্য বা কার্যের একক উৎপাদন ব্যয় জানিতে পারা যায়। ফলে তৎপরতার সহিত উহার বিক্রয়মূল্যও ধার্য করা যায়।

(গ) ইহা বিশ্লেষণমূলক। এজন্য ইহার সাহায্যে কোন্ পর্যায়ে কতটা ব্যয় হইল বা কোথায় এবং কোন্ পর্যায়ে অপচয় বা অধিক ব্যয় দেখা দিল তাহাও সহজে নির্ণয় করা যায়।

(ঘ) বিভিন্ন বিভাগের ও কার্যের দক্ষতা বিচার করিতে হইলেও তজ্জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ইহার সাহায্যে সংগ্রহ করা যায়।

(ঙ) যে কারবার একাধিক দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত সে কারবারের কোন্ দ্রব্যটি উৎপাদন লাভজনক বা কোন্‌টি অলাভজনক ইহার সাহায্যে উহা নির্ণয় করার সুবিধা হয়।

(চ) ইহার সাহায্যে মুনাফার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করাও সম্ভব হয়।

(ছ) বৎসরের কোনও সময়ে হিসাব-নিকাশ প্রয়োজন হইলে ইহার সাহায্যে অসমাপ্ত ও পণ্য ও কার্যের মূল্য নিরূপণ করাও সহজে সম্ভব হয়।

(জ) ইহার বিশ্লেষণমূলক কার্যধারা কারবারে চুরি, অপচয়, অমিতব্যয়িতা প্রভৃতি রোধে সাহায্য করিয়া থাকে।

পরিব্যয়ের উপাদানের শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিতভাবে করা হইয়া থাকে :

(ক) প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct Expenses) : ইহার মধ্যে কাঁচামাল (Materials), মজুরী (Wages) ও আনুষঙ্গিক ব্যয় (Incidental expenses) ধরা হয়। একত্রে উহাদের লইয়া যে ব্যয় হয় উহাকে এক কথায় মুখ্য ব্যয় (Prime Cost) বলে। ইহা নির্ণয় করা পরিব্যয়ের প্রথম স্তর।

(খ) মুখ্য ব্যয়ের (Prime cost) সহিত কারখানার স্থির বা উপরি ব্যয় (Factory overhead or oncost) যোগ করিয়া কারখানার পরিব্যয় (Factory or works cost) স্থির করা হয়। ইহা পরিব্যয়ের দ্বিতীয় স্তর।

(গ) কারখানার পরিব্যয়ের (Factory or works cost) সহিত আফস বা প্রশাসনিক স্থির বা উপরি ব্যয় (Office Overhead or Administrative Expenses) যোগ করিয়া উৎপাদন ব্যয় (Cost of Production) স্থির করা হয়। ইহা পরিব্যয়ের তৃতীয় স্তর।

(ঘ) উৎপাদন ব্যয়ের (Cost of Production) সহিত বিক্রয় ব্যয় (Selling or Distributive Expenses) যোগ করিয়া মোট ব্যয় (Total Cost) স্থির করা হয়। ইহা পরিব্যয়ের চতুর্থ স্তর।

(ঙ) মোট ব্যয়ের (Total Cost) সহিত মুনাফা (Profit) যোগ করিয়া বিক্রয়মূল্য (Selling Price) স্থির করা হয়। ইহাই পরিব্যয়ের শেষ স্তর।

ব্যয় নির্ধারণের জন্য 'কারখানার ব্যয়' ও 'অফিসের ব্যয়' বণ্টনে গৃহীত নীতি (Principles of allocating Factory Expenses and Office Expenses for determination of cost)

কারখানার ব্যয় এবং অফিসের ব্যয় একত্র করিয়া পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা যায়।

কারখানার ব্যয়কে দুই ভাগ করা চলে—প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct Expenses) ও অপ্রত্যক্ষ ব্যয় (Indirect Expenses)। কাঁচামালের মূল্য (Cost of Raw

Materials), প্রত্যক্ষ শ্রম-মজুরী (Direct Labour Charges or Wages) এবং অন্যান্য ধার্যোপযোগী ব্যয় (Chargeable Expenses) প্রত্যক্ষ ব্যয়ের অন্তর্গত। কারখানার ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি (Depreciation) ও মেরামতি ব্যয়, কয়লা, আলো, হাওয়া ও তাপ ব্যয়, খাজনা, শ্রমিক বীমা, অগ্নি, চুরি ও দুর্ঘটনা বীমা প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ ব্যয়ের অন্তর্গত। কারখানার প্রত্যক্ষ ব্যয় উৎপাদনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং উহা সরাসরি উৎপাদন ব্যয় হিসাবে ধার্য করা চলে। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ ব্যয় উৎপাদনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নহে। কিন্তু উক্ত অপ্রত্যক্ষ ব্যয় বিভিন্ন বিভাগ কার্য বা পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সহিত যুক্ত না হইলে পণ্যের প্রকৃত মূল্য স্থির করা সম্ভব নয়। এজন্য পণ্যের বা কার্যের একক পিছু উৎপাদনে কারখানার পরোক্ষ ব্যয় বণ্টনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই বণ্টনের জন্য কতকগুলি নীতি অনুসৃত হয়। নিম্নে উহাদের উল্লেখ করা হইল :

(ক) মুখ্য ব্যয়ের শতাংশ (Percentage on Prime Cost) : এই নীতি অনুযায়ী মোট উপরি-ব্যয় (Overhead Expenses) মোট মুখ্য ব্যয়ের কত শতাংশ উহা প্রথমে স্থির করা হয় এবং তদনুযায়ী প্রত্যেক বিভাগ, কার্য ব পণ্যের উপরি ব্যয় নির্ধারণ করা হয়।

(খ) প্রত্যক্ষ মজুরীর শতাংশ (Percentage on Direct Wages) : এই নীতি অনুযায়ী মোট উপরি ব্যয় মোট প্রত্যক্ষ মজুরীর কত শতাংশ প্রথমে উহা স্থির করা হয় এবং তদনুযায়ী প্রত্যেক বিভাগ, কার্য বা পণ্যের উপরি ব্যয় নির্ধারণ করা হয়।

(গ) প্রত্যক্ষ কাঁচামালের শতাংশ (Percentage on Direct Material) : এই নীতি অনুযায়ী প্রথমে মোট উপরি ব্যয় মোট প্রত্যক্ষ কাঁচামালের কত শতাংশ উহা স্থির করা হয় এবং তদনুযায়ী প্রত্যেক বিভাগ, কার্য বা পণ্যের উপরি ব্যয় নির্ণীত হয়।

(ঘ) উৎপাদিত পণ্যের এককপিছু হার (Rate per unit of production) : উৎপাদিত পণ্য একই প্রকারের হইলে সারা বৎসরে মোট উৎপাদিত পণ্যের একক দ্বারা মোট উপরি ব্যয়কে ভাগ করিয়া এককপিছু উপরি-ব্যয় নির্ধারণ করা হয়।

(ঙ) প্রত্যক্ষ শ্রমঘণ্টা প্রতি হার (Rate per Direct Labour Hour) : এই নীতি অনুযায়ী কারখানার মোট উপরি ব্যয়কে মোট প্রত্যক্ষ শ্রমের সময় বা ঘণ্টার দ্বারা ভাগ করিয়া সেই হারে প্রত্যেক বিভাগ, কার্য বা পণ্যের জন্য ব্যবহৃত শ্রমঘণ্টা অনুযায়ী উহাদের উপরি-ব্যয় নির্ধারণ হয়।

(চ) যন্ত্রপাতির কার্যের সময় হার (Machine Hour Rate) : কারখানায় ব্যবহৃত সমস্ত যন্ত্রপাতির কার্যের মোট সময় কারখানার মোট উপরি-ব্যয়কে

ভাগ করিয়া সেই হারে প্রত্যেক বিভাগ, কার্য বা পণ্যের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সময়ের পরিমাণ অনুযায়ী উহাদের উপরি-ব্যয় নির্ণয় করা হয়।

(ছ) **উৎপাদন ঘণ্টা হার (Rate per Production Hour) :** এই নীতি অনুযায়ী কারখানার মোট উপরি-ব্যয় এবং মোট উৎপাদন ঘণ্টার শতকরা হার নির্ণয় করিয়া তদনুযায়ী প্রত্যেক বিভাগ, কার্য বা পণ্যের উপরি-ব্যয় স্থির করা হয়।

অফিসের উপরি-ব্যয়কেও দুইভাগে ভাগ করা চলে যথা, প্রশাসনিক ব্যয় (Administrative Expenses) এবং বিক্রয় ব্যয় (Selling Expenses)। এই উপরি-ব্যয় কারখানার পরিব্যয়ের (Works Cost) শতাংশ হিসাবে স্থির করা হয় এবং তদনুযায়ী প্রত্যেক বিভাগ, কার্য বা পণ্যের এককপিছু অফিসের উপরি-ব্যয় বণ্টিত হয়।

বিভিন্ন উপরি-ব্যয় বণ্টনের নীতি বর্ণিত হইলেও উক্ত বিভিন্ন নীতি উৎপাদনের ও উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি, যন্ত্রপাতির মান, শিল্পের প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হয় এবং যে নীতি যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত তাহাই গ্রহণ করা হয়।

মজুরী প্রদানের পদ্ধতি (Methods of Wage Payments)

শ্রমিকদের মজুরী প্রদানের পদ্ধতি প্রথমত দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা চলে—মৌলিক পদ্ধতি (Basic Methods) ও প্রেরণামূলক পদ্ধতি (Incentive Methods)। মৌলিক পদ্ধতি আবার প্রধানত দুই প্রকারের—সময় হার (Time Rate) এবং কার্য হার (Piece Rate)। অন্যান্য যে সকল পদ্ধতি গৃহীত হইয়া থাকে উহা মৌলিক পদ্ধতি হইতেই উদ্ভূত এবং উহাদের মধ্যে অনেকের ভিতর কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়ার নীতি গৃহীত হইয়া থাকে। নিম্নের বিবরণ হইতে উভয় পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যাইবে :

১। **সময় হার (Time Rate) :** এই পদ্ধতি অনুযায়ী সময়ের ভিত্তিতে শ্রমিকদিগকে মজুরী দেওয়া হয়। ইহাতে কাজের সময় নির্দিষ্ট থাকে। এই সময় ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ বা মাস হিসাবে নির্ধারিত হইতে পারে। নির্দিষ্ট সময় কাজ করিলে শ্রমিকদিগকে একটি নির্দিষ্ট হারে মজুরী দেওয়া হয়। যে সকল ক্ষেত্রে কাজের নির্দিষ্ট মান বা ধারাবাহিকতা নাই, অথচ কাজের উৎকর্ষ ও কর্মীর কুশলতা প্রয়োজন এবং কাজটি খরিদ্দারের সূক্ষ্ম রুচিসম্মত হওয়া প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে সময় হার উপযুক্ত বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইহার সুবিধা এই যে—ইহা সহজ ও সরল পদ্ধতি। শ্রমিকগণ অনায়াসে ইহা বুঝিতে পারে, নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরী পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত থাকিতে পারে এবং ইহা পরিমাপ করার কোন অসুবিধা নাই। ইহা নির্দিষ্ট মানের পণ্য উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী এবং ব্যক্তিগত রুচি ইহাতে মিটানো সম্ভব হয়। শ্রমিক ও শ্রমিক সংঘও ইহা পছন্দ করে, কারণ ইহাতে শ্রমিকদের মধ্যে মজুরীর তারতম্য ঘটাইয়া বিভেদ সৃষ্টি করা হয় না। তদ্ব্যতীত ঠিকমত চলিলে ইহাই সস্তা পদ্ধতি।

কিন্তু ইহার **অসুবিধা** নিম্নরূপ : ইহাতে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। ফলে ইহাতে শ্রমিকগণ কম উৎসাহ পায়, বরং ইহা কাজে অবহেলা আনিয়া দেয়। তদারকি ভিন্ন ইহাতে কাজ ভালভাবে চলে না। ফলে ব্যয় প্রকৃত-প্রস্তাবে অধিক হয়।

২। **কার্য হার (Piece Rate) :** এই পদ্ধতিতে শ্রমিকগণ কাজের অনুপাতে মজুরী পাইয়া থাকে। ফলে যে যেমন কাজ করে সে সেরূপ মজুরী পাইয়া থাকে। যে কাজে নির্দিষ্ট মান স্থির করা যায়, পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়, ধারাবাহিকতা থাকে এবং দ্রুততা প্রধান বিবেচ্য বিষয় তথায় ইহা ভালভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে।

ইহার **সুবিধা** এই যে—ইহাতে যে যেমন কাজ করে সে তেমন মজুরী পায়। ফলে ইহাতে কাজে উৎসাহ, দ্রুততা, দক্ষতা এবং উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহাতে তদারকি ব্যয় কম পড়ে এবং শ্রমিকদের মজুরী অনায়াসে পরিমাপ করা চলে।

ইহার **অসুবিধা** নিম্নরূপ : ইহাতে উৎপাদনের উৎকর্ষ গৌণ হইয়া দাঁড়ায়, কাজের বেগ বৃদ্ধি পাওয়াতে ত্রুটিপূর্ণ জিনিস উৎপন্ন হয়, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির অপচয় ও অপব্যবহার দেখা দেয়, শ্রমিকদের অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য স্বাস্থ্যহানি ঘটে, উহাদের অনুপস্থিতির হার বৃদ্ধি পায় এবং মজুরী প্রাপ্তির বিভিন্নতার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়।

৩। **শ্রম-সময় হার (Task Rate) :** এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ শ্রমিকের সম্পন্ন করিতে হয় এবং উহার ভিত্তিতে মজুরী প্রদান করা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কাজটি শেষ হইলে তজ্জন্য অতিরিক্ত মজুরী দেওয়া হয় না। এই পদ্ধতির **সুবিধা** এই যে—ইহাতে কাজে তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং কি পরিমাণ মজুরী শ্রমিক পাইবে তাহাও নির্দিষ্ট থাকে। যেখানে কাজের পরিমাণ সহজে স্থির করা যায় সেখানে এই পদ্ধতি উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। সময় হার ও কার্যহারের ত্রুটিগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে এতদ্ উভয়ের সমন্বয়ে এই পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটিয়াছে সত্য কিন্তু ইহার **অসুবিধা** হইতেছে যে—নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কাজটি সম্পন্ন হইলে অতিরিক্ত মজুরী দেওয়ার নিয়ম নাই বলিয়া শ্রমিকরা প্রকৃত প্রস্তাবে কাজে নিরুৎসাহই বোধ করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব থাকায় কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু ইহাতে কাজের মান ঠিকমত রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

৪। **প্রগতিশীল হার (Progressive Rate) :** ইহাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য একটা মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য কিছু অতিরিক্ত মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকে। ইহার **সুবিধা** হইতেছে—ইহা শ্রম-সময় হারের (Task Rate) অসুবিধা দূর করিয়া থাকে এবং অতিরিক্ত মজুরী ক্রমহ্রাসমান বলিয়া

উৎপাদনের উৎকর্ষ হ্রাস না পাওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং ইহাতে শ্রমিকগণ অতিরিক্ত মজুরীর প্রলোভনে অত্যধিক পরিশ্রমে নিযুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটায় না। কিন্তু ইহার **অসুবিধা** হইতেছে যে, ইহাতে ক্রমহ্রাসমান অতিরিক্ত মজুরীর ব্যবস্থা থাকে বলিয়া দক্ষ শ্রমিকগণ তাহাদের কাজে বিশেষ উৎসাহ বোধ করে না এবং তাহারা সাধারণত দ্বিধাগ্রস্তভাবে কাজ করিয়া থাকে। ফলে কাজের উৎকর্ষ অনেক-ক্ষেত্রেই বজায় থাকে না।

৫। **টেলরের পার্থক্যমূলক কার্য হার (Taylor's Differential Piece Rate):** এই পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য উচ্চতর হারে এবং উক্ত কাজ উক্ত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে অক্ষম হইলে নিম্নতর হারে মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। ইহার **সুবিধা** হইতেছে যে—দক্ষ শ্রমিকগণ উচ্চতর হারে মজুরী পাওয়ার অধিকারী হয়, ফলে উহাদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। যাহারা অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ তাহারা উচ্চতর হারে মজুরী পাওয়ার জন্য উহাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত থাকে। কিন্তু ইহার **অসুবিধা** হইতেছে—যাহারা দক্ষ শ্রমিকের পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে না তাহাদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়।

৬। **অধিবৃত্তি পদ্ধতি (Bonus System):** যদিও বিভিন্ন প্রকারের অধিবৃত্তি পদ্ধতিতে মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা আছে, মোটের উপর উহাদের নীতি প্রায় একরূপ। এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা থাকে কিন্তু যদি কোন শ্রমিক নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কাজটি সম্পন্ন করে তবে উহাকে সময় সংক্ষেপের জন্য কিছু অতিরিক্ত মজুরী দেওয়া হয়। ইহা একটি প্রেরণামূলক মজুরী প্রথা এবং প্রগতিশীল (Progressive) পদ্ধতির প্রায় অনুরূপ। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অধিবৃত্তি পদ্ধতিতে সময় সংক্ষেপের জন্য কিন্তু প্রগতিশীল পদ্ধতিতে অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরী দেওয়া হয়। অধিবৃত্তির পদ্ধতির **সুবিধা** হইতেছে—ইহা শ্রমিকদিগকে অধিক আয়ের সুযোগ দিয়া থাকে। এজন্য ইহারা কাজে উৎসাহ বোধ করে এবং অধিক পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করিয়া কাজের মানের অপকর্ষ সৃষ্টি করে না। কিন্তু ইহার **অসুবিধা** হইতেছে—ইহা অত্যন্ত জটিল পদ্ধতি এবং শ্রমিকদের পক্ষে বুঝিতে কষ্ট হয়। ইহা ছাড়া ইহা দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

৭। **গড়ান ক্রম পর্যায় (Sliding Scale):** এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট মজুরী দেওয়া হয় এবং জীবনযাত্রার মানের অথবা বিক্রয়মূল্যের তারতম্য দেখা দিলে উক্ত মজুরীরও তারতম্য দেখা দেয়। যেমন বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পাইলে মজুরী বৃদ্ধি পাইবে, আবার বিক্রয় মূল্য হ্রাস পাইলে মজুরীও হ্রাস পাইবে। ইহার **সুবিধা** হইতেছে—দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের ফলে মজুরীরও পরিবর্তন হয় বলিয়া শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। যদি কারবারের অবস্থা উন্নতির দিকে

অগ্রসর হয় তবে শ্রমিকগণ ইহা পছন্দ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার **অসুবিধা** হইতেছে—দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইলে মজুরী হ্রাস আরম্ভ হইলে শ্রমিকদের বিরোধিতা চরমে উঠে এবং উহার ফলে ধর্মঘট, কারবার বন্ধ প্রভৃতি দেখা দেয়।

৮। **নিম্নতম মজুরী পদ্ধতি (Minimum Wage System) :** এই পদ্ধতি অনুযায়ী জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য নিম্নতম মজুরী ঠিক থাকে। ইহার **সুবিধা** এই যে—ইহাতে শ্রমিকগণ যে মজুরী পায় তাহাতে তাহারা মোটামুটিভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। শ্রমিকগণ ইচ্ছা করিলেও অধিক পরিশ্রম দ্বারা উহা হইতে বেশী মজুরীও পাইতে পারে। কিন্তু ইহার **অসুবিধা** হইতেছে—জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী মজুরী স্থির করা এক প্রবল সমস্যা এবং উহা শ্রমিকদের নিকট কখনও গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।

৯। **মুনাফার শরিকানা (Profit Sharing) :** এই পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রমিকগণ তাহাদের প্রাপ্য মজুরী ছাড়া কারবারের মুনাফার ভাগীদারও হয়। ইহার **সুবিধা** হইতেছে—ইহা শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ দূর করে, কারণ শ্রমিকগণ কারবারটিকে নিজেদের বলিয়া মনে করিতে পারে এবং নিজেদের স্বার্থে উহার মুনাফা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইতে পাবে। ইহাতে তদারকি ব্যয় কম পড়ে, নানাবিধ অপচয় দূর হয় এবং ধর্মঘট, কারবার বন্ধ প্রভৃতি দেখা দেয় না। কিন্তু ইহার **অসুবিধা** হইতেছে—ইহা শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না, কারণ যে মুনাফা শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ হইবে উহা স্থির করা এক দুরূহ সমস্যা। শ্রমিকগণ বৎসর শেষে কি পরিমাণ মুনাফা পাইবে সে সম্বন্ধে তাহারা নিশ্চিত হইতে পারে না। মন্দার সময় বা ব্যবস্থাপনার ত্রুটির জন্য মুনাফা কম হইলে শ্রমিক বিরোধ প্রবলাকার ধারণ করে

১০। **সহ-অংশীদারী (Co-partnership) :** এই পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রমিকগণ তাহাদের প্রাপ্য মজুরী ছাড়া কারবারের মুনাফার ভাগীদার হয় এবং কারবার পরিচালনায়ও অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। ইহার **সুবিধা** মুনাফা শরিকানার অনুরূপ। ইহার অতিরিক্ত সুবিধা হইতেছে—ইহাতে শ্রমিকদের মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে উৎসাহের মাত্রা অধিক বৃদ্ধি পায়। ইহার **অসুবিধাও** মুনাফা শরিকানার অনুরূপ। ইহার অতিরিক্ত অসুবিধা হইতেছে—ইহাতে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নামমাত্র। ইহার ফলে মালিকদের উপর ইহারা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

দিন মজুরী বনাম ঠিকা মজুরী (Day Wage Vs. Piece Wage)

এখানে দিন মজুরী (day wage) বলিতে সময় হার (time rate) এবং ঠিকা মজুরী (piece wage) বলিতে কার্য হার (piece rate) বুঝাইতেছে।

দিন মজুরী প্রথা যেখানে প্রচলিত সেখানে সময়ের ভিত্তিতে শ্রমিকদিগকে মজুরী

দেওয়া হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কাজের সময় নির্দিষ্ট থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে কতটা কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে তাহার কোন নির্দেশ থাকে না। আবার ঠিকা মজুরী প্রথা যেখানে প্রচলিত সেখানে শ্রমিকগণ কাজের অনুপাতে মজুরী পাইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ এবং মজুরীর পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু কতটা সময়ের মধ্যে উক্ত পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে তাহার কোন নির্দেশ থাকে না।

আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই পার্থক্যের ফলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, 'দিন মজুরী' প্রথায় উৎপাদনের উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। ফলে ইহা ব্যক্তিগত সূক্ষ্মরুচির অভাব পূরণ করিতে পারে। এই প্রথায় কার্যের পরিমাণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না। এজন্য যে সকল কারবারে দিন মজুরী দেওয়া হয় সে সকল কারবার অধিক উৎপাদন দ্বারা বেশী মুনাফা অর্জন করিতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে ঠিকা মজুরী প্রথা যেখানে প্রচলিত সেখানে ইহার বিপরীত অবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। উৎপাদনের উৎকর্ষের দিক বা ব্যক্তিগত রুচি মিটানোর দিকে ইহা দৃষ্টি দেয় না। ইহাতে বেশী উৎপাদন দ্বারা অধিক বিক্রয় সম্ভব হইলেও মুনাফা বেশী নাও হইতে পারে। কারণ পণ্যের উৎকর্ষ ঠিকমত বজায় যদি না থাকে তবে অধিক মূল্যে জিনিস বিক্রয় করা সম্ভব নাও হইতে পারে। এজন্য মুনাফার পরিমাণ কম হইতে পারে। এইভাবে বিচার করিলে ইহারা বিপরীতধর্মী একথা বলা চলে। কিন্তু দৃশ্যত বিপরীতধর্মী হইলেও মূলত ইহারা বিপরীতধর্মী নহে। ইহাদের মধ্যে মূলত সাদৃশ্য ও পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। এই সাদৃশ্য ও সম্পর্ক বুঝিতে হইলে উৎপাদনের নীতি অবশ্য মনে রাখিতে হইবে। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, উৎপাদনের পক্ষে উৎকৃষ্ট মান এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ উভয়ই অবশ্য প্রয়োজন। প্রত্যেক কারবারী এই উভয়দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উৎপাদনকার্যে ব্যাপৃত হন। পণ্যের মান উন্নত হইলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। আবার উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন ব্যয় সাধারণত কম পড়ে। ফলে অধিক পরিমাণে পণ্য বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে হইলে পণ্যের মান ও পরিমাণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া উপায় নাই। উপযুক্ত মজুরী প্রথা প্রবর্তন করিতে পারিলে এ উভয় দিকে সাফল্য লাভ করা সহজসাধ্য হয়। কারণ কাজের ভার শ্রমিকদের উপর। উহারা কেবল কাজ করিয়া যাইবে কিন্তু পরিমাণের দিকে দৃষ্টি দিবে না এরূপ হইলে কারবারে কখনও সাফল্য আসিতে পারে না। সুতরাং শ্রমিক নিয়োগের সময় কারবারীকে একথা অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে। কাজের জন্য শ্রমিককে মজুরী দেওয়া হয়, কেবল সময়ের জন্য মজুরী দেওয়া হয় না—ইহা অবশ্যই তাঁহার বিবেচনার মধ্যে আসিয়া যায়। সুতরাং দিন মজুরী দেওয়ার সময় তিনি শ্রমিকের নিকট হইতে কমপক্ষে কিছুটা কাজ অবশ্যই আশা করেন। আবার ঠিকা মজুরী দেওয়ার সময় তিনি শ্রমিকের নিকট হইতে একটা নির্দিষ্ট

মানের কাজ অবশ্যই আশা করেন। এজন্য যে প্রথাতেই মজুরী দেওয়া হউক না কেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ পাইতে প্রত্যেক কারবারী ইচ্ছা করেন। যে শ্রমিক তাঁহার এই ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হইবে তাঁহাকে তিনি ছাঁটাই করিতে বাধ্য হইবেন। ফলে যে প্রথাতেই মজুরী দেওয়া হউক না কেন উভয় ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ ও মান চিন্তা করিয়া মজুরীর হার ঠিক করা হয়। ইচ্ছামত বা খেয়াল-খুশীমত উহা কখনই স্থির হয় না। দিন মজুরীর ক্ষেত্রে পণ্যের মান এবং ঠিকা মজুরীর ক্ষেত্রে পরিমাণ প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইলেও উহারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং উহাদের সম্পর্ক নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। এই অর্থে দিন মজুরী বলিতে ঠিকা মজুরী এবং ঠিকা মজুরী বলিতে দিন মজুরী বুঝাইয়া থাকে (The day wage is the piece wage and piece wage is the day wage)। কেবল উৎপাদন ও কারবারের প্রকৃতি অনুযায়ী যে প্রথা সুবিধাজনক উহাই গৃহীত হইয়া থাকে।

বিভিন্ন প্রকার প্রেরণামূলক মজুরী (Different systems of incentive wage payment)

শিল্পজগতে শ্রম ও মূলধনের মধ্যে অর্থাৎ শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধ চিরন্তন। বর্তমানকালে এই বিরোধ বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। উক্ত বিরোধ দূর করার উদ্দেশ্যে পুরাতন প্রথায় মজুরী দেওয়ার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য অনেক প্রেরণামূলক পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই প্রেরণামূলক পদ্ধতির উদ্দেশ্য শ্রমিকদিগকে কাজে উৎসাহ দেওয়া এবং উহাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। ইহাদের মধ্যে অধিবৃত্তিমূলক ব্যবস্থাগুলি (Bonus Systems) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে উহাদের কয়েকটির পরিচয় দেওয়া হইল :

(ক) হালসী পদ্ধতি (Halsey System) : এই পদ্ধতিতে সময় হারে (Time Rate) মজুরী দেওয়া হয়, কিন্তু প্রত্যেক কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় স্থির করা থাকে। কাজটি উক্ত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন হইলে যে সময় বাঁচে তাহার জন্য অধিবৃত্তি (Bonus) দেওয়া হয়। যে সময়ে কাজটি সম্পন্ন হইয়াছে উক্ত সময়ের জন্য 'সময় হারে' এবং বাঁচানো সময়ের জন্য অর্ধেক হারে অধিবৃত্তি দেওয়া হয়। মনে করি কোন কাজ শেষ করার নির্দিষ্ট সময় ১০ ঘণ্টা। মজুরীর হার প্রতিঘণ্টায় ১ টাকা। কাজটি শেষ হইয়াছে ৮ ঘণ্টায়। সুতরাং সময় বাঁচানো হইয়াছে ২ ঘণ্টা। এক্ষেত্রে শ্রমিক নিম্নরূপ মজুরী পাইবে :

$$(৮ \times ১ + \frac{১}{২} \times ১ \times ২) = ৯ \text{ টাকা}$$

অর্থাৎ ঘণ্টা প্রতি মজুরী পড়িল প্রায় ১ টাকা ১২ পয়সা।

এই পদ্ধতির **সুবিধা** হইতেছে যে, ইহাতে শ্রমিক সময় অনুযায়ী তাহার মজুরী পায় এবং সময় বাঁচানোর জন্য কিছু অতিরিক্ত মজুরী পায়। ইহার ফলে তাহার ঘণ্টা প্রতি মজুরী নির্দিষ্ট হার অপেক্ষা কিছু বেশী পড়ে। ফলে ইহাতে কাজে তৎপরতা

বৃদ্ধি পায়। বাঁচানো সময়ের জন্য অবশ্য শ্রমিককে পুরা মজুরী দেওয়া হয় না। এজন্য মালিকও কিছু লাভবান হন। কিন্তু ইহার **অসুবিধা** হইতেছে—বাঁচানো সময়ের পুরা মজুরী না পাওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তাহা ছাড়া শ্রমিকদের পক্ষে মজুরী ও অধিবৃত্তি ঠিকমত বুঝিয়া লওয়া কষ্টকর।

(খ) রোয়ান পদ্ধতি (**Rowan System**)**:** এই পদ্ধতি হালসী পদ্ধতির প্রায় অনুরূপ। শুধু বাঁচানো সময়ের অধিবৃত্তি দেওয়ার রীতিটা বিভিন্ন। এই অধিবৃত্তি বাঁচানো সময় এবং নির্দিষ্ট সময়ের অনুপাতের ভিত্তিতে স্থির করা হয়। উপরি-উক্ত দৃষ্টান্ত অনুযায়ী এই পদ্ধতিতে শ্রমিক নিম্নরূপ মজুরী পাইবে:

$(৮ \times ১ + \frac{২}{১০} \times ৮ \times ১)$ = প্রায় ৯ টাকা ৬০ পয়সা অর্থাৎ ঘণ্টাপ্রতি মজুরী পড়িল—প্রায় ১ টাকা ২০ পয়সা।

এই পদ্ধতির **সুবিধা** হালসী পদ্ধতির অনুরূপ। তবে ইহাতে হালসী পদ্ধতি হইতে বেশী উৎসাহ পাওয়ার সুযোগ আছে। কারণ প্রথমদিকে ইহাতে অধিবৃত্তির হার বৃদ্ধিও পায়।

ইহার **অসুবিধাও** হালসী প্রথার অনুরূপ। তবে অধিবৃত্তি বৃদ্ধি পাইলে মজুরীর হার হ্রাস পাইতে থাকে। এজন্য উৎপাদন বৃদ্ধি বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না।

(গ) **গ্যাণ্টের শ্রম-সময় এবং অধিবৃত্তি পদ্ধতি** (**Gantt's Task and Bonus System**)**:** ইহাতে দিন মজুরী ও ঠিকা মজুরীর সমন্বয় সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী সর্বাধিক দক্ষ শ্রমিকদের জন্য একটি উচ্চমানের কার্য এবং তজ্জন্য ঘণ্টাপিছু উচ্চহারে মজুরী স্থির করা হয়। যে সকল শ্রমিক উক্ত উচ্চমানের কার্য করিতে অক্ষম তাহারা ঘণ্টাপ্রতি দৈনিক ন্যূনতম মজুরী পাইয়া থাকে। যাহারা নির্ধারিত মানের কিংবা তাহা অপেক্ষা বেশী কার্য করিতে সক্ষম তাহারা নির্ধারিত প্রাপ্য মজুরীসহ ঠিকা প্রথায় অধিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

(ঘ) **মেরিকের বহুগুণ কার্যহার** (**Merrick's Multiple Piece Rate**)**:** প্রত্যেক শ্রমিকের দক্ষতা একরূপ নয় বলিয়া মেরিক মজুরী প্রদানের জন্য উহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত হইতেছে নূতন ও অল্প দক্ষ শ্রমিক। ইহারা নির্ধারিত কার্যের শতকরা ৮৩ ভাগ সম্পন্ন করিতে পারিবে বলিয়া ধরা হয় এবং ইহাদের মজুরীর হার কিছুটা নিম্নহারে স্থির করা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হইতেছে সাধারণ শ্রমিক। ইহাতে নির্ধারিত কার্যের শতকরা ১০০ ভাগই সম্পন্ন করিতে পারিবে বলিয়া ধরা হয় এবং ইহাদের জন্য প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা কিছুটা উচ্চ মজুরী স্থির করা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হইতেছে দক্ষ শ্রমিক। ইহারা নির্ধারিত কার্যের অতিরিক্ত কিছু সম্পন্ন করিতে সক্ষম বলিয়া ধরা হয় এবং ইহাদের জন্য সবচেয়ে বেশী হারে মজুরী স্থির করা হয়।

(ঙ) এমার্সনের দক্ষতা মজুরী পরিকল্পনা (**Emerson's Efficiency Wages Plan**)**:** ইহাতে কার্যের মান খুব উচ্চস্তরে নির্ধারিত থাকে। শ্রমিকদের

মজুরী অবশ্য একটি নির্দিষ্ট দৈনিক হারে স্থির করা থাকে। কিন্তু নির্ধারিত কার্যের একটা ন্যূনতম অংশ যেমন ⅔ অংশ সম্পন্ন করিতে পারিলে শ্রমিকগণ দৈনিক মজুরীর একটা শতকরা অংশ যেমন ৫% অধিবৃত্তি (Bonus) হিসাবে পাইয়া থাকে। ন্যূনতম অংশ হইতে যত বেশী পরিমাণ কার্য সম্পাদন হইবে অধিবৃত্তির হারও ক্রমশ তত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

অন্যান্য প্রেরণামূলক মজুরী যাহা শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ মীমাংসায় সাহায্য করিতে পারে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিও উল্লেখযোগ্য: (১) প্রগতিশীল হার (Progressive Rate), (২) টেলরের পার্থক্যমূলক কার্য হার (Taylor's Differential Piece Rate System), (৩) নিম্নতম মজুরী পদ্ধতি (Minimum Wage System), (৪) মুনাফা শরিকানা (Profit Sharing) এবং (৫) সহ-অংশীদারী (Co-Partnership)।

মুনাফা শরিকানা এবং সহ-অংশীদারী (Profit Sharing and Co-partership)

মুনাফা শরিকানা (Profit Sharing): এই পদ্ধতিতে সময় হার কিংবা কার্যহার পদ্ধতিতে প্রথমে শ্রমিকদিগকে মজুরী দেওয়া হয়। তাহার পর বৎসর শেষে লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ উহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং সাধারণ মজুরী ছাড়া মজুরীর অনুপাতে প্রত্যেক শ্রমিক একটা লভ্যাংশ পাইয়া থাকে। লাভের যে অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয় উহা মূলধনের উপর লভ্যাংশ ঘোষণা করার পর যে নীট লাভ থাকে তাহার একটি অংশ। মূলধনের উপর লভ্যাংশ দেওয়ার পর যে লাভ থাকে উহা অবশ্য পুনরায় শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হয়। শ্রমিকগণ উহাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ নগদ টাকায়, শেয়ার কিংবা ভবিষ্যনিধি (Provident Fund) আকারে পাইয়া থাকে। মুনাফা শরিকানা প্রকৃত প্রস্তাবে মজুরী প্রদানের কোন পদ্ধতি নহে। শ্রমিক অসন্তোষ দূর করার জন্য ইহা সাধারণ মজুরীর উপর একটা অতিরিক্ত ব্যবস্থা।

সহ-অংশীদারী (Co-partership): সহ-অংশীদারী মুনাফা শরিকানারই অনুরূপ। ইহাতে মাত্র আরও একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা থাকে। উহা হইতেছে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার। সুতরাং উহাদের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

মুনাফা শরিকানা = সাধারণ মজুরী + লাভের অংশ।

সহ-অংশীদারী = সাধারণ মজুরী + লাভের অংশ + পরিচালনায় অংশগ্রহণ।

সহ-অংশীদারীতে শ্রমিকদের কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে এবং উহারা কিছুটা মূলধনেরও মালিক হয়। শ্রমিকদের লাভের অংশই সাধারণত মূলধন হিসাবে কারবারে নিয়োগ হয়। ইহারা লাভের অংশ গ্রহণ করিলেও কোন অবস্থাতেই ইহাতে ক্ষতির অংশ বহন করার নিয়ম নাই।

মুনাফা শরিকানার সুবিধা নিম্নরূপ :

(ক) ইহাতে শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ একসূত্রে গ্রথিত হয় এবং উহারা পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা কারবারের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারে। ইহাদের স্বার্থ অভিন্ন হওয়ায় শ্রমিক-মালিক বিরোধ দূর হয় এবং শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে কারখানার কাজ ব্যাহত হয় না এবং ধর্মঘট, কারবার বন্ধ প্রভৃতির সম্ভাবনা থাকে না।

(খ) কারবারের উন্নতি হইলে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকগণ বর্ধিত মুনাফার অংশভাগী হয়। ফলে ইহাতে কারবারের উন্নতি, উৎপাদন বৃদ্ধি, মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপারে শ্রমিকদের সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং উক্ত ব্যাপারে ইহারা আত্মনিয়োগ করিতে সচেষ্ট হয়।

(গ) ইহার ফলে নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকগণ কারখানার কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি অতি সাবধানতার সহিত ব্যবহার করে। ফলে ইহাতে শ্রমিকদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়, কাঁচামালের অপচয় দূর হয় এবং যন্ত্রপাতির আয়ু বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) অধিক লাভের আশায় ইহারা কাজ সম্পাদনে বিশেষ যত্নশীল হয়। ইহার ফলে শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং কারবারের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে।

(ঙ) নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকগণ কার্য সম্পাদনে যত্নবান থাকে বলিয়া কারখানার তদারকি স্বভাবতই হ্রাস পায়।

(চ) ইহাতে শ্রমিকদের অনুপস্থিতি এবং কার্যান্তরে গমন অনেক হ্রাস পায়। কারণ মুনাফার অংশ প্রদানের সময় শ্রমিকদের কার্যকাল বিচার-বিবেচনা করা হয়।

(ছ) ইহাই দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক আকৃষ্ট করার এবং উৎপাদনে উন্নত প্রক্রিয়া আবিষ্কারের উপযুক্ত পরিস্থিতি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

(জ) দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিকের সমাবেশের ফলে একদিকে ইহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদিকে উৎপাদনের গড়পড়তা ব্যয় হ্রাস পায়। ইহার ফলে অধিক বিক্রয় দ্বারা অধিক মুনাফা লাভের সুযোগ ঘটে। এজন্য শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষই উপকৃত হয়।

(ঝ) ইহাতে শ্রমিকদের যথাসাধ্য সন্তোষ বিধান হয় বলিয়া শ্রমিক সংঘের প্রভাবও হ্রাস পায় এবং মালিকদের পক্ষে ইহা অবশ্যই কাম্য।

কিন্তু এই ব্যবস্থা কখনই ত্রুটিহীন বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কারণ ইহাতে নিম্নলিখিতরূপ অসুবিধাগুলিও দেখিতে পাওয়া যায় :

(ক) এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা মুনাফার পরিমাণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কারবারের নানাবিধ ব্যয় নির্বাহ এবং মূলধনের উপর লভ্যাংশ দেওয়ার পর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা না থাকিলে ইহা কার্যকরী করা যায় না। অব্যাহত গতিতে এই পরিমাণ মুনাফা লাভ অনেক কারবারের পক্ষেই সম্ভব হয় না। ফলে বাস্তব

ক্ষেত্রে ইহা কার্যকরী করা এক দুরূহ সমস্যা। মুনাফা লাভ রীতিমত হইলে শ্রমিকদের সহযোগিতা অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু কারবারে লোকসান দেখা দিলে ইহার বিপরীত অবস্থারই সৃষ্টি হয়। উহা কারবারের পক্ষে ভয়াবহ অবস্থা এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(খ) শ্রমিকগণ মুনাফার অংশ উহাদের শ্রমের অনুপাতে অবশ্যই পায় না। অবশিষ্ট মুনাফার উপর শ্রমিক-মালিক উভয়ের ভাগ থাকে। কিন্তু উহার কতটা পরিমাণ মুনাফা শ্রমিকদিগকে দেওয়া হইবে উহা কারবারের পরিচালকমণ্ডলীই স্থির করিয়া থাকে। এরূপ বিভাগের ক্ষেত্রেই শ্রমিক-মালিক বিরোধ চরমে উঠে। কারণ এই মুনাফা বিভাগের সুষ্ঠু মীমাংসা খব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) এরূপ ব্যবস্থা কেবল সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে যেখানে মুনাফার হার মোটামুটি অব্যাহত থাকে সেখানেই কার্যকরী করা সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ কারবারের এবং বিশেষত নূতন কারবারে মুনাফা লাভের হার অনিশ্চিত। এরূপ ক্ষেত্রে ইহা কার্যকরী করার অনেক বাধা দেখা দেয়। অনিশ্চিত লাভের আশা থাকিলে শ্রমিকদের সহযোগিতা ও কর্মপ্রেরণা স্বভাবতই হ্রাস পায়।

(ঘ) এই ব্যবস্থায় মুনাফার অংশ মজুরীর সঙ্গে অবশ্যই দেওয়া হয় না। ইহা বৎসর শেষে হিসাব-নিকাশ হওয়ার পর দেওয়া হয়। অনিশ্চয়তার উদ্বিগ্নে এই দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিতে হয় বলিয়া শ্রমিকদের কর্মে উৎসাহ উদ্দীপনা স্বভাবতই হ্রাস পাইতে থাকে।

(ঙ) ইহাতে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও পুরস্কার দেওয়ার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই। সমষ্টির দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই পুরস্কার বা মুনাফা আসিয়া থাকে। ফলে দক্ষ শ্রমিকের এরূপ ব্যবস্থা মনঃপূত হয় না।

(চ) কারবারের মুনাফা শুধু শ্রমিকদের দক্ষতা বা যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য ব্যাপারের উপরও ইহা নির্ভর করে। শ্রমিকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও অদক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে কারবারের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। সুতরাং মুনাফা লাভের এরূপ অনিশ্চিত পরিস্থিতি শ্রমিকদিগকে কর্মে আশানুরূপ প্রেরণা যোগাইতে পারে না।

(ছ) হিসাব-নিকাশ নিষ্পত্তির দ্বারা মুনাফা স্থির করার ভার পরিচালকমণ্ডলীর এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর থাকে। ইহাদিগকে অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত মুনাফা গোপন করিতে দেখা যায়। ফলে মুনাফার সত্যতা সম্পর্কে শ্রমিকদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ উপস্থিত না হইয়া পারে না। সুতরাং ইহাতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি প্রকৃত প্রস্তাবে বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না।

(জ) ইহা যে একটা জটিল ব্যবস্থা একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অথচ এই জটিল ব্যবস্থার প্রবর্তন শ্রমিকদের পরামর্শ না লইয়াই ঘটিতে থাকে। ইহাতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতির পরিবর্তে অবনতিই আসিয়া যায়।

(ঝ) একই প্রকার শিল্পের অন্তর্গত হইলেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এরূপ মুনাফা বণ্টনের হার বিভিন্ন রূপই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ একইরূপ মুনাফা পায় না। ইহাতে শ্রমিক অসন্তোষ এবং শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয়। ফলে এই ব্যবস্থা শ্রমিক-সংঘের আদর্শের পরিপন্থী দেখা দেয়।

(ঞ) এই ব্যবস্থা অনুযায়ী শ্রমিকগণ কেবল মুনাফার অংশভাগী হয়, কিন্তু লোকসানের অংশভাগী হয় না। এরূপ পরিস্থিতিও শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে না এবং মালিকগণের এ ব্যবস্থা এ কারণে মনঃপূত হয় না।

(ট) এই ব্যবস্থার সুফল শুধু কারবারের উন্নতির সময়ই পাওয়া যায় এবং কারবারের মন্দার সময় ইহা কার্যকরী করা সম্ভব হয় না। ইহাতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। মোটের উপর ইহা সুসময়ের বন্ধু, অসময়ে কেহ কারও নয়।

(ঠ) ইহাতে সুফলের আশা শুধু কল্পনাপ্রসূত। ইহার কুফলগুলির প্রাধান্য ও অস্তিত্ব সবক্ষেত্রেই বেশী মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে ইহা স্থায়ী কার্যকর ব্যবস্থা হিসাবে কারবারী জগতে বিশেষ স্থান পায় না।

সহ অংশীদারীর সুবিধা—ইহার সুবিধাগুলি মুনাফা শরিকানার অনুরূপ। উক্ত সুবিধাগুলি ছাড়া ইহাতে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলিও দেখিতে পাওয়া যায়:

(ক) ইহাতে শ্রমিক নিজেকে কারবারের একজন অংশীদার বলিয়া মনে করিতে পারে। অংশীদারের এই মর্যাদা শ্রমিকেরও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। মালিক কর্তৃক প্রদত্ত এই মর্যাদা শ্রমিকদের নৈতিক মানও উন্নত করে এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের প্রভূত উন্নতি ঘটায়।

(খ) কারবার পরিচালনায় ইহাতে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে কারবারের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ইহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। ইহার ফলে শ্রমিক মালিকের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়, শ্রমিকদের পক্ষ হইতে অযৌক্তিক দাবী পেশ হয় না এবং ইহার ফলে কারবারে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(গ) ইহাতে শ্রমিকগণ কারবারের উন্নতির জন্য অধিকতর শ্রম ও আত্মনিয়োগ করিতে পারে, মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া উহারা অন্যত্র যাইবার চেষ্টা করে না এবং ফলে কারবার উপযুক্ত দক্ষ শ্রমিকের সেবা হইতে বঞ্চিত হয় না। এইভাবে কারবারের এবং উহার মুনাফার অগ্রগতি অব্যাহত থাকে।

কিন্তু ইহার **অসুবিধাগুলি** নিম্নরূপ:

ইহার অসুবিধাগুলিও মুনাফা শরিকানার অনুরূপ। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলিও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়:

(ক) সহ-অংশীদারী আইনসম্মত অংশীদারী (Partnership) কারবারের মত

নয়। সুতরাং ইহাতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের এবং মালিক প্রতিনিধিদের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য সমভাবে স্বীকৃত হয় না।

(খ) ইহাতে শ্রমিকদের প্রতিনিধির সংখ্যা খুব কম থাকে। ইহা ছাড়া কারবার পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের ভোট দেওয়ার ক্ষমতা স্বীকৃত হয় না। তাহা ছাড়া শ্রমিকদের কারবারে ইচ্ছানুযায়ী মূলধন বিনিয়োগের সুবিধা ইহাতে থাকে না।

(গ) কারবারের যে অংশ শ্রমিকদিগকে দেওয়া হয় উহা অতি সামান্য এবং উহার ফলে এজন্য ইহাদের আয়ের অংশ মালিকদের তুলনায় খুব কম। সুতরাং মালিকানার গৌরব ইহাতে নগণ্য। ইহাতে মালিকদের পক্ষে নিজেদের ইচ্ছামত কারবার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার কোনই অসুবিধা হয় না।

(ঘ) শ্রমিকদের প্রাপ্য মুনাফার অংশই কারবারের শেয়ার ক্রয়ে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কারবারে লোকসান হইলে তাহাদের এই পরিশ্রমলব্ধ অর্থের কোনই সুফল পাওয়া যায় না। ফলে মন্দার বাজারে এই ব্যবস্থা শ্রমিক-স্বার্থের পরিপন্থী। একমাত্র কারবারের উন্নত আর্থিক অবস্থাতেই এই ব্যবস্থা সাফল্যের সহিত চলিতে পারে।

ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মুনাফা শরিকানা আন্দোলন (Profit Sharing movement in Indian industries)

বিভিন্ন প্রগতিশীল ও প্রেরণামূলক মজুরী প্রথা প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের আশানুরূপ উন্নতি কোথাও দেখা যাইতেছে না। বরং ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ফলে শিল্প-কারখানায় ধর্মঘট, কারবার বন্ধ প্রভৃতি পুরামাত্রায় চলিতে দেখা যাইতেছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকে মুনাফা শরিকানা প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়া থাকেন। ইহা কার্যকরী হইলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ দূর হইবে এবং শিল্পে শান্তিস্থাপন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখিবে—ইহাই অনেকের বিশ্বাস।

যদিও ইদানীংকালে মুনাফা শরিকানার আলোচনা প্রসার লাভ করিয়াছে, ইহা কোন নূতন ব্যবস্থা নয় একথা বলা চলে। কারণ এই ব্যবস্থা ব্যাপকতা লাভ না করিলেও ইহার প্রবর্তন বহুদিন হইতেই কোন কোন শিল্পে দেখা দিয়াছে। ফরাসী দেশে এই ব্যবস্থা ১৮২০ সালে প্রথম চালু হয়। ১৮৭০ সালের পর ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রবর্তিত হয়। ভারতের টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী ১৯৩৭ সালে ইহা প্রথম চালু করে। ১৯৩১ সালে রয়েল কমিশন অবশ্য এই ব্যবস্থা সমর্থন করেন নাই। স্বাধীনতালাভের পর ভারতে শিল্পে অশান্তি দূর করা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইতে থাকে। এজন্য ১৯৪৮ সালে প্রথম শিল্পনীতিতে শ্রমিকগণের মধ্যে মুনাফার অংশ বণ্টনের জন্য পরামর্শদানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শ পর্ষৎ (Central Advisory Council) স্থাপনের সংকল্প ঘোষণা করেন।

তদনুসারে ১৯৪৮ সালের মে মাসে সমসংখ্যক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধি লইয়া ১৪ জন সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করা হয়। ইহা Committee on Profit Sharing নামে পরিচিত। এই কমিটি লাভের অংশভাগকে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে, শিল্পে শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা হিসাবে এবং শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ হিসাবে বিচার করেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে ৫ বৎসরের জন্য শ্রমিকদিগকে লাভের অংশভাগ প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। এই ৬টি শিল্প হইল কার্পাস, পাট, সিমেণ্ট, সিগারেট, ইস্পাত ও টায়ার। কমিটির মতে ইহা শিল্প হিসাবে প্রবর্তিত না হইয়া প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মূলধনের উপর ৬% লভ্যাংশ মূলধনের ন্যায্য আয় (fair return to capital) বলিয়া কমিটি মত প্রকাশ করেন। উদ্বৃত্ত লাভের শতকরা ৫০ ভাগ শ্রমিকদের প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। নীট মুনাফা হইতে ১০% সংরক্ষণ তহবিলে এবং ৬% মূলধনের প্রাপ্য লভ্যাংশ বাদ দিয়া উদ্বৃত্ত লাভ স্থির হইবে। কোন শ্রমিকের লাভের অংশ হিসাবে প্রাপ্য হইবে তাহার পূর্বের বার মাসের মোট বেতনের অনুপাত অনুযায়ী। আবার কোন শ্রমিকের মুনাফার অংশ বাবদ প্রাপ্য অর্থ তাহার মূল বেতনের ২৫% পর্যন্ত নগদ দেওয়া হইবে এবং বাকী অংশ ভবিষ্যনিধিতে বা অন্যভাবে জমা থাকিবে।

এ পর্যন্ত কোন দেশেই এই ব্যবস্থা সাফল্যের সহিত প্রবর্তিত হয় নাই। নিউজিল্যাণ্ড, ব্রেজিল, চিলি প্রভৃতি দেশে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন বাধ্যতামূলক। কিন্তু বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশগুলিতে ইহার প্রবর্তন স্বেচ্ছামূলক। ভারতেও ইহা এখন পর্যন্ত স্বেচ্ছামূলক। টাটা ছাড়া ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড, টিনপ্লেট কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ইহা প্রবর্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কাহারও অভিজ্ঞতা বিশেষ সন্তোষজনক নহে। টাটা নীট মুনাফার প্রায় ২২½% শ্রমিকদিগকে অধিবৃত্তি হিসাবে দিয়া থাকে, কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষ উন্নতি দেখা দেয় নাই। সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প ছাড়া এই ব্যবস্থা চালু করা খুবই কঠিন—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু ভারতে এরূপ শিল্পের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তাহা ছাড়া বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রকৃত উদ্বৃত্ত মুনাফা বাহির করাও এক প্রবল সমস্যা। কারণ কোন অবস্থাতেই শ্রমিকগণ স্বীকার করে না যে, তাহারা মুনাফার ন্যায্য অংশ পাইতেছে। ফলে ইহার প্রবর্তন খুবই সীমাবদ্ধ। শ্রমিক-মালিকের মধ্যে টেলরের মানসিক বিপ্লব (Mental revolution) ভিন্ন ইহার সাফল্য আশা করা যায় না বলিয়া আমাদের অভিমত।

কর্মী বিভাগ (Personnel Department)

কারবারের বা সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, বদলি, পদোন্নতি, মজুরী নির্ধারণ ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের ভার যে

বিভাগের উপর থাকে উহাকে কর্মী বিভাগ (Personnel Department) বলে। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপককে কর্মী ম্যানেজার (Personnel Manager) বলে। তিনি তাঁহার অধীন কর্মচারীদের সহায়তায় এই বিভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অন্য বিভাগের জন্য উপরি-উক্ত কার্য সম্পন্ন করা, বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করা এই বিভাগের কর্তব্য। অন্য বিভাগের উপর অবশ্য কর্তৃত্ব করার অধিকার ইহার নাই। প্রত্যেক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে এরূপ একটি বিভাগ থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। বিগত শতাব্দীতে কারখানার জন্য কর্মী নির্বাচন, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ উৎপাদন বিভাগের মাধ্যমে সংঘটিত হইত। তখন উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইত এবং শ্রমশক্তিকে অতি সুলভ বস্তু হিসাবেই গণ্য করা হইত। কিন্তু কালক্রমে বিশেষত বর্তমান শতাব্দীতে বিগত শতাব্দীর এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দেখা দেয়। উৎপাদন ব্যয় হ্রাস শুধু যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাপনার উপরই নির্ভর করে না, কর্মীদের উপরও যে নির্ভর করে এ সত্য উপলব্ধি হইতে আরম্ভ করিল। শিল্পপতিগণ এখন উপলব্ধি করিয়াছেন যে, কর্মীদের সহযোগিতা উহাদের মনের ও দেহের পরিপুষ্টি ও পূর্ণ বিকাশ ছাড়া কারবারে সাফল্য আশা করা যায় না। শ্রমশক্তির নৈপুণ্য ও পূর্ণ ব্যবহার শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উপরও অনেকটা নির্ভরশীল। এই সম্পর্কের উন্নতি সাধন করিতে হইলে কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে হইবে। সুতরাং কর্মী সম্পর্কীয় বিষয় একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কর্মী ব্যবস্থাপনা কারবার ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বৃহৎ কারবারে ইহাকে অন্য বিভাগের অন্তর্গত রাখিলে কর্মী ব্যবস্থাপনার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য প্রত্যেক বৃহৎ কারবারে এরূপ একটি পৃথক বিভাগ থাকা সর্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয়। শ্রমিক-কর্মী বিভাগের কাজ নানাবিধ। নিম্নে উহা বর্ণিত হইল। উক্ত বিবরণ হইতেও এই বিভাগের পৃথক অস্তিত্বের কারণ ও গুরুত্ব ভালভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

১। এই বিভাগের প্রথম কাজ কর্মী নিয়োগ। এই বিভাগ সকল বিভাগের সকল শ্রেণীর কর্মী যথা শ্রমিক, করণিক, ব্যবস্থাপক প্রভৃতি নিয়োগ করিয়া থাকে। এই ব্যাপারে এই বিভাগই বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরামর্শ ও সাহায্য দানের সবকিছুই করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া কর্মী নির্বাচনের উদ্যোগ পর্ব হিসাবে এই বিভাগকে কার্য বিশ্লেষণ (Job Analysis), কর্মী সরবরাহ কেন্দ্রের বা উৎসের সহিত প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রচার, সাক্ষাৎকরণ (Interview), নিয়োগকালীন পরীক্ষা গ্রহণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্যভার গ্রহণ করিতে হয়।

২। কর্মীদের বেতন ও মজুরীর হার স্থির করাও এই বিভাগের অন্যতম কাজ। কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিশেষ দক্ষতা, পদমর্যাদা প্রভৃতি বিচার-বিবেচনা করিয়াই ইহা স্থির করিতে হয়। বেতন ও মজুরী উপযুক্ত বিবেচিত হইলেই

কর্মীরা কার্যে উৎসাহবোধ করিবে ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে। সুতরাং এ বিষয়েও এই বিভাগের উপর গুরু দায়িত্ব অর্পিত হইয়া থাকে এবং এজন্য কার্যের মূল্যায়ন (Job Evaluation) এবং গুণগত মান নির্ণয় (Merit Rating) প্রয়োজন হয়।

৩। কর্মীদিগকে উপযুক্ত পদে নিয়োগ করা এবং পদোন্নতির ব্যবস্থা করাও এই বিভাগের বিশেষ কাজ। পদের উপযুক্ত কাজে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে না পারিলে শ্রমনৈপুণ্য হ্রাস পায় এবং কারবারের সাফল্য অনিশ্চিত হয়।

শ্রমিক ও কর্মীদের বুদ্ধি, দক্ষতা, প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা, আগ্রহ প্রভৃতি বিচার-বিবেচনা করিয়াই উহাদের পদের যোগ্যতা স্থির করিতে হয়। তাহা না হইলে কর্মীদের কাজে শৈথিল্য, অসন্তোষ, অনিচ্ছা প্রভৃতি দেখা দেয়। ইহার ফলে কারবারের উৎপাদন ও মুনাফা হ্রাস পায় এবং কর্মীদের মধ্যেও বিরোধ এবং বিভেদ সৃষ্টি হয়। যোগ্যতা অনুযায়ী কার্যবণ্টনের পর কোন্ কর্মী কিরূপ কাজ দেখাইতেছে সে সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ও সংবাদ সংগ্রহও এই বিভাগের করিতে হয় এবং প্রত্যেক কর্মীর কার্য সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ চাকুরি বহিতে (Service Book) লিখিয়া রাখিতে হয়। উক্ত বহির সংবাদাদিকে ভিত্তি করিয়া পদোন্নতি, বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়।

ইহার পরবর্তী কাজ হইতেছে পদোন্নতি ও বদলীর বিষয় বিচার-বিবেচনা করা। অনেক প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ের কোন পদ সৃষ্টি বা খালি হইলে উহা ঠিক নিম্ন পর্যায়ের কর্মীর পদোন্নতি দ্বারা উহা পূরণ করা হয়। এইভাবে স্তর পরম্পরায় পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকে এবং কেবল নিম্নতম পর্যায়ে নূতন নিয়োগ ঘটে। কারবারের অভ্যন্তর হইতে এরূপ পদপূরণ হইলে কর্মীদের যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রতি সুবিচার করা হয় এবং কর্মীরাও তাহাদের যোগ্যতা প্রদর্শন সম্পর্কে সচেষ্ট থাকে। প্রতিষ্ঠানে যোগ্য ব্যক্তির অভাব হইলে অবশ্য বাহির হইতে কর্মী সংগ্রহ করিতে হয়। কর্মীদের একঘেয়ে কর্মজীবনে বৈচিত্র্য ও উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য বা অধিকতর সুষ্ঠু কার্যসম্পাদনের জন্য এক কাজ বা পদ হইতে অন্য কাজ বা পদে কর্মীদের বদলীর প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং এই বিভাগের এই সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করিতে হয়

৪। এই বিভাগকে শ্রমিক কল্যাণের (Labour Welfare) দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। শ্রমিক কল্যাণ বলিতে শ্রমিকদের যাহাতে কর্মে দক্ষতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সন্তুষ্টি বিধান হয় তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে বুঝায়। এই শ্রমিক কল্যাণ-কার্যগুলির মধ্যে উপযুক্ত বিশ্রাম ও ছুটি এবং রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা, কারখানার মধ্যে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি, দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক বীমা, অধিবৃত্তি, ভবিষ্যনিধি, অবসর ভাতা, আনুতোষিক (Gratuity), স্বল্পমূল্যে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা, খেলাধুলা, শরীরচর্চা, চিত্তবিনোদন, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির ব্যবস্থা উল্লেখ-যোগ্য। শ্রমিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি থাকিলে কর্মীরা সন্তুষ্ট থাকে, উহাদের কাজে

দক্ষতা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় এবং কারবারে সাফল্যলাভ সহজসাধ্য হয়। সুতরাং শ্রমিক কল্যাণের নানাবিধ গুরুদায়িত্বও এই বিভাগকে বহন করিতে হয়।

৫। শ্রমিক সম্পর্ক ও শিল্পশান্তি (**Labour Relations and Industrial Peace**) স্থাপনও এই বিভাগের একটি বিশেষ কাজ। শ্রম আইন ও শ্রমনীতির পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টিই শ্রমিক সম্পর্কের বিশেষ উদ্দেশ্য। এজন্য প্রয়োজন শ্রমিকদের দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ অনুসন্ধান করা, উহা দূর করা, বিরোধ উপস্থিত হইলে উহা মীমাংসা করা, শ্রমিক সংঘের সহিত কর্মচুক্তি সম্পাদন করা, শ্রমিক-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলাপ-আলোচনা করা ইত্যাদি। সুতরাং শান্তিপূর্ণ ও হৃদ্যতাপূর্ণ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা, শিল্পে শান্তি বজায় রাখা, শ্রমবিরোধ ও ধর্মঘট দূর করার দায়িত্বও এই বিভাগের উপর অর্পিত হইয়া থাকে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই বিভাগের গুরুত্ব অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের কাজ (Functions of different levels of internal management of a manufacturing business)

বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে উহা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করার প্রয়োজন হইযা থাকে। উক্ত স্তরগুলির পরিচয় ও কাজ নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। **উধ্বর্তন ব্যবস্থাপনা (Top Management) :** এই স্তরের বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষের মধ্যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর, জেনারেল ম্যানেজার, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান যৌথ কারবারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার যে পরিচালকমণ্ডলী থাকে উহা কারবারের উদ্দেশ্য এবং নীতি স্থির করিয়া থাকেন। কারবারের উক্ত উদ্দেশ্য ও নীতি কার্যে পরিণত করার ভার থাকে উধ্বর্তন ব্যবস্থাপনার উপর। অন্য কথায় এই উধ্বর্তন ব্যবস্থাপনাই প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (Chief Executive)। ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার এই প্রধান কর্মাধ্যক্ষ পর্যায়ের লোক। উঁহাদিগকে সাহায্য করার জন্য একাধিক ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বা সমপর্যায়ের অন্য নামধারী কোনও কর্মাধ্যক্ষ থাকিতে পারেন। পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা নির্ধারিত কারবারের উদ্দেশ্য ও নীতি কার্যকরী করার জন্য উঁহারা উঁহাদের অধীন কর্মচারীদিগকে প্রয়োজনীয় আদেশ ও নির্দেশ দিয়া থাকেন এবং আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী কাজ হইতেছে কিনা উহা তদারক করিয়া থাকেন। সুতরাং এই প্রধান কর্মাধ্যক্ষের আসনে যাঁহারা অধিষ্ঠিত উঁহারা কারবারের কাজের অগ্রগতি, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি পরিচালকমণ্ডলীর নিকট পেশ করার জন্যও দায়ী থাকেন। একদিকে পরিচালকমণ্ডলী এবং অন্যদিকে অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া এই প্রধান কর্মাধ্যক্ষ উভয়ের মধ্যে সংযোগ সাধনের সেতু হিসাবে

কাজ করিয়া থাকেন। তিনি কর্মচারীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, মতি-গতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি পরিচালকমণ্ডলীর নিকট পেশ করার দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার কর্মাধ্যক্ষগণ কারবারের পরিকল্পনা, সংগঠন, আদেশ, নির্দেশ, সংযোজনা, নিয়ন্ত্রণ, উদ্দীপনা সৃষ্টি প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকেন। ইহারাই বিভাগীয় পরিকল্পনার খোরাক যোগাইয়া থাকেন, বিভাগীয় পরিকল্পনা অনুমোদন করেন এবং সমগ্রভাবে সমস্ত কার্য ঠিকমত সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন।

২। **মধ্যবর্ত্তী ব্যবস্থাপনা (Middle Management) :** বিভাগীয় প্রধানগণ ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (Superintendent) মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপনার পর্যায়ে পড়েন। ইহারা অন্য কথায় অবস্তন কর্মাধ্যক্ষ (Junior Executives)। ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার নির্দেশ ও আদেশ মত উঁহাদের অধীনস্থ বিভাগ বা বিষয়গুলির কার্য পরিচালনা করা ইহাদের বিশেষ কাজ। ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার নির্দেশমত উঁহাদের অধীনস্থ কর্মচারিগণ কার্য নির্বাহ করিতেছেন কিনা উহা তদারক করা ইহাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার নিকট প্রয়োজনীয় জবাব-দিহিও ইহাদের করিতে হয়। ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার নির্দেশ মত সমপর্যায়ের বিভাগীয় প্রধানদের মধ্যে যাহাতে কর্মসমন্বয় সৃষ্টি হয় এজন্যও ইহাদের দায়-দায়িত্ব পালন করিতে হয়। কারণ এই কর্মসমন্বয়ের ভিত্তিতেই কারবারের সাফল্য বা অসাফল্য নির্ভর করে। কর্মসমন্বয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইলে কারবারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং কারবারের সাফল্য সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া চলে। কারবারের বিভিন্ন সমস্যাও ইহারা উপস্থাপন করিয়া থাকেন এবং ইহাদের ও ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের পন্থা উদ্ভাবন হয় এবং মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপনার দ্বারা সমস্যা সমাধানের কার্যকরী পন্থা গৃহীত হয় এবং ইহাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের সহযোগিতায় উহার সুষ্ঠু মীমাংসা হয়।

৩। **নিম্নতর ব্যবস্থাপনা (Lower Management) :** ফোরম্যান (Fore-man), সুপারভাইজার (Supervisor), অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (Office Superin-tendent) প্রভৃতি নিম্নতর ব্যবস্থাপনার পর্যায়ে পড়ে। কারখানার কর্মীদের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ইহাদের মাধ্যমেই স্থাপিত হইয়া থাকে। কর্মীদের কার্য তদারকি, প্রয়োজনীয় আদেশ, নির্দেশ, পরামর্শ এবং কাজ করিবার উপায় ও পন্থা ইহারাই স্থির করিয়া থাকেন এবং তদনুযায়ী সুষ্ঠু কার্য নির্বাহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। কর্মীদের অভাব-অভিযোগ, কাজের সুবিধা ও অসুবিধা ইত্যাদি ইহাদের নিকটই প্রথম পেশ হয় এবং ইহাদের দ্বারা মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপনার গোচরীভূত হয়। মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপনা আবার উহা ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার নিকট পেশ করেন। ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা উহা সমাধানে অসমর্থ হইলে পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের কর্মধারা উপরি-

উক্ত উপায়ে প্রবাহিত হইয়া থাকে। নিম্নে এই সাংগঠনিক কাঠামোর রূপ চিত্রাকারে দেওয়া হইল :
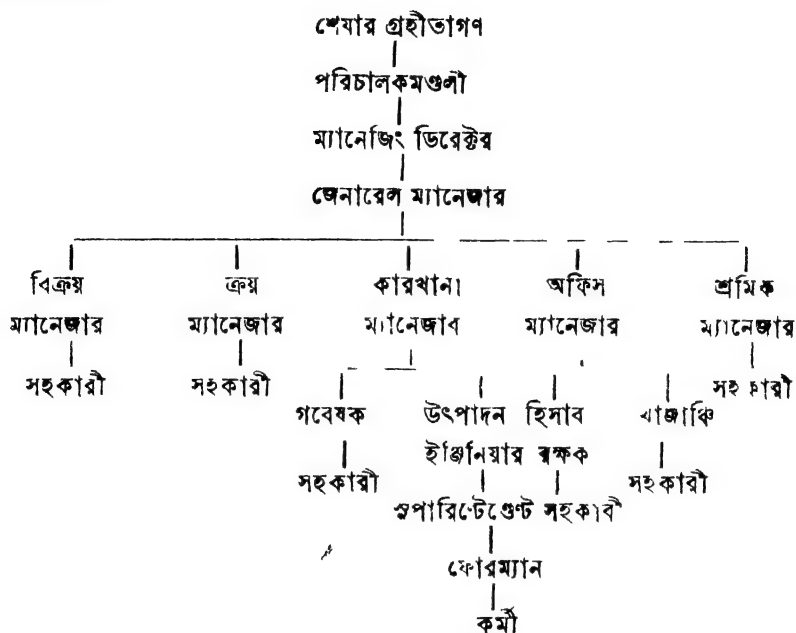
প্রশ্নাবলী (Questions)

1. What factors shou'd be taken into consideration in selecting the site for a factory? [C. U. B. Com. (Pass) 1965]

কোন কারখানার স্থান নির্বাচনে কি কি বিষয় বিবেচনা করা উচিত?

2. Discuss the factors that should be taken into consideration in selecting the site for a factory.

[C. U. B. Com. (Pass) 1966]

কোন কারখানার স্থান নির্বাচনে যে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত তাহা আলোচনা কর।

3. In selecting the site for the location of a 'Steel Plant', what factors are to be taken into consideration?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1968]

একটি ইস্পাত কারখানার স্থান নির্বাচনের জন্য কি কি বিষয় বিবেচনা করা উচিত?

4. In selecting the site for a cotton mill, what factors should you take into consideration? Also state the formalities to be

observed now-a-days before a public limited company floated for the purpose is in a position to commence production.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1963]

একটি কার্পাস বস্ত্রের কারখানা স্থাপনের স্থান নির্বাচনের জন্য কি কি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে? বর্তমানে এতদ্ উদ্দেশ্যে স্থাপিত একটি সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর কাজ আরম্ভ পর্যন্ত কি কি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার পালন করিতে হইবে উল্লেখ কর।

5. The General Manager of a leading scheduled bank has asked you to select a new site for further expansion of its operation. What factors would you take into consideration while making your suggestion ? [C. U. B. Com. (Hons.) 1966]

একটি তফসিলভুক্ত বিশিষ্ট ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার তোমাকে উক্ত ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণের জন্য নূতন স্থান নির্বাচনের কথা বলিয়াছেন। তোমার প্রস্তাব পেশ করিতে কি কি বিষয়গুলি বিবেচনা করিবে?

6. Majority of the units of engineering industries of India are located in Calcutta. What are the reasons ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1969]

ভারতের অধিকাংশ বাস্তশিল্প কারখানা কলিকাতায় অবস্থিত। উহার কি কারণ?

7. What is meant by layout of a factory ? What special factors should be taken into account in designing the layout of a proposed factory ? [C. U. B. Com. (Old) 1964]

কারখানার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস কাহাকে বলে? একটি প্রস্তাবিত কারখানার আভ্যন্তরীণ বিন্যাসের নকশা প্রস্তুত করিতে কি কি বিশেষ বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে?

8. What are the usual tests applied to check up the efficiency of an organisation ? [C. U. B. Com. (Pass) 1966]

কি কি পরীক্ষার দ্বারা সাধারণতঃ কোনও সংগঠনের দক্ষতা বিচার করা হয়?

9. Discuss the principles of allocating 'Factory Expenses' and 'Office Expenses' for determination of cost.

[C. U. B. Com. 1961]

ব্যয় নির্ধারণের জন্য 'কারখানার ব্যয়' ও 'অফিসের ব্যয়' বণ্টনে যে নীতিসমূহ গৃহীত হয় উহার আলোচনা কর।

10. In how many ways wages can be paid to workers ? State their respective advantages. [C. U. B. Com. (Pass) 1965]

কি কি বিভিন্ন উপায়ে শ্রমিকদিগকে মজুরী দেওয়া যাইতে পারে ? উহাদের প্রত্যেকটির সুবিধা উল্লেখ কর।

11. What are the usual methods of wage payments ? Discuss their respective advantages. [C. U. B. Com. (Pass) 1964]

সাধারণ মজুরী প্রদানের পদ্ধতি কি কি ? উহাদের প্রত্যেকের সুবিধা আলোচনা কর।

12. What are the principal methods of wage payment prevalent in India ? Discuss their respective advantages.

[C. U. B. Com. (Pass) 1968]

ভারতে মজুরী প্রদানের কি কি বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত ? উহাদের প্রত্যেকের সুবিধা আলোচনা কর।

13. How is Profit Sharing distinguished from Co-partnership ? Discuss the advantages and disadvantages of Profit Sharing.

[C. U. B. Com. 1952]

মুনাফা শরিকানা এবং সহ-অংশীদারীর মধ্যে পার্থক্য কি ? মুনাফা শরিকানার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

14. Do you think it is desirable to have a Personnel Department in a big organisation ? If so, what should be its functions ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

কোনও বৃহৎ সংগঠনের কি কর্মী বিভাগ থাকা বাঞ্ছনীয় মনে কর ? যদি মনে কর, তবে উহার কি কাজ হওয়া উচিত ?

15. Why it is desirable to have a separate department for dealing with personnel matter in a big organisation ? Discuss fully.

[C. U. B. Com. (Pass) 1966]

বৃহৎ সংগঠনের কর্মী বিভাগ থাকা বাঞ্ছনীয় কেন ? বিশদভাবে আলোচনা কর।

16. Why are the industrial establishments now-a-days appointing Personnel Managers ? What are their functions ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1967]

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে কর্মী ব্যবস্থাপক নিয়োগ করিয়া থাকে কেন ? উহাদের কি কাজ ?

17. Explain the need and features of departmentalisation in a factory. [C. U. B. Com. (Pass) 1971]

কোন কারখানায় বিভাগীয়করণের প্রয়োজনীয়তা ও বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

18. Discuss the important functions of different levels of internal management of a manufacturing business. Illustrate your answer by a suitable organisation chart. [C. U. B. Com. (Hons.) 1972]

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন স্তরের গুরুত্বপূর্ণ কাজ আলোচনা কর। সংগঠনের একটি নকশাসহ উত্তর প্রদান কর।

19. Distinguish between time-wages and piece-wages. Enumerate their respective advantages and disadvantages.

[C. U. B. Com. (Pass) 1972]

সময়ানুসারে মজুরী ও পরিমাণিক মজুরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। উহাদের নিজ নিজ সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ কর।

20. A majority of Jute mills are located in greater Calcutta. Discuss the reasons therefor.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1973]

ভারতের চটকলগুলির অধিকাংশই বৃহত্তর কলিকাতায় অবস্থিত। উহার কারণগুলি আলোচনা কর।

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্যবসার সংগঠন

(Organisation of Trade)

পণ্য বণ্টনের প্রধান প্রধান পদ্ধতি (The principal methods of distribution of goods)

প্রাচীনকালে সম্ভোগকারী তাঁহার ভোগ্যপণ্য সরাসরি উৎপাদকের নিকট হইতে পাইতেন। তখন জনসংখ্যা ছিল কম, বাজার ছিল সংকীর্ণ এবং পরিবহন-ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত। কিন্তু বর্তমানকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরিবহন-ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় বাজারের বিস্তৃতি ও পণ্যের বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে, অনেক জিনিসই সম্ভোগকারী সরাসরি উৎপাদকের নিকট হইতে পান না। বর্তমানে উৎপাদক ও সম্ভোগকারীর মধ্যে একদল তৃতীয় পক্ষ আসিয়া উভয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেছেন। সুতরাং বর্তমানকালে অনেক জিনিসই উৎপাদনকারীর নিকট হইতে একাধিক পর্যায়ে বিভিন্ন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বহু দূরবর্তী সম্ভোগকারীর নিকট পৌঁছায়। এইভাবে ভারতের চা ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদের শ্রান্তিহরণ করিতেছে, বোম্বাইয়ের বস্ত্রে বাংলার অভাব দূর হইতেছে কিংবা ভারতের চিনি মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের প্রয়োজনে লাগিতেছে। উৎপাদক ও সম্ভোগকারীদের মধ্যে এই যে বৈচিত্র্যময় ব্যবস্থা উহাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে :

(১) উৎপাদক কর্তৃক সম্ভোগকারীর নিকট সরাসরি বিক্রয় (Direct sale to consumers by the producer or manufacturer) : ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদিত অনেক কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য যেমন, ধান, কলাই, বস্ত্র প্রভৃতি সম্ভোগকারীর নিকট বাজারে বা উৎপাদকের নিজ গৃহ হইতে সরাসরি বিক্রয় হইয়া থাকে। জাহাজ, রেলইঞ্জিন প্রভৃতির মত বৃহদাকারে উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যও সরাসরি সম্ভোগকারীর নিকট বিক্রয় হইয়া থাকে।

(২) উৎপাদক কর্তৃক খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে সম্ভোগকারীর নিকট বিক্রয় (Sale by producer to consumers through retailers) : যাঁহারা একসঙ্গে অনেক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করেন বা একসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার পণ্য উৎপাদন করেন তাঁহাদের পক্ষে নগদ বা ধারে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করা সুবিধাজনক। খুচরা ব্যবসায়ী এক্ষেত্রে উৎপাদকের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া সম্ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করিয়া থাকেন। স্থানীয় বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্যই সাধারণত এইভাবে বিক্রীত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় উৎপাদক ও

সম্ভোগকারীর মধ্যে মাত্র একটি পর্যায়ে একদল খুচরা ব্যবসায়ী বর্তমান থাকেন। দূরবর্তী বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের পক্ষে অবশ্য এ ব্যবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক নয়।

(৩) পাইকারী ব্যবসায়ীর মাধ্যমে বিক্রয় (Sale through Wholesalers) : উৎপাদক অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করিলে ক্রেতার নিকট অধিক পরিমাণে বিক্রয় করা সুবিধাজনক মনে করেন। এরূপ অবস্থায় ১০ জন খুচরা ব্যবসায়ী যাহা না ক্রয় করিতে পারেন একজন পাইকার তাহা ক্রয় করিতে পারেন। যে সকল পণ্য দূরবর্তী একাধিক বাজারের জন্য উৎপাদিত হয় উহা উৎপাদকের নিকট হইতে পাইকারগণ ক্রয় করিয়া থাকেন। পাইকার আবার বিভিন্ন খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়া থাকেন। এইভাবে খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে সম্ভোগকারিগণ পণ্য ক্রয় করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যবস্থায় উৎপাদক ও সম্ভোগকারীর মধ্যে পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ী এই দুইটি পর্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) বিশেষ প্রতিনিধির মাধ্যমে বিক্রয় (Sale through Special Agent) : অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে পণ্য বিক্রয়ের জন্য উৎপাদক বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া থাকেন। উৎপাদক বিশেষ প্রতিনিধিকে পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকেন। বিশেষ প্রতিনিধি পাইকারদিগকে এবং পাইকার খুচরা ব্যবসায়ীদিগকে পণ্য বিক্রয় করেন। সম্ভোগকারিগণ খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট পণ্য পাইয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় উৎপাদক ও সম্ভোগকারীর মধ্যে বিশেষ প্রতিনিধি, পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ী এই তিন পর্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) নিজস্ব দোকানের মাধ্যমে বিক্রয় (Sale through Own Shops) : অনেক উৎপাদক আবার নিজস্ব দোকান খুলিয়া নিজেদের পণ্য সরাসরি সম্ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করিয়া থাকেন। বাটার জুতার দোকান ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উপরি-উক্ত পর্যায়গুলি নিম্নে চিত্রাকারে বর্ণিত হইল :

পণ্য বিক্রয়ের বিভিন্ন পর্যায়
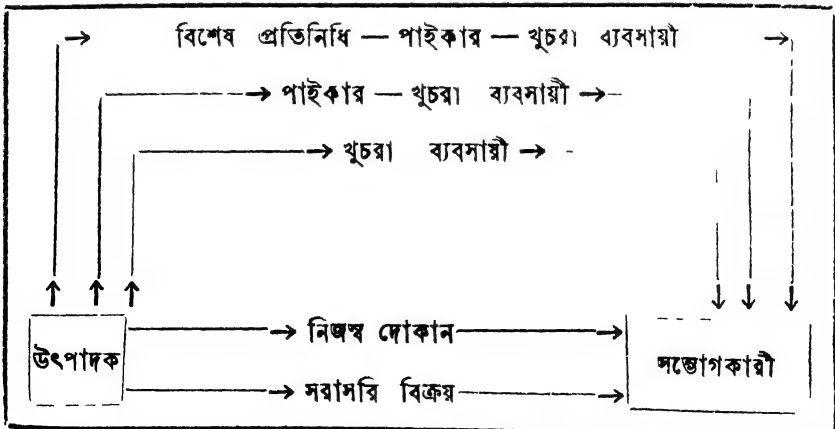
পণ্য বিক্রয়ের বণ্টন-পদ্ধতি নির্বাচনে যে বিষয়গুলি বিবেচ্য (Considerations involved in choosing a channel of distribution for marketing of goods)

পণ্য বিক্রয়ের বণ্টন-পদ্ধতি বলিতে যে উপায়ে উৎপাদকের নিকট হইতে উহা সম্ভোগকারীর নিকট পৌঁছায় উহাকে বুঝায়। ইহার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, যেমন, উৎপাদকের নিকট হইতে সম্ভোগকারীর নিকট সরাসরি বিক্রয়, পাইকার কিংবা খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে বিক্রয় ইত্যাদি। উহা যে উপায়েই হউক না কেন—এই পদ্ধতি নির্বাচনে কতকগুলি বিষয় বিবেচনাযোগ্য। নিম্নের বিবরণ হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে।

১। **পণ্যের প্রকৃতি ও উহার উপযোগিতা (Nature of the goods and their usefulness) :** প্রকৃতি অনুযায়ী পণ্য শিল্পীয় (Industrial) ও ভোগ্য ((Consumption) হইতে পারে। শিল্পীয় পণ্য (Industrial Goods) উৎপাদকদের পণ্য (Producers' Goods)। শিল্পীয় পণ্য বৃহদাকারের যন্ত্র বা ইঞ্জিন হইলে উহার সরাসরি বিক্রয়ের ব্যবস্থায়ই সুবিধাজনক, কিন্তু শিল্পীয় পণ্য কাঁচামাল বা ছোট যন্ত্রপাতি হইলে উহা প্রতিনিধির (Agent) মারফত বিক্রয় হইতে পারে। ভোগ্য পণ্য (Consumption Goods) সম্ভোগকারীদের পণ্য (Consumers' Goods)। ভোগ্য পণ্য অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রায়ই বিক্রয় হয়। এরূপ হইলে পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী বা উৎপাদকের দোকান মারফত সরাসরি বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু পণ্যটি পচনশীল হইলে উহার পক্ষে এরূপ বিভিন্ন মধ্যস্থকারবারীর মারফত দীর্ঘপথ অতিক্রম করা অসুবিধাজনক। এরূপ পণ্য উৎপাদক সরাসরি সম্ভোগকারীদের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকেন। সুতরাং পণ্যের প্রকৃতি ও উহার উপযোগিতা বিক্রয়ের মাধ্যম নির্বাচনে বিবেচনা করার প্রয়োজন হয়।

২। **বাজারের প্রকৃতি (Nature of the Market) :** পণ্যের বাজার বহুদূর বিস্তৃত ব্যাপক হইতে পারে বা স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। পণ্যের বাজার ব্যাপক হইলে বিভিন্ন মধ্যস্থ কারবারীর সাহায্য প্রয়োজন হয়। কারণ উৎপাদকের পক্ষে সরাসরি এরূপ বিস্তৃত এলাকায় পণ্য বিক্রয় করা অসুবিধাজনক। কিন্তু উহার বাজার সীমাবদ্ধ হইলে সরাসরি বিক্রয়ই শ্রেয়।

৩। **পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের আধুনিক সম্প্রসারণ (Current developments in marketing) :** সাধারণত যে পদ্ধতিতে কোন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় অনেকদিন যাবত চলিয়া আসে উহার পরিবর্তনে উৎপাদকগণ স্বভাবতই পরাঙ্মুখ। কিন্তু প্রতিযোগিতার বাজারে নানাপ্রকার ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির উন্নতি বা সম্প্রসারণ আধুনিক চিন্তাধারায় স্থান পাইলে সময়ের সহিত তাল রক্ষা করিতে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

৪। **বিক্রয়-পদ্ধতির কার্যকর উপলব্ধি (Effective realisation of**

alternative channels) : কোনও ক্রয়-বিক্রয় অনুসরণ করার সময় উহার ব্যয়ের বিষয়ও চিন্তা করিতে হয়। সুতরাং কোন বিকল্প-পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইলে উহার ব্যয় সম্পর্কে কার্যকর উপলব্ধি অবশ্যই প্রয়োজন এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য।

৫। **উৎপাদক ও ব্যবসায়ীর মধ্যে সহযোগিতা (Co-operation between producer and dealers) :** ইহাদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা থাকিলে এবং একে অন্যের সুবিধা-অসুবিধার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিলে উপযুক্ত বিক্রয়-পদ্ধতি নির্বাচনে সহায়তা হয়। এই সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত সম্পর্কে উৎপাদকের পক্ষ হইতে বিজ্ঞাপন, নমুনা বিতরণ, বিক্রয়-উদ্যোগীর প্রশিক্ষণ, বিক্রয়ে উৎসাহের জন্য পুরস্কার ব্যবস্থা প্রভৃতি এবং ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা, আর্থিক সাহায্য, বিক্রয়ের পর পণ্যের প্রয়োজনীয় সেবার যোগান প্রভৃতি অপরিহার্য বিষয়।

৬। **বণ্টন নীতি (Policies involved in distribution) :** বণ্টন নীতি সাধারণত তিনপ্রকার হইতে পারে—আতিশয্যবাচক (Intensive), নির্বাচন-বাচক (Selective) এবং এককবাচক (Exclusive)। আতিশয্যবাচক নীতিতে বিভিন্ন প্রকার বিক্রয়-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। নির্বাচনবাচক নীতিতে কোনও বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। আর এককবাচক নীতিতে কোনও অঞ্চলে একমাত্র প্রতিনিধির মারফত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। সুতরাং ব্যবসায়ের নীতি অনুযায়ীও বিক্রয়-পদ্ধতি স্থির হইয়া থাকে।

৭। **আর্থিক কাঠামোর প্রকৃতি (Nature of the Economy) :** আর্থিক কাঠামো ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র প্রভৃতি হইতে পারে। ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় সম্ভোগকারিগণ নিজেদের ইচ্ছামত ও রুচি-অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্য ব্যবহার করিতে পারেন। এই ব্যবস্থা প্রতিযোগিতামূলক। এরূপ ব্যবস্থায় বিক্রয়-পদ্ধতিতে অনেক মধ্যস্থ কারবারীর প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আর্থিক কাঠামোতে এই ব্যবস্থার বিপরীত। এখানে সম্ভোগকারীদের পণ্য ব্যবহার সম্পর্কে পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। এখানকার বিশেষ নীতি হইতেছে—যাহা পাইবে তাহাই খাইবে এবং যাহা সরবরাহ হইবে উহাই পরিধান করিবে (Eat what you get and wear what you are supplied)। এরূপ অবস্থায় বিক্রয়-পদ্ধতির আতিশয্যের প্রয়োজন হয় না। মিশ্র আর্থিক ব্যবস্থায় মধ্যপথ অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত।

৮। **সরবরাহকারীদের অবস্থা (Position of the Suppliers) :** সরবরাহকারিগণ একচেটিয়া কারবার করিতে পারেন, কিংবা উহাদের প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারের সম্মুখীন হইতে পারে। একচেটিয়া কারবারে বিক্রয়-পদ্ধতি সরল ও অনাড়ম্বর। যে কোন পদ্ধতি গৃহীত হউক না কেন উহা ফলদায়ক। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক বাজার হইলে সরবরাহকারিগণকে বিক্রয়ের উপযুক্ত বাহন নির্বাচন করিয়া লইতে হয়।

সুতরাং পণ্য বিক্রয়ের কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত উহা উপরি-উক্ত অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

বিভিন্ন প্রকারের মধ্যস্থকারবারী (Different types of business intermediaries)

বর্তমানে 'ব্যাপক পরিসরে' পণ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য উৎপাদনব্যবস্থায় নানাপ্রকার জটিলতা দেখা যায়। সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে পণ্য বিনিময়ে উৎপাদনকারী ও সম্ভোগকারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এরূপ অবস্থায় উৎপাদনকারী ও সম্ভোগকারীর মধ্যে বিভিন্ন স্তরে অনেক ব্যবসায়ীদের দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মাধ্যমে উৎপাদনকারীর নিকট হইতে সম্ভোগকারীর নিকট পণ্যদ্রব্য পৌছাইয়া থাকে। ইহাদিগকে 'মধ্যগ' বা 'মধ্যস্থকারবারী' (Middlemen or Intermediaries) আখ্যা দেওয়া হয়।

নিম্নে সংক্ষেপে বিভিন্ন প্রকারের মধ্যস্থকারবারীর পরিচয় ও কাজ উল্লেখ করা গেল:

(১) **পাইকার (Wholesale Dealers):** ইহারা উৎপাদকের নিকট হইতে একযোগে প্রচুর পণ্য ক্রয় করিয়া থাকেন। উক্ত পণ্য পরে উঁহারা বিভিন্ন খুচরা ব্যবসায়ীদিগকে বিক্রয় করিয়া থাকেন। এইভাবে ইঁহারা উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ীর মধ্যে 'মধ্যগ' হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন।

(২) **খুচরা ব্যবসায়ী (Retailers):** ইঁহারা পাইকারদের নিকট হইতে মাল খরিদ করিয়া সম্ভোগকারীদের মধ্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। এইভাবে ইঁহারা 'পাইকার' ও সম্ভোগকারীদের মধ্যে 'মধ্যগ' হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন।

(৩) **ফড়িয়া (Factor):** এরূপ 'মধ্যগ' উৎপাদনকারীর নিকট হইতে মাল গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং উক্ত মাল নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিয়া দস্তরীর (Commission) বিনিময়ে নিজ নামে মাল বিক্রয় করিয়া থাকেন। ক্রেতার নিকট হইতে মালের মূল্য আদায় করাও তাঁহাদের দায়িত্ব।

(৪) **দালাল (Broker):** এ জাতীয় 'মধ্যগের' নিকট মাল থাকে না। ইহার কাজ দালালীর (Brokerage) বিনিময়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার সহিত সংযোগ স্থাপন করা এবং উভয়ের মধ্যে মাল ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনে যথোচিত সাহায্য করা।

(৫) **নীলামদার (Auctioneer):** ইনি মূল বিক্রেতার পক্ষ হইয়া তাঁহার নির্দেশমত বাজারে নীলাম ডাকিয়া সর্বোচ্চদরে মাল বিক্রয় করেন। এরূপ 'মধ্যগ' পারিশ্রমিক হিসাবে 'দস্তরী' (Commission) পাইয়া থাকেন।

(৬) **ক্রয় তদারক প্রতিনিধি (Commission Agent):** এ জাতীয় 'মধ্যগ' বিদেশী ক্রেতার পক্ষ হইয়া মাল খরিদ করেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে উহা ক্রেতার নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। একাজে দস্তরীই তাঁহার পারিশ্রমিক।

(৭) **রপ্তানি তদারক প্রতিনিধি (Forwarding Agent)**: বিদেশে মাল পাঠাইতে হইলে নানাপ্রকার ঝুঁকি ও আইন-কানুনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। রপ্তানিকারকের পক্ষে 'মধ্যগ' হিসাবে 'রপ্তানি তদারক প্রতিনিধি' মাল রপ্তানির সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। তিনি পারিশ্রমিক হিসাবে 'দস্তুরী' পাইয়া থাকেন।

(৮) **ঝুঁকিবাহক প্রতিনিধি (Del Credere Agent)**: এ-জাতীয় 'মধ্যগ' মূল ক্রেতার পক্ষ হইয়া মাল বিক্রয় করেন এবং মালের টাকা আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন। তজ্জন্য তিনি অতিরিক্ত দস্তুরী (Del Credere Commission) পাইয়া থাকেন।

(৯) **পণ্যপ্রাপক (Consignee)**: ইহারা উৎপাদক কিংবা পাইকারদের নিকট হইতে পণ্য সংগ্রহ করেন এবং উহাদের প্রতিনিধি হিসাবে দস্তুরীর বিনিময়ে মালিকের দায়িত্বে উক্ত পণ্য বিক্রয় করেন। এইভাবে পণ্যপ্রাপকের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিদেশেও মাল বিক্রয় হইয়া থাকে।

(১০) **দায়গ্রাহক (Underwriters)**: ইহারা যৌথ কোম্পানীর শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উক্ত শেয়ার বা ডিবেঞ্চার জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় না হইলে উঁহারা নিজেরাই উহা ক্রয় করিয়া থাকেন। এই বিক্রয়ের দায়িত্বের জন্য ইহারা দস্তুরী পাইয়া থাকেন।

(১১) **একমাত্র প্রতিনিধি (Sole Agent)**: কোন প্রতিষ্ঠানের পণ্য কোনও অঞ্চলে একমাত্র ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রীত হইলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে একমাত্র প্রতিনিধি বলে। এই প্রতিনিধি দস্তুরীর বিনিময়ে পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকেন।

মধ্যস্থকারবারীদের কার্য (Services of middlemen or intermediaries)

উৎপাদনকারী ও সম্ভোগকারীর মধ্যে সংযোগ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে একদল মধ্যস্থ-কারবারীর আবির্ভাব ব্যবসা-জগতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইহারা নানাপ্রকার লোকহিতকর কার্যে ব্যাপৃত থাকেন সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইঁহাদিগকে নানাপ্রকার বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। নিম্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে উহাদের কার্যকারিতা এবং বিরূপ সমালোচনা বুঝিতে পারা যাইবে:

ব্যবসা-জগতে মধ্যস্থকারবারী নিম্নলিখিত উপকার সাধন করিয়া থাকেন:

(১) ইহারা অনেকক্ষেত্রে উৎপাদনকারীকে কাঁচামাল, শ্রমিক, মূলধন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং উৎপাদনকারী নানাবিধ দ্রব্যের জন্য ইঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া উৎপাদনকার্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন।

(২) ইহারা উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। ইহারা অধিক-পরিমাণে উক্ত দ্রব্য উৎপাদনকারীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া প্রয়োজনমত সম্ভোগ-

কারীদিগকে বিক্রয় করেন। এজন্য উৎপাদনকারী মাল বিক্রয়ের ঝুঁকি হইতে অব্যাহতি পাইয়া উৎপাদনে মনোনিবেশ করিতে পারেন। সম্ভোগকারীকেও উৎপাদকের নিকট উপস্থিত হইয়া হয়রানি হইতে হয় না।

(৩) ইহারা অতিরিক্ত উৎপাদন মজুত রাখার ব্যবস্থা করেন এবং চাহিদানুযায়ী সরবরাহ করেন। এইভাবে ইহারা পণ্যমূল্যের স্থিতি (Stability) বিধানে সহায়তা করেন।

(৪) বিভিন্ন অঞ্চলে মাল পাঠাইয়া ইঁহারা মালের কাট্‌তি ও চাহিদা বাড়ান।

(৫) ইঁহারা সম্ভোগকারীর বাড়ীতেও মাল যোগান দিয়া থাকেন।

(৬) এইভাবে ইহারা উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার জটিলতা দূর করেন।

কিন্তু ইহারা ব্যবসাক্ষেত্রে নিম্নলিখিত **অপকারগুলিও** সাধন করিয়া থাকেন :

(১) ইহারা উৎপাদনকারী ও সম্ভোগকারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনে অন্তরায়।

(২) প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা যোগান ও চাহিদার মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানে কম সহায়তা করেন। অত্যধিক লাভের আকাঙ্ক্ষাই অধিকাংশক্ষেত্রে ইহাদিগকে গ্রাস করে।

(৩) এজন্য পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক নিয়মে নির্ধারণ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ইহারা প্রায়ই পণ্যদ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া অনাবশ্যকরূপে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাইয়া থাকেন।

(৪) ইহাদের অস্তিত্বের জন্য সম্ভোগকারীদিগকে অযথা বেশী মূল্যে জিনিস ক্রয় করিতে হয়।

(৫) ব্যবসাক্ষেত্রে কালোবাজার বা চোরাকারবার ইহাদেরই সৃষ্টি।

মধ্যস্থকারবারীদের এরূপ অকল্যাণকর মুনাফা প্রবৃত্তির জন্য অনেকেই এই প্রথা তুলিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী এবং উৎপাদনকারীর নিকট হইতে সরাসরি যাহাতে কমমূল্যে জিনিস পাওয়া যায় সেরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনে আগ্রহশীল। নিম্নলিখিত ব্যবস্থায় পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হইলে মধ্যস্থকারবারীর প্রয়োজন হয় না :

(ক) বাটার মত এক নিয়ন্ত্রিত সমপণ্য বিপণি (Multiple Shop System)।

(খ) ডাকযোগে মাল প্রেরণ (Mail Order Business)।

(গ) সম্ভোগকারীদের সমবায় বিপণি (Consumers' Co-operative Store)।

(ঘ) কার্টেল (Cartel)।

(ঙ) পূর্বাপর জোট (Vertical Combination)।

পণ্যবণ্টনে পাইকারদের ভূমিকা (Services of wholesalers in the distribution of commodities)

পাইকারী ব্যবসায়ের ভূমিকা (কাজ ও প্রয়োজনীয়তা) নিম্নলিখিত উপায়ে বর্ণনা করা চলে :

(১) বর্তমানে শিল্পজাত পণ্য 'ব্যাপক পরিসরে' (Large Scale) উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পণ্যদ্রব্য ক্রেতাসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা উৎপাদকের পক্ষে জটিল সমস্যা। পাইকারগণ উৎপাদকের নিকট হইতে একযোগে অনেক পরিমাণ মাল ক্রয় করিয়া খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করিয়া এই জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া থাকেন। খুচরা ব্যবসায়ী পাইকারের নিকট হইতে মাল খরিদ করিয়া ক্রেতাসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিয়া থাকেন।

(২) যে স্থানে কাঁচামাল, শ্রমিক, যানবাহন ও মূলধন সহজলভ্য এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল সেইস্থানেই অধিকাংশ কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে উৎপাদক ও ক্রেতাসাধারণের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। বোম্বাই বস্ত্র উৎপাদনের পক্ষে আদর্শস্থল, কিন্তু বোম্বাইকে বাংলার উপর বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য নির্ভর করিতে হয়। এই দূরত্বের জন্য বাংলার কি ধরনের বস্ত্র প্রয়োজন তাহা বোম্বাইয়ের উৎপাদকের পক্ষে জানা কষ্টকর। পাইকারগণ খুচরা ব্যবসায়ীদের মারফত এই প্রয়োজন অনায়াসে জানিতে পারেন এবং পাইকারদের মারফত উৎপাদকও সঠিক প্রয়োজন জানার সুযোগ পান। এইভাবে পাইকারগণের সাহায্যে উৎপাদক ক্রেতা-সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী মালসরবরাহ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

(৩) পাইকারগণ উৎপাদকের নিকট হইতে একযোগে অনেক পরিমাণ মাল ক্রয় করিয়া থাকেন। এইভাবে উঁহারা উৎপাদককে ক্রেতা সংগ্রহের জন্য বিব্রত না রাখিয়া পণ্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করার সুযোগ দিয়া থাকেন।

(৪) বাজার মন্দার সময় মাল ধরিয়া রাখিয়া এবং বাজারের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাল ছাড়িয়া মালের মূল্য চাহিদা ও যোগানের নিয়ম অনুযায়ী যে উঠানামা করে তাহা ইঁহারা হ্রাস করিয়া থাকেন।

(৫) খুচরা ব্যবসায়িগণ অধিক পরিমাণে মাল মজুত রাখিতে পারেন না। সুতরাং পাইকারগণ মাল মজুত রাখিয়া প্রয়োজনমত খুচরা ব্যবসায়ীদিগকে সরবরাহ করিয়া তাঁহাদের ব্যবসায়ের সুযোগ দিয়া উপকার সাধন করিয়া থাকেন।

(৬) অনেক উৎপন্ন দ্রব্যকে, যেমন চা, ক্রেতাসাধারণের বিভিন্ন রুচিমত ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে বিভিন্ন স্থান হইতে মাল সংগ্রহ করিয়া সংমিশ্রণ ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। পাইকারগণই বিভিন্ন উৎপাদকের নিকট হইতে মাল সংগ্রহ করিয়া এই কাজ করিয়া থাকেন। সুতরাং সম্ভোগকারিগণ পাইকারগণের সহায়তায় মনোমত জিনিস পাইয়া থাকেন।

(৭) পাইকারগণ অনেক পরিমাণে মাল খরিদ করেন বলিয়া উঁহারা উৎপাদকের সহিত মূল্য সম্বন্ধে একটা বুঝাপড়া করিতে পারেন এবং সাধারণত অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে মাল খরিদ করিতে পারেন। এই কম মূল্যের সুবিধা ক্রেতাসাধারণ খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ভোগ করিতে পারেন।

এ ক্ষেত্রে পাইকারদের এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের সাধু ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি থাকা

প্রয়োজন। তাঁহারা অত্যধিক লাভ করিবেন না এবং প্রয়োজনের সময় অযথা মাল লুকাইয়া রাখিয়া বেশী মূল্য আদায় করার চেষ্টা করিবেন না—এরূপ মনোভাব প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অনেক ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ী থাকায় ক্রেতসাধারণকে তাঁহাদের ন্যায্য বা অন্যায্য মুনাফা দিয়া অধিক মূল্যে মাল ক্রয় করিতে হয়। ক্রেতাসাধারণ উৎপাদকের নিকট হইতে মাল খরিদ করিলে এই অসুবিধায় না পড়ার সম্ভাবনা। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতাসাধারণের অনেকে একত্রিত হইয়া উৎপাদকের নিকট হইতে মাল খরিদ করিতেছে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে 'সমবায় প্রথা' বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে। এ ব্যবস্থা সর্বত্র চালু হইলে পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন নাও হইতে পারে। বাটা কোম্পানীর মত উৎপাদক তাঁহার নিজস্ব খুচরা দোকানের মাধ্যমেও সম্ভোগ-কারীদের নিকট পণ্য বিক্রয় করিতে পারেন। ইহাতে সম্ভোগকারিগণ কিছুটা কম মূল্যে জিনিস পাইতে পারেন। উৎপাদকও পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের কিছুটা মুনাফা নিজেই গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু উৎপাদনের জটিল ব্যবস্থার কথা এবং উৎপাদক ও সম্ভোগকারীদের মধ্যে দূরত্বের কথা চিন্তা করিলে এই ব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী হইবে বিবেচনার বিষয়। সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইলেও সর্বক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হইবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যদি উহা সম্ভব হইত তবে পাইকারদের ব্যবসা বলিয়া কিছু থাকিত না। পক্ষান্তরে এই ব্যবসা ব্যাপকতা লাভ করিতেছে। এজন্য ক্ষেত্রবিশেষে এরূপ ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পাইকারী ব্যবসা সংগঠন (Organisation of Wholesale Trade)

উৎপাদকের নিকট হইতে একযোগে অনেক পরিমাণ মাল ক্রয় করিয়া খুচরা ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনমত বিক্রয় করাকে **পাইকারী ব্যবসা** বলে।

পাইকারী ব্যবসা **সংগঠন** (Organisation) ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) পাইকারী ব্যবসায়ে বেশী পরিমাণ মাল একযোগে কিনিতে হয়।

(২) এই মাল মজুত রাখার জন্য বড 'গুদাম ঘর' প্রয়োজন।

(৩) অনেক মাল একযোগে ক্রয় করিতে হইলে যথেষ্ট মূলধনের প্রয়োজন।

(৪) উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন ব্যবসায়ীর হাতে না থাকিলে ঐ মাল বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার করা চলে।

(৫) পাইকারী ব্যবসায়ীকে অনেকক্ষেত্রে মাল খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হয়। এজন্য উহাদের মোটর, লরি ইত্যাদি পরিবহন-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

(৬) দূরাঞ্চলে রেলে, স্টীমারে বা জাহাজে মাল পাঠাইতে হইলে ভাড়া সম্বন্ধে রেল, স্টীমার বা জাহাজ কোম্পানীর সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়।

(৭) যোগান ও চাহিদার তারতম্য অনুসারে সাধারণত জিনিসপত্রের মূল্য উঠানামা করে। সুতরাং পাইকারী ব্যবসায়ীকে মাল মজুত রাখিতে হয় বলিয়া এই ঝুঁকি বহন

করিতে হয়। এজন্য অযথা প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল মজুত না থাকে সে বিষয়ে পাইকারী ব্যবসায়ীদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

(৮) খুচরা ব্যবসায়ীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য, মালের গুণাগুণ বোঝানোর জন্য, নূতন নূতন খুচরা ব্যবসায়ীর সন্ধান করার জন্য এবং মালের উত্তরোত্তর বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য একদল অভিজ্ঞ ও দক্ষ **বিক্রয়-উদ্যোগী** (Salesman) প্রয়োজন।

(৯) মাল গুদামে মজুত করা এবং প্রয়োজনমত তথা হইতে মাল ছাড় করার জন্যও অভিজ্ঞ কর্মচারী ও অন্যান্য লোক প্রয়োজন।

(১০) চিঠিপত্র আদান-প্রদান, ব্যবসায়ের গতিপ্রকৃতি, কারবারের বিভিন্ন সংবাদ আদান-প্রদান প্রভৃতির জন্য একটি 'অফিস' (Office) থাকাও প্রয়োজন। যেখান হইতে বিভিন্ন খুচরা ব্যবসায়ীর সহিত সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব এরূপ একটি কেন্দ্রস্থলে উক্ত অফিস অবস্থিত হওয়া উচিত।

(১১) একাধিক পণ্যের পাইকারী ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলে উহা বিভিন্ন বিভাগে সাধারণত বিভক্ত থাকা উচিত। এক এক পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়-পরিচালনার জন্য এক একজন ম্যানেজার থাকিতে পারে।

(১২) পাইকারী ব্যবসা সাধারণত তিনটি বিভাগে বিভক্ত থাকে—(ক) নির্বাহী বিভাগ (Executive Department), (খ) নগদান বিভাগ (Cash Department) এবং (গ) প্রশাসনিক বিভাগ (Administrative Department)। উপরি-উক্ত তিনটি বিভাগ একজন জেনারেল ম্যানেজারের (General Manager) অধীনে থাকে। নির্বাহী বিভাগ ক্রয়, বিক্রয়, প্যাকিং, মালপ্রেরণ, মজুতকরণ প্রভৃতির কাজে নিযুক্ত থাকে। নগদান বিভাগ টাকা-পয়সা লেন-দেনের কাজে নিযুক্ত থাকে এবং প্রশাসনিক বিভাগ সাধারণ পর্যবেক্ষণ, হিসাব, চিঠিপত্র আদান-প্রদান প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত থাকে। ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ও পরিধি অনুযায়ী কাজের প্রসারতা ঘটিয়া থাকে এবং প্রয়োজন মত উপরি-উক্ত ব্যবস্থার রদ-বদল হইয়া থাকে।

খুচরা ব্যবসার সংগঠন (Organisation of a Retail Trade)

পাইকারদের নিকট হইতে মাল খরিদ করিয়া সম্ভোগকারী বা ক্রেতাসাধারণের নিকট বিক্রয় করাকে **খুচরা ব্যবসা** (Retail Trade) বলে।

খুচরা ব্যবসা বড়-ছোট নানাপ্রকারের হইতে পারে। ছোট মুদির দোকান বা বইয়ের দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া বাটার দোকানের মত উৎপাদনকারীদের 'Multiple Shops' অথবা কমলালয় ষ্টোরের মত Departmental Storeও হইতে পারে। তবে যে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যত্ন বা নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়, যেমন দর্জির দোকান বা সূক্ষ্ম কারুকার্যের ব্যবসা, সেক্ষেত্রে ব্যবসা বা দোকান ছোট হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

খুচরা ব্যবসা সংগঠনে (Organisation) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) খুচরা ব্যবসায়ের সাফল্য কারবারের জনপ্রিয়তা ও মালের কাট তির উপর নির্ভর করে। সুতরাং খুচরা ব্যবসায়ীর সর্বাগ্রে এদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

(২) ব্যবসা জনপ্রিয় ও মালের কাট্‌তি বেশী করিতে হইলে দোকানটি উপযুক্ত স্থানে, যেখানে লোকচলাচল বেশী, রাস্তার ধারে বা চৌ-রাস্তার মোড়ে হওয়া উচিত।

(৩) বিশেষ বিশেষ ব্যবসা বিশেষ বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যায়, যেমন, বইয়ের দোকান কলেজ স্ট্রীটে, ঘড়ির দোকান রাধাবাজারে, কাপড় ও মসলার দোকান বড়বাজারে, আবার মাটির পুতুল কৃষ্ণনগরে, তাঁতের কাপড় শান্তিপুর, ধনেখালি, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সুতরাং জনপ্রিয়তা ও মালের কাট্‌তি বেশী হইতে হইলে স্থান ও পণ্য নির্বাচন উভয়ই প্রয়োজন।

(৪) দোকানের পারিপাট্য, বিক্রয়কুশলতা, বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রভৃতিও ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করার জন্য প্রয়োজন। দোকান ভালভাবে সাজানো-গোছানো থাকিলে, দোকানের বাহিরে 'সো কেস' (Show Case)-এ সুন্দর সুন্দর জিনিস সাজাইয়া রাখিলে ক্রেতাকে সহজে আকৃষ্ট করা চলে। কর্মচারীদের বিক্রয়কুশলতা থাকিলে এবং তাঁহাদের মধুর ও মিষ্টি ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলে ক্রেতাসাধারণ বেশী সংখ্যায় আকৃষ্ট হন এবং অনেক ক্রেতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা কোন-না-কোন জিনিস ক্রয় করিতে বাধ্য-বাধকতার মধ্যে পড়িয়া যান। বিজ্ঞাপন ও প্রচারের সাহায্যে ক্রেতাসাধারণের কোনও দোকান সম্বন্ধে পরিচয় হয় এবং তাহার প্রয়োজনীয় জিনিস বিজ্ঞাপিত হইলে অচেনা দোকানও ক্রেতা খোঁজ করিয়া বাহির করিয়া লন। সুতরাং ব্যবসা সংগঠনে খুচরা ব্যবসায়ীকে এদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে। বর্তমানের প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এ সমস্ত দিকে দৃষ্টি দেওয়া ভিন্ন ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা অতীব কঠিন।

(৫) দ্রব্য বিক্রয়ের দিকে যেমন উপরি-উক্ত বিষয়গুলি প্রণিধানযোগ্য, দ্রব্য ক্রয় সম্পর্কেও খুচরা ব্যবসায়ীর নানাদিক দিয়া সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তন্মধ্যে *দ্রব্যের মূল্য ও উহার গুণাগুণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া* অপরিহার্য। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে জিনিসের চাহিদা বেশী অথচ মূল্য কম উহাই ক্রয় করা উচিত। যে জিনিস বিক্রয়ের অসুবিধা সে জিনিস কিনিতে নাই (Goods bought well are half sold)। এজন্য খুচরা ব্যবসায়ে ক্রয়ের কুশলতার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৬) ধারে অপেক্ষা নগদ মূল্যে জিনিস ক্রয় করা উচিত। কারণ নগদ মূল্যে জিনিস কিনিলে পাইকারদের নিকট হইতে বাটা পাওয়া যায়।

(৭) চাহিদা ও রুচির পরিবর্তন আবিষ্কার প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি রাখিয়া মাল ক্রয় করা উচিত। যে জিনিসের রুচি ও চাহিদা পরিবর্তনের বা নূতন আবিষ্কারের ফলে বিক্রয় ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিতে পারে সে সমস্ত জিনিস ক্রয় করা উচিত নয়। বাজারের গতি অনুযায়ীই খুচরা ব্যবসায়ীকে জিনিস ক্রয় করিতে হইবে।

(৮) ক্রেতার সহিত দাম কষাকষি করিয়া অযথা হয়রানি না হওয়া উচিত। সুতরাং জিনিসের দাম জিনিসের উপরই লিখিয়া রাখা উচিত এবং এক দামে জিনিস বিক্রয় করা উচিত। জিনিসের মূল্য জিনিসের উপর লেখা থাকিলে মূল্য দেখিয়া ক্রেতা অনায়াসে জিনিস পছন্দ করিতে পারেন। জিনিসের প্রকৃত মূল্য ক্রেতাকে না জানানোর ইচ্ছা থাকিলে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা চলে।

(৯) অল্প লাভ ও বেশী বিক্রয় এই নীতিতেই খুচরা ব্যবসায়ীর জিনিস বিক্রয় করা উচিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল খরিদ করিয়া মজুত রাখা খুচরা ব্যবসায়ীর পক্ষে উচিত নহে।

খুচরা ব্যবসায়ীর কাজ ও গুরুত্ব (Functions and Importance of Retailers)

খুচরা ব্যবসায়ীর কাজ ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নলিখিত উপায়ে বর্ণনা করা চলে :

(১) ক্রেতা বা সম্ভোগকারীদের সহিত যথার্থ যোগাযোগ খুচরা ব্যবসায়ী স্থাপন করিয়া থাকেন।

(২) ক্রেতাদের রুচি, অভিরুচি, রীতিনীতি ইত্যাদির পরিচয় খুচরা ব্যবসায়ীরাই সংগ্রহ করিতে পারেন বা জানিতে পারেন। পাইকারগণ খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে এই সংবাদ লইয়া উৎপাদকদের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন। খুচরা ব্যবসায়ী না থাকিলে উৎপাদককে নিজেই ক্রেতাসাধারণের চাহিদার স্বরূপ জানিতে হইত। বর্তমান জটিল সমাজব্যবস্থায় উহা কখনও সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হইত না।

(৩) দোকানে বিভিন্ন রকম জিনিস সাজাইয়া রাখিয়া খুচরা ব্যবসায়ী ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জিনিসের বিক্রয় বাড়ান। জিনিসের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া অনেক নূতন নূতন জিনিসের চাহিদা ঘটান। এইভাবে উত্তরোত্তর নূতন নূতন জিনিসের উৎপাদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং নূতন আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত হয়।

(৪) ক্রেতাসাধারণের পক্ষেও দোকানে আসিয়া পছন্দমত জিনিস ক্রয় করা সম্ভব হয়। ক্রেতা তাঁহার প্রয়োজনমত স্বল্প পরিমাণে জিনিস ক্রয় করিয়া থাকেন। উহা খুচরা ব্যবসায়ী ভিন্ন পাইকারদের নিকট হইতে পাওয়া সম্ভব নয়।

(৫) খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে টাটকা ও নূতন জিনিস ক্রেতাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হইতেছে। কারণ খুচরা ব্যবসায়ীরা কখনও বেশী পরিমাণ মাল মজুত রাখেন না। উহার চাহিদা অনুযায়ী পাইকার বা উৎপাদকের নিকট হইতে জিনিস ক্রয় করিয়া থাকেন এবং ক্রেতাদের যোগান দিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহাদের দোকানের জিনিস পুরাতন বা অকেজো হওয়ার সুযোগ পায় না।

(৬) ক্রেতাসাধারণ খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ধারে জিনিস ক্রয় করিবার সুযোগ পান এবং বেশী দামের জিনিস 'কিস্তিবন্দীতে' (instalment) ক্রয় করিতে পারেন।

উপরি-উক্ত বিশেষ সুবিধাই ক্রেতাগণ খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পাইয়া থাকেন। সুতরাং ব্যবসাক্ষেত্রে ক্রেতাসাধারণের অভাব মিটাইতে খুচরা ব্যবসায়ীর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বহু বিপণি (Multiple Shops)

অনেক স্থলে উৎপাদনকারী উঁহার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে অনেক খুচরা দোকান খুলিয়া থাকেন। পাইকার বা মধ্যস্থ-কারবারীকে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় না করিয়া উৎপাদনকারী নিজেই বিভিন্ন অঞ্চলে উঁহার পণ্য বিক্রয়ের জন্য যে দোকানগুলি খুলিয়া থাকেন তাহাকে এক-নিয়ন্ত্রিত সমপণ্য বিপণি বা বহু বিপণি বা বহুশাখা বিপণি (Multiple Shops) বলে। Multiple Shops বলিতে 'বহু বিপণি' বুঝায়। একই নিয়ন্ত্রণাধীনে এরূপ দোকানের সংখ্যা সত্যই বহু। তাহা ছাড়া একই প্রকার পণ্যের এরূপ বহু দোকানের নিয়ন্ত্রণ এক। এজন্য ইহার এরূপ নাম। বাটার জুতার দোকান, সাধনা ঔষধালয় প্রভৃতি এ জাতীয় কারবারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এ-জাতীয় বিপণির **সংগঠন** ও **বৈশিষ্ট্য** নিম্নলিখিত উপায়ে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

বর্তমানে এরূপ বিপণি সাধারণত যৌথ কারবারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এরূপ যৌথ কারবারের পরিচালনভার অংশীদারগণ কর্তৃক নির্বাচিত "বোর্ড অব ডিরেক্টরস্"-এর উপর ন্যস্ত থাকে। এই বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা হইল 'ম্যানেজিং ডিরেক্টর'। বোর্ডের সভ্যগণ মাঝে মাঝে মিলিত হন এবং এরূপ সভায় প্রস্তাব পাস করিয়া কারবারের নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ নীতি কার্যকরী করার ভার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের উপর থাকে। কারবারের আয়তন অনুযায়ী ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অধীনে 'জেনারেল ম্যানেজার', 'সেক্রেটারী' এবং প্রয়োজনমত অন্যান্য কর্মচারী থাকেন। উৎপন্ন দ্রব্যের বিভাগ অনুযায়ী বিভাগীয় ম্যানেজারও নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এ-জাতীয় কারবারের উৎপন্নদ্রব্য হেড অফিসের গুদামে প্রথমত মজুত করা হয়। সেখান হইতে পণ্যদ্রব্য বিভিন্ন বিপণিতে পাঠানো হয়। উক্ত পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়মূল্যও হেড অফিস স্থির করিয়া দিয়া থাকে। প্রত্যেক বিপণিতে একজন ম্যানেজার থাকেন এবং জিনিস বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনমত অন্যান্য কর্মচারী থাকেন। প্রত্যেক দোকানের ম্যানেজারের কাজ দোকানের জিনিস বিক্রয় পরিচালনা করা এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে মোট বিক্রয়, নানাবিধ ব্যয় ও মজুত মালের হিসাব হেড অফিসে পেশ করা। দোকানের ম্যানেজারের পক্ষে মূল কারবার পরিচালনায় কোন হাত নাই। তাঁহার প্রধান কাজ দোকানের উন্নতির দিকে সচেষ্ট থাকা এবং জনসাধারণের চাহিদার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া হেড অফিসে প্রয়োজনবোধে উহা পেশ করা। বিভিন্ন দোকান কিভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহা দেখার জন্য অনেক সময় ইনস্পেক্টরও নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইনস্পেক্টর তাঁহার দোকান পরিদর্শনের বিবরণ

হেড অফিসে পেশ করিয়া থাকেন। কোন্ তারিখের কোন্ সময়ে তিনি দোকান পরিদর্শন করিবেন তাহার কোন স্থিরতা থাকে না। এজন্য দোকানের ম্যানেজারকে তাঁহার দোকানের সাজসজ্জা, মজুত মাল, টাকাকড়ি, হিসাবপত্র ইত্যাদি সব ঠিক আছে কিনা সেজন্য সজাগ থাকিতে হয়। নগদ বিক্রয়ই এরূপ দোকানের বৈশিষ্ট্য। দৈনিক বিক্রয়ের টাকা নিকটবর্তী ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয় এবং হিসাবপত্র, দৈনিক বিক্রয়ের বিবরণ এবং যে জিনিস প্রয়োজন তাহার বিবরণ হেড অফিসে পাঠাইতে হয়। হেড অফিস প্রয়োজনমত সব জিনিসই প্রত্যেক দোকানে পাঠাইয়া থাকে।

বহু বিপণির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Multiple Shops)

বহু বিপণির সুবিধাগুলি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) এরূপ কারবারে মধ্যস্বকারবারী (Middleman) না থাকায় ক্রেতা-সাধারণ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে জিনিস পাইতে পারেন।

(২) মধ্যস্বকারবারী না থাকায় বিক্রেতাও অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ পাইতে পারেন।

(৩) এরূপ দোকান প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া কোনও বিশেষ ধরনের জিনিস ক্রয়ে অভ্যস্ত হইলে ক্রেতার পক্ষে সে জিনিস পাওয়া সহজসাধ্য হয়।

(৪) উৎপাদন কেন্দ্রের সহিত দোকানের সরাসরি সম্বন্ধ থাকায় এবং দোকানের সহিত ক্রেতাদের সরাসরি যোগাযোগ আছে বলিয়া উঁহারা ভাল, খাঁটি ও নূতন জিনিস পাওয়ার সুযোগ পান। কোনও জিনিসের ত্রুটি ধরা পড়িলে তাহার প্রতিবিধানও অনতিবিলম্বে সম্ভব।

(৫) দোকানের মারফত উৎপাদকের সহিত ক্রেতাদের সরাসরি যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় ক্রেতারা তাঁহাদের চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী জিনিস পাইতে সক্ষম হন এবং উৎপাদকও চাহিদা বা রুচির পরিবর্তন অনুযায়ী উৎপাদন ব্যবস্থায় অনায়াসে সত্বর পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন।

উপরি-উক্ত সুবিধার জন্য ইহাতে ক্রেতার স্বার্থ সবচেয়ে ভালভাবে রক্ষিত হয় বলিয়া বলা হয়।

(৬) একই ধরনের জিনিস প্রত্যেক দোকানে বিক্রয় হয় বলিয়া এরূপ দোকানের প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় যথাসম্ভব কম হয় এবং একটি দোকান অন্য দোকানের জিনিসের প্রচারকার্যে সহায়তা করিয়া থাকে।

(৭) নগদ মূল্যে জিনিস বিক্রয় হয় বলিয়া বাকী পাওনার জন্য এরূপ দোকানের কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

(৮) সাধারণত এরূপ দোকানের বিক্রয় খুব বেশী। এজন্য দোকান চালানোর ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম পড়ে।

(৯) এরূপ দোকানে কোন জিনিসের যোগান কম পড়িলে নিকটবর্তী অনুরূপ অন্য দোকান হইতে প্রয়োজনবোধে ঐ ঘাটতি পূরণ হইয়া থাকে। এজন্য ক্রেতাকে কখনও তাহার মনোমত জিনিস ক্রয়ে সাধারণত বিমুখ হইতে হয় না।

বহু বিপণির **অসুবিধাগুলি** নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

(১) অধিক বিক্রয়বহুল কারবার বলিয়া এরূপ দোকানে ক্রেতার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এজন্য বিক্রেতার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় সম্বন্ধ গড়িয়া উঠা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন ক্রেতার ব্যক্তিগত রুচি উপেক্ষিত হয়।

(২) এরূপ দোকানে একজাতীয় পণ্য বিক্রয় হয় বলিয়া একই দোকান হইতে নানাবিধ জিনিস ক্রয় করিবার সুবিধা ক্রেতাসাধারণ পান না।

(৩) এরূপ দোকানের জিনিসগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে একই ছাঁচে ঢালা। সেজন্য ক্রেতাদের পক্ষে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী জিনিস ক্রয় করা কখনই সম্ভব হয় না। সুতরাং বৈচিত্র্যের স্থান এখানে বেশী নাই।

(৪) এরূপ দোকানে যে পণ্য বিক্রয় হয়, কালক্রমে সেইরূপ পণ্যে এ কারবারের একচেটিয়া অধিকার জন্মিতে দেখা যায়। তখন ক্রেতাগণ স্বল্প মূল্যে আর জিনিস ক্রয় করিতে পারেন না।

(৫) এরূপ কারবারে উচ্চ বেতনভোগী কর্মচারীর সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য ক্রেতাগণ মধ্যস্থকারবারী না থাকার জন্য অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে জিনিস কখনই পান না। ইহাদের দোকানের সাজ-সজ্জা ও পরিচালন ব্যয়ও অন্যান্য দোকান অপেক্ষা বেশী।

উপরি-উক্ত অসুবিধার জন্য ক্রেতার স্বার্থ ইহাতে ভালভাবে রক্ষিত হয় কিনা বিবেচনার বিষয়।

(৬) এরূপ কারবার গড়িয়া তুলিতে প্রভূত মূলধন ও প্রচুর দক্ষতার প্রয়োজন। তাই এরূপ কারবারের সংখ্যা খুবই কম।

বিপণি-শৃঙ্খল (Chain Stores)

'বিপণি-শৃঙ্খল' একপ্রকার খুচরা ব্যবসা। ইহাতে খুচরা ব্যবসায়ী উৎপাদকের নিকট হইতে একযোগে অধিক পরিমাণে জিনিস ক্রয় করেন, ক্রীত জিনিস 'কেন্দ্রবর্তী' কোনও গুদামে বা অফিসে জমা রাখেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে খুচরা বিক্রয়ের দোকান খুলিয়া উক্ত গুদাম হইতে মালসরবরাহ করেন। এরূপ দোকানে বিভিন্ন প্রকারের জিনিস পাওয়া যায়। এরূপ ব্যবসা উৎপাদকের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, কারণ উৎপাদকের ভাগ্যে একযোগে এত অধিক পরিমাণ জিনিস ক্রয় করার মত ইহাদের অপেক্ষা ভাল ক্রেতা কমই জুটিয়া থাকে। অনেকগুলি দোকান একসঙ্গে একটি কেন্দ্রের সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে।

ইহাদের সংগঠন ও বৈশিষ্ট্য 'বহু বিপণি' (Multiple Shops)-র অনুরূপ।

বিভিন্ন উৎপাদকের নিকট হইতে মাল ক্রয় করিয়া ইহার মালিক মধ্যবর্তী কোনও স্থানে মাল মজুত রাখেন। সেখান হইতে প্রয়োজনমত বিভিন্ন দোকানে মাল সরবরাহ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক দোকান পরিচালনার জন্য একজন করিয়া ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মচারী থাকেন। উঁহারা হেড অফিসের নির্দেশমত ব্যবসা পরিচালনা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক দোকানের আয়-ব্যয়, প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র প্রভৃতি হেড অফিসে দাখিল করিতে হয়। নীতি-নির্দেশ ব্যাপারে দোকানের ম্যানেজারের কোন ক্ষমতা নাই। নীতি-নির্দেশ হেড অফিসে অবস্থিত কর্মকর্তারাই করিয়া থাকেন।

বিপণি-শৃঙ্খলের সহিত বহু বিপণির **পার্থক্য** নিম্নরূপ :

(১) 'বিপণি-শৃঙ্খলে' উৎপাদক ও বিক্রেতা বিভিন্ন। কিন্তু 'বহু বিপণিতে' উৎপাদক ও বিক্রেতা এক।

(২) মধ্যস্থ-কারবারীর মুনাফা রহিত করার জন্যই 'বহু বিপণি' গঠিত হয়। কিন্তু 'বিপণি-শৃঙ্খল' উৎপাদক ও সম্ভোগকারীর মধ্যবর্তী মধ্যস্থ-কারবারী ব্যবসা।

(৩) 'বহু বিপণি' সমজাতীয় পণ্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত। কিন্তু 'বিপণি-শৃঙ্খলে' নানা জাতীয় পণ্যের কারবার চলে।

বিপণি-শৃঙ্খলের **সুবিধা** নিম্নরূপ :

(১) একযোগে ইহার মালিক অধিক পরিমাণে জিনিস ক্রয় করেন বলিয়া উৎপাদকের নিকট হইতে কিছু কম মূল্যে জিনিস ক্রয় করিতে পারেন। কম মূল্যের এই সুবিধা ক্রেতাসাধারণও পাইয়া থাকেন।

(২) এরূপ দোকান জনবহুল অঞ্চলেই দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য দোকান ও ক্রেতার সহিত সংযোগ সহজসাধ্য হয়।

(৩) যে সমস্ত জিনিসের চাহিদা ব্যাপক এরূপ দোকান সেই সমস্ত জিনিসের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে বলিয়া এরূপ কারবার সহজেই লাভজনক হইয়া উঠে।

বিপণি-শৃঙ্খলের **অসুবিধা** নিম্নরূপ :

(১) এরূপ দোকান সাধারণত বৃহৎ আকারেই পরিচালিত হয়। এজন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্ভব হয় না।

(২) কারবার বড় হইয়া পড়িলে সুষ্ঠু পরিচালন ব্যাপারে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। এরূপ কারবারের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে হেড অফিস হইতে অনেক দোকানের দূরত্ব বাড়িতে থাকে। ফলে সুষ্ঠু পরিচালনার অভাব ঘটে এবং ব্যয়াধিক্যও দেখা দেয়।

বিভাগীয় বিপণি (Departmental Store)

'বিভাগীয় বিপণি বা বহুবিধ পণ্য-বিভাগ-সমন্বিত-বিপণি' একটি বড় রকমের খুচরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এরূপ বিপণিতে মানুষের প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং একই বিপণির মধ্যে পৃথক পৃথক জিনিসের জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ

থাকে। অনেক দেশে এরূপ দোকান এত বড আকার ধারণ করিতে দেখা যায় যে, একই দোকানে সূচ হইতে আরম্ভ করিয়া মোটর গাড়ী পর্যন্ত ক্রয় করা সম্ভব হয়। লণ্ডনের 'সেলফ্রিডস্' নামক এরূপ বিপণিতে প্রায় ৩০০টি বিভাগ আছে। জাপানের এরূপ বৃহত্তম বিপণি 'নিটস্থকোনি'র সাততলা বাড়ীতে মাছ ও তরি-তরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া বহুবিধ পণ্য পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এজাতীয় দোকান বড় একটা না থাকিলেও কমলালয় ষ্টোর্স, ওয়াচেল মোল্লা প্রভৃতি এ জাতীয় দোকান। ইহারা এইরূপ ব্যবসায়ে বিশেষ স্থনাম অর্জন করিয়াছে। কমলালয়ে প্রায় ৩০টি বিভাগ আছে।

এজাতীয় বিপণির **সংগঠন ও পরিচালনা** বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিত উপায়ে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

এরূপ বিপণি সাধারণত 'যৌথ কারবারের' ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এরূপ 'যৌথ কারবারের' পরিচালনভার শেয়ার-গ্রহীতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত 'বোর্ড অব ডিরেক্টরস'-এর উপর থাকে। 'বোর্ড অব ডিরেক্টরস্'-এর প্রধান কর্মকর্তা থাকেন 'ম্যানেজিং ডিরেক্টর'। তিনি 'জেনারেল ম্যানেজার' এবং 'সেক্রেটারী'র মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। 'জেনারেল ম্যানেজারের' অধীনে প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন করিয়া 'বিভাগীয় ম্যানেজার' নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক বিভাগীয় ম্যানেজার' তাঁহার নিজস্ব বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য দায়ী থাকেন। তাঁহার অধীন কর্মচারীদের সাহায্যে তিনি প্রয়োজনীয় জিনিস বাজার হইতে ক্রয় করেন এবং যথোপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করেন। ইহা ছাড়া মাসের শেষে তিনি তাঁহার বিভাগের মজুত মাল ও টাকা-পয়সার হিসাব 'জেনারেল ম্যানেজারকে' দিয়া থাকেন। এরূপ দোকান বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইলেও এবং উহা পরিচালনার জন্য অনেক কর্মচারী নিযুক্ত হইলেও সমগ্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে সুদৃঢ় যোগসূত্র থাকে। উপরি-উক্ত নিয়ম ভিন্ন এজাতীয় বিপণির পরিচালনা ও ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইলে ক্রয়-বিক্রয়, হিসাব প্রভৃতিকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা চলে।

এরূপ দোকান হইতে জিনিস বিক্রয় নিম্নলিখিত উপায়ে সম্পন্ন হয় :

প্রথমত, ক্রেতা তাঁহার যে জিনিস প্রয়োজন তিনি সেই বিভাগে গিয়া থাকেন এবং জিনিস পছন্দ করেন। জিনিস পছন্দ করার পর তিনি টাকা দিয়া থাকেন। যিনি টাকা গ্রহণ করেন তিনি 'মেমো' লিখিয়া 'মেমো'র একটি অংশ ক্রেতাকে দিয়া থাকেন। জিনিসগুলি 'প্যাকিং' বিভাগে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং টাকা 'ক্যাসে' জমা দেওয়া হয়। ক্রেতা 'মেমো'র অংশটুকু প্যাকিং বিভাগে উপস্থিত করেন এবং তাঁহার জিনিস ক্রয়ের 'মেমো' ও 'জিনিস' উভয়ই প্যাকিং বিভাগ হইতে পাইয়া থাকেন। 'গেটে' দরওয়ান থাকে এবং উহাকে 'মেমো' দেখাইয়া দোকান হইতে জিনিস লইয়া বাহির হইতে হয়।

এজাতীয় দোকান ডাকযোগেও ক্রেতাকে জিনিস পাঠাইয়া থাকে, এমন কি শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে, প্রয়োজন হইলে বাড়ীতেও নিজেদের দায়িত্বে মাল পাঠাইয়া দিয়া থাকে। এজন্য অবশ্য কিছু অতিরিক্ত ব্যয় ক্রেতাকে বহন করিতে হয়।

বিভাগীয় বিপণির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantanges of a Departmental Store)

বিভাগীয় বিপণির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে :—

সুবিধা ঃ

(১) ক্রেতাসাধারণ একই দোকানে তাঁহার প্রয়োজনীয় অনেক রকম জিনিস ক্রয় করিবার সুবিধা পান। এজন্য তাঁহাদের শ্রমের লাঘব হয় এবং সময়েরও অপব্যবহার কম হয়।

(২) মফঃস্বলের ক্রেতাগণ একই দোকানে 'অর্ডার' দিয়া বাড়ী বসিয়া ডাকযোগেও বিভিন্ন রকম জিনিস পাইতে পারেন।

(৩) শহরের ক্রেতাগণের ইচ্ছামত এরূপ দোকান হইতে মাল বাড়ীতেও পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং এরূপ ক্রেতাগণ বাড়ী বসিয়া মাল পাওয়ার সুযোগ পান এবং মাল বহন করার হাঙ্গামা হইতে রেহাই পান।

(৪) এরূপ দোকানে একই রকমের জিনিস বহু পরিমাণে থাকে। এজন্য ক্রেতাসাধারণ পছন্দসই জিনিস বাছিয়া লইতে পারেন।

(৫) অনেক পরিমাণ জিনিস একই সঙ্গে কিনিবার সুযোগ পায় বলিয়া এজাতীয় দোকান কম মূল্যে জিনিস ক্রয় করিতে পারে এবং এই কম মূল্যের সুবিধা ক্রেতাও পাইতে পারেন।

(৬) ব্যবসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এজাতীয় দোকানে নিযুক্ত হইবার সুযোগ পান।

(৭) নূতন লোক নিযুক্ত হইলে তিনি নানারকম ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন।

(৮) এজাতীয় দোকান সাধারণত শহরের মাঝখানে অবস্থিত থাকে। এজন্য এই দোকান ক্রেতা আকর্ষণ করার সুযোগ পায়।

(৯) ক্রেতারা কোন জিনিস কিনিতে আসিলে অন্য জিনিসগুলিও দেখিয়া যাইবার সুযোগ পান। ইহাতে পণ্যের প্রচার বৃদ্ধি পায়।

(১০) সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া অপচয় কম হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(১১) মাঝে মাঝে এই সমস্ত দোকান নূতন ও রকমারী মাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে পূর্বক্রীত মাল কম দামে ছাড়িবার বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে। তাহাতে ক্রেতারা অনেক জিনিস কম মূল্যে কিনবার সুযোগ পান।

অসুবিধা :

(১) প্রচুর মূলধন না হইলে এইরূপ দোকান গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় না। সুতরাং দুই-একজনের পক্ষে ব্যবসাজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও এরূপ দোকান আরম্ভ করা চলে না।

(২) দোকানগুলি সাধারণত শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হইয়া থাকে। ফলে শহরের প্রান্ত হইতে অনেক ক্রেতার পক্ষেই এরূপ দোকানে আসিয়া মাল ক্রয় করা সম্ভব হয় না।

(৩) প্রকৃত প্রস্তাবে এই দোকানগুলি ধনী ক্রেতাদের জন্যই সৃষ্ট। সুতরাং দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রেতারা ঐ দোকানে মাল কিনিয়া লাভবান হন না।

(৪) এ সমস্ত দোকানের প্রকৃতপক্ষে ব্যয়বাহুল্য বেশী। এজন্য ক্রেতারা কম মূল্যে জিনিস ক্রয়ের সুযোগ কমই পাইয়া থাকেন।

(৫) একটি ছোট দোকানে দোকানী একজন ক্রেতার প্রতি যতটা যত্ন লইতে পারেন, এরূপ বড় দোকানে উহা সম্ভব হয় না। এজন্য অনেক ক্রেতাই এরূপ দোকান অপেক্ষা ছোট দোকানই পছন্দ করিয়া থাকেন।

(৬) এরূপ দোকান পরিচালনার জন্য সুযোগ্য ও দক্ষ লোকের অনেক ক্ষেত্রেই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে অব্যবস্থার দরুণ ক্রেতারা ক্রমে ক্রমে এরূপ দোকানে আসা বন্ধ করেন এবং দোকানের লাভের পরিবর্তে লোকসানই দেখা যায়।

(৭) এ সমস্ত দোকানে অযথা অনেক অলাভজনক বিভাগ রাখিতে হয়। ফলে মোটের উপর লাভের অঙ্ক কম ভিন্ন বেশী হইতে দেখা যায় না।

বহু বিপণি ও বিভাগীয় বিপণির মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Multiple Shop and a Departmental Store)

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিত উপায়ে বর্ণনা করা যায় :

(১) বহু বিপণিতে একজাতীয় বিভিন্ন প্রকার পণ্য বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়, কিন্তু বিভাগীয় বিপণিতে সম্ভব রকম সবপ্রকার পণ্য বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। যেমন, বাটার দোকানে বিভিন্ন প্রকার জুতার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে, কিন্তু কমলালয়ে গেলে বিভিন্ন প্রকার জুতা ভিন্ন কাপড়, জামা, মনোহারী দ্রব্য, পুস্তক প্রভৃতি নানাপ্রকার জিনিস দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(২) বহু বিপণি শহরের প্রায় সব রাস্তাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিভাগীয় বিপণি শহরের কোনও অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে এবং ব্যবসামুখর জনবহুল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) বহু বিপণিতে নগদ বিক্রয়ের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিভাগীয় বিপণিতে নগদ বিক্রয় ভিন্ন ধারে বিক্রয়ও হইয়া থাকে।

(৪) বহু বিপণিতে ক্রেতাদের আসিয়া জিনিস ক্রয় করিয়া নিজেদেরই লইয়া যাইতে হয়। কিন্তু বিভাগীয় বিপণিতে প্রয়োজনবোধে জিনিস ক্রেতাদের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকে।

(৫) কোনও বহু বিপণি লাভজনক না হইলে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া চলে। তাহাতে ঐ জাতীয় অন্য বিপণির কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু বিভাগীয় বিপণি অনেক অলাভজনক বিভাগও রাখিতে বাধ্য হয়। লাভজনক বিভাগগুলিকে উক্ত ক্ষতির অংশ বহন করিতে হয়।

(৬) বহু বিপণিতে ধনী-দরিদ্র সকল প্রকার ক্রেতার সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিভাগীয় বিপণিতে প্রকৃত প্রস্তাবে ধনীদের সমাগমই অধিক মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

(৭) বিভিন্ন প্রকার মাল মজুত রাখার জন্য বিভাগীয় বিপণির জন্য প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। কিন্তু অল্প মজুত মাল লইয়া বহু বিপণি কারবার চালাইতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে নিকটবর্তী বিপণি হইতে মাল আনাইয়া লইতে পারে।

(৮) বহু বিপণিতে পূর্বাপর (vertical) প্রকৃতির মিলন কিন্তু বিভাগীয় বিপণিতে পার্শ্বিক (lateral) প্রকৃতির মিলন।

বিভাগীয় বিপণির জনপ্রিয়তা (Popularity of Departmental Stores)

বিভাগীয় বিপণি বৃহদাকারের খুচরা দোকান। এরূপ বিপণিতে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং এজন্য পৃথক পৃথক জিনিসের জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ সৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ বড় দোকানে সূচ হইতে আরম্ভ করিয়া মোটর গাড়ী পর্যন্ত ক্রয় করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে এ জাতীয় বৃহৎ দোকান না থাকিলেও এ প্রসঙ্গে কমলালয় ষ্টোরসের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রায় ৩০টি বিভাগ আছে। এরূপ দোকান বড় বড় শহরে জনপ্রিয়। ইহার কারণ নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। প্রথমত, এরূপ দোকান বা বিপণি স্থাপনের জন্য প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। ফলে ইহাকে লাভজনকভাবে কারবার চালাইতে হইলে প্রচুর বিক্রয় প্রয়োজন। এজন্য বহুসংখ্যক খরিদ্দার এরূপ বিপণিতে বিবিধ পণ্য ক্রয়ের জন্য আসা উচিত। বড় শহরে লোকসংখ্যা অনেক, ধনী ব্যক্তির সমাবেশও বহু। সুতরাং এরূপ স্থানে ক্রেতার অভাব হয় না। এরূপ প্রচুর মূলধন নিয়োগ করিয়া কোন ছোট শহরে বা গ্রামে দোকান খুলিলে উহা ক্রেতার অভাবে উঠিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং ব্যবসায়ীর দিক দিয়া বিচার করিলে এরূপ দোকান বড় বড় শহরেই স্থাপিত হইবে যেখানে ক্রেতাসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা এবং সংখ্যা উভয়ই বেশী। ক্রেতাদের পক্ষ হইতেও ইহা নানাদিক দিয়া সুবিধাজনক। বড় বড় শহরে ক্রেতার সংখ্যা যেমন

প্রচুর, দোকানের সংখ্যাও তেমন প্রচুর থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দোকানে ভিড লাগিয়াই থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে কোনও ক্রেতাকে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইলে অনেক দোকানে ঘোরাঘুরি করিতে হইবে। এজন্য বহু শ্রম ও সময় ব্যয় হয়। কিন্তু বিভাগীয় বিপণিতে আসিলে এক দোকান হইতে নানাপ্রকার জিনিস ক্রয় করা সম্ভব হয়। মফঃস্বলের ক্রেতাগণ একই দোকানে অর্ডার দিয়া বাড়ীতে বসিয়া ডাকযোগেও বিভিন্ন প্রকার জিনিস পাইতে পারেন। শহরের ক্রেতাগণের ইচ্ছামত দোকান হইতে মাল বাড়ী পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে ক্রেতাগণ বাড়ী বসিয়া মাল পাওয়ার সুযোগ পান এবং মাল বহন করার হাঙ্গামা হইতেও রেহাই পান। এ জাতীয় দোকান শহরের লোকসমাগমপূর্ণ অঞ্চলেই স্থাপিত হইয়া থাকে। এজন্য এরূপ দোকানের পক্ষে ক্রেতা আকর্ষণ করার সুযোগও বেশী। এবংবিধ কারণে লাভজনকভাবে কারবার চালাইতে হইলে বড় শহরের লোকসমাগমপূর্ণ অঞ্চলেই ইহা স্থাপিত হওয়া উচিত।

এরূপ দোকান সাধারণত যৌথ কোম্পানীর ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়া থাকে। ফলে ইহার পরিচালনভার পরিচালকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত থাকে। পরিচালকমণ্ডলী যে কর্মপদ্ধতি স্থির করেন উহা ম্যানেজিং ডিরেক্টর, জেনারেল ম্যানেজার, সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের মাধ্যমে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। ইহা ছাড়া ইহার প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন করিয়া বিভাগীয় ম্যানেজার থাকেন। প্রত্যেক বিভাগীয় ম্যানেজার তাঁহার বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দায়ী থাকেন। এইরূপ দোকান বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইলেও এবং উহা পরিচালনের জন্য বহু কর্মচারী নিযুক্ত হইলেও সমগ্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে উহার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সুদৃঢ় যোগসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থা থাকে। সাধারণভাবে ইহার সংগঠনের কাঠামো উপরি-উক্ত রূপ হইলেও ইহার পণ্য ক্রয় বিক্রয়-সংক্রান্ত সংগঠন ব্যাপারে কিছুটা অভিনবত্ব আছে। ইহাতে ক্রেতার প্রথমত যে জিনিস প্রয়োজন তিনি সেই বিভাগে আসিয়া থাকেন। সেই বিভাগের বিক্রয় উদ্যোগী (Salesman) তাঁহার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দিয়া থাকেন এবং যাহাতে তিনি তাঁহার প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করেন তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। জিনিস পছন্দ হইলে এবং উহা ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ক্রেতা টাকা দিয়া থাকেন। এখানে টাকা গ্রহণ করার জন্যও এক শ্রেণীর কর্মচারী থাকেন। উক্ত কর্মচারী টাকা গ্রহণ করিয়া 'মেমো' লিখিয়া থাকেন এবং মেমোর একটি অংশ ক্রেতাকে দিয়া থাকেন। উক্ত কর্মচারী টাকা 'ক্যাসে' জমা দিয়া থাকেন। জিনিস গুলি প্যাকিং বিভাগে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। ক্রেতা তাঁহার মেমোর অংশটুকু প্যাকিং বিভাগে উপস্থিত করিলে জিনিসগুলি ও জিনিস ক্রয়ের মেমো পাইয়া থাকেন। গেটে দরওয়ান থাকে। উহাকে মেমো দেখাইয়া দোকান হইতে জিনিস লইয়া বাহির হইতে হয়।

এ জাতীয় দোকানে ডাকযোগেও ক্রেতাকে জিনিস পাঠাইবার ব্যবস্থা থাকে এবং এমন কি শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে, প্রয়োজন হইলে ক্রেতার বাড়ীতেও মাল পাঠানোর

ব্যবস্থা থাকে। এভাবে অবশ্য মাল বহনের জন্য ক্রেতাকে কিছু অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হয়।

এরূপ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার জন্য বিভাগীয় বিপণি এত জনপ্রিয়তা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বিভাগীয় বিপণির বিক্রয় বিভাগের বিন্যাস (Layout for the sales department of a large departmental store)

বিভাগীয় বিপণির বিভিন্ন বিভাগের বিন্যাস (layout) বলিতে বিভিন্ন বিক্রয় বিভাগের বিন্যাসকেই বুঝিতে হইবে। কারণ কোন বিভাগীয় বিপণিতে প্রবেশ করিলে উহার পণ্যাদি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত দেখা যাইবে। এরূপ বিপণি বিন্যাসের উদ্দেশ্য হইবে পণ্যদ্রব্যাদি এরূপভাবে সাজানো থাকিবে যাহাতে উহা ক্রেতাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে এবং একটি মনোমুগ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে পারে। বিক্রয় বিভাগের বিভিন্ন কাজের মধ্যে পণ্য বিক্রয়, উহার প্যাকিং, খরিদ্দারের হস্তে পণ্য সমর্পণ, প্রচার, পণ্য মজুতকরণ এবং অনুরূপ কার্যাবলীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া উল্লেখযোগ্য। কম পরিশ্রমে অধিক বিক্রয়—এ সকল দোকান সম্বন্ধে যোগ্যতা ও দক্ষতার মাপকাঠি। এজন্য প্রয়োজন প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজ আন্তরিকতার সহিত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা এবং একের কাজের সহিত অন্যের কাজের সংঘাত দূর করা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটা নিজস্বতা থাকে। ইহা ছাড়া বিপণির আয়তন ও পরিধির উপর এই বিন্যাস অনেকাংশে নির্ভর করে। সুতরাং বিভিন্ন পণ্যের প্রকৃতি, স্থানীয় পরিবেশ এবং অন্যান্য অবস্থার উপর উহার বিন্যাস নির্ভর করিবে। তবে মোটামুটিভাবে নিম্ন-লিখিতভাবে বিন্যাস সংঘটিত হইলে বিপণির উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে :

১। ইহার প্রবেশপথে বিপণির নামাঙ্কিত সাইনবোর্ড অবশ্যই থাকিবে। প্রবেশ-পথে একজন দরওয়ান থাকিবে। খরিদ্দারদের প্রয়োজনীয় সংবাদ সে প্রবেশপথ হইতেই দিতে পারিবে। বিপণির অভ্যন্তরেও বিভিন্ন বিভাগের নামাঙ্কিত সাইনবোর্ড থাকিবে। উহা দেখিয়া খরিদ্দারগণ বিপণির অভ্যন্তরে কোথায় কোন্ পণ্য পাওয়া যাইতে পারে তাহা জানিতে পারিবেন।

২। ইহা ছাড়া বিপণির অভ্যন্তরে প্রবেশপথের নিকটেই একটি অনুসন্ধান বিভাগ থাকিবে। উক্ত বিভাগ হইতেও খরিদ্দারগণ প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

৩। অনুসন্ধান বিভাগের কর্মচারীই হউন আর দরওয়ানই হউন তিনি যেন খরিদ্দারকে প্রবেশ করিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ সাদর সম্ভাষণ দ্বারা হাসিমুখে আমন্ত্রণ জানান। ইহাতে খরিদ্দারগণ তুষ্ট হইবেন এবং ক্রয়ের মনোভাব লইয়া বিপণিতে প্রবেশ করিবেন। সুতরাং এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা বিপণি বিন্যাসের একটি অঙ্গ হওয়া উচিত।

৪। প্রবেশপথের দুই দিকে 'সো-কেসে' দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য বিভিন্ন পণ্যের নমুনা

অবশ্যই থাকা উচিত। ইহা হইতে খরিদ্দারগণ পণ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারিবেন।

৫। একই প্রকারের পণ্য অবশ্য একই বিভাগে থাকিবে। প্রত্যেক বিভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে হইতেছে কিনা তাহা তদারক করার জন্য বিভাগীয় কর্মচারী থাকিবেন। তিনি এমনভাবে অবস্থান করিবেন যাহাতে বিক্রয়-উদ্যোগিগণ খরিদ্দারদের প্রতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দিতেছেন কিনা তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন।

৬। বিভাগীয় পারিপাট্যের দিকেও লক্ষ্য দিতে হইবে। জিনিসগুলি এমনভাবে 'সো-কেসে' সজ্জিত থাকিবে যাহাতে বিক্রয় উদ্যোগীদিগকে উহা বাহির করিয়া খরিদ্দারগণকে দেখানো ব্যাপারে কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়। যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত যাহাতে পণ্যাদি দেখানো সম্ভব হয় সেরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৭। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যাতায়াতের পথ প্রয়োজনমত প্রশস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে খরিদ্দারদের গমনাগমনের ভিড় অনেকটা এড়ানো সম্ভব হইবে।

৮। বিক্রয়ের কাজ হিসাবে প্যাকিং একটা বিশেষ কাজ। প্যাকিং-এর কাজ যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং খরিদ্দারগণ যে জিনিস লইবেন উহা যেন পথিমধ্যে খুলিয়া না পড়ে এরূপভাবেই প্যাকিং করার প্রয়োজন হইবে। প্রবেশপথ ছাড়া বহির্গমনের জন্য ভিন্ন পথ থাকা উচিত। বহির্গমনের পথের নিকট প্যাকিং বিভাগ থাকিলেই ভাল হয়। খরিদ্দারগণ ইহার ফলে জিনিস লইয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া যাইতে পারেন। ইহাতে বিপণির অভ্যন্তরে ভিড়ের লাঘব হইবে।

৯। যখন কোন খরিদ্দার কোন জিনিস পছন্দ করিবেন এবং তজ্জন্য টাকা দিতে প্রস্তুত থাকিবেন উক্ত টাকা গ্রহণ করিতে, মেমো লিখিতে, উহা 'ক্যাসে' জমা দিতে এবং উদ্বৃত্ত টাকা ফেরত দিতে যেন অযথা বিলম্ব না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। যিনি টাকা গ্রহণ করিবেন তিনি যেন অনায়াসে খরিদ্দারের নিকট উপস্থিত হইতে পারেন। টাকা জমা ও উদ্বৃত্ত ফেরত ইত্যাদি তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করার জন্য 'ক্যাস বিভাগ' বিপণির মধ্যস্থলে থাকিলে ভাল হয়। প্রয়োজনবোধে একাধিক 'ক্যাস বিভাগ' থাকিতে পারে। তবে উহাদের যথাযথ অবস্থান বিক্রয় কার্যে অবশ্যই সাহায্য করিবে।

১০। বিভাগীয় বিক্রয়-উদ্যোগিগণের চেহারা, স্বাস্থ্য ও পোশাক খরিদ্দারগণকে আকর্ষণ করার মত থাকা উচিত। কোন খরিদ্দার কোন বিভাগে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানানো এবং নানাপ্রকার পণ্যাদি প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাকে পণ্য ক্রয়ে প্রলুব্ধ করার মত যোগ্যতা প্রত্যেক বিক্রয়-উদ্যোগীর থাকা আবশ্যক।

বহু বিপণি, বিপণি-শৃঙ্খল এবং বিভাগীয় বিপণির মধ্যে পার্থক্য (Distinction among Multiple Shops, Chain Stores and Departmental Stores)

বহু বিপণি, বিপণি-শৃঙ্খল ও বিভাগীয় বিপণির মধ্যে সাংগঠনিক কাঠামোর ও অন্যান্য পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

বহু বিপণি	বিপণি-শৃঙ্খল	বিভাগীয় বিপণি
১। এক জাতীয় পণ্যই প্রধানত বিক্রয় হয়।	১। বহুবিধ পণ্য বিক্রয় হয়।	১। সম্ভাব্য সকল প্রকার পণ্যই বিক্রয় করার উদ্দেশ্য।
২। ইহা ছোট-বড় সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।	২। ইহাও ছোট-বড় সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।	২। ইহা কেবল জনবহুল শহর ও নগরে দেখিতে পাওয়া যায়।
৩। নগদ বিক্রয় ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য।	৩। ধার ও নগদ উভয় প্রকার বিক্রয়ই ইহাতে দেখা যায়।	৩। ইহাতেও ধার ও নগদ বিক্রয় উভয়ই চলিতে থাকে।
৪। এরূপ বিপণিতে অলাভজনক পণ্য বা কম কাটতি হয় এরূপ পণ্য কমই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে একপ্রকার পণ্যের লাভ হইতে অন্যপ্রকার পণ্যের ক্ষতিপূরণ করিতে হয় না।	৪। কারবার বড় হইলে অলাভজনক পণ্য বা কম কাটতি হয় এরূপ পণ্য এরূপ বিপণিতে থাকা বিচিত্র নয়। এরূপ অবস্থায় এক পণ্যের লাভ দ্বারা অন্য পণ্যের ক্ষতিপূরণ করিতে হয়।	৪। ইহাতে অনেক অলাভজনক বিভাগ বা কম কাটতি হয় এরূপ পণ্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে একরূপ পণ্যের লাভ হইতে অন্যরূপ পণ্যের ক্ষতিপূরণ করাই বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
৫। এখানে বিক্রয়যোগ্য পণ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। এজন্য ধনী-দরিদ্র সকলপ্রকার খরিদ্দারেরই এখানে সমাবেশ হয়।	৫। কারবার খুব বৃহৎ না হইলে বিক্রয়যোগ্য পণ্য অপেক্ষাকৃত সুলভেই পাওয়া যায়। এজন্য সকল শ্রেণীর ক্রেতার এখানে সমাবেশ হয়।	৫। এরূপ বিপণিতে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী। এজন্য এখানে বিলাসী ও ধনী ক্রেতাদের সমাবেশ বেশী।
৬। এরূপ বিপণি হইতে ক্রীত জিনিস ক্রেতাদের নিজেদেরই বহন করিতে হয়। প্রয়োজন হইলেও উহা বাড়ীতে পৌছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা এখানে দেখা যায় না।	৬। এরূপ কারবার বড় হইলে প্রয়োজনবোধে ইহা ক্রেতার বাড়ীতে মাল পৌছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।	৬। এখানে সাধারণত প্রয়োজনবোধে ক্রেতার বাড়ীতে মাল পৌছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

বহু বিপণি	বিপণি শৃঙ্খল	বিভাগীয় বিপণি
ইহার একটি বিপণি অন্য বিপণির প্রচারকার্যে সহায়তা করে। এজন্য ইহার বিজ্ঞাপন ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম।	৭। ইহারও একটি বিপণি অন্য বিপণির প্রচারকার্যে সহায়তা করে। এজন্য ইহারও বিজ্ঞাপন ব্যয় হ্রাস করা চলে।	৭। ইহার এরূপ কোন সুবিধা নাই। ফলে ইহার পক্ষে বিজ্ঞাপন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয় না।
৮। এরূপ বিপণি অল্প মাল মজুত লইয়া কারবার চালাইতে পারে। কোনও জিনিসের অকুলান হইলে নিকটবর্তী দোকান হইতে উহা শীঘ্র আনা চলে। ফলে উহা কম মূলধন লইয়া চলিতে পারে।	৮। ইহার বিপণিগুলি অপেক্ষাকৃত কিছুটা দূরে দূরে অবস্থিত। এজন্য সবসময় নিকটবর্তী বিপণি হইতে মাল আনা সম্ভব হয় না। কেন্দ্রীয় ডিপো হইতেই ইহাকে পণ্যের যোগান লইতে হয়। ইহাকে বেশী মূলধন লইয়াই চলিতে হয়।	৮। ইহার এরূপ কোন সুবিধা নাই। ফলে ইহাকে বিভিন্ন প্রকার পণ্য প্রচুর পরিমাণে মজুত রাখিতে হয়। ফলে প্রচুর মূলধন ভিন্ন এরূপ কারবার চালানোর প্রশ্নই উঠে না।
৯। ইহাতে ডাকযোগে ব্যবসা দেখিতে পাওয়া যায় না।	৯। ইহাতেও ডাকযোগে ব্যবসা খুব কম।	৯। ইহাতে ডাকযোগে ব্যবসাও প্রচুর চলিতে থাকে।
১০। ইহা পূর্বাপর জোটের (Vertical Combination) উদাহরণ।	১০। ইহা পার্শ্বিক জোটের (Lateral Combination) উদাহরণ।	১০। ইহাও পার্শ্বিক জোটের (Lateral Combination) উদাহরণ।

ডাক মারফত কারবার (Mail Order Business)

ইহা একপ্রকার খুচরা কারবার। ডাকযোগেই ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিক্রেতা বিভিন্ন সংবাদপত্র বা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া জিনিসের কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা ক্রেতাসাধারণকে অবগত করান। বিক্রেতা নিজস্ব ইস্তাহার বা ছোট পুস্তিকার সাহায্যেও তাঁহার পণ্য ক্রেতার গোচরীভূত করাইতে পারেন। ক্রেতা বিজ্ঞাপন, ইস্তাহার বা পুস্তিকা হইতে উক্ত পণ্যের গুণাগুণ অবগত হইয়া উহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিলে ডাকযোগে পত্রদ্বারা সে ইচ্ছা জানাইয়া থাকেন। বিক্রেতাও ডাকযোগে

ভি. পি. করিয়া মাল পাঠাইয়া থাকেন। এই ব্যবসায় ক্রেতা ও বিক্রেতার সহিত কোনও সাক্ষাৎ হয় না। ডাক মারফতই সব কিছু সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বিক্রেতার সততার উপরই এ ব্যবসায়ের উন্নতি নির্ভর করে। ইহাতে কোন দোকান সাজাইবার প্রয়োজন হয় না। নিজ গৃহে বসিয়াই বিক্রেতা ব্যবসা চালাইতে পারেন। ফলে অফিস, দোকান ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যয়বাহুল্য নাই। এই ব্যবসায় উৎপাদক নিজেই সম্ভোগকারীকে মাল পাঠাইতে পারেন। 'বিভাগীয় বিপণিতে'ও এ ব্যবসা চলে। ইহা ছাড়া মধ্যস্থ-কারবারী উৎপাদকের নিকট হইতে মাল ক্রয় করিয়া সম্ভোগকারীকে সরবরাহ করিতে পারেন।

এই ব্যবসায়ে নিম্নলিখিত **সুবিধাগুলি** পাওয়া যায়:

(১) এ ব্যবসায়ে অধিক পরিমাণে মাল মজুত রাখার প্রয়োজন নাই। ক্রেতার নিকট হইতে অর্ডার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাল খরিদ করিলেই চলে। ফলে অল্প মূলধন লইয়া এরূপ ব্যবসা চালান চলে।

(২) ইহাতে দোকান সাজানোর ব্যয় হইতেও অব্যাহতি পাওয়া যায়।

(৩) ক্রেতাও বাড়ীতে বসিয়া ডাক মারফত মাল পাওয়ার সুযোগ পান।

(৪) বিক্রেতাও নগদ বিক্রয়ের মত ডাকযোগে মালের টাকা বাড়ী বসিয়াই পাইয়া থাকেন। ধারে বিক্রয়ের ক্ষয়ক্ষতি আর তাহাকে বহন করিতে হয় না।

এই ব্যবসায়ের কতকগুলি **অসুবিধাও** আছে। উহা নিম্নরূপ:

(১) এ ব্যবসায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে না। ক্রেতার পক্ষে জিনিস পরীক্ষা করিয়া ক্রয় করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ক্রেতাকে বিক্রেতার সততার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এই সততার অভাব প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। ফলে ক্রেতাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

(২) এই ব্যবসায়ে প্রচার ও বিজ্ঞাপন চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী একইভাবে চলিতে দেখা যায়। কিছুদিন পর আর এই বিজ্ঞাপন বা প্রচার জিনিস বিক্রয়ে ততটা কার্যকরী হয় না। ক্রেতা এরূপ বিজ্ঞাপনে আর প্রলুব্ধ হন না। ফলে ব্যবসা আর সেরূপ লাভজনক থাকে না। 'মহাশক্তি সালসার' বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে বহুদিন যাবত বাহির হইলেও এই বিজ্ঞাপন বর্তমান বাজারে ক্রেতাকে সেরূপ আকৃষ্ট করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

(৩) এ ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার ব্যক্তিগত রুচির পরিচয় বা পরিবর্তন অবগত হইতে পারেন না। ফলে ব্যবসা খারাপ চলিলে বিক্রেতার পক্ষে উহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে।

কেরায়া ক্রয় ও কিস্তিবন্দী ক্রয় (Hire Purchase and Instalment Purchase)

যে ক্রয়-ব্যবস্থায় ক্রীত জিনিসের মূল্য একযোগে পরিশোধ না করিয়া ক্রমে ক্রমে

নির্দিষ্ট কিস্তি অনুযায়ী পরিশোধ করা চলে তাহাকে **কিস্তিবন্দী ক্রয় (Instalment Purchase)** বলে। ইহার **বৈশিষ্ট্য** নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) জিনিস ক্রয় করিবার সময় ক্রেতাকে কিছু টাকা নগদ দিতে হয়।

(২) অবশিষ্ট টাকা নির্দিষ্ট হারে মাসে মাসে বা অন্য কোন শর্ত অনুযায়ী দিয়া পরিশোধ করিতে হয়।

(৩) এজন্য ক্রেতাকে নগদ মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশী টাকা দিতে হয়। উক্ত বেশী টাকা বাকী টাকার উপর সুদ হিসাবে গণ্য হয়।

(৪) এরূপ ক্রয়-ব্যবস্থায় প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার পর জিনিস ক্রেতা পাইয়া থাকেন।

(৫) উক্ত জিনিসের মালিকানাস্বত্ব তখন ক্রেতাতে বর্তায়।

(৬) কিস্তি মত টাকা না দিলে বিক্রেতার জিনিসের উপর কোন দাবী থাকে না। তিনি শুধু মূল্য আদায়ের জন্য অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

(৭) এরূপ জিনিসের উপর ক্রেতার যদৃচ্ছ-অধিকার থাকে এবং ইচ্ছা করিলে ইহা তিনি হস্তান্তর করিতেও পারেন।

যে ক্রয়-ব্যবস্থায় ক্রীত জিনিসের মূল্য একযোগে পরিশোধ না করিয়া ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করা চলে এবং সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত মালিকানাস্বত্ব ক্রেতাতে বর্তায় না, তাহাকে **কেরায়া ক্রয় (Hire Purchase)** বলে।

ইহা কিস্তিবন্দী ক্রয়ের অনুরূপ। ইহাতেও প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার পর ক্রেতার হস্তে জিনিস আসিয়া যায়। তবে ইহার নিম্নলিখিত **বৈশিষ্ট্য** উল্লেখযোগ্য :

(১) ইহাতে জিনিস ক্রয় করিবার সময় কিছু নগদ মূল্য (Cash down price) দিতে হয়। এ বিষয়ে ইহা কিস্তিবন্দী ক্রয়ের অনুরূপ।

(২) অবশিষ্ট টাকা নির্দিষ্ট হারে মাসে মাসে বা অন্য কোন শর্ত অনুযায়ী দেয়। কিস্তিবন্দী ক্রয়েও এরূপ ব্যবস্থা।

(৩) কেরায়া ক্রয়েও কিস্তিবন্দী ক্রয়ের মত নগদ মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশী টাকা দিতে হয় এবং উহা অনাদায়ী টাকার উপর সুদ বলিয়া গণ্য হয়।

(৪) কিস্তিবন্দী ক্রয়ের মত প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার পর ইহাতেও ক্রেতার হস্তে জিনিস অর্পিত হয়। কিন্তু অবশিষ্ট টাকা না দেওয়া পর্যন্ত ক্রেতাতে জিনিসের মালিকানাস্বত্ব বর্তায় না। এখানেই কিস্তিবন্দী ক্রয়ের সহিত ইহার প্রভেদ। কিস্তিবন্দী ক্রয়ে জিনিস ক্রেতার হস্তে অর্পিত হওয়ার সহিত মালিকানাস্বত্ব আসিয়া যায়।

(৫) কেরায়া ক্রয়ে কিস্তি খেলাপ হইলে বিক্রেতা জিনিস ফেরত লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু কিস্তির যে টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা ফেরত দেওয়া হয় না। উহা জিনিসের ভাড়া বলিয়া গণ্য হয়। এদিক দিয়াও ইহা কিস্তিবন্দী ক্রয় হইতে পৃথক। কারণ কিস্তিবন্দী ক্রয়ে বিক্রেতার জিনিস ফেরত লওয়ার কোন অধিকার নাই।

(৬) কেরায়া ক্রয়ে জিনিস যদৃচ্ছা ব্যবহার বা হস্তান্তর করিবার অধিকার নাই। যদি কেহ এরূপ জিনিস ক্রেতার নিকট হইতে গ্রহণ করেন তিনি কিস্তি খেলাপ হইলে বিক্রেতাকে জিনিস ফেরত দিতে বাধ্য থাকেন। কিস্তিবন্দী ক্রয়ে এরূপ কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।

কেরায়া ক্রয় ও কিস্তিবন্দী ক্রয়ের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of Hire Purchase and Instalment Purchase)

কেরায়া ও কিস্তিবন্দী ক্রয়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

সুবিধা :

(১) নানাবিধ মূল্যবান আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যেমন, রেডিও, গ্রামোফোন, সেলাইয়ের কল, বৈদ্যুতিক পাখা, রেফ্রিজারেটার, মূল্যবান আসবাবপত্র, মোটরগাড়ী, বাড়ী, নানাবিধ মূল্যবান যন্ত্রাদি, ঘড়ি প্রভৃতি এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ ব্যবস্থা স্বল্পবিত্ত লোকের পক্ষে খুবই উপযোগী। এরূপ লোকের পক্ষে একযোগে টাকা দিয়া এই জিনিস ক্রয় করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। অথচ কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে এরূপ জিনিস ক্রেতার পক্ষে ক্রয় করা অনেক সহজসাধ্য।

(২) এইভাবে ক্রেতা সীমাবদ্ধ আয় লইয়াও অনেক মূল্যবান জিনিসের মালিক হইতে পারেন এবং সহজ, সুন্দর, আরামপ্রদ ও উন্নত জীবনযাত্রার অধিকারী হন।

(৩) কেরায়া ক্রয়ে মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রেতা জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণের দিকেও দৃষ্টি দিয়া থাকেন। ফলে ক্রেতাও ইহা যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন না। ইহাতে জিনিসের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়। ক্রেতাই ইহাতে লাভবান হন।

(৪) কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুবিধা থাকায় নগদ বিক্রয় অপেক্ষা এরূপ বিক্রয়ের পরিমাণ অনেক বেশী হয়। ইহা বিক্রেতার পক্ষে অবশ্যই লাভজনক।

(৫) নগদ মূল্য অপেক্ষা যে বেশী মূল্য আদায় হয় তাহাতে মুনাফার পরিমাণ বেশীই হয়।

(৬) কেরায়া ক্রয়ে কিস্তিখেলাপ হইলে বিক্রেতা জিনিসটি ফেরত পান। ইহাতে অনাদায়ী দেনার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। বরং জিনিস ফেরত লইয়া আবার অন্য কোন ক্রেতাকে বিক্রয় করিলে বেশী লাভের সুবিধা হয়।

(৭) উৎপাদক পাইকার বা খুচরা বিক্রেতা এরূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারেন। সুতরাং কাহারও পক্ষে এরূপ জিনিসের বিক্রেতা হওয়া কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে এবং তজ্জন্য বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়ারও প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধা :

(১) দীর্ঘস্থায়ী মূল্যবান জিনিস ভিন্ন এরূপ ব্যবসায়ে সাফল্য আসে না।

(২) মন্দার বাজারে এরূপ জিনিসের বিক্রয় কোন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় না।

(৩) এরূপ কারবারে সাফল্য আনিতে হইলে ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা, আদায়কারী, পরিদর্শক প্রভৃতি ছাড়া বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্যের জন্য প্রচুর ব্যয় করার প্রয়োজন হয়। এ সকল কৃতিত্বের সহিত পরিচালিত না হইলে বিক্রয়ে সাফল্য আসা সম্ভব নয়।

(৪) ক্রেতার আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা না জানিয়া জিনিস বিক্রয় করিলে কিস্তিবন্দী ক্রয়ে অযথা হয়রান হইতে হয়। এ সমস্ত সংবাদাদির জন্য ভ্রাম্যমাণ কর্মচারীর উপর নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। সুতরাং এরূপ কারবারে বহুবিধ ঝুঁকি থাকায় বিক্রেতা কখনও নিশ্চিন্তমনে বিক্রয়কার্যে লিপ্ত থাকিতে পারেন না।

(৫) কিস্তির টাকা আদায় করাও এক বিরক্তিকর ব্যাপার। কিস্তিখেলাপ হইলে কেরায়া ক্রয়ে জিনিস ফেরত লইয়া অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিস্তিবন্দী ক্রয়ে আবার অনেক সময় আইনের আশ্রয় লইতে হয়। এরূপ অবস্থা ব্যবসাক্ষেত্রে মোটেই প্রীতিকর নহে। কেরায়া ক্রয় অপেক্ষা কিস্তিবন্দী ক্রয়েই এরূপ অসুবিধা বিক্রেতাকে বেশী ভোগ করিতে হয়।

(৬) নগদ মূল্য অপেক্ষা ইহাতে অনেক বেশী টাকা দিতে হয়।

(৭) কেরায়া ক্রয়ে আবার কিস্তিখেলাপ হইলে প্রদত্ত কিস্তির টাকা আর ফেরত পাওয়া যায় না। এদিক দিয়াও ক্রেতার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৮) নগদমূল্যে জিনিস কিনিতে হয় না বলিয়া ক্রেতা অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার সামর্থ্যের বাহিরে চলিয়া যান। সুতরাং এরূপ অবস্থায় অমিতব্যয়ী হওয়ার ঝুঁকি আছে।

(৯) প্রকৃত প্রস্তাবে স্বল্পবিত্ত লোকের পক্ষে অনেকক্ষেত্রেই এ জাতীয় জিনিস ক্রয় করার ইচ্ছা থাকিলেও সম্ভব হয় না। কারণ জামিন ভিন্ন এরূপ জিনিস ক্রয় করা যায় না। স্বল্পবিত্ত লোকের পক্ষে জামিন সংগ্রহ করা এক দুরূহ ব্যাপার। ফলে সমাজে যাঁহাদের কিছুটা প্রতিষ্ঠা আছে তাঁহারাই শুধু এরূপ জিনিস ক্রয় করিবার সুযোগ পান।

(১০) এরূপ জিনিস ক্রয় করার পর মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতার মনে শান্তি থাকে না। কোন কারণে কিস্তি পরিশোধের অসুবিধা সৃষ্টি হইলে কেরায়া ক্রয়ে জিনিস ফেরত, কিস্তিবন্দী ক্রয়ে মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্যে ক্রেতাকে জড়াইয়া পড়িতে হয়।

কেরায়া ক্রয় ও কিস্তিবন্দী ক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Hire Purchase and Instalment Purchase)

কেরায়া ক্রয় বা ভাড়া ক্রয় ও কিস্তিবন্দী ক্রয় বা বিলম্বিত মূল্য প্রদানের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় :

কেরায়া ক্রয়	কিস্তিবন্দী ক্রয়
১। ইহাতে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার পর ক্রেতার হস্তে জিনিস আসিয়া যায়, কিন্তু শেষ কিস্তির টাকা পরিশোধ না হইলে মালিকানাস্বত্ব ক্রেতাতে বর্তায় না। উহা বিক্রেতারই থাকিয়া যায়।	১। ইহাতে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার পর ক্রেতার হস্তে জিনিস এবং উহার মালিকানাস্বত্ব আসিয়া যায়। কিস্তির টাকা পরিশোধ না হইলেও বিক্রেতার কোন মালিকানাস্বত্ব ইহাতে থাকে না।
২। ইহাতে কিস্তিখেলাপ হইলে বিক্রেতা জিনিস ফেরত লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু কিস্তির যে টাকা দেওয়া হইয়াছে উহা ফেরত পাওয়া যায় না। উহা ভাড়া বলিয়া গণ্য হয়।	২। ইহাতে কিস্তিখেলাপ হইলে বিক্রেতা জিনিস ফেরত লইয়া যাইতে পারেন না। তিনি শুধু উক্ত টাকা আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন।
৩। ইহাতে জিনিস যদৃচ্ছা ব্যবহার বা হস্তান্তর করা যায় না। যদি কেহ এরূপ জিনিস ক্রেতার নিকট হইতে গ্রহণ করেন, কিস্তিখেলাপ হইলে তিনি উহা ফেরত দিতে বাধ্য থাকেন। আর জিনিস যদৃচ্ছা ব্যবহার করার জন্য ক্ষতি হইলে উক্ত ক্ষতিপূরণ করিতেও ক্রেতা বাধ্য থাকেন।	৩। ইহাতে এরূপ কোন বাধা-বাধকতা নাই। ক্রেতা জিনিস যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন এবং হস্তান্তরও করিতে পারেন। এরূপ ক্রেতা শুধু মূল্য পরিশোধের জন্য দায়ী থাকেন।
৪। প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি নহে। ইহাতে ভাড়ার বিনিময়ে জিনিসটি ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়। তবে সাধারণ ভাড়ার তুলনায় পার্থক্য এই যে, এরূপ চুক্তিতে জিনিস ব্যবহারকারীকে চুক্তি অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ করিয়া মালিক হইবার অধিকার দেওয়া হয়।	৪। ইহা পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি। ইহাতে শুধু মূল্য পরিশোধ বিলম্বিত হয়। ভাড়ার বিনিময়ে জিনিস ব্যবহার করার প্রশ্ন ইহাতে নাই। চুক্তি সম্পাদনের এবং প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা এখানে মালিকে পরিণত হন।
৫। কিস্তির টাকা ইহাতে ভাড়া বলিয়া গণ্য হয়।	৫। কিস্তির টাকা এখানে পণ্যের মূল্য বলিয়া গণ্য হয়।

কেরায়া ক্রয়	কিস্তিবন্দী ক্রয়
৬। ইহাতে কিস্তিখেলাপ হইলে জিনিস ফেরত লইয়া কিস্তির টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা সহজে সম্পন্ন হয়।	৬। ইহাতে কিস্তিখেলাপ হইলে টাকা আদায় করার এক সমস্যা দেখা দেয়। আদালতের আশ্রয় ভিন্ন সহজে টাকা আদায় অনেকক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।
৭। ইহাতে ক্রেতার আর্থিক সঙ্গতি না জানা থাকিলেও মূল্য পরিশোধের জন্য হয়রান হইতে হয় না। জিনিস ফেরত লইয়া সহজেই উহার সমাধান হয়।	৭। ক্রেতার আর্থিক সঙ্গতি না জানিয়া জিনিস বিক্রয় হইলে মূল্য আদায়ের জন্য অযথা হয়রান হইতে হয়।

অধি-বিপণি (Super-market)

অধি-বিপণি বা সংযুক্ত বিপণি (Combination Store) খুচরা বিক্রয়ের দোকান। ইহা বিভাগীয় বিপণির বৃহত্তর সংস্করণ। এরূপ বিপণিতে বিভাগীয় বিপণির মত বিভিন্ন প্রকারের স্থায়ী পণ্য (durable goods) ছাড়া শাক-সব্জী, মাছ, মাংস, ডিম, প্রভৃতি পচনশীল পণ্য (perishable goods)-ও বিক্রয় হইয়া থাকে। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ বিপণির প্রসার খুব বেশী। ইদানীংকালে আমাদের দেশেও এরূপ বিপণি স্থাপিত হইতে দেখা যাইতেছে। দিল্লীর 'সুপার বাজার' ও 'আপনা বাজার', কলিকাতার 'সমবায়িকা' এরূপ অধি-বিপণির উদাহরণ। এরূপ বিপণির **বৈশিষ্ট্য** নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। এরূপ বিপণিতে মাছ, মাংস, তরি-তরকারী প্রভৃতি নানা জাতীয় খাদ্যদ্রব্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া জামা, কাপড়, নানাবিধ তৈজসপত্র, মোটরগাড়ী ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য একই গৃহে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া সজ্জিত থাকে। সুতরাং সম্ভাব্য রকমের ভোগ্যদ্রব্য ও বিলাসদ্রব্য উভয়ই এরূপ বিপণিতে বিক্রয়ের জন্য মজুত থাকার নিয়ম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অধি-বিপণিতে ২০০০ রকমের দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয় হইয়া থাকে।

২। ইহার বিক্রয়যোগ্য পণ্যগুলি বিভিন্ন বিভাগের কাউণ্টারে সজ্জিত থাকে। এরূপ বিপণি বৃহৎ হইলে উহার স্থান সঙ্কুলানের জন্য ইহা বহুতলবিশিষ্ট গৃহে স্থাপিত হইয়া থাকে।

৩। সাধারণত এরূপ বিপণিতে বিক্রয়-কর্মচারী (Salesman) ছাড়াই পণ্যগুলি

বিক্রয় হয়। পণ্যগুলি খোলা অবস্থায় বিভিন্ন বিভাগে র‍্যাকে সুন্দরভাবে সাজান থাকে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে উহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন। প্রত্যেক কাউণ্টারে একাধিক সচল ট্রলি থাকে। যে-কোন ক্রেতা তাঁহার পছন্দমত প্রয়োজনীয় পণ্য কোনও ট্রলিতে তুলিয়া লইতে পারেন এবং এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে প্রয়োজনীয় জিনিস লইয়া বহন করার জন্য ট্রলি লইয়া অগ্রসর হইতে পারেন। ইহার পর বাহিরে যাইবার দরজায় উপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থিত ক্যাসিয়ারকে পণ্যের মূল্য দিয়া উহা লইয়া বাহির হন। বিক্রয়-কর্মচারী না থাকিলেও খরিদ্দারদের সাহায্য করিবার জন্য এবং পণ্যাদি গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য লোক থাকে। উহারা কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খরিদ্দারদিগকে সর্বপ্রকার সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। ভারতে অবশ্য বিক্রয়-কর্মচারী ছাড়া এরূপ বিপণিতে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা এখনও বিশেষভাবে চালু হইতে পারে নাই। দিল্লীর দুইটি অধি-বিপণিতে এগার শতের অধিক কর্মচারী কর্মরত আছেন।

৪। এখানে পণ্যাদি নগদ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। এরূপ বিপণির মালিক উৎপাদক বা পাইকারদের নিকট হইতে স্বল্পমূল্যে অধিক পরিমাণে নানাবিধ পণ্য বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করিয়া থাকেন। এজন্য এরূপ বিপণিতে যথাসম্ভব কম মূল্যে জিনিস বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

৫। এরূপ বিপণি যে-কোনরূপ মালিকানায়, এমনকি সরকারী বিপণি হিসাবেও সংগঠিত হইতে পারে। তবে সমবায় প্রথায় এরূপ কারবার আমাদের দেশে বেশী প্রচলিত।

৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মান অনুযায়ী যে বিপণির বার্ষিক বিক্রয় অন্ততঃ ৩,৭৫,০০০ ডলার এবং অন্যান্য বিভাগ ছাড়া চার প্রকারের খাদ্যসামগ্রী যেমন, ডাল-তেল-মসলা, শাকসব্জী, মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রভৃতি বিভাগ থাকে উহাকে অধি-বিপণি আখ্যা দেওয়া হয়। আমাদের দেশে অবশ্য এরূপ কোন নিয়ম নাই। তবে খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য থাকা এরূপ দোকানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং ইহার সহিত বিভাগীয় বিপণির তুলনা করিলে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা চলে। একটি হইতেছে খাদ্যসামগ্রী, দ্বিতীয়টি হইতেছে বিক্রয় কর্মচারীর অভাব। কিন্তু জাপানের 'নিটসুকোনী' বিভাগীয় বিপণিতে মাছ, শাকসব্জী হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক কিছুই বিক্রয় হয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সঠিক পার্থক্য নির্ণয় করা অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। অধি-বিপণির বিশেষ তাৎপর্য এই যে, ইহা খাদ্য-সামগ্রীর কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং মূল্যে স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য চেষ্টিত থাকে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা হইতে বিভাগীয় বিপণি অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহার সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করিলে এ বিষয়ে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে। এরূপ অধি-বিপণির **সুবিধা** নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। এরূপ বিপণি হইতে ক্রেতা তাঁহার ইচ্ছামত নানাবিধ জিনিস ক্রয় করিতে পারেন। ফলে তাঁকে বিভিন্ন দোকানে ঘুরিয়া হয়রান হইতে হয় না। ইহাতে সময় ও অর্থ উভয়েরই সাশ্রয় হয়।

২। ইহাতে বিক্রয় কর্মচারী থাকে না বলিয়া ইহার পরিচালন ব্যয় অনেক কম পড়ে। ফলে এরূপ বিপণি হইতে ক্রেতারা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে জিনিস ক্রয় করিতে পারেন।

৩। অনেক প্রকারের জিনিস প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে বলিয়া ক্রেতার পক্ষে পছন্দমত পণ্য বাছাই করাও সম্ভব হয়।

৪। এরূপ দোকানের প্রচার ব্যয়ও কম। কারণ ইহার এক বিভাগ অপর বিভাগের প্রচারকার্যে সহায়তা করিয়া থাকে। ক্রেতার প্রবেশ এবং বিভিন্ন পণ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিই এই প্রচারে সাহায্য করিয়া থাকে।

৫। ইহা ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় করার নীতি গ্রহণ করিয়া থাকে। ফলে বাজারদরের উপর ইহা স্থিতিশীল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

৬। ইহাতে অনেক বিভাগ থাকে বলিয়া এক বিভাগের লোকসান অন্য বিভাগের লাভ দ্বারা পূরণ হইতে পারে।

কিন্তু ইহার **অসুবিধা** নিম্নরূপ :

১। এরূপ বিপণি স্থাপন করিতে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। সুতরাং ইহাকে লাভজনকভাবে কারবার চালাইতে হইলে প্রচুর বিক্রয়ের প্রয়োজন। এজন্য এরূপ বিপণি কখনই পাড়ায় পাড়ায় স্থাপিত হইতে পারে না। ফলে অনেক ক্রেতার বাসস্থান হইতে ইহার দূরত্ব বেশী পড়িয়া যায়। এজন্য অনেকের পক্ষে এরূপ বিপণির সুবিধা গ্রহণ করা কখনই সম্ভব হয় না।

২। এখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাব। সুতরাং কর্মচারী ও পরিচালকদের সাদর অভ্যর্থনার অভাব বলিয়া ক্রেতারা এরূপ বিপণিতে আসার বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন না।

৩। যদিও এরূপ বিপণি বাজারদরের উপর স্থিতিশীল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে বলিয়া বলা হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ অল্পসংখ্যক বিপণি অধিক সংখ্যক ক্রেতার অভাব পূরণ করিতে পারে না। এজন্য স্থিতিশীল প্রভাব কার্যকরী দেখিতে পাওয়া যায় না।

৪। অনেক অলাভজনক বিভাগ ইহাতে থাকে। এজন্য এক বিভাগের লোকসান অন্য বিভাগের লাভ দ্বারা পূরণ করিতে হয়। ফলে ন্যায্যমূল্যে এরূপ বিপণি পণ্য বিক্রয় করিতে পারে না।

৫। এরূপ বিপণিতে বাড়ী-গাড়ীওয়ালা ধনী ব্যক্তিদের আনাগোনাই প্রকৃত প্রস্তাবে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ ক্রেতার ইহার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতে দেখা যায় না।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. Describe briefly the principal methods of distribution of goods which may be adopted by the producer for the disposal of his goods to the ultimate consumers.

উৎপাদনকারী তাঁহার পণ্য সম্ভোগকারীদের নিকট বিক্রয়ের জন্য যে যে পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

2. Mention at least three different types of intermediaries that may operate in business and explain their respective functions. [C. U. B. Com. (Pass) 1963]

অন্ততপক্ষে তিনপ্রকারের মধ্যস্থকারবারীর নাম উল্লেখ কর যাঁহারা কারবারী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকেন এবং উঁহাদের প্রত্যেকের কাজ বিশ্লেষণ কর।

3. What are the different types of business intermediaries functioning between producers and consumers ? State their respective roles. [C. U. B. Com. (Hons.) 1967]

উৎপাদনকারী ও সম্ভোগকারীদের মধ্যে কি কি বিভিন্ন প্রকার মধ্যস্থকারবারী কাজ করিয়া থাকে ? উহাদের প্রত্যেকের ভূমিকা উল্লেখ কর।

4. Discuss the services of wholesalers in the distribution of commodities. Should they be replaced by producer's own retail shop ? [C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

পণ্যবণ্টনে পাইকারদের ভূমিকা বর্ণনা কর। উহাদের কি উৎপাদনকারীর নিজস্ব খুচরা দোকান দ্বারা উৎখাত করা উচিত ?

5. 'In retail trade business, skill in selling is of smaller importance than the art of buying'. Explain. [C. U. B. Com. 1952]

খুচরা কারবারে ক্রয়ের কুশলতার তুলনায় বিক্রয়ে নিপুণতার গুরুত্ব কম। ব্যাখ্যা কর।

6. Discuss the advantages and disadvantages of multiple shops. [C. U. B. Com. 1963]

বহু বিপণির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

7. Multiple shop system serves consumers' interest best. Discuss. [C. U. B. Com. 1961]

বহু বিপণিতে ক্রেতার স্বার্থ সবচেয়ে বেশী রক্ষিত হয়। আলোচনা কর।

8. Discuss why Departmental Stores are popular in big cities and how these are organised. [C. U. B. Com. (Pass) 1965]

বিভাগীয় বিপণি বড় বড় শহরে জনপ্রিয় কেন এবং উহা কিভাবে সংগঠিত হয় আলোচনা কর।

9. Discuss a proper layout for the sales department of a large departmental store. [C. U. B. Com. (Pass) 1963]

একটি বিভাগীয় বিপণির বিক্রয় বিভাগের উপযুক্ত বিন্যাস আলোচনা কর।

10. Distinguish carefully between a Multiple Shop and a Departmental Store. [C. U. B. Com. 1957]

বহু বিপণি ও বিভাগীয় বিপণির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

11. Discuss the difference in the organisational structure of Chain Stores, Multiple Shops and Departmental Stores.

[C. U. B. Com. (Pass) 1966]

বিপণি শৃংখল, বহু বিপণি এবং বিভাগীয় বিপণির মধ্যে উহাদের সাংগঠনিক কাঠামোর পার্থক্য আলোচনা কর।

12. Discuss Mail Order Business with its merits and defects.

গুণাগুণসহ ডাক মারফৎ কারবারের আলোচনা কর।

13. State the characteristics of Hire Purchase and Instalment Purchase with their difference, merits and demerits.

কেরায়া ক্রয় ও কিস্তিবন্দী ক্রয়ের বৈশিষ্ট্যসহ উহাদের পার্থক্য ও গুণাগুণ বর্ণনা কর।

14. Do you think that the establishment of Super-markets confers any additional benefits as compared to Departmental Stores ? Give reasons for your answer. [C. U. B. Com. (Hons.) 1969]

অধি-বিপণি স্থাপনে কি বিভাগীয় বিপণি অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যাইবে ? তোমার উত্তরের যুক্তি দেখাও।

15. Explain the functions of Commission Agents, Sole Agents and Brokers. Do you think they may be eliminated ? Give reasons for your answer. [C. U. B. Com. (Pass) 1968]

ক্রয় তদারক প্রতিনিধি, একমাত্র প্রতিনিধি এবং দালালের কার্য বিশ্লেষণ কর। উহাদের কি বাদ দেওয়া উচিত ? তোমার উত্তরের যুক্তি দেখাও।

16. Explain the consideration involved in choosing a channel of distribution for marketing of consumers' goods.

[B. U. B. Com. (Hons.) 1971]

বিক্রয় পদ্ধতি নির্বাচনের জন্য যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত উহা বিশ্লেষণ কর।

17. Give your views about the distributive function of a business. Should there be agency or self-selling method ? Give reasons for your answer. [C. U. B. Com. (Hons.) 1972]

কারবারের বণ্টনমূলক কাজ সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর ; ইহা প্রতিনিধিমূলক হইবে, না স্বয়ং-বিক্রয় পদ্ধতি হইবে ? কারণসহ উত্তর লিখ।

18. What is meant by a Departmental Stores ? Discuss its organisation and advantages. [C. U. B. Com. (Pass) 1972]

বিভাগীয় বিপণি বলিতে কি বুঝায় ? উহার সংগঠন ও সুবিধাগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

19. A tendency is noticeable among many large manufacturing organisations to establish their own retail selling units. What are their advantages. [C. U. B. Com. (Pass) 1973]

বৃহৎ বৃহৎ উৎপাদনকারী সংস্থার নিজস্ব খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপনের প্রবণতা দেখা যায়। ইহার সুবিধাগুলি কি কি ?

অষ্টাদশ অধ্যায়

বৈদেশিক বাণিজ্য

(Foreign Trade)

বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সংগঠন (Control Organisations in Foreign Trade)

বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের যে সংগঠন দেখা যায় উহাকে নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে :

১। **সরকার (Government) :** ইহাই বৈদেশিক বাণিজ্যের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। সরকার বৈদেশিক বাণিজ্যের মূলনীতি ও পদ্ধতি স্থির করেন, বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করেন, শুল্কনীতি ও শুল্ক ধার্য করেন এবং আমদানী ও রপ্তানীর অনুমতিপত্র (Licence) প্রদান করেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই সকল কার্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য (Commerce) দপ্তর ও উহার অধীন কর্মচারীদের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

২। **শুল্ক কর্তৃপক্ষ (Customs Authorities) :** ইঁহারা আমদানী ও রপ্তানীকৃত পণ্যাদির উপর ধার্য শুল্ক আদায় করেন, পণ্যের আমদানী ও রপ্তানীর উপর নজর রাখেন এবং নিষিদ্ধ ও বাঞ্ছিত পণ্যের আমদানী-রপ্তানী বন্ধ করেন। এজন্য ইহারা আমদানী-রপ্তানী বিভাগের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। পণ্য রপ্তানীর সময় ইহারা রপ্তানীকারীদের নিকট হইতে শুল্ক চালান ও রপ্তানীর অনুমতিপত্র (Licence) গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা করেন এবং উক্ত পণ্যের উপর শুল্ক আদায় করিয়া রপ্তানীর অনুমতি (Permission) দিয়া থাকেন। এই অনুমতি ভিন্ন জাহাজে মাল বোঝাই করিতে পারা যায় না।

পণ্য আমদানীর সময় ইহারা জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট হইতে জাহাজ বন্দরে পৌছানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজী রিপোর্ট (Ship's Report) গ্রহণ করেন। উহাতে পণ্যের যাবতীয় বিবরণ লেখা থাকে। উক্ত জাহাজী রিপোর্ট পরীক্ষা করার পর আমদানীকারকের নিকট হইতেও আমদানীকৃত পণ্যের পরিমাণ, মূল্য ও অন্যান্য তথ্যাদি আদায় করেন। ইহার পর ইঁহারা চোরাই চালান রোধ করিবার জন্য বিস্তৃত অনুসন্ধান চালান এবং বেআইনী দ্রব্য না পাইলে এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষের সকল নিয়ম-কানুন ঠিকমত পালিত হইয়া থাকিলে মাল খালাসের আদেশপত্র দিয়া থাকেন।

৩। **বন্দর কর্তৃপক্ষ (Port Authorities) :** পণ্য আমদানী-রপ্তানী বন্দর মারফত সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই বন্দর পরিচালনার ভার বন্দর কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকে। এই কর্তৃপক্ষের প্রধান কাজ হইতেছে বন্দরে জাহাজের যাতায়াত,

মাল উঠানো-নামানো, বন্দর শুল্ক ধার্য ও উহার আদায়, বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যও উপরি-উক্ত পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রক (Ministry of Commerce) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের মূলনীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহার অধীনে প্রধান আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রক (Chief Controller of Imports and Exports) বাণিজ্যের মূলনীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ কার্যে পরিণত করিয়া থাকেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন শহর ও বন্দরে উঁহার অধীন অনেক সহকারী ও অন্যান্য অনেক কর্মচারী আছেন। ১৯৪৭ সালে যে রপ্তানী ও আমদানী নিয়ন্ত্রণ আইন (Exports and Imports Control Act, 1947) পাস হয় উহাকে ভিত্তি করিয়াই অবশ্য বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের কারণ (Reasons for Control of Foreign Trade)

বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের কারণ নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশই অর্থনৈতিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা (Economic self-sufficiency) লাভের জন্য ব্যস্ত। এজন্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ এবং দেশের মধ্যে শিল্পোন্নয়ন ও কাঁচামাল উৎপাদন অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ভারতও এ বিষয়ে সচেষ্ট আছে এবং আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।

২। আমদানী নিয়ন্ত্রণ হইলে এবং হ্রাস পাইলে বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যয়ও হ্রাস পায়। ফলে উহা দেশের উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ব্যবস্থায় হাত দিয়াছে। এজন্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

৩। অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রা অত্যাবশ্যক তাহা রপ্তানীর দ্বারা পূরণ করিতে না পারিলে অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করা যায় না এবং পরনির্ভরতা দূর হয় না। এজন্য রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করা বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের জন্য প্রয়োজন হয়। এরূপ রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য থাকে সুপরিকল্পিত উপায়ে দেশের শিল্পোন্নয়নকে অব্যাহত রাখিয়া বিদেশে বিভিন্ন প্রকার উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানী করা। ভারত এইভাবে পাট, চা, লাক্ষা, লৌহ আকরিক প্রভৃতি রপ্তানীতে বিশেষ মনোযোগ দিয়া আসিতেছে।

৪। বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত (unfavourable balance of trade) দেখা দিলে উহার ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বাড়িয়াই চলিয়াছে। এমতাবস্থায় উহা নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

৫। দেশ রক্ষা বা উহার নিরাপত্তার জন্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এতদ্ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। ভারতকেও এজন্য বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইতেছে।

৬। বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন ক্ষুদ্র কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহদায়তন কারবারী প্রতিষ্ঠানের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমপরিমাণ সুযোগ-সুবিধা দিতে হইলে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এরূপ নিয়ন্ত্রণের ফলে ভারত হইতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত অনেক পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব হইতেছে।

৭। পরিকল্পনামূলক অর্থনীতি (Planned Economy) গৃহীত হইলে উহা কার্যকরী করার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রয়োজনমত আমদানী-রপ্তানী ব্যবস্থাকে শিথিল বা সুদৃঢ় করা চলে। ভারতের পক্ষেও এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য।

৮। দেশের শিল্পোন্নতি, কর্মসংস্থানবৃদ্ধি, বেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতি কাজগুলি ঠিকপথে চালিত করিতে হইলেও বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ভারতের যে এরূপ প্রয়োজন নাই একথা বলা চলে না।

বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Methods of Foreign Trade Control)

বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সাধারণত নিম্নলিখিত উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে :

১। **নিষিদ্ধকরণ (Prohobition):** পণ্য বিশেষের আমদানী ও রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করাকে নিষিদ্ধকরণ বলা হয়। ইহার দ্বারা দেশের ও জাতীয় স্বার্থে অবাঞ্ছিত দ্রব্যের আমদানী এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের রপ্তানী বন্ধ করা হয়।

২। **অনুমতিপত্র দান (Licensing):** ইহা দুই উপায়ে সংঘটিত হয়। প্রথমত, আমদানীর পরিমাণ স্থির করিয়া অনুমতিপত্র দান এবং দ্বিতীয়ত, রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া অনুমতিপত্র দান। কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কি কি পণ্য কতটা আমদানী করা যাইতে পারে সরকার উহা স্থির করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন আমদানী-কারীকে অনুমতিপত্র দেওয়া হয়। উক্ত অনুমতিপত্র দুই প্রকারের হইয়া থাকে—(১) খোলা সাধারণ অনুমতিপত্র (Open General Licence or O. G. L.) এবং (২) বিশেষ বা সীমাবদ্ধ অনুমতিপত্র (Special or Restricted Licence)। খোলা সাধারণ অনুমতিপত্র দ্বারা কতকগুলি পণ্য আমদানী সম্পর্কে সকল কারবারীকে অনুমতিপত্র দেওয়া চলে। কিন্তু বিশেষ বা সীমাবদ্ধ অনুমতিপত্র দ্বারা বিশেষ বিশেষ কারবারীকে নির্দিষ্ট পণ্য আমদানীর অধিকার দেওয়া হয়। রপ্তানীক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের রপ্তানী অবশ্যই নিষিদ্ধ করা হয়। অন্যান্য পণ্য রপ্তানী সম্পর্কে উৎসাহই দেওয়া হয়। তবে এরূপ ক্ষেত্রে রপ্তানী সীমিত করার উদ্দেশ্যে

অনুমতি দেওয়া হয় না। এই অনুমতিপত্রের মাধ্যমে শত্রুপক্ষীয় দেশগুলিতে রপ্তানী এড়াইয়া মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিতে সীমাবদ্ধ রাখিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ইহা ছাড়া রপ্তানী শুল্ক আদায় এবং পণ্য রপ্তানীর জন্য অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ সহজসাধ্য করা হয়।

৩। **শুল্ক (Duty) :** শুল্কের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া আমদানী-রপ্তানীর পরিমাণও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই শুল্ক অবশ্য রাজস্ব (Revenue) আদায়ের কিংবা শিল্পসংরক্ষণের (Protection) উদ্দেশ্যে ধার্য হইতে পারে।

৪। **পরিমাণ নির্ধারণ (Quota) :** কোন কোন পণ্যের আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৫। **বিশেষ সুবিধা (Preferential Treatment) :** বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা শুল্ক হ্রাস, শুল্ক রেহাই প্রভৃতি বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা থাকিতে পারে। কমনওয়েলথভুক্ত এবং ইউরোপীয় কমনমার্কেটভুক্ত দেশগুলি এইভাবে নিজেদের দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

৬। **বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (Foreign Currency Exchange Control) :** পণ্য আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সৃষ্টি হয়। কিন্তু পণ্য রপ্তানীর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান সৃষ্টি হয়। উক্ত চাহিদা ও যোগানের উপর নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বিভিন্ন দেশের সহিত মুদ্রার বিনিময় হার স্থির করা ইহার উদ্দেশ্য। এই নিয়ন্ত্রণ ভার দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত থাকে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ইহার তত্ত্বাবধানে বিদেশীয় বিনিময় ব্যাঙ্ক এবং দেশীয় বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রার লেন-দেন কার্যে নিযুক্ত আছে।

৭। **বাণিজ্য চুক্তি (Trade Agreement) :** বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির দ্বারাও বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

৮। **রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা (State Trading Corporation) :** এরূপ সংস্থা স্থাপন এবং উহার মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার দ্বারাও বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ভারতের State Trading Corporation এরূপ একটি সংস্থা।

পণ্য আমদানী-রপ্তানীর বিভিন্ন পদ্ধতি (Different methods of Imports and Exports of Goods)

যে জিনিস যে দেশে উৎপন্ন হয় না এবং বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে তাহা ব্যক্তিবিশেষের সামান্য প্রয়োজন মিটাইতে হইলে তাহার পক্ষে সরাসরি বিদেশ হইতে উক্ত জিনিস আমদানী করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও শ্রমসাধ্য। এজন্য দেশের মধ্যে অনেক 'আমদানী-সংস্থা' গড়িয়া উঠে এবং উহারা প্রয়োজনীয় জিনিস প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। এই সংস্থাগুলি

সাধারণত নিম্নলিখিত তিনটির যে-কোন একটি উপায় অবলম্বন করিয়া প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানী করিতে পারে :

(১) সরাসরি উৎপাদকের নিকট হইতে জিনিসের অর্ডার দিয়া।

(২) অনেকক্ষেত্রে উৎপাদক সরাসরি জিনিস রপ্তানী না করিয়া উক্ত কার্যের ভার বিভিন্ন সংস্থার মারফত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সে অবস্থায় আমদানীকারককে মাল আমদানীর জন্য উক্ত প্রকার কোনও সংস্থার নিকট অর্ডার পেশ করিতে হয়।

(৩) বিদেশে আবার অনেক 'ক্রয় তদারক প্রতিনিধি' (Commission Agent) থাকেন। ইহারা বিদেশী আমদানীকারকের পক্ষ হইয়া মাল খরিদ করেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে উহা আমদানীকারকের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। একাজে দস্তুরীই তাঁহাদের পারিশ্রমিক। আমদানীকারক ইহাদের মারফতও মাল আমদানীর ব্যবস্থা করিতে পারেন।

উপরি-উক্ত যে-কোন পন্থাই অবলম্বন করা হউক না কেন, মাল আমদানী-রপ্তানীর জন্য কতকগুলি খুঁটিনাটি ব্যাপার ও আইন-কানুনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। উহাদের পৃথক আলোচনা হইতে সে সম্বন্ধে বিশদ-বিবরণ জানিতে পারা যাইবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার দলিলপত্র (Different kinds of Documents used in Foreign Trade)

আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের বিশদ বিবরণ জানিতে হইলে উহাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন দলিলপত্রাদির পরিচয় জানা আবশ্যক। নিম্নে উহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল :

(১) **অর্ডার (Order) :** আমদানীকারক কোন মাল আমদানী করার প্রয়োজন বোধ করিলে মালের বিবরণ, পরিমাণ, মূল্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ রপ্তানীকারককে জানাইতে হয়। যে পত্রে উক্ত সংবাদ জানানো হইয়া থাকে তাহাকে 'অর্ডার' বলে। 'অর্ডার' দেওয়া না হইলে যেমন মাল আমদানী হয় না তেমনই আবার 'অর্ডার' না পাইলে রপ্তানীকারকের পক্ষে মাল পাঠানো সম্ভব হয় না। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিক্রেতা নিকটে থাকিলে ক্রেতা সেখানে গিয়া হয়ত মুখে মালের অর্ডার দিতে পারেন কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যে লিখিত অর্ডার অত্যাবশ্যক।

(২) **ঋণের নিদর্শনপত্র (Letter of Credit) :** 'অর্ডার' অনুযায়ী রপ্তানীকারক মাল পাঠাইয়া উহার মূল্য-প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহাকে নিশ্চিত হইতে হইলে 'ঋণের নিদর্শনপত্র' ব্যবহৃত হয়। এজন্য আমদানীকারককে তাঁহার নিজ দেশের কোনও ব্যাঙ্কের সহিত এরূপ ব্যবস্থা করিতে হয় যাহাতে উক্ত ব্যাঙ্ক রপ্তানীকারক দেশের কোনও ব্যাঙ্কের সহিত এরূপ বন্দোবস্ত করে, যাহার ফলে রপ্তানীকারক তাঁহার নিজ দেশের উক্ত ব্যাঙ্কে প্রেরিত মালের রসিদ ও অন্যান্য দলিল জমা দিয়া তথা হইতে প্রয়োজনীয় টাকা পাইতে পারেন। আমদানীকারকের পক্ষ হইতে বিদেশস্থ ব্যাঙ্ক রপ্তানীকারককে পণ্যের মূল্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া যে পত্র প্রেরণ করে তাহাকে

'ঋণের নিদর্শনপত্র' বলে। জাহাজে মাল পাঠানো হইলে রপ্তানীকারক এই প্রতিশ্রুতি-পত্রের বলে উক্ত মালের রসিদাদি উক্ত ব্যাঙ্কে জমা দিয়া 'বাণিজ্য-হুণ্ডি' অগ্রিম ভাঙ্গাইয়া (discount) লইতে পারেন।

ব্যাঙ্কে হুণ্ডি ভাঙ্গাইবার সময় নিম্নলিখিত দলিলগুলি জমা দিতে হয়:

(১) মালের চালান (Invoice)—একাধিক প্রতিলিপি।

(২) চালানী রসিদ (Bill of Lading)—একাধিক প্রতিলিপি।

(৩) নৌ বীমাপত্র (Marine Insurance Policy)।

(৪) বাণিজ্যদূতের চালান (Consular Invoice)।

(৫) প্রভব-লেখ (Certificate of Origin)।

উপরি-উক্ত দলিলগুলিকে এককথায় মালের স্বত্বের দলিল (Documents of Title to Goods) বলে। এই দলিলগুলি জাহাজ হইতে মাল খালাস করিবার জন্য প্রয়োজন।

সুতরাং এই ঋণের নিদর্শনপত্রের ব্যবস্থা আমদানীকারককে করিতে হয় এবং রপ্তানীকারকও উক্ত পত্র পাইলে তাহার পক্ষে মালের টাকা পাওয়ার কোন অসুবিধা হয় না। 'ঋণের নিদর্শনপত্রের' ব্যবস্থা বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের পরম সহায়ক। ইহার সাহায্যে অপরিচিত নূতন ব্যবসায়ীও অনায়াসে বিদেশ হইতে মাল আমদানী করিতে পারেন। এই পত্রের শর্ত অনুযায়ী 'ঋণ' বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে। যেমন,

(ক) অনুমোদনসাপেক্ষ ঋণ, (খ) অনুমোদনীয় ঋণ, (গ) দলিলপত্র দাখিল-সাপেক্ষ ঋণ, (ঘ) দলিল গ্রহণসাপেক্ষ ঋণ, (ঙ) নির্দিষ্ট ঋণ ইত্যাদি।

(৩) বাণিজ্য হুণ্ডি (Bill of Exchange) : ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত দেনা-পাওনা মিটাইতে এই দলিল ব্যবহৃত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে যখন এই দলিল ব্যবহৃত হয় তখন রপ্তানীকারক এরূপ দলিল লিখিয়া থাকেন। ইহাতে রপ্তানীকারক নির্দিষ্ট সময় অন্তে আমদানীকারককে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়া থাকেন। মালের দলিলের সহিত ইহা জমা দিয়া রপ্তানীকারক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অগ্রিম টাকা গ্রহণ করেন। ব্যাঙ্ক হইতে এরূপ অগ্রিম টাকা গ্রহণ করাকে হুণ্ডি ভাঙ্গান (discount) বলে। ব্যাঙ্ক অবশ্য উক্ত দলিল দেখাইয়া পরে আমদানীকারকের নিকট হইতে টাকা পাইয়া থাকে। সুতরাং নির্দিষ্ট সময় অন্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার সর্তনিরপেক্ষ নির্দেশপত্রকে বাণিজ্য-হুণ্ডি (Bill of Exchange) বলে। ইহাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা হুণ্ডির বাহককে টাকা দিবার নির্দেশ থাকে এবং নির্দেশদাতার সহি থাকে। 'বাণিজ্য-হুণ্ডি' আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় বাণিজ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৪) বন্ধকী পত্র (Letter of Hypothecation) : অনেকক্ষেত্রে 'বাণিজ্য-হুণ্ডি' অগ্রিম ভাঙ্গাইবার সময় ব্যাঙ্ক আমদানীকারকের নিকট হইতে উক্ত হুণ্ডির টাকা পাওয়া সম্বন্ধে জামিনস্বরূপ কোন কিছু রপ্তানীকারকের নিকট হইতে দাবী করিতে

পারে। 'বন্ধকী পত্র' দ্বারা উক্ত জামিন পূরণ হইতে পারে। যে পত্র দ্বারা ব্যাঙ্কের নিকট মাল বন্ধক রাখা হয় তাহাকে 'বন্ধকী পত্র' বলে। ব্যাঙ্ক যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার প্রাপ্য টাকা না পায় তবে উক্ত 'বন্ধকী পত্রের' ক্ষমতাবলে মাল বিক্রয় বা অন্য কোন উপায় দ্বারা প্রাপ্য টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অগ্রিম টাকা লওয়ার প্রয়োজন হইলে বন্ধকী পত্রের (Letter of Hypothecation) সাহায্যে উহা পাওয়া যাইতে পারে।

(৫) জাহাজের সহ-অধ্যক্ষের রসিদ (Mate's Receipt): জাহাজে মাল তুলিয়া দেওয়ার পর উক্ত মালের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া জাহাজের সহ-অধ্যক্ষ কিংবা অন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী রপ্তানীকারককে একখানা রসিদ দিয়া থাকেন। উক্ত রসিদকে 'জাহাজের সহ-অধ্যক্ষের রসিদ' (Mate's Receipt) বলে। ইহা কাঁচা রসিদ। ইহা দ্বারা মালবহনের কোন দায়িত্ব জাহাজের মালিক গ্রহণ করেন না। জাহাজ কোম্পানীর অফিসে উক্ত রসিদ জমা দিয়া মালবহনের পাকা রসিদ অর্থাৎ 'চালানী রসিদ' (Bill of Lading) গ্রহণ করা হয়।

(৬) রপ্তানী চালান (Export Invoice): জাহাজে মাল বোঝাই করার পূর্বে যে মাল পাঠানো হইল তাহার বিস্তৃত বিবরণ, ওজন, মূল্য, আমদানীকারকের নাম, ঠিকানা প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া একখানা বিবরণী (Statement) প্রস্তুত করিতে হয়। উহাকে 'রপ্তানী চালান' (Export Invoice) বলে। উক্ত 'চালান' দেখিয়া আমদানীকারক মাল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব বিষয় জানিতে পারেন।

(৭) চালানী রসিদ বা বহনপত্র (Bill of Lading): জাহাজে মাল বোঝাই হইলে জাহাজের কর্মচারিগণ উক্ত মাল পরীক্ষা করিয়া উহার 'মাশুল' (Freight) স্থির করেন। অতঃপর রপ্তানীকারককে উক্ত মাশুল দিতে হয় কিংবা তজ্জন্য অন্য কোনো বন্দোবস্ত করিতে হয়। মালের 'চালান' (Invoice) এবং 'জাহাজের সহ-অধ্যক্ষের রসিদ' (Mate's Receipt) জমা দিলে মালবহনের পাকা রসিদ বা 'চালানী রসিদ' পাওয়া যায়। যে রসিদে জাহাজের নাম, মাল বোঝাইয়ের স্থান, গন্তব্যস্থল, উহার বিস্তৃত বিবরণ ও মাশুল, প্রাপকের নাম ও ঠিকানা প্রভৃতির উল্লেখ থাকে এবং যাহার দ্বারা জাহাজের মালিক উক্ত রসিদে উল্লিখিত চুক্তির শর্তানুযায়ী গন্তব্যস্থলে মাল পৌছাইয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহাকে 'চালানী রসিদ' (Bill of Lading) বলে। এই 'চালানী রসিদ' আমদানীকারককে পাঠাইতে হয়। কারণ এই 'চালানী রসিদ' দাখিল না করিলে জাহাজ হইতে মাল খালাস করা যায় না। 'বাণিজ্য-হুণ্ডির' অগ্রিম টাকা গ্রহণ করিবার সময় এই রসিদ আমদানীকারককে পাঠানোর জন্য ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয়। আর ঐ রসিদ জমা না দিলে ব্যাঙ্ক রপ্তানীকারককে টাকা প্রদান করে না।

(৮) নৌ বীমাপত্র (Marine Insurance Policy): সমুদ্রপথে আকস্মিক

বিপদ-আপদের ফলে জাহাজে প্রেরিত মাল নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। এই ক্ষয়-ক্ষতির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মালের নৌ বীমা করা প্রয়োজন। রপ্তানীকারক মালের এরূপ নৌ বীমা করাইয়া থাকেন। 'বীমা-মাশুলের' (Premium) বিনিময়ে নৌ বীমা কোম্পানী যে ক্ষয়-ক্ষতি বহন করার চুক্তিপত্র দিয়া থাকে উহাকে 'নৌ বীমাপত্র' (Marine Insurance Policy) বলে। মালের 'চালানী রসিদ' ও 'চালানের' সহিত 'নৌ বীমাপত্রও' আমদানীকারককে পাঠাইতে হয়। সমুদ্রপথে মালের কোন ক্ষতি হইলে উক্ত 'বীমাপত্রের' বলে আমদানীকারক নৌ বীমা কোম্পানী হইতে ক্ষতিপূরণ পাইয়া থাকেন।

(৯) **বাণিজ্যদূতের চালান (Consular Invoice) :** আমদানীকারক দেশের বাণিজাস্বার্থের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনেক দেশ হইতে বিদেশে 'বাণিজ্যদূত' (Consul) প্রেরণ করা হয়। রপ্তানীকারক মালের চালান প্রস্তুত করিয়া উহা আমদানীকারক দেশের বাণিজ্যদূতের অফিসে পেশ করিলে উক্ত মালের সত্যতা স্বীকার করিয়া বাণিজ্যদূত যে 'সাক্ষ্যপত্র' (Certificate) দিয়া থাকেন তাহাকে 'বাণিজ্যদূতের চালান' (Consular Invoice) বলে। উক্ত 'বাণিজ্যদূতের চালান' আমদানীকারককে পাঠাইতে হয়। এই 'চালান' থাকিলে আমদানীকারককে মালের 'আমদানী শুল্ক' (Import Duty) প্রদান সম্পর্কে কোন বেগ পাইতে হয় না এবং মালের শুল্ক ফাঁকি দেওয়া সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠে না। 'বাণিজ্যদূতের চালান' পাইতে হইলে 'বাণিজ্যদূত'কে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। উক্ত দক্ষিণাকে 'বাণিজ্যদূতীয় দক্ষিণা' (Consulage) বলে।

(১০) **প্রভব-লেখ (Certificate of Origin) :** যখন মালের শুল্ক সম্পর্কে কোন সুবিধা (Preference) পাওয়ার প্রয়োজন হয় তখন এরূপ পত্রের প্রয়োজন হয়। যে পত্রে রপ্তানীকারক মালের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি জানান এবং উক্ত পত্রে স্থানীয় কোন বণিক সঙ্ঘ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা উক্ত স্বীকারোক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় তাহাকে 'প্রভব-লেখ' (Certificate of Origin) বলে। প্রয়োজন-বোধে এরূপ 'প্রভব-লেখও' আমদানীকারককে পাঠাইতে হয়। উক্ত প্রভব-লেখের বলে আমদানীকারক শুল্ক সম্বন্ধে সুবিধা পাইয়া থাকেন।

উপরি-উক্ত দলিলপত্রাদি রপ্তানীকারককে সংগ্রহ বা প্রস্তুত করিতে হয় এবং আমদানীকারককে পাঠাইতে হয়। আমদানীকারক উক্ত দলিলগুলির বলে মাল খালাস, শুল্কপ্রদান প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

(১১) **দলিলী হুণ্ডি (Documentary Bill) :** রপ্তানীকারক জাহাজে মাল পাঠানোর পর ব্যাঙ্ক মারফত 'বাণিজ্য-হুণ্ডির' সহিত চালান, চালানী রসিদ, নৌ বীমাপত্র, বাণিজ্যদূতের চালান, প্রভব-লেখ প্রভৃতি আমদানীকারককে পাঠাইয়া থাকেন। এরূপ হুণ্ডিকে 'দলিলী হুণ্ডি' (Documentary Bill) বলে। ইহা আবার দুই প্রকারের হইতে পারে—(১) 'স্বীকৃতি সাপেক্ষ দলিল' (Documents against

Acceptance—D. A.) এবং (২) 'পরিশোধ সাপেক্ষ দলিল' (Documents against Payment—D.P.)। এই হুণ্ডির সহিত যে দলিলগুলি থাকে তাহাকে এক কথায় 'স্বত্বের দলিল' (Documents of Title) বলে। এই দলিলগুলি ভিন্ন জাহাজ হইতে মাল খালাস, নির্বিবাদে শুল্কপ্রদান, ক্ষয়-ক্ষতির জন্য নৌ বীমা কোম্পানীর নিকট ক্ষতিপূরণ পাওয়া ইত্যাদি কোনটাই সম্ভব নয়। সুতরাং আমদানীকারককে ব্যাঙ্ক হইতে এই দলিলগুলি লইতে হয়। উহা যদি 'স্বীকৃতি সাপেক্ষ দলিল' (Documents against Acceptance) হয় তবে হুণ্ডিতে স্বীকৃতি দিয়া দলিলগুলি লইতে হয়। যদি উহা 'পরিশোধ সাপেক্ষ দলিল' (Documents against Payment) হয় তবে হুণ্ডির টাকা পরিশোধ করিয়া দলিলগুলি লইতে হয়।

(১২) **শুল্ক অফিসে দাখিলী পণ্যের তালিকা (Bill of Entry):** জাহাজ বন্দরে আসিয়া পৌঁছাইলে উক্ত মাল খালাস করিবার পূর্বে আমদানীকারককে মালের বিস্তৃত বিবরণ শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হয়। উহাকে শুল্ক অফিসে 'দাখিলী পণ্যের তালিকা' (Bill of Entry) বলে। মালের বিস্তৃত বিবরণ মাল পর্যবেক্ষণের পূর্বে সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব না হইলে 'Bill of Sight' নামে একটি দলিল দাখিল করিলেও চলে। এক্ষেত্রে মাল পর্যবেক্ষণের পর অবশ্য 'Bill of Entry' পূরণ করিতে হয়। শুল্ক নির্ধারণের জন্যই Bill of Entry-র প্রয়োজন।

(১৩) **জাহাজী রিপোর্ট (Ship's Report):** জাহাজ বন্দরে পৌঁছাইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের অধ্যক্ষকে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট এই রিপোর্ট দাখিল করিতে হয়। ইহাতে জাহাজের নাম, উহার বহন ক্ষমতা, অধ্যক্ষের নাম, জাহাজে রেজেস্ট্রীকৃত বন্দরের নাম, লস্করের সংখ্যা, যে বন্দরে মাল বোঝাই হইয়াছে তাহার নাম, এই বন্দরের পূর্বে যে বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়াছিল তাহার নাম, মালের বিস্তৃত বিবরণ, মাল প্রাপকদের নামের তালিকা, জাহাজের অধ্যক্ষ ও লস্করদের ব্যবহার্য ও অন্যান্য মাল যাহার জন্য শুল্ক প্রদেয় তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রভৃতি এই রিপোর্টে লিখিয়া দিতে হয়। এই রিপোর্ট দাখিল না করিলে জাহাজ হইতে মাল খালাস করিতে দেওয়া হয় না। ভুল রিপোর্ট দাখিল করিলে এবং তাহাতে তঞ্চকতা প্রকাশ পাইলে তজ্জন্য জাহাজ বা মাল আটক হইতে পারে এবং অধ্যক্ষকে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইতে পারে।

বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী করার নিয়ম (Formalities to be observed in importing goods from Foreign Countries)

যে প্রকার পণ্য বা মালই হউক না কেন সমুদ্রপথে বিদেশ হইতে উহা আমদানী করিতে হইলে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত পন্থা গ্রহণ ও আইন-কানুন পালন করিতে হয়:

(১) **লাইসেন্স (Licence):** বর্তমানে অনেক দেশেই বৈদেশিক বাণিজ্য সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ভারতেও বৈদেশিক বাণিজ্য সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

অনেক জিনিসের আদানী নিষিদ্ধ। এজন্য যে জিনিস আমদানী করিতে হইবে তাহার জন্য সর্বপ্রথমে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে।

(২) **অর্ডার (Order) ঃ** লাইসেন্স পাওয়ার পর রপ্তানীকারকের নিকট মালের বিস্তৃত বিবরণসহ মালের 'অর্ডার' পেশ করিতে হইবে। গোপনীয়তা রক্ষা করার ইচ্ছা থাকিলে 'অর্ডারে' সাঙ্কেতিক ভাষা'(Code Language) ব্যবহার করা চলে। রপ্তানী-কারককে মালের জন্য কিছু অগ্রিম দিতে হইবে, না মাল পৌঁছাইলে মূল্য পরিশোধ করিলে চলিবে ইত্যাদি সম্বন্ধে পত্র-বিনিময় দ্বারা সব কিছু মীমাংসার প্রয়োজন।

(৩) **ঋণের নিদর্শনপত্র (Letter of Credit) ঃ** মালের মূল্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধেও রপ্তানীকারকের সংশয় দূর করিবার জন্য তাহাকে ব্যাঙ্ক মারফত 'ঋণের নিদর্শনপত্র' (Letter of Credit) দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। উক্ত 'ঋণের নিদর্শনপত্রের' বলে রপ্তানীকারক মালের চালান, চালানী রসিদ, নৌ বীমাপত্র এবং প্রয়োজনবোধে বাণিজ্যদূতের চালান, প্রভব-লেখ প্রভৃতি ব্যাঙ্কে জমা দিয়া বাণিজ্য-হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া লইতে পারেন।

(৪) **বিনিময়হার বুকিং (Exchange Booking) ঃ** মালের 'অর্ডার' দেওযা সম্পূর্ণ হইলে উহার সহিত 'মুদ্রার বিনিময় হার' (Exchange Rate) স্থির করিয়া লওয়া উচিত। তাহা হইলে পরে বিনিময় হারের রদবদল হইলে কাহারও কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

(৫) **বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি (Availability of Foreign Exchange) :** বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতাহেতু অনেক দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তাহার জন্য সরকারের নিকট হইতে অনুমোদন লাভ করিতে হয়। এই নিয়ম ভারত সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সুতরাং কেবল মুদ্রার বিনিময় হার স্থির করিলে চলিবে না উহা প্রয়োজমত পাওযা যাইবে কিনা তজ্জন্য অনুমোদন লাভ প্রয়োজন।

(৬) **দলিল প্রাপ্তি (Receipt of Documents) ঃ** উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলি যথাযথ সম্পন্ন হওযার পর যে জাহাজে মাল প্রেরিত হইয়াছে তাহার পৌঁছানোর অপেক্ষায় থাকিতে হয়। ইহা ছাড়া, যে সমস্ত দলিল জাহাজ হইতে মাল খালাসের জন্য প্রয়োজন তাহাও রপ্তানীকারকের নিকট হইতে পাইতে হইবে। এই দলিলগুলি যেমন, চালান (Invoice), চালানী রসিদ (Bill of Lading), নৌ বীমাপত্র (Marine Insurance Policy) ও বাণিজ্য-হুণ্ডি (Bill of Exchange) এবং প্রয়োজন হইলে বাণিজ্যদূতের চালান (Consular Invoice) ও প্রভব-লেখ (Certificate of Origin) সব কিছু যে ব্যাঙ্কে রপ্তানীকারক হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়াছে সেই ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখা অফিস বা প্রতিনিধির নিকট হইতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখা অফিস বা প্রতিনিধির নিকট উক্ত দলিলাদি পৌঁছাইলে আমদানীকারককে সংবাদ দেওয়া হয়। আমদানীকারক উক্ত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ার পর ব্যাঙ্কে গিয়া 'বাণিজ্য-হুণ্ডিতে' স্বীকৃতি দেওয়ার শর্ত থাকিলে 'স্বীকৃতি' দিয়া বা মূল্য পরিশোধ

করার শর্ত থাকিলে মূল্য 'পরিশোধ' করিয়া উক্ত দলিলপত্রাদি গ্রহণ করেন। টাকা পরিশোধে অক্ষম হইলে ব্যাঙ্ককে একখানা 'বন্ধকী-পত্র' (Letter of Hypothecation) লিখিয়া দিলেও দলিলখানা পাওয়া যায়।

(৭) **মাল খালাস (Release of Goods) :** দলিল প্রাপ্তির পর জাহাজ আসিয়া বন্দরে পৌছাইলে জাহাজ হইতে মাল খালাসের জন্য তৎপর হইতে হইবে। মালের 'আমদানী শুল্ক' (Import Duty) দেওয়ার প্রয়োজন থাকিলে উহা প্রথমত শুল্ক অফিসে জমা দিতে হইবে। আমদানীকৃত জিনিসের বিস্তৃত বিবরণ Bill of Entry-তে লিখিয়া শুল্ক অফিসে দাখিল করিতে হয়। মালের সঠিক বিবরণ জানা না থাকিলে Bill of Sight-এ লিখিয়া দিতে হয়। শুল্ক নির্ধারণের জন্য Bill of Entry দাখিলের পর জাহাজে চালানী রসিদ দেখাইয়া মাল খালাস করিয়া আমদানীকারকের গুদামে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৮) **বন্ধকী গুদামে মাল (Goods in Bonded Warehouse) :** মাল খালাসের সময় শুল্ক দেওয়া সম্ভব না হইলে গুদাম ভাড়া দিয়া শুল্ক বিভাগের 'বন্ধকী গুদামে' (Bonded Warehouse) সাময়িকভাবে মাল জমা রাখিতে হইবে এবং ক্রমে ক্রমে শুল্ক দিয়া উক্ত গুদাম হইতে মাল লইতে হইবে।

(৯) **ব্যাঙ্কের সাহায্য (Bank Accommodation) :** শুল্ক ইত্যাদি দিতে অক্ষম হইলে ব্যাঙ্ককে মালের 'বন্ধকী-পত্র' দিলে ব্যাঙ্ক মাল খালাস ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করে। তখন ব্যাঙ্কে ক্রমে ক্রমে টাকা জমা দিয়া মাল ব্যাঙ্কের হেপাজতে রক্ষিত স্থান হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(১০) **মাল খালাস প্রতিনিধির সাহায্য (Assistance of Clearing Agent) :** জাহাজ হইতে মাল খালাসের হাঙ্গামা আমদানীকারক নিজে গ্রহণ করিতে না চাহিলে 'মাল খালাস প্রতিনিধি'র (Clearing Agent) সাহায্যে উহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে।

(১১) **লেন-দেনের পরিসমাপ্তি (Closing of the Transaction) :** অর্ডার অনুযায়ী মাল পাইলে এরূপ কোন নির্দিষ্ট মাল আমদানী ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটে। অর্ডার অনুযায়ী না হইলে, ওজনে কম হইলে কিংবা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলে উহা সমাধানের জন্য রপ্তানীকারকের সহিত পত্রবিনিময় প্রয়োজন হয়।

(১২) **ক্ষতিপূরণ দাবী (Claim for Compensation) :** আকস্মিক বিপদে জাহাজে মালের কোন ক্ষতি হইলে নৌ বীমাকারী কোম্পানীর নিকট উহার দাবী উপস্থিত করিয়া ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিতে হয়।

বিদেশে মাল রপ্তানীর পদ্ধতি (Procedure to be followed in Exporting goods to a Foreign Country)

যে প্রকারের মালই হউক না কেন সমুদ্রপথে উহা রপ্তানী করিতে হইলে রপ্তানীকারককে সাধারণত নিম্নলিখিত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় :

(১) **অর্ডার (Order) ঃ** প্রথমত, রপ্তানীকারককে আমদানীকারকের নিকট হইতে মালের বিস্তৃত বিবরণসহ **অর্ডার (Order)** পাইতে হইবে। অর্ডার মনোমত হইলে মাল পাঠানোর পরবর্তী পন্থা গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা পত্র বা তার বিনিময় দ্বারা 'অর্ডার' গ্রহণযোগ্যের সুরাহা করিয়া লইতে হয়। আমদানীকারক নূতন প্রতিষ্ঠান হইলে মালের মূল্য বাবদ কিছু টাকা অগ্রিমও রপ্তানীকারক চাহিতে পারেন।

(২) **ঋণের নিদর্শনপত্র (Letter of Credit) :** মালের মূল্যপ্রাপ্তি সম্পর্কে যাহাতে নিঃসংশয় হইতে পারেন তজ্জন্য রপ্তানীকারককে আমদানীকারকের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক মারফত **ঋণের নিদর্শনপত্র (Letter of Credit)** পাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়।

(৩) **বিনিময় হার নির্ধারণ (Exchange Booking) :** কোন কারণে মুদ্রার **বিনিময় হারের (Exchange Rate)** পরিবর্তন হেতু যাহাতে কোন লোকসান ভোগ করিতে না হয় তজ্জন্য পূব হইতেই মূল্য পরিশোধের সময় মুদ্রার বিনিময় হার কি হইবে তাহা স্থির করিয়া লওয়া উচিত।

(৪) **জাহাজে স্থান সংরক্ষণ (Reservation of Shipping Accommodation) ঃ** নির্দিষ্ট সময়ে মাল প্রেরণের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তজ্জন্য জাহাজ কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া পূর্বেই **জাহাজে স্থান সংরক্ষণ** করিয়া রাখিতে হয়। জাহাজে এই স্থান সংরক্ষণ দুই প্রকার চুক্তির ভিত্তিতে হইতে পারিবে। প্রথমটি জাহাজে মাল প্রেরণের বর্তমান চুক্তি। যখন জাহাজ শীঘ্রই সমুদ্রযাত্রা করিতেছে এবং রপ্তানীযোগ্য মালও তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে তখন তাহাকে বলা হয় **Ready Shipment.** এরূপ Ready Shipment-এর জন্যও স্থান সংরক্ষণের চুক্তি হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে জাহাজে মাল প্রেরণের অগ্রিম চুক্তি। রপ্তানীযোগ্য মাল যখন তৈয়ারী হইতে কিছুটা বিলম্ব হয় তজ্জন্য মাল পাঠাইতে যখন কিছুটা সময় অতিবাহিত হইবে তখন তাহাকে বলা হয় **Forward Shipment.** এরূপ Forward Shipment-এর জন্যও পূর্বেই অগ্রিম চুক্তি দ্বারা জাহাজে স্থান সংরক্ষণ করা চলে।

(৫) **পণ্য মোড়াই (Packing of Goods) ঃ** উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণ হইলে পণ্য বা **মাল বাছাই, মোড়াই** প্রভৃতি সতর্কতার সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। মোড়াইয়ের উপর **প্রাপকের নাম, ঠিকানা** প্রভৃতিও পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে। ইহার পর জাহাজে মাল বোঝাই করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাল জাহাজঘাটায় রেল, লরি বা নৌকায় প্রেরণ করা যাইতে পারে। রেলে মাল পাঠাইতে হইলে উহাতে মাল বুক করার নিয়মগুলি অনুসরণ করিতে হইবে। রপ্তানী-তদারক প্রতিনিধি (Forwarding or Shipping Agent) মারফত মাল পাঠাইতে হইলে তাহাকে এ সম্বন্ধে উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন। মাল বাছাই করার পর

প্রয়োজনীয় কয়েক কপি (সাধারণত ৪ কপি) চালান (Invoice) প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত।

(৬) শুল্ক বিভাগীয় চালান (Customs House Challan): মাল জাহাজে বোঝাই করার পূর্বে Collector of Customs-এর নিকট হইতে একখানা অনুমতিপত্র লওয়া প্রয়োজন। এজন্য **শুল্ক বিভাগীয় একখানা চালান Customs House Challan)** রপ্তানীকারককে পূরণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া সরকারের নিকট হইতে রপ্তানী অনুমতিপত্র (Export Licence) এবং রপ্তানী ঘোষণাপত্র (Export Declaration)-ও শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হয়।

শুল্ক বিভাগীয় চালানকে **জাহাজী বিল (Shipping Bill)**-ও বলা হয়। ইহাতে মালের বিশদ বিবরণ, অর্থাৎ উহার বিশেষ চিহ্ন ও সংজ্ঞা, পরিমাণ, মূল্য ইত্যাদি, যে দেশে প্রেরিত হইতেছে উহার নাম, যে জাহাজে প্রেরিত হইবে তাহার নাম, যে বন্দরে মাল খালাস হইবে উহার নাম প্রভৃতি থাকে। যে মাল রপ্তানী হইবে উহার উপরে শুল্ক ধার্য হইবে কিনা উহা লিপিবদ্ধ (Noting) করা এবং শুল্ক দেয় হইলে উহা প্রদানের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যেই এই চালান রচিত হয়। ইহার তিন কপি প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার প্রপত্র (form) শুল্ক অফিস হইতে পাওয়া যায়।

(৭) ওজনের প্রমাণপত্র (Certificate of Weighment): মাল জাহাজে বোঝাই করার পূর্বে মালগুলি ওজন করারও প্রয়োজন। এই ওজনের কাজ করিবার জন্য শুল্ক বিভাগের পৃথক ব্যবস্থা আছে। মাল ওজন করার পর **'ওজনের প্রমাণপত্র' (Certificate of Weighment)** লওয়া থাকিলে মালের মাশুল, শুল্ক প্রভৃতি স্থির করা সহজসাধ্য হয় এবং ঝামেলা অনেক কমিয়া যায়।

(৮) শুল্ক প্রদান (Payment of Duties): মাল ওজন করার পর শুল্ক বিভাগে উক্ত মালের বিবরণ দাখিল করিতে হয়। সেখানে প্রয়োজনীয় 'রপ্তানী শুল্ক' (Export Duty এবং জাহাজ ঘাটার ভাড়া (Dock Charges) দেওয়ার পর জাহাজে মাল বোঝাই করার ছাড়পত্র পাওয়া যায়।

(৯) সহ-অধ্যক্ষের রসিদ (Mate's Receipt): উক্ত ছাড়পত্র লইয়া জাহাজে মাল বোঝাই করিতে হয়। জাহাজে মাল বোঝাই করা হইলে জাহাজের 'সহ-অধ্যক্ষের রসিদ' (Mate's Receipt) পাওয়া যায়। উহা জাহাজে মাল বোঝাইয়ের স্বীকারপত্র।

(১০) চালানী রসিদ (Bill of Lading): সহ-অধ্যক্ষের রসিদ ও মালের 'চালান' (Invoice) জাহাজ কোম্পানীর অফিসে জমা দিলে এবং মালের মাশুল (Freight) ও প্রাইমেজ (Primage) অর্থাৎ মাল বোঝাই তদারক খরচ প্রদান করিলে প্রয়োজনীয় চালানী রসিদ (Bill of Lading) পাওয়া যায়। উহাই জাহাজে মালবহনের চুক্তিপত্র। চালানী রসিদও অন্তত ৩।৪ কপির প্রয়োজন।

(১১) নৌ বীমা (Marine Insurance) : সমুদ্রপথে আকস্মিক বিপদে মাল বিনষ্ট হইলে যাহাতে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় তজ্জন্য মালগুলির নৌ-বীমা করা প্রয়োজন। 'চালানী রসিদ' ও মালের 'চালান' নৌ-বীমা অফিসে দাখিল করিলে উহা পরীক্ষা করিয়া বীমা-মাশুলের (Premium) বিনিময়ে নৌ বীমাপত্র (Marine Insurance Policy) পাওয়া যায়।

(১২) অন্যান্য দলিল (Other Documents) : প্রয়োজনবোধে ইহার 'বাণিজ্যদূতের চালান' (Consular Invoice) এবং প্রভব-লেখ (Certificate of Origin) সংগ্রহ করিতে হয়। তাহার পর মালের টাকাপ্রাপ্তির জন্য 'বাণিজ্য-হুণ্ডি' (Bill of Exchange) প্রস্তুত করিতে হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে উহাও তিন কপি প্রস্তুত করার প্রয়োজন। 'বাণিজ্য-হুণ্ডি' স্বীকৃতি সাপেক্ষ (Against Acceptance) কিংবা পরিশোধ সাপেক্ষ (Against Payment) হইতে পারে।

(১৩) মাল প্রেরণ (Despatch of Goods) : ইহার পর চালান, চালানী রসিদ, নৌ বীমাপত্র, বাণিজ্যদূতের চালান, প্রভব-লেখ প্রভৃতি আমদানীকারকবে পাঠাইতে হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে উহা ব্যাঙ্কের মারফত পাঠানোর নিয়ম একত্রে ঐ দলিলগুলিকে বলা হয় 'মালের স্বত্বের দলিল' (Documents o title to goods)। মালের মূল্য অগ্রিম পাইতে হইলে এবং 'ঋণের নিদর্শনপত্রে ব্যবস্থা থাকিলে 'মালের স্বত্বের দলিলগুলি' ব্যাঙ্কে জমা দিয়া 'বাণিজ্য-হুণ্ডি' ভাঙ্গাইয়া লইতে হয়।

(১৪) বাণিজ্য-হুণ্ডি ভাঙ্গান (Discounting of Bill of Exchange
'বাণিজ্য-হুণ্ডি' ভাঙ্গাইবার পর রপ্তানীকারকের আর কিছু করণীয় নাই। ইহার রপ্তানীকারকের দেশস্থ ব্যাঙ্ক স্বত্বের দলিলসহ 'বাণিজ্য-হুণ্ডি' আমদানীকারকের দে উহার প্রতিনিধি বা শাখা ব্যাঙ্কের নিকট প্রেরণ করে। উক্ত ব্যাঙ্ক আমদানীকারক 'মালের স্বত্বের দলিল' দিয়া মালের মূল্য গ্রহণের ব্যবস্থাও করে। হুণ্ডি 'স্বীকৃতি সাপেক্ষ' হইলে হুণ্ডি স্বীকারের পর এবং 'পরিশোধ সাপেক্ষ' হইলে হুণ্ডির টাকা দেওয়ার পর আমদানীকারককে স্বত্বের দলিল দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক অবশ্য 'হুণ্ডি' ভাঙ্গাইবা সময় রপ্তানীকারকের নিকট হইতে মালের বন্ধকী পত্র (Letter of Hypothecatio., আদায় করিয়া থাকে। আমদানীকারকের নিকট হইতে টাকা না পাওয়া গেলে 'বন্ধকী-পত্রের' বলে ব্যাঙ্ক মাল বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিতে পারে।

ভারত সরকারের আমদানী নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ব্যবস্থা (Machinery of the Government of India for Controlling Imports)

ভারত সরকারের আমদানী নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ব্যবস্থা নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

ভারতের আমদানী নিয়ন্ত্রণের সর্বাধিনায়ক বাণিজ্য মন্ত্রক (Ministry of Commerce)। বাণিজ্য মন্ত্রীই এই দপ্তরের উচ্চতম কার্যাধ্যক্ষ।

এই মন্ত্রক বা দপ্তর ভারতের আমদানী সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন এবং কোন্ দেশ হইতে কোন্ কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে আমদানী করা যাইতে পারে প্রতি বৎসর উহা ঘোষণা করিয়া থাকেন। আমদানীর নীতি ও পদ্ধতি কার্যকরী করার ভার প্রধান আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের (Chief Controller of Imports and Exports) উপর ন্যস্ত। তাঁহাকে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য ভারতের অনেক বন্দর ও শহরে অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছেন। ইহা ছাড়া সরকারকে আমদানী নিয়ন্ত্রণের সাধারণ নীতি গ্রহণের পরামর্শ দিবার জন্য একটি আমদানী-উপদেষ্টা পরিষদও (Import Advisory Council) আছে। আইন অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্যাদি আমদানী ও রপ্তানী দেখাশুনা ও শুল্কাদি আদায় শুল্ক ও বন্দর কর্তৃপক্ষ করিয়া থাকে।

পণ্য আমদানী করিতে হইলে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ প্রয়োজন। এই আহরণ রপ্তানী ভিন্ন সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমানে রপ্তানী অপেক্ষা আমদানীর পরিমাণ বেশী। সুতরাং আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারে মিতব্যয়িতা প্রয়োজন। এজন্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সাধারণত যে যে পণ্য ভারতে উৎপাদিত পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে উহা আমদানীর জন্য খুব কম অনুমতিপত্র (Licence) দেওয়া হয়। ভোগ্যপণ্য আমদানীর অনুমতিপত্রও বিশেষ বিচার-বিবেচনার পর দেওয়া হয়। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য অত্যাবশ্যকভাবে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধনীয় দ্রব্যাদির আমদানীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সুবিধা বুঝিয়া Soft Currency অঞ্চল হইতে বেশী আমদানীর জন্যই সাধারণত অনুমতিপত্র দেওয়া হয়। যখন Soft Currency অঞ্চল হইতে ঠিকমত প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তখন Hard Currency অঞ্চল হইতে আমদানী করার অনুমতিপত্র দেওয়ার রীতি।

আমদানী নীতি সাধারণত বৎসরে একবার কিংবা দুইবার বিচার-বিবেচনা করা হয়। এইভাবে এক বৎসর বা ছয়মাসে কোথা হইতে কি পরিমাণ দ্রব্যাদি আমদানী করা যাইতে পারে উহা স্থির করা হয়। আমদানীর অনুমতিপত্র দুই প্রকারের। একটি হইতেছে খোলা সাধারণ অনুমতিপত্র (Open General Licence —O.G.L.)। ইহা যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া চলে। দ্বিতীয়টি হইতেছে সীমাবদ্ধ অনুমতিপত্র (Restricted Licence)। ইহা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষকে দেওয়া হয়।

সাধারণভাবে উপরি-উক্ত উপায়ে আমদানী নীতি ও পদ্ধতি কার্যকরী করা হয়।

কোনও ব্যবসায়ী কোন পণ্য আমদানী করিতে ইচ্ছা করিলে উহার আমদানী নিষিদ্ধ কিনা প্রথমে দেখিবেন। আমদানী নিষিদ্ধ না হইলে উহা খোলা সাধারণ আমদানী অনুমতিপত্রের (Open General Licence) কিংবা বিশেষ আমদানী অনুমতিপত্রের (Special Licence) অধীন তাহা দেখিয়া লইবেন। ইহার পর

প্রধান আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের (Chief Controller of Imports and Exports) নিকট অনুমতি চাহিয়া আবেদন করিবেন। অনুমতিপত্র পাইলে রপ্তানীকারকের নিকট অর্ডার পেশ ও প্রয়োজনীয় পত্র বিনিময় দ্বারা পণ্য আমদানীর ব্যবস্থা করিবেন।

আমদানী নিয়ন্ত্রণ (Import Control)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষার উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অগ্রগতি বহুল অংশে নির্ভর করে। ভারতের মত উন্নতিশীল দেশে ইহার প্রয়োজনীয়তা কোন অংশেই কম নহে। কিন্তু ভারতের পক্ষে নানাবিধ কারণে এই ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতে ভারতে বৈদেশিক মুদ্রা সংকট ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে অর্থনৈতিক দুর্গতি চরমে উঠিতে চলিয়াছে। আমদানী বৃদ্ধি এবং রপ্তানী সম্প্রসারণ আশানুরূপ না হওয়ার ফলেই ইহার এরূপ দুর্গতি। মোটের উপর যে সকল কারণের জন্য এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছে উহা সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) ভারত খাদ্যশস্য সম্পর্কে এখনও স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই। ফলে ১৯৫৬ সাল হইতে ক্রমবর্ধমান খাদ্যশস্য আমদানী আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই আমদানীর ফলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা প্রচুর ব্যয় হইতেছে।

(২) খাদ্যসামগ্রী ছাড়া অন্যান্য ভোগ্যসামগ্রী আমদানীও করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইহার ফলে উন্নয়নমূলক ব্যয়ও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এই ব্যয় বৃদ্ধি এবং অধিক মুদ্রা প্রচলনহেতু জনসাধারণের ক্রয়-শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং উহাদের ভোগ্যসামগ্রীর চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সামগ্রীর উৎপাদন চাহিদা অনুযায়ী বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে এই সকল দ্রব্যের আমদানী বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ১৯৫৬ সাল হইতে অনুসৃত সরকারের উদার আমদানী অনুমতিপত্র প্রদান নীতির ফলেও অনেক জিনিসের যেমন, পশমবস্ত্র, রেয়ন, ঘড়ি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতির আমদানী প্রচুর হয়। ফলে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হইয়া যায়।

(৩) উন্নয়নমূলক কার্যাদির জন্য বিদেশ হইতে অনেক যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হয়। প্রতিরক্ষার জন্যও অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমদানী হইয়া থাকে। চীনের আক্রমণ এবং পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধই এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হয়।

(৪) ১৯৫৭ সাল হইতে আমাদের দেশে মুদ্রাস্ফীতি বেশ দ্রুতগতিতেই চলিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে অনেক অত্যাবশ্যক ভোগ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পায়। এজন্য রপ্তানী পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। ফলে অনেক পণ্য রপ্তানীর উপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং আমাদের আশানুরূপ বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ ব্যাহত হয়।

(৫) বিদেশেও মুদ্রাস্ফীতির জন্য প্রয়োজনীয় আমদানী দ্রব্যের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। সুয়েজখালের মধ্য দিয়া জাহাজ চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায়ও আমদানী দ্রব্যের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

(৬) বিদেশে ভারত সরকারের ঋণ পরিশোধের জন্যও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়।

(৭) ভারতীয় মুদ্রা লেন-দেন হয় এরূপ দেশে বাড়তি রপ্তানীর জন্য প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা ঠিকমত না পাওয়াতেও কিছুটা সংকট দেখা দিয়াছে।

(৮) ইহার ফলে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংকটও প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। এই পরিস্থিতি হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পন্থা গৃহীত হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি, আমদানী সংকোচন, রপ্তানী সম্প্রসারণ, মুদ্রাস্ফীতি রোধ ও মুদ্রামান হ্রাস উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য পন্থা অপেক্ষা আমদানী সংকোচন ও রপ্তানী সম্প্রসারণ বৈদেশিক মুদ্রার সংকট মোচনে বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পন্থা গৃহীত হইলেও আমাদের আশানুরূপ ফল দিতে পারিতেছে না। রপ্তানী পণ্যগুলির অত্যধিক উৎপাদন ব্যয় ও মূল্য বৃদ্ধি, উহাদের গুণগত উৎকর্ষের অভাব, জাহাজে মাল বোঝাই করিবার পূর্বে পণ্যের মান সম্পর্কে ভালভাবে পর্যবেক্ষণের (Pre-shipment Inspection) ও বিদেশে ভারতীয় পণ্যের উপযুক্ত প্রচারের অভাব এবং রপ্তানীকৃত পণ্যের টাকা আদায়ের অনিশ্চয়তা বিশেষ প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করিতেছে। এ সকল ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক সম্পূর্ণ দূর না হওয়া পর্যন্ত উপরি-উক্ত কারণে অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে আমদানী নিয়ন্ত্রণ ও সংকোচন বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তবে ভারতে এখনও আশানুরূপ শিল্পসমৃদ্ধি ঘটে নাই। ইহা ছাড়া রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য উৎপাদন শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য মূলধনীয় দ্রব্যাদি আমদানী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা সম্ভব নয় এবং উহা সমর্থনযোগ্যও নহে। এ প্রসঙ্গে Mudaliar Committee-র অভিমত উল্লেখযোগ্য। কমিটির মতে—'the right solution of the problem for making the balance of payments in equilibrium lies not in further restriction of imports without due limits.' সুতরাং অন্তত রপ্তানী সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ বিশেষ মূলধনীয় দ্রব্যাদির আমদানী অপরিহার্য। এজন্য মূলধনীয় দ্রব্যাদির আমদানী সংকোচন ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিলে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় অনেকটা হ্রাস পাইবে। ডঃ সরোজকুমার বসুর মতে আমাদের এই পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অব্যবস্থা এবং সামঞ্জস্যহীনতার পরিচয় পাওয়া যায় (We have a picture of an unplanned behaviour to an almost incredible degree among various government departments in a planned economy)।

শুধু আমদানী সংকোচনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া এই অব্যবস্থা ও সামঞ্জস্যহীনতা দূর করাও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য অবশ্য প্রয়োজন।

রপ্তানী বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা (Steps to encourage Export Trade)

আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য প্রদানের জন্য রপ্তানী দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ স্বাস্থ্যসম্মত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের অবসান করার উদ্দেশ্যে রপ্তানী বাণিজ্যকে যথাসাধ্য উৎসাহিত করা হইতেছে। এজন্য ভারত সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিয়াছেন :

১। **বাণিজ্য বোর্ড গঠন (Establishment of Board of Trade) :** এই সংস্থা বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রক কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। আমদানী-রপ্তানী বিশেষত রপ্তানী বৃদ্ধির স্বাস্থ্যসম্মত নীতি নির্ধারণের জন্য এই সংস্থা সরকারকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া থাকেন।

২। **রপ্তানী উন্নয়ন দপ্তর (Directorate of Export Promotion) :** বাণিজ্য বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুত রপ্তানী সম্প্রসারণের নীতি কার্যকর করার ভার এই দপ্তরের উপর। ইহা ছাড়া Commercial Intelligence and Statistics বিভাগ এবং বিদেশের Trade Commissioner-দের কার্যের মধ্যে ইহা সমন্বয় সাধন করিয়া থাকে।

৩। **রপ্তানী উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদ (Export Promotion Advisory Council) :** এই পরিষদ সরকারকে রপ্তানী নীতি ও পদ্ধতি বিষয়ক পরামর্শ দিয়া থাকেন। রপ্তানী সম্পর্কে দৈনন্দিন সমস্যা জ্ঞাত করানো, বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানীর সুযোগ-সুবিধা, মাল বোঝাই ও খালাস ও অনুরূপ বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা কার্য চালানো ইহার কাজ।

৪। **রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ (Export Promotion Councils) :** ভারত বৈদেশিক মুদ্রা সংকটে খুবই বিপদাপন্ন। এরূপ মুদ্রা সংকটের প্রধান কারণ বৃহৎ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা এবং তজ্জন্য কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির আমদানী। খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাট্‌তির জন্য খাদ্যশস্য এবং প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র আমদানীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বৃদ্ধি পায় নাই। রপ্তানীবৃদ্ধি সম্পর্কে জাতীয়তাবোধের অভাব, রপ্তানীযোগ্য পণ্যের নিম্নমান ও উচ্চমূল্য, উচ্চহারে শুল্ক ও ট্যাক্স ধার্য, উক্ত পণ্যের দ্বারা আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের প্রবণতা প্রভৃতি রপ্তানী বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এবংবিধ অবস্থা দেশের আর্থিক উন্নয়নের পরিপন্থী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই অবস্থার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আমদানী নিয়ন্ত্রণের সহিত রপ্তানী বৃদ্ধির সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় যত্নবান হওয়া এবং ইহার দ্বারা যতটা সম্ভব বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করা যায় তাহার চেষ্টা করা উচিত।

এজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে সাফল্য আশা করা যায় না। এ সম্পর্কে আমাদের উদ্দেশ্য হইবে 'রপ্তানী অথবা ধ্বংস' (Export or Perish)। সুতরাং ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের মান উন্নয়ন করা এবং রপ্তানী সম্পর্কে জাতীয়তাবোধ জাগরূক হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভারত সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন এবং এজন্য রপ্তানী সম্প্রসারণের বিভিন্ন পন্থা গৃহীত হইয়াছে। রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ গঠন রপ্তানী সম্প্রসারণের অন্যতম বিশেষ পন্থা।

রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদের **সংগঠন** নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

এরূপ পরিষদের সংখ্যা বর্তমানে ১৯টি। এই শিল্পগুলি হইতেছে কার্পাসতন্তু, রেশম ও রয়নতন্তু, প্লাষ্টিক ও লিনোলিয়াম, কাজুবাদাম, তামাক, খেলাধুলার সরঞ্জাম, রাসায়নিক ও উহার উপযোগী দ্রব্য, লাক্ষা, চামড়া, ইঞ্জিনিয়ারীং দ্রব্য, অভ্র, মসলা, সামুদ্রিক পণ্য, কার্য-প্রক্রিয়াগত খাদ্যসামগ্রী (processed food), মূল রাসায়নিক, ঔষধ প্রস্তুতকরণ ও সাবান, পশম ও পশমজাত দ্রব্য, পাকা চামড়া ও চামড়ার দ্রব্যাদি এবং হস্তচালিত তাঁতজাত দ্রব্য।

এই পরিষদগুলি কৃষক, শিল্পোৎপাদক এবং রপ্তানীকারকদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এবং রপ্তানী-আমদানী উপদেষ্টা পরিষদের (Export-Import Advisory Council) অধীন। ইহাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার এবং ইহাদিগকে পরামর্শ ও সাহায্য দিবার জন্য ইহাদের উপরে Federation of Indian Export Organisation অবস্থিত। এই পরিষদগুলির কার্য হইতেছে রপ্তানী সম্প্রসারণের সকল প্রকার বাধা দূর করা, বিদেশে পণ্যের বাজারের পরিমাপ করা, নূতন বাজার সৃষ্টি করা, বর্তমান বাজারের সম্প্রসারণ করা, পণ্যের নূতন নূতন এবং অধিকতর ফলপ্রদ ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণা চালান এবং সরকারকে এ সকল বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।

৫। **পণ্যমণ্ডলী (Commodity Boards) :** রপ্তানী উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদকে বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানী সম্পর্কে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার জন্য বিভিন্ন শিল্পের জন্য এরূপ পৃথক পৃথক পরিষদ ও মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছে।

৬। **বাণিজ্যিক সেবা (Commercial Services) :** বিভিন্ন উৎস হইতে বাণিজ্যিক সেবা পরিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি (Commercial Representatives), বাণিজ্য মিশন (Trade Missions), রাষ্ট্রীয় কারবারী সংস্থা (State Trading Corporation) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা বাণিজ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন অনুসন্ধানের উত্তর প্রদান করেন, উৎসাহ দিয়া থাকেন এবং উহার সম্ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এইভাবে ইহারা বিভিন্ন বাণিজ্যিক সেবামূলক কার্য করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রীয় বা কারবারী সংস্থার অন্যবিধ কাজও আছে। উহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সাহায্যে রপ্তানী সম্প্রসারণ, বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য।

৭। **উদারনৈতিক রপ্তানী নীতি (Liberal Export Policy):** এই নীতির দ্বারা সরকার অনেক দ্রব্য-রপ্তানীর বিধিনিষেধ শিথিল করিয়াছেন এবং যে কাঁচামাল রপ্তানীযোগ্য পণ্যের উৎপাদনে ব্যয়িত হইয়া থাকে উহার আমদানী শুল্ক ফেরত দিয়া থাকেন।

৮। **ভাড়ার রেয়াত (Freight Concessions):** রপ্তানীর জন্য কোন মাল বাহিত হইলে রেল ও জাহাজ ভাড়ার রেয়াতও সরকার দিয়া থাকেন।

৯। **প্রদর্শনী দপ্তর (Directorate of Exhibition):** রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে প্রদর্শনী, বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন ও 'শো কেশে' (Show case) বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন, পণ্যের চাক্ষুষ-প্রচার (Visual Publicity) প্রভৃতি ব্যবস্থা এই দপ্তর করিয়া থাকেন এবং ইহার উদ্দেশ্য বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় পণ্যকে জনপ্রিয় করা। বিভিন্ন দেশে শিল্পবাণিজ্য মিশন পাঠাইয়াও রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে।

১০। **গুণগত নিয়ন্ত্রণ (Quality Control):** রপ্তানীযোগ্য পণ্যের গুণগত মান যাহাতে বজায় থাকে তজ্জন্য ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যান্ডার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন (Indian Standards Institution) স্থাপিত হইয়াছে। ইহা রপ্তানীর পূর্বে পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষা করিয়া থাকে।

১১। **রপ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন (Export Credit and Guarantee Corporation):** দেশের রপ্তানী বৃদ্ধিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য রপ্তানী প্রাপ্য নিশ্চয়তা পরিকল্পনা (Export Credit Guarantee Scheme) গৃহীত হয়। উহা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে জানুয়ারী মাসে শ্রী টি. সি. কাপুরের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি রপ্তানী ঝুঁকি বীমা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। তদনুযায়ী ১৯৫৭ সালে জুলাই মাসে রপ্তানী ঝুঁকি বীমা সংস্থা (Export Risk Insurance) কর্পোরেশন গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে রপ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন স্থাপিত হয় এবং উক্ত রপ্তানী ঝুঁকি বীমা সংস্থা ইহার সহিত যুক্ত হয়। এইভাবে রপ্তানী ঝুঁকি বীমা সংস্থার অস্তিত্ব বিলোপ ঘটে। এখন রপ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন রপ্তানী ঝুঁকির নিরাপত্তার বিশেষ সংস্থা। রপ্তানী বাণিজ্যে ঋণ ও গ্যারান্টি দেওয়া এবং তজ্জন্য ঝুঁকি বহন করা এই কর্পোরেশনের কাজ। ফলে রপ্তানী বাণিজ্য উন্নয়নে এই কর্পোরেশন এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আছে।

১২। **বাণিজ্যিক সালিশী (Commercial Arbitration):** রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইলে উহাতে রপ্তানী বাণিজ্য প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতে পারে। এজন্য বাণিজ্যিক সালিশী সমিতি গঠন দ্বারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-মীমাংসার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাণিজ্যিক সালিশী সমিতি এবং ভারতীয় বাণিজ্যিক প্রতিনিধি উভয়েই বিবাদ-মীমাংসা সম্পর্কে রপ্তানীকারকদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে।

বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইতেছে। এজন্য বৈদেশিক মুদ্রা সংকটকে আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংকট (crisis of ambition) বলিতে পারি। সুতরাং এই সংকট দূর করা অবশ্য প্রয়োজন। রপ্তানী উন্নয়নের ও সম্প্রসারণের যে ব্যবস্থাগুলি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে মুদ্রা সংকট অনেকটা দূর হইবে আশা করা যায়। এজন্য আর যে সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে উহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :

(ক) এইজন্য বৈদেশিক ঋণ, বিনিয়োগ সাহায্যের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করা হইতেছে এবং ইহাতে অনেকটা সফলতাও আসিয়াছে। ক্রমাগত বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও ভারত যে তাহার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে তাহার অন্যতম কারণ বৈদেশিক সাহায্য। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, সোভিয়েট রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছে।

(খ) রিজার্ভ ব্যাংকের বৈদেশিক সিকিউরিটির পরিমাণ যে হ্রাস করার অধিকার দেওয়া হইযাছে উহার ফলে অতিরিক্ত বৈদেশিক সিকিউরিটি বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির কাজে ব্যবহার করা চলিবে।

(গ) বিভিন্ন দেশের সহিত পণ্য বিনিময়ের যে চুক্তি সম্পাদিত হইতেছে তাহাতে বৈদেশিক মুদ্রা সংকট হ্রাস পাইবে। কারণ ইহাতে টাকা লেন-দেনের পরিবর্তে রপ্তানীর পাওনা দ্বারা আমদানীর দেনা মিটানো সম্ভব হইতেছে।

(ঘ) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ দ্বারাও বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের ব্যবস্থা চলিতেছে। ইহার দ্বারা বিদেশভ্রমণ ও বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

(ঙ) মুদ্রাস্ফীতি-বিরোধী আর্থিক ও ফিসক্যাল (Fiscal) নীতিও এই সংকট মোচনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

(চ) ১৯৬৬ সালের জুন মাসে মুদ্রামান হ্রাসও বৈদেশিক মুদ্রা সংকট মোচনের অন্যতম চেষ্টা।

রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থের যোগান (Financing of Export Trade)

রপ্তানী বাণিজ্য নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি হইতে সাধারণত প্রয়োজনীয় অর্থ সংক্রান্ত সাহায্য পাইয়া থাকে :

(ক) **বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Bank) :** রপ্তানী বাণিজ্যের দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য যে সমস্ত হুণ্ডি বা ধার দলিল সৃষ্ট হয় বিনিময় ব্যাঙ্ক উহা ক্রয় করে এবং এইভাবে আমদানী ও রপ্তানীকারকদের আর্থিক সাহায্য দিয়া থাকে। ইহারা আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য মূল্যবান ধাতু এবং সিকিউরিটি আমদানী করে, অগ্রিম চুক্তির সুবিধা সৃষ্টি করিয়া বিনিময় হারের অযথা হ্রাস বৃদ্ধি রোধ করে এবং রপ্তানী চালান ও অন্যান্য দলিল জামিন লইয়া টাকা ধার দেয়।

সুতরাং বিদেশের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় ইহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

(খ) **স্বীকৃতিদানের প্রতিষ্ঠান (Accepting Houses) :** এই প্রতিষ্ঠানগুলি বৃটেনের আমদানীকারকদের পক্ষ হইয়া রপ্তানীকারকদের হুণ্ডি স্বীকার করিয়া থাকে এবং প্রয়োজন হইলে উহার টাকা প্রদান করিয়া থাকে। রপ্তানীকারক এরূপ প্রতিষ্ঠান দ্বারা কোন হুণ্ডি স্বীকৃত হইলে তাঁহার রপ্তানীকৃত মালের মূল্য প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। উক্ত ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইয়া টাকা গ্রহণ করাও চলে। এই স্বীকারদানের প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম আছে। ব্যক্তিবিশেষ এবং যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কও একরূপ স্বীকৃতিদানের কাজ করিয়া থাকে। এই সকল প্রতিষ্ঠান এইভাবে রপ্তানী বাণিজ্যের অর্থ-সংক্রান্ত লেন-দেন ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

(গ) **যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক (Joint Stock Banks) :** ইহারাও বৈদেশিক বাণিজ্যে ঋণদান ব্যাপারে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। অবশ্য এ জাতীয় বড় বড় ব্যাঙ্কগুলিই এ ব্যাপারে বেশী লিপ্ত এবং এজন্য বিদেশে ইহাদের শাখা অফিসও আছে। তবে বিনিময় ব্যাঙ্কের মত ইহাদের কাজ-কারবার এখনও ততটা অগ্রসর হইতে পারে নাই।

(ঘ) **ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (State Bank of India) :** ইহাও বৈদেশিক বাণিজ্যে ঋণদান ও অন্যান্য ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। ইহা আমদানী ও রপ্তানীকারকদিগকে ঋণের নিদর্শন পত্র (Letter of Credit) দিয়া থাকে এবং বাণিজ্য-হুণ্ডিতে স্বীকৃতি দিয়া থাকে, অগ্রিম বিনিময় হারের ব্যবস্থা করে, প্রতিভূ (Guarantee) হিসাবে কাজ করে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকিও বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইহা প্রাক্-জাহাজ বোঝাই (Pre-shipment) এবং জাহাজে বোঝাইয়ের পরবর্তী (Post-shipment) কালের জন্যও ঋণ প্রদান করিয়া থাকে।

(ঙ) **রপ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারাণ্টি কর্পোরেশন (Export Credit and Guarantee Corporation) :** ইহা রপ্তানী বাণিজ্যের ঝুঁকি বহন করে এবং রপ্তানী ঋণ ও গ্যারান্টি দিয়া থাকে। রপ্তানী বাণিজ্যের ঝুঁকি দুই প্রকারের—বাণিজ্যিক ঝুঁকি (Commercial risks) এবং রাজনৈতিক ঝুঁকি (Political risks)। বৈদেশিক আমদানীকারক দেউলিয়া হইতে পারে, মূল্য পরিশোধে অসমর্থ হইতে পারে বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ নাও করিতে পারে। এইগুলি হইতেছে বাণিজ্যিক ঝুঁকি। ইহা ছাড়া আমদানীকারকের দেশে যুদ্ধ, গৃহবিবাদ, আমদানী নীতি ও মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন, জাহাজের গতিপথে বাধা সৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ বিপদ-আপদ দেখা দিতে পারে। এইগুলি হইতেছে রাজনৈতিক ঝুঁকি। এই কর্পোরেশন উভয়বিধ ঝুঁকিই বহন করিয়া রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে।

ষ্টেট-ট্রেডিং কর্পোরেশন (State Trading Corporation)

১৯৫৬ সালের মে মাসে ভারত সরকার আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনার জন্য এবং দেশের মধ্যে ও বিদেশে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। উক্ত সংস্থা 'ষ্টেট্ ট্রেডিং কর্পোরেশন' নামে পরিচিত। ইহা ঘরোয়া (private) যৌথ কোম্পানী। ইহার বর্তমান অনুমোদিত মূলধন পাঁচ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন দুই কোটি টাকা। ইহার মূলধনের সমস্তটাই ভারত সরকার দিয়াছেন। ইহার পরিচালনার ভার একটি পরিচালকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত। উহার পরিচালকগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

এতদিন পর্যন্ত বেসরকারী উদ্যোগে যে ভারতের বহির্বাণিজ্য চলিতেছে উহার ফলে আশানুরূপ রপ্তানী সম্প্রসারণ সম্ভব হয় নাই। সুতরাং এই সংস্থার কাজ হইবে বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামো শক্তিশালী করা, রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটানো, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।

এরূপ সংস্থা স্থাপিত হওয়ার ফলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যাইবে :

(১) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাচে রাষ্ট্র গঠনের নীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনের ও ব্যবসা-বাণিজের উপাদান রাষ্ট্রেরই অধীন। এরূপ সংস্থা ভিন্ন রাষ্ট্রের আদর্শ কার্যকরী করিয়া তোলা সম্ভব নহে। সুতরাং এই সংস্থা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সফল করিবে।

(২) রাষ্ট্রীয় কারবারের ফলে যে লাভ হইবে উহা দেশের উন্নয়নমূলক কার্যে ব্যয়িত হইবে।

(৩) বর্তমানে বিভিন্ন দেশে অধিকমাত্রায় দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (Bilateral trade ageement) দেখা যাইতেছে। রাষ্ট্রীয় কারবার ভিন্ন এই দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাতে দর-কষাকষি দ্বারা সুবিধাজনক শর্ত পাওয়া সম্ভব হইবে।

(৪) ভারতে খাদ্যশস্যের ঘাট্‌তি আছে। কেবল এই সংস্থার মাধ্যমেই যথাযথ খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। ইহাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যস্তরও স্থির রাখা সম্ভবপর হইবে। অন্যথায় কালোবাজারী, ফটকাবাজী প্রভৃতি সমাজবিরোধী কাজ যাহা দেখা যাইতেছে উহা ক্রমশ আরও বৃদ্ধি পাইবে।

(৫) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একচেটিয়া কারবার ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করিতেছে। এই একচেটিয়া কারবার বেসরকারী ক্ষেত্র অপেক্ষা সরকারী ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়।

(৬) রাষ্ট্রীয় কারবার ভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নহে।

কিন্তু এরূপ কারবারের অসুবিধা নিম্নরূপ :

(১) কর অনুসন্ধান কমিশনের মতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পর্যাপ্ত রাজস্ব আয় সৃষ্টি করিতে পারে না।

(২) রাষ্ট্রীয় কারবার অযথা প্রসার লাভ করিলে বেসরকারী ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৩) ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রশাসন এক জিনিস নয়। প্রশাসনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারাই রাষ্ট্রীয় কারবার পরিচালিত হইয়া থাকে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিক পথে চলিতে পারে না।

(৪) রাষ্ট্রীয় কারবারের সরকারী কর্মচারিগণ স্বভাবতই কর্মে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। ইহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যে আমলাতন্ত্র ভাব আসিয়া যায়। ইহাতে দ্রব্যমূল্য অযথা বৃদ্ধিই পায়।

(৫) রাষ্ট্রীয় কারবারে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে আন্তর্জাতিক সংঘাত, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি অনিবার্য হইয়া পড়ে। ইহার ফলে দুর্বল দেশগুলিকে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য স্বার্থের পরিপন্থী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্যের বিনিময়ে বন্ধুত্ব বজায় রাখিতে হয়।

ষ্টেট্ ট্রেডিং-এর এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইহার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সার্থক হইয়াছে। প্রথম ১০ বৎসরে উহা ১০ কোটি টাকার লেন-দেন করিয়াছে। ইহা বহির্বাণিজ্যে বৈচিত্র্য দান করিয়াছে এবং অনেক পণ্যের নূতন বাজার সৃষ্টি করিয়াছে। আভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য বণ্টনেও ইহা এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং ইহা এমন একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে যাহা বেসরকারী উদ্যোগে কথনই সম্ভব হইত না।

ষ্টেট্ ট্রেডিং কর্পোরেশনের মাধ্যমে চাউল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বণ্টন করার পরিকল্পনা (Distribution Plan of rice and other essential commodities through a State Trading Corporation)

ভারত বা পশ্চিমবঙ্গ চাউল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে ঘাট্‌তি অঞ্চল। সুতরাং এ জাতীয় দ্রব্যাদি যাহা কিছু দেশে উৎপন্ন হয় বা বাহির হইতে সংগ্রহ হয় উহার একত্রীকরণ ও সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা ছাড়া লোকের খাদ্যাভাবজনিত দুর্দশা লাঘব করা সম্ভব নয়। কারণ কোন দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষা যোগান কম হইলে উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও 'বরাদ্দ ব্যবস্থা' (rationing) প্রবর্তন করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। খাদ্যশস্যের মত জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যাদি যাহাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিরও ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে থাকে তজ্জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। আবার অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিগণ যাহাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে না পারেন তাহার জন্য 'বরাদ্দ ব্যবস্থা' (rationing) চালু করা অত্যাবশ্যক। শুধু মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলেই চলিবে না, দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য বরাদ্দ অনুযায়ী সকলেই যাহাতে পাইতে পারেন তাহার সুষ্ঠু ব্যবস্থাও থাকা উচিত। এইভাবে চাউল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সকলেই পাইতে পারে এবং সমাজ-

বিরোধী কার্যকলাপের আশ্রয় লইয়া অধিক পরিমাণে উক্ত দ্রব্যাদি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারে। এজন্য খাদ্যসমস্যার সমাধান শুধু খাদ্যের যোগান বা উৎপাদনের উপর নির্ভর করে না। উপযুক্ত বণ্টন ব্যবস্থাও এই সমস্যার সমাধানের পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপ অবশ্য প্রয়োজন। এ সম্পর্কে সরকারী সংগ্রহ ও বণ্টন নীতি ব্যবস্থা অত্যন্ত সততা, দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত পরিচালিত হওয়া উচিত। কারণ চাহিদার তুলনায় যোগান কম হইলে এবং সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থা বে-সরকারী ব্যবসায়ীর হাতে থাকিলে কালোবাজার ও মজুতদারী সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে ব্যবসায়িগণ অধিক মুনাফার লোভে খাদ্যশস্য মজুত করিয়া কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যশস্যের প্রকৃত ঘাটতি অপেক্ষা অধিক ঘাটতি সৃষ্টি করে। ইহার ফলে খোলাবাজারে প্রয়োজনমত খাদ্যশস্য পাওয়া যায় না, মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পায় এবং দরিদ্রব্যক্তিগণ অনাহারের সম্মুখীন হন। দেশের ঘাট্‌তি থাকা সত্ত্বেও চোরাকারবারীরা অত্যধিক মুনাফার লোভে ভিন্ন রাজ্যে বা দেশে খাদ্যশস্য পাচার করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। যাহা হউক, খাদ্যসমস্যা দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। সুতরাং ইহা সমাধানের জন্য দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এজন্য খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যাপারে আমরা নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিতে পারি। আমাদের বিশ্বাস এই প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করিতে পারিলে ঘাট্‌তিজনিত অসুবিধা দূর হইবে এবং দেশবাসী 'বরাদ্দ ব্যবস্থা' অনুযায়ী দ্রব্যাদি পাইবে :

(১) খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনিতে হইবে এবং এজন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসা চালু করিতে হইবে।

(২) এই নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত করা উচিত।

(৩) ষ্টেট্ ট্রেডিং কর্পোরেশন উৎপাদক ও সম্ভোগকারীদের মধ্যে যে মুনাফাবাজী পাইকারগণ অবস্থিত উহাদের উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করিবে।

(৪) উৎপাদকের নিকট হইতে শস্য সংগ্রহের কাজ এই কর্পোরেশনকেই করিতে হইবে। এজন্য গ্রামাঞ্চলে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে বা অন্য কোন ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৫) উক্ত সমবায় সমিতির বা অন্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিক্রয় কার্যও সমাধা করা যাইতে পারে।

(৬) এজন্য গ্রামাঞ্চলে এবং শহরে মাল মজুত রাখার জন্য অনেক সংগ্রহশালা বা গুদাম (Store House or Godown) প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৭) খাদ্যশস্যের বিক্রয় লাভ না রাখা এবং লোকসান না করার (No Profit, No Loss) ভিত্তিতে সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে স্বল্পবিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ক্রয়মূল্য অপেক্ষাও কম মূল্যে যেন খাদ্যশস্য বিক্রয় করিতে পারে।

(৮) ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য উভয়ই ন্যায্য (fair) হইবে।

(৯) খাদ্যশস্য সম্পর্কে ভারতকে একটিমাত্র এলাকা হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

(১০) বাহির হইতে যে খাদ্যশস্য আমদানী হইবে উহাও বণ্টনের জন্য কর্পোরেশনের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে।

(১১) মোটের উপর সংগৃহীত মাল এবং উহার বণ্টনের ভার একটিমাত্র সংস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন হইবে। কারণ যোগানের উপর কর্তৃত্ব না থাকিলে চাহিদা মিটানো সম্ভব নয়।

(১২) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমবায় সমিতির মাধ্যমেই হউক বা অন্য উপায়ে হউক খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক দোকান খুলিতে হইবে। উহাতে বিক্রয়মূল্যের তালিকা প্রকাশ্য স্থানেই ঝুলান থাকিবে।

(১৩) খাদ্যশস্য পরিবহনে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

(১৪) চালগুলির উপরও কর্পোরেশনের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে।

(১৫) প্রয়োজনীয় টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা ষ্টেট ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে সরবরাহ করিতে হইবে।

(১৬) কর্পোরেশন বা উহার অনুমোদিত সমবায় সমিতি বা অন্য সংস্থা ভিন্ন অন্য কাহাকেও উৎপাদক কর্তৃক খাদ্যশস্য বিক্রয় নিষিদ্ধ হইবে। উৎপাদক যাহাতে উহার পণ্যের মূল্য সঙ্গে সঙ্গে নগদ পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

(১৭) কর্পোরেশন নিজের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া কিংবা উহার অনুমোদিত সংস্থার সাহায্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থার কার্য সম্পাদন করিবে।

(১৮) কাজটি মোটেই সহজসাধ্য নহে। ইহার জন্য উচ্চস্তরের প্রশাসনিক সততা, দৃঢ়তা ও দক্ষতার প্রয়োজন হইবে।

খনিজ তৈল সরবরাহ (Petroleum Distribution)

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খনিজ তৈলজাত দ্রব্যাদি কিভাবে সরবরাহ হইয়া থাকে উহা জানার পূর্বে ভারতে খনিজ তৈল উৎপাদনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিছুটা অবগত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারত খনিজ তৈল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। এজন্য ইহাকে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। যে সকল দেশ হইতে ভারত খনিজ তৈল ও উহা হইতে উৎপাদিত দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া থাকে তন্মধ্যে ইরাক, ইরাণ, সৌদি আরব, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্বে উহার একমাত্র খনিজ তৈল উৎপাদন কেন্দ্র ছিল আসামের ডিগবয় অঞ্চল। এখান হইতে খনিজ তৈল উৎপাদন আরম্ভ হয় ১৮৮৯ সালে। পরবর্তী ৬০ বৎসরের মধ্যে উহার বাৎসরিক উৎপাদন দাঁড়ায় ৫ লক্ষ টন। কিন্তু ভারতে খনিজ তৈলজাত দ্রব্যাদির চাহিদা প্রায় ১·৬ কোটি টন। ১৯৭৫ সালের মধ্যে

উহার চাহিদা ৩·২ কোটি টনে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। উপরি-উক্ত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৭০ সালে দেখা যায় ৬৮ লক্ষ টন। সুতরাং চাহিদা এবং উৎপাদনের মধ্যে এখনও বিরাট ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার Indian Oil and Natural Gas Commission-এর উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খনিজ তৈল সন্ধানের কাজে ব্যাপৃত আছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে ভারতে প্রায় ১০·৩৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত স্থানে খনিজ তৈল আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। এই অনুসন্ধানের ফলে যে যে অঞ্চলে খনিজ তৈলের অবস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাদের মধ্যে কয়েকটি খনি হইতে তৈল উত্তোলন আরম্ভ হইয়াছে। উহাদের মধ্যে আসামের নাহারকাটিয়া এবং গুজরাটের আঙ্কেলেশ্বর খনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাদের উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৫০ লক্ষ টন।

ইহা ছাড়া ১৯৪৭ সালে ভারতে মাত্র একটি তৈল শোধনাগার ছিল। বর্তমানে উহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে নয়টি। এই নয়টির মধ্যে টম্বের দুইটি, বিশাখাপত্তনমের একটি এবং ডিগবয়েরটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। আর বারৌনি, কোচিন, কয়ালী, নুনমাটি এবং মাদ্রাজের শোধনাগার সরকারী প্রতিষ্ঠান। এই সকল শোধনাগার হইতে নানাবিধ খনিজ তৈলজাত দ্রব্য যেমন, পেট্রোল, ডিজেল তৈল, কেরোসিন, পিচ, মোম প্রভৃতি উৎপাদন হইতেছে। এই সকল শোধনাগারের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১·৮ কোটি টন। আমরা এখনও বিদেশ হইতে শোধনের জন্য খনিজ তৈল আমদানী ছাড়া প্রচুর খনিজ তৈলজাত দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া থাকি। ১৯৬৭ সালে খনিজ তৈলজাত দ্রব্যাদির আমদানী পরিমাণ দেখা যায় ৯৬ লক্ষ টন এবং উহাতে ব্যয় পড়ে ১১৮ কোটি টাকা। আমরা কিছুটা খনিজ তৈলজাত দ্রব্যাদি বিদেশেও রপ্তানী করিয়া থাকি। ১৯৬৭ সালে প্রায় ১৪ কোটি টাকার উক্ত দ্রব্যাদি রপ্তানী হয়। ১৯৬৬ সালে উক্ত রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ছিল প্রায় ৯ কোটি টাকা। সুতরাং রপ্তানী যে বৃদ্ধি পাইতেছে একথা বলা চলে। তবে রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর মূল্য অনেক বেশী।

একথা অবশ্য বলা চলে যে, খনিজ তৈল আবিষ্কার, উৎপাদন, সরবরাহ ইত্যাদি ব্যাপারে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নানাদিক দিয়াই অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। যে সকল তৈলখনির উপর বিদেশী প্রভাব ছিল উহাও জাতীয় সরকারের হাতে আসিতেছে। তবে খনিজ তৈলজাত দ্রব্যাদির যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশী থাকায় ইহার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে। বিদেশী কোম্পানীগুলিকে এখন আর উহাদের শোধনাগারগুলির উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইতে দেওয়া হইতেছে না। উহাদিগকে নূতন শোধনাগার স্থাপন করিতে দেওয়া হইতেছে না। বিদেশী কোম্পানী-গুলির তৈল সরবরাহ কেন্দ্রগুলিও বৃদ্ধি করিতে পারিতেছে না এবং Indian Oil Corporation ক্রমে ক্রমে বাজার দখলের জন্য বিশেষ সচেষ্ট আছে। তবে বিদেশী

কোম্পানীগুলির আধিপত্য এখনও বিশেষ খর্ব হয় নাই। উহারা বিক্রয়-যোগ্য খনিজ তৈলজাত দ্রব্যাদির ৪৬ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

১৯৫৯ সাল পর্যন্ত খনিজ তৈল ও উহার দ্রব্যাদির বিক্রয় ও সরবরাহ বে-সরকারী হাতেই ছিল। ঐ বৎসরের জুন মাস হইতে ভারত সরকার উহার বিক্রয় ও সরবরাহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। এজন্য ঐ সময়ে Indian Oil Company স্থাপিত হয়। ইহা সরকারী প্রতিষ্ঠান। ইহা খনিজ তৈল সরবরাহ ও উহার দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া ১৯৫৯ সালের জুন মাসে ভারত সরকার এবং বার্মাসেলের সমান মালিকানায় Oil India Limited স্থাপিত হয়। ইহার কাজ হয় খনিজ তৈল অনুসন্ধান করা এবং উহার আসামের খনি হইতে পাইপ লাইনের সাহায্যে বারৌনি ও নুনমাটিতে তৈল সরবরাহ করা।

কিন্তু এই কাজ অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে Indian Oil Refineries এবং Indian Oil Company-কে যুক্ত করিয়া ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে Indian Oil Corporation-এর গোড়াপত্তন করা হয়। ইহার প্রধান কার্যালয় বোম্বাইতে অবস্থিত। এই Indian Oil Corporation-ই বর্তমানে খনিজ তৈল সরবরাহ ও বিক্রয় ব্যাপারে লিপ্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান। ইহা বর্তমানে বিক্রয়যোগ্য খনিজতৈলজাত দ্রব্যাদির ৫৪ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ইহা আশা করা যায় যে, আগামী ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিবে। এজন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বন্দরে তৈলের ডিপো স্থাপিত হইয়াছে এবং এই কাজ ক্রমশই ব্যাপকতা লাভ করিতেছে। পাইপ লাইনের সাহায্যে প্রধান প্রধান কেন্দ্রে তৈল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত পাইপ লাইনগুলির মধ্যে নাহারকাটিয়া গৌহাটি, গৌহাটি-বারৌনি, গৌহাটি-শিলিগুড়ি, বারৌনি-কলিকাতা, বারৌনি-কানপুর, কয়ালী-আমেদাবাদ, কোচিন-এর্ণাকুলাম প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ডিপো হইতে খরিদ্দারদিগকে তৈল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাদের চেষ্টায়ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক ডিপো-দোকান স্থাপিত হইয়াছে। খনিজ তৈল ও উহার দ্রব্যাদির সরবরাহ ও বিক্রয় বর্তমানে এইভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

মূল্যজ্ঞাপনের বিভিন্ন রীতি (Different modes of price quotations)

ব্যবসা-বাণিজ্যে বিক্রেতা ক্রেতাকে জিনিসের মূল্য জানাইতে হইলে জিনিসের প্রকৃত বিক্রয়মূল্যের সহিত অন্য কোন ব্যয় ধরা হইয়াছে কিনা তাহা কতকগুলি সংক্ষিপ্ত শব্দের দ্বারা বুঝাইয়া থাকেন। নিম্নে উহাদের কতকগুলি উল্লেখ করা হইল :

(১) **উৎপাদন স্থানে পণ্যার্পণ মূল্য (Loco) :** দ্রব্য-মূল্যের সহিত একথা যুক্ত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, দ্রব্যের প্রকৃত বিক্রয়মূল্যই ইহাতে ধরা হইয়াছে। অন্যবিধ কোন ব্যয় বহনের দায়িত্ব বিক্রেতার ইহাতে নাই। সুতরাং ক্রেতা এই দরে

মাল কিনিতে প্রস্তুত থাকিলে বিক্রেতার স্থান হইতে উহা গ্রহণ করিতে হইবে এবং মাল বহনের যাবতীয় ব্যয় ক্রেতাকেই বহন করিতে হইবে।

(২) **রেলগাড়ীতে উঠানো পর্যন্ত** (**Free on Rail or Wagon,** সংক্ষেপে **F. O. R. or F. O. W.**) : এরূপ দর উল্লিখিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই মূল্যের সহিত রেলগাড়ীতে মাল উঠানো পর্যন্ত সমস্ত ব্যয় ধরা হইয়াছে এবং উক্ত মূল্যে মাল ক্রয় করিলে বিক্রেতা উক্ত ব্যয় বহন করিবেন।

(৩) **জাহাজের পার্শ্ব পর্যন্ত** (**Free Alongside the Ship,** সংক্ষেপে **F. A. S.**) : এরূপ দর উল্লিখিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, মালের সহিত জাহাজের পার্শ্ব পর্যন্ত মালবহনের সমস্ত ব্যয় উহার সহিত ধরা হইয়াছে এবং বিক্রেতাই উক্ত ব্যয় বহন করিবেন।

(৪) **জাহাজে উঠানো পর্যন্ত** (**Free on Board,** সংক্ষেপে **F. O. B.**) এরূপ দর উল্লিখিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, মালের সহিত জাহাজে মাল উঠানো পর্যন্ত সমস্ত ব্যয় ধরা হইয়াছে এবং বিক্রেতাই উক্ত ব্যয় বহন করিবেন।

(৫) **মাশুলসহ মূল্য** (**Cost & Freight,** সংক্ষেপে **C. & F.**) : এরূপ দর উল্লিখিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, মালের বিক্রয়মূল্যের সহিত মাল জাহাজে উঠানোর ব্যয় ও জাহাজের মাশুল সবই ধরা হইয়াছে এবং বিক্রেতা ঐ সমস্ত ব্যয় বহন করিবেন।

(৬) **মাশুল ও বীমাসহ মূল্য** (**Cost, Insurance and Freight,** সংক্ষেপে **C. I. F.**) : এরূপ দর উল্লিখিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, মালের বিক্রয়-মূল্যের সহিত জাহাজে মাল উঠানোর ব্যয়, জাহাজের মাশুল এবং মালের বীমা ব্যয়ও উহার সহিত ধরা হইয়াছে এবং বিক্রেতা ঐ সমস্ত ব্যয় বহন করিবেন।

(৭) **অবতরণ পর্যন্ত** (**Landed**) : এরূপ দর উল্লিখিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, গন্তব্যস্থলে অবতরণ পর্যন্ত সমস্ত ব্যয় মালের বিক্রয়মূল্যের সহিত যুক্ত আছে এবং বিক্রেতা ঐ সমস্ত ব্যয় বহন করিবেন।

(৮) **গুদাম পর্যন্ত** (**In Bond**) : এরূপ দর উল্লিখিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, গন্তব্যস্থলে 'বন্ধকী-গুদামে' (Bonded Warehouse) মাল পৌছানো পর্যন্ত সমস্ত ব্যয় মালের বিক্রয়মূল্যের সহিত যুক্ত আছে এবং উক্ত ব্যয় বিক্রেতা বহন করিবেন।

(৯) **সর্বব্যয়সাকুল্য পণ্যার্পণ মূল্য** (**Franco, Rendu, Free Delivery or Free Domicile**) : এরূপ দর উল্লিখিত হইলে মালের মূল্যের সহিত বিক্রেতার গুদাম হইতে ক্রেতার গুদামে মাল পৌছাইয়া দিবার সমস্ত ব্যয়ই যুক্ত থাকে এবং উক্ত ব্যয় বিক্রেতা বহন করিবেন।

শুল্ক আদায়ের উদ্দেশ্য (Object of levying duties)

'শুল্ক' (Duties) আদায়ের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) **রাজস্ব সংগ্রহ :** সরকারের ব্যয়-নির্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন। শুল্ক আদায়ের দ্বারা এই অর্থের প্রয়োজন অনেকটা মিটিয়া থাকে।

(২) **বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ :** কোনও জিনিসের আমদানী বা রপ্তানী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ না করিয়া উক্ত জিনিসের উপর উচ্চহারে শুল্ক আদায় করিয়া উহা নিয়ন্ত্রণ করা চলে। কারণ উচ্চহারে শুল্ক আদায়ের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং বিক্রেতার পক্ষে উহা বিক্রয় করা লাভজনক হয় না। ফলে উক্ত জিনিসের আমদানী বা রপ্তানী হ্রাস পায়।

(৩) **শিল্প সংরক্ষণ :** দেশের কোন শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এবং উহার উন্নতি ব্যাহত হইলে বিদেশী জিনিসের উপর উচ্চহারে শুল্ক আদায় করিয়া উক্ত জিনিসের আমদানী হ্রাস বা বন্ধ করা যায়। উচ্চহারে শুল্ক দেওয়ার ফলে বিদেশী পণ্যের দাম দেশীয় পণ্যের সমান বা উহা অপেক্ষা অধিক হয়। ফলে দেশীয় পণ্যের কাটতি বাড়ে এবং বিদেশী পণ্যের চাহিদা হ্রাস পাইয়া উহার আমদানী কমিয়া যায় বা বন্ধ হয়। এই সুযোগ-সুবিধার ফলে দেশীয় শিল্প উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

(৪) **সস্তাদামে মাল ঢালাই রোধ করা :** অনেকক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বাজার দখল করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিদেশ হইতে মাল আমদানী (dumping) হইতে দেখা যায়। উহা রোধ করার উদ্দেশ্যেও উচ্চহারে শুল্ক ধার্য করা হয়।

(৫) **পক্ষপাতমূলক ব্যবহার :** এক দেশের তুলনায় অন্য দেশের পণ্য আমদানী ব্যাপারে পক্ষপাতমূলক ব্যবহার দেখাইতে হইলেও যে দেশকে পক্ষপাতমূলক সুবিধা দেওয়া হইবে না সে দেশের পণ্যের উপর উচ্চতর হারে শুল্ক ধার্য করা চলে।

(৬) **দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ :** দেশের মধ্যে কোন জিনিসের অত্যধিক ব্যবহার অবাঞ্ছনীয় মনে করিলেও উক্ত জিনিসের উপর উচ্চহারে শুল্ক আদায় করা হয়। উহার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহাতে চাহিদা হ্রাস পায় এবং উহার অত্যধিক ব্যবহারও বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

(৭) **আয়ের ক্ষতিপূরণ :** কোন ক্ষেত্রে শুল্ক বাবদ আয় কমিয়া গেলে অন্য ক্ষেত্রে শুল্ক আদায় করিয়া উহা পূরণ করা হয়। যেমন, উচ্চহারে আমদানী শুল্ক স্থাপন করিলে যে আয় কম হয় তাহা পূরণের জন্য উৎপাদন শুল্ক স্থাপন করা হয়।

(৮) **আয়ের স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা :** আয়ের উৎস হিসাবে উহা স্থিতিস্থাপক (elastic)। সুতরাং আয়ের স্থিতিস্থাপকতা রক্ষার উদ্দেশ্যেও ইহা ধার্য করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার শুল্ক (Different kinds of Duties)

সরকার পণ্যের উপর যে কর ধার্য করেন তাহাকে 'শুল্ক' (Duty) বলা হয়। শুল্ক নিম্নলিখিত প্রকার হইতে পারে :

বাণিজ্য শুল্ক (Customs Duties)

পণ্য আমদানী রপ্তানীর উপর যে কর ধার্য করা হয় তাহাকে 'বাণিজ্য শুল্ক' বলে। ইহা আবার দুই প্রকারের হইতে পারে: **(ক) আমদানী শুল্ক (Import Duty)** এবং **(খ) রপ্তানী শুল্ক (Export Duty)**। আমদানীকৃত পণ্যের উপর যে শুল্ক আদায় হয় তাহাকে 'আমদানী শুল্ক' (Import Duty) এবং রপ্তানীর জন্য প্রেরিত পণ্যের উপর যে শুল্ক আদায় হয় তাহাকে 'রপ্তানী শুল্ক' (Export Duty) বলে। উদ্দেশ্য ভেদে 'বাণিজ্য শুল্ককে' আবার (ক) **রাজস্ব শুল্ক (Revenue Duty)** এবং (খ) **সংরক্ষণ শুল্ক (Protective Duty)** এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সরকারের আয় বৃদ্ধির জন্য আমদানী-রপ্তানীকৃত পণ্যের উপর যে শুল্ক আদায় হয়, তাহাকে 'রাজস্ব শুল্ক' বলে। বিদেশী দ্রব্যের প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার জন্য যে শুল্ক ধার্য করা হয় তাহাকে 'সংরক্ষণ শুল্ক' বলে।

আবগারী ও উৎপাদন শুল্ক (Excise Duties)

দেশের অভ্যন্তরে যে জিনিসের ব্যবহার অত্যধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, বরং ক্ষতিকর তাহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ করার জন্য যে শুল্ক ধার্য হয় তাহাকে বলা হয় 'আবগারী শুল্ক'। যেমন মদ, গাঁজা, আফিং প্রভৃতির উপর ধার্য শুল্ক। আবার, দেশের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক তাহার উপর যে শুল্ক ধার্য করা হয় তাহাকে বলা হয় 'উৎপাদন শুল্ক'। যেমন, চিনি, তামাক, দিয়াশলাই, বনস্পতি তৈল, বস্ত্র প্রভৃতির উপর ধার্য শুল্ক।

আবগারী ও উৎপাদন উভয় প্রকার শুল্ককে ইংরাজীতে Excise Duty বলা হয়।

শুল্ক ধার্যের অন্যতম ও প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে রাজস্ব বৃদ্ধি। কারণ দেশ শাসনের জন্য যে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন তাহার একটি প্রধান উৎস হইতেছে বিভিন্ন দ্রব্যের উপর ধার্য শুল্ক।

বাণিজ্য ও উৎপাদন শুল্কের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

১। বাণিজ্য শুল্ক ধার্য বা আদায় হয় আমদানী বা রপ্তানী পণ্যের উপর, কিন্তু আবগারী ও উৎপাদন শুল্ক ধার্য বা আদায় করা হয় দেশের মধ্যে উৎপাদিত এবং ব্যবহৃত পণ্যের উপর।

২। বাণিজ্য শুল্ক ধার্য করার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

(ক) রাজস্ব সংগ্রহ।

(খ) শিল্প-সংরক্ষণ।

(গ) আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ।

(ঘ) বাজার দখল করার উদ্দেশ্যে বিদেশীদের অতি সস্তা দামে মাল বিক্রয়ের (dumping) অপচেষ্টা নিরোধ করা।

(ঙ) কোনও দেশের প্রতি মাল আমদানী ব্যাপারে পক্ষপাতমূলক ব্যবহার (preferential treatment) দেখানোর জন্য।

কিন্তু আবগারী ও উৎপাদন শুল্কের উদ্দেশ্য হইতেছে:

(ক) রাজস্ব সংগ্রহ।

(খ) অবাঞ্ছিত বা স্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্যের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা।

(গ) বিদেশী মালের উপর উচ্চহারে আমদানী শুল্ক স্থাপনের ফলে আয়ের যে ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করার জন্য। উচ্চ হারে আমদানী শুল্ক আদায় হইলে আমদানী কমিয়া যায় এবং পূর্বের তুলনায় আমদানী শুল্ক খাতে আয় কমিয়া যায়। বিদেশ হইতে যে জিনিসের আমদানী এইভাবে কমিয়া যায় বা বন্ধ হয় সে জিনিসের উৎপাদন স্বভাবতই দেশের মধ্যে বৃদ্ধি পায় এবং ঐ সকল শিল্প উন্নত হইবার সুযোগ পায়। সুতরাং এই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন শুল্ক দেওয়ার নৈতিক দায়িত্বও আছে।

(ঘ) সকল শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে যাহাতে শুল্ক আদায় হইতে পারে এতদ্ উদ্দেশ্যেও উৎপাদন শুল্ক আদায় করা হয়। এজন্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য যেমন, কেরোসিন, চিনি, কাপড, দিয়াশলাই, চা, সৌখিন দ্রব্য প্রভৃতির উপর ইহা ধার্য করা হয়।

মূল্যানুসারে ধার্য শুল্ক (Ad Valorem Duty)

পণ্যের মূল্য স্থির করিয়া উহার উপর শতকরা হারে যে শুল্ক ধার্য করা হয় তাহাকে 'মূল্যানুসারে ধার্য শুল্ক' বলে। যেমন 5% Ad Valorem অর্থাৎ পণ্যের মূল্য যদি ১০০ টাকা হয় তবে উহা হইতে ৫ টাকা শুল্ক আদায় হইবে। মূল্যবান জিনিসের উপর সাধারণত মূল্যানুসারে শুল্ক ধার্য করা হয়।

নির্দিষ্ট হারে ধার্য শুল্ক (Specific Duty)

পণ্যের ওজন, আয়তন ও সংখ্যার ভিত্তিতে যে শুল্ক ধার্য করা হয় তাহাকে 'নির্দিষ্ট হারে ধার্য শুল্ক' বলা হয়। যেমন, প্রতি টনে এক টাকা, প্রতি কিউবিক ফুটে দশ পয়সা কিংবা প্রতি গ্রোসে (gross) পঁচিশ পয়সা ইত্যাদি।

যেখানে জিনিসের মূল্য সঠিক নিরূপণ করা সহজসাধ্য সেখানে মূল্যানুসারে শুল্ক আদায় করা সহজসাধ্য হয়। কিন্তু জিনিসের মূল্য নিরূপণ অনেক ক্ষেত্রেই চালানে (Invoice) বর্ণিত মূল্য দেখিয়া স্থির করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। এ বিষয়ে 'শুল্ক বিভাগের চালান' (Customs Invoice) এবং 'বাণিজ্যদূতের চালান' (Consular Invoice) পরম সহায়ক। কারণ, মালের বিবরণের সত্যতা শুল্ক কর্তৃপক্ষকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। বাণিজ্যদূতও মালের বিবরণের সত্যতা স্বীকার করিয়া সার্টিফিকেট দিয়া থাকেন। আমদানী শুল্ক নির্ধারণে উক্ত চালান দুইটি মালের বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে প্রামাণ্য দলিল বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তবে শুল্ক 'মূল্যানুসারে ধার্য হইবে কি নির্দিষ্ট হারে' ধার্য হইবে উহা মালের মূল্য, গুণাগুণ, ওজন, আয়তন, সংখ্যা প্রভৃতি দেখিয়া এবং শুল্ক প্রদানকারীর সুবিধা-অসুবিধা বিচার-বিবেচনা করিয়া স্থির করা হয়।

প্রত্যর্পণযোগ্য শুল্ক (Drawback)

আমদানী-রপ্তানী ক্ষেত্রে কোন পণ্যের উপর একাধিকবার শুল্ক ধার্য করা হয় না। সুতরাং কোন পণ্যের উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য হওয়ার পর যদি উহা রপ্তানী হয় কিংবা কোন জিনিস আমদানী করিয়া পুনঃ-রপ্তানী করা হয় তবে উৎপাদন ও আমদানী শুল্ক উহার প্রদানকারীকে ফেরত দেওয়ার নিয়ম আছে। এরূপভাবে যে শুল্ক ফেরত দেওয়া হয় তাহাকে 'প্রত্যর্পণযোগ্য শুল্ক' (Drawback) বলা হয়।

রাজবৃত্তি (Bounty)

দেশের কোন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ দিবার জন্য এবং উহাকে বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্দিষ্ট হারে যে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় তাহাকে রাজবৃত্তি (Bounty) বলে।

সহায়ক বৃত্তি (Subsidy)

সমগ্র দেশের কল্যাণের জন্য কোনও শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন হইলে সরকার উক্ত প্রতিষ্ঠানকে যে বাৎসরিক অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন উহাকে 'সহায়ক বৃত্তি' (Subsidy) বলা হয়।

'রাজবৃত্তি' (Bounty) এবং 'সহায়ক বৃত্তি' (Subsidy)-র মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

(১) 'রাজবৃত্তি' কোনও শিল্প-বিশেষের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। 'সহায়ক বৃত্তি' সমগ্র দেশের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(২) 'রাজবৃত্তি' উৎপাদনের নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর নির্দিষ্ট হারে (যেমন, প্রতি মণে বা প্রতি গ্রোসে এক টাকা) প্রদান করা হয়, কিন্তু 'সহায়ক বৃত্তি' একযোগে একটা মোটা টাকা দেওয়া বুঝায়।

বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য প্রদান (Payments in foreign trade)

দেশের অভ্যন্তরে একস্থান হইতে অন্যস্থানে টাকা পাঠাইতে হইলে নগদ টাকা পাঠাইয়া বা চেক পাঠাইয়া উক্ত কার্য সম্পন্ন করা চলে। কিন্তু এক দেশের টাকা ভিন্ন দেশে অচল। চেকও কোন বিদেশী গ্রহণ করিতে চাহেন না। সুতরাং বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনা-পাওনা মিটাইতে হইলে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। এই 'ভিন্ন পন্থা' অবশ্য দেশের অভ্যন্তরেও দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য ব্যবহার করা চলে। কিন্তু ইহাদের ব্যবহার ভিন্ন বৈদেশিক দেনা-পাওনা বা ব্যবসা-বাণিজ্য অচল অবস্থায় আসিয়া পড়ে। বৈদেশিক বাণিজ্যে দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য বা এক দেশ হইতে অন্য দেশে টাকা পাঠানোর জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় :

(১) স্বর্ণ আমদানী-রপ্তানী (Import or Export of Gold) : সকল দেশের পাওনাদারগণই তাঁহাদের পাওনা পরিশোধের জন্য স্বর্ণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। সুতরাং স্বর্ণ আমদানী-রপ্তানী দ্বারা সর্বত্রই 'দেনা-পাওনা' মিটানো চলে। তবে এই ব্যবস্থার কতকগুলি অসুবিধাও আছে। প্রথমত, স্বর্ণ আমদানী রপ্তানী করায় প্যাকিং

মাশুল ইত্যাদি ব্যয় আছে। ইহা এক দেশ হইতে ভিন্ন দেশে পাঠানো নিরাপদও নহে। পথিমধ্যে খোয়া যাওয়ার ভয় আছে। সেজন্য অবশ্য বীমা করিয়া পাঠানো চলে। কিন্তু ইহাতে প্রেরণ ব্যয় বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। সুতরাং স্বর্ণ আমদানী-রপ্তানী ব্যয়বহুল বলা চলে। দ্বিতীয়ত, স্বর্ণ আমদানী-রপ্তানী হইলে দেশের মূল্যস্তরের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। যে দেশ স্বর্ণ আমদানী করিবে সে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং যে দেশ স্বর্ণ রপ্তানি করিবে তথায় দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইবে। ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক দৃঢ়তা নষ্ট হয়। তৃতীয়ত, অনেক দেশের স্বর্ণ আমদানী রপ্তানীর উপর নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আছে। ফলে নিম্নে বর্ণিত দ্বিতীয় পন্থা অর্থাৎ হুণ্ডির সাহায্যে দেনা-পাওনা মিটানো সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

(২) **বাণিজ্য-হুণ্ডি (Bill of Exchange) :** বৈদেশিক বাণিজ্যে 'বাণিজ্য-হুণ্ডি'ই প্রধানত দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে সাহায্য করিয়া থাকে। কি উপায়ে বাণিজ্য-হুণ্ডির সাহায্যে এই দেনা-পাওনা মিটানো হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। কলিকাতা ও লণ্ডনের বণিকদের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্য চলিয়া থাকে। উভয় স্থানেই বহু আমদানী-রপ্তানীকারক আছেন। রপ্তানীকারকগণ আমদানীকারকদের উপর বাণিজ্য-হুণ্ডি লিখিয়া থাকেন। উঁহারা আবার উক্ত বাণিজ্য-হুণ্ডি ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইয়া থাকেন। বাণিজ্য-হুণ্ডি ভাঙ্গানোর জন্য উভয় স্থানে বহু 'বিনিময় ব্যাঙ্ক' (Exchange Banks) আছে। উহারা নিজেদের ব্যবসা প্রসারের জন্য আমদানী-কারকের পক্ষ হইয়া 'ঋণের নিদর্শনপত্র' (Letter of Credit) দিয়া রপ্তানীকারকের 'হুণ্ডি' ভাঙ্গাইয়া দিয়া থাকেন। রপ্তানীকারদের পক্ষ হইয়া আমদানীকারদের দেশের ব্যাঙ্কের মারফতও উহারা 'বাণিজ্য-হুণ্ডি'র টাকা আদায় করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া অনেক আমদানীকারক তাঁহাদের ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যাঙ্ক হইতে 'বাণিজ্য হুণ্ডি' ক্রয় করিয়া থাকেন। এইভাবে 'বাণিজ্য-হুণ্ডির' ক্রয়-বিক্রয়, ভাঙ্গানো ইত্যাদি দ্বারা এক দেশ হইতে ভিন্ন দেশে টাকা-পয়সা পাঠানো হইয়া থাকে। দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে এই 'বাণিজ্য হুণ্ডি'র অকুলান হইলে অবশ্য স্বর্ণ আমদানী রপ্তানী অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

(৩) **তারযোগে প্রেরণ (Telegraphic Transfer = T. T.) :** দ্রুত অর্থপ্রেরণের প্রয়োজন হইলে এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী। এই ব্যবস্থায় প্রেরককে তাহার স্থানীয় ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে হয়। উক্ত ব্যাঙ্ক তারযোগে উহার বিদেশস্থ শাখা অফিস বা প্রতিনিধি ব্যাঙ্ককে উক্ত টাকা প্রাপককে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়া থাকে। বিদেশস্থ ব্যাঙ্ক উক্ত নির্দেশমত প্রাপককে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দিয়া থাকে।

ইহা ছাড়া, 'পোষ্টাল অর্ডার', 'ব্যাঙ্ক ড্রাফট' প্রভৃতির সাহায্যেও কিছু কিছু অর্থ আদান-প্রদান হইয়া থাকে।

যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হউক না কেন, বর্তমানে কেহই বিদেশে যদৃচ্ছা টাকা-পয়সা পাঠাইতে পারেন না। ভারত সরকার প্রায় সমস্ত দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বা অন্য কারণে টাকা-পয়সা পাঠানোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু

করিয়াছেন। এজন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মারফত সমস্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন-দেন নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির জন্য এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণ ও উহার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানীর উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

মালগুদামের কাজ এবং ভারতে মালগুদাম সংগঠনের বর্তমান অবস্থা (Functions of Warhousing and the present state of organisation of Warehouses in India)

অনেক জিনিস আছে যাহা উৎপাদকগণ বা সরবরাহকারিগণ সম্ভোগকারীদের প্রয়োজনমত ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া যোগান দিতে পারেন না। এ সমস্ত জিনিস উৎপাদকগণ একযোগে অনেক পরিমাণ উৎপাদন করিয়া থাকেন এবং সরবরাহকারিগণ সম্ভোগকারীদের প্রয়োজনমত উহা যোগান দেওয়ার জন্য একযোগে অনেক পরিমাণ জিনিস সংগ্রহ করিয়া থাকেন। উক্ত উৎপাদিত বা সংগৃহীত জিনিস কোনও স্থানে নিরাপদ অবস্থায় মজুত রাখা প্রয়োজন। যে স্থানে পণ্যাদি নিরাপদ অবস্থায় মজুত থাকে তাহাকে 'মালগুদাম'(Warehouse) বলে।

মালগুদাম প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে: (১) পণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী এবং (২) মালিকানা অনুযায়ী।

পণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী উহা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, যেমন বিভিন্ন প্রকারের কাঁচামাল, যথা—গম, পাট, তৈলবীজ প্রভৃতির মালগুদাম কিংবা শিল্পজাত দ্রব্য, যথা—লোহালক্কড়, আসবাবপত্র, বস্ত্র প্রভৃতির মালগুদাম।

মালিকানা অনুযায়ী ইহা আবার ব্যক্তিগত, সার্বজনিক, সরকারী বা চুক্তিবদ্ধ মালগুদাম হইতে পারে।

ব্যক্তিগত মালগুদাম বৃহৎ ব্যবসায়ের প্রয়োজন কমই মিটাইতে পারে। সার্বজনিক বা সরকারী মালগুদাম ভিন্ন এই প্রয়োজন মিটানো সম্ভব নয়। এই সার্বজনিক বা সরকারী মালগুদাম যাহা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হয় উহার কাজ নিম্নলিখিত-ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

(১) মজুত রাখার সুবিধা (Storage Facility): যে হারে পণ্য উৎপন্ন বা সরবরাহ হয় সে হারে সম্ভোগকারীর প্রয়োজনে না লাগিলে এরূপ পণ্য মালগুদামে সুরক্ষিত ও নিরাপদ অবস্থায় মজুত থাকিতে পারে।

(২) বিক্রয়ের সুবিধা (Marketing Facility): মালগুদামে এইভাবে যে পণ্য মজুত থাকে উহার মালিক এখান হইতে মালের শ্রেণীবিভাগ, মোড়াই, ছোট লপ্ত কিংবা বড় লপ্তে বাঁধাই, ক্রেতাকে মাল দেখানো প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন এবং বাজারে প্রয়োজনমত ক্রেতাকে মাল সরবরাহ করিতে পারেন। ইহাতে গুদামের সন্নিকটে উক্ত পণ্যের উপযুক্ত বাজার গড়িয়া উঠিতে পারে। মাল গুদামের মালিকের বিশেষ জ্ঞানও ক্রেতা ও বিক্রেতার পরম সহায়ক হয়।

(৩) **মালিকানার বদল (Change of Ownership) :** মালগুদামে পণ্য মজুত রাখিলে মালগুদামের মালিক পণ্যের মালিককে একখানা রসিদ দিয়া থাকেন। উক্ত রসিদে মালের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা থাকে এবং মাল মজুত রাখা ও উপযুক্ত মালিককে প্রয়োজনের সময় প্রত্যর্পণ করা হইবে এরূপ সর্তাদিও লিখিত থাকে। এই রসিদকে বলা হয় 'মালগুদাম পরওয়ানা' (Warehouse Warrant)। 'মালগুদাম পরওয়ানা' পৃষ্ঠসহি (Endorsement) দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য। সুতরাং স্থানান্তর না করিয়া বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে 'মালগুদাম পরওয়ানা' পৃষ্ঠসহি দ্বারা মালের মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তর করা চলে। ইহাতে মাল স্থানান্তরের বিরাট ব্যয় বাঁচিয়া যায়। সম্ভোগকারিগণও এই ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধাস্বরূপ অপেক্ষাকৃত সস্তায় মাল পাইতে পারেন।

(৪) **অগ্রিম মাল আমদানী বা উৎপাদন করার সুবিধা (Facility of Import or Production of goods in Advance) :** আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এবং বহুল উৎপাদনের যুগে মালের অগ্রিম সংস্থান থাকা প্রয়োজন। মাল মজুত রাখার এরূপ সুবন্দোবস্ত থাকিলে স্বভাবতই অগ্রিম মাল আমদানী বা উৎপাদন করা চলে।

(৫) **মালের দর উঠা-নামা হ্রাস (Lessening of Price fluctuations) :** বাজার মন্দার সময় মাল মজুত রাখিয়া এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মাল ছাড় করিয়া ইহা মালের অত্যধিক দর উঠা-নামা হ্রাস করে।

(৬) **পুনঃ-রপ্তানী সুবিধা (Re-export Facility) :** যে সমস্ত মাল পুনঃ রপ্তানীর জন্য আমদানী হয় উহা ডকের নিকট মালগুদামে মজুত রাখিতে পারিলে স্থানান্তর ব্যয় কমিয়া যায়। 'মালগুদাম' এরূপ সুযোগ-সুবিধা দিয়া থাকে।

(৭) **খরিদ্দারদের সুবিধা (Facility to Customers) :** বিক্রয়যোগ্য বাজারের সন্নিকটে মাল মজুত রাখিতে পারিলে খরিদ্দারদের পক্ষে অনায়াসে অল্প ব্যয়ে ও সময়ে মাল গ্রহণ করার সুবিধা হয়। অনেক ব্যবসাকেন্দ্রে মালগুদাম এরূপ সুযোগ-সুবিধা দিয়া থাকে।

(৮) **সাহায্যকারী কাজ-কারবার (Ancillary Services) :** যাহারা বড় বড় মালগুদামের মালিক তাহারা মালগুদামের সহিত মাল উঠানো-নামানো ও মজুতকরণের আধুনিক যন্ত্রপাতি, মাল আদান-প্রদানের বাহন প্রভৃতির ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। মালের মালিকের পক্ষে এই সমস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি বা বাহন লইয়া গিয়া মাল উঠানো-নামানো বা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং মালগুদাম এ বিষয়ে অশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে।

(৯) **ঋণের সুবিধা (Facility for Loan) :** মালের মালিক কোন সময়ে অর্থের প্রয়োজন অনুভব করিলে গুদামজাত মাল বন্ধক রাখিয়া মালগুদামের মালিকের

নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ ঋণের সুবিধাও মালগুদামের মালিকগণ দিয়া থাকেন।

উপরি-উক্ত আলোচনায় মালগুদামের গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। বর্তমান ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা অসীম। ইহা ভিন্ন কখনই শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য কোনটাই সবিশেষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সুতরাং দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে যত বেশী সংখ্যক মালগুদাম প্রতিষ্ঠিত হইবে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। আমাদের দেশে দরিদ্র কৃষকশ্রেণী পল্লী অঞ্চলে মালগুদামের অভাবে অনেকক্ষেত্রে তাহাদের কৃষিজাত পণ্য অল্পমূল্যে দালালের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। মালগুদাম ইহাদের আর্থিক উন্নতিতে যে পরম সহায়ক হইতে পারে ইহা বলাই বাহুল্য। মালগুদামে মাল মজুত রাখিলে তজ্জন্য ভাড়া দিতে হয়। ইহাতে যে ব্যয় হয় তাহার তুলনায় যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় তাহার মূল্য অনেক বেশী। মালের মালিকের নিকট হইতে যে ভাড়া আদায় হয় উহাই মালগুদামের মালিকের মালগুদাম বাবদ আয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে পণ্য গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। কিন্তু কৃষিজাত এবং শিল্পজাত পণ্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত ইহার গুরুত্বও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে সরকার এদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন এবং গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার যাহাতে যথাযথ উন্নতি হয় তাহার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। ইহার ফলে দেশের মধ্যে বিভিন্ন মালিকানায় অনেক গুদাম স্থাপিত হইয়াছে এবং আরও স্থাপিত হইতে যাইতেছে। এই গুদামগুলিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

(ক) ব্যক্তিগত গুদাম—ইহা ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত এবং উহার মালিকদের নিজস্ব পণ্য উহাতে গুদামজাত হইয়া থাকে।

(খ) সাধারণ গুদাম—ইহা বিভিন্ন ব্যবসায়ীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং ভাড়ার বিনিময়ে ইহাতে যে-কেহ পণ্য মজুত রাখিতে পারেন।

(গ) সমবায় গুদাম—ইহা সমবায় প্রথায় কতিপয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায় স্থাপিত। ইহাতে কৃষি ও কুটির শিল্পজাত পণ্যাদিই সাধারণত মজুত থাকে।

(ঘ) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্থাপিত গুদাম—ভারত সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় গুদাম কর্পোরেশন এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক রাজ্যগুদাম কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে যে গুদাম স্থাপিত হইতেছে উহাই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্থাপিত গুদাম। ভাড়ার বিনিময়ে যে-কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইহাতে পণ্য মজুত রাখিতে পারেন।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এবং সমবায় প্রথায় গুদাম স্থাপনের প্রেরণা স্বাধীনতা লাভের পর পাওয়া যায়। এই উদ্যোগ কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিখিল ভারত গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি স্থাপিত হয়। এই কমিটির সুপারিশ ক্রমে ১৯৫৬ সালে কৃষিজাত পণ্য (উন্নয়ন ও গুদামজাতকরণ) [Agricultural Produce

(Development and Warehousing)] কর্পোরেশন আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে National Co-operative Development and Warehousing Board (N. C. D. W. B.) স্থাপিত হয়। পণ্য মজুত, সংরক্ষণ ও খালাসের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে সর্বাধুনিক গুদাম নির্মাণ করার পরিকল্পনা এই বোর্ড গ্রহণ করেন। উহার পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় গুদাম কর্পোরেশন এবং রাজ্য গুদাম কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। এই কর্পোরেশনের মূলধন কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, সমবায় সমিতি ও বীমা কর্পোরেশন যোগান দিয়া থাকে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে ১০০টি গুদাম নির্মাণের ভার কেন্দ্রীয় গুদাম কর্পোরেশনের উপর, ২৫০টি গুদাম নির্মাণের ভার রাজ্য গুদাম কর্পোরেশনের উপর অর্পিত হয়। উহাতে ১০ লক্ষ টন পণ্য মজুতের ব্যবস্থা হইবে স্থির করা হয়। অবশ্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ৩৫০টি গুদামের মধ্যে ২৩৫টি গুদাম নির্মিত হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত গুদাম নির্মিত না হইলেও গুদাম নির্মাণ কার্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে একথা বলা চলে। বর্তমানে এরূপ গুদামের সংখ্যা ছয় শতেরও অধিক হইয়াছে এবং উহা যে ভবিষ্যতে আরও উন্নতি লাভ করিবে এ আশা আমরা অনায়াসে করিতে পারি।

চুক্তিবদ্ধ মালগুদাম (Bonded Warehouse)

কোন মালগুদামের মালিক তাহার গুদামে নিরাপদে মাল মজুত রাখার এবং শুল্ক প্রদান করার পূর্বে উক্ত মাল না-ছাড় করার চুক্তিতে প্রতিজ্ঞাপত্র (Bond) লিখিয়া দিয়া শুল্ক কর্তৃপক্ষের (Customs Authorities) সাহত চুক্তিবদ্ধ হইলে উহাকে 'চুক্তিবদ্ধ মালগুদাম' (Bonded Warehouse) বলা হয়। মালের প্রকারভেদ অনুযায়ী চুক্তির সর্তাবলী রচিত হয়। ইহার বিশেষ ও প্রধান সর্ত হইতেছে মাল রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাপারে বিশেষ যত্ন লওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান। শুল্ক কর্তৃপক্ষের কর্মচারিগণ এরূপ মালগুদামের তত্ত্বাবধানকার্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সরকারী প্রহরীও মোতায়েন করা হয়। আমদানিকৃত মালের শুল্ক জাহাজ হইতে মাল খালাসের সময় না দিতে পারিলে উক্ত মাল এখানে মজুত রাখিতে হয় এবং পরে একযোগে কিংবা ক্রমান্বয়ে শুল্ক প্রদান করিয়া গুদাম হইতে মাল খালাস করিতে হয়। এরূপ মালগুদামে মাল রাখিতে হইলে শুল্ক কর্তৃপক্ষকে প্রথমে Entry for Warehousing প্রপত্র বা ফরম (form)-এ মালের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া দিতে হয় এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষ উহা পরীক্ষা করার পর মাল গুদামে প্রেরণের ও মজুত রাখার আদেশ দিয়া থাকেন। গুদামে মাল রাখার পর উক্ত মালের জন্য 'Warehouse Keeper's Receipts' গ্রহণ করিতে হয়। পরে শুল্ক প্রদান করিয়া 'Warehouse Keeper's Order' অনুযায়ী গুদাম হইতে মাল খালাস কর হয়।

চুক্তিবদ্ধ মালগুদামের সুবিধা নিম্নলিখিত উপায়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) যে আমদানীকারক তাঁহার আমদানীকৃত মালের শুল্ক বাবদ দেয় টাকা জাহাজ

হইতে মাল খালাস করার সময় দিতে অপারগ বা শুল্ক বাবদ দেয় টাকা রাখিতে অনিচ্ছুক তিনি উক্ত আমদানীকৃত মাল 'চুক্তিবদ্ধ মালগুদামে' গচ্ছিত রাখার সুবিধা পাইয়া থাকেন এবং পরে ক্রমান্বয়ে বা একযোগে শুল্ক প্রদান করিয়া উক্ত গুদাম হইতে মাল লইয়া যাইতে পারেন। আমদানী বাণিজ্যে এরূপ ব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। 'চুক্তিবদ্ধ মালগুদাম' এরূপ সুবিধা দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে।

(২) উক্ত গুদামজাত মাল প্রয়োজনবোধে আমদানীকারক ঐস্থান হইতেই মাল বাছাই, শ্রেণী-বিভাগ, মোড়াই, প্রদর্শন, পরীক্ষা প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন এবং এভাবে ঐস্থান হইতে মাল বিক্রয়ের কাজও সমাধা করিতে পারেন।

(৩) যে সমস্ত মাল পুনঃ-রপ্তানীর জন্য আমদানী হয় তাহার জন্য আমদানী শুল্ক প্রদান করিয়া পুনরায় মাল রপ্তানী হইলে উক্ত শুল্ক ফেরত চাওয়া বা পাওয়া অত্যন্ত ঝঞ্ঝাটের কাজ। উক্ত ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে শুল্ক না দিয়া 'চুক্তিবদ্ধ গুদামে' মাল রাখা চলে এবং তথা হইতে রপ্তানী করা চলে। ইহাতে একদিকে আমদানী শুল্ক বাবদ টাকা অযথা যেমন আটক না রাখিলে চলে তেমনই স্থানান্তর ব্যয়ও অনেক বাঁচিয়া যায়। ইহাতে গুদাম ভাড়া বাবদ টাকা লাগিলেও অনেক ব্যয় সংক্ষেপ হয় এবং নানাপ্রকার অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(৪) রপ্তানীযোগ্য মালও শুল্ক প্রদান না করিয়া সরাসরি 'চুক্তিবদ্ধ মালগুদামে' পাঠানো যায় এবং তথা হইতে প্রয়োজনীয় রপ্তানী শুল্ক দিয়া সহজ উপায়ে মাল রপ্তানী করা যায়

(৫) রপ্তানীযোগ্য মালেরও এখান হইতে শ্রেণী বিভাগ, মিশ্রণ, মোড়াই প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন হইতে পারে।

বহনপত্র বা চালানা রসিদ এবং জাহাজ ভাড়া চুক্তিপত্র (Bill of Lading and Charter Party)

পণ্যের বিবরণ ও মাশুলের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখসহ জাহাজে মাল বহনের সম্পাদিত চুক্তিপত্রকে বহনপত্র (Bill of Lading) বলে। ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য :

(ক) যে মাল জাহাজে প্রেরিত হইল ইহা উক্ত মাল প্রাপ্তি স্বীকারপত্র।

(খ) ইহা জাহাজ কোম্পানী এবং রপ্তানীকারকের মধ্যে মাল বহনের চুক্তিপত্র।

(গ) ইহা মালের আইনসঙ্গত মালিকানা দলিল। সুতরাং ইহা যাঁহার অধিকারে থাকিবে, তিনি উক্ত দলিলের বলে বন্দরের জাহাজ হইতে দলিলে উল্লিখিত মাল গ্রহণ করিতে পারেন।

(ঘ) যদিও ইহা হস্তান্তরযোগ্য দলিল নহে, তথাপি বাস্তবক্ষেত্রে ইহা হস্তান্তরযোগ্য দলিলের মত কাজ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা পিঠসহি বা পিঠসহি ছাড়া হাতবদল

হইতে পারে কিন্তু হস্তান্তরযোগ্য দলিলের মত ইহার ধারক হস্তান্তরকারীর স্বত্ব অপেক্ষা ভাল স্বত্ব পান না।

(ঙ) ইহা 'মাশুল দেয়' (Freight Paid) অথবা 'মাশুল অদেয়' (Freight not Paid) হইতে পারে। 'মাশুল দেয' অর্থ পণ্যপ্রেরক পণ্যপ্রেরণের মাশুল পণ্যপ্রেরণের সময় প্রদান করিয়াছেন। আর 'মাশুল অদেয়' অর্থ পণ্যপ্রেরক উহা প্রদান করেন নাই। পণ্য প্রত্যর্পণের সময় পণ্য-গ্রহীতা উহা প্রদান করিবেন।

(চ) ইহা 'নির্দোষ বহনপত্র' (Clean Bill of Lading) অথবা 'ত্রুটিযুক্ত বহনপত্র' (Foul Bill of Lading) হইতে পারে। যে পণ্য প্রেরিত হইল উহাতে কোন দোষ ত্রুটি না থাকিলে উহার জন্য যে বহনপত্র দেওয়া হয় উহাকে 'নির্দোষ বহনপত্র' বলে। আর যে পণ্য প্রেরিত হইল উহাতে কোন দোষ-ত্রুটি ধরা পড়িলে 'ত্রুটিযুক্ত বহনপত্র' দেওযা হয়। 'নির্দোষ বহনপত্র' হস্তান্তর হওয়াও বাঞ্ছনীয়। যেমন প্যাকিং ঠিকমত না হইলে 'ত্রুটিযুক্ত বহনপত্র' দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু পণ্যপ্রেরক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও 'নির্দোষ বহনপত্র' পাইতে ইচ্ছা করিলে জাহাজ কোম্পানীকে একখানা 'ক্ষতিপূরণের দলিল' (Letter of Indemnity) দিতে হয়। ইহার ফলে মালের কোন ক্ষতি হইলে জাহাজ কোম্পানী উহার জন্য দায়ী থাকে না।

(ছ) সাধারণত ইহার পাঁচ কপি (Five Copies) প্রস্তুত করিতে হয়। তিন কপি বিভিন্ন ডাকে আমদানীকারককে পাঠাইতে হয়। এক কপি জাহাজ কোম্পানীর নিকট থাকে এবং আর এক কপি পণ্যপ্রেরকের নিকট থাকে।

(জ) ইহা সাধারণত পণ্যপ্রেরক কর্তৃক লিখিত হইয়া থাকে এবং জাহাজ কোম্পানী উহা পরীক্ষা ও সহি করিয়া পণ্যপ্রেরককে দিয়া থাকে।

(ঝ) ইহাতে জাহাজের নাম, জাহাজ কোম্পানীর নাম, জাহাজের গন্তব্যস্থল, পণ্য বোঝাইয়ের বন্দরের নাম, পণ্যের যাবতীয় বিবরণ, পণ্য খালাসের স্থান, পণ্য-প্রেরকের নাম, পণ্যগ্রহীতার নাম, পণ্যের ও মাশুলের পরিমাণ ইত্যাদি সংবাদ লিখিত হইয়া থাকে।

পণ্য পরিবহনের উদ্দেশ্যে কোনও জাহাজের সমগ্র অংশ কিংবা উহার অংশবিশেষ কোনও নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রার কিংবা কোনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়া হইলে উক্ত সম্পাদিত চুক্তিতে জাহাজ ভাড়ার চুক্তিপত্র (Charter Party) বলে। এই জাহাজ ভাড়া চুক্তিপত্রে উভয়পক্ষের নাম-ঠিকানা, চুক্তিপত্রের প্রকৃতি, জাহাজের নাব্যতা, বাহিত পণ্যের পরিমাণ, ভাড়ার পরিমাণ, পণ্য বোঝাই ও খালাসের জন্য 'ছাড় সময়' (Lay Days) প্রভৃতি উল্লেখ থাকে। এরূপ চুক্তিপত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি অপ্রকাশিত (Implied) শর্ত উল্লেখযোগ্য : (১) যাত্রাকালে জাহাজের উপযুক্ত নাব্যতা, (২) নির্দিষ্ট তারিখে ও সময়ে সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতি, (৩) বিশেষ কারণ ভিন্ন জাহাজের যাত্রাপথের অপরিবর্তনীয়তা, (৪) পণ্য বোঝাইয়ের জন্য নির্ধারিত বন্দরে জাহাজ ভিড়ানো এবং (৫) যিনি জাহাজ ভাড়া লইয়াছেন তিনি জাহাজের

মালিকের অজ্ঞাতসারে কোন বিপজ্জনক বা বে-আইনী পণ্য জাহাজে পাঠাইতেছেন না।

বহনপত্র (Bill of Lading) এবং জাহাজ ভাড়ার চুক্তিপত্রের (Charter Party) মধ্যে নিম্নলিখিত **পার্থক্য** উল্লেখযোগ্য :

(ক) বহনপত্র মালগ্রহণ ও বহনের প্রামাণ্য রসিদ। কিন্তু জাহাজ ভাড়া চুক্তিপত্র ভাড়ারই চুক্তি। ইহাতে মাল গ্রহণের বা বহনের চুক্তি সম্পর্কে কিছু লেখা থাকে না।

(খ) বহনপত্র পণ্য গ্রহণ ও বহনের চুক্তি হইলেও জাহাজ ভাড়ার প্রশ্ন ইহার সহিত জড়িত। কিন্তু জাহাজ ভাড়া চুক্তিপত্রে জাহাজ ভাড়া ছাড়া পণ্য গ্রহণ ও বহন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ইহার সহিত জড়িত নয়।

(গ) কোনও বহনপত্রে উল্লিখিত পণ্য পরিবহনের জন্য জাহাজের স্বল্প পরিমাণ স্থান অধিকৃত হয়। কিন্তু জাহাজ ভাড়ার চুক্তিপত্র অনুযায়ী সাধারণত সমগ্র জাহাজ কিংবা জাহাজের অধিকাংশ স্থান অধিকৃত হয়।

(ঘ) উভয় দলিলে লিখিত চুক্তির ধারা এবং অপ্রকাশিত শর্তাদি একপ্রকার নয়।

(ঙ) বহনপত্র হস্তান্তরযোগ্য দলিল না হইলেও উহা হস্তান্তর করা যায়। কিন্তু জাহাজ ভাড়ার চুক্তিপত্র হস্তান্তরযোগ্য দলিলও নয় এবং উহা হস্তান্তর করাও যায় না।

মৃতমাশুল (Dead Freight)

পণ্যপ্রেরণের জন্য জাহাজের নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থান নির্দিষ্ট মাশুলে ভাড়া লইয়া যদি পণ্য-প্রেরক উহা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার না করেন তবে অব্যবহৃত স্থানের জন্য জাহাজের মালিক উহার নিকট হইতে নির্দিষ্ট মাশুল অপেক্ষা কিছু কম হারে মাশুল গ্রহণ করিয়া থাকেন। উক্ত মাশুলকে মৃতমাশুল বলা হয়।

পরিদর্শনী (Primage)

জাহাজে যে পণ্য বোঝাই হয় উহা পরিদর্শনের জন্য পণ্য-প্রেরকের নিকট হইতে পণ্যমাশুলের শতকরা ১০ ভাগ বেশী আদায় করা হয়। উক্ত অতিরিক্ত মাশুলকে পরিদর্শনী বলে।

কড়তা (Tare)

যাহার ভিতর পণ্য প্রেরণ করা হয় যথা, প্যাকিং বাক্স, মোড়ক প্রভৃতি উহার ওজনকে কড়তা বলা হয়। মোট ওজন হইতে কড়তা বাদ দিলে পণ্যের ওজন পাওয়া যায়।

চলতা (Draft)

পণ্য পুনঃপুনঃ হস্তান্তর বা উঠানো-নামানোর ফলে উহার ওজনের যে ঘাট্‌তি বা

হ্রাস ঘটে উহাকে চলতা বলে। এরূপ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে চলতার জন্য মূল্য কিছু বাদ পাওয়া যায়।

লিপিবদ্ধকরণ (Noting)

যে সকল পণ্যের রপ্তানীর জন্য শুল্ক দিতে হয় এবং যে সকল পণ্যের রপ্তানীর জন্য শুল্ক দিতে হয় না উহা শুল্ক দপ্তরের খাতায় লিখিয়া দিতে হয়। উক্ত লিখনকে লিপিবদ্ধকরণ বলে। ইহার সাহায্যে শুল্ক ধার্য করার সুবিধা হয়।

পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান (Rummaging)

শুল্ক প্রদেয় ও নিষিদ্ধ পণ্যের চোরাই চালান সন্দেহ হইলে শুল্ক কর্তৃপক্ষ জাহাজে যে রীতিমত অনুসন্ধান কার্য চালান উহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান বলে। চোরাই চালান বন্ধ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

জিম্মা রসিদ (Trust Receipt)

আমদানীকারকের পণ্য আমদানীর জন্য ঋণের প্রয়োজন হইলে তিনি সমস্ত জাহাজী দলিল (Shipping Documents) ও পণ্যের মালিকানা স্বত্ব (Title of the Goods) ব্যাঙ্ককে হস্তান্তর দ্বারা ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন। উক্ত ঋণ পরিশোধ করার পূর্বে আমদানীকৃত পণ্য খালাস করিবার প্রয়োজনে জাহাজী দলিলাদি আবশ্যক হইলে ব্যাঙ্ককে একখানা রসিদ দিয়া উক্ত দলিলাদি গ্রহণ করা চলে। এই রসিদকে জিম্মা রসিদ বলা হয়। পরে পণ্য বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হয়। জিম্মা রসিদ দিয়া দলিলাদি গ্রহণ করিলেও পণ্যের মালিকানা স্বত্ব ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাঙ্কেরই থাকিয়া যায়। আমদানীকারক এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্কের পক্ষে শুধু পণ্যের জিম্মাদার থাকেন। এরূপ জিম্মাদার হিসাবে থাকা অবস্থায় আমদানীকারককে উক্ত পণ্যাদি পৃথক্‌ভাবে রাখিতে হয় এবং ব্যাঙ্কের নামে উহার বীমা করিয়া রাখিতে হয়। ব্যাঙ্ক যে-কোন সময় উক্ত জিম্মা রসিদ বাতিল করিয়া পণ্যের দখল লইতে পারে।

ঋণপত্র (Debenture)

শুল্ক ফেরত দেওয়ার স্বীকৃতি হিসাবে সরকার যে দলিল প্রদান করেন উহাকে ঋণপত্র বলা হয়। এই ঋণপত্র কথাটি কোনও কোম্পানী ঋণ গ্রহণের জন্য যে দলিল প্রদান করিয়া থাকে উহাকে বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. Discuss the salient features of Government control on foreign trade of India [C. U. B. Com. (Hons.) 1971]

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

2. Describe the formalities you would be required to observe for importing capital goods in India.

[C. U. B. Com. (Pass) 1964]

ভারতে মূলধনীয় মালপত্র আমদানী করিতে হইলে যে নিয়ম-কানুন পালন করিতে হয় উহার বিবরণ দাও।

3. Describe briefly different stages through which an imported torch light should pass from its entry into the port to the ultimate consumer. [C. U. B. Com. (Pass) 1966]

যে যে পর্যায়ের মধ্য দিয়া আমদানীকৃত 'টর্চ লাইট' বন্দরে প্রবেশ হইতে উহার শেষ পর্যায়ের সম্ভোগকারীর নিকট পৌছাইবে সংক্ষেপে উহার বিবরণ দাও।

4. What formalities will you be required to observe if you want to import motor parts from the United Kingdom ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1966]

যুক্তরাজ্য হইতে মোটরের অংশ আমদানী করিতে হইলে কি কি আইন-কানুন পালন করিবে ?

5. What formalities an importer in India is required to observe up to the stage of clearance of imported goods from the port ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1967]

আমদানীকৃত মাল বন্দর হইতে খালাস করা পর্যন্ত ভারতের একজন আমদানীকারক কি কি নিয়ম-কানুন পালন করিবে ?

6. Describe the procedure you would be required to follow for exporting jute goods from India.

[C. U. B. Com. (Pass) 1966]

ভারত হইতে পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানীর জন্য কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করিবে বর্ণনা কর।

7. What is the machinery of the Government of India for controlling imports ? Do you think in a developing country, in normal times, import restrictions on capital goods are justified ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1963]

ভারত সরকারের আমদানী নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ব্যবস্থা কিরূপ ? স্বাভাবিক অবস্থায় কোনও উন্নতিশীল দেশে মূলধনীয় দ্রব্যাদি আমদানীর বাধা থাকা কি যুক্তিসঙ্গত ?

8. What are the reasons for adoption in our country of the policy of import control ? If a businessman wants to import some goods, what steps should be taken by him to obtain an import licence ? [C. U. B. Com. (Hons.) 1967]

আমাদের দেশে আমদানী নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করার কারণ কি ? একজন ব্যবসায়ী যদি কিছু দ্রব্য আমদানী করিতে চান, তবে তাঁহাকে আমদানীর অনুমতিপত্র পাইতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ?

9. What steps have been taken by the Government in order to encourage export trade ? Is there any specialised institution for providing safeguards against export risks ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

রপ্তানী বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ? রপ্তানীর ঝুঁকির নিরাপত্তার জন্য কি কোন বিশেষ সংস্থা আছে ?

10. The biggest difficulty in the development of industries is insufficient availability of foreign exchange. How is this problem being tackled by the Government ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1966]

শিল্পোন্নয়নের সবচেয়ে বড় অসুবিধা বৈদেশিক মুদ্রার অপ্রাচুর্য। সরকার এই সমস্যা সমাধানের কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

11. Discuss the organisation and functions of Export Promotion Councils.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1967]

রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদের সংগঠন এবং কার্যাবলী আলোচনা কর।

12. Critically examine the steps that have been taken by the Government to develop India's export trade.

[C. U. B. Com. (Pass) 1968]

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য যে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে উহার সমালোচনামূলক আলোচনা কর।

13. To promote India's exports, what measures have been adopted by the Government of India ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1968]

ভারতে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

14. Examine the steps taken by the Government for boosting up India's exports.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1969]

ভারতে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন উহার আলোচনা কর।

15. Give an outline of a scheme you would like to recommend for distribution of rice and other essential commodities through a State Trading Corporation.

[C. U. B. Com. (Pass) 1965]

ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের মাধ্যমে চাউল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বণ্টন করার যে পরিকল্পনা সুপারিশ কর উহার বিবরণ দাও।

16. West Bengal is now going in for wholesale rationing of foodgrains. What should be your suggestions for procurement and distribution of foodgrains ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1966]

পশ্চিমবঙ্গ এখন খাদ্যশস্যের সম্পূর্ণ 'র‍্যাশন' করিতে যাইতেছে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যাপারে তোমার কি প্রস্তাব হওয়া উচিত ?

17. Mention three main items of India's export. How export trade is usually financed ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1966]

ভারতের প্রধান তিনটি রপ্তানী দ্রব্যের নাম উল্লেখ কর। সাধারণত রপ্তানী বাণিজ্য কিভাবে অর্থ-সংক্রান্ত সাহায্য পায় ?

18. How Petroleum products, including kerosene, are distributed in different parts of India ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1969]

কেরোসিনসহ পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কিভাবে বণ্টন করা হয় ?

19. Enumerate the functions of Warehousing and discuss the present state of oragnisation of Warehouses in India.

[C. U. B. Com. (Pass) 1965]

মালগুদামের কাজ বর্ণনা কর এবং ভারতে মালগুদাম সংগঠনের বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর।

20. What is a Bonded Warehouse ? Discuss its importance.

চুক্তিবদ্ধ মালগুদাম কাহাকে বলে ? উহার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

21. State what you know about the following :

Bill of Lading, Charter Party, Customs Duty, Ad Valorem Duty, Drawback, Price Quotations, Dead Freight. Primage, Rummaging, Trust Receipt.

নিম্নলিখিতগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :

বহনপত্র, জাহাজ ভাড়ার চুক্তি, বাণিজ্য শুল্ক, মূল্যানুসারে শুল্ক, প্রত্যর্পণযোগ্য শুল্ক, মূল্যজ্ঞাপন, মৃতমাশুল, পরিদর্শনী, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, জিম্মা রসিদ।

22. Describe the procedure for clearing a consignment of imported machinery through Customs and Port Authorities.

[C. U. B. Com. (Pass) 1972]

শুল্ক ও বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির একটি চালান খালাস করিবার কার্যক্রম বর্ণনা কর।

23. Enumerate the procedure for exporting a consignment of sugar from India to Ceylon. [C. U. B. Com. (Pass) 1973]

চিনির একটি চালান ভারত হইতে সিংহলে রপ্তানী করিবার কার্যক্রম বর্ণনা কর।

24. Discuss the functions and importance of various institutions connected with the promotion of Indian foreign trade.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1973]

বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারকল্পে যে সকল সংস্থা নিয়োজিত উহাদের কাজ ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

25. Discuss the organisation and functions of any Bonded Warehouse. [C. U. B. Com. (Pass) 1973]

যে কোনও শুল্কাধীন মালগুদামের সংগঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

ঊনবিংশ অধ্যায়

প্রচার, বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়কলা

(Publicity, Advertisement and Salesmanship)

প্রচার ও বিজ্ঞাপন (Publicity and Advertisement)

জনসাধারণের সহিত কোন নীতি, আদর্শ, বিষয় কিংবা পণ্যসামগ্রীর পরিচয় ঘটাইবার প্রচেষ্টাকে 'প্রচার' (Publicity) বলা হয়।

পণ্যসামগ্রীর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচয় ঘটাইবার প্রচেষ্টাকে 'বিজ্ঞাপন' (Advertisement) বলা হয়।

যদিও উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষেত্রে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন তথাপি নিম্নলিখিত-ভাবে উহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা চলে :

(১) কোনও নীতি, আদর্শ, বিষয় বা পণ্যসামগ্রীর সহিত জনসাধারণের পরিচয় ঘটাইবার প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'প্রচার'। কিন্তু শুধু পণ্যসামগ্রীর সহিত সম্ভাব্য ক্রেতাসাধারণের পরিচয় ঘটাইবার প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'বিজ্ঞাপন'।

(২) 'প্রচারের' কাজ ব্যাপক ও বৃহত্তর মানব-সমাজকে লইয়া। 'বিজ্ঞাপনের' কাজ সংকীর্ণ ও ক্রেতাসাধারণকে লইয়া। সুতরাং 'বিজ্ঞাপন' 'প্রচারে'র একটি অংশ-বিশেষ এবং ইহাদের পার্থক্য সমগ্র ও অংশের মধ্যে পার্থক্যের মত। "Publicity is a large genus of which advertisement is a species".

(৩) 'বিজ্ঞাপনের' কাজ শুধু ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া কিন্তু 'প্রচারের' কাজ সর্বতোমুখী।

(৪) 'প্রচারের' কাজ অনেকক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক এবং মুনাফা বর্জিত। তখন ইহা বাস্তব সত্যই প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু 'বিজ্ঞাপনের' কাজ জনকল্যাণমূলক হইলেও উহা মুনাফা বর্জিত নহে।

(৫) 'প্রচার' সর্বতোমুখী না হইয়া একধারায়ও প্রবাহিত হইতে পারে। তখন উহা বিজ্ঞাপনের রূপও গ্রহণ করিতে পারে কিংবা বিজ্ঞাপন হইতে স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করিতে পারে। এই স্বতন্ত্র রূপকে 'পক্ষপাতমূলক প্রচার' (Propaganda) বলা যাইতে পারে। ইহাতে আংশিক সত্য প্রকাশ পায়। নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচারকে এই 'পক্ষপাতমূলক প্রচার' বলা চলে।

(৬) বিজ্ঞাপন মুদ্রিত আকারেই সাধারণত প্রকাশিত হইয়া থাকে। এজন্য ইহাকে 'মুদ্রিত বিক্রয়কলা' (Printed Salesmanship) বলা হয়। প্রচার মুদ্রিত বা অমুদ্রিত দুই প্রকারেই হইতে পারে।

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব (Objects and importance of Advertisement)

পণ্য বিক্রয়ের ব্যাপারে বিজ্ঞাপন বিশেষ প্রয়োজন। সম্ভাব্য ক্রেতার সহিত পণ্যের পরিচয় না ঘটিলে জিনিস বিক্রয় খুব কমই হইয়া থাকে। পূর্বে যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিসর খুব সংকীর্ণ ছিল তখন বিক্রেতা হয়ত তাঁহার বিক্রয়যোগ্য পণ্য তাহার নিজের কথাবার্তার দ্বারা সম্ভাব্য ক্রেতার গোচরে আনিতে পারিত। তাহার দোকানে বা ব্যবসাস্থলে লোক আনাগোনার ফলে জিনিসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রচার ঘটিত। কিন্তু বর্তমানে বৃহৎ পরিসরে উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পৃথিবীব্যাপী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ায় অনেকক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন ভিন্ন বিক্রয়যোগ্য পণ্য ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের গোচরে আনা সম্ভব হয় না। বিজ্ঞাপনের সাহায্যে পণ্যের সংবাদ ক্রেতার গোচরে আনিলেই বিজ্ঞাপনের কাজ শেষ হয় না। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে জিনিসের উৎকর্ষ, উহার সার্থকতা, আপেক্ষিক মূল্য, স্বল্পতা প্রভৃতি সম্বন্ধে ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়া পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করিতে পারিলে বিজ্ঞাপনের সার্থকতা দেখা দিবে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা যে **উদ্দেশ্য, উপকার ও কাজ** সাধন করিতে হয় বা করা যায় নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল :

(১) বিজ্ঞাপনের সাহায্যে প্রচলিত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ইহার দ্বারা যত বেশী লোকের মধ্যে জিনিসের প্রচার হইবে উহার বিক্রয়ও ততোধিক বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে।

(২) ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি নূতন জিনিসের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপনের মারফত জানিতে পারেন। ইহার ফলে নূতন জিনিসের চাহিদা সৃষ্টি হইবে এবং উহার বিক্রয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

(৩) প্রতিযোগিতার বাজারে একই জিনিস অনেক প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করিয়া থাকে। কোন প্রতিষ্ঠানের জিনিস অন্যের তুলনায় প্রাধান্যলাভ করিবে কিনা উহা বিজ্ঞাপন স্থির করিয়া দিতে পারে। কারণ অনেকক্ষেত্রে ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করিয়াই জিনিসের গুণাগুণ স্থির করেন। এরূপ অবস্থায় যাঁহার বিজ্ঞাপন যত বেশী মনোজ্ঞ ও আকর্ষণযোগ্য হইবে ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি তাহার দ্বারাই তত বেশী প্রলুব্ধ হইবেন এরূপ সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। সুতরাং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে জিনিসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত বাহন বিজ্ঞাপন।

(৪) বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া জিনিস ব্যবহারের পর উহার উৎকর্ষ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইলে জিনিসের খ্যাতি বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের প্রসার ও সুনাম (Goodwill) প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৫) বিজ্ঞাপনের ফলে জিনিসের কাট্‌তি বাড়িলে উহার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আয়তনও বৃদ্ধি পায়। ইহাতে অধিক লোক নিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

(৬) বিজ্ঞাপনের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে উহাতে যদি 'ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি' (Law of Increasing Return) দেখা দেয় তবে ক্রমেই উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং ক্রেতাও সস্তাদরে জিনিস ক্রয় করিতে সক্ষম হন।

(৭) কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের এভাবে আয়তন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে উহার জিনিস উৎপাদনের জন্য যে-সমস্ত মালমশলা প্রয়োজন হইবে তাহারও চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে উক্ত মালমশলা উৎপাদনকারীদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাইবে। এইভাবে বিজ্ঞাপনের ফলে একের উন্নতিতে অপরেরও উন্নতি সংঘটিত হয়।

(৮) যে জিনিসের কাট্‌তি এইভাবে বৃদ্ধি পাইবে তাহার এবং তৎসংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিলে, পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী, দালাল, যানবাহন প্রভৃতির কাজ-কারবার বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ ঘটিয়া যায়।

(৯) যাহাতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সেই সমস্ত সংবাদপত্র, মাসিকপত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেরও ইহা হইতে একটা মোটা টাকা আয় হয়।

(১০) সম্ভাব্য ক্রেতাও বিজ্ঞাপনের সাহায্যে তাহার কি প্রয়োজন, কি ব্যবহার করা উচিত, কোথায় উহা পাওয়া যাইতে পারে এবং কাহার নিকট হইতে উহা ক্রয় করা উচিত ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

(১১) যাঁহারা বিজ্ঞাপন রচনা করিয়া থাকেন বা লিখিয়া থাকেন একাধারে যেমন তাঁহাদের কর্মসংস্থান হয় অন্যদিকে তাঁহারা বিজ্ঞাপনের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সচেষ্ট থাকেন। ফলে, কলানৈপুণ্য বৃদ্ধি পায় এবং তাঁহাদের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ ঘটে।

(১২) বিজ্ঞাপনের ফলে নানাপ্রকার জিনিসের যে চাহিদা সৃষ্টি হয় তাহাতে লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি কার্যকরী হইলে বিজ্ঞাপন নূতন ক্রেতা সৃষ্টি করিতে পারিবে এবং পুরাতন ক্রেতাও বজায় রাখিতে পারিবে। কারণ সুনাম একবার অর্জিত হইলে এবং উহা বজায় থাকিলে ক্রেতা সংগ্রহের কোন অসুবিধা হয় না।

সুতরাং বিজ্ঞাপনের সাফল্যে শুধু পণ্য উৎপাদক বা ব্যবসায়ীই উপকৃত হয় না, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকও ইহার ফলে উপকৃত হয়। 'It sets a virtuous circle in motion.' এক কথায় বিজ্ঞাপন সমাজকল্যাণকর। বিজ্ঞাপনকে সমাজকল্যাণকর হইতে হইলে উহার উদ্দেশ্য সৎ ও মহৎ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা যে বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপনের সহিত পরিচিত ইহার সবগুলিই যে ভাল এবং আমাদের সঠিক পথনির্দেশ করিতে পারে ইহা কখনই বলা চলে না। অসৎ উদ্দেশ্য লইয়াও অনেক ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন এবং বিজ্ঞাপনের জমকাল ধোঁকা সাজাইয়া লাভবান হইবার চেষ্টা করেন। ইহাতে ক্রেতা বা জনসাধারণ যে প্রবঞ্চিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং এরূপ প্রবঞ্চনা হইতে সকলকে সতর্ক হইতে

হইবে। আর এরূপ ধোঁকাবাজী স্বল্পকাল স্থায়ী। ইহার দ্বারা কখনই স্থায়ী লাভ সম্ভব নহে। কারণ "You can befool some people for all time, all people for some time, but not all people for all time".

বিজ্ঞাপনের জন্য অর্থব্যয় (Advertisemet Expenditure)

বিজ্ঞাপন ব্যয়বহুল। সুতরাং ইহা একটি অপব্যয় (Waste), ইহাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং অযথা মানুষকে জিনিস কিনিতে প্রলুব্ধ করে। তাহার বিচার-বুদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করে, অনেক বিক্রেতা ইহার সাহায্যে একচেটিয়া বাজার গঠন করিতে সক্ষম হয়। ইহার ফলে জনসাধারণ নানাভাবে অভিভূত হয়। অনেকে মনে করেন—যাহা কিছু ছাপার অক্ষরে লেখা হয় উহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। বিজ্ঞাপন এখন একটি চারুকলা। ইহার বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গী পরম জ্ঞানী ব্যক্তিকেও মুগ্ধ করিতে পারে। একই বস্তুর মহিমা নানাস্থানে নানা ভাষায় এবং নানা ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইতে থাকিলে লোকের মনে উহা বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে তৎপর হয়। আবার চতুর বিজ্ঞাপনদাতা মিথ্যা জিনিসের বিজ্ঞাপন আইন বাঁচাইয়া, নিজের সুনাম রক্ষা করিয়া মনোজ্ঞ ভাষায় ও চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া লোকের চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হন। ফলে যে দ্রব্যের কোন প্রয়োজন নাই, এমন কি যাহা অকেজো তাহাও লোকে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচনা করেন। বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেকের দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, বিশেষ স্নো বা ক্রীম না মাখিলে ফরসা হওয়া যায় না, বিশেষ তৈল মাথায় না দিলে মাথা ঠাণ্ডা রাখা যায় না, বিশেষ টনিক না খাইলে দেহ ও মন ঠিক রাখা যায় না, বিশেষ কাপড়ের শার্ট না পরিলে 'স্মার্ট' হওয়া যায় না বা বিশেষ শাড়ী না পরিলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না। ইহা ছাড়া অনেক অজ্ঞ ব্যক্তিকে ভয় দেখাইয়া কাজ হাসিল করিতেও বিজ্ঞাপন চেষ্টার ত্রুটি করে না। এজন্য বিজ্ঞাপন দ্বারা লোকে নানাভাবে প্রলুব্ধ হয়। সুতরাং উপরি-উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা জনসাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর (harmful) এবং বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে ব্যয়বহুল বলিয়া অপব্যয়। ইহা ছাড়া সীমিত বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতার মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতায় উঁহারা বিক্রয় বৃদ্ধির পরিবর্তে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হন। আর যে বাজারে বিক্রেতারই প্রাধান্য সেখানে বিজ্ঞাপন ব্যয় অপচয় মাত্র, এরূপ কথা অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের মতে বিজ্ঞাপন অপব্যয় নহে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই ব্যয় মোট বিক্রয়মূল্যের শতকরা একভাগও নহে। সুতরাং উৎপাদক বা বিক্রেতার তরফে এই ব্যয় যৎসামান্য এবং ইহাকে এরূপ অবস্থায় অপব্যয় বলা চলে না। বিজ্ঞাপন দ্বারা জিনিস প্রচার করা বহুদিন যাবত চলিয়া আসিতেছে এবং দিন দিনই ইহা বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্যবসায়িগণ যদি ইহাকে অপব্যয় মনে করিতেন তবে ইহার পরিবর্তে অবশ্যই অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। বিজ্ঞাপনের ফলে যে সব জিনিসের বিক্রয় বৃদ্ধি পায় তাহার ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। সুতরাং ক্রেতা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যেই জিনিস ক্রয় করিতে পারেন। "Man cannot live on

bread alone". খাদ্য ছাড়া আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-ব্যসন, আরাম-বিরাম সব কিছুরই প্রয়োজন। এগুলি পাইতে হইলে বহু জিনিসের প্রয়োজন। এজন্য সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ জিনিসের চাহিদা বাড়িবে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। আমাদের চাহিদা ও প্রয়োজন বৃদ্ধি না পাইলে আমাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং সমাজেরও শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন হইতে পারে না। সেক্ষেত্রে আমাদের জীবন হইবে "nasty, solitary, short and brutish"; সুতরাং বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রলুব্ধ হওয়ার প্রশ্ন (খারাপ জিনিস সম্বন্ধে অবশ্য নয়) উঠে না। আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস যত বেশী মাত্রায় ব্যবহার করিতে শিখিব ততই উক্ত জিনিস পাওয়ার যোগ্যতালাভের জন্য সচেষ্ট হইব। ইহাতে নিজের ও সমাজের কল্যাণই সাধিত হইবে। এজন্য বিজ্ঞাপন অনিষ্টকর ইহা বলা চলে না। বাজারে বিক্রেতাদের প্রাধান্য থাকিলেও প্রতিযোগিতার বাজারে বিজ্ঞাপন ছাড়া চলার উপায় নাই।

বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপন পদ্ধতি বা মাধ্যম (Different Methods or media of advertisement)

বিজ্ঞাপন যে ভাবাতেই প্রকাশ হউক না কেন উহা প্রকাশ করার জন্য কোনও 'মাধ্যম' প্রয়োজন। যে 'মাধ্যমে' পণ্যের প্রচার সর্বাধিক আশা করা যাইতে পারে বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে সেই 'মাধ্যমই' বাছিয়া লওয়া উচিত। ব্যবসা-বাণিজ্যে বর্তমানে যেরূপ জটিলতা দেখা দিয়াছে বিজ্ঞাপনেও সেরূপ জটিলতা দেখা দিয়াছে এবং এজন্য বিভিন্ন প্রকার 'মাধ্যমের' সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্যবহৃত হইতেছে। নিম্নে কতকগুলি বিজ্ঞাপনের 'মাধ্যম' বর্ণিত হইল :

(১) সংবাদপত্র (Newspapers): দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে। যে জিনিস সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সে জিনিসের বিজ্ঞাপন ইহাতে দেওয়া ভাল। ইহাতে সর্বাধিক প্রচারের সম্ভাবনা থাকে। তবে ইহাতে বিজ্ঞাপন পুনঃপুনঃ দিতে হয়। কারণ দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পড়ার পর উহা পাঠকের দৃষ্টির অগোচরে চলিয়া যায়। ফলে বিজ্ঞাপনও মনের অগোচরে চলিয়া যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। 'Out of sight, out of mind'. সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার চাহিদা বেশী। এজন্য ইহাতে ব্যয়ও কিছু বেশী পড়ে। বিজ্ঞাপনও সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষদের নিয়মমাফিক করিয়া তৈয়ারী করিয়া দিতে হয়।

(২) সাময়িক পত্রিকা (Magazines and Periodicals): ইহাতে বিজ্ঞাপন দিলে সংবাদপত্র অপেক্ষা ইহার স্থায়িত্ব অনেক বেশী পাওয়া যায়। কারণ পাঠক ইহা অনেক দিন ধরিয়াই পড়িয়া থাকেন এবং কাছে রাখেন। এজন্য ইহার বিজ্ঞাপনগুলি বেশীদিন তাঁহার চোখে পড়ার সম্ভাবনা। বিশেষ বিশেষ ধরনের জিনিস· বিশেষ বিশেষ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া ভাল। যেমন, ঔষধপত্রাদি চিকিৎসা-সংক্রান্ত

পত্রিকায় কিংবা কৃষিযন্ত্রাদি কৃষিপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া শ্রেয়ঃকর। মোটের উপর যাহাকে জানানোর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে তিনি কোন্ পত্রিকা বেশী পড়িয়া থাকেন তাহা বিচার-বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞাপন দিলে উহার ফল ভাল পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে উৎপাদক বা ব্যবসায়ী তাঁহার জিনিসের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য নিজস্ব পত্রিকাও ছাপাইতে পারেন। বড় বড় ব্যবসায়ীদের এরূপ পত্রিকা প্রকাশ করিতে দেখা যায়।

(৩) **প্রচারপত্র (Handbills) :** পণ্যের বিশেষ গুণাগুণ-সম্বলিত 'প্রচারপত্র' ছাপাইয়া উহা বিভিন্ন জনবহুল স্থানে কিংবা ডাকযোগে বিলি করিয়াও বিজ্ঞাপনের কাজ করা হয়। প্রচারপত্র সুন্দর ও সুদৃশ্য কাগজে লিখিত অথবা মুদ্রিত হইলে উহা দেখিবার আগ্রহ জনসাধারণের মনে জাগে এবং ইহাতে বিজ্ঞাপনের ব্যয়ও কম পড়ে এবং সুফলও পাওয়া যায়। অনেক সময় ব্লটিং পেপার, দেওয়াল পঞ্জী প্রভৃতিও প্রচার-পত্র হিসাবে বিলি করা হয়। ইহার ব্যবহারিক গুণের জন্য শুধু প্রচারপত্র অপেক্ষা বেশী ফলদায়ক হয়। শুধু প্রচারপত্র না পড়িয়াও অনেকে ফেলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু প্রচারপত্রের ব্যবহারিক গুণ থাকিলে উহা সহসা কেহ ফেলিয়া দেন না।

(৪) **প্রাচীরপত্র (Posters) :** বড় বড় অক্ষরে প্রাচীরপত্র লাগাইয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে। ইহা লোক-চলাচল অঞ্চলে সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় এরূপ স্থলে লাগাইলে দূর হইতেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এবং বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

(৫) **তালিকাবহি (Catalogues) :** অনেক ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান তাহাদের বিভিন্ন জিনিসের বিবরণ ও মূল্যসহ তালিকাবহি প্রস্তুত করে এবং উক্ত তালিকাবহি ক্রেতাসাধারণের মধ্যে বিলি করিয়া বিজ্ঞাপনের কাজে লাগায়। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ উক্ত তালিকাবহি দৃষ্টে মাল পছন্দ করিতে পারেন এবং তজ্জন্য অর্ডার দিয়া থাকেন। ইহা বেশ ফলদায়ক এবং খুব ব্যয়সাধ্যও নহে।

(৬) **নমুনা (Sample) :** ক্রেতা যাহাতে দ্রব্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারেন তজ্জন্য অনেক ব্যবসায়ী বিনামূল্যে কিংবা অতি অল্পমূল্যে ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে জিনিসের নমুনা বিতরণ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। ঔষধ, সাবান প্রভৃতি জিনিসের বিক্রয় এরূপ নমুনা দৃষ্টে খুবই হইয়া থাকে।

(৭) **মেলা ও প্রদর্শনী (Fairs and Exhibitions) :** মেলায় ও প্রদর্শনীতে বহু লোকসমাগম হয়। এজন্য ইহাতে পণ্যদ্রব্য সাজাইয়া বিজ্ঞাপনের কাজ ভালভাবে চলে। ইহাতে পণ্যের প্রচারও হয় এবং অনেক পণ্য বিক্রয়ও হয়। বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে মেলা অনেককাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বিশেষ কোন পর্ব উপলক্ষে এরূপ মেলা বসিয়া থাকে। বর্তমানে কলিকাতা ও দিল্লীর মত বড় বড় শহরেও প্রতি-বৎসর প্রদর্শনী হওয়ার একটা রেওয়াজ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে দেশ-বিদেশের পণ্য

উপস্থিত করার সুযোগ-সুবিধা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং মেলা বা প্রদর্শনী যে বিজ্ঞাপনের একটি উপযুক্ত বাহন একথা বলা চলে।

(৮) **সিনেমা স্লাইড (Cinema Slides):** আজকাল চিত্রগৃহেও কম লোকসমাগম হয় না। এখানে পণ্যদ্রব্যের রং-বেরং-এর ছবি কিংবা ছবির সহিত পণ্যদ্রব্যের কার্যকারিতা সম্বন্ধে কথোপকথন প্রভৃতি চিত্রগৃহের পর্দায় প্রতিফলিত করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে এবং অনেক বিজ্ঞাপন দেওয়াও হইতেছে। এরূপ বিজ্ঞাপনও বিশেষ ফলদায়ক।

(৯) **বাতায়ন সজ্জা (Window Display or Dressing):** ক্রেতা-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দোকানের বহির্দেশে এবং Show-case-এ অনেক পণ্য সামগ্রী সাজাইয়া রাখা হয়। ইহাই বিজ্ঞাপনের সহজতম প্রণালী এবং ইহাতে ব্যয়ও কম। তবে জনবহুল অঞ্চলে দোকানটি অবস্থিত না হইলে ইহার দ্বারা বেশী সংখ্যক ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব নয়।

(১০) **মাল সরবরাহের গাড়ী (Delivery Vans):** অনেক প্রতিষ্ঠানের মাল সরবরাহ করিবার গাড়ী থাকে। উহার গায়েও বড় বড় অক্ষরে পণ্যসামগ্রী ও প্রতিষ্ঠানের নাম লিখিত হইয়া থাকে। এই গাড়ী চলাচলের সময় এরূপ লেখা জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিজ্ঞাপনের কাজ চলে।

ইহা ছাড়া আরও বিভিন্ন উপায়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে। উপরে শুধু কয়েক প্রকারের বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রণালীর আভাস দেওয়া হইল। দোকানের সাইন বোর্ডও উহার বিজ্ঞাপনের কাজ করে। রাস্তার বিভিন্ন অঞ্চলে বা বাড়ীর উপরে আলোক-সজ্জার সাহায্যেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ট্রামে-বাসে সর্বত্রই আমরা বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই। বর্তমানে রেডিও মারফত বিজ্ঞাপন দেওয়াও প্রসারলাভ করিয়াছে। ইহাকে বলা হয় **বেতার বাণিজ্যিক প্রচার (Commercial Broadcasting)**। বেতার স্টেশনের বিবিধ ভারতী প্রোগ্রাম মারফত এরূপ প্রচারের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারে ইহা এক অভিনব ব্যবস্থা। ইহাতে পণ্যের সর্বাধিক প্রচারের সম্ভাবনা আছে। এজন্য ব্যয়ও বেশী নহে। তবে এরূপ বিজ্ঞাপন বেতার স্টেশনের নিয়মমাফিক মত প্রস্তুত করিতে হয় এবং উহাতে সময়ও খুব কম দেওয়া হয়। রুচি বিরুদ্ধ কোন বিজ্ঞাপন ইহাতে দেওয়া চলে না। সুতরাং সুস্থ ও রুচিসম্মত বিজ্ঞাপনে ইহার এক বিশেষ ভূমিকা আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার হওয়ায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেও ব্যাপকতা দেখা দিয়াছে।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন (Selection of media for advertisement)

কোনও পণ্যের বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে:

১। **পণ্যের প্রকৃতি (Nature of the Product):** পণ্যের প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। কোনও পণ্য যেমন, মাছ, দুগ্ধ, শাকসব্জী প্রভৃতির মত স্বল্পকাল স্থায়ী বা পচনশীল, কোনও পণ্য যেমন, মোটর গাড়ী, আসবাবপত্র প্রভৃতির মত দীর্ঘকাল স্থায়ী, কোনও পণ্য যেমন, চাউল, ডাল, তৈল প্রভৃতির মত নিত্য প্রয়োজনীয়, আবার কোনও পণ্য যেমন, স্নো, পাউডার প্রভৃতির মত বিলাসদ্রব্য। এরূপ বিশেষ গুণবিশিষ্ট পণ্যের জন্য বিশেষ মাধ্যম উপযোগী। সুতরাং পণ্যের প্রকৃতি প্রথমত বিচার করিয়া মাধ্যম নির্বাচন করা উচিত। স্বল্পকাল স্থায়ী পণ্যের জন্য পোষ্টার, হ্যাণ্ডবিল প্রভৃতি মাধ্যম হিসাবে নির্বাচিত হইতে পারে, কিন্তু পণ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে দৈনিক বা মাসিকপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত।

২। **বাজারের বিস্তৃতি (Extent of the Market):** কোন পণ্যের বাজার স্থানীয়, কোন পণ্যের বাজার আঞ্চলিক, কোন পণ্যের বাজার দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং কোনও পণ্যের বাজার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত। সুতরাং পণ্যের বাজারের বিস্তৃতির উপর মাধ্যম নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভর করে। যেমন, দুধ, শাকসব্জী প্রভৃতির বাজার স্থানীয় এবং এজন্য স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে। শিল্প জাতীয় পণ্যের বাজার দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে এবং এজন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারিত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া বিশেষ কার্যকরী। আবার সোনা, রূপা এবং অনেক শিল্পজাত পণ্য ও কাঁচামালের বাজার আন্তর্জাতিক হইতে পারে এবং এরূপ ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া বিশেষ ফলপ্রদ।

৩। **ক্রেতাদের প্রকৃতি (Nature of the Customers):** কোনও পণ্যের চাহিদা সার্বজনীন হইতে পারে এবং কোনও পণ্যের চাহিদা শ্রেণী বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। ক্রেতাদের সামর্থ্যও বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। ক্রেতাদের এই প্রকৃতি অনুযায়ী মাধ্যম নির্বাচন অনেকটা নির্ভর করে। সার্বজনীন চাহিদার জন্য দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে, কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর জন্য বিশেষ কাগজ অধিক ফলপ্রদ।

৪। **চাহিদার প্রকৃতি (Nature of the Demand):** পণ্যের চাহিদা প্রবহমান বা সাময়িক হইতে পারে। এই চাহিদার প্রকৃতির উপরও মাধ্যম নির্বাচন নির্ভর করে। প্রবহমান চাহিদার জন্য যে-কোন মাধ্যম কার্যকরী হইতে পারে, কিন্তু সাময়িক চাহিদার জন্য ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ।

৫। **ক্রেতার রুচি ও অভ্যাস (Tastes and Habits of the Customers):** জীবনযাত্রার মান, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর ক্রেতাদের রুচি ও অভ্যাস নির্ভর করে। এই রুচি ও অভ্যাস অনুসন্ধান করিয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন করা উচিত। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট হ্যাণ্ডবিল অপেক্ষা প্রচারপত্র (circular letters) কিংবা দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন অধিক কার্যকরী।

৬। **আবেদনের বিস্তৃতি (Extent of the Appeal):** বিজ্ঞাপনের

মাধ্যমে যে আবেদন প্রচারিত হইবে উহার বিস্তৃতি ব্যাপক হইবে কিংবা স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকিবে উহার উপর মাধ্যম নির্বাচন অনেকাংশে নির্ভর করে। যেমন, আবেদনের বিস্তৃতি ব্যাপক হইলে দৈনিক সংবাদপত্র বা স্থানীয় হইলে স্থানীয় সংবাদপত্র বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

৭। **আবেদনের স্থায়িত্ব (Duration of the Appeal):** আবেদন দীর্ঘকাল কি স্বল্পকাল স্থায়ী হইবে তাহার উপর বিজ্ঞাপন মাধ্যম নির্বাচন অনেকটা নির্ভর করে। যেমন, বিজ্ঞাপনের দ্বারা ক্রেতার মনের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্য থাকিলে দৈনিক অপেক্ষা মাসিক পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া শ্রেয়ঃ।

৮। **বিজ্ঞাপনের নীতি (Advertising Policy):** বিজ্ঞাপনের নীতি আশু কিংবা ভবিষ্যৎ চাহিদা সৃষ্টি করা হইতে পারে। প্রত্যক্ষ আবেদন দ্বারা আশু পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্য থাকিলে যাহাতে কৌতূহল, আতঙ্ক, ইংগিত থাকে এরূপ মাধ্যম হওয়া উচিত। কিন্তু পরোক্ষভাবে ভবিষ্যতে ক্রেতার উপর প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্য থাকিলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত, সম্পাদকীয় সমর্থন প্রভৃতি বিশেষ কার্যকরী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

৯। **বিজ্ঞাপনের ব্যয় (Cost of Advertisement):** বিজ্ঞাপনের জন্য কিরূপ ব্যয় করা সম্ভব হইবে তাহার উপরও মাধ্যম নির্বাচন নির্ভর করে। ব্যয় বেশী করার সম্ভাবনা থাকিলে ক্রমাগত দৈনিক সংবাদপত্রে এবং অন্যান্য বিভিন্ন উপায়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে। কিন্তু ব্যয়াধিক্য হইলে কারবারের ক্ষতির কারণও হইতে পারে। এজন্য কম ব্যয়ে যাহাতে অধিক ফল পাওয়া যায় এরূপ নীতিতেই বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন করা উচিত।

১০। **বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি (Copy of the Advertisement):** ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি অনেকক্ষেত্রে নানা রংয়ে রঞ্জিত এবং বড় বড় অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে। এরূপ বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সুবিধাজনক নহে। 'পোষ্টার' এক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী। সুতরাং বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপিও মাধ্যম নির্বাচনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

জেলা শহরের একজন নূতন বড় খুচরা বস্ত্র ব্যবসায়ী এবং পশ্চিমবঙ্গের একজন নূতন ধরনের সাবান-গুঁড়া প্রস্তুতকারক যে উপায়ে বা যে যে মাধ্যমের সাহায্যে উহাদের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে পারেন তাহার উদাহরণ (An example of the principal means or media which may be adopted by a merchant for his new big retail cloth stores in a district town and by a manufacturer of a new brand of soap powder in West Bengal)

বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপনের মাধ্যম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্‌টি কোন্‌

ব্যবসায়ীর পক্ষে উপযুক্ত তাহা স্থির করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে :

(১) পণ্যের প্রকৃতি, (২) বাজারের বিস্তৃতি, (৩) ক্রেতাদের প্রকৃতি, প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য, (৪) বিজ্ঞাপনের স্থিতি—স্থায়ী বা অস্থায়ী, (৫) বিজ্ঞাপন ব্যয়।

মাধ্যম নির্বাচনে বাস্তবক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিচার করিতে হইবে। কোনও জেলা শহরের বস্ত্রব্যবসায়ী তাঁহার নূতন দোকানের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে চাহিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন :

ব্যবসায়ী বস্ত্রাদি সাধারণত নানাপ্রকার—সূতী, রেশমী, উচ্চমূল্যের, নিম্নমূল্যের প্রভৃতি হইতে পারে। ইহার পণ্যের যে প্রকৃতি তাহা সকল শ্রেণীর লোকের ব্যবহার-যোগ্য। সুতরাং শহরের সর্বত্রই তাঁহার পণ্যের চাহিদা আছে। এমন কি শহরের নিকটবর্তী গ্রামের লোক এই ব্যবসায়ীর দোকানে বস্ত্র কিনিতে আসিতে পারে। গরীব, মধ্যবিত্ত ও ধনী সকল শ্রেণীর ক্রেতাই তাঁহার দোকানে পদার্পণ করিতে পারে। তাঁহাকে একজন স্থায়ী ব্যবসায়ী ধরা যাইতে পারে। জেলা শহরে ক্রেতার সংখ্যা মোটামুটি মন্দ নয়। এজন্য বিজ্ঞাপনে সাফল্য আসিলে ভাল মুনাফা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ফলে এই ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন ব্যয়ও মোটামুটি করিতে পারিবেন। সুতরাং এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার নিম্নলিখিতরূপ বিজ্ঞাপন মাধ্যম নির্বাচন করা উচিত।

১। **প্রচারপত্র (Handbills):** লোক মারফত এই প্রচারপত্র শহরের বহুলোকের হাতেই দেওয়া চলে। এইভাবে দোকানের ও পণ্যের বিবরণ জানানো সম্ভব হইবে।

২। **প্রাচারপত্র (Posters):** শহরের বিভিন্ন স্থানে এরূপ প্রাচীরপত্রও অনেক লোকের মধ্যে দোকানে পরিচয় ঘটাইবে।

৩। **সিনেমা স্লাইড (Cinema Slide):** স্থানীয় চিত্রগৃহে শহরের বিভিন্ন স্থান, এমন কি শহরের নিকটবর্তী গ্রামের বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। সুতরাং দোকানের পরিচয় ঘটাইতে ইহা একটি উপযুক্ত মাধ্যম।

৪। **বড় সাইন বোর্ড ও দোকানের বহিঃসজ্জা (Big Sign Board and Outer Display of the Shop):** দোকান যে স্থানে অবস্থিত সে পথ দিয়া যে সকল লোক যাতায়াত করিবে ইহা তাহাদের দৃষ্টিপথে অবশ্যই পড়িবে। এইভাবে দোকানের পরিচয় অনেক লোকের মধ্যেই ঘটিবে।

৫। **পণ্যসজ্জা (Window Display):** Show-case-এ আকর্ষণীয় বস্ত্রাদি সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিলে মধ্যবিত্ত ও ধনী ব্যক্তিগণ এরূপ দোকানে প্রবেশ করার আকর্ষণ বোধ করিবে। কারণ ইহাতে তাহাদের মনে এই ধারণা জন্মাইবে যে, তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিস এরূপ দোকানেই পাওয়া সম্ভব।

৬। **স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন (Advertisement in Local News-**

papers): অনেক মফঃস্বল শহরে স্থানীয় পত্রিকা দেখা যায়। এরূপ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলে দোকানের মর্যাদা বৃদ্ধি ও উহার পরিচয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

নূতন অবস্থায় বিজ্ঞাপন এরূপ বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাপকভাবেই আরম্ভ করা উচিত যদি এরূপ ব্যয় ব্যবসায়ীর সাধ্যের মধ্যে থাকে। নতুবা সাধ্য অনুযায়ী ইহা হইতে ২।১টি মাধ্যম কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

নূতন এক শ্রেণীর সাবানের গুঁড়ার বিজ্ঞাপন সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রচার করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে:

এই পণ্যের প্রকৃতি বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোর বস্তু। জামাকাপড় পরিষ্কার করার জন্য ইহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই প্রয়োজন। দাম অত্যধিক না হইলে ধোপার কাপড় কাচাতেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার বাজারের বিস্তৃতি ব্যাপক। জামাকাপড়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার প্রবণতা অনেক লোকের মধ্যেই আছে। এরূপ ব্যবসায়ী স্থায়ী ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এরূপ জিনিস প্রস্তুত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই যখন বিজ্ঞাপন দেওয়ার উদ্দেশ্য তখন মোটা টাকা ব্যয় করিবার ক্ষমতাও আছে। সুতরাং উপরি-উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যম উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে:

১। **সংবাদপত্র (Newspapers):** সংবাদপত্র প্রচারের সম্ভাবনা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র। সংবাদপত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাবানের গুঁড়ার প্রচারেরও যথেষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এরূপ বিজ্ঞাপন অবশ্য দীর্ঘদিন দেওয়া উচিত। শুধু একবার কি দুইবার দিলে বেশী কাজ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

২। **নমুনা (Sample):** ক্রেতা যাহাতে জিনিসের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারেন সেজন্য বিনামূল্যে কিংবা অতি অল্পমূল্যে বিভিন্ন দোকানদার মারফত এবং বিক্রয়-উদ্যোগীর মারফত ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের মধ্যে নমুনা বিতরণ করা উচিত।

৩। **সিনেমা স্লাইড (Cinema Slides):** মফঃস্বলের ও শহরের চিত্রগৃহে সিনেমা স্লাইড দিতে পারিলে অনেক লোকের মধ্যে ইহার প্রচার সহজসাধ্য হইতে পারে।

৪। **মেলা ও প্রদর্শনী (Fairs and Exhibitions):** মেলায় ও প্রদর্শনীতে বহু লোকসমাগম হয়। এরূপ স্থানে কম মূল্যে নমুনা বিতরণ করারও বিশেষ সুবিধা হয়। তাহা ছাড়া ইহার গুণাগুণ হাতে-কলমে এরূপ স্থানে বহুলোককে দেখানো চলে।

৫। **প্রাচীরপত্র (Posters):** বড় বড় অক্ষরে ব্যবসা-চিহ্ন ও সাবানের নাম লিখিয়া মোটা কাগজের উপর লাগাইয়া দোকানে দোকানে টাঙাইয়া রাখার ব্যবস্থা করিতে পারিলেও ইহার বহুল প্রচার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন (Scientific Advertisement)

ক্রেতাদের মনস্তত্ত্ব, বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা, পণ্যের প্রকৃতি ও চাহিদা প্রভৃতি বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া যে বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা ও অভিযান অনুসরণ করা হয় উহাকে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন বলে। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের মাধ্যম, আকার, আয়তন ও ভাষা স্থির করা হয় এবং উহাতে দোষ-ত্রুটি দেখা দিলে উহা সংশোধন দ্বারা স্থায়ী পন্থা গৃহীত হয়। ইহার উদ্দেশ্য থাকে স্বল্পব্যয়ে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। এই ব্যবস্থায় প্রথমে ব্যয় অধিক হইলেও শেষ পর্যন্ত পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পণ্যপ্রতি এরূপ ব্যয় খুবই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি সাধারণত গৃহীত হইয়া থাকে :

১। **অনুসরণ পদ্ধতি (Follow-up System)ঃ** 'অনুসরণ পদ্ধতি' বিজ্ঞাপন কার্যকরী বা ফলপ্রসূ করিবার এক অভিনব পন্থা। যে জিনিস যাঁহার প্রয়োজন তিনি উহার বিজ্ঞাপন দেখিতে স্বভাবতই প্রলুব্ধ হন। উহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা ও আগ্রহও তাঁহার হয়। তিনি হয়ত উহার প্রয়োজনীয় বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য প্রতিষ্ঠানের সহিত পত্রাদিও লিখিয়া থাকেন, কিন্তু কোন কারণে হয়ত আর অর্ডার দেওয়া হয় না। যে ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি এরূপ পত্রালাপ করিয়া থাকেন তাঁহার নিকট হইতে যাহাতে অর্ডারটি শীঘ্র আসে তজ্জন্য প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট জিনিসের গুণাগুণ, বিস্তৃত বিবরণ ও অন্যান্য উৎসাহব্যঞ্জক বাক্য-বিন্যাসসহ মাঝে মাঝে পত্রাদি প্রেরণ করা হয়। এইভাবে বিজ্ঞাপন ফলপ্রসূ করার অক্লান্ত চেষ্টাকে 'অনুসরণ পদ্ধতি' আখ্যা দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনদাতা কোনও ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তির পিছনে নাছোড়বান্দা হইয়া লাগিয়া থাকিলে উক্ত ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তির চক্ষুলজ্জার খাতিরেই হউক বা অন্য কারণেই হউক আর চুপচাপ নাও থাকিতে পারেন। তখন তিনি হয়ত মালের অর্ডারটি দিয়া থাকেন। নাছোড়বান্দা হইয়া লাগিয়া থাকিলে অনেকক্ষেত্রে অর্ডার পাওয়া সম্ভব হয়। এখানেই 'অনুসরণ পদ্ধতি'র সার্থকতা।

২। **বিজ্ঞাপনের 'সূত্রসন্ধানী কৌশল' (Keying in Advertisement) :** বিজ্ঞানের 'মাধ্যম' বহুবিধ। প্রত্যেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সকল 'মাধ্যমে' বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব নহে। উহা অত্যন্ত ব্যয়-বহুল এবং কোনক্রমে যুক্তি-যুক্তও নহে। কিন্তু কোন্ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে উহা বেশী কার্যকরী বা ফলপ্রসূ হইতে পারে তাহা জানিতে না পারিলে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজে সাফল্যের সহিত অগ্রসরও হওয়া যায় না। যে উপায়ে বিজ্ঞাপনের এই ফলপ্রসূতা নির্ণয় করা চলে তাহাকে বিজ্ঞাপনের 'সূত্রসন্ধানী কৌশল' (Keying in Advertisement) বলে। এজন্য প্রথমত একাধিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং উহাতে যে উপায়গুলি গ্রহণ করা হয় নিম্নে তাহা উল্লেখ করা গেল :

(ক) **বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন ঠিকানা দিয়া :** বিজ্ঞাপনের

উত্তরে যে অনুসন্ধানপত্র বা অর্ডার আসিয়া থাকে তাহা বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কোন্ মাধ্যম হইতে সর্বাপেক্ষা বেশী উত্তর পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে কোন্ মাধ্যম বেশী কার্যকরী জানিতে পারা গেলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন না দিয়া কেবল উক্ত মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করা চলে।

(খ) বিজ্ঞাপনের উত্তরদাতা কোন্ 'মাধ্যম' দেখিয়া এই অর্ডার বা অনুসন্ধানপত্র লিখিতেছেন তাহা উল্লেখ করিতে অনুরোধ জানাইয়া: ইহার ফলেও যে ঠিকানা হইতে বেশী উত্তর পাওয়া যায় বিজ্ঞাপনের পক্ষে সে মাধ্যম যে বেশী কার্যকরী তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

(গ) বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞাপন বিভিন্ন মাধ্যমে দিয়া: কোন্ মাধ্যম কোন্ বিভাগের পক্ষে বেশী কার্যকরী এরূপ বিজ্ঞাপন হইতে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে।

(ঘ) প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের সহিত 'কুপন', 'ছক' বা 'অর্ডার ফরম' দিয়া: বিজ্ঞাপনের উত্তরদাতাকে তাহার অনুসন্ধান বা অর্ডারের সহিত উক্ত 'কুপন', 'ছক' বা 'অর্ডার ফরম' পাঠাইতে অনুরোধ জানাইলে বিজ্ঞাপনের অধিক ফলপ্রসূ মাধ্যম জানিতে পারা যায়।

উপরের নিয়মে বিভিন্ন মাধ্যম বিজ্ঞাপনের পক্ষে কিরূপ ফলপ্রসূ হইবে তাহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু একই মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু বা ভাষার তারতম্য ঘটাইয়াও 'সূত্রসন্ধানী কৌশল' অবলম্বন করা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় লোকের মনস্তত্ত্বের দিকেই অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে: যেমন, একটা দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপনে দাঁতের 'সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা' বৃদ্ধি পাইবে ইহা প্রকাশের দিকে নজর দিলে কিংবা 'দাঁত রক্ষা' পাইবে ইহা প্রকাশের দিকে বেশী দৃষ্টি দিলে অধিক কার্যকরী হইবে তাহা স্থির করিতে পারিলে তদনুযায়ী বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে।

৩। বাজার-সংক্রান্ত সমীক্ষা ও গবেষণা (Market Survey and Research): পূর্বে পুরাতনপদ্ধতি অনুযায়ী বিক্রেতা ক্রেতার চাহিদা বা বাজারের অবস্থা অনুমান করিয়া বিজ্ঞাপন দিতেন। ক্রেতার চাহিদা, রুচি, পছন্দ, অপছন্দ এ সম্পর্কে বিক্রেতা তখন কোন অনুসন্ধানই করিতেন না। ফলে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন ক্রেতার বা বাজারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকে এবং বাজার-সংক্রান্ত সমীক্ষা ও গবেষণায় মন দিয়া থাকে। এই বাজার-সংক্রান্ত সমীক্ষা ও গবেষণা নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত:

(ক) ক্রেতা-সংক্রান্ত সমীক্ষা ও গবেষণা (Consumer Survey and Research): এই সমীক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্য ক্রেতার সঠিক চাহিদা নিরূপণ করা। এই চাহিদা নিরূপণের জন্য ক্রেতাসাধারণকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া উহাদের মতামত নির্ণয় করা হয়। কে কোন্ জাতীয় পণ্য ব্যবহার করেন, কোন্ মার্কার পণ্যগুলি পছন্দ করেন এবং কেন করেন, অন্য মার্কার পণ্য কেন ব্যবহার করেন না,

কি উদ্দেশ্যে কোন্ পণ্য ব্যবহার করেন, কোন্ গুণের জন্য কোন্ বিশেষ পণ্য ব্যবহার করেন, ক্রেতার মাসিক আয় ও ব্যয় কিরূপ ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে ক্রেতার চাহিদার স্বরূপ জানা হয় এবং তদনুযায়ী অধিক সংখ্যক ক্রেতাকে আকর্ষণের জন্য বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করা হয়।

উপরি-উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর সংগ্রহ করিতে সকল সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট যাওয়া কখনই সম্ভব নয়। এজন্য ক্রেতা বাছাই প্রয়োজন। তাহা ছাড়া যাঁহারা এই প্রশ্নগুলির উত্তর সংগ্রহ করিবেন তাঁহাদেরও বুদ্ধিমান, আলাপী, মিষ্টভাষী প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইতে হয়। কাহারও অসন্তুষ্টি বা বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া এ সকল প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করিতে হয়।

(খ) ব্যবসায়ী-সংক্রান্ত সমীক্ষা ও গবেষণা (Dealer Survey and Research): শুধু ক্রেতার মতামত জানিলেই পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। ফলে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মতামত ও মনোভাব জানার প্রয়োজন হয়। এজন্য পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কোন্ জাতীয় বা কোন্ মার্কার পণ্য অধিক জনপ্রিয় উক্ত পণ্যের দৈনিক, মাসিক বা বাৎসরিক বিক্রয় কিরূপ, কোন্ শ্রেণীর ক্রেতা কোন্ পণ্যের ত্রুটি কিরূপ বলিয়া থাকেন, কোন্ গুণের দ্বারা ক্রেতা অধিক আকৃষ্ট হন, পণ্যের নগদ বিক্রয় অধিক না ধারে বিক্রয় অধিক প্রভৃতি প্রশ্নাবলীর উত্তর খুচরা ব্যবসায়িগণ অবশ্যই দিতে পারেন এবং উহাদের নিকট হইতে এরূপ সংবাদাদি অবশ্যই সংগ্রহ করা যায়। আবার পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে খুচরা ব্যবসায়ীদের মনোভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ গ্রহণ করা যায়। এরূপ তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করা চলে।

(গ) বিজ্ঞাপন মাধ্যম-সংক্রান্ত সমীক্ষা ও গবেষণা (Advertising Media Survey and Research): ইহার সাহায্যে বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে কোন্‌টিতে বিজ্ঞাপন দিলে সর্বাধিক ফল পাওয়া যাইবে তাহা জানা সম্ভব হয়। যেমন, মাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্র স্থির করিতে হইলে কোন্ সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যা এবং উহার জনপ্রিয়তা কিরূপ, কোন্ শ্রেণীর পাঠক উহা পাঠে বেশী অভ্যস্ত, উহাদের আয়ই বা কিরূপ প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞাপনের মাধ্যম স্থির করিতে হয়।

বিজ্ঞাপনে উপরি-উক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হইলে উহা হইতে বিশেষ সুফল লাভ করা সম্ভব হয়। ইহাতে প্রারম্ভিক ব্যয় কিছু বেশী হইলেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা ক্রেতাসাধারণের সহিত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে এবং অধিক সংখ্যক ক্রেতা আকর্ষণ করিয়া শেষ পর্যন্ত ব্যয়ের মাত্রাধিক্য হ্রাস করে এবং অধিক মুনাফা লাভের পথ প্রশস্ত করে। ব্যবসাজগতে 'ক্রেতা সাবধান' (Caveat Emptor) অর্থাৎ ক্রেতা নিজ দায়িত্বে বিচার-বিবেচনা করিয়া জিনিস কিনিবেন—পুরাতন নীতি। প্রতিযোগিতার বাজারে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞাপনে এই পুরাতন নীতি পরিহার

করা হয়। বর্তমান নীতি হইতেছে 'বিক্রেতা সাবধান' (Caveat Vendor) অর্থাৎ বিক্রেতা নিজ প্রচেষ্টায় বা দায়িত্বে ক্রেতার নিকট পণ্য উপস্থাপিত করিবেন। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন ইহার প্রকৃত পথপ্রদর্শক।

বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি (Copy of an Advertisement)

বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি ক্রেতাসাধারণের নিকট পণ্যের বার্তা বহন করিয়া থাকে। এই বার্তার উদ্দেশ্য থাকে ক্রেতার উপর পণ্য ক্রয়ের প্রভাব বিস্তার করা এবং পণ্য ক্রয়ে উহাকে উদ্বুদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি রচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে :

১। প্রথমত, প্রতিলিপি আকর্ষণীয় হওয়া উচিত। এজন্য ইহার শিরোনামা, আকার, রং, শব্দসম্ভার প্রভৃতি এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে ইহা সম্ভাব্য ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। বড় অক্ষর, ব্যঙ্গচিত্র, বিজ্ঞাপনের চারিদিকে শূন্যস্থান, আকর্ষণীয় রং, উপযুক্ত স্থান, সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা প্রভৃতি দৃষ্টি আকর্ষণের বিভিন্ন পন্থা।

২। ইহা অর্থপূর্ণ ও শিক্ষামূলক হওয়া উচিত। এজন্য ইহার ভাষা ও বিষয়বস্তু এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে ইহা পাঠ করিলে পণ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ হয়। ভাষার সরলতা, পণ্যের পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রভৃতি বিজ্ঞাপনকে অর্থপূর্ণ ও শিক্ষামূলক করিয়া থাকে।

৩। ইহা চিত্তাকর্ষক ও অনুভূতিশীল হওয়া উচিত। এরূপ হইলে ইহা ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। পণ্যটি সম্পর্কে তাহার আগ্রহ সৃষ্টি হইবে এবং তাহার মনে পণ্যটি পাইবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিবে। এইভাবে বিজ্ঞাপন উহার পাঠককে সক্রিয়ভাবে ক্রেতায় পরিণত করিবে।

৪। ইহার দ্বারা ক্রেতার মনে বিশ্বাস উৎপাদন এবং স্থায়ী ধারণা সৃষ্টি করা উচিত। এজন্য বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে উহা পাঠ করিলে পাঠকের মনে পণ্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস এবং স্থায়ী ধারণার সৃষ্টি হয়। সম্ভাব্য ক্রেতাকে উদ্দেশ্য করিয়া কিন্তু অতিরঞ্জিত না করিয়া সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় পণ্যসমাচার জ্ঞাপন করিলে দৃঢ় বিশ্বাস ও স্থায়ী ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫। ইহা সৃজনশীল হওয়া উচিত। বিজ্ঞাপনের সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে চাহিদা সৃষ্টি করা। কিন্তু এই সাধারণ উদ্দেশ্য ছাড়া ইহার এরূপ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকা উচিত যাহাতে নূতন পণ্যের ব্যবহার, পুরাতন পণ্যের পরিহার, উহাদের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি মূর্ত হইয়া উঠে। ইহা পাঠকের মনে চিন্তার খোরাক যোগাইয়া সৃজনশীলতা সৃষ্টি করে, পণ্যটির পরিচয় উহার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং এইভাবে পণ্যটির ব্যবহারের সুস্পষ্ট ইংগিত প্রতিফলিত হয়। ইহাতে বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতাও সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে।

৬। ক্রেতার সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবপ্রবণতার দিকে প্রতিলিপির দৃষ্টি দেওয়া উচিত। পাঠকের মনে কোনপ্রকার আঘাত না দিয়া প্রতিলিপির কাজ হইবে তাহার মনস্তত্ত্ব অর্থাৎ ভয়ভীতি, স্বভাব, মনোবৃত্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া। যেমন, জীবন বীমা বা ব্যাঙ্কে সঞ্চয়-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে স্নেহের বন্ধন, অবসরকালীন অসুবিধা, মৃত্যুজনিত বিপদ-আপদ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাইতে পারে। পোশাক-পরিচ্ছদের বিজ্ঞাপনে মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্যপ্রীতির দিকে গুরুত্ব দেওয়া চলে। তৈল, ঘৃত প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপনে কোন স্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্যাদি নাই বা ধর্ম-বিরুদ্ধ বা সংস্কার-বিরুদ্ধ কোন কিছু নাই এরূপ বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দিলে বেশী কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৭। প্রতিলিপি অবশ্যই ক্রেতাসাধারণের মনোযোগ, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়া (Attention, Interest, Desire and Action) সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দিবে, কিন্তু উহার ব্যয়ের দিকেও সতর্কতা অবলম্বন করিবে। সবচেয়ে কম ব্যয়ে সর্বাধিক ফললাভ করাই বিজ্ঞাপনের চরম উদ্দেশ্য। সুতরাং এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে হইবে।

৮। উপরি-উক্ত সাধারণ অবস্থা বা নিয়মগুলি (General conditions or laws) যথাসাধ্য মানিয়া বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি প্রস্তুতে অগ্রসর হওয়া উচিত। উপরি-উক্ত অবস্থা বা নিয়মগুলিকে ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞাপন প্রস্তুতের ধারা (Method of preparation) নিম্নরূপ হওয়া উচিত :

(ক) ইহার ভাষা সরল (Simple) ও সহজবোধ্য হইবে।

(খ) ইহা দেখিতে সুন্দর ও শোভন হইবে। কারণ মানুষ সৌন্দর্যের (Beauty) উপাসক।

(গ) ইহা উন্নত রুচিসম্পন্ন এবং শিল্পানুমোদিত (Artistic) হইবে।

(ঘ) পণ্যের চাহিদা ও ক্রেতার প্রকৃতি অনুযায়ী ইহার ভাষায় আবেদন (Appeal) প্রকাশ পাইবে।

(ঙ) ইহা উপযুক্ত মাধ্যমে (Medium) প্রকাশিত হইবে।

(চ) মাধ্যম নির্বাচনের সময় ব্যয়ের (Cost) বিষয়টিও চিন্তা করিতে হইবে। ব্যয় যাহাতে অত্যধিক না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

(ছ) ইহা প্রকাশের উপযুক্ত সময়ও চিন্তা করিতে হইবে। যে সময় বা ঋতুতে যে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় সেই সময় বা ঋতুতে ঘন ঘন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়া উচিত। যেমন, পূজার সময় অনেক পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, শীতকালে গরম বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সময় বুঝিয়া বিজ্ঞাপন দিলে উপযুক্ত ফললাভের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ (Themes of Advertisement)

ক্রেতার মনে পণ্য ক্রয়ের উদ্দীপ্ত বাসনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে মানব মনের যে

সুকুমারবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় উহাকে 'বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ' (Themes of Advertisement) বলা চলে। বিজ্ঞাপনে উহাদের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তাসহ নিম্নে উহাদের নাম উল্লেখ করা হইল :

১। **সৌন্দর্যবোধ (Sense of Beauty) :** সৌন্দর্যবোধ মানুষের একটি সুকুমারবৃত্তি। মানুষ ইহার উপাসক। বিজ্ঞাপনে মানুষের এই অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করিতে পারিলে উহাতে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য প্রসাধন দ্রব্যাদির বিজ্ঞাপন সাধারণত মানুষের সৌন্দর্যবোধকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়া থাকে। যেমন, 'বিউটি ক্রীম' ভিন্ন ত্বকের কোমলতা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

২। **স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামবোধ (Sense of Ease and Comfort) :** স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের আকাঙ্ক্ষা সকলেই বোধ করিয়া থাকেন। সামর্থ্য অনুযায়ী সকলেই ইহার জন্য চেষ্টিত থাকেন। উৎকৃষ্ট তোষক, বালিশ প্রভৃতি, বৈদ্যুতিক পাখা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, হিমায়ন যন্ত্র ইত্যাদি মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এজন্য ইহাদের বিজ্ঞাপনে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামবোধের ইংগিত যুক্ত হইয়া থাকে। যেমন, 'ডানলো পিলোর গদিই' একমাত্র আরামপ্রদ শয্যাদ্রব্য।

৩। **সুস্থতাবোধ (Desire for Good Health) :** মানুষ স্বভাবতই সুস্থ, নিরোগ ও কর্মঠ থাকিতে চায় এবং এজন্য স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনে যথাসম্ভব যত্নবান হয়। ঔষধ, পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ইহার সহায়ক। সুতরাং এরূপ পণ্যের বিজ্ঞাপনে সুস্থতাবোধের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং ইহাদের ব্যবহারে মানুষ কিরূপ সুস্থ থাকিতে পারে তাহার ইংগিত থাকে। যেমন, 'বোর্ণভিটা' ভিন্ন সুস্থ ও সতেজ থাকা দুষ্কর।

৪। **স্নেহবোধ (Sense of Affection) :** স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা মানুষের সহজাত সদ্‌প্রবৃত্তি এবং সাংসারিক ধর্ম। ইহার জন্য মানুষ শিশুদের খেলনা, শিশুখাদ্য প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকে। এজন্য এরূপ দ্রব্যাদির বিজ্ঞাপনে অপত্যস্নেহ-বোধের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তদনুযায়ী বিজ্ঞাপন রচিত হয়। যেমন একমাত্র ...নের স্প্রীংযুক্ত খেলনাই' শিশুরা পছন্দ করে।

৫। **শঙ্কাবোধ (Sense of Fear) :** মানুষের মনে ভয় বা শঙ্কা একটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং এজন্য মানুষ বিপদ-আপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্বদা চেষ্টিত থাকে। বিভিন্ন প্রকারের বীমা, সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা প্রভৃতির দ্বারা মানুষ অনেক ভবিষ্যৎ বিপদ-আপদ হইতে নিরাপত্তা বোধ করিতে পারে। সুতরাং এ জাতীয় বিজ্ঞাপন মানুষের বিপদ-আপদের উল্লেখ ও মীমাংসার প্রতি ইংগিত দিয়া রচিত হইয়া থাকে। যেমন, 'জীবন বীমাই' পরিবারবর্গকে সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে।

৬। **দেশপ্রেমবোধ (Sense of Patriotism) :** লোকের মনে দেশপ্রেম-বোধ থাকা স্বাভাবিক। এজন্য বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে দেশী পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির

জন্ম এবং দেশী পণ্যের সহিত বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা রোধ করার উদ্দেশ্যে দেশপ্রেমের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন রচিত হইয়া থাকে। যেমন, 'দেশপ্রেম ও দেশী জিনিস ব্যবহার একসূত্রে গ্রথিত'।

৭। **মিতব্যয়িতা বা হিসাববোধ (Sense of Frugality):** অনেকের মিতব্যয়িতা বা হিসাববোধ খুব প্রখর। ইহারা কম মূল্যে দীর্ঘদিন স্থায়ী ভাল জিনিস কিনিতে আগ্রহশীল। এজন্য এই হিসাববোধ জাগ্রত করিয়া অনেক পণ্যের বিজ্ঞাপন রচিত হইয়া থাকে। যেমন, 'মডার্ণ কেবিনেটের আসবাবপত্র' কিরূপ মজবুত ও স্থায়ী এবং দামে সস্তা একবার আসিয়া পরীক্ষা করুন।

৮। **গর্ববোধ (Sense of Pride):** অনেকের অহঙ্কার বা গর্ববোধ খুব প্রবল। মূল্যবান জিনিস, মোটর গাড়ী, রেডিও, অলঙ্কারাদি ক্রয়ে এই বোধ বিশেষ প্রকাশ পায়। এজন্য ইহাদের যে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতা গর্ববোধ করিতে পারেন উহার আভাস দিয়া বিজ্ঞাপন রচিত হইয়া থাকে। যেমন, 'নূতন মডেলের হিন্দুস্থান মোটরই' নিজস্ব গাড়ীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে।

৯। **আভিজাত্যবোধ (Sense of Superiority):** সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইলে আভিজাত্যবোধও বৃদ্ধি পায়। এই আভিজাত্য রক্ষার জন্য অনেকে উচ্চমূল্যের জিনিস ক্রয় করিতে আগ্রহশীল হন। সুতরাং উচ্চমূল্যের জিনিস ক্রয় করিতে প্রলুব্ধ করার জন্য উহার বিজ্ঞাপনে এই আভিজাত্যবোধকে সজাগ করার চেষ্টা হয়। যেমন, 'রবীন কার্পেটই' একমাত্র ঘরের শোভা ও উন্নত রুচির পরিচয় দিতে পারে।

১০। **সমকক্ষবোধ (Sense of Emulation):** অনেকের সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা এবং এজন্য ধনী, মহৎ, বিদ্বান বা পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে অনুকরণ করার প্রবণতা বহুলোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোন বিশেষ ব্যক্তি কোনও বিশেষ দ্রব্য ব্যবহারে অভ্যস্ত এবং সে সম্বন্ধে উহার প্রশংসাসূচক মতামত ইত্যাদি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়া লোকের সমকক্ষবোধ জাগাইয়া তোলা হয়। যেমন, অধ্যাপক ঘোষ বলেন—আমি নিয়মিত 'বিষহরি' পত্রিকা পাঠ করি। প্রত্যেক বিদ্যার্থীর ইহা অবশ্য পাঠ্য পত্রিকা।

বিজ্ঞাপনের মূলতত্ত্ব ও নীতি (Basic Principle and Policy of Advertisement)

বিজ্ঞাপনের যে পন্থা অবলম্বন করিলে স্বল্প-ব্যয়ে অধিক মুনাফা লাভের সম্ভাবনা থাকে উহাই বিজ্ঞাপনের মূলতত্ত্ব ও নীতি। এই মূলতত্ত্ব ও নীতির উদ্দেশ্য থাকে নূতন পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করা, চলতি পণ্যের চাহিদা বজায় রাখা এবং পণ্যের বর্তমান বাজার অপেক্ষা ভবিষ্যতের বাজারকে সুদৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং বর্তমান বিক্রয় এবং ভবিষ্যৎ বিক্রয়—এই দুই প্রকার উদ্দেশ্য লইয়া বিজ্ঞাপনের মূলতত্ত্ব ও নীতি নির্ধারণ করিতে হয়। এই মূলতত্ত্ব ও নীতির সাফল্য এবং কার্যকারিতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির

উপর নির্ভর করে। এজন্য মূলতত্ত্ব ও নীতি-নির্ধারণের সময় এইগুলিকে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

দ্রুত ও আশু ফললাভের জন্য নিম্নলিখিত মূলতত্ত্ব ও নীতি অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞাপন রচনা করা উচিত :

১। **কৌতূহল (Inquisitiveness) :** বিজ্ঞাপনের সাফল্য ক্রেতার মনে কৌতূহল সৃষ্টি করার উপর অনেকটা নির্ভর করে। সুতরাং বিজ্ঞাপনের ভাষা, আকার, চিত্র, রং প্রভৃতি যাহাতে ক্রেতার মনের উপর রেখাপাত করিয়া পণ্য সম্পর্কে উহার কৌতূহল সৃষ্টি করিতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে। ক্রেতার মনে কৌতূহল সৃষ্টি নানাভাবে করা হয় যেমন, অনেক সময় বিজ্ঞাপনের সম্পূর্ণ অংশ বা বিবরণ প্রকাশ না করিয়া কিয়দংশ প্রকাশ করা হয় এবং এইভাবে সম্ভাব্য ক্রেতার মনে কৌতূহল উদ্রেক করা হয়। কোন কোন সময় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিশেষত সংবাদ-পত্রে অনেকটা অংশ খালি রাখা হয় এবং পাঠকদিগকে এই খালি অংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করা হয়।

২। **আবেদন (Appeal) :** বিজ্ঞাপনে অনেকক্ষেত্রে আবেদন দ্বারা সরাসরি পণ্য ক্রয়ের অনুরোধ জানান হয়। অনেকক্ষেত্রে চা, বিস্কুট, কফি, সিগারেট, জুতা, ঔষধ, জামা-কাপড প্রভৃতির বিজ্ঞাপন এরূপ আবেদনপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, টসের চা কিনুন, বাটার জুতা ব্যবহার করুন ইত্যাদি।

৩। **আতঙ্ক (Panic or Alarm) :** পাঠকের মনে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কাল্পনিক আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া অনেকক্ষেত্রে উহাকে পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ঔষধ, অস্ত্রশস্ত্র, অগ্নিনির্বাপক দ্রব্য, জীবাণুনাশক দ্রব্য, বীমা প্রভৃতির বিজ্ঞাপনের জন্য এরূপ নীতি গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন—এবার শীতে সাবধান হউন—'চ্যাম্পিয়ান সিরাপ' ভিন্ন সর্দিকাশির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবিয়াছেন কি—বীমা ভিন্ন এই ভাবনা দূর হওয়া সম্ভব নয় ইত্যাদি।

৪। **ইংগিত (Suggestion or Hint) :** অনেকক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পাঠকদিগকে উহাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ইংগিত দেওয়া হয় কিংবা চিন্তার খোরাক যোগান হয়। দেহের ও মনের পরিপুষ্টি সাধনের ইংগিত সাধারণত এরূপ বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায়। যেমন, চুল উঠা কিভাবে বন্ধ হয়, দাঁত শক্ত ও পরিষ্কার রাখিতে হইলে কি করিতে হয় ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের কিছু বিবরণ দিয়া কোনও পণ্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

উপরি-উক্ত নীতিতে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রত্যক্ষ ও দ্রুত ফললাভের আশা কম থাকিলে বা উহাতে ক্রেতার মনে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে চতুর ও দক্ষ ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দ্বারা ভবিষ্যৎ কার্যকারিতার উপর আস্থা স্থাপন করেন। এজন্য নিম্নলিখিত পরোক্ষ পন্থা গ্রহণ করা হয় :

১। **সম্পাদকীয় সমর্থন (Editorial Support) :** অনেকক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন-দাতা অনুরোধ ও অর্থব্যয় দ্বারা বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় পণ্য সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

২। **পরোক্ষ আবেদন (Indirect Appeal) :** অনেক ব্যবসায়ী ক্যালেণ্ডার, ডায়েরী, প্যাড, পেন্সিল প্রভৃতি সম্ভাব্য ক্রেতাদিগকে উপহার দিয়া পণ্য ক্রয়ের পরোক্ষ আবেদন জানান।

৩। **পরোক্ষভাবে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ (Drawing Customer's Attention Indirectly) :** অনেকক্ষেত্রে রেড ক্রশ সোসাইটি, যক্ষ্মানিবারণী তহবিল, বন্যাত্রাণ সাহায্য তহবিল প্রভৃতি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন বা পুস্তিকার ব্যয় বহন করিয়া উক্ত বিজ্ঞাপন বা পুস্তিকার এক কোণে উহার ব্যয় বহনকারী হিসাবে ব্যবসায়ী নিজেদের নাম মুদ্রিত রাখেন। এইভাবে পরোক্ষভাবে এবং সূক্ষ্মভাবে ব্যবসায়ীর প্রতি ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

৪। **শিক্ষামূলক বিজ্ঞাপন (Educational Advertisement) :** অনেকক্ষেত্রে কোন কোন পণ্যের যেমন, মোটরগাড়ী, রেডিও, সেলাইকল, যন্ত্রপাতি, পুস্তক প্রভৃতির বিজ্ঞাপনে উক্ত পণ্যাদির পূর্বের সংস্করণ অপেক্ষা বর্তমান সংস্করণে কি কি উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয় এবং এইভাবে ক্রেতাকে নূতন সংস্করণ কিনিতে উৎসাহিত করা হয়।

বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জা (Layout of an Advertisement) :

বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপিতে বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু, অক্ষর, আকার, চিত্র, ট্রেডমার্ক প্রভৃতির যথাযোগ্য সন্নিবেশকে বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জা (Layout) বলে। বিজ্ঞাপনের সার্থকতা উহার অঙ্গসজ্জার যৌক্তিকতা, সামঞ্জস্য, আকার, আয়তন প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। কিন্তু কিরূপ মাধ্যম ব্যবহৃত হইবে তাহার উপরও ইহার বিষয়-সন্নিবেশ নির্ভর করে। যেমন, লিখিত অক্ষর, চিত্র প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা সংবাদপত্রে কিংবা সাময়িকপত্রে প্রকাশের জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু রেডিওর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইলে শুধু বাক্যবিন্যাসই যথেষ্ট। এখানে আমরা সংবাদপত্রে বা সাময়িকপত্রে যে লিখিত বিজ্ঞাপন দিতে হয় তাহার অঙ্গসজ্জা সম্পর্কে আলোচনা করিব। এই অঙ্গসজ্জার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিবেচনা প্রয়োজন।

১। **আয়তন (Size) :** বিজ্ঞাপনের আয়তন ছোট বা বড় হইতে পারে। বিজ্ঞাপনের আয়তন বড় হইলে অনেক বিষয় বা বড় অক্ষরে লেখা চলে। ইহাতে পণ্য সম্পর্কে পাঠক বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করিতে পারে এবং অনেক পাঠকের দৃষ্টিও আকর্ষণ হইতে পারে। তবে বেশী বড় হইলে এবং অনেক বিষয়বস্তু উহাতে লিখিত হইলে

অনেক পাঠকের উহা পড়ার আগ্রহ নাও থাকিতে পারে। সুতরাং কোন্ শ্রেণীর পাঠকের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হইতেছে উহার আয়তন স্থির করার সময় উহা বিবেচনা করিতে হইবে। আবার আয়তন বড় হইলে ব্যয়ও অত্যধিক পড়ার সম্ভাবনা থাকে। ইহাও বিবেচনার বিষয়। সুতরাং কম ব্যয়ে স্বল্পায়তনের মধ্যে বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

২। আকার (Shape): বিজ্ঞাপনের আকার গোলাকার, বর্গাকার, ত্রিকোণাকার কিংবা চতুর্ভুজাকার হইতে পারে। যে মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে উহাতে কিরূপ স্থানে বিজ্ঞাপন সঙ্কুলান সম্ভব হইবে তাহার অবগতির উপর বিজ্ঞাপনের আকার নির্ভর করে। এজন্য বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

৩। বিষয়বস্তুর গভীরতা (Depth of the Matter): বিষয়বস্তুর আন্তরিক গভীরতার উপর উহার স্পষ্টতা নির্ভর করে এবং পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও উহার মনে স্থায়ী রেখাপাত করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং রেখাচাতুর্যে বিষয়বস্তুর গভীরতা ফুটাইয়া তোলা হইবে কিনা এবং উহার উদ্দেশ্য কতটা সফল হইবে ইহা বিশেষজ্ঞ ও শিল্পীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে হইবে।

৪। শিরোনামা (Headline): অনেকক্ষেত্রে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মোটা অক্ষরে শিরোনামা লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু শিরোনামার অক্ষরে গভীরতা যেন আকার, আয়তন ও বিষয়বস্তুর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ইহা ছাড়া শিরোনামায় কি জাতীয় শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হইবে তাহাও স্থির করিতে হইবে। অনেক ব্যবসায়ী একই পণ্যের বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যমে একই শিরোনামা পুনঃপুনঃ ব্যবহার করেন। বারংবার একই শিরোনামা পাঠকের দৃষ্টিতে পড়িলে পাঠক উক্ত শিরোনামার এবং বিজ্ঞাপিত পণ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারেন। সুতরাং শিরোনামার এ বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে।

৫। উদাহরণ (Illustrations): ছবি, চিত্র, বিশেষ চিহ্ন, ফটো প্রভৃতির সাহায্যে বিজ্ঞাপিত পণ্যের প্রতি ক্রেতার মনোযোগ, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়া (Attention, Interest, Desire and Action) প্রকাশ পাইতে পারে। সুতরাং অঙ্গসজ্জায় এদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। তবে দেখিতে হইবে উক্ত চিত্রাদিতে যেন কোন কুরুচির পরিচয় প্রকাশ না পায়।

৬। বিষয়বস্তু (Text): বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু নানাভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহাতে কোন বিশেষ প্রসঙ্গ (Theme) বা সমস্যা ও উহার সমাধান উল্লেখ কিংবা কোন বিষয়ের প্রাসঙ্গিক ঘটনা ও বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ হইতে পারে। যাহাই হউক না কেন—মনে রাখিতে হইবে যে বিষয়বস্তুই বিজ্ঞাপনের প্রাণ এবং প্রাণহীন বিজ্ঞাপন কখনই কার্যকরী হইতে পারে না। এই প্রাণবস্তু ভাব বিজ্ঞাপনের ভাষার সরলতা, স্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সুতরাং বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জায় এদিকটা উপেক্ষণীয় নহে।

৭। **পশ্চাৎপট (Background):** বিজ্ঞাপনের পশ্চাৎপট একটি আকর্ষণীয় বস্তু। সুতরাং পশ্চাৎপটে যে বর্ণের ও রংয়ের সংযোজন হইবে উহা যেন সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। সাধারণত কাল অক্ষর বা চিত্র সাদা পশ্চাৎপটে এবং কাল পশ্চাৎপটে সাদা অক্ষর বা চিত্র বেশী পরিস্ফুট হয়। বর্তমানে পশ্চাৎপটে দুই রংয়ের পরিবর্তে বহু রং ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যে রংই ব্যবহৃত হউক না কেন উহা যেন অক্ষর ও রংয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে।

সুতরাং বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জায় উহার প্রত্যেকটি অঙ্গের এরূপ বিন্যাস হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে একে অন্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে এবং সবকিছু মিলিয়া উচ্চ রুচিসম্পন্ন নয়নরঞ্জন শিল্প সৃষ্টিতে পরিণত হইয়া বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সাফল্য-মণ্ডিত হয়।

প্রতিযোগিতামূলক কোন এক শ্রেণীর শিশুখাদ্যের একখানা বিজ্ঞাপন (An advertisement for selling a competitive brand of baby food)

সুস্থ ও সবল শিশু গৃহের আনন্দ

আমাদের '**ভিটাফুড**' আপনাদিগকে এই আনন্দ দিতে পারিবে। ইহার জনপ্রিয়তা সর্বোচ্চ।

কারণ

ইহার গুণগত মান সর্বোচ্চ। যে গুণগত মানের জন্য ইহা এত জনপ্রিয় তাহার কারণ নিম্নরূপ:

১। ইহাতে প্রথম শ্রেণীর ভিটামিন আছে।

২। ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক এবং স্বাস্থ্যসম্মত প্রথায় প্রস্তুত।

৩। ইহা অন্যান্য শিশুখাদ্য অপেক্ষা দামে সস্তা।

৪। ইহার আস্বাদ শিশুদের খুবই মুখরোচক ও প্রিয়।

প্রতি সকালে শিশুদিগকে ইহা দিতে ভুলিবেন না।

বেবী ফুড প্রোডাক্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-২৮

একটি ব্যাঙ্কের সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একখানা বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি (An Advertisement Copy for a Bank to popularise Savings Bank Accounts)

জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপনের একখানি প্রতিলিপি (A Copy of Advertisement for the sale of National Defence Certificate)

নিজ দেশকে রক্ষা করার অর্থ নিজেকে রক্ষা করা।

মানবসভ্যতার অমূল্য দান স্বাধীনতা। কাজেই দেশকে রক্ষা করুন, স্বাধীনতা বজায় রাখুন এবং নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটান। ইহার উত্তম পন্থা **জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট ক্রয়।**

ইহা প্রত্যেক পোস্ট অফিসে পাওয়া যায়। ইহা হইতে যে সুদ পাওয়া যায় উহাতে আয়কর দিতে হয় না। সুতরাং সাধ্যমত ইহা ক্রয় দ্বারা নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সঞ্চয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করুন এবং মাতৃভূমিকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিয়া সার্বভৌম স্বাধীনতা ভোগ করুন।

জাতীয় সঞ্চয় সংগঠন।

ভারতের হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য একখানি বিজ্ঞাপন (An Advertisement for promoting the sale of Indian handicrafts)

বিশেষ সংবাদ—সকলেরই অবগত হওয়া উচিত।

সৌন্দর্যের রহস্য উদ্ঘাটিত।

ভারতের হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি

সকলের সৌন্দর্যপ্রীতি এবং শিল্প-মনের খোরাক। নক্সাদার বিভিন্ন প্রকারের শাড়ী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ইহা ভারতেরই গৌরব বহন করিতেছে এবং দেশে-বিদেশে সকলের নিকট সমাদৃত। সর্বদিক দিয়াই ইহা আপনার রুচি তৃপ্তিকর অথচ মূল্যও অধিক নয়।

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

হস্তশিল্প বোর্ড

কলিকাতা : দিল্লী : বোম্বাই : মাদ্রাজ

বিজ্ঞাপন অভিযান (Advertisement Campaign)

কোনও পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পন্থায় ধারাবাহিক-ভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা ক্রেতার উপর যে প্রভাব বিস্তার করা হয় উহাকে বিজ্ঞাপন অভিযান বলে। সুতরাং উহা সিগারেটই হউক আর সাবানই হউক কিংবা ক্ষুদ্র সঞ্চয় পরিকল্পনাই হউক, নূতন জিনিস চালু করিতে বা বাজার দখল করিতে হইলে সুনির্দিষ্ট উপায়ে এবং ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারের কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। তবে যে জিনিসের বিজ্ঞাপন অভিযান চালান হইবে উহার গুণ, মান, উহার উৎপাদকের বা সরবরাহকারীর সংগঠনশক্তি, দক্ষতা ও আর্থিক সঙ্গতি, উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা এবং বিজ্ঞাপনের উপযুক্ত মাধ্যম বিচার করিতে হইবে। এই বিচারের পর বিজ্ঞাপন অভিযান আরম্ভ করিতে হইবে। এই অভিযান নিম্নলিখিত উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে অর্থাৎ বিজ্ঞাপন অভিযান নিম্নলিখিত রূপ ধারণ করিয়া থাকে :

১। **আঞ্চলিক অভিযান (Zonal Campaign) :** এরূপ অভিযানে সমগ্র বাজারকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় এবং একটির পর একটি অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে এবং গভীরভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার আরম্ভ করা হয়। সুতরাং সিগারেট, সাবান বা ক্ষুদ্র সঞ্চয় পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন অভিযান সমগ্র বাজারকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করিয়া পরিচালিত হইতে পারে। একটি অঞ্চলে কৃতকার্যতা দেখা দিলে অন্য অঞ্চলে পদক্ষেপ করা যাইতে পারে।

২। **শ্রেণীবদ্ধ অভিযান (Classified Campaign) :** এরূপ অভিযানে সমগ্র বাজারের ক্রেতাগণকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে শ্রেণীর ক্রেতাদের মধ্যে পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী তাহাদের মধ্যে প্রথমে বিজ্ঞাপন অভিযান পরিচালিত হয়। পরে অন্যান্য শ্রেণার ক্রেতাগণের মধ্যে সম্ভাবনা অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞাপন অভিযান আরম্ভ হয়। সিগারেট, সাবান প্রভৃতির ব্যবহার বা ক্ষুদ্র-বৃহৎ সঞ্চয়-স্পৃহা প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে ইহাদের জন্য শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন অভিযান না হইলেও চলে। তবে প্রথমে ধনীর মধ্যে, পরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এবং সর্বশেষে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে যদি বিজ্ঞাপন প্রচারের ইচ্ছা কেহ করেন তবে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন অভিযান গ্রহণ করিতে পারেন।

৩। **জাতীয় অভিযান (National Campaign) :** এরূপ অভিযানে সমগ্র বাজারে একসঙ্গে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারের কার্য আরম্ভ করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য থাকে বিভিন্ন অঞ্চলের বা দেশের সর্বত্র ক্রেতাদের মধ্যে পণ্যের বার্তা পৌছাইয়া দেওয়া। এজন্য এক সঙ্গে বিভিন্ন সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে, ট্রাম বাসে, সাইনবোর্ডের মাধ্যমে, রাস্তার সংযোগস্থলে ও জনাকীর্ণ স্থানে 'পোস্টার', 'নিওন-সাইন' প্রভৃতির মাধ্যমে পণ্যের আবির্ভাব ও গুণাগুণ প্রচার করা হয়। তবে ইহা ব্যয়-বহুল বিজ্ঞাপন অভিযান। ইহাতে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। সাধারণত বড় ব্যবসায়ী বা উৎপাদক ছাড়া

এরূপ বিজ্ঞাপন অভিযান আরম্ভ করিতে পারেন না। তবে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ইহাতেই বেশী ফলপ্রসূ হয়। সরকারের পক্ষে এরূপ অভিযান পরিচালনা করা কোন বৃহৎ ব্যাপার নয়। সিগারেট বা সাবান উৎপাদক বৃহৎ কারবারী হইলে এরূপ অভিযান অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আঁটিয়া উঠার ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিত্ব (Advertising Agency)

অন্যের পক্ষ হইয়া বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করাকে বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিত্ব বলে। এরূপ প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আবির্ভাবও নূতন। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে এরূপ সংস্থা খুব কম দেখা যাইত। কিন্তু বর্তমানে ইঁহারা বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী হিসাবে নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন। ইঁহারা মধ্যস্থকারবারী হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন। ইঁহারা বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষ হইয়া বিজ্ঞাপনের উপযুক্ত মাধ্যম, স্থান, প্রতিলিপি, সময় ইত্যাদি স্থির করিয়া দিয়া থাকেন এবং উহাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও বিজ্ঞাপন অভিযান পরিচালনা করিতে সাহায্য করেন। পক্ষান্তরে ইঁহারা বিজ্ঞাপন-গ্রহীতার বিজ্ঞাপনীয় স্থানের পূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কেও নিশ্চয়তা দান করিয়া থাকেন। বিজ্ঞাপন জগতে ইঁহাদের ভূমিকা নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে :

১। বর্তমানকালে পণ্যের বাজার ব্যাপক। ক্রেতার রুচি ও চাহিদা বিভিন্ন। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমও বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইহার ফলে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজ অতীতের মত আর সহজ ও সরল নাই। এরূপ জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে অনেকক্ষেত্রে এখন আর বিজ্ঞাপন-বিষয়ক ব্যাপারের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এরূপ বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিত্ব সংস্থা বিজ্ঞাপনের সকল দায়িত্ব গ্রহণ এবং সুষ্ঠুভাবে উহা বহন করিয়া থাকেন।

২। কারবারী প্রতিষ্ঠান অবশ্য বিজ্ঞাপনের জন্য পৃথক বিভাগ খুলিতে পারেন এবং উহা পরিচালনার জন্য দক্ষ ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা ব্যয়-বহুল। অন্যান্য ব্যয় ছাড়া একজন দক্ষ বিজ্ঞাপন ম্যানেজারকে বেতনই দিতে হয় প্রায় ১২০০।১৫০০ টাকা। কারবারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ বড় না হইলে এরূপ ব্যয়-বহুল বিভাগ পরিচালনা করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিত্ব সংস্থা এরূপ বিরাট ব্যয়ের চাপ হইতে অনেক প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই রক্ষা করিতে পারেন।

৩। এই সকল বিজ্ঞাপনী সংস্থা বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। ইঁহারা বিজ্ঞাপন-দাতাকে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে পারেন, বিজ্ঞাপন অভিযান পরিচালনা করিতে পারেন, বিভিন্ন পণ্যের বাজার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে পারেন, বিজ্ঞাপনের উপযুক্ত মাধ্যম নির্বাচন করিতে পারেন, বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি ও অঙ্গসজ্জা কিরূপ হইবে, কোনও পণ্যের বিজ্ঞাপন কিভাবে কতদিন দিতে হইতে পারে ইত্যাদি স্থির করিতে পারেন। সুতরাং বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে ইহারা যে বিশেষ উপযোগী প্রতিষ্ঠান ইহা বলাই বাহুল্য।

৪। ইহারা বিজ্ঞাপনগ্রহীতাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিজ্ঞাপনীয় স্থান ভাড়া লইয়াও থাকেন। ইহাতে বিজ্ঞাপনগ্রহীতা বিজ্ঞাপন-প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিতে পারেন এবং বিজ্ঞাপনী-সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা সহজে আদায় করিতে পারেন।

৫। ইহারা সাধারণত বিজ্ঞাপনদাতার নিকট হইতে বিজ্ঞাপনের জন্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। বিজ্ঞাপনগ্রহীতাদের প্রাপ্যের ১০ হইতে ১৫ শতাংশ দস্তুরী (Commission) হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৬। ইহাদের নিজস্ব অনেক শিল্পী ও বিজ্ঞাপন রচয়িতা থাকেন। ইহাদের সাহায্যে বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জা এবং বিজ্ঞাপন রচনা ভালভাবেই সম্পন্ন হইতে পারে। এই কাজের জন্য অবশ্য বিজ্ঞাপনদাতার নিকট হইতে ইহারা কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৭। ইহাদের কেবল নিজস্ব শিল্পী ও বিজ্ঞাপন রচয়িতাই থাকে না, বিভিন্ন পণ্যের জন্য বিভিন্ন প্রকারের বিজ্ঞাপন দেওয়ার পৃথক পৃথক বিভাগও থাকে এবং উক্ত বিভাগগুলি দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে কোন প্রকার বিজ্ঞাপনদাতারই বিজ্ঞাপন দিতে কোন অসুবিধা হয় না।

৮। ইহারা অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন মাধ্যমের যথা, সংবাদপত্র, সিনেমা হল প্রভৃতির বিজ্ঞাপন অধিকার ক্রয় বা লীজ লইয়া বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকট ভাড়া দিয়া থাকেন। ইহাতে বিজ্ঞাপনগ্রহীতা এবং বিজ্ঞাপনদাতা উভয়েরই সুবিধা হয়। কারণ ইহাতে উহার বিজ্ঞাপনগ্রহীতা বিজ্ঞাপন সংগ্রহের এবং উহার টাকা সংগ্রহের ঝামেলা হইতে অব্যাহতি পান। আবার বিজ্ঞাপনদাতারও কোন্ পত্রিকায় বা কোন্ হলে বিজ্ঞাপন দেওয়ার স্থান পাওয়া যাইবে ইহা খোঁজাখুঁজির জন্য হয়রান হইতে হয় না।

৯। ইহাদের কাজ শুধু বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ও বিজ্ঞাপন দেওয়া নয়। ইহারা বিজ্ঞাপন ও বাজার সম্পর্কে গবেষণা কার্যে লিপ্ত থাকেন। উক্ত গবেষণার সুফল বিজ্ঞাপনদাতারা অনায়াসে ভোগ করিতে পারেন।

ভারতে বর্তমানে কয়েকটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে The Press Syndicate Ltd., Progressive Publicity Service, Clarion Advertising Services Private Ltd., Alfa Advertising Services বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া বিজ্ঞাপনদাতা, বিজ্ঞাপনগ্রহীতা, বিজ্ঞাপনী সংস্থা প্রভৃতির সম্মিলিত চেষ্টায় ভারতীয় বিজ্ঞাপন পরিষদ (Advertising Council of India) স্থাপিত হইয়াছে। বিজ্ঞাপন জগতে এই পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মধারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পরিষদ অবাঞ্ছিত ও অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রকাশ নিবারণ, বিভিন্ন শ্রেণীর বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে উপযুক্ত নূতন নূতন বিজ্ঞাপন মাধ্যম অনুসন্ধান ও প্রবর্তন, বিজ্ঞাপন রচনা কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণের (Training) ব্যবস্থা, বিজ্ঞাপন ও পণ্যের বাজার বিশ্লেষণ ও গবেষণা প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত আছেন। ইহার ফলে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধীয় বিষয়ের যে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন হইতেছে ইহা বলাই বাহুল্য।

প্রতিযোগিতামূলক কোনও জিনিসের বাজার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনের কর্মসূচী (An Advertisement Programme for a competitive product)

বিজ্ঞাপনের কর্মসূচী বলিতে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কখন কোন্ কাজটি করিতে হইবে তাহার পূর্ণ বিবরণকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং বিজ্ঞাপন রচনা, বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন এবং বিজ্ঞাপন অভিযান প্রভৃতি বিজ্ঞাপনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে এবং ইহার ধারাবাহিকতা কিভাবে রক্ষিত হইবে তাহার সুস্পষ্ট ইংগিত ইহার দ্বারা সূচিত হয়। এরূপ কর্মসূচীর পরিকল্পনা নিম্নলিখিতভাবে করা যাইতে পারে :

১। **প্রতিলিপি রচনা (Preparation of the Copy) :** প্রতিলিপি রচনায় বিভিন্ন নীতি গৃহীত হইতে পারে। ইহা কৌতূহল সৃষ্টি করিতে পারে, আবেদন বা অনুরোধ জানাইতে পারে, আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে পারে, ইংগিত বা চিন্তার খোরাক যোগাইতে পারে। আশু দ্রুত ফললাভের জন্য এই সকল নীতি গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের কার্যকারিতার উপর আস্থা স্থাপন করিতে সম্পাদকীয় সমর্থন, ক্যালেণ্ডার, ডায়েরী প্রভৃতির মাধ্যমে পরোক্ষ আবেদন কিংবা রেডক্রশ সোসাইটি, বন্যাত্রাণ সমিতি প্রভৃতির পক্ষ হইয়া বিজ্ঞাপন দিয়া পরোক্ষভাবে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। যেমন, কোনও ঔষধের প্রকৃতি অনুযায়ী বিজ্ঞাপন রচনায় উপরি-উক্ত যে কোন পন্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। ঔষধের বিজ্ঞাপনে প্রত্যক্ষভাবে আতঙ্কসৃষ্টি এবং পরোক্ষভাবে সম্পাদকীয় সমর্থন বিশেষ কার্যকরী হইতে পারে।

২। **মাধ্যম নির্বাচন (Selection of the Media) :** পণ্যের প্রকৃতি, বাজারের বিস্তৃতি, চাহিদার স্বরূপ, ক্রেতার রুচি ও অভ্যাস, আবেদনের বিস্তৃতি, উহার স্থায়িত্ব এবং বিজ্ঞাপন ব্যয় প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া এক বা একাধিক মাধ্যম নির্বাচন করা উচিত। যেমন ঔষধের বাজার খুবই বিস্তৃত, সকল শ্রেণীর লোকেরই ইহা প্রয়োজন। সুতরাং যে মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সর্বাধিক লোকের মধ্যে উহা প্রচারিত হইতে পারে সেরূপ পরিকল্পনাই গৃহীত হওয়া উচিত। বহুল প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র এ বিষয়ে বিশেষ কার্যকরী হইতে পারে।

৩। **অঙ্গসজ্জা (Layout) :** মাধ্যম নির্বাচনের পর বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। এজন্য বিজ্ঞাপনের আয়তন, আকার, বিষয়বস্তুর গভীরতা, শিরোনামা, স্থান নির্বাচন, চিত্র বা ছবি সন্নিবেশ, পশ্চাৎপট প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হইবে। যেমন, ঔষধের ক্ষেত্রে ছবি বা চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তুর গভীরতাকে পরিস্ফুট করা বিশেষ কার্যকরী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪। **বিজ্ঞাপন অভিযান (Advertising Campaign) :** কোন্ স্থানে কিভাবে ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইবে তাহা স্থির করাই বিজ্ঞাপন অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিজ্ঞাপন অভিযানকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে

পারে—আঞ্চলিক, শ্রেণীবদ্ধ ও জাতীয়। আঞ্চলিক অভিযানে সমগ্র বাজারকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে বিজ্ঞাপন প্রচার একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য অঞ্চলে ইহা পরিব্যাপ্ত হয়। শ্রেণীবদ্ধ অভিযানে ক্রেতাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে শ্রেণীর ক্রেতাদের মধ্যে পণ্য বিক্রয়ের সম্ভাবনা বেশী তাহাদের মধ্যে প্রথমে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। ক্রমান্বয়ে সম্ভাবনা অনুযায়ী অন্যান্য ক্রেতাদের মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। জাতীয় অভিযানে এক সঙ্গে সমগ্র বাজারে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। যেমন, ঔষধের বিজ্ঞাপনে জাতীয় অভিযানই বেশী ফলপ্রসূ। কারণ ইহা সকল শ্রেণীর লোকেরই প্রয়োজন এবং ইহার বাজার কোন অঞ্চলে বা গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নহে। ইহার চাহিদা সর্বত্র। প্রতিযোগিতার বাজারে জাতীয় অভিযান ভিন্ন ব্যাপক প্রস্তুতি সম্ভব নহে। তবে জাতীয় অভিযানের ব্যয় বেশী। এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়াই অভিযানের মাধ্যম স্থির করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে।

সুতরাং কোন পণ্যের বিজ্ঞাপন কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে উপরি-উক্ত বিষয়গুলি বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট কর্মপন্থা স্থির করিয়া কর্মসূচীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে হইবে। এরূপ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে বিজ্ঞাপনী সংস্থার অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে পরিকল্পনা প্রস্তুত অনায়াসসাধ্য হইবে।

বিক্রয়কলা (Salesmanship)

বিজ্ঞাপন ছাড়া ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিবর্গের সহিত ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপন করিয়া পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টাকে 'বিক্রয়কলা' (Salesmanship) বলে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য একমাত্র বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করা চলে না। উহার সহিত 'বিক্রয়কলা' যুক্ত হইলে কার্যে সাফল্য সম্বন্ধে অধিকতর নিশ্চিত হওয়া যায়। বিক্রয়কলাকে অন্য কথায় 'ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন' (Personal Advertisement) বলা চলে।

'বিক্রয়কলার' কাজ নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) বিজ্ঞাপন ভাবী ক্রেতাকে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের সহিত পরিচয় করাইয়া দেয়। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিবর্গকে জিনিস ক্রয় করিতে প্রলুব্ধ করিতে বিজ্ঞাপন চিত্তাকর্ষক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অনেক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বিজ্ঞাপনের চাকচিক্য বা চিত্তোৎকর্ষে মুগ্ধ নাও হইতে পারেন এবং জিনিসের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশেষ আস্থা পোষণ নাও করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় বিক্রয়কলার কাজ বা প্রয়োজন হইতেছে ভাবী ক্রেতাদের সহিত ব্যক্তিগত যোগসাধন করা এবং জিনিসের গুণাগুণ প্রচার করিয়া এমনভাবে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করা যাহাতে উক্ত পণ্য ক্রয় করিতে তিনি

উদ্বুদ্ধ হন। যিনি এরূপ ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনকার্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাকে 'বিক্রয়-উদ্যোগী' (**Salesman**) আখ্যা দেওয়া হয়।

(২) বিক্রয়কলার দ্বিতীয় কাজ হইতেছে ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা বা বাক্‌নৈপুণ্যের দ্বারা জিনিসের উৎকর্ষ প্রমাণ করা, ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তির মনে জিনিসের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আস্থা স্থাপন করা, তাঁহার মন জয় করা, যাহাতে তিনি নিয়মিত ও স্থায়ী ক্রেতা হইয়া পড়েন।

(৩) উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে 'বিক্রয়কলার' কাজ শুধু জিনিস ক্রয় করিতে 'উদ্বুদ্ধ করা নয়, পণ্যের আদর্শও বিক্রয়' করা। পণ্যের সৌন্দর্য, উপযোগিতা, কার্যকারিতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতিও 'বিক্রয়' করিতে হইবে। বিক্রেতার সেবা, কর্মতৎপরতা প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে 'বিক্রয়' করিতে হইবে। অন্য কথায়, জিনিসের গুণাগুণ সম্বন্ধে ক্রেতার মনে আস্থা স্থাপন করার সহিত বিক্রেতা যে ক্রেতার জিনিস পাওয়া সম্বন্ধে তৎপর থাকিবেন এবং ক্রেতার সুবিধা-অসুবিধার দিকে সজাগ দৃষ্টি দিবেন এবং তদনুযায়ী কাজ করিবেন এ ধারণাও ক্রেতার মনে যাহাতে জাগে তাহা সৃষ্টি করাও বিক্রয়কলার অন্যতম কাজ।

(৪) ক্রেতার রুচি-অভিরুচি, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি জানিয়া তদনুযায়ী কার্যে অগ্রসর হওয়া এবং কার্যসিদ্ধি করাও বিক্রয়কলার কাজ।

(৫) বিক্রয়কলার কাজ বিক্রয়কেন্দ্রে বসিয়া কিংবা বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। বিক্রয়কেন্দ্রে বা দোকানে থাকিলে বিক্রয়কলার কাজ হইল ক্রেতার আগমনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং দোকানে প্রবেশমাত্র তাঁহাকে অভিবাদন, সাদর অভ্যর্থনা প্রভৃতি জানান। তাহার পর আন্তরিকতা ও সৌজন্যের সহিত জিনিস কিনিতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করা এবং তাহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া কাজ হাসিল করা।

(৬) বিক্রয়কলার কাজ বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া সম্পন্ন করিতে হইলে উপরি-উক্ত বিভিন্ন কাজ ছাড়া যাহাতে পণ্যের ব্যাপক প্রচার হয় এবং বিভিন্ন স্থানের ক্রেতাদের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে তৎপ্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখা বিক্রয়কলার কাজ।

(৭) প্রথম সাক্ষাতে এবং বিদায় গ্রহণকালে সম্ভাব্য ক্রেতাকে অভিবাদন জানান বিক্রয়কলার অত্যাবশ্যক কাজ। ইহাতে ক্রেতার মনে প্রীতিভাব উদ্রেক হয়। তাহাতেও ভবিষ্যৎ বিক্রয়সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে।

(৮) ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়-উদ্যোগীর পক্ষে স্থানীয় ব্যাপার সম্বন্ধে সহানুভূতি, উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রকাশ করাও বিক্রয় কার্যের পক্ষে সহায়ক।

বিক্রয়-উদ্যোগীর অত্যাবশ্যক গুণাবলী (**Essential Qualities of a Salesman**)

'বিক্রয়-উদ্যোগীর' যোগ্যতার উপরও যে কারবারের সাফল্য নির্ভর করে তাহাতে

কোন দ্বিমত নাই। বিক্রয়কার্যে যে যত বেশী পারদর্শী হইবে সে তত ভাল বিক্রয়-উদ্যোগী বলিয়া গণ্য হইবে। 'বিক্রয় উদ্যোগীর' বিভিন্ন রুচি ও প্রকৃতির লোকের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকে। ইঁহাদের সকলকে তাহার আচরণ ও কথাবার্তা দ্বারা খুশী করা মোটেই সহজসাধ্য কাজ নহে। আবার ইহা না করিতে পারিলে তাঁহার কার্যে সাফল্য লাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। সুতরাং কাহাকেও 'বিক্রয় উদ্যোগীর' কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে তাঁহার নিম্নলিখিত গুণাবলীর অধিকারী হওয়া একান্ত প্রয়োজন :

(১) বিভিন্ন ধরনের মানুষের প্রকৃতি উপলব্ধি করার যোগ্যতা (Capacity to understand the nature of different sorts of people). বিভিন্ন প্রকৃতির ধরনের খরিদ্দারের সহিত বিক্রয় উদ্যোগীর কারবার। [illegible] খরিদ্দারের প্রকৃতি না জানিতে পারিলে তাহার প্রয়োজন বুঝিতে পারিবেন না এবং তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া [illegible] ক্রয় উদ্বুদ্ধ করা যায় না। ফলে বিক্রয়ে সাফল্য আসে না। [illegible] মনস্তত্ত্ব (Psychology) বিষয় আয়ত্ত করা। [illegible] বিক্রয় উদ্যোগীকে মনস্তত্ত্ববিদ [illegible] হইবে এবং পরে বিক্রয় উদ্যোগীর কার্যে [illegible] কথা। তবে একমাত্র মনস্তত্ত্ব [illegible] হইলেই বিক্রয় সাফল্য লাভ সম্ভব নহে। এজন্য বিক্রয় উদ্যোগী নিম্নলিখিত অন্যান্য গুণাবলীর অধিকারী [illegible] হইবে

(২) উচ্চমানের সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষা (General Education and Special Training): উচ্চমানের সাধারণ শিক্ষা [illegible] হয়। [illegible] শিক্ষা থাকিলে [illegible] সুতরাং সুষ্ঠু কার্য পরিচালনার [illegible] বিক্রয় উদ্যোগীর উচ্চ [illegible] প্রয়োজন।

(৩) পণ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান (Clear and thorough Knowledge of Articles): পণ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান [illegible] ক্রেতার [illegible] যথাযথ উত্তরও দিতে [illegible] ক্রেতা [illegible] ক্রয় সম্বন্ধে [illegible] বোধ করিবেন না। সুতরাং পণ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান 'বিক্রয় উদ্যোগীর' অবশ্য থাকা প্রয়োজন।

(৪) ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা, বাক্-নৈপুণ্য, সুমিষ্ট ব্যবহার, প্রফুল্লতা এবং সহানুভূতিশীলতা (Personality, Sharpness of Intelligence, Cleverness of Speech, Pleasing Manners, Cheerfulness and Sympathetic Attitude): উপরি-উক্ত গুণ থাকাও বিক্রয়-উদ্যোগীর পক্ষে প্রয়োজন। উহা না থাকিলে ক্রেতাকে বশে বা আয়ত্তে আনা সম্ভব নয় এবং ক্রেতাকে বিক্রয় উদ্যোগীর আয়ত্তে না আনিতে পারিলে বিক্রয়ে সাফল্যলাভ আশানুরূপ হয় না। সহানুভূতির সহিত ক্রেতার প্রয়োজন বুঝিতে পারা বিক্রয়ে সাফল্যের জন্য অবশ্যই কর্তব্য।

(৫) সংক্ষেপে বক্তব্য বিষয় সুন্দরভাবে হৃদয়গ্রাহী করার ক্ষমতা (Capacity to make the subject-matter fully attractive by neat and brief speech) : বক্তব্য বিষয়কে অল্প কথায় মনোমুগ্ধ করিয়া প্রকাশ করা বিক্রয়-উদ্যোগীর অন্যতম গুণ। বিক্রয়-উদ্যোগীর এরূপ গুণ থাকিলে সে স্বভাবতই ক্রেতাকে মুগ্ধ করিতে পারে এবং জিনিস বিক্রয়ে সাফল্য আনিতে পারে।

(৬) প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব (Presence of Mind) : এরূপ গুণ থাকিলে উপস্থিত বিষয়ে বুদ্ধি বিকশিত হয় এবং মন জয় করা সহজসাধ্য হয়।

(৭) ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা (Patience and Persistence) : কোনও ব্যক্তি কোন জিনিস ক্রয় করিতে আসিলে বা চাহিলে তিনি হয়ত অনেক জিনিস দেখিতে চাহিবেন এবং অনেক কথার অবতারণা করিবেন। এজন্য অনেক সময়ও হয়ত তিনি লইবেন। এরূপ অবস্থায় 'বিক্রয়-উদ্যোগীকে' ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সমস্ত কিছু দেখাইতে ও শু'নতে হইবে। এজন্য কোনপ্রকার বিরক্তি প্রকাশ করিলে চলিবে না। এরূপ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা 'বিক্রয়-উদ্যোগী'র থাকা প্রয়োজন। ইহাতে ক্রেতার মন সহজে জয় করা যায়। এভাবে মন জয় করিতে পারিলে ক্রেতা অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিশ্চয়ই কিছু না কিনিয়া ফিরিয়া যাইবেন না।

(৮) সুশ্রী চেহারা (Good Appearance) : বিক্রয়-উদ্যোগীর সুশ্রী চেহারা থাকিলে ক্রেতা অবশ্যই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইবেন। সুতরাং বিক্রয়ে সাফল্য চেহারার উপরও অনেকটা নির্ভর করে।

(৯) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উন্নত রুচিসম্পন্ন পোশাক (Neat and Clean dress with refined taste) : বিভিন্ন রুচি ও অবস্থার লোকের সহিত 'বিক্রয়-উদ্যোগী'র কাজ-কারবার। কাজেই তাহাকে সর্বদা চটপটে (Smart) থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই চটপটেভাব (Smartness) নির্ভর করে অনেকটা পোশাকের উপর। বিক্রয়-উদ্যোগীর এরূপ পোশাক পরিধানে থাকিলে ক্রেতা স্বভাবতই উহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিবেন এবং উহার নিকট হইতে ভাল জিনিস পাইবেন এরূপ আশা পোষণ করিবেন। এজন্য ক্রেতা এরূপ লোকের দিকেই বেশী আকৃষ্ট হইবেন।

(১০) শ্রমসাধ্য কাজ করার ক্ষমতা (Capacity for Hard Work) : বিক্রয়-উদ্যোগীর কাজ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং শ্রমসাধ্য কাজ করার ক্ষমতা না থাকিলে এ ব্যাপারে সাফল্য লাভ করা যায় না। এজন্য তাঁহাকে স্বাস্থ্যবান হইতে হইবে এবং সর্বপ্রকার অলসতা দূর করিতে হইবে।

(১১) নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসভাজনতা (Dependability and Trustworthiness) : নিয়োগকর্তা ও ক্রেতা উভয়ের নিকট এ গুণের পরিচয় না দিতে পারিলে কার্যে সাফল্য বা কর্মোন্নতি কোনটাই সম্ভব নয়।

(১২) **আনুগত্য, উৎসাহ ও প্রফুল্লতা (Loyalty, Enhusiasm and Cheerfulness) :** যে প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিতে হইবে সে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য না থাকিলে, নিজের সত্তাকে প্রতিষ্ঠানের সহিত মিশাইতে না পারিলে এবং উৎসাহ ও প্রফুল্লতা সহকারে প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পন্ন করিতে না পারিলে নিয়োগকর্তা এবং ক্রেতা কাহারও বিশ্বাস বা আস্থা আনা যায় না এবং কাজে বা কর্মোন্নতিতে সাফল্য আসে না। 'বিক্রয় উদ্যোগী'র উপর ব্যবসায়ের সুনাম অনেকটা নির্ভর করে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যের অভাব বা শৈথিল্য দেখা দিলে ব্যবসায়ে সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় একথা প্রত্যেক 'বিক্রয়-উদ্যোগী'র মনে রাখা উচিত। "Remember, more races are won, more business built, more obstacles overcome by cheerful, energetic enthusiasm than by other human attributes."

(১৩) **দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (Determination) :** কার্যে সাফল্যলাভ করিতে হইলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-বিশিষ্ট হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

(১৪) **উচ্চাভিলাষ (Ambition) :** কারবারের উন্নতিতে বিক্রয়-উদ্যোগীর উন্নতি এবং কার্যে সাফল্য আসিলে মনোবাসনা সিদ্ধ হইবে এরূপ উচ্চাভিলাষ কর্মে অবশ্যই সাফল্য আনিয়া দেয়।

(১৫) **অন্যের সহিত এক হইয়া যাওয়ার ক্ষমতা (Capacity to become one with others) :** ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়-উদ্যোগীদের পক্ষে কোনও স্থানের ব্যক্তিদের সহিত উক্ত স্থানের বিভিন্ন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করা বা তাঁহাদের সহিত এক হইয়া যাওয়ার যোগ্যতা থাকাও অত্যাবশ্যক। এরূপ অবস্থায় স্থানীয় লোক তাঁহাকে নিজেদের একজন বলিয়াই মনে করিবে এবং তাঁহার কর্ম-সাফল্যে সাহায্য করিবে।

বিক্রয়-উদ্যোগীর কাজ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ এবং উপরি-উক্ত গুণাবলীর যতটা সম্ভব অধিকারী হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

বিক্রয়কলা ও মনস্তত্ত্ব (Salesmanship and Psychology)

বিক্রয়কলা ও মনস্তত্ত্বের সহিত সম্পর্ক অতি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ, কারণ বিক্রয়ে সাফল্য আনিতে হইলে মনস্তাত্ত্বিক হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। মনস্তত্ত্বের কাজ মানুষের আচরণ-বিধি বিশ্লেষণ করা এবং মানুষ কোন্ অবস্থায় কি প্রকার আচরণ করিতে পারে উহার একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া। ব্যবসাজগতে ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত ব্যাপারেও এই মনস্তত্ত্বের প্রভাব কম নয়। মানুষ কোনও পণ্য ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে প্রয়োজন প্রবণতা ও আবেগ দ্বারা চালিত হয়। ইহা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। যদি কোনও বিক্রয়-উদ্যোগী ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে উহার খরিদ্দারের এই সহজাত প্রবৃত্তি আবেগ ও প্রবণতা অনুধাবন করিতে সক্ষম হন তবে পণ্য বিক্রয় ব্যাপারে উঁহ

খরিদ্দারকে পণ্য ক্রয়ে অনায়াসে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন এবং তাহাকে একজন স্থায়ী খরিদ্দারেও পরিণত করিতে পারেন। কিন্তু বিক্রয়-উদ্যোগীকে এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইলে মনস্তত্ত্ব (Psychology) অধ্যয়ন অবশ্য প্রয়োজন। খরিদ্দার কোনও ব্যক্তি-বিশেষ নহে। ইহা বহুলোকের সমষ্টি। কিন্তু এক ব্যক্তির আচরণবিধি অন্য একজন ব্যক্তির আচরণবিধি হইতে পৃথক হওয়া কোন বিচিত্র ব্যাপার নহে। মোটের উপর লোকের পদমর্যাদা, মেলামেশা, পরিবেশ প্রভৃতি বিভিন্ন হওয়ায় একের উদ্দেশ্য, আবেগ, সহজাত প্রবৃত্তি প্রভৃতি অন্য হইতে পৃথক দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোনও একজন খরিদ্দারকে কোনও বিশেষ অবস্থায় ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে অন্যকেও যে অনুরূপ অবস্থায় ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে পারা যাইবে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। এজন্য ভিন্ন পন্থার প্রয়োজন হইতে পারে। অবস্থাবিশেষে কোন্ খরিদ্দারকে কিভাবে আয়ত্তে আনিতে হইবে উহা মনস্তত্ত্বের বিষয়। মনস্তত্ত্বই বিভিন্ন অবস্থার প্রকৃষ্ট বিশ্লেষণ করিতে পারে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারে। সুতরাং বিক্রয়-কলার সাফল্য মনস্তত্ত্ব শিক্ষার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কোনও বিক্রয়-উদ্যোগী মনস্তত্ত্বের শিক্ষা পাইলে তিনি কোনও খরিদ্দারের সমাগম দেখিলে তাহার উদ্দেশ্য, ভাবপ্রবণতা, সহজাত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে উৎসাহ বোধ করিতে পারেন এবং খরিদ্দারের পোশাক-পরিচ্ছদ, চেহারা ও উহার সহিত সামান্য কথাবার্তার মাধ্যমে উহার প্রকৃতির স্বরূপ অবগত হইতে পারেন এবং তদনুযায়ী নিজের আচরণকে সংযত করিয়া উহাকে কোন পণ্য ক্রয় করিতে বাধ্য করিতে পারেন। সুতরাং উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে অসুবিধা হইবে না যে, মনস্তত্ত্বে পারদর্শী হইলে বিক্রয়কলার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজসাধ্য হয়। এজন্য প্রত্যেক বিক্রয়-উদ্যোগীর কাজে সাফল্য অর্জন করার জন্য মনস্তত্ত্বে জ্ঞান অবশ্য প্রয়োজন। এজন্য বলা হয়—একজন বিক্রয়-উদ্যোগীকে প্রথমে মনস্তাত্ত্বিক এবং পরে বিক্রয়-উদ্যোগী হইতে হইবে (a salesman needs to be a psychologist first and salesman afterwards)। বিক্রয়-উদ্যোগীর পক্ষে মনস্তত্ত্বের জ্ঞান কতটা গুরুত্বপূর্ণ খরিদ্দারদের প্রকৃতি ও প্রবণতার দুই-একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন শ্রেণীর বা প্রকৃতির লোকের সহিত পরিচিত। উদাহরণ স্বরূপ উহাদের মধ্যে একজন অফিসের সহকর্মী, একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী, একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ও একজন সংসার-অভিজ্ঞ স্ত্রীলোক লইয়া বিষয়টি আলোচনা করা যাইতে পারে।

একজন অফিসের সহকারী তাঁহার উপরিস্থ কর্মচারীর আদেশ-নির্দেশমতই সাধারণ কাজকর্ম করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার সমগোত্রীয় লোকের সহিত চলাফেরা, কথাবার্তা ও অন্যান্য সামাজিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং এরূপ কোন লোক যদি কোনও দোকানে কোনও পণ্য ক্রয় করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন তখন তিনি পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে বিক্রয়-উদ্যোগীর নিকট হইতে কিরূপ পরামর্শ আশা করেন? তিনি আদেশ-নির্দেশের মত প্রত্যক্ষ ও সরাসরি পরামর্শই আশা করেন এবং পণ্যের

উপযোগিতা সম্পর্কে সরাসরি উপদেশই তাঁহাকে পণ্য ক্রয় করিতে উদ্বুদ্ধ করিবে। মনে করি তিনি একটি 'লিভার টনিক' ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে কোনও ঔষধের দোকানে প্রবেশ করিয়াছেন। এরূপক্ষেত্রে আশু ফলদায়ক ও স্থায়ী নিরাময় সম্পর্কে ইহা বিশেষ উপযুক্ত এরূপ সরাসরি উপদেশ প্রদান করিলেই জিনিসটির বিক্রয় সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চয় হওয়া যাইবে। কিন্তু একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী এরূপ দোকানে উক্ত জিনিস ক্রয় করিতে আসিলে তাঁহাকে এরূপ সরাসরি উপদেশে উপযুক্ত ফলপ্রদান করিতে পারিবে না। কারণ তিনি অফিসের সহকারীর মত আদেশ-নির্দেশ শুনিতে অভ্যস্ত নন। তাঁহার একটি স্বাধীন সত্তা আছে বলিয়াই তিনি মনে করেন। এরূপক্ষেত্রে জিনিসের গুণাগুণ সম্পর্কে প্রস্তাব বা ইংগিত পেশ করিলে ফলদায়ক হওয়ার সম্ভাবনা। ইহা একটি জনপ্রিয় ঔষধ এবং সে সম্পর্কে তিনি কি মনে করেন এবং ব্যবহার দ্বারা উহার সঠিক পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করেন কিনা এই জাতীয় ভাষণই বিশেষ কার্যকরী প্রস্তাব। কিন্তু একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকে শুধু এরূপ প্রস্তাব বা ইংগিত দিলে চলে না। এরূপ ঔষধ কেন বিশেষ কার্যকরী এবং উহাতে কি আছে যাহার ফলে ইহা বিশেষ রোগ প্রতিরোধকের ক্ষমতা রাখে ইত্যাদির বিচার-বিশ্লেষণই তিনি প্রত্যাশা করেন। সুতরাং ঔষধের বিভিন্ন উপাদান ও উহাদের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিলে ফলদায়ক হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু একজন সংসার-অভিজ্ঞ স্ত্রীলোকের দৃষ্টিভঙ্গী এই ঔষধ সম্পর্কে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি সাংসারিক আয়-ব্যয় সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। সুতরাং কম মূল্যে ভাল জিনিস পাওয়ার আগ্রহ তাঁহার বেশী। এরূপ ক্ষেত্রে বাজারে ইহাই যে ভাল ঔষধ লোকে বলে এবং দামেও সস্তা এরূপ উক্তি উপযুক্ত ফল প্রদান করিতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন ও প্রকৃতিবিভিন্ন। এই বিভিন্ন প্রকৃতির সহিত পরিচিত হওয়া বিক্রয়-উদ্যোগীর কার্যে সাফল্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। এই উক্তির সমর্থন পাইলে একথা অবশ্যই বলা চলে যে, বিক্রয়কলা ও মনস্তত্ত্ব একসূত্রে গ্রথিত। ফলে বিক্রয়-উদ্যোগী হিসাবে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে অন্যান্য গুণাবলীর সহিত তাঁহার মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বেশ কিছুটা জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক।

বিভিন্ন প্রকারের বিক্রয়-উদ্যোগী (Different types of Salesman)

কার্যের প্রকৃতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিক্রয়-উদ্যোগী বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারেন। নিম্নে উহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল :

(১) বিক্রয়-উদ্যোগীকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা চলে : (ক) 'সৃজনক্ষম' (Creative) এবং (খ) 'সেবারত' (Service)। 'সৃজনক্ষম' বিক্রয়-উদ্যোগীদের কাজ নূতন জিনিস বাজারে চালু করা এবং উহার চাহিদা সৃষ্টি করা। 'সেবারত' বিক্রয়-উদ্যোগীর কাজ ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করা এবং তাহাদের প্রয়োজনমত জিনিসের যোগান দেওয়া।

(২) যে জিনিস বিক্রয় করিতে হইবে তদনুযায়ী বিক্রয়-উদ্যোগীদের 'বাস্তব' (Tangible) এবং 'অবাস্তব' (Intangible) এই দুইভাগে ভাগ করা চলে। 'বাস্তব' বিক্রয়-উদ্যোগীর কাজ স্পর্শযোগ্য বা স্পর্শদ্বারা অনুভবযোগ্য পণ্য লইয়া আর 'অবাস্তব' বিক্রয়-উদ্যোগীর কাজ স্পর্শদ্বারা অনুভবযোগ্য নয় এরূপ জিনিস লইয়া—যেমন, আমোদ-প্রমোদ বা বিশ্রামের আনন্দ উপভোগের বস্তু কিংবা নিরাপদে টাকা-পয়সা বিনিয়োগের কাজ-কারবার কিংবা বীমার পলিসির বিক্রয় ইত্যাদি লইয়া। ইঁহারা ক্রেতার নিকট বিশেষ ধরনের সুযোগ-সুবিধা বা উপযোগিতা (Utility) বিক্রয় করিয়া থাকেন।

(৩) বিক্রয়-উদ্যোগী আবার খুচরা দোকানের (Retail Shop), পাইকারী ব্যবসায়ীর (Wholesale Dealer's) এবং উৎপাদকের প্রতিনিধি (Manufacturer's Representative) হিসাবে ভাগ করা চলে। খুচরা দোকানের বিক্রয়-উদ্যোগী দোকানে বসিয়া মাল বা জিনিস বিক্রয়ে সহায়তা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জিনিস ক্রয়ের উদ্দেশ্যে দোকানে প্রবেশ করেন তাঁহার নিকট মাল বিক্রয় করা ইঁহার কর্তব্য। অনুরূপে বড় বড় দোকানে বসিয়া বিক্রয়কার্য সম্পাদন করা পাইকারী ব্যবসায়ীর বিক্রয়-উদ্যোগীর কাজ। কিন্তু উৎপাদকের প্রতিনিধি সাধারণত ভ্রাম্যমাণ। তিনি বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিয়া পণ্যের প্রচার ঘটান এবং চাহিদা সৃষ্টি করেন। ইঁহার সহিত পণ্যের বিক্রয়কার্যের কোন সম্পর্ক নাই।

বিক্রয়ে অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং কারবারী প্রক্রিয়া (Economic, Psychological and Business Process in Selling)

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কারবারী জগতে জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে পণ্য উৎপাদন স্থানীয় চাহিদার উপর নির্ভর করিত। ক্রেতাদের প্রয়োজনও সামান্য আহার-বাসস্থান এবং পরিচ্ছদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যাহা কিছু পণ্য উৎপন্ন হইত এবং বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত হইত উহা সহজেই বিক্রয় হইয়া যাইত। মোটের উপর তখন বিক্রেতার বাজারের (Seller's Market) প্রাধান্য ছিল। এরূপ অবস্থায় বিক্রয় প্রচেষ্টার গুরুত্ব বিশেষ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনকারী এবং বিক্রয়-সংস্থার সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে এখন বিক্রেতার বাজারের প্রাধান্য শেষ হইয়াছে। এখন ক্রেতার চাহিদা, ইচ্ছা ও অনিচ্ছার উপর অনেকাংশে বিক্রয় নির্ভর করে। এজন্য এখন ক্রেতার বাজারের (Buyer's Market) প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্রেতার চাহিদার বৈচিত্র্য, পণ্যের বৈচিত্র্য, পণ্যের বাজারের দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃতি, ক্রেতাদের বিভিন্ন সংস্কৃতি, জীবনযাত্রার মান, পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি বিক্রয়ের বাজারের জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। এজন্য বৃহৎ পরিসরে উৎপাদন-ব্যবস্থা চালাইয়া উৎপাদন ব্যয়-সংকোচ করিলেই পণ্য বিক্রয় হয় না। আর

যথাযথভাবে পণ্য বিক্রয় করিতে না পারিলে মুনাফালাভও সম্ভব হয় না। সুতরাং সুষ্ঠু বিক্রয়-ব্যবস্থা চালু করিতে না পারিলে কারবারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতার সম্ভাবনাও ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে। এজন্য প্রত্যেক কারবারীকে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় বৃদ্ধির নানাবিধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে বিশেষ বদ্ধপরিকর হইতে হয় এবং বিক্রয়-ব্যবস্থার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। ফলে পণ্য বিক্রয়ের গুরুত্ব দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কারবারী জগতে ইহা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। পণ্য বিক্রয়ের কার্য সাফল্যের সহিত অগ্রসর না হইলে কারবারে কখনই মুনাফা অর্জন সম্ভব হয় না। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার জন্যই পণ্য বিক্রয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া কারবারী জগতে বিবেচিত হইয়া থাকে।

কিন্তু বিক্রয়-ব্যবস্থা ফলপ্রসূ (Effective) করিতে হইলে উহার তিনটি প্রক্রিয়ার (Process) উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। উহারা হইতেছে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া (Economic Process), মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া (Psychological Process) এবং কারবারী প্রক্রিয়া (Business Process)।

আপাতদৃষ্টিতে পণ্যের বাজার প্রতিযোগিতামূলক (Competitive) হইলেও ইহাতে বাস্তবক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা (Imperfect Competition) দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য বিক্রয়-প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ বা কার্যকর করিতে নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। অর্থাৎ এজন্য প্রয়োজন পণ্যের প্রচার, বিজ্ঞাপন ও অন্যবিধ সক্রিয় ব্যবস্থা যাহার ফলে সম্ভাব্য ক্রেতা প্রকৃত ক্রেতায় রূপান্তরিত হইতে পারেন। ফলে প্রত্যেক কারবারীকে পণ্য উৎপাদন ব্যয় ছাড়া পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য অনেক ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু এই ব্যয়ের সীমা নির্দেশ না থাকলে বা উহা অত্যধিক হইয়া পড়িলে পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এজন্য বিক্রয়-প্রচেষ্টা ফলবতী না হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং উৎপাদন ব্যয়-সংকোচের সহিত বিক্রয়জনিত ব্যয়-সংকোচও বিক্রয়-সাফল্যের জন্য অত্যাবশ্যক। বিক্রয়-ব্যয় কম হইলে কম মূল্যে পণ্যের যোগান দিয়া অধিক সংখ্যক ক্রেতা আকর্ষণ করা চলে। ইহাতে মোট বিক্রয় বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ইহাই বিক্রয়ের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া এবং বিক্রয়-প্রচেষ্টার সাফল্যের একটা দিক। এদিকে দৃষ্টি দেওয়া বিক্রেতার অবশ্যই প্রয়োজন।

বিক্রয়-প্রচেষ্টার দ্বিতীয় দিক হইতেছে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া (Psychological Process)। বিভিন্ন উৎপাদকের একই প্রকারের এবং একই মূল্যের বহু পণ্য বাজারে আছে। কোন্ পণ্যের উপর ক্রেতার অধিক আকর্ষণ দেখা দিবে উহা ক্রেতার মনের উপর বিক্রেতার প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে। ইহা বিক্রয়ের সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। সুতরাং পণ্য বিক্রয়ের ব্যয়-সংকোচের সহিত ক্রেতাকে আকর্ষণ করার মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার উপরও বিক্রয়-প্রচেষ্টার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে।

বিক্রয়-প্রচেষ্টার তৃতীয় বা শেষ প্রক্রিয়া হইতেছে কারবারী প্রক্রিয়া (Business Process)। অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া কার্যকর হইলেও কারবারী প্রক্রিয়ায় শৈথিল্য দেখা দিলে বিক্রয়-প্রচেষ্টা ব্যাহত না হইয়া যায় না। পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ, ঠিকমত সময়ে পণ্য উৎপাদন এবং উপযুক্ত পরিবহনের মাধ্যমে উহাকে বাজারে পাঠানো প্রভৃতি কারবারী প্রক্রিয়া। কাজেই কারবারী প্রক্রিয়ার সাফল্যের উপর বিক্রয়-প্রচেষ্টার সাফল্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

বিক্রয়কলার মূলতত্ত্ব ও কলাকৌশল (Fundamentals and the Techniques of Salesmanship)

যে সকল কার্যের দ্বারা বিক্রেতা ক্রেতাকে আকর্ষণ করেন এবং সম্ভাব্য ক্রেতাকে বাস্তব ক্রেতায় পরিণত করেন উক্ত কার্যাবলী বিক্রয়কলা বা বিক্রয় বিদ্যার অন্তর্গত। বিক্রয়কলার কার্য ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। এজন্য বিক্রয়ের কতকগুলি মূলতত্ত্ব ও কলাকৌশল মানিয়া চলিলে বিক্রয়কলার কাজ সহজ ও সরল হয় এবং কর্মের সাফল্য সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। নিম্নে উক্ত মূলতত্ত্ব ও কলাকৌশলগুলি আলোচিত হইল

১। **বিক্রয় সংগঠন (Sales Organisation):** সংগঠন ভিন্ন কারবারের কাজ অগ্রসর হইতে পারে না। অনুরূপভাবে বিক্রয়ের কাজও বিক্রয় সংগঠন ভিন্ন অগ্রসর হইতে পারে না। কারবারের বিক্রয় বিভাগ (Sales Department) বিক্রয় সংগঠনের কাজ করিয়া থাকে। এই সংগঠন বা বিভাগের মাধ্যমে বিক্রয় পরিকল্পনার কার্যক্রম ও পদ্ধতি প্রস্তুত হয়। এই বিভাগের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একজন 'বিক্রয় ব্যবস্থাপক' (Sales Manager) নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করাও অবশ্য প্রয়োজন। বিক্রয়নীতি কার্যক্রম ও পদ্ধতি কার্যকরী করা এবং তজ্জন্য বিক্রয় কর্মচারীদের শিক্ষার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে। এজন্য 'বিক্রয় ব্যবস্থাপক'কে শিক্ষিত, অভিজ্ঞ, দক্ষ, উদ্যোগী, উৎসাহী ও উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন হইতে হয়। সুতরাং প্রত্যেক কারবারী প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় সংগঠন থাকা একটি মূলতত্ত্ব বা নীতি হওয়া উচিত।

২। **বিক্রয়-নীতি (Sales Policy) :** বিক্রয়-সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাই বিক্রয়-নীতি। এই নীতি বিক্রয় সংগঠনের মাধ্যমে কার্যকরী করা হয়। তবে এই নীতি বিশেষ মূলতত্ত্ব ও কলাকৌশলের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠা উচিত। এই তত্ত্বের ভিত্তি হইতেছে অতীত অভিজ্ঞতা, বাস্তব অবস্থা এবং গবেষণা দ্বারা পরীক্ষিত গৃহীত কর্মপন্থা। বিক্রয়-নীতি প্রধানত একটি নির্দিষ্টকালের জন্য রচিত হওয়া এবং প্রয়োজনমত উহার পরিবর্তন সাধন করা উচিত। পণ্য বিক্রয়ের আকাঙ্ক্ষিত ফললাভের জন্য ইহা অবশ্যই প্রয়োজন।

৩। **বিক্রয় কার্যক্রম ও পদ্ধতি (Sales Programme and Methods) :** বিক্রয়-নীতি কার্যকরী করিতে হইলে বিক্রয় কার্যক্রম ও পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বিক্রয় কার্যক্রম বলিতে ভৌগোলিক অঞ্চল অনুযায়ী বা অন্য উপায়ে ক্রেতা ও বাজারের বিভাগ, পণ্যের মোট বিক্রয়ের লক্ষ্য (Target) নির্ধারণ, উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর সময় স্থিরীকরণ প্রভৃতিকে বুঝায়। পণ্যের প্রকৃতি, বাজারের বিস্তৃতি, খরিদ্দারদের বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা ও আয় প্রভৃতি বিচার-বিবেচনা করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে উপযুক্ত বিক্রয়-পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়। বিক্রয়-পদ্ধতির কার্যকারিতা উপযুক্ত সংখ্যক বিক্রয়-উদ্যোগী (Salesman) নিয়োগ, বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মাধ্যম নির্বাচন এবং উহাতে পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ব্যবস্থা, পণ্যের নমুনাকরণ (Sampling), মান নির্ধারণ (Standardisation) এবং তদনুসারে অনুক্রম নির্ধারণ (Gradation), পণ্যতালিকা বহি (Catalogue) প্রণয়ন, উহার প্রশংসা-পত্র মুদ্রণ ও প্রচার, মেলা ও প্রদর্শনীতে পণ্যপ্রদর্শনের ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপরি-উক্ত বিক্রয়ের বিভিন্ন সমস্যা বিচার-বিবেচনা করিয়া বিক্রয় কার্যক্রম ও পদ্ধতি নির্বাচন ও তদনুযায়ী কার্যে আত্মনিয়োগ ভিন্ন বিক্রয়ে সাফল্যলাভ করা সহজসাধ্য নহে।

৪। **বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ (Sales Control) :** বিক্রয়-নীতি, কার্যক্রম ও পদ্ধতি যথাযথভাবে কার্যে পরিণত হইতেছে কিনা উহা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা এবং তদনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রয়-লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনবোধে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ও কাজ। ইহা ভিন্ন কারবারে ঈপ্সিত ফললাভ করা যায় না ইহাই অভিজ্ঞ কারবারীদের অভিমত। এজন্য ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা বিক্রয়কলার অন্যতম মূলনীতি, কারবারের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণও ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় সাধারণত নিম্নলিখিত পন্থাগুলি গৃহীত হইয়া থাকে :

(ক) পণ্যের বিক্রয় হিসাব (Estimate), লক্ষ্য (Target), নীতি (Policy), কার্যক্রম (Programme), পদ্ধতি (Method) প্রভৃতি নির্ধারণ।

(খ) বিক্রয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর উপর উহা কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব অর্পণ করা। তিনি অবশ্য উক্ত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে তাঁহার অধীন এক এক কর্মচারীকে এক এক অঞ্চলের ভার দিয়া থাকেন এবং উক্ত অঞ্চলের খরিদ্দারদের নিকট পণ্য বিক্রয়ের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ (Quota) স্থির করিয়া দিয়া থাকেন। উক্ত কর্মচারীদিগকে বিক্রয়কার্যে সহায়তা করার জন্য বিজ্ঞাপন, প্রচার ইত্যাদি আনুষঙ্গিক সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(গ) ইহার পর নির্দিষ্ট সময় পর পর উক্ত কর্মচারীদের নিকট হইতে তাঁহাদের কার্যের অগ্রগতির বিবরণ (Report) সংগ্রহ করা হয়।

(ঘ) ইহার পর মাঝে মাঝে উক্ত কর্মচারীদের সভা আহ্বান করা হয় এবং উক্ত

সভায় এই সকল বিবরণ আলোচিত হয় এবং বাজার ও খরিদ্দারদের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

(ঙ) যে সকল কর্মচারী বিক্রয়-লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন বা উহা অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়।

(চ) বিক্রয়-সংক্রান্ত ব্যাপারের কোন কিছুর পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে উহা করা হয় এবং নূতন নীতি ও পদ্ধতি কার্যকরী করা হয়।

বিক্রয় সম্প্রসারণের জন্য বিক্রয়কলার প্রয়োজনীয় সহায়ক ব্যবস্থাগুলি (Different Aids to Salesmanship necessary for Sales Promotion)

বিক্রয়-উদ্যোগীদের চেষ্টায় কারবারের বিক্রয় সম্প্রসারণ ঘটিয়া থাকে। উহাদের ব্যক্তিগত গুণাবলী এজন্য বিশেষ দায়ী সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাদের কার্য যাহাতে ফলপ্রসূ হয় তাহার জন্য কতকগুলি সহায়ক ব্যবস্থাও (Aids) গৃহীত হইয়া থাকে। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :

১। **বিজ্ঞাপন (Advertisement) :** ইহা পণ্যের পরিচয় জ্ঞাপন করে। ব্যক্তিগত (Personal) প্রচারকার্য ছাড়া এই অব্যক্তিক (Impersonal) প্রচারও বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য যে প্রয়োজন ইহা কারবারী জগতে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। এজন্য ইহা বিক্রয়কলার সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। **চিঠিপত্র (Correspondence) :** সম্ভাব্য ক্রেতার সহিত বিক্রয়-উদ্যোগীর সাক্ষাৎকারের পূর্বে অনেক কারবারী প্রতিষ্ঠান উক্ত ক্রেতাকে পত্রের মাধ্যমে বিক্রয়-উদ্যোগীর পরিচয় জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার সাক্ষাতের সময় ও তারিখ জানাইয়া দিয়া থাকেন। পত্রের মাধ্যমে ক্রেতার মনে অবশ্য কারবারী প্রতিষ্ঠানের এবং বিক্রয়-উদ্যোগীর প্রতি সহানুভূতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়। এরূপ পত্র বিক্রয়-উদ্যোগীর কার্যের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং বিক্রয়-উদ্যোগীর পক্ষে ক্রেতার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহাকে আয়ত্তে আনা সহজসাধ্য হয়।

৩। **বিক্রয় পুস্তিকা (Sales Manual) :** পণ্যের পরিচয়, গুণাগুণ, উপযোগিতা, প্রশংসাপত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া অনেক কারবারী প্রতিষ্ঠান পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে বিক্রয়-উদ্যোগী পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারেন এবং উহা সম্ভাব্য ক্রেতার হস্তে সমর্পণ করিয়া ক্রেতাকেও এসম্বন্ধে জ্ঞাত করাইতে পারেন। এরূপ পুস্তিকা সম্ভাব্য ক্রেতাকে প্রভাবিত করিয়া বিক্রয়কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে।

৪। **নমুনা (Samples) :** নূতন দ্রব্যের প্রচারের জন্য উহার নমুনা বিতরণ বহুদিন যাবৎ প্রচলিত। প্রায় সকল লোকের ব্যবহারের উপযুক্ত এবং স্বল্পমূল্যবিশিষ্ট

প্রসাধন দ্রব্য, ঔষধ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ কার্যকরী। সম্ভাব্য ক্রেতা এরূপ নমুনা পরীক্ষা করিয়া পণ্যের গুণাগুণ বিচার করিতে পারেন, উহা ক্রয়ে উৎসাহবোধ করিতে পারেন এবং এইভাবে অনেকে উহা ক্রয় করিয়া থাকেন। তবে সকল শ্রেণীর সম্ভাব্য ক্রেতাদের মধ্যে এরূপ নমুনা বিতরণ করিতে গেলে ব্যয়াধিক্যের সম্ভাবনা থাকে। কাজেই নমুনা বিতরণের জন্য সম্ভাব্য ক্রেতা বাছাই প্রয়োজন হয়। যাহা হউক, ইহা যে বিক্রয়-সম্প্রসারণের অন্যতম পন্থা তাহাতে সন্দেহ নাই।

৫। **পারিতোষিক (Premiums):** পারিতোষিক বলিতে ক্রেতা পণ্য ক্রয় করিলে তাঁহাকে কোন একটা সুবিধা দেওয়া বুঝায়। বিক্রীত পণ্যের সহিত কোনও উপহার দ্রব্য দেওয়া এই জাতীয় পারিতোষিক। অনেকক্ষেত্রে বিক্রীত পণ্যের সহিত টিকিট বা কুপন সংযুক্ত করা হয়। উক্ত টিকিট বা কুপন দেখাইলে ক্রেতাকে কম মূল্যে জিনিস দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক কুপনের বিনিময়ে কোনও একটা উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। উপহারটি যদি সুদৃশ্য, পছন্দসই, প্রয়োজনীয় প্রভৃতি গুণ-বিশিষ্ট হয় তবে ইহা বিক্রয়-সহায়ক হিসাবে বিশেষ কার্যকরী হয়।

৬। **প্রতিযোগিতা (Contest):** বিক্রয়-উদ্যোগীর মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি, যে সকল ব্যবসায়ীর মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় হয় উহাদের সহযোগিতা লাভ এবং ক্রেতাদের মধ্যে পণ্য সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিযোগিতার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। পণ্য ও উহার বিক্রয় সম্পর্কে প্রবন্ধ আহ্বান বা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান প্রভৃতির মারফত এরূপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত প্রতিযোগিতার ফলাফল অনুযায়ী নগদ বা পণ্যের আকারে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিযোগী, প্রতিযোগীর দক্ষতার ন্যায়সঙ্গত বিচার, পুরস্কার ঘোষণার নিরপেক্ষতা এবং পুরস্কারের উপযোগিতা থাকিলে ইহা বিক্রয় সম্প্রসারণে স্থায়ী ফল দিতে পারে।

৭। **ক্রয়ে উৎসাহবর্ধক পুরস্কার পরিকল্পনা (Purchase Incentive Prize Scheme):** পণ্য বিক্রয়ের সহায়ক হিসাবে ক্রয়ে উৎসাহবর্ধক পুরস্কার পরিকল্পনাও গৃহীত হইতে পারে। বর্তমানকালের বিজ্ঞাপনে অনেক কোম্পানীকে বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য এরূপ পরিকল্পনারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখা যায়। যেমন 'হামাম' সাবানের বিজ্ঞাপনে একবার দেখা গিয়াছিল যে কেহ হামাম সাবানের মোড়াই কাগজের তিনখানা কোম্পানীতে পাঠাইবেন তাঁহার নাম একখানা chevrolet মোটর গাড়ীর প্রতিযোগিতায় স্থান পাইবে। অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতার লটারিতে যাহার নাম প্রথম স্থান অধিকার করিবে তাহাকে একখানা chevrolet মোটর গাড়ী পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হইবে। সুতরাং ইহা যে বিক্রয় বৃদ্ধির একটি বিশেষ প্রচেষ্টা তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ বিক্রয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অনেকক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন করিতে দেখা যায়। কারণ এই বিজ্ঞাপনের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়—'হামাম' সাবান একাধারে দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবে এবং অন্যদিকে লটারিতে অংশ গ্রহণ করার

সুযোগ দিবে। এরূপ লটারিতে শীর্ষস্থান অধিকার করিলে সামান্য ব্যয়ে একখানা মোটর গাড়ীর মালিক হওয়া যাইবে। ফলে অনেকেই হামাম সাবান ক্রয় করিতে উৎসাহবোধ করিবেন। আধুনিক কালের বিজ্ঞাপনের ইহা একটি বিশেষ ধারা।

৮। **মেলা ও প্রদর্শনী (Fairs and Exhibitions) :** বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বা বৎসরান্তে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে, তীর্থস্থানে এবং বিশেষ স্থানে মেলা হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের প্রচেষ্টায় অনেক স্থানে প্রদর্শনীর আয়োজনও হইয়া থাকে। এই মেলা ও প্রদর্শনী স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং এমন কি আন্তর্জাতিক ভিত্তিতেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই মেলা এবং প্রদর্শনীও বিক্রয় বৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে। ইহাতে বহু লোকসমাগম হয়। পণ্যের কারবারিগণ এরূপ স্থানে তাঁহাদের বিক্রয়যোগ্য পণ্য উপস্থাপিত করিয়া উহার বৈশিষ্ট্য, উপযোগিতা ও গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন এবং ক্রেতাকে পণ্য ক্রয়ে আকৃষ্ট করিতে পারেন। এইভাবে মেলা এবং প্রদর্শনী একদিকে পণ্যের প্রচার ও বিক্রয় বৃদ্ধির সহায়ক এবং অন্যদিকে ক্রেতার বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

৯। **জনসম্পর্ক (Public Relations) :** অনুকূল জনসম্পর্ক স্থাপিত হইলে কারবারের সুনাম বৃদ্ধি পায়, পরোক্ষভাবে উহা বিক্রয়-সম্প্রসারণে সহায়তা করে এবং কারবারের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই অনুকূল জনসম্পর্ক নানাভাবে স্থাপন করা যাইতে পারে। ক্রেতাদের অসুবিধার দিকে নজর রাখা, তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের ঠিকমত উত্তর দেওয়া বা প্রতিবিধান করা, পণ্যের গুণাগুণ ও উহার পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত করান, বিভিন্ন উৎসব-আনন্দে চাঁদা প্রদান করা, জনসাধারণের সভাসমিতিতে যোগদান করা, আনন্দ-উৎসবে জনগণকে সম্ভাষণ, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, মন্দির, ধর্মশালা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় সাধ্যমত অর্থপ্রদান প্রভৃতির উপর অনুকূল জনসম্পর্ক নির্ভর করে। এইভাবে জনগণের উপর সহানুভূতিশীল ও পৃষ্ঠপোষকতার মনোভাব সৃষ্টি করিলে বিক্রয়-সম্প্রসারণে সুদূরপ্রসারী সুফল আশা করা যায়।

১০। **বিক্রয় সারগ্রন্থ এবং বিক্রয়-বিজ্ঞাপনী বহি (Sales Manual and Sales Portfolio) :** বিক্রয় সারগ্রন্থে পণ্যের নানাবিধ পরিচয় জ্ঞাপন করা হয়। ইহাতে পণ্যের আকার, আয়তন, প্রকৃতি, বর্ণ, গঠনবিন্যাস, স্থায়িত্ব, মূল্য, মান, খরিদ্দারদের প্রশংসাপত্র, বিক্রয়ে অর্জিত সাফল্য প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। বিক্রয়-বিজ্ঞাপনী বহিতে পণ্য-সংক্রান্ত বিবিধ চিত্র সন্নিবিষ্ট থাকে। সম্ভাব্য ক্রেতাদের সহিত কথাবার্তার সময় বিক্রয়-উদ্যোগিগণ তাঁহাদের নিকট এই গ্রন্থ দুইটি উপস্থাপিত করিতে পারেন। এইভাবে এই দ্রব্যাদিও বিক্রয়-কার্যে সহায়তা করিয়া থাকে।

বিক্রয়কর্মীর নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ (Appointment and Training of Sales Personnel)

কারবারী জগতে উপযুক্ত বিক্রয় কর্মচারী নির্বাচন ও নিয়োগ, সুদক্ষ কারিগর নির্বাচন ও নিয়োগ অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এজন্য সবিশেষ সতর্কতার সহিত নির্বাচন ও নিয়োগকার্য সম্পন্ন করিতে হয়। বিক্রয় কর্মচারী বাহির হইতে নিয়োগ করার প্রয়োজনই বেশী অনুভূত হয়। এজন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় এবং প্রার্থীকে নির্দিষ্ট প্রপত্রে (Form) আবেদন করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। উক্ত প্রপত্রও বিশেষ যত্নসহকারে প্রস্তুত করা হয়, কারণ উহা হইতে প্রার্থীর বিভিন্ন গুণাবলীর যাহাতে পরিচয় পাওয়া যায় এরূপ তথ্যের ভিত্তিতে উহা রচিত হয়। উক্ত প্রপত্রে যে সকল আবেদনপত্র পাওয়া যায় যে সকল আবেদন-কারীদের মধ্য হইতে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনের জন্য প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের (Preliminary Interview) ব্যবস্থা হয়। সাক্ষাৎকারের সময় প্রথমে মৌখিক আলাপন এবং পরে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থান অনেকক্ষেত্রে গৃহীত হইয়া থাকে। অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে একাধিক বার, একাধিক ব্যক্তির দ্বারা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয় এবং উহাদের পৃথক পৃথক মনোনয়ন একত্রিত করিয়া তুলনামূলক বিচারদ্বারা যোগ্যতম ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। অনেকক্ষেত্রে এরূপ প্রাথমিক নির্বাচনের পর মনোবিজ্ঞানগত পরীক্ষা (Psychological Test) দ্বারা চূড়ান্ত নির্বাচন স্থির করা হয় এবং নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। যে পদ্ধতিই গৃহীত হউক না কেন, উহাতে সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এইভাবে বিক্রয় কর্মীদের নির্বাচন ও নিয়োগ হওয়ার পর সকল কর্মীই যে সমগুণ-সম্পন্ন হইবেন বা প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অধিকারী হইবেন একথা কখনই বলা চলে না। আবার পাঠ্যপুস্তকে বিক্রয় কর্মচারীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর যে উল্লেখ থাকে উহাদের সার্থকতা থাকিলেও কোনও বিক্রয় কর্মচারীর পক্ষে এরূপ সর্বগুণসম্পন্ন হওয়া কখনই সম্ভব হয় না। তাহা হইলেও বিক্রয় কর্মচারীদের বিশেষ কয়েকটি গুণ থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। উহাদের মধ্যে কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনার দক্ষতা (Communicative Ability), ভাবপ্রবণতার সুস্থিরতা (Emotional Stability), সাহস ও নির্ভীকতা (Courage and Fearlessness), দৃঢ় সঙ্কল্পতা (Firm Determination), আত্মবিশ্বাস (Self-confidence), দূরদৃষ্টি ও কল্পনাশক্তি (Foresight and Imagination), অভ্রান্ত বিচারশক্তি (Sound Judgment) এবং সর্বোপরি বিক্রয়ের কলাকৌশল (Technical Knowledge of Selling) উল্লেখযোগ্য। বাহিরের নির্বাচন কখনই এ সকল ব্যাপারে সুফল দিতে পারে না। এজন্য প্রত্যেক আধুনিক কারবারে বিক্রয় কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের (Training) ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ ব্যবস্থা অনেক কারবারেই আছে। তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রয়-বিদ্যা সম্বন্ধে সর্বাধুনিক

বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষালাভ ভিন্ন কোন বিক্রয় কর্মচারীই কর্মে সাফল্য আশা করিতে পারেন না।

প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থা অবশ্য সকল বিক্রয় কর্মচারীর পক্ষে একরূপ হওয়া সম্ভব নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নহে। পণ্যের ও বাজারের প্রকৃতি, সম্ভাব্য ক্রেতার আয়, উহার জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান হইলে উহার প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত বিক্রয় কর্মচারীদিগকে পণ্য উৎপাদনের যাবতীয় প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও পর্যায়গুলি দেখানো। এই উপায়ে কর্মচারীদিগকে পণ্যের উৎপাদন সম্পর্কে সঠিক ও সামগ্রিক ধারণা সৃষ্টি করা যাহাতে কোনও ক্রেতার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসা পূরণ করা সম্ভব হয়। বাণিজ্যিক কাজকারবারে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অবশ্য এরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে না এবং উহার ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় না।

তবে কারবার যে প্রকারেরই হউক উহার প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থা সাধারণত নিম্নরূপ হইতে পারে এবং অনেকক্ষেত্রে উহা ঐরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়:

(ক) কারবারের নিজস্ব তত্ত্বগত প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থা (Theoretical Training Arrangement of the Business itself): বড় বড় কারবারী প্রতিষ্ঠানে এরূপ প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বিক্রয়বিভাগের সহিত একটি বাজার-সংক্রান্ত গবেষণা (Market Research) শাখাও থাকে। এই শাখা বিক্রয় কর্মচারীদিগকে বাজার সম্বন্ধে তত্ত্বগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করিয়া থাকে। সাধারণত বিক্রয়-ব্যবস্থাপকের (Sales Manager) তত্ত্বাবধানে এরূপ প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় এবং তিনি নিজেও শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(খ) বিক্রয় কর্মচারী প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থা (Salesman Training Course): অনেক বাণিজ্যিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা ইহাদিগকে এ বিষয়ে যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। বিভিন্ন কারবারী প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কর্মচারিগণকে ইহাতে শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হয়। এরূপ অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বক্তৃতার মাধ্যম ছাড়া ডাক মারফত শিক্ষার (Correspondence Course) ব্যবস্থাও করিয়া থাকে।

(গ) কারবারী প্রতিষ্ঠানের সান্ধ্যবিভাগ (Evening Course of Business Enterprise): বিক্রয় কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য সান্ধ্যবিভাগ হিসাবে অনেক প্রতিষ্ঠান আংশিক শিক্ষার (Part-time Course) ব্যবস্থা করিয়া থাকে। অনেক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানও এরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

(ঘ) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ (Practical Training): উপরি-উক্ত যে সকল প্রশিক্ষণের উল্লেখ করা হইল উহারা সবই তত্ত্বগত প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থা। শুধু তত্ত্বগত প্রশিক্ষণের দ্বারা উপযুক্ত বিক্রয় কর্মচারী সৃষ্টি হয় না—ইহা কারবারিগণ

স্বীকার করিয়া থাকেন। এজন্ত অভিজ্ঞ সুদক্ষ বিক্রয় কর্মচারীদের সঙ্গে শিক্ষানবীশ হিসাবে নূতন বিক্রয় কর্মচারীদিগকে বাজারে বাজারে ঘুরাইয়া এবং এইভাবে ক্রেতাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করাইয়া উহাদিগকে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভেরও ব্যবস্থা করা হয়।

(ঙ) **বিক্রয় কর্মচারীদের সভা (Meetings of Salesmen):** মাঝে মাঝে বিক্রয় কর্মচারীদিগকে মিলিত হইয়া পণ্যের বাজার, বিক্রয়-পদ্ধতি, ক্রেতাদের প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার দ্বারা পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সমষ্টিগতভাবে বিক্রয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা হয়। ইহাও প্রশিক্ষণের একটি কার্যকরী ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে।

পণ্য বিক্রয়ের কার্যক্রম পরিকল্পনা (Planning Programme for Marketing the products)

কারবার পরিচালনায় শুধু পণ্য উৎপাদনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিলে চলে না। উক্ত পণ্য বিক্রয়ের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে কারবারের প্রধানতম উদ্দেশ্য সাধন, অর্থাৎ মুনাফা অর্জন কখনই সম্ভব হয় না। এজন্য বিক্রয় কার্যক্রম প্রস্তুত করা অবশ্যই প্রয়োজন। এই বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্দেশ্য থাকে বিক্রয় সম্প্রসারণের যথাসম্ভব সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সম্ভাব্য ক্রেতাকে প্রকৃত ক্রেতায় পরিণত করা। এজন্য প্রস্তুতকারক নিজেই হউক বা তাঁহার বিক্রয়-ব্যবস্থাপকের (Sales Manager) মাধ্যমেই হউক বিক্রয়বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখানো ভিন্ন উহা সম্ভব নহে। সুতরাং চকোলেট বিক্রয়ের জন্যই হউক আর সিগারেট বিক্রয়ের জন্যই হউক প্রস্তুতকারককে (Producer or Manufacturer) বিক্রয়ের কার্যকরী বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করিয়া বিক্রয় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে হইবে। এজন্য যে সকল ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া উচিত নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল :

১। প্রথমত পণ্যকে বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী অবস্থায় আনিতে হইবে। এজন্য পণ্যের মান, গ্রেড (Grade) ও শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন হইলে উহার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহার মোড়াই বা প্যাকিং এবং বিক্রয়ের জন্য গুদামজাতকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। প্যাকিং ভাল হইলে উহা অনেকক্ষেত্রে আকর্ষণের বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়।

২। দ্বিতীয় কাজ হইবে বাজার-সংক্রান্ত গবেষণা। ইহার সাহায্যে বিক্রয় সম্প্রসারণের নানাবিধ তথ্য অবগত হওয়া যাইবে। কোন্ কোন্ অঞ্চলে পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হইবে, কি প্রকার খরিদ্দারদের নিকট পণ্য উপস্থাপিত করিতে হইবে, খরিদ্দারদের ক্রয়ের অভ্যাস ও ক্রয়ক্ষমতা কিরূপ, বিক্রয় ব্যাপারে বিজ্ঞাপন কিংবা বিক্রয়-উদ্যোগীদের সাহায্য বা অন্য উপায়ের মধ্যে কোন্‌টি বেশী কার্যকরী হইবে, চাহিদার প্রকৃতি ও পরিমাণ কিরূপ, পণ্যের মূল্যই বা কিরূপ হইবে, নূতন খরিদ্দার ও নূতন বাজারের কিরূপ সম্ভাবনা আছে প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য বিক্রয়-গবেষণায়

দ্বারা অবগত হওয়া যাইবে। ইহার সাহায্যে বিক্রয় কার্যক্রম (Sales Programme) প্রস্তুত করা সহজসাধ্য হইবে।

৩। উক্ত বাজার-গবেষণার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন হইবে :

(ক) পণ্যের ডিজাইন, মান ও মূল্য নির্ধারণ।

(খ) চাহিদা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞাপন ও প্রচার, বিক্রয়-উদ্যোগী, প্রদর্শনী, বাতায়ন সজ্জা নমুনা বিতরণ, পণ্য সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারের জন্য পুস্তিকা ও মূল্য তালিকা প্রকাশ প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) বিভিন্ন স্থানে পণ্য প্রেরণের ব্যবস্থাগ্রহণ। ইহার উদ্দেশ্য হইবে ক্রেতা যাহাতে তাঁহার বাসস্থানের নিকট হইতেই জিনিস পাইতে পারেন উহার দিকে দৃষ্টি রাখা। এজন্য বিভিন্ন স্থানে মাল গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা থাকিলে পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়িগণ ঐ সকল স্থান হইতে মাল গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের দোকানের মাধ্যমে ক্রেতাকে মালের যোগান দিতে পারেন।

(ঘ) বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ (Sales Control) ব্যবস্থা গ্রহণ। ইহার উদ্দেশ্য থাকিবে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিক্রয়ের পরিমাণ স্থির করা এবং উক্ত পরিমাণ অনুযায়ী বিক্রয়-কার্য অগ্রসর হইতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করা যাঁহাদের মাধ্যমে এই বিক্রয়কার্য সমাধা হইবে তাঁহাদের নিকট হইতে বিভিন্ন সময় বিক্রয়ের বিবরণ সংগ্রহ করা, তাঁহাদের নিকট বিক্রয় সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করা, সুপারিশ আহ্বান করা এবং তাঁহাদিগকে ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত করার ব্যবস্থাও এই বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত হইবে।

(ঙ) জনসম্পর্ক (Public Relations) স্থাপন করা। ইহার উদ্দেশ্য হইবে খরিদ্দারদের সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা, তাহাদের অভাব-অভিযোগের সদুত্তর দেওয়া এবং প্রতিবিধান করা, পণ্যের গুণাগুণ, উহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্পর্কে জ্ঞাত করানো, বিভিন্ন উৎসব-আনন্দে চাঁদা দেওয়া, জনসাধারণের সভাসমিতিতে যোগদান করা, আনন্দ উৎসবে জনগণকে সম্ভাষণ, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, মন্দির, ধর্মশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সাহায্য করা। পণ্যের বিক্রয় সম্প্রসারণে ইহার ফল সুদূরপ্রসারী

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. What do you understand by Publicity ? How far does it differ from Advertisement ? [C. U. B. Com. 1951]

প্রচার বলিতে কি বুঝ ? বিজ্ঞাপনের সহিত উহার পার্থক্য কি ?

2. Discuss the objects and importance of Advertisement.

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

3. Is there any utility in Advertising ? Explain very clearly.
[C. U. B. Com. 1957]

বিজ্ঞাপনের কি কোন উপযোগিতা আছে ? বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

4. It pays to advertise. Do you agree ? Justify your views by specific reasons. [C. U. B. Com. 1958]

বিজ্ঞাপন লাভজনক। তুমি কি উহা সমর্থন কর ? দৃষ্টান্তসহ তোমার উত্তরের যৌক্তিকতা দেখাও।

5. Advertisement is a wasteful expenditure. Do you agree with this statement ? Give reasons for your answer.
[C. U. B. Com. (Pass) 1965]

বিজ্ঞাপন অপব্যয়। তুমি কি এই উক্তি সমর্থন কর ? যুক্তিসহ উত্তর লিখ।

6. In sellers' market Advertisement is a wasteful expenditure. Discuss fully. [C. U. B. Com (Hons.) 1968]

বিক্রেতার বাজারে বিজ্ঞাপন অপব্যয়। বিশদভাবে আলোচনা কর।

7. Give an account of the different kinds of media of Advertisement.

বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপন মাধ্যমের বিবরণ দাও।

8. Discuss the factors to be taken into consideration for the selection of media for Advertisement.

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনের জন্য বিবেচনার বিষয়গুলি আলোচনা কর।

9. Discuss the principal means or media which may be adopted by a merchant for his new big retail cloth stores in a district town and by a manufacturer of a new brand of soap powder in West Bengal.

কোনও জেলা শহরের একজন নূতন বড় খুচরা বস্ত্র ব্যবসায়ী এবং পশ্চিমবঙ্গের একজন নূতন ধরনের সাবান গুঁড়া প্রস্তুতকারক যে উপায়ে বা যে যে মাধ্যমের সাহায্যে উহাদের বিজ্ঞাপন দিতে পারেন তাহার আলোচনা কর।

10. What is Scientific Advertisement ? Discuss the methods adopted for this purpose.

বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন কাহাকে বলে ? এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে পদ্ধতি গৃহীত হয় উহার আলোচনা কর।

11. What are the important points which the copy of an Advertisement should contain in order to be effective ?
[B. U. B. Com. 1963]

বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপিকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে উহাতে কি কি প্রয়োজনীয় বিষয় থাকা উচিত ?

12. Give a brief account of themes of Advertisement.

বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গের একটা বিবরণ দাও।

13. What is Advertising Policy ? How is it made effective ?

বিজ্ঞাপনের নীতি কাহাকে বলে ? ইহা কিভাবে কার্যকরী করা হয় ?

14. State the factors to be taken into consideration in preparing the layout of an Advertisement.

বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জা ব্যাপারে যে যে বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে উহার উল্লেখ কর।

15. Prepare a draft of an Advertisement for selling a competitive brand of baby food.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1964]

প্রতিযোগিতামূলক কোনও এক শ্রেণীর শিশু খাদ্যের একখানা বিজ্ঞাপন প্রস্তুত কর।

16. Draft an Advertisement Copy for a Bank to popularise Savings Bank Account. [C. U. B. Com. (Pass) 1967]

একটি ব্যাঙ্কের সঞ্চয়ী আমানত হিসাবের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য একখানা বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি রচনা কর।

17. What is Advertising Campaign ? How would you proceed with your Advertising Campaign for a product ?

বিজ্ঞাপন অভিযান কাহাকে বলে ? কোন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অভিযানে কিভাবে অগ্রসর হইবে ?

18. As a manufacturer of cigarettes of different brands, you want to enter into a market already well-served and controlled by an established company. How would you plan your Advertisement Campaign ? [C. U. B. Com. (Hons.) 1963]

বিভিন্ন শ্রেণীর সিগারেট প্রস্তুতকারক হিসাবে তুমি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানী কর্তৃক ভালভাবে সরবরাহকৃত ও নিয়ন্ত্রিত বাজারে প্রবেশ করিতে চাও। তুমি তোমার বিজ্ঞাপন অভিযান পরিকল্পনা কিভাবে প্রস্তুত করিবে ?

19. For the purpose of introducing a new washing soap in the market, what points would you stress in formulating an Advertisement Campaign ? [C. U. B. Com. (Pass) 1964]

বাজারে জামাকাপড় পরিষ্কার করার একপ্রকার নূতন সাবান প্রচলন করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন অভিযান প্রস্তুত করার সময় কি কি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিবে ?

20. You want to popularise a small savings scheme of the Government of India in your area. How would you organise your Publicity Campaign ? [C. U. B. Com. (Pass) 1968]

তোমার এলাকায় ভারত সরকারের একটি ক্ষুদ্র সঞ্চয় পরিকল্পনা জনপ্রিয় করিতে চাও। তোমার বিজ্ঞাপন অভিযান কিভাবে সংগঠন করিবে ?

21. What is Advertising Agency ? Discuss the part it plays in Advertising.

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিত্ব কাহাকে বলে ? বিজ্ঞাপনে ইহার ভূমিকা আলোচনা কর।

22. Selling is both an art and a science. What qualifications should a salesman possess to become successful ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

বিক্রয় একটি কলা ও বিজ্ঞান। বিক্রয়-উদ্যোগীর কৃতকার্যতার জন্য তাঁহার কি কি গুণ থাকা উচিত ?

23. It is said that a salesman needs to be a psychologist first and salesman afterwards. Do you agree with this view ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1966]

ইহা বলা হয় যে, একজন বিক্রয়-উদ্যোগীকে প্রথমে মনস্তত্ত্ববিদ্ এবং পরে বিক্রয়-উদ্যোগী হইতে হইবে। তুমি কি এই মত সমর্থন কর ?

24. What, in your opinion, are the essential qualities of an effective and successful salesman ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1968]

তোমার মতে ফলপ্রসূ ও সফলকাম বিক্রয়-উদ্যোগীর অত্যাবশ্যক গুণাবলী কি কি ?

25. Discuss the place of selling in business and explain the selling process as an economic, psychological and business process.

কারবারে বিক্রয়ের স্থান এবং ইহা যে অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং কারবারী প্রক্রিয়া উহা আলোচনা কর।

26. A new manufacturer of chocolates wants to introduce his products in a competitive market. How should he organise his sales campaign ? [C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

একজন নূতন চকোলেট প্রস্তুতকারক তাঁহার পণ্য প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক। তাঁহার বিক্রয় অভিযান কিভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত ?

27. You have been appointed marketing manager of a newly formed cigarette manufacturing company. How would you plan your programme for marketing the products keeping in view the remotest corners of India ? [C. U. B. Com. (Pass) 1967]

তুমি একটি নূতন সিগারেট প্রস্তুতকারক কোম্পানীর বিক্রয়-ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হইয়াছ। ভারতের দূরতম অঞ্চলকে দৃষ্টিপথে রাখিয়া উক্ত পণ্য বিক্রয়ের জন্য কার্যক্রম পরিকল্পনা কিভাবে প্রস্তুত করিবে ?

28. Explain the importance of advertising in modern business, and discuss the purchase incentive scheme as a method of boosting up sales. [C. U. B. Com. (Hons.) 1971]

আধুনিক কারবারে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর এবং ক্রয়ের উৎসাহ-মূলক ব্যবস্থা বিক্রয় বৃদ্ধির উপায় উহা আলোচনা কর।

29. "Today advertising agencies have become well-established. Elucidate this statement with special reference to the services and functions of a modern advertising agency.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1972]

বর্তমানে বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিত্বের সেবা ও কাজ উল্লেখ করিয়া এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

30. Discuss the fundamentals of salesmanship and techniques of sales promotion in a competitive market.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1973]

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রয়কলার মূলনীতি এবং বিক্রয় বৃদ্ধির কলাকৌশল আলোচনা কর।

—

বিংশ অধ্যায়

বাজার (Markets)

বিভিন্ন প্রকার বাজার (Different Classes of Markets)

যে স্থানে বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলিত হইয়া নানাপ্রকার জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত থাকে তাহাকে সাধারণ অর্থে বাজার (Market) বলে। কিন্তু অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এই কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজন্য বাজারের রূপ বিভিন্ন। নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকার বাজারের বিবরণ হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে :

(১) স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার (Local, National and International Markets) : ক্রয়-বিক্রয় কোনও স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকিলে উহাকে বলা হয় 'স্থানীয় বাজার' (Local Market)। যেমন, কলিকাতার বাজার। ক্রয়-বিক্রয় কোনও দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে তাহাকে বলা হয় 'জাতীয় বাজার' (National Market)। যেমন, ভারতের বাজার। ক্রয়-বিক্রয় কোনও দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে তাহাকে বলা হয় 'আন্তর্জাতিক বাজার' (International Market)। যেমন, পৃথিবীর বাজার। জিনিসের গুণাগুণের উপর বাজারের বিস্তার ও পরিধি নির্ভর করে। দুধ, তরিতরকারী, ইট প্রভৃতির বাজার স্থানীয়, কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যের ও কাঁচামালের বাজার 'জাতীয়' হইলেও সোনা-রূপার বাজার 'আন্তর্জাতিক' না হইয়া যায় না। বিভিন্ন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ই এরূপ বাজারের মুখ্য কাজ।

(২) সদ্য, ফটকা, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও যুগব্যাপী বাজার (Ready and Futures Markets, Short, Long and Secular Periods of Markets) : ক্রয়ের সঙ্গে মাল প্রত্যর্পণ হইলে তাহাকে বলা হয় 'সদ্য বাজার' (Ready Market)। বর্তমানে ক্রয়-বিক্রয় কিন্তু ভবিষ্যতে মাল প্রত্যর্পণ হইলে উহাকে বলে 'ফটকা বাজার' (Futures Market) এবং অর্থনীতির সূত্র অনুযায়ী মালের মূল্য স্থির করিতে 'হ্রস্ব, দীর্ঘ ও যুগব্যাপী বাজার' (Short, Long and Secular Periods of Market) শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের ধারা ও প্রকৃতি নির্ণয় করাই এরূপ বাজারের কাজ।

(৩) পাইকারী ও খুচরা বাজার (Wholesale and Retail Markets) : অনেক পরিমাণ মাল একসঙ্গে কোন ক্রেতাকে বিক্রয় করার বাজারকে বলা হয় 'পাইকারী বাজার' (Wholesale Market)। অল্প পরিমাণ

মাল সম্ভোগকারীদের নিকট বিক্রয় করার বাজারকে বলা হয় 'খুচরা বাজার' (Retail Market)। উৎপাদক ও সম্ভোগকারীর মধ্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সংযোগ সাধন করাই এরূপ বাজারের বিশেষ কাজ।

(৪) **পণ্যের ও শেয়ার বাজার (Commodity and Share Markets) :** উৎপন্ন দ্রব্য ও কাঁচামাল লইয়া যে স্থানে কারবার চলে তাহাকে বলা হয় 'পণ্যের বাজার' (Commodity Market) এবং কোম্পানীর শেয়ার, সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতি লইয়া যে স্থানে কারবার চলে তাহাকে বলা হয় 'শেয়ার বাজার' (Share Market or Stock Exchange)। উক্ত পণ্যাদির ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করাই এরূপ বাজারের কাজ।

(৫) **মূলধন, টাকার ও বৈদেশিক মুদ্রার বাজার (Capital, Money and Foreign Exchange Markets) :** যে যে উৎস হইতে মূলধন পাওয়া যাইতে পারে তাহাকে বলা হয় 'মূলধন বাজার' (Capital Market)। যে যে প্রতিষ্ঠানগুলি আমানত গ্রহণ করিয়া ও টাকা-পয়সা ধার দিয়া থাকে তাহাদের লইয়া গঠিত হয় 'টাকার বাজার' (Money Market) এবং যেখানে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহাকে বলা হয় 'বৈদেশিক মুদ্রার বাজার' (Foreign Exchange Market)। শিল্প-বাণিজ্যের অর্থের অভাব দূর করাই এরূপ বাজারের কাজ।

(৬) **প্রতিযোগিতামূলক ও একচেটিয়া বাজার (Competitive and Monopoly Markets) :** যেখানে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা বর্তমান থাকে তাহাকে 'প্রতিযোগিতামূলক বাজার' (Competitive Market) বলে। আবার যেখানে একজন বিক্রেতা বা উৎপাদকের হাতে কোন দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ থাকে তাহাকে 'একচেটিয়া বাজার' (Monopoly Market) বলে। ক্রয়-বিক্রয়ের গতি নির্ণয় করাই এরূপ বাজারের কাজ।

(৭) **সুসংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত বাজার (Organised and Regulated Markets) :** যে বাজার কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয় তাহাকে 'সুসংগঠিত বাজার' (Organised Market) বলে। যে বাজারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকে তাহাকে 'নিয়ন্ত্রিত বাজার' (Regulated Market) বলে। একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করাই এরূপ বাজারের কাজ।

(৮) **সংগঠনহীন ও অনিয়ন্ত্রিত বাজার (Unorganised and Unregulated Markets) :** যে বাজার কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনের অধীন নয় এবং সরকার কর্তৃকও নিয়ন্ত্রিত নহে উহাকে সংগঠনহীন ও অনিয়ন্ত্রিত বাজার বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়।

পণ্যের বাজার, মূলধনের বাজার ও টাকার বাজারের কাজ (Functions of Commodity Markets, Capital Markets and Money Markets)

পণ্যের বাজার, মূলধনের বাজার ও টাকার বাজারের প্রত্যেকের কাজ নিম্নলিখিত-ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

পণ্যের বাজারের কাজ (Functions of the Commodity Market or Exchange) : যে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত বাজারে কাঁচামাল, শিল্পজাত দ্রব্য, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি পাইকারী হারে বা নিলামে ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহাকে পণ্যের বাজার বলে। যখন এরূপ বাজারে শুধু কৃষিজাত কাঁচামালের ক্রয়-বিক্রয় কার্য সম্পন্ন হয় তখন ইহাকে কাঁচামালের বাজার (Produce Exchange) বলা হয়। A Commodity Exchange is a large genus of which Produce Exchange is a species. এরূপ বাজারে মাল উপস্থিত করার প্রয়োজন হয় না। শুধু নমুনা বা বর্ণনার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহা ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে মাল প্রত্যর্পণ ছাড়াও ভবিষ্যতে পণ্য প্রত্যর্পণ হইবে এরূপ ভিত্তিতেও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি এরূপ বাজারে সম্পাদিত হয়। এরূপ বাজারের কাজ সংক্ষেপে নিম্নলিখিত-ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(ক) নমুনা (Sample), বর্ণনা (Description), স্তরবিভাগ (Grading) প্রভৃতির ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা ইহার প্রধানতম কাজ। এইভাবে ইহা অযথা পণ্যের টানাটানি রোধ করে এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা দিয়া ক্রেতা যাহাতে বিক্রেতার নিকট হইতে তাঁহার প্রয়োজনীয় পণ্য ঠিকমত সময়ে পাইতে পারেন তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে।

(খ) এরূপ বাজার চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া থাকে। এইভাবে ইহা পণ্য উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি দূর করে এবং শিল্পে নির্ধারিত মানের পণ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করিয়া থাকে।

(গ) ইহার কাজ পণ্যের মূল্যের অস্বাভাবিক দর ওঠা-নামা ও পরিবর্তনশীলতা হ্রাস করা, ন্যায্য মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া এবং ক্রমাগত ক্রয়-বিক্রয় কার্যাদি ও পাইকারী হারে পণ্যাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত করা এবং শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি অব্যাহত রাখা।

(ঘ) ইহা রক্ষণ (Hedging)-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া ভবিষ্যতে দর উঠা-নামাজনিত লাভ-লোকসানের হাত হইতে ক্রেতা-বিক্রেতাকে রক্ষা করিয়া থাকে। রক্ষণ-ব্যবস্থার দ্বারা যে জিনিস বর্তমানে নগদ লেন-দেনের ভিত্তিতে ক্রয় করা হয় উহাই আবার ভবিষ্যৎ লেন-দেনের ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয়। ফলে নগদ ক্রয়ের লাভ-লোকসান ভবিষ্যৎ বিক্রয়ের লাভ-লোকসানের দ্বারা পূরণ হয়।

(ঙ) ইহা পণ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ পরিবেশন করে, পণ্যের গুণাগুণ অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ ও নমুনা স্থির করে এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে মীমাংসা করিয়া থাকে এবং বাজারের নিয়ম ভঙ্গ করিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করে।

উপরি-উক্ত কার্যের দ্বারা পণ্যের বাজার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়া থাকে।

মূলধনের বাজারের কাজ (Functions of the Capital Market) : যে যে উৎস হইতে কারবারের প্রয়োজনীয় মূলধন পাওয়া যাইতে পারে উহাকে বলা হয় মূলধনের বাজার (Capital Market)। শেয়ার বাজার, ইস্যু হাউস (Issue Houses), লগ্নিকারক সংস্থা (Investment Trusts), আর্থিক সংস্থা (Finance Companies) এবং এই জাতীয় সংস্থাগুলি এই বাজারের অন্তর্গত। এই বাজারের কাজ নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(ক) বিভিন্ন প্রকারের মূলধন সরবরাহ করা ইহার প্রধান কাজ। এই মূলধন কারবারের স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে কিংবা চল্‌তি মূলধন হিসাবে নিয়োজিত হইতে পারে। সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই বাজার মূলধনের যোগান দিয়া থাকে। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়াই এই বাজারের অন্যতম প্রধান কাজ।

কারবার প্রবর্তনে স্থায়ী মূলধনের, চল্‌তি মূলধনের এবং কারবার সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার অর্থের যোগানই এই বাজার দিয়া থাকে। তবে মূলধন বাজারের প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন বিভিন্ন। এজন্য উহাদের কার্যের ধারা ও মূলধন যোগানের পদ্ধতিও বিভিন্ন। যেমন, শেয়ার বাজার। ইহা শেয়ার, ডিবেঞ্চার ও সরকারী ঋণ-পত্র ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান। ইহা প্রত্যক্ষভাবে কোন মূলধন যোগান দেয় না, তবে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিয়া শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগের সুবিধা ঘটায়। ইহা ছাড়া, ইহা শেয়ারের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের কাজও করিয়া থাকে এবং লোকের মধ্যে সঞ্চয়ের স্পৃহা বৃদ্ধি করে।

(খ) ইহার লগ্নীকারক ট্রাস্ট (Investment Trust)। জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করে এবং উক্ত অর্থ বিশেষভাবে নির্বাচিত শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করিয়া লগ্নিকৃত মূলধনের উপর যথাসম্ভব বেশী লভ্যাংশ পাওয়ার ব্যবস্থা করে।

(গ) ইহার বিভিন্ন লগ্নিকারক সংস্থা (Investment Corporation) শিল্প-বাণিজ্যে দীর্ঘ মিয়াদী ঋণ প্রদান করে, শেয়ার বিক্রয়ের দায়গ্রহণ করে, আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণে অর্থ সাহায্য করে এবং বিভিন্ন কারবারী প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজন হইলে ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ও করণকৌশল-সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়া থাকে।

সুতরাং মূলধনের বাজারের বিভিন্ন সদস্যগণ নানাভাবে শিল্প-বাণিজ্যকে অর্থসাহায্য দিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করে।

টাকার বাজারের কাজ (Functions of the Money Market): যে যে প্রতিষ্ঠানগুলি আমানত গ্রহণ এবং ঋণ-দানের কাজ-কারবারে লিপ্ত থাকে উহাদিগকে সমষ্টিগতভাবে টাকার বাজার (Money Market) বলে। টাকার বাজার ও মূলধনের বাজারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে সাধারণ-ভাবে যে সংস্থাগুলি দীর্ঘমিয়াদী ঋণ দিয়া থাকে এবং শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ক্রয় দ্বারা মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে উহাকে মূলধনের বাজার বলে। অন্যপক্ষে স্বল্পমিয়াদী ঋণ দিয়া মূলধনের অভাব পূরণের কাজে যে সকল প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত থাকে উহাকে টাকার বাজার আখ্যা দেওয়া হয়। টাকার বাজারের কাজ নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(ক) ইহা আমানত গ্রহণ করে ও ঋণ দেয়।

(খ) আমানতের উপর সুদ দেওয়াও ইহার কাজ।

(গ) ইহা আমানত বা জমার অতিরিক্ত ঋণ, বোক ঋণ প্রভৃতি নানা প্রকারের ঋণ দিয়া থাকে। তজ্জন্য ইহা জামিনও গ্রহণ করিয়া থাকে।

(ঘ) আমানতকারীদের পক্ষ হইয়া শেয়ার, ডিবেঞ্চার, বৈদেশিক মুদ্রা প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করে।

(ঙ) ইহা বিল ভাঙ্গায়, আমানতকারীদের চেকের টাকা আদায় করে এবং অন্যান্য অনেক কাজ করিয়া থাকে।

(চ) ইহা মূল্যবান দলিলপত্রাদি, অলঙ্কার ও মূল্যবান দ্রব্যাদি গচ্ছিত রাখে।

(ছ) ইহা আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থের অভাব পূরণ করিয়া থাকে।

এই বাজারের অধ্যক্ষ হইতেছে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ইহা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় রাখার উদ্দেশ্যে উহার উপর প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

পণ্যের বাজার (Commodity Market)

কাঁচামাল অথবা পণ্যের বাজারের প্রকৃতি (Nature of a Produce or Commodity Exchange)

যে অবস্থায় বা যে স্থানে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রেতা বা বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ সৃষ্টি হয় উহাই ব্যাপক অর্থে পণ্যের বাজার। এরূপ বাজারে কাঁচামাল, খনিজ পদার্থ ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় সংসাধিত হয়। যখন কেবল কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয় তখন উহাকে কাঁচামালের বাজার (Produce Exchange) বলে। কাঁচামালের বাজারই হউক আর পণ্যের বাজারই হউক উহা সুসংগঠিত (Organised) কিংবা সংগঠনবিহীন (Unorganised) হইতে পারে।

এখানে সুসংগঠিত বাজারের বৈশিষ্ট্য, কারবারের প্রকৃতি বা কার্যপ্রণালীর আলোচনা করা হইল। এই কাজ-কারবারের ধারা পণ্যের বাজার হউক বা কাঁচামালের বাজার হউক—উভয়ক্ষেত্রে একই প্রকার। নিম্নে উহা আলোচিত হইল।

(১) ইহা সাধারণত যৌথ কারবারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং 'বোর্ড অব ডিরেক্টরস্' দ্বারা পরিচালিত।

(২) ইহার সভ্য দালাল (Brokers), প্রত্যক্ষ কারবারী (Jobbers), আমদানীকারক (Importers), রপ্তানীকারক (Exporters), পাইকার (Wholesale-dealers) ও খুচরা বিক্রেতা (Retailers) সকলেই হইতে পারেন।

(৩) ইহাতে পৃথক পৃথক পণ্যের জন্য পৃথক পৃথক বাজারের সৃষ্টি হইতে পারে। যেমন, The East India Jute Association, The East India Cotton Association ইত্যাদি তখন ইহাকে বলা হয় বিশেষ বাজার (Special Merket)। কিন্তু একাধিক পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হইলে উহাকে বলা হয় সাধারণ বাজার (General Market)।

(৪) এই সমস্ত 'বাজার সমিতি'র কতকগুলি নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়া চলিতে হয়। এ সমস্ত সমিতির উদ্দেশ্য হইতেছে নিম্নরূপ :

(ক) সভ্যদের জন্য কোনও নির্দিষ্ট স্থান স্থির করা যেখানে মিলিত হইয়া ইহারা ক্রয়-বিক্রয় কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন এবং পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন।

(খ) যে পণ্য ব্যবসায়ে ইহারা লিপ্ত সে সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ এবং সরবরাহ করা।

(গ) কাজ-কারবারের সুবিধার জন্য এবং উহা সহজসাধ্য করার জন্য সমিতির আইনমত সভ্যগণ কাজ-কারবার করিতেছে কিনা তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং কোন ব্যতিক্রম দেখা দিলে তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঘ) পণ্যের গুণাগুণ অনুযায়ী উহার শ্রেণী বিভাগ ও নমুনা স্থির করা।

(ঙ) কাজ-কারবার সম্বন্ধে বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করা।

(চ) পণ্যের বাজারে দর স্থির করিতে সাহায্য করা।

(৫) এরূপ বাজারে দুই প্রকার লেন-দেন সংঘটিত হইতে পারে।

(ক) **নগদ লেন-দেন** (**Cash or Spot Transaction**): এরূপ লেন-দেনে মাল প্রত্যর্পণ ও মূল্য পরিশোধ অবিলম্বে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং কোন-ক্রমেই ৭।৮ দিনের বেশী সময় লওয়া হয় না। অন্য কথায় ইহা সদ্য প্রত্যর্পণ চুক্তি (Spot Delivery Contract)। নগদ লেন-দেন একটি সম্পূর্ণ চুক্তি (Contract) বলিয়া গণ্য হয় এবং ভবিষ্যৎ বা ফটকা লেন-দেনের (Futures Transaction) মত পণ্যের দাম বাড়িলে মূল্যের পার্থক্য প্রদান করিয়া ইহা বাতিল করা চলে না। এরূপ লেন-দেন সুসংগঠিত বাজারে কিংবা সংগঠনবিহীন বাজারে সম্পন্ন হইতে পারে।

(খ) ভবিষ্যৎ বা ফটকা লেন-দেন (Futures Transaction) : ইহাতে বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট দরে ভবিষ্যতে মালসরবরাহের ব্যবস্থা হয়। অন্য কথায় ইহা ভবিষ্যৎ দেয় চুক্তি (Forward Delivery Contract)। ভবিষ্যতে দর উঠা-নামার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এরূপ কাজ-কারবার হইয়া থাকে। এরূপ কাজ-কারবার 'পণ্যের বাজারের' একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইহার ফলে ক্রেতা যেমন ভবিষ্যতে মাল পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকেন, বিক্রেতা আবার হাতে মাল না থাকিলে ইতিমধ্যে উহা সংগ্রহ বা উৎপাদনের সুযোগ পান। সততার সহিত ফটকা লেন-দেনের কাজ চলিলে ইহাতে মালের দর অত্যধিক উঠা-নামা বন্ধ হয়। ফলে পণ্যের মূল্যস্তরে একটা স্থিতিশীলতা আসিয়া যায়।

(৬) অনেক সময় ফটকা লেন-দেনে ভবিষ্যতে আকস্মিক কারণে বা উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটিলে ক্রেতা বা বিক্রেতার লোকসান হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এরূপ লোকসানের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পণ্যের বাজারে একপ্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। উহাকে বলা হয় 'রক্ষণ' (Hedging)। এই প্রণালীতে যে জিনিস বর্তমানে 'নগদ লেন-দেনের' ভিত্তিতে ক্রয় করা হইয়াছে উহাই আবার 'ফটকা লেন-দেনে'র ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয়। ফলে ভবিষ্যতে দর উঠা-নামা করিলে 'নগদ' ক্রয়ের জন্য যে লাভ বা লোকসান হইবে উহা 'ফটকা' বিক্রয়ের লোকসান বা লাভ দ্বারা পূরণ হইবে।

(৭) 'পণ্যের বাজারে' উপরি-উক্ত যে কাজ-কারবার হয় তাহার জন্য মালের উপস্থিতি প্রয়োজন হয় না। নমুনা বা শ্রেণী বিভাগের ভিত্তিতেই 'ক্রয়-বিক্রয়' সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে কাঁচামালের বা পণ্যের বাজারের অবদান (Services of a Produce or a Commodity Exchange to trade and industry)

পণ্যের বা কাঁচামালের বাজারের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

১। এরূপ বাজার ইহার সভ্যদের একস্থানে মিলিত হইয়া পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা ঘটায় এবং পরস্পরের মধ্যে ব্যবসা-সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ের আলোচনার সুযোগ দেয়।

২। এরূপ বাজার মারফত পণ্য সম্পর্কীয় যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়।

৩। ইহা ক্রমাগত ক্রয়-বিক্রয় কার্যাদি এবং পাইকারী হারে পণ্যাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে।

৪। ইহার ফটকা লেন-দেন (Futures Transactions) ভবিষ্যতে দর উঠা-নামার একটা রক্ষাকবচ। ইহার ফলে ক্রেতা যেমন ভবিষ্যতে মাল পাওয়া সম্বন্ধে

নিশ্চিত থাকিতে পারেন, বিক্রেতাও আবার হাতে মাল না থাকিলে উহা সংগ্রহ করার সুযোগ পান।

৫। সততার সহিত ফটকা লেন-দেনের কাজ সম্পন্ন হইলে পণ্যের মূল্য অত্যধিক উঠা-নামা রদ হয় এবং এইভাবে পণ্যের মূল্যস্তরে একটা স্থিতাবস্থা (Stability) বজায় থাকে।

৬। অনেক সময় ফটকা লেন-দেনে ভবিষ্যতে আকস্মিক কারণে কিংবা উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তনের জন্য ক্রেতা বা বিক্রেতা লোকসানের সম্মুখীন হইতে পারেন। এরূপ বাজারে যে রক্ষণ (Hedging) ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহার বলে এরূপ লোকসানের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী বর্তমানের 'নগদ লেন-দেনের' ভিত্তিতে যে ক্রয় হয় উহাই আবার 'ভবিষ্যতে লেন-দেনের' ভিত্তিতে বিক্রয় হয়। ফলে ভবিষ্যতে দর উঠা-নামা করিলে একের লাভ দ্বারা অন্যটির লোকসান পূরণ হয়। এইভাবে উৎপাদনকারীর বা অন্যান্য ব্যবসায়ীর স্বার্থ বজায় থাকে।

৭। এরূপ বাজারের সহিত যে ব্যবসায়ী বা উৎপাদকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাঁহারা ক্রয়-বিক্রয়ের হালচাল দেখিয়া পণ্যের প্রকৃত চাহিদা ও যোগানের একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারেন। ঐ জ্ঞান দ্বারা ইঁহারা চাহিদা ও যোগানের মধ্যে একটা সমতা বজায় রাখিতে সক্ষম হন।

৮। নমুনা বা শ্রেণী বিভাগের ভিত্তিতে এখানে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়। ফলে অযথা পণ্যের টানাটানি রোধ হয়।

৯। এই নমুনা বা শ্রেণী-বিভাগের ফলে বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতা তাঁহার যে শ্রেণীর পণ্য প্রয়োজন তাহাই ঠিকমত পাইতে পারেন।

১০। এ বাজারের ক্রমাগত ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় থাকায় উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে লাভ-লোকসানের হিসাব করা সহজসাধ্য হয় এবং তদনুযায়ী তাঁহারা উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্যের যোগান বজায় রাখিতে পারেন।

সুতরাং সুনিয়ন্ত্রিত পণ্যের বাজার ব্যবসা, শিল্প ও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

ফটকা বাজারের কার্যপ্রণালী (Working of Futures Market): যে বাজারে বর্তমান চুক্তির ভিত্তিতে ভবিষ্যতে মাল সরবরাহ ও উহার মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা থাকে তাহাকে 'ফটকা বাজার' (Futures Market) বলে। ফটকা বাজারে সাধারণত পাট, তুলা, গম, তৈলবীজ, বাদাম প্রভৃতি কাঁচামালের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে ভারতে চট, সোনা, রূপা প্রভৃতিরও ফটকা বাজার আছে।

ফটকা বাজারের কার্যপ্রণালী ও বৈশিষ্ট্য (Features) নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

১। ফটকা বাজারে মালের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। উহার নমুনা ও শ্রেণী-

বিভাগের ভিত্তিতে কাজ-কারবার হইয়া থাকে। এজন্য এ বাজারের পণ্যের ব্যাপক উৎপাদন ও চাহিদা, উহার গুণাগুণ অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ, নমুনাকরণের যোগ্যতা, স্থায়িত্ব, সঠিকভাবে ওজন, পরিমাণ ও সংখ্যা স্থির করার সহজসাধ্যতা, অল্প সময়ের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী যোগান দেওয়ার অসুবিধা, উহার চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহজলভ্যতা প্রভৃতি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন।

২। ফটকা বাজারে দুই প্রকার লেন-দেন সংঘটিত হয়। একটিকে বলা হয় (ক) 'ঝুঁকিদারী কারবার' (Speculative Business) এবং অপরটিকে বলা হয় (খ) 'অ-ঝুঁকিদারী কারবার' (Non-speculative Business)। এ বাজারের ঝুঁকিদারী ব্যবসায়িগণ ভবিষ্যতে দর উঠা-নামার ঝুঁকি বহন করিয়া লাভবান হইতে চেষ্টা করেন। ভবিষ্যতের অবস্থা ঠিকমত অনুমান হইলে তাঁহারা লাভবান হন। অন্যথায় তাঁহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ভবিষ্যতে ইহারা মাল গ্রহণ বা প্রত্যর্পণ না করিয়া 'চুক্তির' মূল্যের সহিত বাজার দরের পার্থক্য স্থির করিয়া শুধু উক্ত অর্থ আদান-প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাজ-কারবারও বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। যেমন 'তেজীওয়ালা' (Bulls)—ইহারা ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধির অনুমান করিয়া বর্তমানে কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করিয়া থাকেন। মন্দীওয়ালা (Bears)—ইহারা ভবিষ্যতে মূল্য কমিয়া যাওয়ার অনুমান করিয়া বর্তমানে উচ্চ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকেন। আবার ভবিষ্যতে একটা নির্দিষ্ট দরে পণ্য ক্রয় করার চুক্তিকে বলা হয় 'Call Option'. অনুরূপে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্য বিক্রয় করার চুক্তিকে বলা হয় 'Put Option'. সততার সহিত এই কাজ-কারবার চলিলে পণ্যের মূল্য অযথা উঠা-নামা করে না। ফলে মূল্যস্তরে একটা স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। এইভাবে ইহারা সমাজের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে উপকার সাধন করিয়া থাকেন।

'অ-ঝুঁকিদারী কারবার' (Non-speculative Business)-কে অন্য কথায় 'রক্ষণ' (Hedging) বলে। এই প্রণালীতে যাহা 'নগদ' ক্রয় করা হইয়াছে তাহাই আবার 'ভবিষ্যতের চুক্তিতে' বিক্রয় করা হয়। সুতরাং ভবিষ্যতে দর উঠা-নামার ফলে নগদ ক্রয়ের জন্য যে লাভ ও লোকসান হয় উহা 'ভবিষ্যতের চুক্তিতে' বিক্রয়ের লোকসান বা লাভ দ্বারা পূরণ হয়। কাঁচামাল দ্বারা ভোগ্যবস্তু কিংবা শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে যাঁহারা নিযুক্ত তাঁহাদের পক্ষে এই 'রক্ষণ' (Hedging) ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। এ সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। মনে করি, কোন উৎপাদক 'সরিষার তৈল' এই ভোগ্যবস্তু উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত। এজন্য তাঁহার একটা বিরাট তৈলের কারখানা আছে। তৈল উৎপাদনের জন্য 'সরিষা' এই কাঁচামাল প্রচুর প্রয়োজন। 'পণ্যের বাজার' হইতে তিনি প্রয়োজনমত সরিষা কিনিতে পারেন। বর্তমানে তিনি যে 'সরিষা' ক্রয় করিবেন উহা দ্বারা 'তৈল' উৎপাদন করিতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হইবে। এই 'তৈল' উৎপাদনের পর বাজারে যখন উহা বিক্রয় হইবে তখন 'সরিষার' বাজারদর হয়ত অনেক কমিয়া গিয়াছে। কাঁচামালের সহিত ভোগ্যবস্তুর মূল্যের সম্পর্ক

থাকায় তাঁহাকে হয়ত কম মূল্যে তৈল বিক্রয় করিতে হইতে পারে। এরূপ করিতে হইলে তাঁহার অবশ্যই লোকসান হইবে। এই লোকসানের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে তারিখে তিনি যে পরিমাণ 'সরিষা' নগদ ক্রয় করিয়াছেন উক্ত তারিখে উক্ত মূল্যে তিনি উক্ত পরিমাণ 'সরিষা' তৈল বিক্রয়ের সময়ে প্রত্যর্পণ হইবে এরূপ 'ভবিষ্যৎ' বিক্রয়ের 'অগ্রিম চুক্তি' (Forward Contract) করিবেন। সুতরাং 'ভবিষ্যৎ বিক্রয়ের' 'সরিষা' প্রত্যর্পণের সময়ে যদি সরিষার মূল্য কমিয়া যাওয়ার দরুন তৈলের মূল্য কমিয়া যায় তবে ইহাতে যে লোকসান হইবে তাহা উক্ত 'অগ্রিম বিক্রয়' চুক্তির সরিষা বাজার দরে ক্রয় করিয়া প্রত্যর্পণ করিলে যে লাভ হইবে তদ্দারা পূরণ হইবে। পক্ষান্তরে যদি সরিষার মূল্য ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পায় তবে 'তৈলের' মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে। সে ক্ষেত্রে 'তৈলের' লাভ দ্বারা 'সরিষার' অগ্রিম চুক্তির লোকসান পূরণ হইবে। সুতরাং উৎপাদক 'রক্ষণ' (Hedging) ব্যবস্থা দ্বারা দর উঠা-নামার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit) অর্জন করিতে পারেন। ফটকা বাজারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য রক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রকৃত পণ্যের আদান-প্রদান এখানে কমই সম্পাদিত হয়।

৩। এরূপ বাজারের ফটকা ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিও একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। ইহার বিক্রয়কক্ষে বিক্রেতাগণ অঙ্গুলি দ্বারা বিক্রয়ের সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশ করিয়া উহা সম্মুখদিকে হেলাইয়া 'লেও' (Offer) বলিয়া সপ্তমে গলা চড়াইয়া চীৎকার করিতে থাকেন। ক্রেতাগণও অনুরূপভাবে অঙ্গুলি দ্বারা ক্রয়ের পরিমাণ বা সংখ্যা নির্দেশ করিয়া পিছন দিকে হেলাইয়া 'দেও' (Accept) বলিয়া চড়া গলায় চীৎকার করিতে থাকেন। এরূপ চীকার ও হট্টগোলের মধ্যে তাঁহারা পরস্পরের কথা ও ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিকে Call Method বলা হয়। কোন কোন সংগঠনবিহীন বাজারে চীৎকার না করিয়া গোপনে কাপড়ের নীচে হাত রাখিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের লেন-দেন সম্পন্ন হইয়া থাকে। উহাকে বলা হয় Cover Method. যাহা হউক সুসংগঠিত বাজারে মৌলিক চুক্তি এইভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরের দিন লিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং প্রত্যেককে জামিনের অর্থ বাজার সংস্থার অফিসে জমা দিতে হয়।

৪। ইহাতে নির্দিষ্ট মাসের ভিত্তিতে লেন-দেন সম্পাদন করিতে হয়। এরূপ চুক্তিতে কেবল মাসের নাম উল্লেখ থাকিলেও মাসের কোন্ তারিখে চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন হইবে উহা নির্বাচনের স্বাধীনতা বিক্রেতাকে দেওয়া হয়।

৫। ইহাতে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট ওজন বা সংখ্যা নির্ধারিত থাকে এবং উহার এক, দুই প্রভৃতি বিভিন্ন মাত্রার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। যেমন, কোন বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের মাত্রা ১০০ কুইণ্টাল হইলে ১০০, ২০০, ৩০০ কুইণ্টাল প্রভৃতি ওজনের পণ্য বিক্রয় হইবে কিন্তু ১৫০ বা ১৭৫ কুইণ্টাল ওজনের মাল ক্রয়-বিক্রয় হইবে না।

৬। এখানে সকল লেন-দেন মূল পর্যায়ের (Basis Grade) ভিত্তিতে সম্পাদিত

হইয়া থাকে। তবে মূল পর্যায়ের তুলনায় উচ্চ বা নিম্ন পর্যায়ের পণ্যও প্রদানযোগ্য পর্যায় (Tenderable Grade) বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ফটকা বাজারের অবদান (Services of Futures Markets)

'ফটকা বাজারে'র সুবিধা, উপযোগিতা বা অবদান নিম্নের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :

(১) যে সকল উৎপাদক উৎপাদিত দ্রব্য অনতিবিলম্বে ক্রেতাকে যোগান দিতে সক্ষম নন এবং উক্ত ক্রেতাও অনতিবিলম্বে যোগান চাহেন না তাঁহাদের পক্ষে এরূপ কারবার বিশেষ সুবিধাজনক। কারণ এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা তাঁহার পণ্য নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রীত হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত রহিলেন এবং ক্রেতাও ভবিষ্যতে তাঁহার জিনিস পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিতে পারিলেন।

(২) কাঁচামাল হইতে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে এই 'ফটকা বাজার' পরম সহায়ক। কারণ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদক তাঁহার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকায় তাঁহার কারখানার কাজ চালু সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন এবং অধিক মনোযোগের সহিত শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করিতে পারেন।

(৩) আমদানী ও রপ্তানীকারকও মালপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিতে পারেন। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

(৪) সকল পক্ষই 'রক্ষণ' (Hedging) ব্যবস্থা দ্বারা অত্যধিক দর উঠা-নামার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন।

(৫) 'ঝুঁকি বাহকগণ' তাঁহাদের কাজ সততার সহিত পরিচালনা করিলে জিনিসের দর অত্যধিক উঠা-নামা রোধ করিতে পারেন এবং দরের স্থিতিশীলতা (Stability) রক্ষা করিতে পারেন। ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধি অনুমান করিলে ইঁহারা জিনিস ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ফলে জিনিসের চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং মূল্য বাড়িতে থাকে। এইভাবে বর্তমানে পণ্যের মূল্যের নিম্নগতি রোধ হয়। বর্তমানে ক্রীত দ্রব্য ভবিষ্যতে ছাড়া হয় বলিয়া ভবিষ্যতের দরও অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে না। আবার ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস অনুমান করিলে ইঁহারা জিনিস বিক্রয় আরম্ভ করেন। ইহার ফলে বর্তমান মূল্যের নিম্নগতি আরম্ভ হয় এবং ভবিষ্যতের অত্যধিক মূল্য হ্রাস রোধ হয়। এইভাবে ইঁহাদের কার্যের দ্বারা ইঁহারা দ্রব্যমূল্যের অত্যধিক উঠা-নামা রোধ করেন এবং মূল্যের একটা স্থিতিশীলতা আনয়ন করেন।

(৬) ইঁহারা পরোক্ষ বিনিময় (Arbitrage) দ্বারা একই সময়ে যে স্থানে মূল্য কম সে স্থান হইতে ক্রয় করিয়া যে স্থানে মূল্য বেশী তথায় বিক্রয় করিয়া বিভিন্ন বাজারের মধ্যে দরের অত্যধিক উঠা-নামা রোধ করেন।

(৭) ফটকা বাজারের 'রক্ষণ'-ব্যবস্থা থাকায় এরূপ কারবারের প্রয়োজনীয় অর্থাদি ব্যাঙ্ক হইতে অল্পায়াসে পাওয়া যায়।

'ফটকা বাজারের' অসুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

(১) 'ফটকা বাজারে' যে সমস্ত ঝুঁকিদার ব্যবসায়ী কাজ-কারবার করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রকৃত ব্যবসা বুঝেন না। তাঁহারা ইহাকে রাতারাতি ধনবান হওয়ার স্থান মনে করেন। ফলে তাঁহাদের কার্যকলাপের দরুণ দর উঠা-নামা রোধ হওয়ার পরিবর্তে উহা অত্যধিক উঠা-নামা করিতে থাকে। এজন্য তাঁহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(২) অনেক নিপুণ ঝুঁকিদারও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একযোগে প্রচুর মাল কিনিয়া লুকাইয়া রাখেন এবং বাজারে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করিয়া অধিক মূল্যে অল্প অল্প করিয়া মাল বাজারে ছাড়েন। ফলে উহার উপর নির্ভরশীল ক্রেতাদের ব্যবসা ও শিল্পপ্রচেষ্টা ব্যাহত হয়।

(৩) এরূপ বাজারে মালের নমুনা ও শ্রেণীবিভাগ থাকায় অনেক মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃত চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞানলাভ না করিয়া এ ব্যবসায়ের ঝুঁকি লন। ফলে তাঁহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং সমাজের অকল্যাণ হয়।

সুতরাং অবাঞ্ছিত ও অবৈধ ফটকাবাজী (Undesirable and Illegitimate Speculation), পণ্যমূল্যে কৌশল হস্তচালনা (Price Manipulation), ভুয়া বিক্রয় (Wash Sale), পাল্টা বিক্রয় (Matched Order), মিথ্যা সংবাদ প্রভৃতি ইহাকে জুয়াখেলার ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া থাকে।

এ সকল অসুবিধা দূর করিতে না পারিলে এরূপ বাজারের সুফল কখনই আশা করা যায় না। এজন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে The Forward Contract Regulation Act, 1952, উল্লেখযোগ্য। উহা ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালে সংশোধিতও হয়। শিল্প-বাণিজ্য প্রসারে এরূপ বাজারের বিশেষ গুরুত্ব থাকায় উহার বিলোপসাধন কেহ অনুমোদন করেন না।

এজন্য উক্ত আইন দ্বারা বাঞ্ছিত ফটকার প্রবর্তন এবং এরূপ বাজারের কাজকর্ম সুপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই আইন অনুযায়ী যে যে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে নিম্নে উহার উল্লেখ করা হইল :

১। আইনটি যথাযথভাবে কার্যকরী করার জন্য চারজন সদস্য লইয়া একটি 'আগাম বাজার কমিশন' (Forward Markets Commission) গঠিত হইয়াছে এবং উহার হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

২। নগদ বাজারে যে সমস্ত লেন-দেন ১১ দিনের মধ্যে নিষ্পন্ন হয় সেগুলি ছাড়া অন্য সমস্ত লেন-দেন এই আইনের আওতায় আনা হইয়াছে। সুতরাং ফটকা বাজারের লেন-দেন এবং নগদ বাজারের আগাম লেন-দেন এই আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। পণ্যের ঐচ্ছিক লেন-দেন (Option Dealings), কার্ব (Kerb) ও ডাব্বা (Dubba) কারবারকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে। গম, তুলা, সুতা, পাট, চট, তৈলবীজ, লাক্ষা প্রভৃতির ফটকা কারবারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে।

৩। আগাম বাজার কমিশনের সুপারিশক্রমে এবং জনস্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার একটি পণ্যের জন্য কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে কেবল একটি বাজার অনুমোদন করিতে পারেন।

৪। কোনও পণ্যের বাজারের অনুমোদন লইতে হইলে উহার নিয়মাবলী ও উপবিধি (Rules and Bye-laws) সরকার কর্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইতে হয় এবং উক্ত বাজারের পরিচালকমণ্ডলীতে অন্তত একজন সরকারী এবং তিনজন জনসাধারণের প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হয়।

৫। উক্ত আইনে কেন্দ্রীয় সরকারকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে উহার বলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনবোধে কোনও বাজারের নিয়মাবলী ও উপবিধি রচনায়, পরিবর্তনে ও সংশোধনে নির্দেশ জারী করিতে পারেন। ইহার ফলে নির্দিষ্ট মূল্যাংশ জমা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন, নিকাশঘর স্থাপন, পক্ষকালীন ভিত্তিতে চুক্তির নিষ্পত্তি-সাধন, কারবারী চক্র নিরোধ প্রভৃতি সম্ভব হইতেছে। ইহা ছাড়া সরকার বাজারের অনুমোদন নাকচ, পরিচালকমণ্ডলীর ক্ষমতা হরণ, ৭ দিন বা ততোধিক সময়ের জন্য সমস্ত লেন-দেন বন্ধ এবং বাজার-সংক্রান্ত যে-কোন সংবাদ বা তথ্য পরিবেশনের জন্য বাধ্য করিতে পারেন।

কিন্তু আইনের কড়াকড়ি সত্ত্বেও অবৈধ ফটকা কারবার যে না চলে এমন নহে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য অর্থনীতিবিদ্‌গণ অবশ্য বিভিন্নপ্রকার পরামর্শ দিয়া থাকেন। অধ্যাপক লার্নার অবৈধ ফটকা কারবারের প্রতিষেধক হিসাবে 'পাল্টা ফটকাবাজী' (Counter Speculation) সুপারিশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সরকারের এরূপ একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা উচিত যাহার কাজ হইবে বিভিন্ন দ্রব্যের ন্যায্য মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা এবং বাজার দর যাহাতে উক্ত মূল্যের সমান থাকে তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অধ্যাপক টাউজিকের মতে অবৈধ ফটকা কারবারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠন করা উচিত। তবেই ফটকা কারবারিগণ সামাজিক দায়িত্ব (Social Responsibilities) সম্বন্ধে সচেতন থাকিবেন এবং তাঁহাদের কার্যকলাপ বৈধপথে পরিচালিত করিতে সচেষ্ট হইবেন।

মূলধনের বাজার (Capital Market)

মূলধনের বাজারের বর্তমান পরিবর্তন (Change of Capital Market in recent years)

একটি প্রবাদ আছে—Indian Capital is proverbially shy. ভারতের মূলধন অত্যন্ত লাজুক ইহা সুবিদিত। ইহার তাৎপর্য এই যে—ভারতীয়েরা শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন নিয়োগ করিতে কোন প্রকার উৎসাহ বোধ করেন না। তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ সিন্দুকে থাকে এবং সামান্য অংশ লগ্নিকারবারে নিয়োজিত হয়। ভারতের

মূলধনের বাজারের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়াই এরূপ উক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং আমাদের দেশের শিল্পোন্নতির মূলে বৈদেশিক মূলধনের দান একজন্য অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ভারতের মূলধনের বাজারে কোনও গঠনমূলক উন্নতি দৃষ্ট হয় নাই। এককথায় উহা অনুন্নতই ছিল। কারণ ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। কৃষিতে বিনিয়োগযোগ্য কোন লগ্নিপত্রের ব্যবহার দেখা যায় নাই। শেয়ার বাজার অবশ্য ছিল। কিন্তু উহাতেও সরকারী ঋণ-পত্র ছাড়া শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি লগ্নিপত্রের প্রাচুর্য ছিল না। শেয়ার বাজারের মোট লগ্নিপত্রের মধ্যে সরকারী ঋণ-পত্রই ছিল ৫০ শতাংশ। ম্যানেজিং এজেন্সীর প্রভাবে নূতন কোন লগ্নিপত্র সংস্থাও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বৈদেশিক লগ্নিপত্র কলিকাতা বা বোম্বাই শেয়ার বাজার অপেক্ষা লণ্ডন শেয়ার বাজারেই বেশী লেন-দেন হইত। সাধারণ লোকের অর্থলগ্নি করার নগণ্য ক্ষমতা ও ইচ্ছা, লগ্নিকারক সংস্থাগুলির (Institutional Investors) সরকারী ও আধা-সরকারী লগ্নিপত্রে অর্থবিনিয়োগের প্রবণতা ভারতীয় মূলধনের বাজারকে খর্ব করিয়া রাখিয়াছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতে এই অবস্থার ব্যতিক্রম আরম্ভ হইয়াছে এবং বর্তমানে ভারতীয় মূলধন বাজার প্রকৃতপ্রস্তাবে অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে (Indian Capital market has substantially changed in recent years) একথা বলা চলে। ইহার কারণ সরকারী প্রচেষ্টা এবং ভারতবাসীদের অর্থলগ্নি ব্যাপারে পূর্বের লাজুকতা ও নিশ্চেষ্টতার অবসান। বিভিন্ন লগ্নিসংস্থা স্থাপন, উহাদের অবলেখনের কাজ, জীবন-বীমার জাতীয়করণ, স্বল্প সঞ্চয়ের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, ইউনিট ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ইহার মূলে আছে। উহা ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এই পরিবর্তনে বিশেষ সহায়তা করিয়া আসিতেছে :

১। লগ্নিকারকদের অর্থের নিরাপত্তার জন্য বিবিধ আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে কোম্পানী আইনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৬ সালে এই আইনের যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহাতে লগ্নিকারকদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। শেয়ার বাজারে সমাজের পক্ষে ফটকা কারবারের ক্ষতিকর প্রভাব দূর করার জন্যও পৃথক আইন পাশ হইয়াছে এবং এতদ্ উদ্দেশ্যে কোম্পানী আইনও সংশোধিত হইয়াছে।

২। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেক শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। উহাদের অভূতপূর্ব সাফল্য বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে অর্থবিনিয়োগ ব্যাপারে লোকের আস্থা সৃষ্টি করিয়াছে। জনসাধারণ স্বভাবতই অর্থলগ্নি ব্যাপারে সচেতন হইয়া পড়িয়াছে, শিল্পবাণিজ্যে উত্তরোত্তর অর্থলগ্নি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং লগ্নিপত্রের প্রাচুর্যও শেয়ার বাজারে দেখা দিয়াছে।

৩। Industrial Credit and Investment Corporation, Industrial Finance Corporation, Unit Trust, Industrial Development Bank, Life Insurance Corporation, লগ্নিসংস্থা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির অবলেখন

(underwriting) কার্যকলাপ অনেকটা প্রসারলাভ করিয়াছে। ইহাও মূলধনের বাজারের সম্প্রসারণে বিশেষ সাহায্য করিতেছে।

৪। উপরি-উক্ত আর্থিক সংস্থাগুলি মধ্যম ও দীর্ঘ মিয়াদী ঋণ প্রদান করিয়া মূলধনের সমস্যাও কিছুটা দূর করিয়া থাকে, ইহাদের কার্যকলাপ মূলধনের বাজারের উপর একটি সুস্থ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং মূলধনের বাজারের সম্প্রসারণে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে।

৫। এতদিন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (Commercial Banks) স্বল্পমিয়াদী ঋণ দ্বারা টাকার বাজারের অভাব পূরণ করিতেছিল। বর্তমানে ইহারাও কিছুটা দীর্ঘমিয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করিতেছে। ইহারা কোম্পানীর ঋণপত্র (Debenture), শেয়ার প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকে এবং উহা জামিন রাখিয়া ঋণ দিয়া থাকে। ইহাদের এই কার্যকলাপ মূলধনের বাজারের শ্রীবৃদ্ধিতে সাহায্য করিতেছে।

৬। ঋণদান ও অন্যান্য ব্যাপারে বর্তমানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা সুসংহত ও অসংহত মূলধনের বাজারের এবং টাকার ও মূলধনের বাজারের একত্রীকরণ। যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা ও উহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ব্যাপারে ইহাদের সমবেত চেষ্টা মূলধনের বাজারের বিশেষ পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। গ্রাম্য ঋণদান ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক বিশেষ তৎপর হইয়া উঠায় মূলধনের বাজারের সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। উপরি-উক্ত বিষয়গুলির একত্র প্রভাব মূলধনের বাজারের কাঠামোকে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের তুলনায় অনেকটা বেশী সুদৃঢ় করিতে সাহায্য করিয়াছে। তবে একথাও সত্য যে, এই উন্নতি অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের মূলধনের বাজারের সমকক্ষ হইতে এখনও পারে নাই। সুতরাং সরকার, লগ্নিকারক ও কারবারিগণের এ ব্যাপারে অধিক সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে।

শেয়ার বাজার (Stock Exchange)

শেয়ার বাজার এবং উহার বৈশিষ্ট্য (Stock Exchange and its chief features)

যে বাজারে যৌথ কোম্পানীর শেয়ার, স্টক, কোম্পানীর কাগজ বা সরকারী ঋণ-পত্র (Government Securities), ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা চলে তাহাকে 'শেয়ার বাজার' (Stock Exchange) বলে।

বিভিন্ন স্থান বা দেশের শেয়ার বাজারের বৈশিষ্ট্য বিভিন্নরূপ। তবে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় সব বাজারেই একরূপ :

(১) ইহা সাধারণত যৌথ কোম্পানীর ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং অংশীদারগণ কর্তৃক নির্বাচিত 'বোর্ড অব ডিরেকটরস্' দ্বারা কার্য পরিচালিত হয়।

(২) ইহার একটি নিজস্ব গৃহ থাকে। সেখানে ইহার সভ্যগণ মিলিত হন এবং সভ্যগণ ভিন্ন অন্য কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারেন না।

(৩) এ বাজারে শেয়ার, ঋণপত্র প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয় দালালের (Broker) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কেহ শেয়ার কিংবা ঋণপত্র ক্রয় বা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাকে দালালের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হয় এবং তিনি উহার জন্য যাহা করণীয় সব কিছু করিয়া থাকেন।

(৪) ইহার কাজ-কারবার নগদ (Cash) কিংবা বাকীতে (On Account) চলিতে পারে। নগদ কারবার হইলে তৎক্ষণাৎ কিংবা ৩।৪ দিনের মধ্যে টাকা ও শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে আদান-প্রদান হইয়া থাকে।

(৫) বাকীর কারবার হইলে পনর দিন বা একমাস সময় পাওয়া যায়। বাকীর কারবারে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি মিটানোর যে দিন স্থির হয় সে দিন কোন পক্ষ উহা মিটাইতে প্রস্তুত না থাকিলে অনুরূপ আরও সময় লইতে পারেন। যে পক্ষ এরূপ সময় চান তাঁহাকে অবশ্য কিছু খেসারত দিতে হয়।

(৬) অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতা ও বিক্রেতা শেয়ার বা ঋণপত্র প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হন না। সে অবস্থায় একপক্ষ অপর পক্ষকে চুক্তিমত টাকা বা শেয়ার না দিতে পারিলে চুক্তির মূল্য ও বাজার মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা দিয়া রেহাই পান।

শেয়ার বাজারের কাজ ও গুরুত্ব (Functions and Importance of Stock Exchange)

সঞ্চয় এবং উহার বিনিয়োগ ভিন্ন দেশের আর্থিক সম্পদ এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কিন্তু সঞ্চয়ের সুষ্ঠু বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকা চাই। নতুবা লোকের সঞ্চয় তাহার বাক্সে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। 'শেয়ার বাজার' বিনিয়োগের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র। যে দেশে 'শেয়ার বাজার' যত উন্নত সে দেশে বিনিয়োগের প্রসারও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বিনিয়োগ ব্যাপারে 'শেয়ার বাজার' বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং নানাবিধ কাজ-কারবার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। শেয়ার বাজারের কার্যাদি ও গুরুত্ব নিম্নলিখিত উপায়ে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

(১) ইহা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া থাকে।

(২) বর্তমানে জনসাধারণের সঞ্চয়ের একটা বড় অংশ যৌথ কোম্পানীর শেয়ার, ঋণপত্র, কোম্পানীর কাগজ বা সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতিতে নিয়োজিত হয়। শেয়ার বাজারে এই সমস্ত জিনিস ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহার ফলে এইগুলির গুরুত্ব যেমন বাড়িয়া যায়, অন্যদিকে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ বাজারের চাহিদা ও যোগান পর্যবেক্ষণ করিয়া উহাদের গুণাগুণ স্থির করিতে পারেন। সুতরাং শেয়ার বাজার থাকার ফলে এরূপ বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব হইতেছে। ইহার ফলে লোকের সঞ্চয়

বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতামূলক লগ্নিপত্রে সুষ্ঠুভাবে এবং সুশৃংখলভাবে নিয়োগ হইতে পারে এবং লোকের অর্থবিনিয়োগ প্রবণতা নিয়মিত হইতে পারে (help orderly flow of savings among competitive investments and thus regulates the investment psychology of the people)।

(৩) ইহার মাধ্যমে যৌথ কোম্পানীগুলি মূলধন সংগ্রহের সুযোগ লাভ করে এবং সঞ্চিত অর্থও উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিতে পারে। শেয়ার দায়গ্রাহকগণের অনেকেই এরূপ বাজারের সভ্য। ফলে নূতন যৌথ কোম্পানীগুলি ইহাদের সহযোগিতায় শেয়ার বিক্রয় দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে।

(৪) শেয়ার বাজার ঋণপত্র বা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ ঘটাইয়া ঋণ সংগ্রহ এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে। ইহার ফলে ঋণ সংগ্রহ ও অর্থ বিনিয়োগ উভয়ই নিরাপদ ও সহজ হয়।

(৫) শেয়ার বাজার শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা জিনিসপত্রের মূল্যস্তরের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

(৬) ইহা বিভিন্ন প্রকার শেয়ার, ঋণপত্র, স্টক প্রভৃতির মূল্যাদি জানিতে জনসাধারণকে সাহায্য করে। কারণ ঐগুলির বাজার দর, 'শেয়ার বাজার' উহার নোটিশ বোর্ডে ও সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া থাকে।

(৭) ইহা শেয়ার, ঋণপত্র ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লোকের সঞ্চয়স্পৃহাও বৃদ্ধি করে। ফলে দেশের মধ্যে মূলধন সংগঠন সহজসাধ্য হয়।

(৮) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ঋণপত্র ইত্যাদির যে প্রচার ইহার মাধ্যমে ঘটে উহার ফলে ইহা উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মর্যাদা ও সুনাম বৃদ্ধি পাইতে সহায়তা করে।

(৯) 'শেয়ার বাজার' যৌথ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা ঘটাইয়া যৌথ কোম্পানী কারবার প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করে। বর্তমানে বিরাট বিরাট যৌথ কোম্পানীর বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতে শেয়ার বাজারের দান উল্লেখযোগ্য। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শেয়ার বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া আছে। ইহার সুষ্ঠু কাজ পরিচালনার উপর দেশের শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় এবং ইহার ফলে দেশের আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হয়। আবার উহার কার্য ঠিকভাবে না চলিলে এবং কৃত্রিম উপায়ে দর উঠা-নামা, ফটকাবাজী এবং নানাবিধ অবৈধ উপায় প্রবেশ করিলে ইহা দেশের ও দশের অকল্যাণ সাধন করে। এজন্য 'শেয়ার বাজারে'র কারবারে লিপ্ত ব্যক্তিগণের সততা, নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতার উপরই জনসাধারণের সঞ্চয় বিনিয়োগ, অর্থ বিনিয়োগ ও উহার সমৃদ্ধি নিরাপদ ও সহজসাধ্য হয় এবং শিল্প-বাণিজ্যও সমৃদ্ধি লাভ করে।

(১০) ব্যাঙ্কের যে স্বল্পমেয়াদী আমানত উহার বিনিয়োগ দ্বারা মুনাফা অর্জন

করিতে শেয়ার বাজারই একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। কারণ প্রয়োজনের সময় ক্রীত শেয়ার এখানে বিক্রয় দ্বারা সহজেই নগদ টাকা সংগ্রহ করা চলে।

(১১) শেয়ার বাজার না থাকিলে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি বড় বড় প্রতিষ্ঠান উহাদের প্রচুর অর্থ বিনিয়োগে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিত। সুতরাং এই বাজার যে ইহাদের অর্থের সুষ্ঠু বিনিয়োগের সুযোগ দিয়া থাকে এ কথা বলা চলে।

(১২) শেয়ার বাজার যৌথ কোম্পানীগুলির মালিকানা হস্তান্তরের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র। সুতরাং বিত্তশালী ব্যক্তিগণ এই বাজারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় দ্বারা শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ করায়ত্ত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে ইঁহারা পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকেন এবং এইভাবে এই বাজারগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহের স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। অন্য কথায় শেয়ারের মূল্য ও উহার ক্রয়-বিক্রয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাব অবগত হওয়া যায়। ফলে ইহাকে বলা হয় Mirror of National Economy. এজন্য জার্মানীর বিখ্যাত রাজনীতিবিদ Bismarck একদা বলিয়াছিলেন—'If you want to feel the pulse of the British nation then look for it not in the British House of Commons, but on the London Stock Exchange'.

উপরি-উক্ত সুযোগ-সুবিধার জন্য ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, ইহা জনসাধারণের অর্থ-বিষয়ক ব্যাপারে একটি মূল্যবান প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ইহার মাধ্যমে জনসাধারণের অর্থ যাহাতে নিরাপদে ও সহজে বিনিয়োগ হইতে পারে এবং উক্ত বিনিময় হইতে নিয়মিত আয় হইতে পারে তাহার সুব্যবস্থা ও সুবন্দোবস্ত থাকা উচিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শেয়ার বাজারে এরূপ অবস্থা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় শেয়ার বাজারগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারে ফটকাবাজীর প্রাবল্য এবং অত্যধিক দর উঠা-নামা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারে এরূপ অবস্থা অত্যধিক পরিলক্ষিত হয়। ইহার প্রধান কারণ শেয়ার লেন-দেনের দায় নিষ্পত্তির (Settlement) দীর্ঘমিয়াদী ব্যবস্থা। ইহাতে ফটকা কারবারের অবকাশ অত্যন্ত বেশী। ফলে বোম্বাই বাজারকে জুয়ার বাজার আখ্যা দেওয়া হয়। কলিকাতার বাজারে নগদ লেন-দেনের ব্যবস্থা থাকিলেও অনেক কারবার 'অগ্রিম' (Forward) এবং 'ভবিষ্যৎ' চুক্তির ভিত্তিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ফলে এখানে ফটকাবাজীর প্রাবল্য কম নয়। ইহা ছাড়া, শেয়ার লেন-দেন না করিয়া দরের পার্থক্য মিটাইয়াও অনেক কাজ-কারবার চলে। এরূপ ব্যবস্থাও ফটকা কারবারের যথেষ্ট অবকাশ দিয়া থাকে। ১৯৫৬ সালে Stock Exchange নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হওয়ার পূর্বে শেয়ার বাজারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত শিথিল ছিল। অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত হইতে সরল ও সাধু

বিনিয়োগকারীদের রক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এজন্য শেয়ার বাজারের দর উঠা-নামা একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। সুতরাং শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন উহার সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এজন্য it can do more harm than good to the people.

শেয়ার বাজারের কাজ-কারবার (Working of a Stock Exchange)

বিভিন্ন শেয়ার বাজারের কাজ-কারবারের পদ্ধতি ও রীতি-নীতি বিভিন্ন প্রকার। তবে সাধারণত কতকগুলি কাজ-কারবারের পদ্ধতি ও রীতি-নীতি সকল বাজারে প্রায় একই প্রকার। উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

যখন কোন ব্যক্তি কোন লগ্নিপত্র (Securities) ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তখন তাঁহাকে কোনও দালালের (Broker) শরণাপন্ন হইতে হয়। যিনি লগ্নিপত্র বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকেও অনুরূপ কোনও দালালের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হয়। দালাল ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দস্তরীর বিনিময়ে মধ্যস্থ হিসাবে লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করিয়া থাকেন। লগ্নিপত্রের দালালগণ (Brokers) শেয়ার বাজারের সভ্য। ইহা ছাড়া অন্য একপ্রকার সভ্য থাকেন। উহাদিগকে বলা হয় লগ্নিপত্রের কারবারী (Jobbers)। লগ্নিপত্রের কারবারী নিজ নামেই শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকেন, কিন্তু দালাল ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষ হইয়া শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করেন। লগ্নিপত্রের কারবারী (Jobber) কথাটির প্রয়োগ লণ্ডন শেয়ার বাজারের। অনুরূপ কারবারীকে বোম্বাইয়ের বাজারে তরণীওয়ালা (Tarawaniwalas) বলা হয় যদিও এই ভূমিকার পরিবর্তন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার বাজারে অবশ্য এরূপ শ্রেণীবিভাগ নাই। লেন দেনের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য শেয়ার বাজারে প্রত্যেক সদস্যেরই ২।৪ জন ক্ষমতাপ্রাপ্ত করণিক (Authorised Clerk) থাকে। প্রত্যেক সদস্যদের পক্ষে বোম্বাই বাজারে ৫ জন, কলিকাতার বাজারে ২ জন এবং মাদ্রাজ বাজারের ৩ জন করণিক নিযুক্ত করার ক্ষমতা আছে। লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের অর্ডার সংগ্রহের জন্যও একপ্রকার দালাল থাকে। উহাদিগকে বলা হয় Remisiers। ইঁহারা উপ-দালালের (Sub-brokers) কাজ করিয়া থাকেন। ক্রেতা ও বিক্রেতার অর্ডার অনুযায়ী দালালগণ শেয়ার বাজারে গিয়া যে শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক সেরূপ লগ্নিপত্র কারবারীর নিকট উহার মূল্য জানিতে চান। তিনি উহার উত্তরে একসঙ্গে উক্ত শেয়ারের ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য (Double-barrelled price) উভয়ই উল্লেখ করিয়া থাকেন। দালাল যখন শেয়ারের মূল্য জানিতে চান তখন তিনি উহা ক্রয় করিবেন কি বিক্রয় করিবেন তাহা প্রকাশ করেন না বলিয়া একসঙ্গে এরূপ ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য উল্লেখ করা হইয়া থাকে। উক্ত মূল্য মনোমত না হইলে দালাল লগ্নিপত্র কারবারীকে উহাদের পার্থক্য হ্রাস করিতে (Make up the gap) অনুরোধ জানান। এইভাবে দর কষা-কষির পর মূল্য সাব্যস্ত হয়। মূল্য সাব্যস্ত হইলে ক্রেতার ও বিক্রেতার নাম প্রকাশ করা হয় এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের

চুক্তিপত্র প্রস্তুত হয় এবং দালাল উহা ক্রেতা ও বিক্রেতার নিকট উহাদের সম্মতি ও স্বাক্ষরের জন্য উপস্থিত করেন। এইভাবে চুক্তিমত ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হইলে দালাল দস্তুরী পাইয়া থাকেন এবং মূল্য অনুযায়ী লগ্নিপত্রের কারবারীর মুনাফা বা লোকসান হয়। শেয়ার বাজারে লেন-দেন নগদ বা বাকীতে সম্পন্ন হইতে পারে। নগদ লেন-দেনে সাধারণত তিন হইতে সাতদিনের মধ্যে টাকা-পয়সার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হয়। কিন্তু বাকীর লেন-দেনে চৌদ্দ দিনের মধ্যে প্রাথমিক নিষ্পত্তি করার নিয়ম সাধারণত চালু দেখিতে পাওয়া যায়।

তবে লেন-দেন মিটাইবার জন্য ৩।৪ দিনব্যাপী আনুষ্ঠানিক সময় প্রয়োজন হয়। ইহার প্রথম দিনকে বলা হয় Contango or Making-up Day। এই দিনটিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা অবিলম্বে লেন-দেন নিষ্পত্তি করিবেন কিংবা পরবর্তী নিষ্পত্তির দিন (১৪ দিন পর) পর্যন্ত জের টানিবেন (Carry Over) উহা স্থির করিবেন। ক্রেতা বা বিক্রেতা নানা কারণে লেন-দেন স্থগিত রাখিতে অনুরোধ জানাইতে পারেন। সঙ্গতির অভাবে ক্রেতা নিষ্পত্তির দিন স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিলে তাঁহাকে উক্ত সময়ের জন্য কিছু সুদ দিতে হয়। উক্ত সুদকে ব্যাজ (Contango) বলে। বিক্রেতা শেয়ার যোগানের অভাবে অনুরূপ প্রস্তাব করিলে তাহাকেও কিছু অর্থ দিতে হয়। উক্ত অর্থকে বলা হয় হরজানা (Backwardation)। বাকী কারবারে নিরুৎসাহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই এই ব্যাজ বা হরজানার ব্যবস্থা। লেন-দেন নিষ্পত্তির দ্বিতীয় দিনটিকে বলা হয় Ticket Day or Name Day। এই দিন দালাল ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম, শেয়ারের মূল্য ও বিবরণ প্রভৃতি লগ্নিপত্র কারবারীর নিকট পেশ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় দিনে উক্ত কার্য সম্পূর্ণ না হইলে আরও একটি দিন লওয়া হয়। এই তৃতীয় দিনকে বলা হয় Intermediate Day। এই দিন দলিল-পত্রাদি সব প্রস্তুত করিতে হয়। শেষ বা চতুর্থ দিনকে বলা হয় নিষ্পত্তির দিন (Settlement or Account Day)। এই দিন শেয়ার সরবরাহ ও মূল্য প্রদান হইয়া থাকে। প্রথম দিনে অর্থাৎ Contango Day-তে লেন-দেন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে এই নিষ্পত্তির দিন চৌদ্দ দিন পিছাইয়া যায়।

লেন-দেন নিষ্পত্তির জন্য নিকাশঘর (Clearing House) থাকে। যদি কোন বাজারের নিজস্ব নিকাশঘর না থাকে তবে কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে এরূপ নিকাশ-ঘরের কাজ করার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। আমাদের দেশে বোম্বাই ও মাদ্রাজের শেয়ার বাজারে জন্য ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতার শেয়ার বাজারের জন্য এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এবং আমেদাবাদ বাজারে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নিকাশঘরের কাজ করিয়া থাকে। নিকাশীতালিকায় বহির্ভূত লগ্নিপত্র (Securities) ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সরাসরি আদান-প্রদান দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। নিকাশঘরের কাজ হইতেছে যে, উহা লেন-দেনের কাজ সহজ ও সরলভাবে দ্রুত সম্পন্ন করে, ক্রেতা বা বিক্রেতা হিসাবে প্রত্যেক সদস্যের সমস্ত লেন-দেন স্থির করে, বাকীর লেন-দেনে সদস্যদিগকে

লগ্নিপত্রের মূল্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিতে বাধ্য করে এবং চুক্তি খেলাপের মাত্রা সীমিত করে।

তালিকাভুক্ত যে-কোন লগ্নিপত্রের নগদ লেন-দেন করা চলে। কিন্তু বাকীতে লেন-দেন করিতে হইলে শুধু অগ্রিম চুক্তির জন্য নির্দিষ্ট লগ্নিপত্র (Securities in the Forward List) ভিন্ন করা চলে না। এইভাবে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নয় শতাধিক তালিকাভুক্ত লগ্নিপত্রের মধ্যে মাত্র তেরটি এবং বোম্বাই শেয়ার বাজারে প্রায় পাঁচশত লগ্নিপত্রের মধ্যে পঁয়ষট্টিটি অগ্রিম চুক্তির জন্য নির্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

যদিও উপরি-উক্ত নিয়মে শেয়ার বাজারের ক্রয়-বিক্রয় লেন-দেন সম্পন্ন হইয়া থাকে তথাপি ইহাতে প্রকৃত লেন-দেন ছাড়া ফটকাবাজী (Speculation)-ও কিছু কম হয় না।

ফটকা লেন-দেনের মধ্যে ঐচ্ছিক লেন-দেন (Privilege or Option Dealings) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ইচ্ছা করিলে প্রকৃত লেন-দেন না করিয়া বাজার দর ও চুক্তির মূল্য এতদ্ উভয়ের পার্থক্য প্রদান করিয়া চুক্তি নিষ্পন্ন করা চলে। এই ঐচ্ছিক লেন-দেন বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। কোনও নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ লগ্নিপত্র ক্রয় করার এরূপ চুক্তিকে বলা হয় Call Option. অনুরূপ বিক্রয়ের চুক্তিকে বলা হয় Put Option. ইচ্ছানুযায়ী ক্রয় বা বিক্রয় করার এরূপ চুক্তিকে বলা হয় Call and Put Option বা Double Option বা Straddle. আবার Call of More Option চুক্তিতে প্রয়োজনবোধে দ্বিগুণ পরিমাণ লগ্নিপত্র ক্রয়ের অধিকার জন্মায়। Put of More Option চুক্তিতে অনুরূপভাবে দ্বিগুণ পরিমাণ লগ্নিপত্র বিক্রয়ের অধিকার জন্মায়।

ফটকাবাজী ও উহার অর্থনৈতিক তাৎপর্য (Speculation and its economic significance)

কোনও দ্রব্যের ভবিষ্যৎ যোগান ও চাহিদা এবং মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি অনুমান করিয়া মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে উক্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কে ফটকাবাজী (Speculation) বলে। ফটকা কারবারী ভবিষ্যতে কোন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখিলে ভবিষ্যতে অধিক মূল্যে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে বর্তমানের কম মূল্যে উহা ক্রয় করেন। এরূপ ফটকা কারবারীকে বলা হয় **তেজীওয়ালা (Bull)**। আবার ভবিষ্যতে কোনও দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখিলে ফটকা কারবারী ভবিষ্যতের কম মূল্যে ক্রয় করার উদ্দেশ্যে বর্তমানে উচ্চমূল্যে উক্ত দ্রব্য বিক্রয় করে। এরূপ ফটকা কারবারীকে বলা হয় **মন্দীওয়ালা (Bear)**। কোন নূতন কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য ভবিষ্যতে অধিক মূল্যে বিক্রীত হওয়ার সম্ভাবনা দেখিলে ঐ উচ্চমূল্যে শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের আবেদনও অনেক ফটকা কারবারী করিয়া থাকেন। এরূপ ফটকা কারবারীকে বলা হয় **অধিমূল্য শিকারী (Stag)**। আবার যখন ফটকা

কারবারী ভবিষ্যতে কম মূল্যে দ্রব্য ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করিয়া উক্ত দ্রব্য ভবিষ্যতে অধিক মূল্যে বিক্রয়ের আগাম চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং উভয় চুক্তিই কার্যকালে পালন করিতে ব্যর্থ হন তখন এরূপ ফটকা কারবারীকে **খেলাপী মন্দীওয়ালা (Lame Duck)** আখ্যা দেওয়া হয়। ফটকাবাজী এই বিভিন্ন প্রকার ফটকা কারবারীদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এরূপ ফটকাবাজীর অর্থনৈতিক তাৎপর্য ও সুবিধা নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(ক) ইহা বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে এরূপ দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য রক্ষা করে।

(খ) ইহা কাঁচামালের যোগান ও পণ্য বিক্রয়ের ঝুঁকি বহন করিয়া থাকে। ফলে এ ব্যাপারে উৎপাদকের ঝুঁকি হ্রাস পায়। এজন্য উৎপাদকের পক্ষে নিশ্চিন্ত মনে উৎপাদন-ধারা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

(গ) ভবিষ্যতে কোনও দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখিলে ফটকা কারবারী উহা ক্রয় করিয়া মজুত রাখেন। ইহার ফলে বর্তমানের যোগান হ্রাস পায় এবং উহার মূল্যও খুব হ্রাস পাইতে পারে না। আবার কোন দ্রব্যের মূল্য ভবিষ্যতে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখিলে ফটকা কারবারী উহা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে যোগান বৃদ্ধি পায় এবং বর্তমানের মূল্যও খুব বেশী হইতে পারে না। এইভাবে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয় এবং বর্তমানের ও ভবিষ্যতের মূল্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। সুতরাং ইহা দ্রব্যমূল্যের তারতম্য হ্রাস ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

(ঘ) ফটকা কারবারীদের কাজ-কারবারের গতি নিরীক্ষণ করিলে কোন পণ্যের চাহিদার ও যোগানের ভবিষ্যৎ গতি ও পরিমাণও অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। এই গতি নিরীক্ষণ দ্বারা উৎপাদকগণ পূর্ব হইতেই তাঁহাদের উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করিয়া লইতে পারেন।

(ঙ) ইহাদের এই কাজ-কারবার অন্যভাবেও অনেক উপকার সাধন করিয়া থাকে। লগ্নিপত্রের সহজসাধ্য হস্তান্তর, উহা ক্রয়-বিক্রয়ের গতিশীলতা এবং মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা প্রভৃতি যে সকল সুবিধা শেয়ার বাজার হইতে পাওয়া যায় উহার বেশীর ভাগ ফটকা কারবারের সুফল হইতে পাওয়া যায়। কেবল লগ্নির উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয় হইলে শেয়ার বাজারের কাজ-কারবারের অবিরাম গতি রক্ষা করা সম্ভব হইত না। কারণ এরূপ লেন-দেনের সংখ্যা খুব বেশী নয়। এই অল্পসংখ্যক লেন-দেনের সহিত প্রচুর ফটকা কারবার যুক্ত হওয়ায় শেয়ার বাজারের ক্রয়-বিক্রয় অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে শেয়ার বাজারের ফটকা ক্রয়-বিক্রয়ের দর দেখিয়াই লগ্নিকারকগণ প্রভাবিত হন এবং কোন্ প্রকার শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করিবেন উহা স্থির করেন। এইভাবে ফটকা কারবার মূলধনের সঠিক

গতি নির্দেশ করে এবং বিনিয়োগ (Investment) এবং মূলধন সংগঠনে (Capital formation) সাহায্য করে।

(চ) পণ্যের বাজারের ফটকা দর হইতে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনকারিগণ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উৎপাদনের গতি ও পরিমাণ স্থির করিতেও সাহায্য পাইয়া থাকেন।

ফটকা কারবারের উপরি-উক্ত সুবিধা থাকায় উহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম করে। এইভাবে অবশ্য ইহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। উহা ফটকা কারবারের সুফল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সুফলগুলি অবশ্য **বৈধ ফটকাবাজী** (Legitimate Speculation) হইতে উদ্ভূত হয়। ভবিষ্যৎ মূল্যের পরিবর্তন ঠিকমত অনুমান করিয়া যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয় এবং মুনাফালাভ হয় উহাই বৈধ ফটকাবাজীর অন্তর্গত হয়। ইহার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি দেখা দেয়। কিন্তু **অবৈধ ফটকাবাজী** (Illegitimate Speculation) উহার বিপরীত ফল প্রদান করে। যখন অসৎ ও অনভিজ্ঞ ফটকা কারবারী মুনাফার লালসায় বশীভূত হইয়া নিজ স্বার্থসাধনের জন্য এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হন তখন উহাকে বলা হয় অবৈধ ফটকাবাজী। এই অবৈধ ফটকাবাজীতে অনেক সময় প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয়ের পরিবর্তে ভবিষ্যতের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর বাজী ধরিয়া চুক্তি করা হয়। অন্যকথায় ইহা জুয়াখেলার (Gambling) সামিল। ইহা অবশ্যই সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ এবং উহার কুফলও ভয়ানক। সুতরাং এরূপ ফটকাবাজীর জন্য যে অসুবিধাগুলি দেখা দেয় উহা নিম্নের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :

(ক) অনেক সময় যখন ফটকা কারবারী নিজের নিকট মজুত কোনও লগ্নিপত্র উপযুক্ত মূল্যের অভাবে লাভজনকভাবে বিক্রয় করিতে অসমর্থ হন তখন তিনি গোপনে দালাল মারফত নিজেই নিজের নিকট উচ্চ মূল্যে উহা ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে অন্যান্য ক্রেতাদের দৃষ্টি উহাতে আকৃষ্ট হয় এবং উহাই প্রকৃত বাজার দর মনে করিয়া উহা উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে বাজার দর বৃদ্ধি পায় এবং ফটকা কারবারী তাঁহার লগ্নিপত্র এই উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহা ভুয়া বিক্রয় (Wash Sales) নামে অভিহিত। সুতরাং এই ভুয়া বিক্রয় দ্বারা ব্যক্তিগত মুনাফালাভ ফটকাবাজীর একটি প্রধান ত্রুটি।

(খ) ইহা ছাড়া যে লগ্নিপত্রের ক্রয়-বিক্রয় খুব কম হয় এরূপ লগ্নিপত্রের ক্রয়-বিক্রয়ে তেজীভাব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ফটকা কারবারিগণ ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য পৃথক পৃথক দালাল নিয়োগ করেন এবং ক্রয়-বিক্রয় মূল্য স্থির করিয়া দেন। ইহার পর এই নিযুক্ত দালালগণ এরূপ লগ্নিপত্র খুব ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ করেন। ইহার ফলে এরূপ লগ্নিপত্র বাজারে বিশেষ চালু বলিয়া পরিগণিত হয়। এরূপ কৃত্রিম বাজার সৃষ্টি করাকে Matched Order বলা হয়। সুতরাং এরূপ কৃত্রিম বাজার সৃষ্টি দ্বারা সমাজ-বিরোধী মুনাফালাভও ফটকাবাজীর অন্যতম ত্রুটি। ইহার ফলে যে শিল্পে অধিক-মূলধন প্রয়োজন ইহাদের গোপন কারসাজীর ফলে উহা নিয়োগ হইতে পারে না।

(গ) অনেক ফটকা কারবারীর হাতে লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রচুর মূলধন থাকে না। ফলে ইহারা পণ্য বা লগ্নিপত্রের বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধি কমাইতে পারেন না। পক্ষান্তরে ইহারা মিথ্যা গুজব রটাইয়া, কোম্পানীর পরিচালক বা কর্মকর্তাদের নিকট হইতে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাজার দরের যথাযথ পরিবর্তন ঘটাইয়া মুনাফালাভ করেন। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ Keynes-এর মতে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার অস্থিরতার জন্য এরূপ ফটকা কারবারিগণই দায়ী। সুতরাং ইহা যে ফটকা কারবারের বিকৃত ও ধ্বংসমূলক (Destructive) রূপ ইহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য ইহা যাহাতে দূর হয় এবং গঠনমূলক (Constructive) ফটকা কারবারের সৃষ্টি হয় সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন।

কলিকাতা শেয়ার বাজারের সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational set-up of the Calcutta Stock Exchange)

ভারতের শেয়ার বাজারগুলির মধ্যে কলিকাতার শেয়ার বাজার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বৃহৎ। এই বাজারের গোড়াপত্তন দেখিতে পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। তখন কলিকাতায় বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঋণপত্রাদির ক্রয়-বিক্রয় হইতে ইহার সূত্রপাত হয়। তখন এই ঋণপত্রাদির ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান ছিল বর্তমান জেমস্ ফিন্‌লে এণ্ড কোম্পানীর নিকটবর্তী একটি নিমগাছের তলায়। প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঋণপত্রাদি ক্রয়-বিক্রয় হইতে ইহার সৃষ্টি হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নবগঠিত বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার, স্টক প্রভৃতিও ক্রয়-বিক্রয় ইহাতে আরম্ভ হয় এবং ইহা পরে স্থানান্তরিত হইয়া এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের নিকটবর্তী স্থানে যায়। ইহার পর ১৯০৮ সালে শেয়ার কারবারিগণ Calcutta Stock Exchange নামে সমিতি গঠন করিয়া ২নং নিউ চীনাবাজার স্ট্রীটে (পরে ২নং রয়েল একচেঞ্জ প্লেস নামে পরিচিত) উহার কার্যালয় স্থানান্তর করেন। ১৯২৩ সালে ইহা কোম্পানী আইন অনুযায়ী রেজেস্ট্রীকৃত হয় এবং ৩·৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত ভবনে অধিষ্ঠিত হয়। এই বাজারের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational set-up) বা গঠন (Constitution) ও কার্যপদ্ধতি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। **নাম (Name)** : ইহার নাম The Calcutta Stock Exchange Association Limited.

২। **মূলধন (Capital)** : উহার মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। প্রতি শেয়ারের মূল্য ২৫০ টাকা। সুতরাং ইহার মোট সভ্যসংখ্যা ১২০ পর্যন্ত হইতে পারে। ১৯৫৬ সালের লগ্নীপত্র চুক্তি (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের ১০ই অক্টোবর হইতে ইহা সরকারী অনুমোদন লাভ করে এবং প্রতি ৫ বৎসর অন্তর এই অনুমোদন পুনর্বহাল করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অনুমোদনের পূর্বে ইহার মূলধন ছিল ৩ লক্ষ টাকা, কিন্তু প্রতি শেয়ারের মূল্য ছিল ১ হাজার টাকা। তখন অংশীদারী কারবারও ইহার সদস্য ছিল। কিন্তু অনুমোদনের পর অংশীদারী কারবারের সদস্যভুক্তি হওয়া নিষিদ্ধ

হয়। অংশীদারদিগকে সদস্যভুক্তি করার উদ্দেশ্যে এবং কলিকাতার কাটনি বাজার তুলিয়া দেওয়ার জন্য উহার সদস্যগণকে এই বাজারের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রতিটি ১,০০০ টাকার শেয়ার ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া শেয়ারের সংখ্যা ১২০০ করা হয় এবং প্রতি শেয়ারের মূল্য ২৫০ টাকা ধার্য করা হয়।

৩। **সভ্য বা সদস্যপদ (Membership):** ইহার সভ্যপদ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রতিষ্ঠাতা সভ্য ও সাধারণ সভ্য। ইহা লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্ব হইতেই যাঁহারা শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করিতেন তাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। আর যাঁহারা পরে লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া সভ্য হইয়াছেন তাঁহারা সাধারণ সভ্য। এই শেয়ার বাজারের সভ্য হওয়া এক বিরাট ব্যাপার। শেয়ার ক্রয় দ্বারাই অবশ্য ইহার সভ্য হইতে হয়। কিন্তু ইহার সভ্য হইতে গেলে শুধু শেয়ারের অভিহিত মূল্য (Face Value) দিলে চলে না। প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ২৫০ টাকা হইলেও উহার বাজার দর অনেক বেশী। সুতরাং শেয়ার কিনিতে হইলে উহার বাজার দরই দিতে হয়। ইহা ছাড়া প্রবেশ মূল্য হিসাবে ৫ হাজার টাকা এবং আমানত (Deposit) হিসাবে ২০ হাজার টাকা দিতে হয়। নূতন সভ্যপদ লাভ করিতে হইলে দুইজন পুরাতন সভ্যের সুপারিশসহ শেয়ার বাজারের কার্যকরী সমিতির অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এই কার্যকরী সমিতি সভ্য-পদের আবেদনকারীর আর্থিক সঙ্গতি, ব্যবসা, চরিত্র, সততা প্রভৃতি বিচার-বিবেচনা করিয়া এরূপ আবেদন মঞ্জুর করিয়া থাকেন। শেয়ার বাজারের সভ্যগণ ছাড়া তাঁহাদের নিযুক্ত প্রতিনিধিরাও শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু প্রত্যেক প্রতিনিধিকে প্রবেশমূল্য বাবদ ৫০০ টাকা দিতে হয়। ইহা ছাড়া প্রত্যেক সভ্য ও প্রতিনিধিকে বাৎসরিক ৪ টাকা হারে চাঁদা দিতে হয়। সভ্য ও প্রতিনিধিগন ভিন্ন অন্য কাহারও শেয়ার বাজারে প্রবেশাধিকার নাই।

৪। **পরিচালনা (Management):** ইহা একটি কার্যকরী সমিতি বা কমিটি (Executive Committee) দ্বারা পরিচালিত। উক্ত কমিটি ১৯ জন ডিরেক্টর লইয়া গঠিত। ডিরেক্টরদের মধ্যে তিনজন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। অন্যান্য ডিরেক্টরগণ সভ্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। সমিতি প্রতি বৎসর উহার একজন সভাপতি (President) এবং একজন সহ-সভাপতি (Vice-President) নির্বাচন করে। প্রতি বৎসর সমিতির অর্ধেক ডিরেক্টর (যাঁহারা বেশীদিন আছেন) অবসর গ্রহণ করেন। এরূপ অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টরগণ পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারেন। এই সমিতি বা কমিটির প্রধান কাজ বাজার ও উহার সভ্যদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা এবং তজ্জন্য নিয়মাবলী (Rules) এবং উপবিধি (Bye-laws) প্রস্তুত করা। সভ্যদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে কমিটিই উহার মীমাংসা করিয়া থাকেন এবং কমিটির সিদ্ধান্ত সকল সভ্যকে মানিয়া চলিতে হয়। কমিটি অনেকগুলি সাব-কমিটির সাহায্যে বাজারের কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন যেমন, সালিসী কমিটি, নথিপত্র কমিটি, তালিকাভুক্তির কমিটি, চুক্তিভঙ্গ প্রতিবিধান কমিটি ইত্যাদি।

৫। লেন-দেন (Transaction) : নগদ লেন-দেনই (Cash Transaction) কলিকাতা বাজারের বৈশিষ্ট্য। ইহাতে চুক্তির দ্বিতীয় দিনে কিংবা তৃতীয় দিনে বেলা ৪টার মধ্যে চুক্তিমত টাকা ও শেয়ার হস্তান্তর করার নিয়ম। উক্ত সময়ের মধ্যে শর্তপালন না হইলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে (Aggrieved Party) কার্যকরী সমিতির নিকট ১৬ টাকা জমা দিয়া অভিযোগ পেশ করিতে হয়। উক্ত সমিতি তখন নোটিশ দিয়া ৭ দিনের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের নির্দেশ দিয়া থাকে। উক্ত নির্দেশ অমান্য করিলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ২ দিনের নোটিশ দিয়া চুক্তি বাতিল করিয়া দিতে পারেন অথবা প্রকাশ্য বাজারে উক্ত শেয়ার ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারেন বা উহাতে কোন লোকসান হইলে তাহা চুক্তি খেলাপকারীর (Defaulter) নিকট হইতে আদায় করিতে পারেন।

নগদ লেন-দেন বৈশিষ্ট্য হইলেও অগ্রিম বা ভবিষ্যৎ চুক্তিও (Forward Contract) এখানে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ঐচ্ছিক লেন-দেন (Option Dealings) অর্থাৎ অগ্রিম চুক্তি অনুযায়ী লগ্নিপত্র প্রকৃত হস্তান্তর কিংবা ইচ্ছা করিলে বাজার দর ও চুক্তির মূল্য এতদ্ উভয়ের পার্থক্য বা ভুক্তান করার সুবিধা এই বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত নহে। ইহা সত্বেও এই বাজারের অনেক লেন-দেনই নগদ টাকায় নিষ্পত্তি না হইয়া ঐচ্ছিক লেন-দেন ও ফটকার ভিত্তিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এজন্য কলিকাতার বাজার ফটকা বাজার (Speculative Market) বলিয়া আখ্যা লাভ করিয়াছে। এ বাজারের সভ্যগণ সকলেই দালালশ্রেণীভুক্ত এবং দালালী কারবারী (Broker Dealer)। প্রতিনিধিগণ শুধু তাঁহাদের নিয়োগকর্তার পক্ষ হইয়া শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত থাকিতে পারেন। দালাল বা সভ্যগণ দস্তরীর বিনিময়ে ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষ হইয়া শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করেন। কিন্তু শেয়ার বাজারে কেবল একজন সভ্য অপর একজন সভ্যের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে পারেন। এজন্য সকল চুক্তিই এখানে মুখ্য ব্যক্তির চুক্তি (Principal's Contract)। এখানে কোন সভ্য অপর সভ্যের নিকট ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম উল্লেখ করেন না। ইহার ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা শেয়ার বাজারের অভ্যন্তরে চুক্তিবদ্ধ দর জানিতে পারেন না। এজন্য উক্ত চুক্তিবদ্ধ দর অপেক্ষা ক্রেতাকে অধিক দরে শেয়ার ক্রয় করিতে হয় এবং বিক্রেতাকে কম দরে উহা বিক্রয় করিতে হয়। ইহার লেন-দেনে তিনটি চুক্তি সম্পাদিত হয়—উভয় দালালের মধ্যে একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি, দালাল ও ক্রেতার সহিত একটি চুক্তি এবং দালাল ও বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি। যে দরে বাজারের অভ্যন্তরে দালালের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয় উহা শেয়ার বাজারের দেওয়ালের বোর্ডে লিখিত হয় এবং সরকারী মূল্য তালিকায় প্রকাশ পায়।

এ বাজারের ভবিষ্যৎ বা অগ্রিম চুক্তি নিষ্পত্তির জন্য নিকাশঘরের (Clearing House) ব্যবস্থা আছে। অগ্রিম চুক্তি নিষ্পত্তির জন্য ২ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এই নিকাশঘরের কাজ করিয়া থাকে। অগ্রিম লেন-দেন নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মূল্যাংশ জমা দেওয়ার নিয়মও আছে। প্রথম ৫ লক্ষ টাকার ক্রয়-বিক্রয়ে কোন কিছু জমা দিতে হয় না। পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকার উপর শতকরা ৫ টাকা এবং

১৫ লক্ষের অধিক হইলে শতকরা ১০ টাকা জমা দিতে হয়। ফটকা কারবারের তীব্রতা অনুযায়ী মূল্যাংশ জমা দেওয়ার হার পরিবর্তনও হইয়া থাকে।

কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজ (Functions of the Calcutta Stock Exchange)

সব শেয়ার বাজারের কার্যাবলী একই প্রকারের। কলিকাতার শেয়ার বাজার ইহার কোন ব্যতিক্রম নহে। ইহার মুখ্য কাজ লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। এ কাজের মাধ্যমে ইহা দেশের অর্থনৈতিক প্রতিবিম্ব (Mirror of Country's Economy) হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। ইহার কার্যকলাপ দেখিয়া দেশের আর্থিক অবস্থা এবং কারবারী জগৎ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। উহার কার্যাবলীর নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে :

(ক) ইহা একটি সুসংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত শেয়ার বাজার। ইহার ফলে ইহার পক্ষে সহজ ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভিন্ন প্রকার লগ্নিপত্র যেমন শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে। এই ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য দালালের মারফত সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই দালালগণই এই বাজারের সভ্য। দালালগণও প্রতিনিধিগণ ছাড়া এই বাজারে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই. ক্রেতার পক্ষে দালাল এবং বিক্রেতার পক্ষে দালাল এখানে মিলিত হওয়ার সুযোগ পান এবং প্রয়োজনমত ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য সম্পন্ন করেন। সুতরাং এই বাজার উহাদের পরস্পরের সহিত মিলিত হওয়ার স্থান হিসাবে কাজ করিয়া থাকে (acts as a meeting ground for all its members)।

(খ) ইহা লগ্নিপত্রের মালিকানা হস্তান্তরে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক স্থান। লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা অগণিত। ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ খুবই কম। সুতরাং ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অবিরাম লেন-দেন সংঘটিত হওয়ার ইহাই উপযুক্ত স্থান।

(গ) ইহা লগ্নিপত্রের ক্রয়-বিক্রয় মূল্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলে বিনিয়োগকারিগণকে উহাদের মূল্য সম্বন্ধে সজাগ রাখিতে ইহা সাহায্য করে। এইভাবে ইহা লগ্নিপত্রের প্রকৃত বিনিয়োগমূল্য নিরূপণে সাহায্য করে।

(ঘ) লগ্নিপত্রের ক্রয়-বিক্রয়ের মালিকানা হস্তান্তরের সুযোগ দিয়া মূলধনের গতিশীলতা রক্ষা করা ইহার অন্যতম প্রধান কাজ। এই কাজের দ্বারা ইহা জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহ দিয়া থাকে, বিনিয়োগকারীকে লগ্নির সুবিধা ও আয় বৃদ্ধিতে এবং লাভজনক ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করিতে সাহায্য করে।

(ঙ) ইহা লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা দিয়া উহা নগদ টাকায় রূপান্তরিত করার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে। লগ্নিপত্র নগদ টাকায় পরিণত করার সুবিধা থাকায়

একদিকে জনসাধারণ যেমন অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহবোধ করে, অন্ত দিকে ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি উহা জামিন রাখিয়া ঋণ দিয়া থাকে।

(চ) ইহা যৌথ কোম্পানীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণভাবে উপরি-উক্ত কার্যগুলি সম্পন্ন করিলেও ইহা বিশেষ কতকগুলি কার্যেও লিপ্ত থাকে। উক্ত পরিচালনা ১৯ জন ডিরেক্টর দ্বারা গঠিত একটি কমিটির উপর ন্যস্ত। উক্ত কমিটি সভ্যদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে নিয়মাবলী ও উপবিধি রচনা করিয়া থাকে। সভ্যদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে উহা মীমাংসা করিয়া থাকে।

(ছ) লেন-দেন কার্য সুষ্ঠুভাবে সততার সহিত সম্পাদিত হইতেছে কিনা উহা দেখাও ইহার অন্যতম কাজ। ইহার নগদ লেন-দেন তিন দিনের মধ্যে এবং বাকী লেন-দেন ১৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবার নিয়ম। নগদ লেন-দেনে চুক্তি খেলাপ হইলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ইহা চুক্তি বাতিল করার বা লোকসান আদায় করার অধিকার দিয়া থাকে। ইহার বাকী লেন-দেন নিষ্পত্তির জন্য নিকাশঘরের ব্যবস্থাও আছে। বাকী লেন-দেন নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে ইহা নিকাশঘরে মূল্যাংশ জমা দেওয়ার ব্যবস্থাও প্রবর্তন করিয়াছে। ফটকা কারবারের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে মূল্যাংশ জমা দেওয়ার হার পরিবর্তন করার ক্ষমতাও ইহার আছে। সুতরাং নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ফটকাবাজী নিয়ন্ত্রণ করা ইহার একটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি প্রধান শেয়ার বাজার (Some other principal Stock Exchanges of the world)

পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি প্রধান শেয়ার বাজারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

(১) বোম্বাই শেয়ার বাজার (Bombay Stock Exchange) :

(ক) বোম্বাই শেয়ার বাজারের নাম The Indian Share and Stock Brokers' Association. ইহা কলিকাতার মত রেজিষ্ট্রিকৃত লিমিটেড কোম্পানী নহে এবং মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় নাই। ইহার আইন-কানুন নিজস্ব এবং বোম্বাই সরকার কর্তৃক সমর্থিত। ইহার সদস্যসংখ্যা ৪৫১ জন। প্রত্যেক সদস্যকে ২০,০০০ টাকা আমানত রাখিতে হয় এবং সদস্যপদ ত্যাগ করিলে উহা ফেরত দেওয়া হয়। সদস্যপদ ছাড়া বহুসংখ্যক কেরাণীও ইহার পরিচালন-কার্যে ও লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয়ে সাহায্য করিয়া থাকে।

(খ) ইহার পরিচালনভার ১৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কমিটির উপর ন্যস্ত। এই কমিটির সদস্যগণ দুই বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন। সদস্য ও কেরাণীদের প্রত্যেককে বৎসরে ৬·০০ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হয়। উহাদের মধ্যে ১·০০ টাকা দান হিসাবে বিতরণ করা হয়।

(গ) বোম্বাইয়ের বাজারে চুক্তির দায়-নিষ্পত্তির (Settlement) জন্য একমাস সময় পাওয়া যায়। এজন্য এখানে প্রচুর ফটকা কারবার (Speculative Business)-এর অবকাশ ঘটে এবং ইহার প্রাধান্যই এখানে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। তাই অনেকে ইহাকে জুয়ার (Gambling) বাজার বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

(ঘ) বোম্বাই বাজারে 'নিকাশঘর' (Clearing House) থাকায় ফটকা কারবারের সুযোগ-সুবিধা বেশী ঘটিয়া থাকে। কারণ নিকাশঘর মারফত ক্রয় ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য প্রধান করিয়া শেয়ারের কারবার অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে।

(ঙ) কলিকাতার শেয়ার বাজারের মত এখানেও সদস্যদের মধ্যে লেন-দেন কার্য সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। বাহিরের লোকের সহিত যে কাজ-কারবার চলিয়া থাকে তাহার জন্য স্বতন্ত্র চুক্তির প্রয়োজন হয়। এরূপভাবে দালাল-কারবারী (Broker dealer) মারফত পৃথক চুক্তি হওয়ায় বাহিরের ক্রেতা ও বিক্রেতা শেয়ারের প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে।

(২) লণ্ডন শেয়ার বাজার (London Stock Exchange) :

(ক) পৃথিবীর মধ্যে লণ্ডন শেয়ার বাজার সবচেয়ে বড় এবং সুসংগঠিত বলিয়া পরিগণিত। ইহা একটিমাত্র বাজার নহে। ইহা কতকগুলি বাজারের একত্র সমাবেশ। ইহার নিয়ন্ত্রণও ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত ছিল।

(খ) প্রথমত, এই বাজার গৃহের কর্তৃত্ব নয়জন অছি এবং পরিচালক বোর্ডের (Board of Trustees and Managers) হস্তে ন্যস্ত থাকে। এই বোর্ড অংশীদারগণ (Shareholders) কর্তৃক গঠিত। এই অংশীদারগণের সহিত বাজারের সদস্যদের (Members) কিছু পার্থক্য আছে। প্রথম যখন বাজারের গৃহ নির্মিত হয় তখন অংশীদারদের নিকট অংশ বিক্রয় করিয়া উহা সম্পন্ন হয়। এইভাবে 'সদস্যদের' বাহিরে অনেক 'অংশীদার' আছে। এই বোর্ডের হস্তে বাজারের আর্থিক কর্তৃত্ব নিয়োজিত হয়। এই বোর্ড বাজারের চাঁদা স্থির, গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজকর্ম দেখাশোনা এবং অংশীদারদের লভ্যাংশ ঘোষণা করিত।

(গ) দ্বিতীয়ত, শেয়ার বাজারের সাধারণ কাজকর্ম ত্রিশজন সভ্য দ্বারা গঠিত এক কমিটির উপর ন্যস্ত (Committee of 30 members of general purposes) হয়। এই কমিটির সভ্যদের বাজারের সদস্যরা প্রতি বৎসর নির্বাচন করিয়া থাকেন। এই কমিটি শেয়ার বাজারের আইন-কানুন প্রণয়ন, সদস্যদের আচরণ, কারবারের নীতি-নির্দেশ এবং বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি করিত।

(ঘ) ১৯৪৫ সালে উক্ত দ্বিধা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা একত্রিত হইয়া Council of Stock Exchange এর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। উক্ত Council বাজারের কার্য ও আর্থিক পরিচালনা করিয়া থাকে।

(ঙ) লণ্ডন শেয়ার বাজারের সদস্য-সংখ্যা প্রায় ৪,০০০। ইহা ছাড়া প্রায় ২,০০০ কেরাণী সদস্যদের কার্যের সহায়তা করিয়া থাকে।

(চ) এই বাজারে দুই প্রকারের সদস্য আছে : (১) **দালাল** (Broker) এবং (২) **প্রত্যক্ষ কারবারী** (Jobbers)। দালালের কাজ হইতেছে জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করিয়া 'প্রত্যক্ষ কারবারী'র পক্ষ হইয়া কাজকর্ম করা। 'প্রত্যক্ষ কারবারী' জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারেন না। যাহা কিছু ক্রয়-বিক্রয় উহা দালালের মারফতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। অধিকন্তু 'দালাল' সব রকম শেয়ারের কারবারে লিপ্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু 'প্রত্যক্ষ কারবারী' কোনও বিশেষ রকমের শেয়ারের কারবারে নিযুক্ত থাকেন।

(ছ) যখন কোন ব্যক্তি কোন শেয়ার কিনিতে বা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক তখন তাঁহাকে দালালের শরণাপন্ন হইতে হয়। দালাল উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে 'অর্ডার' লইয়া উহার মূল্য জানিবার জন্য যে 'প্রত্যক্ষ কারবারী' উক্ত শেয়ার লইয়া কারবার করেন, তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং প্রত্যক্ষ কারবারী দালালের প্রশ্নের উত্তরে ক্রয়-বিক্রয় উভয় মূল্যই (Double-barrelled price) উল্লেখ করিয়া থাকেন। যখন চুক্তি সম্পন্ন হয় তখন দালাল 'ক্রয় ও বিক্রয় লিপি' (Bought or Sold Contract Notes) প্রস্তুত করিয়া ক্রেতা বা বিক্রেতার নিকট পাঠাইয়া দেন। প্রত্যক্ষ কারবারীর লাভ ক্রয় ও বিক্রয়ের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে এবং উহাকে বলা হয় Turn of the market কিন্তু দালালের পাওনা দস্তুরী (Brokerage)।

(জ) লণ্ডনের বাজারে নগদ (Cash) এবং বাকী (Account) উভয় প্রকার লেন-দেনই চলিয়া থাকে। নগদ লেন-দেনের কারবার হইলে দিনের মধ্যে শেয়ার ও টাকা আদান-প্রদান করিয়া লেন-দেন কার্য সমাধা করিয়া ফেলিতে হয়। বাকী লেন-দেনের কারবারে এক পক্ষকাল বা কোন কোন ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহ সময় পাওয়া যায়। লেন-দেনের দায় নিষ্পত্তির প্রথম দিনকে বলা হয় Contango or Carry over Day. এই দিন উভয়পক্ষ শেয়ার ও টাকা আদান-প্রদান করিয়া চুক্তি সমাধা করিবেন কিনা স্থির করেন। দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় Ticket or Name Day. এই দিন উভয়পক্ষের নাম প্রকাশ করিবার দিন এবং 'দালাল' উভয়পক্ষের নাম একটি কাগজে লিখিয়া প্রত্যক্ষ কারবারীর নিকট পেশ করেন। তৃতীয় দিনকে বলা হয় Intermediate or making up day. তৃতীয় দিনে টাকা আদান-প্রদান না হইলে এই দিন প্রস্তুতির জন্য দেওয়া হয়। চতুর্থ এবং শেষ দিনকে বলা হয় Account or Pay Day. এই দিন শেয়ার-সংক্রান্ত দলিলপত্র এবং টাকা আদান-প্রদানের কাজ সমাধা করিতে হয়।

(৩) নিউইয়র্ক শেয়ার বাজার (New York Stock Exchange) :

(ক) নিউ ইয়র্ক শেয়ার বাজার Wall Street-এ অবস্থিত বলিয়া উহার নামও হইয়াছে Wall Street। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শেয়ার বাজার।

(খ) ইহা একটি স্বেচ্ছামূলক (Voluntary) প্রতিষ্ঠান এবং লণ্ডনের মত সুসংহত নহে

(গ) ইহার সদস্যসংখ্যা প্রায় ১,৪৭৫ জন। ৬০০ কারবারী প্রতিষ্ঠান, অনেক দালাল, কারবারী ও পুঁজিপতি এই বাজারের সদস্য। উহার সদস্যপদ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, অর্থশালী ও বিত্তবান এবং অত্যন্ত সাধু ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং এ বাজারের সদস্য হইতে হইলে বিশেষ গুণ থাকা চাই।

(ঘ) ইহা একটি 'গভর্ণিং কমিটি' দ্বারা পরিচালিত। উক্ত কমিটির নির্বাচিত সভ্যসংখ্যা ৪২ জন।

(ঙ) এই বাজারের একই সদস্য দালাল ও কারবারী হিসাবে কাজ করিতে পারেন। লণ্ডনের বাজারের মত দালাল ও প্রত্যক্ষ কারবারী পৃথক করা নাই। কিন্তু একই লেন-দেনে উভয় ভূমিকা গ্রহণ করা চলে না। দালাল হিসাবে কাজ করিলে 'দালালী' পাইবেন এবং কারবারী হিসাবে কাজ করিলে মুনাফা পাইবেন। তাই একই লেন-দেনে 'দালালী ও মুনাফা' উভয়ই ভোগ করার নিয়ম নাই।

(চ) একজন দালাল অপর এক দালালের মারফতই এই কাজ-কারবার করিতে পারেন। এরূপ অধীন দালাল (Under-broker)-কে Two Dollar-Broker বলা হয়। কারণ, তাঁহার দালালীর পরিমাণ প্রতি একশত শেয়ারে মাত্র দুই ডলার। যে সকল সদস্য নিজেদের হিসাবে কাজ-কারবার করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে বলা হয় Room Traders.

(ছ) সাধারণত প্রত্যেক লেন-দেন দৈনিক দায় নিষ্পত্তির ভিত্তিতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে ফটকা কারবারও কিছু কিছু চলে।

(জ) এখানে আমেরিকার 'স্টক ও শেয়ার'ই বেশী ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যান্য ঋণ-পত্রের কারবার মাঝে মাঝে চলে।

(ঝ) বাজারে কাজের সময় সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি নিয়ম পালন করা হয়। বাজারের কারবারের সময় বেলা ১০টা হইতে ৩টা পর্যন্ত। ঐ সময়ের বাহিরে কেহ কাজ-কারবার করিলে তাহাকে ৫০ ডলার জরিমানা দিতে হয়।

(৪) প্যারিস শেয়ার বাজার (Paris Stock Exchange) :

(ক) প্যারিস শেয়ার বাজারকে Bourse বলা হয়।

(খ) এই বাজার সরকার-নিয়ন্ত্রিত। ইহার দুইটি বিভাগও আছে। এক বিভাগ শেয়ার ও ঋণপত্রের এবং দ্বিতীয় বিভাগ পণ্যের।

(গ) লাইসেন্স প্রাপ্ত ৭০০ লোক এই বাজারের সদস্য। ইহারা দালাল, কারবারী এবং উভয়ই। যিনি 'দালাল ও কারবারী' এই উভয় ভূমিকায় কাজ করিতে চান তাঁহাকে ২৫,০০০ ফ্রাঙ্ক সরকারের নিকট জমা দিতে হয়। উক্ত জমা অর্থের উপর ৪% সুদ পাওয়া যায়। তিনি ইচ্ছা করিলে উক্ত অর্থসহ তাঁহার সদস্যপদ অন্য কাহাকেও

বিক্রয় করিতে পারেন। এই সকল দালাল এবং তাঁহাদের দ্বারা শেয়ারের মূল্যজ্ঞাপন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। আদালত সাধারণত ইহাদিগকে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য 'অছি' নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

(ঘ) এখানে নগদ, বাকী এবং অগ্রিম কারবার চলিয়া থাকে। শেয়ার ও ঋণপত্রের একটা নির্দিষ্ট মূল্যের কমে অগ্রিম কারবার চলে না। নগদ কারবারে এ সম্বন্ধে কোন কড়াকড়ি নাই।

লণ্ডন, কলিকাতা এবং বোম্বাই শেয়ার বাজারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা (Comparative Study among London, Calcutta and Bombay Stock Exchanges)

উক্ত তিনটি বাজারের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে :

(১) লণ্ডনের বাজারে দালাল ও প্রত্যক্ষ কারবারী এই দুই শ্রেণীর সদস্য আছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে এরূপ শ্রেণী-বিভাগ নাই।

(২) লণ্ডনের বাজারে শেয়ারের মূল্য অত্যধিক উঠা-নামা খুব কমই করিয়া থাকে। নগদ কারবার, পক্ষকালের মিয়াদে বাকী কারবার, দালাল ও প্রত্যক্ষ কারবারীর অস্তিত্ব, উভয়মুখী মূল্যজ্ঞাপন (Double-barrelled Price Quoting) প্রভৃতি অত্যধিক দর উঠা-নামা করার রক্ষাকবচ। কলিকাতায় যদিও নগদ কারবার চলিয়া থাকে তথাপি অগ্রিম কারবারের যে অনুমতি দেওয়া হয় এবং পার্থক্য (Difference) প্রদান করার যে রীতি প্রচলিত তাহাতে ফটকা কারবার রীতিমত চলিয়া থাকে। বোম্বাই বাজারে অগ্রিম ও ফটকা কারবারই প্রধান বৈশিষ্ট্য। এজন্য ইহা 'জুয়ার বাজার' (Gambling Market) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(৩) লণ্ডনের বাজারে সদস্য হওয়া সহজতর। এখানে গণতন্ত্রের নীতি প্রচলিত। এখানকার বাজারের কেরাণিগণ উহাদের মেধা, কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার বলে অধিক সুবিধাজনক শর্তে সদস্য হইতে পারেন। কলিকাতায় এরূপ কোন সুযোগ-সুবিধা নাই। বোম্বাই বাজারের কেরাণিগণ সদস্যগণকে শুধু সাহায্য করিতে পারেন।

(৪) লণ্ডনের বাজারে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এখানে দালালের সহিত প্রত্যক্ষ কারবারীর শেয়ারের দাম-দস্তর ঠিক হওয়ার পর ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম প্রকাশ করিতে হয় এবং কি মূল্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে তাহাও ক্রেতা ও বিক্রেতা জানিতে পারেন। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে এরূপ ব্যবস্থা নাই। সেখানে বাজারের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় উহা তাহাদের নিজেদের মধ্যে। ক্রেতা-বিক্রেতার সহিত দালালের পৃথক চুক্তি হয়। দালাল ইচ্ছা করিলে শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় মূল্য গোপন করিতে পারেন এবং বাহিরের লোকের নিকট হইতে বেশী টাকা আদায় করিতে পারেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ কারবারই কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে বেশী অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় শেয়ার বাজারগুলির ত্রুটি দূর করার ব্যবস্থা (Steps taken to remedy the defects of the Indian Stock Exchanges)

শেয়ার বাজারের গলদ যে দূর হওয়া উচিত প্রত্যেক জনহিতকর ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করিবেন। যাহাতে ফটকা কারবারের সুযোগ সুবিধা না থাকে, সুষ্ঠুভাবে শেয়ারের কাজ-কারবার চলিতে পারে, পরিচালন সমিতিগুলি সুষ্ঠু পরিচালন সম্বন্ধে সচেতন থাকে, বাজারের লেন-দেনের নিয়মাবলী ভালভাবে প্রস্তুত হয় এবং উহা যথাযথভাবে পালিত হয় সে সম্বন্ধে সরকার ও পরিচালক সমিতি অবহিত না হইলে কখনও শেয়ার বাজারের কাজকর্ম কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় এবং তজ্জন্য জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

শেয়ার বাজারের গলদ সম্বন্ধে ভারত সরকারের টনক নড়িলে ১৯৩৬ সালে এ সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান ও সুপারিশ করার জন্য ডা: পি. জি টমাসের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। উক্ত কমিটির নানাবিধ সুপারিশ ১৯৪৭ সালে প্রকাশ পায় এবং উক্ত কমিটি এজন্য National Investment Commission স্থাপনের পরামর্শ দেন। কিন্তু উক্ত সুপারিশ অনুযায়ী কোন কার্যই করা হয় না। পরে উক্ত সুপারিশ অনুযায়ী কোন কিছু করা যায় কি না তজ্জন্য ১৯৫১ সালে শ্রী এ. ডি গোরওয়ালার নেতৃত্বে আর একটি কমিটি গঠিত হয়। তাঁহাদের সুপারিশক্রমে ১৯৫৬ সালে The Securities Contracts (Regulation) Act পাস হয়। উক্ত আইন অনুসারে শেয়ার বাজারের যেরূপ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে নিম্নে সংক্ষেপে উহার কিছু উল্লেখ করা হইল :

(১) প্রত্যেক শেয়ার বাজারকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অনুমোদন সংগ্রহ করিতে হয়। অনুমোদন সংগ্রহ করিতে হইলে কতকগুলি শর্ত পালন করিতে হয়।

(২) শেয়ার বাজার পরিচালন ও উহার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের আছে। বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তার জন্যই এরূপ সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৩) সরকারের অনুমোদিত প্রত্যেক শেয়ার বাজারকে হিসাবপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি যথাযথভাবে রাখিতে হয় এবং গত ৫ বৎসরের পুরাতন হিসাবপত্রও নষ্ট না করিয়া রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়।

(৪) সরকার অনুমোদিত প্রত্যেক শেয়ার বাজারকে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্য পেশ করিতে হয়।

(৫) শেয়ার বাজারের আইন-কানুন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইতে হয়। প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত নিয়ম-কানুন রদ-বদল করিতে পারেন।

(৬) শেয়ার বাজারে 'ঐচ্ছিক' (Option) কারবার করা নিষেধ। 'অগ্রিম' (Forward) কারবারও সরকার ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিতে নির্দেশ দিতে পারেন।

(৭) সদস্যদের কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মকর্তা (Principal) হিসাবে কাজ করা নিষেধ।

(৮) কোন যৌথ কোম্পানী উহার 'শেয়ার' শেয়ার বাজারের তালিকায় উঠাইতে ইচ্ছুক হইলে কারণ না দর্শাইয়া উহা প্রত্যাখ্যান করা চলে না।

(৯) শেয়ার বাজারের কার্যকলাপ-সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিত প্রকাশ করিতে হয়।

(১০) শেয়ার বাজারের পরিচালকমণ্ডলীতে সরকারী প্রতিনিধি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি ও সরকার মনোনীত ব্যক্তিদের গ্রহণ করিতে হয়।

(১১) প্রয়োজন হইলে কোনও শেয়ার বাজারের কর্তৃত্ব সরকার নিজ হাতে তুলিয়া লইতে পারেন।

(১২) Stock Exchange Commission নামে একটি সংস্থা গঠিত হইয়াছে। উক্ত সংস্থা শেয়ার বাজারের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে।

(১৩) আইন অনুযায়ী কাজ-কারবার ঠিকমত না চলিলে সদস্যরা আইনত দণ্ডনীয় হন। এজন্য তাঁহাদের জরিমানা কিংবা এক বৎসর কারাদণ্ড কিংবা উভয়ই হইতে পারে।

উপরি-উক্ত আইন শেয়ার বাজারের অনেক গলদ দূর করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে উহা সর্বপ্রকার গলদ দূর করিতে পারিবে কিনা বলা কঠিন। কারণ, পরিচালনার ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকেই উক্ত আইন বেশী দৃষ্টি দিয়াছে। উহার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের দিকে ততটা দৃষ্টি দেয় নাই। শেয়ার বাজারে অগ্রিম, ভবিষ্যৎ, ফটকা প্রভৃতি অনেক প্রকার কাজ-কারবার চলিয়া থাকে। এই সমস্ত কাজ-কারবার ঠিকমত চালিত হইলে উহা অবশ্যই জনকল্যাণকর এবং উহা বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত হইবে না। কেবল উক্ত কাজ-কারবার যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে তাহাই বন্ধ করিতে হইবে। ('The reform of the Stock Market lies not in abolition of speculation lock, stock and barrel, but in correction of the unhealthy tendencies.')

শেয়ার বাজারের লগ্নিপত্রের দাম উঠা-নামার কারণ (Causes of fluctuations in prices of stocks and shares in the Stock Exchanges)

শেয়ারের দর উঠা-নামা অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম 'চাহিদা ও যোগানের' (Demand and Supply) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উহার দর বাড়ে এবং চাহিদা হ্রাস পাইলে উহার দর কমে। আবার চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী হইলে দর কমিবে এবং যোগান কম হইলে দর বাড়িবে। যে-যে কারণে

উক্ত চাহিদা ও যোগানের তারতম্য ঘটে এবং উহার ফলে শেয়ারের দর উঠা-নামা করে নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল :

(১) ফটকা কারবারী ও বিনিয়োগকারীর কার্যকলাপ (Activities of the Speculators and Investors) : শেয়ার বাজারে মন্দীওয়ালা (Bears) শেয়ার বিক্রয় করিতে থাকেন। ফলে শেয়ারের দর কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে তেজীওয়ালা (Bulls) ক্রমাগত শেয়ার কিনিতে থাকেন। তাহার ফলে শেয়ারের দাম বাড়ে। সেরূপ বিনিয়োগকারিগণ অধিক বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে দর বাড়িবে এবং বিনিয়োগে মন্দা দেখা দিলে শেয়ারের দর কমিবে।

(২) ঝুঁকিবাহকদের কার্যকলাপ (Activities of the Underwriters) : ঝুঁকিবাহকগণ যে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যে-কোনপ্রকারেই হউক উক্ত কোম্পানীর শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন। ফলে উক্ত শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(৩) ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী দ্বারা শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় (Buying and Selling of Shares and Securities by the Banks and Insurance Companies) : ইহারা তাহাদের নিকট গচ্ছিত ও সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের জন্য শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে শেয়ার ও ঋণপত্রের দর বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রে উহারা কম লাভের শেয়ার বিক্রয় করিয়া বেশী লাভের শেয়ার ক্রয় করিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলেও শেয়ার বাজারে দর উঠা-নামা করে।

(৪) ব্যাঙ্কের হার (Bank Rate) : কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হারে হুণ্ডি ভাঙ্গাইতে স্বীকৃত থাকে তাহাকে 'ব্যাঙ্কের হার' বলে। ব্যাঙ্কের হার বৃদ্ধি পাইলে বিনিয়োগ ব্যবস্থায় মন্দা দেখা দেয়। ফলে শেয়ারের দর কমে। আবার ব্যাঙ্কের হার কমিলে বিনিয়োগ ব্যবস্থায় তৎপরতা দৃষ্ট হয়। ইহার ফলে শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(৫) অতিরিক্ত উৎপাদন কিংবা সম্ভোগে মন্দা (Over-production or Under-consumption) : কোন কোম্পানীর পণ্য চাহিদার তুলনায় বেশী উৎপাদন হইলে এবং পণ্যের চাহিদা কমিয়া গেলে সেই কোম্পানীর শেয়ারের দরে মন্দা দেখা দেয়।

(৬) কোম্পানী বিশেষের উৎপাদন নীতি (Production Policy of a Particular Company) : যে কোম্পানীর পণ্য বাজারে বেশী আদৃত কিংবা একচেটিয়া, সে কোম্পানী উচ্চমূল্যে জিনিস বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে পণ্যের উৎপাদন হ্রাস ঘটিলেই উক্ত কোম্পানীর লভ্যাংশের হারও বৃদ্ধি পায়। ফলে কোম্পানীর শেয়ারের দরও বৃদ্ধি পায়। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অবশ্য এরূপ উৎপাদন হ্রাস-নীতি অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয় না।

(৭) কোম্পানীর সুনাম (Goodwill of the Company) : কোন কোম্পানীর বাজারে সুনাম বৃদ্ধি পাইলে উহার পণ্যের কাটতিও বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে লভ্যাংশের হারও বৃদ্ধি পায়। ফলে উহার শেয়ারের দরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুনাম হারাইতে থাকিলে উহার বিপরীত ফল ফলে।

(৮) ব্যবসা-বাণিজ্যের সাধারণ অবস্থা (The General Outlook of the Trade) : ব্যবসা-বাণিজ্যে 'বাজার গরম' (Boom) ভাব থাকিলে এবং ভবিষ্যতে 'বাজার গরম' হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে শেয়ারের দরেও বাজার গরম অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বাজারের অবস্থায় অতি মন্দা (Slump) ভাব সৃষ্টি হইলে শেয়ারের দরেও মন্দা ভাব উপস্থিত হয়।

(৯) সরকারের প্রতি আস্থা (Confidence in Government) : সরকারী ঋণপত্রের সুদ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে সরকারের প্রতি জনসাধারণের আস্থার অভাব ঘটিলে উক্ত ঋণপত্রের দর কমিতে থাকে। পক্ষান্তরে, সরকারের প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকিলে উহাতে জনসাধারণের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ফলে উহার দরও বৃদ্ধি পায়।

(১০) ঋণযোগ্য অর্থের অবস্থা (Position of Loanable Fund) : ঋণযোগ্য অর্থের যোগান প্রচুর থাকিলে উহার সুদের হার কমিয়া যায়। ফলে যে সমস্ত ঋণপত্র বা শেয়ারে সুদের হার নির্দিষ্ট তাহার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দরও বৃদ্ধি পায়। ঋণযোগ্য অর্থের যোগান কম হইলে সুদের হার বৃদ্ধি পায়। ফলে নির্দিষ্ট সুদের হারের শেয়ারে বা ঋণপত্রে বিনিয়োগ কমিয়া যায় এবং উহাদের দরও হ্রাস পায়।

(১১) বহির্বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত (Unfavourable Balance of Trade) : বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দিলে বৈদেশিক পাওনা মিটাইতে অনেক ক্ষেত্রে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় আরম্ভ হয়। এরূপ অবস্থায় শেয়ার ও ঋণপত্রের দর স্বভাবতই কমিয়া থাকে।

(১২) সাধারণ মূল্যস্তর (General Price Level) : মুদ্রাস্ফীতির জন্য কিংবা অন্য কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে শেয়ারের দরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মন্দার বাজারে উহার বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(১৩) যুদ্ধ-বিগ্রহ (War) : যুদ্ধের সময় নানাদিক দিয়া দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। উহার ফলে বিভিন্ন প্রকার শিল্পেরও প্রসার ঘটে। এজন্য শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়ও বৃদ্ধি পায়। জনসাধারণের হাতে টাকার পরিমাণও বৃদ্ধি পায় এবং উহার বিনিয়োগমাত্রাও বৃদ্ধি পায়। ফলে শেয়ারের দাম বাড়ে।

(১৪) সহানুভূতিসূচক উঠা-নামা (Sympathetic Fluctuations) : একই প্রকারের ঋণপত্র বা শেয়ারের সর্বত্রই প্রায় একপ্রকার বাজার দর দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোনও বাজারে কোন কারণে উহার দর বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইলে অন্য বাজারেও উহার প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং শেয়ারের দরের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

ইহা ছাড়া, আরও নানাপ্রকারে শেয়ারের দর উঠা-নামা করিতে পারে। তন্মধ্যে

বিদ্রোহ, ধর্মঘট, প্রতিযোগিতা, গুজব, নূতন করনীতি, সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য নীতি, অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থা, একত্রীকরণ, পরিচালনব্যবস্থায় পরিবর্তন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বিনিয়োগকারী ট্রাস্ট এবং ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট (Investment Trust and Unit Trust of India)

যে প্রতিষ্ঠান নিজস্ব শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে এবং উক্ত মূলধন বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়ে নিয়োগ করিয়া লভ্যাংশ ও সুদ উপার্জন করে উহাকে বিনিয়োগকারী ট্রাস্ট (Investment Trust) বলে। ইহা সার্বজনিক কোম্পানীর আকারে গঠিত হইয়া থাকে। লগ্নিপত্রে টাকা বিনিয়োগ ছাড়া ইহা কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের দায়ও গ্রহণ করে এবং সুযোগ-সুবিধামত লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয়ও করিয়া থাকে। দেশের স্বল্প-আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঞ্চিত অর্থ লাভজনক উপায়ে লগ্নি করার পক্ষে এরূপ ট্রাস্ট বিশেষ উপযোগী। কারণ এরূপ ব্যক্তিগণের পক্ষে বিনিয়োগ ক্ষেত্রের ভাল-মন্দ বিচার করা কঠিন ব্যাপার এবং ঝুঁকির ব্যাপার। পক্ষান্তরে এরূপ ট্রাস্ট এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের কাজ করিয়া থাকে। সুতরাং সঞ্চিত অর্থ সরাসরি বিনিয়োগ না করিয়া ট্রাস্টের শেয়ার ক্রয় করিলে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। টাটা ইন্‌ভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট, জে. কে. ইন্‌ভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট, হিন্দুস্থান ইন্‌ভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড প্রভৃতি এই জাতীয় ট্রাস্ট।

বিনিয়োগকারী ট্রাস্ট বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। তন্মধ্যে ব্যবস্থাপনা ট্রাস্ট এবং ইউনিট ট্রাস্ট উল্লেখযোগ্য। ব্যবস্থাপনা ট্রাস্ট বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয় করিয়া থাকে এবং উহার পরিচালকমণ্ডলী লগ্নিক্ষেত্র নির্বাচন ও পরিবর্তন ব্যাপারে পূর্ণক্ষমতা ভোগ করে। এজন্য ইহা পরিবর্তনশীল ট্রাস্ট (Flexible Trust) এবং বিনিয়োগকারী কোম্পানী (Investment Company) নামেও পরিচিত। ইউনিট ট্রাস্ট কয়েকটি নির্দিষ্ট শেয়ার ও ঋণপত্রে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া থাকে। এজন্য ইহাকে নির্দিষ্ট লগ্নির ট্রাস্ট (Fixed Trust)-ও আখ্যা দেওয়া হয়। অন্যান্য ব্যাপারে উভয় প্রকার ট্রাস্টের কার্যের ধারা প্রায় একইরূপ।

১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর ভারতীয় আইনসভার এক আইনের বলে ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া (Unit Trust of India) স্থাপিত হয়। ১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই হইতে ইহা কার্য আরম্ভ করে। ৯ জন সদস্য লইয়া গঠিত বোর্ড ইহার কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। ৫ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া ইহা কাজ আরম্ভ করিয়াছে। এই মূলধনের যোগান দিয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২½ কোটি টাকা, জীবনবীমা কর্পোরেশন ৭৫ লক্ষ টাকা, কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫ লক্ষ টাকা, তপশীলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ১ কোটি টাকা। ইহার কার্যাবলী নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(ক) ট্রাস্টের প্রধান কাজ ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের নিকট ইহার 'ইউনিট' (Unit) বিক্রয় করা। এইভাবে যে অর্থ সংগৃহীত হয় উক্ত অর্থ নির্বাচিত (Selected) প্রতিষ্ঠানে বা কারবারে বিনিয়োগ করা হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'ইউনিটের' অভিহিত মূল্য (Face Value) ১০ টাকার কম এবং ১০০ টাকার বেশী না হয় এরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছে। এইভাবে কোটি টাকার অর্থ সংগ্রহ এবং উহা লগ্নি করা ইহার কাজ ও লক্ষ্য।

(খ) উক্ত সংগৃহীত অর্থ লগ্নিপত্রে এরূপভাবে বিনিয়োগ করার নিয়ম যাহাতে গড়ে ছয় শতাংশের অধিক আয় হয়।

(গ) স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এবং অপর ৩৬টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও উহাদের শাখা মারফত 'ইউনিট' বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(ঘ) প্রতি আর্থিক বৎসরের শেষে ব্যয় বাদে যে লভ্যাংশ থাকে উহার শতকরা ৯০ ভাগ 'ইউনিট' ক্রেতাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ক্রেতাকে অবশ্য 'ইউনিট' হইতে আয়ের ১০০০ টাকা পর্যন্ত আয়কর দিতে হয় না। ইহাকে আয়কর না কাটিয়া লভ্যাংশ বণ্টন করিতে হয়।

(ঙ) ইহাকে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যবিশিষ্ট 'ইউনিট' বিক্রয়ের ও প্রত্যর্পণের দৈনন্দিন মূল্য নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে হয়।

(চ) ইহা ক্রেতার নিকট হইতে 'ইউনিট' ফেরত লইয়া মূল্যও প্রত্যর্পণ করিয়া থাকে। 'ইউনিট' জামিন রাখিয়া ইহা ধারও দিয়া থাকে।

(ছ) ইহাকে ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ 'ইউনিট' ক্রেতাদের মধ্যে বিলিযোগ্য আয়ের পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়।

(জ) ইহা যে কোম্পানীতে টাকা লগ্নি করিবে লগ্নিযোগ্য মোট তহবিলের উহা শতকরা ৫ ভাগের বেশী হইবে না।

(ঝ) ক্রমবর্ধমান শিল্পোন্নয়নের ফলে যে সমৃদ্ধি দেখা দিতেছে তাহাতে স্বল্প ও বৃহৎ লগ্নিকারী উভয়ই যাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে এবং সামান্যতম ঝুঁকি লইয়া উপযুক্ত লাভ পাইতে পারে সেইদিকে কার্যধারা প্রবাহিত করাই এরূপ ট্রাস্ট গঠনের উদ্দেশ্য।

(ঞ) আমাদের দেশে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আবার এই স্বল্প সঞ্চয়ের উপযুক্তক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুবিধা নাই। ফলে উক্ত সঞ্চয়ের একটা অংশ বিশেষত স্বল্প সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয় অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয়িত হইয়া পড়ে অথচ ইহাদের সংখ্যা বা মোট সঞ্চয় মোটেই নগণ্য নহে। ইহাদের ব্যক্তিগত স্বল্প সঞ্চয় বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন লাভজনক প্রতিষ্ঠানে লগ্নি করা কখনই সম্ভব হয় না। ফলে ইহাদের সঞ্চয় একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ হইতে বাধ্য হয়। ইহাতে ঝুঁকি ও বিপদ দুই-ই থাকে। ইউনিট ট্রাস্টের কাজ ইউনিট বিক্রয় করিয়া উহাদের সঞ্চয় একত্রিত করা এবং বিভিন্ন লাভজনক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা। ভারতীয় মূলধন

বাজারে (Indian Capital Market) ইউনিট ট্রাস্টের এই বিশেষ অবদান উল্লেখযোগ্য। এইভাবে ইহা মূলধন বাজারকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেছে।

বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক (Investment Banks)

বিনিয়োগ ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া যাইতে পারে :

যে সকল ব্যাঙ্ক নিজের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে এবং জনসাধারণের নিকট হইতে দীর্ঘ-মিয়াদী আমানত গ্রহণ করে তাহাদিগকে বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক আখ্যা দেওয়া হয়। ইহাদিগকে অন্য কথায় ফিনান্স কোম্পানী (Finance Company) এবং শিল্পীয় ব্যাঙ্ক (Industrial Bank)-ও বলা চলে। ইহারা যৌথ কারবারের ভিত্তিতে গঠিত। এই দীর্ঘ মেয়াদী আমানত গ্রহণের উদ্দেশ্য শিল্প-বাণিজ্যে দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ দেওয়া। এই ব্যাঙ্ক একমাত্র আমানতের উপর নির্ভর না করিয়া মূলধন হইতেও ঋণের একটা মোটা অংশ সরবরাহ করিতে পারে। শিল্প-বাণিজ্যে দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণদান ছাড়া ইহারা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায়গ্রাহকের (Underwriters) কাজও করিয়া থাকে। এইভাবে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারেও ইহারা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার এবং পুরাতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নূতন শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করা এবং দীর্ঘ-মিয়াদী বন্ধকী-ঋণ (Mortgage Loan)-ও এই ব্যাঙ্কগুলি দিয়া থাকে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের লগ্নি বিষয়ে পরামর্শদাতা হিসাবেও ইহারা কাজ করিয়া থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই জাতীয় ব্যাঙ্ক শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। ভারতে এই জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা স্বদেশী আন্দোলন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিশেষ দেখা দেয়। কিন্তু পরিচালনার নানাবিধ ত্রুটির জন্য উহা বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। শিল্পে মূলধনের এবং বিশেষজ্ঞের অভাব বিশেষ অনুভূত হওয়ায় ভারত সরকার উহাদের অনুরূপ কয়েকটি দীর্ঘ ও মাঝারি-মিয়াদী ঋণদান-সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন।

বাস্তুনির্মাণ সমিতি (Building Societies)

বাস্তুনির্মাণ সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া যাইতে পারে :

ইহারা যৌথ কারবারের ভিত্তিতে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান। ইহারা নিজেদের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে এবং উক্ত মূলধনের সাহায্যে জমি ক্রয়, বাড়ী তৈয়ারী, রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়া থাকে এবং উক্ত বাড়ীগুলি সহজ কিস্তিতে স্বল্পবিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট বিক্রয় করে। ইহারা নিজেদের মূলধন ছাড়া দীর্ঘ-মিয়াদী আমানতও গ্রহণ করে। উভয়বিধ অর্থই গৃহনির্মাণে বিনিয়োগ হইয়া থাকে। ক্রেতাদের সুবিধা-অসুবিধা, প্রয়োজনীয়তা, আর্থিক সঙ্গতি প্রভৃতি বিচার-বিবেচনা করিয়া ইহারা বিভিন্ন ধরনের ও মূল্যের গৃহাদি নির্মাণ করিয়া থাকে। বাড়ীর মূল্য

নির্ধারণে উহার ব্যয় এবং টাকার উপর সুদ উভয়ই ধরা হয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্প প্রসার, শহরাঞ্চলের বিস্তার প্রভৃতির ফলে গৃহের চাহিদা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। সকলের পক্ষে গৃহ নির্মাণ করিয়া বসবাস করা সম্ভব হয় না। স্বল্প আয়ের ব্যক্তিগণ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বসবাস করিয়া কেবল ভাড়ার টাকাই দিয়া যায়, উহার সুফল কিছুই পায় না। ইহাদের পক্ষে ভাড়ার মত কিস্তিতে বাড়ী ক্রয় করার সুবিধা পাইলে বাড়ীর অভাব দূর হইয়া যায়। বাস্তুনির্মাণ সমিতি এই সুবিধা দিয়া থাকে। ইহারা ১৫।২০ বৎসরের কিস্তিতে বাড়ী বিক্রয় করিয়া থাকে। যিনি এইভাবে বাড়ী ক্রয় করেন তিনি কিস্তির টাকা পরিশোধ করিলে উক্ত বাড়ীর মালিক হন। সর্বশেষ কিস্তি না দেওয়া পর্যন্ত অবশ্য এ অধিকার জন্মায় না। সুতরাং আর্থিক সঙ্গতির অভাবে যাঁহাদের পক্ষে নিজস্ব বাড়ী তৈয়ারী করা সম্ভব হইত না তাঁহারা এই সমিতির কল্যাণে উহা সম্ভব করিতে পারিতেছেন। এরূপ সমিতিতে টাকা বিনিয়োগ করাও লাভজনক।

কয়েকটি সরকারী ও আধা-সরকারী অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান (Some of the Government and Semi-Government Financial Institutions)

প্রয়োজনীয় মূলধন ভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উপযুক্ত মূলধনের অভাব বহুদিন হইতেই বোধ করিয়া আসিতেছে। এখানে ব্যক্তিগত মূলধনের পরিমাণ খুবই কম। 'বাণিজ্য ব্যাঙ্ক' শিল্পক্ষেত্রে দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ দিতে পারে না। উপযুক্ত সংখ্যক 'শিল্প ব্যাঙ্ক'ও গড়িয়া উঠে নাই। 'রাষ্ট্রীয় শিল্প সাহায্য আইন' (State Aid to Industries Act)-ও শিল্পোন্নয়নের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। এজন্য দেশের মধ্যে আশানুরূপ শিল্পোন্নতি সম্ভব হয় নাই। পূর্বে যে কয়েকটি ভাল ভাল বৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের অধিকাংশ বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যেই গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। আমাদের দেশের বাণিজ্য ব্যাঙ্ক, ম্যানেজিং এজেন্ট, বৈদেশিক মূলধন, সরকারী সাহায্য, মহাজন, সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতির চেষ্টায় এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিল্পে যে মূলধন সংস্থানের অকিঞ্চিৎকর ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহা ভিন্ন কয়েকটি ঋণদান সংস্থা সরকারী চেষ্টায় স্থাপন করা হইয়াছে। এই সংস্থাগুলিকে এক কথায় **Non-Bank Financial Intermediary** বলা চলে। ইহারা সাধারণভাবে ব্যাঙ্কের কাজ-কারবারে লিপ্ত থাকে না। বরং ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী, সরকার প্রভৃতির নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহ করে এবং শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনমত ঋণ দিয়া থাকে। এইভাবে ইহারা মধ্যগ (Intermediary) হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। ফলে উক্ত সংস্থাগুলি নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার জন্য এবং পুরাতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বৃহদায়তন ও আধুনিক করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ

ঋণ হিসাবে সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নে উক্ত ঋণদান সংস্থার কয়েকটির পরিচয় প্রদত্ত হইল।

(ক) ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন (Industrial Finance Corporation): ইহা ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা এবং উক্ত মূলধনের টাকা সংগ্রহের জন্য ইহার শেয়ার বিক্রয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, শিডিউল্ড ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন ও কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ভারত সরকারের মধ্যে সাধারণত সীমাবদ্ধ। উপযুক্ত যৌথ কোম্পানী, অংশীদারী কারবার এবং অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘ মিয়াদী ঋণ ও অগ্রিম অর্থপ্রদান, ঋণপত্র ক্রয় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঋণের জামিন হওয়া ইহার প্রধান কাজ। বলা বাহুল্য, বৃহৎ শিল্প, ভিত্তিমূলক বা জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে উপরি-উক্ত অর্থ সাহায্য করা ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

(খ) স্টেট্ ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন (State Financial Corporation): ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করিবে এরূপ আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা বৃহদাকার শিল্পেরই প্রয়োজন মিটাইতে পারিতেছিল না। এজন্য স্টেট্ ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন গঠন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে স্টেট্ ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন আইন পাস করিয়া সকল রাজ্যে এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। ইহার পর হইতে বিভিন্ন রাজ্যে এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে থাকে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ২ কোটি টাকা মূলধন লইয়া পশ্চিমবঙ্গে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের মূলধনের শতকরা ২৫ ভাগ জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হয়। অবশিষ্ট মূলধন রাজ্য সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, শিডিউল্ড ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতির নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগৃহীত হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য করা ইহার কাজ।

(গ) ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইন্‌ভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন (Industrial Credit and Investment Corporation): বিশ্বব্যাঙ্ক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের চেষ্টায় ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া এই সংস্থা গঠিত হয়। ইহার আদায়ীকৃত মূলধন ৫ কোটি টাকার মধ্যে ২ কোটি টাকা ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী, ১ কোটি টাকা বৃটিশ ও কমনওয়েলথ ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী, ৫০ লক্ষ টাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও অধিবাসী এবং বাকী ১½ কোটি টাকা ভারতীয় জনসাধারণের নিকট হইতে আদায় হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইহার কার্যকরী মূলধনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ৭½ কোটি টাকা, বিশ্বব্যাঙ্ক ৫ কোটি টাকা এবং ভারত সরকার ৫ কোটি টাকা জমা রাখিয়াছেন। এই সংস্থা

বে-সরকারী নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাথমিক মূলধন সরবরাহ করিবে এবং যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান মূলধনের অভাবে উন্নত ও প্রসারিত হইতে পারিতেছে না তাহাদিগকে এজন্য আর্থিক সাহায্য এবং প্রয়োজনবোধে কারিগরি সাহায্য প্রদান করিবে।

(ঘ) ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ডেভেলপ্‌মেণ্ট কর্পোরেশন (National Industrial Development Corporation) : ইহা ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে। ইহা একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ভারত সরকারই ইহার মূলধন সরবরাহ করিতেছে। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। যে সমস্ত বে-সরকারী শিল্প উন্নত হইতে ও মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা অর্জন করিতে পারিতেছে না এবং বে-সরকারী উদ্যোগ বেশী কার্যকরী নহে, উহাদের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়া ও অর্থসাহায্য করিয়া উহাদিগকে মুনাফা অর্জনের উপযোগী করার কাজ এই সংস্থার উপর। মুনাফা অর্জনের ক্ষমতালাভ করার পর এই সংস্থা উহার পরিচালনভার আর বহন করিবে না। ইহার এরূপ কাজ সাধারণত বৃহদায়তন ও ভারি শিল্পের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ যদিও ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য করায় ইহার কোন বাধা নাই।

(ঙ) ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন (National Small Industries Corporation) : ইহার অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা এবং সরকারই উহা সরবরাহ করে। যে সমস্ত শিল্পের মূলধন ৭½ লক্ষ টাকার বেশী নহে, কর্মচারীর সংখ্যা শক্তি ব্যবহার করিলে ৫০ জনের কম এবং শক্তি ব্যবহার না করিলে ১০০ জনের কম সেই সমস্ত শিল্পকে উন্নত করা ইহার প্রধান কাজ। ইহার অন্যতম কাজ—যে সমস্ত শিল্প বৃহৎ শিল্পের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে উহাদের সহিত বৃহৎ শিল্পের সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা যাহার ফলে এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বৃহৎ শিল্পগুলির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যোগান দিতে পারে। এই সংস্থা এরূপ ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে অর্থ, কারিগরি ও পণ্য বিক্রয় ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করে। ইহা ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

(চ) রি-ফিনান্স কর্পোরেশন (Re-finance Corporation) : ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ছিল ২৫ কোটি টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কর্পোরেশন প্রভৃতির মধ্যে ইহার ১২½ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রয় হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর ইহার চেয়ারম্যান। কোন ব্যাঙ্ক মাঝারি আয়তনের বে-সরকারী যে-সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে নাতিদীর্ঘকালের জন্য ঋণ প্রদান করিবে, উক্ত ব্যাঙ্ককে উক্ত পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসাবে সাহায্য করা ইহার কাজ। সরাসরি কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে এই সংস্থা কোন ঋণ দিবে না। এই সংস্থা কর্তৃক ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত অর্থসাহায্যের জন্য ব্যাঙ্কই দায়ী থাকিবে এবং কোন্ প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া উচিত তাহাও ব্যাঙ্কই স্থির করিবে। ইহা এখন শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

(ছ) ইণ্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন (International Finance Corporation) : ইহা ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি ডলার। ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ইহাতে মূলধনের কতকটা যোগান দিয়াছে। এই সংস্থা উহার সভ্যদিগের মধ্যে অনুন্নত দেশগুলির বে-সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নত হইতে সাহায্য করে।

(জ) ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (The Industrial Development Bank of India) : এই ব্যাঙ্কের কাজ ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ৫০ কোটি টাকা এবং বিলিকৃত মূলধন ১০ কোটি টাকা। ইহার পরিচালনার ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত। অন্যান্য ঋণদান-সংস্থা বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যে দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ দিয়া থাকে তাহার মধ্যে ৩ হইতে ২৫ বৎসরে পরিশোধ্য মূলধন পুনঃ সরবরাহ (Re-finance) করা এই ব্যাঙ্কের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, স্টক প্রভৃতি ক্রয় করা ও ঋণের জামিনদার (Guarantor) হওয়া ইহার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজ।

উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মূলধনের সংস্থান ঘটাইতেছে এবং অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইতে চেষ্টা করিতেছে।

টাকার বাজার (Money Market)

টাকার বাজার এবং ভারতীয় টাকার বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Money Market and characteristics or chief features of the Indian Money Market)

যে-যে উৎস হইতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় স্বল্প-মিয়াদী ঋণ পাওয়া যায় উহাদিগকে একত্রে টাকার বাজার আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং স্বল্প-মিয়াদী ঋণ আদান-প্রদানই প্রধানত এ বাজারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ভারতীয় টাকার বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। ভারতীয় টাকার বাজার প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত—সুসংগঠিত এবং অসংগঠিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক, ভারতীয় যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক, জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যাঙ্ক প্রভৃতি লইয়া সুসংগঠিত বাজার গঠিত। আর মহাজন, সাহুকর, শ্রফ, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি লইয়া অসংগঠিত বাজার। ইহাদিগকে এক কথায় দেশীয় ব্যাঙ্ক (Indigenous Banks) বলা হয়। সুসংগঠিত বাজারের ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন। আর অসংগঠিত বাজারের দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। ফলে এতদ্ উভয় বাজারের বিভিন্ন অংশ বা উপাদানের মধ্যে কোন সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

২। ভারতের টাকার বাজারের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা বা ব্যাঙ্কের সংখ্যা দেশের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। ভারতে প্রায় ৮৬,০০০ জনপ্রতি একটি করিয়া ব্যাঙ্ক, কিন্তু

ইংলণ্ডে সে তুলনায় প্রায় ৪,৮০০ জনপ্রতি একটি করিয়া ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কে ভারতের জনপ্রতি আমানতের পরিমাণও খুব কম। মাত্র ৫২ টাকা।

৩। ইহার টাকার বাজারের বা ব্যাঙ্কের উন্নতি বা প্রসার অধিকাংশ শহরাঞ্চলে। ইহার ফলে গ্রামের প্রয়োজন মোটেই মিটিতেছে না। স্টেট্ ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি অবশ্য বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছে কিন্তু উহার সন্তোষজনক ফল এখনও পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয় নাই।

৪। সুসংগঠিত এবং অসংগঠিত দুই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক থাকায় সুদের হার এক প্রকার হইতে পারে নাই। ফলে বিভিন্ন সুদের হারে টাকা-পয়সা লেন-দেন হইয়া থাকে।

৫। ভারতে এখনও সুসংগঠিতভাবে বিল বাজার (Bill Market) গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অবশ্য এই বিল বাজার গঠনে যত্নবান হইয়াছে কিন্তু উহা আশানুরূপ ফল দিতে পারে নাই।

৬। ইংলণ্ড বা আমেরিকার মত ভারতে টাকার বাজার কেন্দ্রীভূত নহে। ভারতের টাকার বাজারের মধ্যে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া এই বাজার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া রহিয়াছে। দেশের বিশাল আয়তন, পরিবহন ও অর্থ প্রেরণের অসুবিধার জন্য টাকার বাজার কেন্দ্রীভূত হইতে পারে নাই। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে সুদের হারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। ভারতীয় টাকার বাজারে বিদেশী প্রভাবও কম নয়। বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির প্রভাব এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা বৈদেশিক বাণিজ্যে একপ্রকার একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করিয়া আছে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতেও ইহারা ছাড়ে নাই।

৮। ভারতীয় টাকার বাজারের সুসংবদ্ধ ব্যাপক প্রসার না হওয়ায় ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক সম্বল প্রয়োজনের তুলনায় কম। এজন্য ব্যাঙ্কের রি-ডিস্কাউণ্টযোগ্য সম্পত্তি (Re-discountable assets) খুব কম। ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট রি-ডিস্কাউণ্ট (Re-discount) করার সুবিধা গ্রহণ করার অসুবিধা দেখা দেয়।

সুতরাং ভারতীয় টাকার বাজারের উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিলে টাকার বাজার হিসাবে ইহার নানাবিধ ত্রুটিই দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ সুসংগঠিত ও সম্প্রসারণশীল টাকার বাজার ভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন নানাভাবেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। এজন্য দেশের উন্নতির জন্য টাকার বাজার সর্বতোভাবে সুসংবদ্ধ হওয়া উচিত। ইহা ছাড়া বিশেষ ধরনের ঋণদান ব্যাপারে পারদর্শী উপবাজার (sub-markets) যেমন, বাণিজ্য বিল বাজার, ট্রেজারী বিল বাজার, তলবমাত্র ঋণের বাজার প্রভৃতি সৃষ্টি হওয়া উচিত। আর বৈদেশিক প্রভাব যাহাতে অতিমাত্রায় প্রাধান্য বিস্তার না করিতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

ভারতীয় টাকার বাজারের প্রধান সদস্যদের বিবরণ (Account of the chief constituents of the Indian Money Market)

ভারতীয় টাকার বাজার নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া গঠিত। উহারা শিল্প-বাণিজ্যে ঋণদান করিয়া থাকে।

১। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank of India) : ব্যাঙ্ক-ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল ব্যাঙ্কের শীর্ষস্থানে যে ব্যাঙ্ক অবস্থিত থাকে উহাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank)। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ইহার উপর ভারতীয় টাকার বাজারের নিয়ন্ত্রণ-ভার ন্যস্ত। এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের আর্থিক অবস্থা এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবসাকে এমনভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিকমত চলে এবং মূলত দেশের আর্থিক উন্নতির অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ইহা দেশীয় মুদ্রা প্রচলন ও প্রচারের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব পালন করে, মুদ্রা মূল্য এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থির রাখে, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কার্যাবলী ও ঋণ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং এক কথায় বলিতে গেলে ইহা দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কের বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক (Friend, Philosopher and Guide) হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

২। ভারতের স্টেট ব্যাঙ্ক (State Bank of India) : ইহা অন্যান্য যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কের মত কাজ-কারবার করিয়া থাকে। তবে বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ইহাকে সরকারী আইনের বলে বিধিবদ্ধ ব্যাঙ্ক হিসাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা অবশ্য রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক। গ্রামাঞ্চলে ঋণ ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসার প্রসার ঘটানই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এজন্য ইহার বহু শাখা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছে। ফলে গ্রামের লোকদের এবং কৃষকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়ার সুবিধা হইয়াছে। যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই অথচ ইহার শাখা আছে তথায় ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবেও কাজ করিয়া থাকে।

৩। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (Commercial Banks) : ইহারা দুই শ্রেণীর—তপসিলভুক্ত (Scheduled) এবং অ-তপসিলভুক্ত (Non-scheduled)। যে সকল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত তাহাদিগকে তপসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক বলে। এই তালিকাভুক্ত হইতে হইলে ইহার আদায়ীকৃত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। তালিকাভুক্ত হওয়ার পর ইহাকে চলতি আমানতের (Demand Liabilities) এবং স্থায়ী আমানতের (Time Liabilities) শতকরা ৩ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হয়। বাকী ব্যাঙ্কগুলি অ-তপসিলভুক্ত। কিন্তু এতদ্ উভয়ের কার্যাবলী একই প্রকার। জনসাধারণের নিকট হইতে ইহারা আমানত গ্রহণ এবং শিল্প-বাণিজ্যে স্বল্পমিয়াদী ঋণ দান করিয়া থাকে। সংক্ষেপে ইহাদের কার্যাবলী এইভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তপসিলভুক্ত বৃহদাকারের ১৪টি ব্যাঙ্ক এখন

রাষ্ট্রায়ত্ত। ইহাদের বিশেষ কাজ—রপ্তানী সম্প্রসারণ, কৃষি উন্নয়ন ও ছোট শিল্পগুলির উন্নয়ন ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা।

৪। **বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Banks) :** এরূপ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত আমানত গ্রহণ ও ঋণ-দান ব্যবসা করিয়া থাকে। তবে ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা বৈদেশিক কারবারের লেন-দেন ব্যাপারেই বেশী লিপ্ত থাকে। বাণিজ্যিক হুণ্ডি, বৈদেশিক মুদ্রা প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ যোগান দেওয়াই ইহার প্রধান কাজ। ইহা সাধারণত রপ্তানীকারকের নিকট হইতে বাণিজ্য-হুণ্ডি ক্রয় করে, উহা অপর কোন ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করে কিংবা আমদানীকারকের নিকট হইতে উহার নিজস্ব প্রতিনিধি বা শাখা ব্যাঙ্ক মারফত হুণ্ডির টাকা আদায় করিয়া থাকে। হুণ্ডি ক্রয়ের সময় উহা যে বাটা (Discount) কাটিয়া লয় উহাই এই ব্যাঙ্কের প্রধান আয়। অগ্রিম কারবারেও (Forward Contract) ইহারা টাকা লেন-দেনের ব্যবসা করিয়া থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কও এসব কারবার করিতে পারে। কিন্তু ভারতে যে সব বিদেশী বিনিময় ব্যাঙ্ক আছে উহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, আর্থিক সঙ্গতি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত উহাদের যোগাযোগ এবং সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধা এত বেশী যে, ভারতীয় দেশীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি উহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ইহাদের একচেটিয়া কারবার দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উহারা ঐ নামেই পরিচিত।

৫। **শিল্প ব্যাঙ্ক (Industrial Banks) :** ইহারা শিল্পপ্রচেষ্টায় দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ দিয়া থাকে বলিয়া উহাদের ঐ প্রকার নামকরণ হইয়াছে। ইহারা দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ দিয়া থাকে বলিয়া ইহারা দীর্ঘ-মিয়াদী আমানতও গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া ইহাদের মূলধন যোগানও যথেষ্ট। এজন্য একমাত্র আমানতের উপর নির্ভর না করিয়া মূলধন হইতেই ইহারা ঋণের মোটা অংশ সরবরাহ করিতে পারে। আমাদের দেশে এরূপ ব্যাঙ্ক খুব কম। বর্তমানে এরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে সরকার পক্ষ হইতেই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। কারণ, এরূপ ব্যাঙ্ক ব্যতীত দেশের মধ্যে আশানুরূপ শিল্পপ্রসার সম্ভব নহে। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স করপোরেশন, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট করপোরেশন, স্টেট ফিনান্সিয়াল করপোরেশন প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৬। **কৃষি ব্যাঙ্ক (Agricultural Banks) :** এই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ কৃষকদিগকে অল্প সুদে ঋণ দান করা, উহাদিগকে উক্ত ঋণ পরিশোধে সাহায্য করা এবং কৃষক ঋণগ্রস্ত থাকিলে উক্ত ঋণভার হইতে যাহাতে সে ধীরে ধীরে মুক্ত হইতে পারে তজ্জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা। আমাদের দেশের কৃষককুল ঋণের বোঝা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, ঋণভার লইয়া জীবন অতিবাহিত করে এবং ঋণভার সন্তানদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে (born in debt, live in

debt and die in debt)। তাহাদের এইভাবে ঋণগ্রস্ত হওয়ার প্রধান কারণ তাহারা মহাজনদের নিকট হইতে অত্যধিক চড়া সুদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হয়, নিজেদের ফসলের উপযুক্ত মূল্য পায় না এবং এজন্য উক্ত ধার বা ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারে না। সুতরাং কৃষকদের দুরবস্থা হইতে রক্ষা একমাত্র কৃষি ব্যাঙ্কই করিতে পারে। আমাদের দেশে এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা খুব কম। সমবায় ব্যাঙ্কগুলি অনেক ক্ষেত্রে কৃষি ব্যাঙ্কের কাজ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা কম এবং কৃষকদের জমির উন্নতি, ফসল উৎপাদনের জন্য লাঙ্গল, বলদ, বীজ, সার প্রভৃতি ক্রয় করার বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইতে সম্পূর্ণ অক্ষম। সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে এদিকে পড়ায় ইদানীং অনেক স্থলে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপরও এই দায়িত্বভার দেওয়া হইয়াছে।

৭। **সমবায় ব্যাঙ্ক (Co-operative Banks) :** এরূপ ব্যাঙ্ক কৃষকদিগকে স্বল্প-মিয়াদী ঋণ দিয়া থাকে। ইহারা ইহাদের সদস্য ও গ্রামের জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে, সেন্ট্রাল কোপারেটিভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে এবং উক্ত টাকা কৃষকদিগকে স্বল্পসুদে ধার দিয়া থাকে। শহর ও পল্লী উভয় স্থানেই এরূপ ব্যাঙ্ক উক্ত অঞ্চলের জনসাধারণকে লইয়া গঠিত হইতে পারে। ইহাতে মধ্যবিত্ত লোক, কৃষক, শিল্পী প্রভৃতি নানাশ্রেণীর লোক উপকৃত হইতে পারে। এরূপ ব্যাঙ্ক উহার আদর্শ অনুযায়ী ঠিকভাবে পরিচালিত হইলে জনসাধারণের মধ্যে মিতব্যয়িতা, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা, সহানুভূতিবোধ, আত্মপ্রত্যয়, শৃঙ্খলাবোধ, বিশ্বাস প্রভৃতি জাগাইয়া তুলিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে উক্ত ব্যাঙ্কগুলি ঠিকভাবে পরিচালিত না হওয়ায় ইহার সুফল বিশেষ পাওয়া যাইতেছে না।

৮। **ভূমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Banks) :** ভূমি বা জমি বন্ধক রাখিয়া জমির উন্নতির দ্বারা অধিক ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষকদিগকে দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ দেওয়াই এই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। ইহারা জনসাধারণের নিকট হইতে দীর্ঘ-মিয়াদী আমানত গ্রহণ করে, সরকারের নিকট ঋণপত্র বিক্রয় করে, অংশীদারদের নিকট হইতে মূলধন বাবদ শেয়ারের টাকা পায় এবং এইভাবে সংগৃহীত অর্থ কৃষকদিগকে দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ দিতে সাহায্য করে। সমবায় ব্যাঙ্ক স্বল্প-মিয়াদী আমানত গ্রহণ করে। সেজন্য এই ব্যাঙ্কের পক্ষে স্বল্প-মিয়াদী ঋণ ভিন্ন অন্য কিছু দেওয়া সম্ভব হয় না। অথচ দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ ভিন্ন কৃষকদের পক্ষে ঋণভার মুক্ত হওয়া এবং ভূমির উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অধিক সংখ্যায় এরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। জমি বন্ধক রাখিয়া ইহারা টাকা ধার দেয় বলিয়া এরূপ ব্যাঙ্কের টাকা মারা যাওয়ার ভয় থাকে না। আমাদের দেশে অবশ্য এরূপ ব্যাঙ্কের প্রসার সেরূপ হয় নাই। সেজন্য কৃষকদের দুর্দশাও দূর হইতেছে না।

৯। **সাধারণ আমানত (Public Deposits) :** অনেক কোম্পানী

জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে। বোম্বাই ও আমেদাবাদের বস্ত্রকলগুলি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এইভাবে এই আমানত স্বল্প-মিয়াদী ঋণের কতকটা অভাব পূরণ করিয়া থাকে।

১০। **দেশীয় ব্যাঙ্কার (Indigenous Bankers) :** মহাজন (Money Lenders), সাহুকর, স্রফ্ শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি ইহাদের অন্তর্গত। অধিকাংশ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক শহরাঞ্চলে অবস্থিত। গ্রামাঞ্চলে প্রায় সম্পূর্ণভাবে এবং শহরাঞ্চলে আংশিকভাবে দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ ঋণদানের কাজ করিয়া থাকে। এখনও ভারতীয় টাকার বাজারের শতকরা ৫০ ভাগ ইহারা অধিকার করিয়া আছে। ইহারা প্রধানত ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্প ও ছোট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বল্প-মিয়াদী ঋণ দিয়া থাকে।

যদিও স্বল্প মিয়াদী ঋণদান সংস্থাগুলির সংজ্ঞা অনুযায়ীই টাকার বাজারের সদস্য হওয়া উচিত, কিন্তু ১৪টি বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার ফলে এই সংজ্ঞার কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। এজন্য দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণদান সংস্থাগুলিও টাকার বাজারের সদস্যভুক্ত হইতে পারে।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী (Functions of the Reserve Bank of India)

ব্যাঙ্ক-ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সকল ব্যাঙ্কের শীর্ষস্থানে যে ব্যাঙ্ক অবস্থিত থাকে তাহাকে 'কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক' বলে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই বর্তমানে একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে। ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ইহার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের আর্থিক অবস্থা ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসাকে এমনভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিকমত চলে এবং মূলত দেশের আর্থিক উন্নতির অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত কাজ-কারবারগুলির অধিকারী :

(১) দেশের কাগজী মুদ্রা (Paper Currency) প্রচলনের ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত থাকে। ইহাতে তাহার একচেটিয়া অধিকার। ধাতু-মুদ্রা ও অন্যান্য নিদর্শক মুদ্রা (Token Coins) সরকার কর্তৃক নির্মিত হইলেও উহা এই ব্যাঙ্কের মারফতই বাজারে চালু হয়। সুতরাং মুদ্রা প্রচারের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর থাকে। মুদ্রার পরিমাণের উপরও দ্রব্য মূল্যস্তর (Price Level) বহুলাংশে নির্ভর করে। আবার দ্রব্যমূল্যের স্থিতি (Stability)-র উপর দেশের আর্থিক বনিয়াদের সুদৃঢ়তা নির্ভর করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ক্ষমতার দ্বারা কি পরিমাণ কাগজী মুদ্রা চালু থাকিবে এবং উহার সঙ্কোচন ও প্রসারণ কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া থাকে। একাধারে এই অধিকারের ফলে ইহা যেমন কাগজী মুদ্রার পরিমাণ স্থির করিতে পারে, অন্যপক্ষে ইহার দ্বারা অন্যান্য ব্যাঙ্কের কাজ-কারবার ও ঋণ-ঘটিত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ হইতে পারে। কাগজী মুদ্রার সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা দেশের মুদ্রাব্যবস্থাকে সুসমঞ্জস করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এরূপ ক্ষমতা আছে।

(২) বর্তমানকালে আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে ঋণব্যবস্থা (Credit System) এবং মুদ্রাব্যবস্থা (Currency) অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রকৃত প্রস্তাবে ঋণব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ না করিতে পারিলে মুদ্রাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সঙ্কোচন ও প্রসারণ আনয়ন করা সম্ভব নহে। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ঋণব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ভার ন্যস্ত আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই নিয়ন্ত্রণ কাজ প্রধানত দুই উপায়ে সাধন করিয়া থাকে : (১) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'বাট্টার হার' (Bank Rate) এবং (২) 'খোলা বাজারে সরকারী ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়' (Open Market Operations)। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির বাণিজ্য-হুণ্ডি ভাঙ্গাইতে প্রস্তুত থাকে তাহাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'বাট্টার হার' (Bank Rate) বলে। উক্ত হার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রচারপত্রে প্রতি সপ্তাহে ঘোষিত হইয়া থাকে। এই হারের উপর অন্যান্য ব্যাঙ্কের বাট্টার হার (Market Rate) ও তাহাদের ঋণ-ঘটিত কাজ-কারবারের গতি-প্রকৃতি নির্ভর করে। সাধারণত মুদ্রার সঙ্কোচন প্রয়োজন হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাট্টার হার বৃদ্ধি করিয়া ঋণ সঙ্কোচন করা হয় এবং মুদ্রার প্রসার প্রয়োজন হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাট্টার হার কমাইয়া ঋণ প্রসারণ করা হয়। অনুরূপে, দেশ বা ব্যাঙ্কের তহবিলের অর্থ কমাইতে হইলে এই ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণপত্র (Securities) বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে এবং এইভাবে বাজার হইতে টাকা তুলিয়া লয়। আবার বাজারে টাকা ছাড়িতে হইলে বা মুদ্রার যোগান বেশী করিবার প্রয়োজন হইলে বাজার হইতে এই ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিতে আরম্ভ করে। ইহা ছাড়া বর্তমানকালে অন্যান্য উপায়েও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণের ও মুদ্রার সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঘটাইয়া থাকে।

(৩) ইহা সরকারেরও ব্যাঙ্কার। সরকারী অর্থ বিনা সুদে এখানে জমা থাকে এবং ব্যাঙ্কের মারফত সরকারী লেন-দেন সম্পন্ন হয়। প্রয়োজনের সময় ইহা সরকারকে স্বল্প-মিয়াদী ঋণও দিয়া থাকে এবং সরকারী ঋণ পরিচালনা করিয়া থাকে।

(৪) ইহা অন্যান্য ব্যাঙ্কেরও ব্যাঙ্কার। অন্যান্য ব্যাঙ্ক উহাদের মোট আমানতের কিয়দংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া থাকে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সদস্য শ্রেণীভুক্ত এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক আছে। উহাদিগকে 'তপসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক' (Scheduled Banks) বলে। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির আদায়ীকৃত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা হইলে উহারা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'তপসিলভুক্ত' হওয়ার জন্য আবেদন করিতে পারে। ঐ আবেদন গ্রাহ্য হইলে উহারা তপসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক পর্যায়ভুক্ত হয়। উক্ত তপসিলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট উহাদের চলতি আমানতের (Demand Liabilities) এবং স্থায়ী আমানতের (Time Liabilities) শতকরা ৩ ভাগ জমা রাখিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার বলিয়া উহারা প্রয়োজনের সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ পাইয়া থাকে। এজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে শেষ পর্যায়ের চূড়ান্ত ঋণদাতা (Lender of the last resort) বলে। ইহাকে অন্য কথায় আপৎকালীন ঋণ (Distress borrowing) বলা চলে। ঐ সমস্ত ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট বিল ভাঙ্গাইয়া কিংবা

অনুমোদিত শেয়ার, বণ্ড প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া নিজেদের আর্থিক সঙ্গতি বাড়াইয়া লয়। এই অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের যে আমানত রাখিতে হয় উহার হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া, কিংবা বাট্টার হারের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া কিংবা সরকারী ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিয়া, কিংবা এক বা একাধিক ব্যাঙ্ককে বা সমস্ত ব্যাঙ্ককে উপদেশ-নির্দেশ দিয়া উহার কর্তৃত্ব বজায় রাখে এবং এইভাবে দেশের আর্থিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় করিবার প্রয়াস পায়।

(৫) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 'ক্লিয়ারিং হাউসের' (Clearing House)-ও কাজ করে। ইহা দ্বারা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটার জন্য নিজ নিজ যে দাবী-দাওয়া উপস্থিত হয় তাহা মিটাইবার কাজ হয়।

(৬) ইহা বৈদেশিক মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার বজায় রাখে। এজন্য প্রয়োজনমত ইহাকে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করিতে হয়। বিদেশের সহিত দেনা-পাওনা মিটাইবার কাজও ইহাকে করিতে হয়।

(৭) অনেক ক্ষেত্রে ইহাতে দেশের শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অর্থের যোগান দিতে হয়। কৃষির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি কৃষিঋণ বিভাগ (Agricultural Credit Department) আছে। ইহা ছাড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করাও ইহার অন্যতম কাজ।

(৮) জাতির স্বার্থের খাতিরে অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকারের পরামর্শদাতা হিসাবেও ইহাকে কাজ করিতে হয়।

সুতরাং উপরি-উক্ত কার্যাবলীর মাধ্যমে ইহা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির বন্ধু, দার্শনিক (পরামর্শদাতা) ও পথপ্রদর্শকের কাজ করিয়া থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী (Functions of Commercial Banks)

স্বল্প-মিয়াদী আমানত (Deposits) গ্রহণ এবং শিল্প-বাণিজ্যে স্বল্প-মিয়াদী ঋণদান ব্যাপারে যে সকল ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে নিযুক্ত উহাদিগকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (Commercial Banks) বলে। আধুনিক শিল্পোন্নত দেশে ব্যাঙ্ক বলিতে সাধারণত এই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককেই বুঝাইয়া থাকে। উহারা কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করে (Raises its funds) এবং উহাদের কার্যাবলী (Functions) কিরূপ নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :

১। এ সকল ব্যাঙ্ক যৌথ মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত। সুতরাং এরূপ ব্যাঙ্ক শেয়ার বিক্রয় দ্বারা অর্থ বা মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকে।

২। ইহা ছাড়া জনসাধারণের নিকট হইতে ইহা আমানত (Deposit) গ্রহণ দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করে। উক্ত আমানত বা উহার হিসাব তিন প্রকারের হইতে পারে।

(ক) চলতি আমানত হিসাব (Current or Call Deposit Account) : ইহা চলতি হিসাব (Current Account) নামে প্রচলিত। এরূপ হিসাবে ব্যাঙ্ক যে আমানত গ্রহণ করে উক্ত আমানত হইতে আমানতকারী তাহার

সুবিধা অনুযায়ী টাকা উঠাইতে পারেন বা অপর কাহাকেও হস্তান্তর করিতে পারেন। ব্যাঙ্ক সাধারণত আমানতের উপর কিছু সুদ দিয়া থাকে। কিন্তু বড় বড় ব্যাঙ্ক এই আমানতের উপর কোন সুদ দেয় না, দিলেও খুব সামান্য সুদ দিয়া থাকে। বরং এইরূপ আমানতকারীর নিকট হইতে 'আনুষঙ্গিক ব্যয়' (Incidental Charges) বলিয়া ব্যাঙ্ক কিছু দাবী করিয়া থাকে। কারণ চলতি হিসাবে টাকা গ্রহণ, প্রদান, অপর ব্যাঙ্কের বা পক্ষের নিকট হইতে টাকা আদায় ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাঙ্ককে ছাপান কাগজ-পত্র বেশ কিছু ব্যয় করিতে হয়। এরূপ আমানতে সব সময় কিছু টাকা জমা রাখিতে হয়।

(খ) সঞ্চয়ী আমানত হিসাব (Savings Deposit Account): ইহাকে সঞ্চয়ী হিসাব (Savings Account)-ও বলা হয়। ভারতীয় ব্যাঙ্কের এরূপ আমানত হইতে আমানতকারী সাধারণত বৎসরে নির্দিষ্টসংখ্যক বার মাত্র টাকা উঠাইতে বা হস্তান্তর করিতে পারেন। টাকার পরিমাণও সাধারণত সপ্তাহে ১০০০ টাকার বেশী উঠানোর নিয়ম নাই। উহার বেশী উঠাইতে হইলে ব্যাঙ্ককে পূর্বে নোটিশ দিতে হয়। ইহাতে চলতি আমানত অপেক্ষা কিছু বেশী সুদ পাওয়া যায়। ইহার বর্তমান সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা। তবে এরূপ আমানতে চলতি আমানত অপেক্ষা কম হইলেও সব সময় কিছু টাকা জমা রাখিতে হয়।

(গ) স্থায়ী আমানত হিসাব (Fixed or Time Deposit Account): ইহাতে নির্দিষ্ট সময়, ৩, ৬ মাস বা ১ বৎসরের বা ততোধিক সময়ের জন্য আমানত গ্রহণ করা হয়। ঐ সময়ের পূর্বে আমানতকারী ইহা হইতে কোন টাকা উঠাইতে পারেন না। ইহাতে সঞ্চয়ী হিসাব অপেক্ষা বেশী সুদ পাওয়া যায়। উক্ত সময়ের পূর্বে টাকা উঠাইতে হইলে ব্যাঙ্ক বাটা (Discount) বাবদ কিছু দাবী করিয়া থাকে।

গচ্ছিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদে আছে এবং প্রয়োজনমত পাওয়া যাইবে এই বিশ্বাস ও আস্থা লইয়াই লোকে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে। জনসাধারণের এরূপ আস্থা না থাকিলে ব্যাঙ্ক ব্যবসা ভাল চলিতে পারে না। সুতরাং ব্যাঙ্ক ব্যবসা ভালভাবে চালাইতে হইলে ব্যাঙ্ককে এই আস্থা অর্জনের জন্য সব সময়ই যত্নবান হইতে হয়।

৩। যৌথ কারবারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক শেয়ার বিক্রয় করিয়া অংশীদারগণের নিকট হইতে মূলধন আকারে টাকা পাইয়া থাকে। উক্ত টাকার অনেকাংশ অবশ্য ব্যাঙ্কের কাজ-কারবার চালু রাখার জন্য বাড়ী, জমি ও নানাবিধ স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করিতে ব্যয় হইয়া থাকে। এজন্য ব্যাঙ্কের কাজ-কারবারের অধিকাংশ আমানত টাকা লইয়াই চলিয়া থাকে। আমানতের টাকা অবশ্য আমানতকারিগণ যে কোন সময়ে উঠাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু অনেক টাকাই এইভাবে উঠাইয়া লওয়া হয় না বলিয়া উক্ত টাকা লইয়া ব্যাঙ্কের নানাবিধ কাজ-কারবার চালাইতে অসুবিধা হয় না।

৪। উপরি-উক্ত টাকা লগ্নি করা বা ধার দেওয়াই ব্যাঙ্কের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কাজ। গচ্ছিত টাকার উপর ব্যাঙ্ক কিছু সুদ দিয়া থাকে। কিন্তু ব্যাঙ্ক যে হারে সুদ দেয় উহা

অপেক্ষা বেশী সুদে ব্যাঙ্ক টাকা লগ্নি করিয়া থাকে বা ধার দেয়। ব্যাঙ্কও যাহাতে লগ্নি করিলে টাকা ফেরত পাওয়া ও সুদ পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারে তাহাতেই লগ্নি করিয়া থাকে। এজন্য ব্যাঙ্ক উপযুক্ত জামিন (Security) লইয়া টাকা লগ্নি করিয়া থাকে বা ধার দিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক সাধারণত সোনা, সরকারী ঋণপত্র, লাভজনক কোম্পানীর শেয়ার প্রভৃতি জামিন রাখিয়া টাকা ধার দিয়া থাকে। অনেক সময় ব্যবসায়ীদের কাঁচামাল জামিন বা বন্ধক রাখিয়াও (Hypothecation of Goods) ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিয়া থাকে।

৫। ব্যাঙ্ক অনেকক্ষেত্রে টাকা ধার দিয়া অর্থসৃষ্টি করে। ব্যাঙ্ক ঋণ-গ্রহীতাকে সরাসরি টাকা দিয়া দিতে পারে। ঋণ-গ্রহীতা আমানতকারী হইলে তাহাকে জমাতিরিক্ত (Overdraft) টাকা উক্ত জামিনে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিবার সুযোগ দিতে পারে অথবা ঋণ-গ্রহীতার নামে একটি আমানত হিসাব খুলিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ টাকা একযোগে অবশ্যই তাহাকে দেওয়া হয় না। এইভাবে ঋণপ্রদান ও আমানত গ্রহণ দ্বারা ব্যাঙ্ক অর্থসৃষ্টি করে।

৬। হুণ্ডির মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে টাকার প্রয়োজন হইলে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কে গিয়া অনুত্তীর্ণ সময়ের জন্য বাটা (Discount) দিয়া হুণ্ডির টাকা পাইতে পারেন। ব্যাঙ্কের পক্ষে এরূপ হুণ্ডি ভাঙ্গানো একটি উল্লেখযোগ্য কারবার। আন্তর্জাতিক ব্যবসাক্ষেত্রে স্বল্প-মিয়াদী হুণ্ডি ভাঙ্গানোও ব্যাঙ্কের একটি বিশেষ কাজ। ব্যাঙ্ক রপ্তানীকারকের নিকট হইতে অনুত্তীর্ণ সময়ের বাটা কাটিয়া হুণ্ডি ক্রয় করে এবং আমদানীকারকের নিকট হইতে নির্দিষ্ট সময়ে টাকা আদায় করিয়া থাকে। রপ্তানীকারক এরূপ টাকা প্রাপ্তির সুবিধা পাওয়ায় তাহাকে আর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। অনেকক্ষেত্রে এসব প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে এবং বিদেশস্থ বণিকের প্রতিনিধি হিসাবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও টাকা আদান-প্রদানে সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং নানাভাবে ব্যাঙ্ক দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়া দেয়।

৭। ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে অনেক দলিল-পত্রাদির যেমন, হুণ্ডি (Bill of Exchange), বহনপত্র (Bill of Lading), চালান (Invoice), বীমাপত্র (Insurance Policy), আকলপত্র (Letter of Credit) প্রভৃতি লেন-দেন ব্যাঙ্কের মারফত সম্পন্ন হয়। এরূপ কারবারে ব্যাঙ্ক অনেকক্ষেত্রে কিছু দস্তরী (Commission) দাবী করিয়া থাকে।

৮। ব্যাঙ্ক উহার আমানতকারীদের পক্ষে অনেক কাজ করিয়া দেয়। উহা অন্য ব্যাঙ্কের উপরে কাটা চেক, কোম্পানীর লভ্যাংশ, পেনসন প্রভৃতির টাকা আদায় করিয়া দেয়, উহাদের শেয়ার, স্টক প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় করাইয়া দেয়।

৯। ব্যাঙ্ক জনসাধারণের মূল্যবান অলঙ্কারাদি ও দলিল-পত্রাদি নিরাপদে রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অনেক সময় ব্যাঙ্ক সম্পত্তির অছি (Trustee) হিসাবেও কাজ করিয়া থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্বল্প-মিয়াদী আমানত গ্রহণ করে। এজন্য ইহাকে স্বল্প-মিয়াদী ঋণ-দান কারবারে লিপ্ত থাকিতে হয়। ইহাদের পক্ষে দীর্ঘ-মিয়াদী বন্ধকী কারবারে টাকা লগ্নি করা অত্যন্ত বিপদজনক ঝুঁকির কাজ। এই প্রধান বৈশিষ্ট্যই ইহাকে অন্যান্য ব্যাঙ্কের বিশেষ কাজ-কারবার হইতে পৃথক রাখিয়াছে এবং ভাল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী বলিয়া উহাকেই বলা হইবে যিনি বন্ধক ও হুণ্ডির মধ্যে যে পার্থক্য তাহা ভালভাবে বুঝিয়া থাকেন (A good commercial banker is one who can distinguish well between a Mortgage and a Bill of Exchange)।

বর্তমানে অবশ্য এই নিয়ম সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণদান ব্যাপারেও লিপ্ত থাকিতে হইতেছে। অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কও কিছু কিছু দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ না দিয়া থাকে এমন নহে। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এরূপ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এজন্য মূলধন বাজার ও টাকার বাজারের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

ব্যাঙ্কের হার (Bank Rate)

যে হারে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) উহার কর্তৃত্বাধীনে ব্যাঙ্কগুলির বিল ভাঙ্গাইয়া থাকে বা অর্থের যোগান দিয়া থাকে উহাকে ব্যাঙ্কের হার (Bank Rate) বলে। সাধারণত ঋণ ব্যাপারে কড়াকড়ির প্রয়োজন হইলে অর্থাৎ ঋণের বাজারের সঙ্কোচন প্রয়োজন হইলে এই হার বৃদ্ধি করা হয় এবং ঋণের ব্যাপারে উদারতা দেখানোর প্রয়োজন হইলে অর্থাৎ ঋণের বাজারের প্রসারণ প্রয়োজন বোধ করিলে এই হার হ্রাস করা হয়। সুতরাং এই হ্রাস-বৃদ্ধি সমীচীন কি অসমীচীন উহা বিচার করিতে হইলে সে সময়ে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা এবং গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া উচিত। মোটের উপর কথা—স্বল্প-মিয়াদী ঋণের অভাবে যাহাতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ব্যাহত না হয় বা অত্যধিক ঋণ প্রদানের ফলে মূল্যস্তর (Price Level) অযথা বৃদ্ধি না পায় সেজন্য ঋণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজন ও পরিমাণের সহিত ঋণের প্রয়োজন ও পরিমাণের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। দেশে মোট ঋণের পরিমাণ নির্ভর করে ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদানের নীতির উপর। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের ব্যাঙ্ক-ঋণের নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। দেশের অর্থনৈতিক দৃঢ়তার জন্য যে এই ঋণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন একথা কেহ অস্বীকার করেন না। মতভেদ হইতেছে ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন্ পন্থা ব্যবহার করিলে এ সম্পর্কে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইবে উহা লইয়া। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে বিভিন্ন পন্থা রহিয়াছে। উহা হইতেছে (১) ব্যাঙ্কের হার (Bank Rate), (২) খোলাবাজারের কারবার (Open Market Operations), (৩) জমার অনুপাতের পরিবর্তন (Variable Reserve Ratio), (৪) নৈতিক উপরোধ (Moral Suasion), (৫) নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (Selective Credit Control) ইত্যাদি।

ঋণ-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ব্যাঙ্কের হার কিরূপ কার্যকরী উহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথম পরিকল্পনাকালে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে এবং উহার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্কের হার ৩% হইতে ৩½% করা হয়। উহার ফলে ঋণের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসর হইতে মূল্যস্তর পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। তখন ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্কের হার পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া ৪%-এ দাঁড়ায় এবং পরে ৪½% হয়। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উহা বাড়িয়া ৫%-এ দাঁড়ায়। কিন্তু তাহাতে অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ব্যাঙ্কের হার পুনরায় ৫% হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬% হয়। ইহাতেও মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সফল হয় না। ব্যাঙ্কের হার বৃদ্ধি পাইলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি উহাদের আমানতের সুদের হারও বাড়াইয়া দেয়। সুতরাং একথা বলা চলে যে, বিভিন্ন সময়ে যে ব্যাঙ্কের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে উহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নাই। বরং উহা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভারতীয় টাকার বাজারের সুসংগঠিত অংশই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে। কিন্তু টাকার বাজারের অসংগঠিত অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হারের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ যে টাকার বাজারের এরূপ অবস্থা একথা বলা চলে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজেও ব্যাঙ্কের হারের হ্রাস-বৃদ্ধির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দিহান। যাঁহারা এভাবে ব্যাঙ্কের হার বৃদ্ধির পক্ষপাতী নহেন, তাঁহাদের মত হইতেছে যে, এরূপ ব্যাঙ্কের হার বৃদ্ধির ফলে সরকারী ঋণপত্রের বাজারে মন্দা সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহার ফলে উহাদের মূল্য হ্রাস পায়। পরিকল্পনার দ্বারা যেখানে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ইচ্ছা সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের হার বৃদ্ধি উক্ত পরিকল্পনার পরাজয়ই সূচনা করে। ঘাট্‌তি পূরণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক মুদ্রা সৃষ্টি এবং পরিকল্পনার উত্তরোত্তর ব্যয় বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্কের হার বৃদ্ধি অসমীচীন বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। Radcliffe Commission-এর মতে 'Bank Rate is a blunt instrument of monetary policy'. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরও বলিয়াছেন—'The Bank Rate was of relatively small significance in the movement of foreign short-term funds'.

কিন্তু যাঁহারা ইহার পক্ষে তাঁহারা অন্যরূপ মত পোষণ করেন। ব্যাঙ্কের হারই যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বিশেষ কার্যকরী উঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। The World Bank Missionও ব্যাঙ্কের হার বৃদ্ধির পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। The World Bank Mission-এর মতে—'The low rate of interest prevailing in the market created an illusion that capital was actually a scarce resource'. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে যখন প্রচুর অর্থ সঞ্চিত আছে তখন নির্বাচনমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ (Selective Credit Control) অথবা

অন্য পন্থা কেবল আংশিক সুফল দিতে পারে। Dr. V. K. R. V. Rao-ও ব্যাঙ্কের হার বৃদ্ধির পক্ষে মত দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে এবং ভোগ নিয়ন্ত্রিত হইবে। বর্তমান পরিস্থিতি লোকের মনে উন্নতি ও সম্প্রসারণের মনোবল সৃষ্টি করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় উচ্চ হারের জন্য বিনিয়োগ ক্ষেত্রে কোন প্রতিকূল অবস্থা দেখা দিবে না। জাপান ও অন্যান্য দেশে এরূপ ব্যাঙ্কের হার বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগক্ষেত্রে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং ব্যাঙ্কের হার বৃদ্ধির সহিত সুদের হার বৃদ্ধি অর্থ নৈতিক উন্নতি, বিনিয়োগ, মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণে সুফলই দিবে।

সুতরাং উপরি-উক্ত দ্বিবিধ মতামতের মধ্যে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করা কঠিন ব্যাপার। মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণ ভীত ও সন্ত্রস্ত। মূলধন বা ঋণ-প্রাপ্তির সুলভতার জন্যই যে ইহা অনেকাংশে দায়ী একথা বলা চলে। সুতরাং উচ্চ সুদের হার যে উহা কতকটা প্রতিরোধ করিতে পারিবে একথা বলা চলে।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কার্যাবলী (Functions of the State Bank of India)

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে বিশেষ আইন দ্বারা পূর্বতন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে (Imperial Bank of India) স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। সুতরাং স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এখন সরকারী ব্যাঙ্ক। বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। উহার নিম্নলিখিত কার্যাবলী হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :

১। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হিসাবে যে সকল কাজ করিত, স্টেট ব্যাঙ্ক সে সকল কাজ পূর্বের মতই করিয়া থাকে। শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে স্বল্প-মিয়াদী ঋণ প্রদান করা ইহার অন্যতম প্রধান কাজ।

২। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ও ঋণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন করাও ইহার বিশেষ কাজ। এই বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই ইহার সৃষ্টি। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ও ঋণ-ব্যবস্থা প্রসারের জন্য ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাইয়ের মধ্যে ৪০০টি নূতন শাখা খুলিবার কথা ছিল। কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে উহা ৪১৬টি শাখা খুলিয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যাঙ্ক এবং ইহার অধীন ব্যাঙ্কসমূহ ২৭৪টি শাখা স্থাপন করিয়াছে। ইতিমধ্যে ইহা আরও অনেক শাখা স্থাপন করিয়াছে।

৩। এই শাখা বিস্তারের উদ্দেশ্য গ্রামীণ ঋণদান সমিতিগুলিকে সুলভ হারে অধিক পরিমাণে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং গ্রামের ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত সঞ্চিত অর্থ আমানতের ব্যবস্থা করা। এই কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তাহা দেখা স্টেট ব্যাঙ্কের কাজ।

৪। এই ব্যাপারে ইহা অনেকটা অগ্রগতি লাভ করিতেছে এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এই ব্যাঙ্ক হইতে প্রচুর টাকা ঋণ পাইয়াছে। ইহা সরকারী ঋণপত্রের জামিনে প্রচলিত

হার অপেক্ষা ½ শতাংশ কম হারে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দিয়া থাকে। সমবায় ব্যাঙ্ক ছাড় সমবায় ঋণদান সমিতি এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকেও ইহা ঋণ দিয়া থাকে।

৫। ইহা ছাড়া কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও ইহা সহায়তা করিয়া থাকে। এজন্য ইহা কেন্দ্রীয় গুদাম ঘর কর্পোরেশনের (Central Warehousing Corporation) শেয়ার ক্রয় করিয়াছে এবং গুদামে রক্ষিত পণ্যদ্রব্যের রসিদের জামিনে ঋণ প্রদান করিতেছে।

৬। ইহা সমবায় ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির অর্থ বিনা ব্যয়ে সপ্তাহে তিনবার করিয়া স্থানান্তরের সুযোগ দিয়া থাকে।

৭। ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণ প্রদান করাও স্টেট ব্যাঙ্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সাহায্য দেওয়ার জন্য ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা একটি পথ-নির্দেশক পরিকল্পনা (Pilot Scheme) গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কোনও ক্ষুদ্রশিল্প ঋণ-প্রার্থী হইলে নিকটবর্তী স্টেট ব্যাঙ্কের এজেন্টদের নিকট আবেদন করিতে হয়। উক্ত এজেন্ট অন্যান্য ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন এবং উহাদের নিকট হইতে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেন। স্টেট ব্যাঙ্ক নিজেও এবং রাজ্য ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের মাধ্যমেও ক্ষুদ্রশিল্পকে ঋণ-দান করিয়া থাকে।

৮। উপরি-উক্ত পরিকল্পনায় বিশেষ সাফল্য দেখা দিয়াছে। ফলে ইহা স্টেট ব্যাঙ্কের সকল শাখাতেই প্রসার লাভ করিয়াছে। ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণ-দান ব্যাপারে যথাসম্ভব উদারনীতিই গৃহীত হইয়াছে। ইহার সুদের হার শতকরা ৬ টাকার মধ্যে রাখা হইয়াছে এবং ঋণের সর্তসমূহও যথাসাধ্য সহজ করা হইয়াছে।

৯। স্টেট ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্র শিল্পে সাত বৎসর মিয়াদী পর্যন্ত ঋণ প্রদান করিয়া থাকে। ইহা পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, উত্তর-প্রদেশ ও রাজস্থানের রাজ্য ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের সহিত চুক্তিবলে উহাদের যে সকল স্থানে শাখা নাই তথায় উহাদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

১০। যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিস নাই সেখানে স্টেট ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

১১। স্টেট ব্যাঙ্ক একটি সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, কিন্তু ইহা ভারতের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক। এজন্য ভারতীয় টাকার বাজারে ইহা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার মোট আমানতের পরিমাণ ২৩০ কোটি টাকার উর্ধ্বে। উহা তপসিল-ভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের প্রায় ২৫ শতাংশ। এজন্য অন্যান্য ব্যাঙ্কের টাকার প্রয়োজন হইলে উহারা স্টেট ব্যাঙ্ক হইতেও টাকা ধার করিয়া থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Pros and Cons of the Nationalisation of Commercial Banks)

বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণের প্রশ্ন লইয়া দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। এই জাতীয়করণের প্রশ্ন অবশ্য নূতন নয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ভারতের ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলির জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ দ্বারা স্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি জাতীয়করণ হইলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় এবং যাঁহারা ইহার পক্ষপাতী তাঁহাদের ইচ্ছা পূরণ হয়। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ১৪টি বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হইয়াছে। জাতীয়করণের **সপক্ষে** নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখান হইয়াছে। ইহার পিছনে Prof. Sayers-এর মতে তিনটি বিশেষ দিক আছে। ইহা হইতেছে Monetization, Integration and Socialisation Issues. নিম্নের আলোচনা হইতে উহা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

১। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের ফলে দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ব্যাঙ্ক 'ফেল' হওয়ার বিপর্যয় আর দেখা দিবে না। ইহাতে আমানতকারীদের টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে, জনসাধারণের সঞ্চয়স্পৃহা বৃদ্ধি পাইবে এবং ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। গৃহ হইতে লোকের সঞ্চিত অর্থ ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি চুরি-ডাকাতির কবলে পড়িবে না। ইহাতে ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের চাকুরীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাইবে, উহাদের কাজে আগ্রহ সৃষ্টি হইবে এবং এইভাবে ব্যাঙ্ক-ব্যবসার বিশেষ সম্প্রসারণও দেখা দিবে।

২। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-নীতির সুফল পাওয়া যাইতেছে না। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সকল ব্যাঙ্কের উপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার এবং টাকাকড়ির ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। এ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে এবং দেশের আর্থিক অবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলেও ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ প্রয়োজন।

৩। ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া অনেক ফটকা কারবার (Speculative Business) চলে। উক্ত ফটকা কারবারের ফলে কৃত্রিমভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যস্তরও অযথা আলোড়িত হয়। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হওয়ায় ফটকাবাজীদের এরূপ অপকর্ম দূর হইবে।

৪। অনেক লোক কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা গোপন রাখে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে এভাবে কর ফাঁকি দেওয়া বন্ধ হইবে।

৫। বর্তমান সরকারের নীতি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দেশকে গড়িয়া তোলা। ধনবৈষম্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন (concentration) রোধ করা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যবসায় একচেটিয়া মালিকানা ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করিতেছে। ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ইহার ফলে কতিপয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে (concentration of economic power in the hands of a few) এবং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পাঁচটি ব্যাঙ্কে মোট আমানতের ৪৬ ভাগ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সুতরাং এরূপ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবসান ঘটাইতে হইলে এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisation or diffusion) করিতে হইলে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ অবশ্যই প্রয়োজন।

৬। বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হওয়ায় উহার প্রচুর আমানত এবং বাৎসরিক ৪০.৫০ কোটি টাকা মুনাফা সরকারের আয়ত্তে আসিবে এবং উহা উপযুক্তভাবে পরিকল্পনা রূপায়ণে বিশেষ সহায়তা করিবে।

৭। ভারতের শিল্পপতিদের সহিত ব্যাঙ্কের অবাঞ্ছিত যোগাযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দেশে শিল্পপতিদের স্বার্থে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা পরিচালিত হয়। এজন্য সর্বাধিক সমাজকল্যাণ ব্যাহত হইতেছে এবং প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ঋণ প্রসারিত হইতেছে না। ইহার ফল অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীয়-ভবন এবং সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপঘাত মৃত্যু। সুতরাং এই অবস্থার অবসানের জন্যও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রয়োজন।

৮। ব্যাঙ্ক মুনাফা লাভের দিকে দৃষ্টি দিয়াই উহার ঋণ-দান-নীতি ও বিনিয়োগ নীতি নির্ধারণ করে। বে-সরকারী ব্যবসা প্রচেষ্টার প্রসার উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার ফলে প্রকৃত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বহু প্রতিষ্ঠান যেমন, কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্প ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আশানুরূপ ঋণ পাইতেছে না। ঋণবণ্টন-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইলেও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ অবশ্য প্রয়োজন।

কিন্তু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের **বিপক্ষের** যুক্তিগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে:

১। সরকারী ব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক (Bureaucratic)। ফলে ইহাতে লালফিতার (Red Tapism) দৌরাত্ম্যও সর্বাধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হওয়ায় আমলাতন্ত্রের প্রসারই ঘটিবে, লালফিতার দৌরাত্ম্য দেখা দিবে এবং পরিচালন দক্ষতা ও নৈপুণ্য হ্রাস পাইবে। ইহাতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বিপর্যয় দেখা দিবে।

২। ব্যাঙ্ক-ব্যবসা জাতীয়করণের ফলে উহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। ইহাতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন হইবে। একেই ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা সুবিধার নয়, বৈদেশিক ঋণ ভিন্ন অনেক কাজেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং এই আর্থিক পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া এক বিরাট সমস্যা দেখা দিবে এবং আর্থিক অনটন আরও বৃদ্ধি পাইবে।

৩। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হওয়ায় আমানতকারীর আমানত সম্পর্কে বা ঋণ-গ্রহীতার ঋণ সম্পর্কে কোন গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। ফলে ব্যক্তিগত ব্যবসা ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষার মূলনীতি লঙ্ঘিত হইবে।

৪। ভারতের ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের প্রায় ৩০ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং স্টেট ব্যাঙ্কের করায়ত্ত। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির আমানতের শতকরা ২৫ ভাগ সরকারী ঋণপত্রে লগ্নিকৃত। সুতরাং আমানত ও লগ্নিকৃত অর্থের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ যথেষ্টই আছে বলা চলে। এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ দ্বারা বে-সরকারী প্রচেষ্টাকে খর্ব করার প্রশ্নই উঠে না।

৫। ভারতের কারবারীক্ষেত্রে মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy) প্রবর্তিত। ইহাতে সরকারী এবং বে-সরকারী কারবারের সহ-অবস্থান সূচিত হইয়া থাকে। বে-সরকারী ক্ষেত্রের অর্থের যোগান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হওয়ায় বে-সরকারী উদ্যমের অর্থের যোগান ব্যাহত হইবে এবং সরকারী ও বে-সরকারী কারবারের সহ-অবস্থান শুধু নীতিকথার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।

৬। দেশে পরিপূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী। ইহাতে শুধু বে-সরকারী প্রচেষ্টা ধ্বংস পাইবে এবং বেকার সমস্যা তীব্রতর হইবে।

৭। সদিচ্ছা থাকিলে জাতীয়করণ ছাড়াও সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্মিলিত চেষ্টায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-ব্যবসার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা চলে। সুতরাং যাহা সহজে সম্ভব তাহার জন্য এরূপ বৈপ্লবিক ব্যবস্থা অযথা আর্থিক বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া অর্থনৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করিবে।

৮। কিছুদিন পূর্বে ব্যাঙ্কের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control) প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। উক্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ফলাফল না দেখিয়া ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা ঠিক হয় নাই।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control over Commercial Banks)

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিপক্ষে যত যুক্তিই দেখানো হউক উহার জন্য যে প্রচণ্ড দাবী উঠিয়াছিল, উহা সরকারের অনুমোদন লাভ করিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, যদিও সরকার তখন এ সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। বরং তৎকালীন উপ-প্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষপাতী ছিলেন না। সরকারের বিবেচনায় ব্যাঙ্কগুলিকে আরও বেশী করিয়া আয়ত্তে আনিলে সরকারের প্রশাসনিক সামর্থ্যের উপর তীব্র চাপ পড়িবে এবং মূল প্রশ্নগুলি পড়িয়া থাকিবে। এজন্য তিনি ব্যাঙ্কে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (Social Control) পক্ষপাতী। এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইতেছে ব্যাঙ্কের ঋণদান সম্পর্কে কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প এবং রপ্তানীকে অগ্রাধিকার দেওয়া। ব্যাঙ্কের এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপ :

১। ইহার জন্য জাতীয় ঋণ পরিষদ (National Credit Council) গঠিত

হয়। ইহার কাজ হয় ঋণপ্রার্থী সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং উহাদের মধ্যে অগ্রাধিকার স্থির করা।

২। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩। সঠিক পথে ব্যাঙ্ক শিল্পের উন্নতিতে যে সকল বাধা সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য কমিশন নিয়োগ।

৪। ব্যাঙ্কের পদস্থ পরিচালকদের জন্য একটি ট্রেনিং সংস্থার পত্তন।

৫। কোন ব্যাঙ্ক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘন করিলে কিংবা তদনুযায়ী প্রচারিত নির্দেশ অমান্য করিলে উহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার অধিকার স্বীকৃত হয়।

৬। আইনের বলে শিল্পপতিদের পরিবর্তে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়। কোন কোন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অপছন্দ হইলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মনোনীত প্রার্থীর পরিবর্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনোনীত প্রার্থীকে চেয়ারম্যান করার ক্ষমতা থাকে। প্রয়োজন মনে করিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানকে অপসারণ করিতে পারে।

৭। কোন সংস্থার পরিচালক, অংশীদার ও ম্যানেজিং এজেণ্ট ঋণ বা গ্যারাণ্টি পাইবেন না। স্থানীয় বা উপদেষ্টা কমিটিতে ঋণলাভের ব্যাপারে উহাদের কোন প্রতিনিধি থাকিতে পারিবে না।

৮। প্রতিটি বিদেশী ব্যাঙ্ককে ভারতীয়দের লইয়া উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিতে হয় এবং ঋণদান নীতি ও রীতি সম্পর্কে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির সম্পর্কে প্রযোজ্য ব্যবস্থা বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকেও অনুসরণ করিতে হয়।

৯। কোন বিশেষ মক্কেল কিংবা গোষ্ঠী ঋণলাভের ব্যাপারে বিশেষ কোন সুবিধা পাইবেন না।

ব্যাঙ্কের উপর যে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন একথা সকলেই স্বীকার করেন। তবে ব্যাঙ্কের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সুফল বা কুফল বিবেচনা করার সুযোগ ঘটে নাই। সদিচ্ছা লইয়া কাজে অগ্রসর হইলে উহাতে সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। তবে উহার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উপস্থিত হয় নিম্নের বিবরণ হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে।

১। অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ আর. কে. হাজারীর মতে, ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবে না। কারণ জাতীয়করণ ভিন্ন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইবে।

২। ডাঃ হাজারীর মতে জাতীয় ঋণ পরিষদ (National Credit Council) একটি অপ্রয়োজনীয় সংস্থা। ইহা কখনই উহার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবে না।

৩। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান এবং ডিরেক্টরগণ কাহার নিকট দায়ী থাকিবেন সে সম্বন্ধেও ইহাতে সুস্পষ্ট নির্দেশ নাই।

৪। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঋণদানের নীতি গৃহীত হইলে ব্যাঙ্কের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কা আছে।

৫। মিঃ সি. এইচ. ভাবার মতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ একটি অস্পষ্ট ধারণা। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলিতে কি বুঝায় তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যাও ইহাতে নাই।

৬। বেসরকারী ব্যাঙ্কের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকারী ব্যাঙ্কগুলিও এরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে বাদ যায় না। সুতরাং জাতীয়করণ বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা একদিকের ত্রুটি কতকটা লাঘব হইলেও অন্যদিকে অনেক ত্রুটি প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা আছে।

৭। ঋণদান ব্যাপারে উপেক্ষিত কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের কোন সুরাহা ইহার ফলে সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। সে বিশ্বাস থাকিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতিই উহা করিতে পারিত। সুতরাং উহাদের দ্বারা যখন এযাবৎ কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয় নাই তখন এই নূতন ব্যবস্থায় উহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

৮। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে। ইহার ফলে আমানতকারীদের টাকা ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হইবে, ব্যাঙ্কের মুনাফা হ্রাস পাইবে, ব্যয় বৃদ্ধি দেখা দিবে, অংশীদারদের লভ্যাংশ এবং কর্মচারীদের বোনাস হ্রাস পাইবে। ফলে উহাদের স্বার্থ বিপন্ন হইবে।

৯। ইহার ফলে যাঁহাদের চেষ্টায় এবং টাকায় ব্যাঙ্ক ব্যবসার এতটা উন্নতি সম্ভব হইয়াছে তাঁহাদের অধিকারে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা হইবে।

১০। ইহার ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দক্ষতা এবং ব্যবসায়ের ভদ্রতা ও শিষ্টাচার বিনষ্ট হইবে।

স্বল্প-মিয়াদী ঋণদানের বিভিন্ন প্রণালী (Different Methods of Short-term Lending)

শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বল্প-মিয়াদী ঋণদান ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। বড় বড় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিই প্রধানত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি হইতে এরূপ ঋণের সুবিধা পাইয়া থাকে। ক্ষুদ্র আয়তনের শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হইতে বিশেষ ঋণ পায় না। উহারা প্রধানত মহাজন, পোদ্দার, স্রফ প্রভৃতি দেশীয় ব্যাঙ্কারদের নিকট হইতে উচ্চ সুদে ঋণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে যে প্রণালীতে স্বল্প-মিয়াদী ঋণ দিয়া থাকে নিম্নের বিবরণ হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে :

টাকা লগ্নি করা বা ধার দেওয়াই ব্যাঙ্কের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কাজ। গচ্ছিত টাকার উপর ব্যাঙ্ক কিছু সুদ দিয়া থাকে। কিন্তু ব্যাঙ্ক যে হারে সুদ দেয় উহা অপেক্ষা বেশী সুদে ব্যাঙ্ক টাকা লগ্নি করিয়া থাকে বা ধার দেয়। ব্যাঙ্কও যাহাতে লগ্নি করিলে টাকা ফেরত পাওয়া ও সুদ পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারে তাহাতেই

লগ্নি করিয়া থাকে। এজন্য ব্যাঙ্ক উপযুক্ত জামিন (Security) লইয়া টাকা লগ্নি করিয়া থাকে বা ধার দিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক সাধারণত সোনা, সরকারী ঋণপত্র, লাভজনক কোম্পানীর শেয়ার প্রভৃতি জামিন রাখিয়া টাকা ধার দিয়া থাকে। অনেক সময় ব্যবসায়ীদের কাঁচামাল জামিন রাখিয়াও ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিয়া থাকে।

সাধারণত ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ টাকা ধার দেয় তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ টাকার জামিন গ্রহণ করে। লগ্নিকৃত টাকার পরিমাণ এবং জামিন দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণের যে পার্থক্য তাহাকে Margin বলে। টাকা ধার দেওয়ার সময় এই Margin রক্ষা করা ব্যাঙ্কের পক্ষে খুবই সমীচীন। কারণ কিছুটা Margin থাকিলে ব্যাঙ্কের লোকসান হওয়ার কোন ভয় থাকে না। সাধারণত ৩০।৪০% Margin রাখিয়া ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিয়া থাকে অর্থাৎ ১০০ টাকার জিনিস জামিন রাখিলে ব্যাঙ্ক ৬০।৭০ টাকার বেশী ধার দিতে চায় না।

জামিন না রাখিয়াও যে ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয় না এমন নহে। জামিন না রাখিয়া টাকা ধার দেওয়াকে বলে 'জামিনবিহীন ঋণ' (Clean Credit or Advance), ঋণ-গ্রহীতার সুনাম, আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রভৃতি দেখিয়া শুধু ব্যক্তিগত জামিনেও (Personal Security) টাকা ধার দেওয়া হয়।

এই ঋণ বা অগ্রিম (Loan or Advance) ব্যাঙ্ক সাধারণত নিম্নলিখিত তিন উপায়ে দিয়া থাকে :

১। **রোক ঋণ (Cash Credit) :** সাধারণত কৃষি পণ্য যেমন, তুলা, পাট, তৈলবীজ, চা ইত্যাদি অথবা শিল্পজাত দ্রব্য যেমন, বস্ত্র, সূতা, ঔষধপত্র, তৈল প্রভৃতি জামিন (Security) হিসাবে জমা রাখিয়া ব্যাঙ্ক এই প্রকার ঋণ দিয়া থাকে। উক্ত দ্রব্যাদি কোন অনুমোদিত গুদামে কিংবা ব্যাঙ্কের নিজস্ব গুদামে মজুত থাকে। এইভাবে গুদামে না রাখিয়াও উক্ত দ্রব্যাদির উৎপাদনের ভিত্তিতেও ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়া থাকে। যে দ্রব্যাদি এইভাবে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক (Hypothecation) থাকে তাহা উৎপাদনের পর ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিক্রয় হয় এবং ব্যাঙ্কের ঋণের টাকা ও সুদ সঙ্গে সঙ্গে আদায় হয়। এরূপ রোক ঋণ (Cash Credit) বড় বড় ব্যবসায়িগণ ব্যবসা চালু রাখিবার জন্য প্রায়ই গ্রহণ করিয়া থাকেন। চা-বাগিচা শিল্পেই এরূপ ঋণ বিশেষ চালু দেখা যায়। এরূপ ঋণের টাকা ঋণ-গ্রহীতার নামে ব্যাঙ্কে আমানত (Deposit) হিসাবে জমা থাকে এবং প্রয়োজনমত ঋণ-গ্রহীতা চেক কাটিয়া উঠাইতে পারেন। এরূপ ঋণে যে টাকা প্রকৃত প্রস্তাবে তোলা হয় তাহার উপরই ব্যাঙ্ক সুদ দাবী করিয়া থাকে।

২। **জমাতিরিক্ত গ্রহণ (Overdraft) :** আমানতকারিগণ (Depositors) সাধারণত এই উপায়ে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই ঋণ-ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক তাহার আমানতকারীর চলতি হিসাব (Current Account) হইতে চুক্তি অনুযায়ী

জমার অতিরিক্ত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তুলিবার অনুমতি দিয়া থাকে। ইহার জন্য জামিন হিসাবে আমানতকারীকে ব্যাঙ্কে স্টক, শেয়ার, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি গচ্ছিত রাখিতে হয়। অনেকক্ষেত্রে একজন জামিনদার (Guarantor) লইয়া ঋণ-গ্রহীতার হ্যাণ্ডনোটের ভিত্তিতে এরূপ ঋণ দেওয়া হয়। আমানতকারীর ব্যবসায়িক সুনাম, আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রভৃতি দেখিয়া ব্যক্তিগত জামিনেও (Personal Security) জমাতিরিক্ত টাকা ঋণ হিসাবে দেওয়ার রীতি আছে। এই ব্যবস্থায় যে পরিমাণ টাকা জমাতিরিক্ত গ্রহণ করা হয় তাহার উপরই শুধু ব্যাঙ্ক সুদ দাবী করিয়া থাকে। ব্যবসাক্ষেত্রে কার্যকরী মূলধনের (Working Capital) অভাব অনেকক্ষেত্রে এইভাবে মিটানো হয়।

৩। **ব্যাঙ্কের ঋণ (Bank Loan) ঃ** অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ের জন্য ঋণের প্রয়োজন হইলে এই প্রথায় ঋণ গ্রহণ করা হয়। শেয়ার, সরকারী ঋণপত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক এরূপ ঋণ দিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক এরূপ ঋণের দ্বারা উহার আমানতকারীর নামে একটি ঋণের হিসাব (Loan Account) খুলিয়া থাকে এবং উহা ঋণের হিসাবে আমানতকারীর নামে ডেবিট লিখলেও আমানতকারীর চলতি হিসাবে (Current Account) ক্রেডিট লিখিয়া থাকে এবং প্রয়োজনমত চেক কাটিয়া উহা হইতে টাকা উঠানো যায়। ঋণ গ্রহণের দিন হইতে উক্ত টাকা উঠানো হউক বা না হউক—সমগ্র ঋণের উপর আমানতকারীকে সুদ দিতে হয়।

সুতরাং জমাতিরিক্তগ্রহণ (Overdraft) এবং রোক ঋণ (Cash Credit) হইতে ব্যাঙ্ক ঋণ (Bank Loan)-এর পার্থক্য এই যে—

(ক) 'ব্যাঙ্ক ঋণ' লওয়া হয় কিছুটা দীর্ঘ দিনের জন্য, কিন্তু 'জমাতিরিক্তগ্রহণ' ও 'রোক ঋণ' লওয়া হয় অল্পদিনের জন্য। ঋণগ্রহীতা সাধারণত 'ব্যাঙ্ক ঋণের' সব টাকা একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু 'জমাতিরিক্তগ্রহণ' ও 'রোক ঋণ' ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করার রীতি।

(খ) 'ব্যাঙ্ক ঋণে' সম্পূর্ণ টাকার উপর সুদ দিতে হয়। 'জমাতিরিক্তগ্রহণ' ও 'রোক ঋণে'র জন্য যে পরিমাণ টাকা উঠানো হয় তাহার উপর সুদ দিতে হয়।

(গ) 'ব্যাঙ্ক ঋণ' অপেক্ষা 'জমাতিরিক্ত' ও 'রোক ঋণ' গ্রহণ বেশী জনপ্রিয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কও 'ব্যাঙ্ক ঋণ' দিতে বেশী উৎসাহ বোধ করে না। কারণ ইহাতে টাকা বেশী দিন আটক থাকে এবং ব্যাঙ্কের ঘরে ইহার জন্য সুদের পরিমাণ মোটের উপর কমই আসে।

৪। হুণ্ডির মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে টাকার প্রয়োজন হইলে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কে গিয়া অনুত্তীর্ণ সময়ের জন্য বাটা (Discount) দিয়া হুণ্ডির টাকা পাইতে পারেন। ব্যাঙ্কের পক্ষে এরূপ হুণ্ডি ভাঙানো একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসা। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-ক্ষেত্রে স্বল্প-মিয়াদী হুণ্ডি ভাঙানোও ব্যাঙ্কের একাধিক বিশেষ কাজ। ব্যাঙ্ক রপ্তানী-

কারকের নিকট হইতে অনুত্তীর্ণ সময়ের বাটা কাটিয়া হুণ্ডি ক্রয় করে এবং আমদানী-কারকের নিকট হইতে নির্দিষ্ট সময়ে টাকা আদায় করিয়া থাকে। রপ্তানীকারক এরূপ টাকা প্রাপ্তির সুবিধা পাওয়ায় তাহাকে আর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। অনেকক্ষেত্রে এসব প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে এবং বিদেশস্থ বণিকের প্রতিনিধি হিসাবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও টাকা আদান-প্রদানে সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং নানাভাবে ব্যাঙ্ক ধার দিয়া দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়া দেয়।

৫। ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে অনেক দলিলপত্রাদির যেমন, হুণ্ডি (Bill of Exchange), বহন পত্র (Bill of Lading), চালান (Invoice), বীমাপত্র (Insurance Policy), আকলপত্র (Letter of Credit) প্রভৃতির লেন-দেন ব্যাঙ্কের মারফত সম্পন্ন হয়। এক কথায় উহাদিগকে মালের স্বত্বের দলিল (Documents of Title to Goods) বলে। এগুলি জামিন রাখিয়াও ব্যাঙ্ক স্বল্প-মিয়াদী ঋণ দিয়া থাকে।

হস্তান্তরযোগ্য দলিল (Negotiable Instruments)

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ধারে জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ঋণের স্বীকৃতি হিসাবে বা টাকা-পয়সার লেন-দেন ব্যাপারে নগদ টাকার পরিবর্তে নানাপ্রকার দলিল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাদিগকে এক কথায় হস্তান্তরযোগ্য দলিল (Negotiable Instruments) বলে। এই সকল দলিল যে-কোন সময়ে প্রয়োজন-বোধে নগদ টাকায় রূপান্তর করা চলে। বাণিজ্য হুণ্ডি (Bill of Exchange), অঙ্গীকারপত্র (Promissory Note) ও চেক (Cheque) এই জাতীয় দলিল। এই হস্তান্তরযোগ্য দলিলগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের পর পর হাত বদল হইতে পারে এবং যে কেহ স্থির বিশ্বাসে (Good faith) ইহার স্বত্বের ত্রুটি না জানিয়া (without knowing the defects of the title) গ্রহণ করিলে তাহার ঐ দলিলে উল্লিখিত টাকা পাইবার অধিকার জন্মে।

চেক (Cheque)

যিনি ব্যাঙ্কের চলতি ও সঞ্চয়ী আমানতে টাকা রাখিয়া থাকেন তিনি উক্ত আমানত হইতে প্রয়োজনমত টাকা তুলিতে বা হস্তান্তর করিতে চাহিলে তাঁহাকে একখানা প্রপত্র (form) পূরণ করিয়া ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিতে হয়, কিংবা যাহাকে টাকা দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে দিতে হয়। উক্ত ব্যক্তি অবশ্য উহা ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিয়া টাকা লইয়া থাকেন। এই পূরিত প্রপত্রই চেক নামে অভিহিত। এরূপ কতকগুলি চেক প্রপত্র একসঙ্গে বাঁধাই করিয়া ব্যাঙ্ক প্রয়োজনমত উহার আমানতকারীদিগকে

সরবরাহ করিয়া থাকে। চেকের সংজ্ঞা—যে ব্যবসায়ী হুণ্ডি (Bill of Exchange) প্রাপকের চাহিবামাত্র উল্লিখিত টাকা দিবার জন্য ব্যাঙ্কের উপর আদেশ জারী করে তাহাকে চেক (cheque) বলে। ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) ইহা দ্বারা আমানতকারী ব্যাঙ্ককে টাকা দিবার নির্দেশ দিয়া থাকেন।

(২) টাকার পরিমাণ চেকের মধ্যে লিখিত হইয়া থাকে।

(৩) টাকার প্রাপক আমানতকারী নিজে কিংবা অপর কোন ব্যক্তি হইতে পারেন।

(৪) আমানতকারীকে চেকের নীচে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতে হয়। প্রথম টাকা জমা দিবার সময় ব্যাঙ্ক একটি কাগজে আমানতকারীর স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া থাকে। চেকের নীচের সহি আমানতকারীর উক্ত স্বাক্ষরের অনুরূপ হওয়া চাই। নতুবা ব্যাঙ্ক চেকের টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে না। আর চেকে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ আমানতকারীর জমা টাকার বেশী হইতে পারিবে না।

(৫) আমানতকারী ভিন্ন অন্য কেহ চেক কাটিতে পারেন না।

(৬) চেকের সাহায্যে টাকা-পয়সা লেন-দেন হইলেও আইনত অন্য কোন ব্যক্তিকে পাওনা পরিশোধের জন্য চেক লইতে বাধ্য করা যায় না। ইহা পরস্পরের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই চালু হইয়া থাকে।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার চেকের পরিচয় দেওয়া হইল :

১। **বাহকদেয় চেক (Bearer Cheque) :** যে চেকের টাকা যে-কোন লোক ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিলেই পাওয়ার অধিকারী তাহাকে 'বাহকদেয় চেক' বলে। ইহা হস্তান্তরের জন্য পিঠসহি (Endorsement) প্রয়োজন হয় না। টাকা গ্রহণ করিবার সময় চেকের উল্টাপিঠে বাহকের শুধু প্রাপ্তিস্বীকারমূলক সহি দিতে হয়।

২। **আদেশবাহী চেক (Order Cheque) :** যে চেকের টাকা আমানত-কারীর আদেশমত প্রাপককে বা উক্ত প্রাপকের নির্দেশমত কোনও ব্যক্তিকে দেয় তাহাকে 'আদেশবাহী চেক' বলে। যে ব্যক্তি এই প্রকার চেকের টাকা গ্রহণ করিবে, তাহাকে চেকের উল্টাপিঠে সহি দিতে হয়। টাকা দেওয়ার সময় নির্দেশমত প্রাপক টাকা পাইতেছে কিনা তাহা ব্যাঙ্কের দেখা প্রয়োজন। উক্ত প্রাপক ব্যাঙ্কের অপরিচিত হইলে ব্যাঙ্কের কোনও পরিচিত ব্যক্তিদ্বারা উহাকে সনাক্ত করাইয়া লওয়ার নিয়ম। সুতরাং 'আদেশবাহী চেকের' টাকা 'বাহকদেয় চেকের' মত যে-কোন ব্যক্তিকে দেওয়া চলে না।

৩। **আড়ি চেক (Crossed Cheque) :** যে চেকের উপর আড়াআড়িভাবে দুইটি সমান্তরাল রেখা টানিয়া উক্ত রেখা দুইটির মধ্যে 'এণ্ড কোং' লিখিয়া কিংবা অনুরূপ কিছু লিখিয়া কিংবা কোন কিছু না লিখিয়া দেওয়া হয় তাহাকে 'আড়ি চেক' বলে। এরূপ আড়ি চেকের টাকা ব্যাঙ্ক হইতে সরাসরি নগদ পাওয়া যায় না। ইহা

ব্যাঙ্কে যাহার 'হিসাব' (Account) খোলা আছে তাহার মারফত ভাঙ্গাইতে হয়। প্রাপকের নিজের 'হিসাব' (Account) থাকিলে তিনি ঐ হিসাবে উক্ত চেকের টাকা জমার জন্য ব্যাঙ্কে জমা দিবেন। তাঁহার টাকার প্রয়োজন থাকিলে নিজে বাহকদেয় (Bearer) চেক লিখিয়া ব্যাঙ্ক হইতে সরাসরি টাকা গ্রহণ করিবেন। প্রাপকের ব্যাঙ্কে কোন 'হিসাব' না থাকিলে যাঁহার ব্যাঙ্কে 'হিসাব' আছে তাঁহার মারফত চেক ব্যাঙ্কে জমা দিয়া ভাঙ্গানোর ব্যবস্থা করিবেন। আদায়কারী ব্যাঙ্ক দেয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এই টাকা গ্রহণ করিবে এবং যিনি চেক জমা দিয়াছেন তাঁহার হিসাবে উহা জমা দেখাইবে এই ব্যবস্থা সাধারণ আড়িযুক্ত চেকের পক্ষেই প্রযোজ্য। বিশিষ্ট আড়িযুক্ত চেক সম্পর্কে অবশ্য কিছুটা অন্য নিয়ম। সাধারণভাবে বলা চলে—যেখানে প্রাপককে সরাসরি ব্যাঙ্ক হইতে টাকা দেওয়ার ইচ্ছা নয় কিংবা উচিত নয় সেরূপ অবস্থায় এরূপ চেক ব্যবহার করা হয়। চেক অনেক হাতবদল হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে কিংবা হারাইয়া যাওয়ার ভয় থাকিলে এরূপ চেক ব্যবহার করা খুবই সমীচীন। আদায়কারী ব্যাঙ্ক নিজ দায়িত্বে এরূপ চেকের টাকা গ্রহণ করিয়া থাকে। ফলে এরূপ চেকের প্রকৃত প্রাপক সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোন বিতর্ক উপস্থিত হইলে আদায়কারী ব্যাঙ্ক মারফত উহার মীমাংসা চলে। যে-কোন ধারক বা বাহক আদেশবাহী কিংবা বাহকদেয় চেককে আড়ি চেকে পরিণত করিতে পারেন। কিন্তু আজ্ঞাকারক ভিন্ন অন্য কেহ আড়ি তুলিয়া দিতে বা বাতিল করিতে পারেন না।

চেক প্রধানত উপরি-উক্ত তিন প্রকারের। নিম্নলিখিতগুলি উহার প্রকারভেদ :

১। **খোলা চেক (Open Cheque) :** যে চেকের টাকা ব্যাঙ্ক হইতে সরাসরি নগদ পাওয়া যায় এবং আড়ি থাকিলে তাহা তুলিয়া দিয়া নগদ টাকা পাওয়ার সুবিধা হয় তাহাকে 'খোলা বা সাদা চেক' বলে। অন্য কথায় যাহা আড়ি চেক নহে তাহাই খোলা চেক। খোলা চেক বাহকদেয় বা আদেশবাহী হইতে পারে।

২। **বাসি বা দূষিত চেক (Stale Cheque) :** যে চেক ৬ মাস পূর্বে লেখা হইয়াছে অথচ উক্ত সময়ের মধ্যে টাকা লওয়ার জন্য ব্যাঙ্কে উপস্থিত করা হয় নাই তাহাকে 'বাসি চেক' বলে।

৩। **পরবর্তী তারিখে দেয় চেক (Post-dated Cheque) :** যে তারিখে চেক পাওয়া গেল বা লিখিত হইল, চেকের তারিখের ঘরে সে তারিখ না লিখিয়া যদি কোন পরবর্তী তারিখ লেখা হয় তবে ঐরূপ চেককে 'পরবর্তী তারিখে দেয় চেক' বলা হয়। চেকে লিখিত তারিখ না আসা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক হইতে এরূপ চেকের টাকা পাওয়া যায় না। যেখানে ভবিষ্যতে কোনও তারিখ ভিন্ন উল্লিখিত টাকা প্রদানের উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যাঙ্কে জমা হওয়ার সম্ভাবনা নাই কিংবা ভবিষ্যতে কোনও তারিখের পূর্বে প্রাপককে টাকা দেওয়ার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য নয় বা দেওয়া উচিত নয় সেক্ষেত্রে এরূপ চেক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৪। **পূর্ববর্তী তারিখে দেয় চেক (Ante-dated Cheque) :** যে তারিখে চেক লিখিত হইল কিংবা পাওয়া গেল চেকে সে তারিখ না লিখিয়া যদি পূর্ববর্তী কোন তারিখ লেখা থাকে তবে ঐরূপ চেককে 'পূর্ববর্তী তারিখে দেয় চেক' বলে। কোনও দেনা পূর্বে পরিশোধ করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু করা হয় নাই এবং এখন পূর্বের তারিখ বসাইয়া চেক দিলে সে ত্রুটি দূর হয়—সেরূপ অবস্থায় এরূপ চেক ব্যবহৃত হয়। কোনও ব্যক্তি যে তারিখে চেক লেখা হইয়াছে সে তারিখে চেক না লইয়া উহার পরবর্তী অন্য কোন তারিখে উক্ত চেক গ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তির নিকট এরূপ চেক 'পূর্ববর্তী তারিখে দেয় চেক' বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৫। **ব্যাঙ্ক ড্রাফট (Bank Draft) :** ইহাও একপ্রকার চেক। ইহা দ্বারা এক ব্যাঙ্ক উহার অপর শাখা ব্যাঙ্ককে টাকা দিবার নির্দেশ দিয়া থাকে।

চেকের নমুনা

নং ৩২৭৮৫	ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিমিটেড নং ৩২৭৮৫ তাং কলিঃ ১১।১০।৭৩
টাঃ ১০০০৲	....
প্রাপক—ডি. সেন	ডি. সেন কিংবা বাহককে দেয় ....
তাং ১১. ১০. ৭৩	এক হাজার টাকা মাত্র ....
মন্তব্য—দেনা শোধ	টাঃ ১০০০৲ হরিহর ভট্ট

বিভিন্ন প্রকারের আড়ি (Different Kinds of Crossing)

আড়ি দুই প্রকারের হইতে পারে :

(১) সাধারণ (General)

(২) বিশিষ্ট (Special)

সাধারণ আড়ির নমুনা (Examples of General Crossing)

(১)

(২)

এণ্ড কোং
(& Co.)

(৩)

হস্তান্তর অযোগ্য
(Not Negotiable)

(৪)

হস্তান্তর অযোগ্য এণ্ড কোং
(Not Negotiable & Co.)

(৫)

তিন শত টাকার কম মাত্র
(Under Rs. three hundred only)

(৬)

তিন শত টাকার কম এণ্ড কোং
(Under three hundred rupees & Co.)

(৭)

তিন শত টাকার কম হস্তান্তর অযোগ্য
(Under Rupees three hundred Not Negotiable)

(৮)

তিন শত টাকার কম—হস্তান্তর অযোগ্য এণ্ড কোং
(Under Rupees three hundred Not Negotiable & Co.)

বিশিষ্ট আড়ির নমুনা (Examples of Special Crossing)

উপরি-উক্ত সাধারণ আড়ির যে-কোনটার সহিত এবং উহা ছাড়াও আড়ির মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়ে বিশিষ্ট আড়ির সৃষ্টি করা যাইতে পারে :

(১)

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

(২)

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

(৩)

কেবল প্রাপকের হিসাবে
(Account payee only)

(৪)

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ
কেবল প্রাপকের হিসাবে

সাধারণ আড়ি থাকিলে সেরূপ চেক কেবল যে-কোনও ব্যাঙ্কের মারফত ভাঙ্গানো যাইবে—ইহাই বুঝায়। কিন্তু সাধারণ আড়ির সহিত বা সাধারণ আড়ি ভিন্ন শুধু বিশিষ্ট আড়ি থাকিলে উক্ত বিশিষ্ট আড়ির দ্বারা চেকের টাকা প্রদান বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ করা হয়। যেমন —

(১) আড়ির মধ্যে কাহারও নাম লেখা থাকিলেই তাহাকে টাকা দেয় বুঝায়।

(২) আড়ির মধ্যে কোন ব্যাঙ্কের নাম থাকিলে উক্ত ব্যাঙ্কের মারফত চেক ভাঙ্গাইতে হইবে। এখানে 'দেয় ব্যাঙ্ক' (Drawee Bank) অন্য কোন ব্যাঙ্ককে টাকা দিবে না।

(৩) 'কেবল প্রাপকের হিসাবে'—আড়ির মধ্যে এরূপ লেখা থাকিলে যে ব্যাঙ্কই টাকা গ্রহণ করুক না কেন, সে টাকা শুধু প্রাপকের হিসাবেই (Payee's A/c) 'ক্রেডিট' হইবে। ব্যাঙ্কে প্রাপকের হিসাব না থাকিলে এরূপ চেক ভাঙ্গানো যায় না।

(৪) ব্যাঙ্কের নামসহ 'কেবল প্রাপকের হিসাবে' লেখা থাকিলে সে ব্যাঙ্কের মারফতই শুধু টাকা আদায় হইবে এবং আদায়ীকৃত টাকাও শুধু প্রাপকের হিসাবে 'ক্রেডিট' হইবে। এক্ষেত্রে আদায়কারী ব্যাঙ্কে প্রাপকের হিসাব না থাকিলে চেক ভাঙানো যাইবে না।

(৫) হস্তান্তর অযোগ্য কিংবা অসম্প্রদেয় (Not Negotiable) লেখার বিশেষ তাৎপর্য আছে। ইহার অর্থ ইহা নয় যে, উহা হাতবদল হইতে পারিবে না। পর পর পিঠসহি (Endorsement) দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য দলিল (Negotiable Instrument) যেভাবে হাতবদল হয় এক্ষেত্রেও সেরূপ করা চলে। তবে আইনসঙ্গত ধারকের (Holder) স্বার্থ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্যই এ কথা দুইটি আড়ির ভিতর লেখা হইয়া থাকে। ইহার আইনগত অর্থ এই যে, একখানা চেকের কোন ধারক তাহার পূর্ববর্তী ধারকের উক্ত চেকে যে স্বত্ব ছিল তাহার অপেক্ষা অধিক ভাল স্বত্ব (Better Title) পায় না। চুরি করা চেক উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করিলেও এরূপ চেকে গ্রহীতার কোন স্বত্ব জন্মে না। সুতরাং 'হস্তান্তর অযোগ্য' লেখা চেক গ্রহণ করিবার সময় গ্রহীতাকে জানিয়া লইতে হইবে যে, যাঁহার নিকট হইতে তিনি উক্ত চেক গ্রহণ করিতেছেন তাঁহার উহাতে ভাল স্বত্ব (Good Title) আছে কিনা। হস্তান্তরকারী স্বত্ব সম্বন্ধে সাবধান হইবে (Beware of the title of the transferor)—এই সাবধান বাণীই কথা দুইটির বিশেষ তাৎপর্য। যাঁহার নিকট হইতে চেক গ্রহণ করা হইবে গ্রহীতা তাঁহার স্বত্ব ভালভাবে না দেখিয়া লইলে উক্ত স্বত্বে কোন ত্রুটি ধরা পড়িলে গ্রহীতা বৈধ অধিকারীকে উক্ত চেকের ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

বাণিজ্য-হুণ্ডি এবং উহার বৈশিষ্ট্য (Bill of Exchange and its *characteristics*)

বাণিজ্য-হুণ্ডি একটি ধার দলিল (Credit Instrument) যাহার সাহায্যে এক

ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে দলিলে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ বিনাশর্তে অন্য কাহাকেও কিংবা দলিল বাহককে কোন নির্দিষ্ট দিনে বা চাহিবামাত্র দিবার নির্দেশ দিয়া থাকেন। যিনি বাণিজ্য-হুণ্ডি লিখিয়া থাকেন তাঁহাকে বলা হয় 'আজ্ঞাকারক' (Drawer)। তিনি সাধারণত উত্তমর্ণ হইয়া থাকেন। যাঁহাকে দলিলের টাকা দিবার নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁহাকে বলা হয় 'দায়ক' (Drawee)। তিনি সাধারণত অধমর্ণ হইয়া থাকেন। যিনি টাকা গ্রহণ করেন তাহাকে বলা হয় প্রাপক (Payee)। তিনি সাধারণত আজ্ঞাকারকের পাওনাদার কিংবা আজ্ঞাকারক স্বয়ং।

বাণিজ্য-হুণ্ডির বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

(১) ইহা লিখিত দলিল, মৌখিক নহে।

(২) ইহাতে একজন আজ্ঞাকারক (Drawer) থাকিবেন। তিনি সাধারণত পাওনাদার। কিন্তু উপযোজক হুণ্ডিতে (Accommodation Bill) আজ্ঞাকারক পাওনাদার নহেন। নিজের সুবিধার জন্য উহা প্রস্তুত হইলে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে দেনদার।

(৩) ইহাতে একজন প্রাপক (Payee) থাকিবেন। আজ্ঞাকারক নিজে প্রাপক হইতে পারেন কিংবা তাঁহার পাওনাদারও প্রাপক হইতে পারেন।

(৪) ইহার একপক্ষ দায়ক বা স্বীকারক (Drawee or Acceptor)। ইনি সাধারণত দেনদার। উপযোজক হুণ্ডিতে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

(৫) ইহাতে হুণ্ডি লেখার তারিখ থাকিবে এবং তাহা পরিষ্কারভাবেই লিখিতে হইবে।

(৬) হুণ্ডির মিয়াদকালও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা চাই।

(৭) দলিলটির ভাষা হুকুম বা আদেশের মত হইবে। ভাষায় যেন কোনপ্রকার অনুরোধ প্রকাশ না পায়।

(৮) ইহা শর্তহীন আদেশ (Unconditional Order)।

(৯) দেয় টাকার পরিমাণ সংখ্যায় ও কথায় প্রকাশ করিতে হইবে।

(১০) ইহার টাকা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলিলবাহককে প্রদত্ত হইতে পারে।

(১১) ইহা কোনও নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট দিনে কিংবা চাহিবামাত্র দেয়।

(১২) আজ্ঞাকারক কর্তৃক ইহা স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(১৩) দলিল বলিয়া গ্রাহ্য হইতে হইলে ইহাতে দায়কের স্বীকৃতি বা দায়কের পক্ষ হইয়া অন্য কাহারও স্বীকৃতি প্রয়োজন।

কোন দলিল হুণ্ডি কিনা তাহা উপরি-উল্লিখিত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ দ্বারা স্থির করিতে হইবে।

বাণিজ্য-হুণ্ডি প্রধানত দুই প্রকার :

(১) **আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-হুণ্ডি (Inland Bill of Exchange) :** যে

হুণ্ডির লিখন ও পরিশোধ একই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহাকে ‘আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-হুণ্ডি’ বলে। ইহা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরম সহায়ক।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-হুণ্ডির নমুনা

টিকিট

বড় বাজার
কলিকাতা
২০।৭।৭৩

অদ্য হইতে তিন মাস পরে আমাকে কিংবা
আমার নির্দেশমত কোন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত
মূল্যের বিনিময়ে পাঁচশত টাকা প্রদান
করিবেন।

টাঃ ৫০০'০০

প্রতি
শ্রীরামকানাই মিত্র
কলিকাতা

স্বীকৃত
শ্রীরামকানাই মিত্র
২০।৭।৭৩

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য

(২) **বৈদেশিক বাণিজ্য-হুণ্ডি (Foreign Bill of Exchange):** যে হুণ্ডি একদেশে লিখন এবং ভিন্ন দেশে পরিশোধ হয় তাহাকে ‘বৈদেশিক বাণিজ্য-হুণ্ডি’ বলে। ইহা আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। নিম্নে উহার নমুনা দেওয়া হইল:

কলিকাতা
২৪শে জুন, ১৯৭৩

৫০০ পাঃ

এই আদি হুণ্ডি দেখিবার ৬০ দিন পর (ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় নকল অপ্রদত্ত থাকিলে) প্রাপ্ত মূল্যের বিনিময়ে রায় এণ্ড কোং কিংবা উহাদের আদেশমত অন্য কাহাকেও পাঁচশত পাউণ্ড প্রদান করিবেন।

প্রতি

ব্রাউন এণ্ড কোং
লণ্ডন } ঘোষ এণ্ড কোং
কলিকাতা

হারাইয়া যাইবার ভয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য-হুণ্ডির সাধারণত তিনখানা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে হয় এবং প্রত্যেক প্রতিলিপিতে অন্য দুইখানার কথা উল্লেখ থাকে।

চেক্ ও বাণিজ্য-হুণ্ডির মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Cheque and a Bill of Exchange)

চেক্ ও বাণিজ্য-হুণ্ডির মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

চেক্	বাণিজ্য-হুণ্ডি
১। ইহা সর্বদাই ব্যাঙ্ককে টাকা দিবার নির্দেশ।	১। ইহা সাধারণত কোন ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে টাকা দিবার নির্দেশ।
২। ইহা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত প্রপত্রে লিখিত।	২। ইহা যে-কোন কাগজে লিখিত।
৩। ইহার টাকা চাহিবামাত্র দেয়।	৩। ইহার টাকা চাহিবামাত্র কিংবা নির্দিষ্ট সময় অন্তে দেয়।
৪। ইহাতে স্বীকৃতির প্রয়োজন নাই।	৪। স্বীকৃতি ভিন্ন ইহা কোন দলিল নহে।
৫। আমানতকারী ইহা লিখিয়া থাকেন।	৫। পাওনাদার ইহা লিখিয়া থাকেন।
৬। ইহাতে স্ট্যাম্প প্রয়োজন হয় না।	৬। ইহাতে স্ট্যাম্প দিতে হয়।
৭। ইহা ব্যাঙ্কে উপস্থিত না করিলে চেক প্রদানকারী প্রাপকের নিকট দায়মুক্ত হন না।	৭। ইহা টাকা দিবার তারিখে দায়কের নিকট উপস্থিত না করিলে হুণ্ডি-প্রদানকারী প্রাপকের নিকট দায়মুক্ত হন।
৮। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা না পাওয়া গেলে চেক প্রদানকারীকে দায়ী করার জন্য তাহাকে সে সংবাদ জানান বাধ্যতামূলক নহে।	৮। দায়ক টাকা দিতে অপারগ হইলে সে সংবাদ হুণ্ডি প্রদানকারীকে দেওয়া বাধ্যতামূলক। নতুবা হুণ্ডি প্রদানকারী দায়মুক্ত হন।
৯। ইহাতে রেয়াতী দিন (Days of Grace) বলিয়া কিছু নাই।	৯। ইহাতে তিন দিবস রেয়াতী দিন দেওয়ার নিয়ম আছে।
১০। ইহা দিতে হইলে ব্যাঙ্কে টাকা থাকা প্রয়োজন।	১০। ইহাতে ব্যাঙ্কে টাকা থাকার কোন নিয়ম নাই।

চেক্	বাণিজ্য-হুণ্ডি
১১। ইহা একখানাই কাটা হয়।	১১। বৈদেশিক-হুণ্ডি হইলে ইহা তিনখানা লিখিতে হয়।
১২। ইহা অধমর্ণ অনেকক্ষেত্রে উত্তমর্ণকে টাকা দিবার জন্য লিখিয়া থাকেন।	১২। ইহা প্রধানত উত্তমর্ণ কর্তৃক লিখিত এবং অধমর্ণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া থাকে।

অঙ্গীকারপত্র (Promissory Note)

যে দলিল লিখিয়া কোনও ব্যক্তি মূল্যের বিনিময়ে অপর কোন ব্যক্তি বা উহার নির্দেশমত অন্য কোন ব্যক্তিকে কিংবা দলিলের বাহককে বিনা শর্তে একটি নির্দিষ্ট দিনে বা চাহিবামাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন উক্ত দলিলকে অঙ্গীকারপত্র (Promissory Note) বলে। নিম্নে উহার একটি নমুনা দেওয়া হইল :

> টাঃ ৫০০·০০ কলিকাতা
>
> ৫।৪।৫৪
>
> মূল্য প্রাপ্তির বিনিময়ে চাহিবামাত্র আমি শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিংবা তাঁহার আদেশমত ব্যক্তিকে পাঁচশত টাকা শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা হার সুদসহ কলিকাতায় পরিশোধ করার অঙ্গীকারবদ্ধ হইলাম।
>
> শ্রীবিজয়কুমার মুখার্জী

বাণিজ্য-হুণ্ডি ও অঙ্গীকারপত্রের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Bill of Exchange and Promissory Note)

বাণিজ্য-হুণ্ডি এবং অঙ্গীকারপত্রের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

বাণিজ্য-হুণ্ডি	অঙ্গীকারপত্র
১। ইহা টাকা দিবার আদেশ।	১। ইহা টাকা পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার।

বাণিজ্য-হুণ্ডি	অঙ্গীকারপত্র
২। ইহার লেখক পাওনাদার।	২। ইহার লেখক দেনদার।
৩। ইহাতে স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়।	৩। ইহাতে স্বীকৃতির প্রয়োজন নাই। ইহার অঙ্গীকারই স্বীকৃতি।
৪। ইহাতে তিনপক্ষ—আজ্ঞাকারক, স্বীকারক ও প্রাপক।	৪। ইহাতে দুইপক্ষ—অঙ্গীকারক ও প্রাপক।
৫। প্রয়োজনবোধে, যেমন বৈদেশিক হুণ্ডির ক্ষেত্রে, একাধিক প্রতিলিপির প্রয়োজন।	৫। ইহা একখানাই প্রস্তুত হয়।
৬। ইহা ফেরত হইলে নথিভুক্ত করার কিংবা আপত্তি জানানোর প্রয়োজন হয়।	৬। ইহা ফেরত হইলে নথিভুক্ত করা কিংবা আপত্তি করার প্রয়োজন হয় না।
৭। ইহার একাধিক স্বীকারক থাকিলে উহারা যুক্তভাবে দায়ী।	৭। ইহার একাধিক অঙ্গীকারক থাকিলে উহারা যুক্তভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী।
৮। ইহার স্ট্যাম্পের হার অঙ্গীকারপত্র হইতে পৃথক।	৮। ইহার স্ট্যাম্পের হার বাণিজ্য-হুণ্ডি হইতে পৃথক।

চেক এবং অঙ্গীকারপত্রের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Cheque and a Promissory Note)

চেক ও অঙ্গীকারপত্রের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

চেক্	অঙ্গীকারপত্র
১। ইহাতে সাধারণত তিনপক্ষ—আজ্ঞাকারক, দায়ক ও প্রাপক।	১। ইহাতে সাধারণত দুইপক্ষ—পাওনাদার ও দেনদার।
২। ইহা আদেশপত্র। ব্যাঙ্কের উপর এই আদেশ দেওয়া হয়।	২। ইহা আদেশপত্র নহে। ইহা দেনা শোধের অঙ্গীকারপত্র।
৩। ইহার টাকা চাহিবামাত্র দেয়।	৩। ইহার টাকা চাহিবামাত্র কিংবা নির্দিষ্ট সময়াস্তে দেয়।
৪। ইহা চাহিবামাত্র দেয় হইলেও ব্যাঙ্কে টাকা প্রাপ্তির জন্য উপস্থিত করিতে হয়।	৪। ইহা চাহিবামাত্র দেয় হইলেও দেনদারের নিকট টাকা পরিশোধের জন্য উপস্থিত করিতে হয় না।

চেক্	অঙ্গীকারপত্র
৫। ইহার লেখককে উহা ব্যাঙ্ক কর্তৃক ফেরত না হইলে টাকা পরিশোধের দায়িত্ব লইতে হয় না।	৫। ইহার লেখককেই টাকা পরিশোধের দায়িত্ব লইতে হয়।
৬। ইহাতে স্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয় না।	৬। ইহাতে স্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয়।
৭। ব্যাঙ্কে টাকা না থাকিলে চেক লেখা চলে না।	৭। দেনদারের টাকার অকুলান হইলেই ইহা লেখার প্রয়োজন হয়।
৮। ইহার টাকা ব্যাঙ্ক হইতে উপযুক্ত সময়ে গ্রহণ না করিলে লেখক দায়মুক্ত হন না।	৮। ইহার টাকা উপযুক্ত সময়ে দেনদারের নিকট হইতে আদায় না হইলে দেনদার দায়মুক্ত হন।
৯। ইহা ব্যাঙ্কের প্রদত্ত ছাপানো প্রপত্রে লিখিত হয়।	৯। ইহা যে-কোন কাগজে লেখা চলে।
১০। ইহা ব্যাঙ্কের উপর লিখিত হয়।	১০। ইহা যে-কোন ব্যক্তিই লিখিতে পারে।

টাকা-পয়সা প্রেরণের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different Methods of remittance facilities)

টাকা-পয়সা প্রেরণের বা মূল্য পরিশোধের বিভিন্ন প্রণালী হইতে পারে। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল :

(ক) **নগদ টাকা (Cash) :** ক্রীত জিনিসের মূল্য নগদ টাকায় দেওয়া চলে। নগদ টাকা বলিতে প্রচলিত ধাতুমুদ্রা, কাগজীমুদ্রা প্রভৃতিকে বুঝায়। ক্রীত জিনিসের মূল্য বেশী না হইলে বা দূরে পাঠাইতে না হইলে নগদ টাকায় মূল্য পরিশোধ সুবিধাজনক।

(খ) **পোস্টাল অর্ডার (Postal Order) :** নগদ টাকার বিনিময়ে পোস্ট-অফিস ৫০ পয়সা হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত একপ্রকার ছাপান কাগজ বিক্রয় করে। উহার প্রতিখানা ক্রয় করিতে ১০ পয়সা অতিরিক্ত ব্যয় পড়ে। ইহা পোস্ট-অফিস হইতে ক্রয় করিয়া যাঁহাকে টাকা দিতে হইবে তাঁহার নাম উহার উপর লিখিয়া ডাকযোগে তাঁহাকে পাঠাইতে হয়। তিনি নিকটবর্তী পোস্টঅফিসে উহা দাখিল করিয়া উহাতে উল্লিখিত টাকা লইয়া থাকেন। পোস্টাল অর্ডারের উপর দুইটি সমান্তরাল রেখা টানিয়া উহাকে আড়ি চেকের (Crossed Cheque) সমতুল্য করা যাইতে পারে। প্রাপককে এরূপ পোস্টাল অর্ডার ব্যাঙ্কের মারফত ভাঙাইতে হয়। প্রকৃত প্রাপক ইহার টাকা পাইল কিনা ইহাতে সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

টাকার পরিমাণ কম হইলে এভাবে পরিশোধ করা চলে। ব্যবসা জগতে ইহা বিশেষ চালু নয়। সাধারণত সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বহু পাওনা ইহার দ্বারা পরিশোধ হয়। সরকারী চাকুরীর অধিকাংশ আবেদনপত্রের 'ফি'-ও ইহার দ্বারা পরিশোধ হয়।

(গ) **মনি অর্ডার (Money Order) :** পোস্টঅফিসে টাকা পাঠানোর জন্য একপ্রকার 'ফরম' পাওয়া যায়। উক্ত ফরম পূরণ করিয়া ফরমসহ টাকা ও টাকা পাঠানোর ব্যয় পোস্টঅফিসে দাখিল করিলে টাকা প্রাপকের পোস্টঅফিস ফরমে লিখিত পরিমাণ টাকা উহাকে দিয়া থাকে। এভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে পোস্টঅফিসের মারফত একখানা মনি অর্ডারের মাধ্যমে ১০০০'০০ টাকা পর্যন্ত পাঠানো যায়।

(ঘ) **তারযোগে মনি অর্ডার (Telegraphic Money Order) :** দ্রুত টাকা পাঠানোর বা পরিশোধের প্রয়োজন হইলে উপরি-উক্ত মনি অর্ডারের সহিত 'তার' করার ফি জমা দিলে পোস্টঅফিস প্রাপকের পোস্টঅফিসকে তারযোগে উল্লিখিত টাকা প্রাপককে দিবার নির্দেশ দিয়া থাকে।

(ঙ) **ট্রেজারি চালান (Treasury Chalans) :** সরকারের ধনাগারকে Treasury বলে। যেখানে এরূপ Treasury আছে তথায় নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিয়া রসিদ বা চালান গ্রহণ করিতে হয়। উক্ত রসিদ বা চালান প্রাপকের নিকট পাঠাইলে তিনি নিকটবর্তী Treasuryতে উহা দাখিল করিয়া টাকা গ্রহণ করিতে পারেন। সাধারণত সরকারকে টাকা পরিশোধ করা এ উপায়ে বিশেষ সুবিধাজনক।

(চ) **চেকস্ (Cheques) :** ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে আমানতকারীকে উক্ত টাকা পুনরায় গ্রহণ করিতে হইলে বা উক্ত টাকা হইতে অন্য কাহাকেও দিতে হইলে চেকের ব্যবহার করিতে হয়। 'চেক' ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠানোর ছাপান ফরম। উহা ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে দিয়া থাকে। উক্ত 'চেক' পূরণ করিয়া উহা কাহাকেও দিলে তিনি উহা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া টাকা গ্রহণ করিতে পারেন। ব্যবসা-ক্ষেত্রে নগদ টাকার পরিবর্তে 'চেকের' ব্যবহারই বেশী হইয়া থাকে।

(ছ) **বাণিজ্য-হুণ্ডি (Bill of Exchange or Hundi) :** ব্যবসাজগতে দূরে টাকা পাঠাইবার জন্য কিংবা ধারে বিক্রয়ের জন্য কিংবা ব্যবসায়ীদের নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য একপ্রকার দলিল ব্যবহৃত হয়। উক্ত দলিল বিক্রেতা কিংবা উত্তমর্ণ কর্তৃক লিখিত হয় এবং উহাতে ক্রেতা বা অধমর্ণকে নির্দিষ্ট সময় অন্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার নির্দেশ থাকে। উক্ত দলিল ক্রেতা বা অধমর্ণ দ্বারা স্বীকৃত হইলে যাঁহার নিকট উক্ত দলিল থাকিবে তিনি উক্ত দলিলের টাকা নির্দিষ্ট দিনে পাইবার অধিকারী হন। এজাতীয় দলিলকে 'বাণিজ্য-হুণ্ডি' বলে।

(জ) **অঙ্গীকারপত্র (Promissory Notes) :** হুণ্ডির প্রয়োজন 'অঙ্গীকার-পত্র' দ্বারাও মিটানো চলে। তবে ইহা অধমর্ণ স্বয়ং লিখিয়া উত্তমর্ণকে টাকা দিবার অঙ্গীকারাবদ্ধ হন।

(ঝ) **ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ (Bank Drafts) :** এক ব্যাঙ্ক-অফিস উহার অন্য শাখা ব্যাঙ্ক-অফিসকে বা প্রতিনিধিকে চেক্ দ্বারা যে টাকা দিবার নির্দেশ দিয়া থাকে উহাকে ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ বলে। ইহার সাহায্যেও ব্যবসাজগতে প্রচুর লেন-দেন হইয়া থাকে।

উপরি-উক্ত যে কোন প্রণালীতে মূল্য পরিশোধ করা চলে। তবে ক্ষেত্রকর্মবিধায় কোন্‌টি সুবিধাজনক তাহা বাছিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু বিদেশে মূল্য পরিশোধ ব্যাপারে টাকা মনি অর্ডার করা চলে না। বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য পরিশোধের জন্য বাণিজ্য-হুণ্ডি ও ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন-দেনে ঋণ সংস্থান (Credit accommodation for foreign trade transactions)

বৈদেশিক বাণিজ্যে ঋণ সংস্থান ব্যাপারে ঋণের নিদর্শনপত্র (Letter of Credit) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ইহার ফলে রপ্তানীকারক স্বীকারযোগ্য দলিলী হুণ্ডি (D/A Bills) প্রস্তুত করিয়া বিনিময় ব্যাঙ্কের মারফত ভাঙ্গাইয়া লন।

অর্ডার অনুযায়ী মাল পাঠাইয়া উহার মূল্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে রপ্তানীকারককে নিশ্চিত হইতে হইলে ঋণের নিদর্শনপত্র বা প্রত্যয়পত্র (Letter of Credit) ব্যবহৃত হয়। আমদানীকারকের পক্ষ হইয়া রপ্তানীকারকের দেশে অবস্থিত কোনও ব্যাঙ্ক রপ্তানীকারককে পণ্যের মূল্য প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি পত্র দিয়া থাকে উহাকে ঋণের নিদর্শনপত্র বলে। ইহা বৈদেশিক বাণিজ্যে টাকা-পয়সা লেন-দেন ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। জাহাজে মাল পাঠাইয়া রপ্তানীকারক এই নিদর্শনপত্রের বলে মালের দলিলাদি ব্যাঙ্কে জমা দিয়া নগদ টাকা গ্রহণ করিতে পারেন কিংবা বাণিজ্য-হুণ্ডি (Bill of Exchange) অগ্রিম ভাঙ্গাইয়া লইতে পারেন। আমদানীকারক নিজের দেশের কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিয়া কিংবা অন্য উপায়ে ঋণের ব্যবস্থা করিয়া ঐ ব্যাঙ্কের বিদেশস্থ শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাঙ্ক মারফত রপ্তানীকারককে এরূপ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

এই ঋণের নিদর্শনপত্র সাধারণত দুই শ্রেণীর দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঋণের নিদর্শনপত্র যে কোন সময়ে প্রত্যাহার করার ক্ষমতা থাকিলে উহাকে **প্রত্যাহার-যোগ্য ঋণের নিদর্শনপত্র (Revocable Letter of Credit)** বলে। এই প্রকার ঋণকে প্রত্যাহারযোগ্য ঋণ বলা হয়। যাঁহার পক্ষ হইয়া ঋণের নিদর্শনপত্র দেওয়া হয় তাঁহার অনুমতি ভিন্ন যদি উহা প্রত্যাহার করা না যায় তবে উহাকে **স্থায়ী এবং অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণের নিদর্শনপত্র (Confirmed and Irrevocable Letter of Credit)** বলে।

ইহা ছাড়া আরও নানাপ্রকার শর্তে এই প্রত্যয়পত্র প্রদান করা হয়। জাহাজে প্রেরিত পণ্যের দলিলপত্র হুণ্ডির সহিত যুক্ত হইবার শর্তে প্রত্যয়পত্র প্রদেয় হইলে

উহাকে বলা হয় 'দলিল সাপেক্ষ প্রত্যয়' (Documentary Credit)। কিন্তু প্রেরিত পণ্যের দলিল হুণ্ডির সহিত যুক্ত হওয়ার কোন শর্ত না থাকিলে উহাকে বলা হয় 'সাদা প্রত্যয়' (Clean Credit)। ক্রেতার হুণ্ডিতে স্বীকৃতিদানের ভিত্তিতে যে প্রত্যয়ের ব্যবস্থা হয় উহাকে বলা হয় 'স্বীকৃতি সাপেক্ষ প্রত্যয়' (Acceptance Credit)। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের জন্য হুণ্ডি কাটিবার নির্দেশ থাকিলে উহাকে বলা হয় 'নির্দিষ্ট প্রত্যয়' (Fixed Credit)। প্রেরিত পণ্য জামিন রাখিয়া রপ্তানীকারক যদি প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে গ্রহণ করেন তবে উহাকে বলা হয় 'প্রয়োজনীয় অর্থ আদায়ের প্রত্যয়' (Omnibus Credit)। অনেক সময় এরূপ বন্দোবস্ত থাকে যে, নির্দিষ্ট শর্ত পালিত হইলে ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ পুনঃপুনঃ মঞ্জুর করিবে। এরূপ পুনঃপুনঃ মঞ্জুরীকৃত প্রত্যয়কে 'আবর্তিত প্রত্যয়' (Revolving Credit) বলে। আমদানীকারকের ব্যাঙ্ক যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের হুণ্ডিগুলিকে হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে উহার রপ্তানীকারকের দেশস্থ শাখা বা প্রতিনিধিকে নির্দেশ দিয়া থাকে তাহা হইলে এই নির্দেশপত্র সমন্বিত প্রত্যয়কে 'হস্তান্তরযোগ্য প্রত্যয়' (Negotiable Credit) বলে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্যমূল্য পরিশোধ ব্যাপার ছাড়া অবাণিজ্যিক (Non-commercial) ক্ষেত্রেও ঋণের নিদর্শনপত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ভ্রমণকারীর ঋণের নিদর্শনপত্র (Traveller's Letter of Credit) উল্লেখযোগ্য। ইহা দেশান্তরে বা দেশাভ্যন্তরে ভ্রমণকারীকে দেওয়া চলে। কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া ভ্রমণকারী এরূপ পত্র পাইতে পারেন। ইহাতে উক্ত ব্যাঙ্ক উহার শাখা বা প্রতিনিধিগণকে উক্ত ভ্রমণকারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার নির্দেশ বা অনুরোধ করিয়া থাকে। ভ্রমণকারী উহা বহন করিয়া থাকে এবং যে সকল ব্যাঙ্কের উপর এরূপ নির্দেশ থাকে উহাদের নিকট উক্ত পত্র উপস্থিত করিলে নির্দেশমত টাকা পাইয়া থাকেন। ভ্রমণকারী ভিন্ন ব্যবসায়িগণও ইচ্ছা করিলে এরূপ পত্র গ্রহণ করিতে পারেন।

ইহা ছাড়া আমদানীকারক ব্যাঙ্কের গুদামে কিংবা কোনও সরকারী গুদামে আমদানীকৃত পণ্য জমা রাখিয়া এবং ব্যাঙ্কের নিকট উহা বন্ধক (Hypothecation) রাখিয়া অর্থের সংস্থান করিয়া লইতে পারেন এবং রপ্তানীকারকের প্রাপ্য মিটাইয়া ফেলিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় আমদানীকারক ব্যাঙ্ককে ক্রমে ক্রমে টাকা পরিশোধ করিয়া গুদাম হইতে মাল খালাস করিয়া লন।

ব্যাঙ্কের নিকাশ-ব্যবস্থা (Bank Clearing System)

ব্যাঙ্ক ব্যবসা চালু হওয়ায় এবং উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ায় ব্যবসা-জগতে অধিকাংশ লেন-দেন চেকের মারফত সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যবসায়ীই যাঁহার ব্যাঙ্কে হিসাব খোলা আছে তাঁহার দেনদারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত চেকের

টাকা আদায়ের জন্য তাঁহার যে ব্যাঙ্কে হিসাব খোলা আছে তথায় জমা দিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই প্রত্যহ অনেক চেক এইভাবে জমা পড়িতেছে। এইভাবে প্রত্যেক ব্যাঙ্কেরই অন্য অনেক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা পাওয়ার অধিকার জন্মিয়া থাকে। এক ব্যাঙ্ককে অন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাইতে হইলে দেয় ব্যাঙ্কে চেক উপস্থিত করিতে হয়। এইভাবে টাকা আদায় করিতে হইলে রীতিমত শ্রম ও লোকের প্রয়োজন। ইহাতে যে প্রচুর অসুবিধা সৃষ্টি হয়—বলাই বাহুল্য। এই অসুবিধা দূর করার জন্য প্রত্যেক বড় বড় শহরে ও ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্রে একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে। উক্ত স্থানে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের আমানতকারীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত চেকগুলি লইয়া উপস্থিত হন এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের উপর লিখিত চেকের পারস্পরিক হিসাব-নিকাশ করিয়া দেনা-পাওনা মিটাইয়া থাকেন। এই ব্যবস্থাই 'নিকাশ ব্যবস্থা' (Clearing System) নামে পরিচিত। যে স্থানে মিলিত হইয়া এরূপ হিসাব-নিকাশের কার্য সম্পন্ন হয় সে স্থানকে 'নিকাশ ঘর' (Clearing House) বলে। সাধারণত কোনও বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক এই নিকাশ ঘরের কাজ করিয়া থাকে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কও এরূপ একটি নিকাশ ঘর যে সমস্ত ব্যাঙ্ক এইভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের দেনা-পাওনা মিটাইয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেককে 'নিকাশী ব্যাঙ্ক' (Clearing Bank) বলে।

যে বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক নিকাশ ঘরস্বরূপ কাজ করিয়া থাকে উক্ত ব্যাঙ্কে প্রত্যেক নিকাশী ব্যাঙ্কের একটি হিসাব রাখিতে হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে এরূপ ব্যবস্থাতেও নগদ টাকা-পয়সার লেন-দেন হয় না। উক্ত হিসাব-নিকাশের পর যে ব্যাঙ্কের টাকা পাওনা হয় সে ব্যাঙ্কের হিসাবে উক্ত টাকা জমা ধরিয়া লওয়া হয় এবং যে ব্যাঙ্ককে উক্ত টাকা দিতে হয় সে ব্যাঙ্কের হিসাবে উক্ত টাকা খরচ হিসাবে লিখিয়া রাখা হয়। নিকাশ ব্যবস্থার দ্বারা এইভাবে নগদ টাকার লেন-দেন না করিয়া অল্প পরিশ্রমে প্রভূত পরিমাণ টাকার দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. Define principal classes of markets and describe the functions of each. [C. U. B. Com. (Hons.) 1968]

বিভিন্ন প্রকার বাজারের সংজ্ঞা দাও এবং উহাদের প্রত্যেকের কাজ বর্ণনা কর।

2. What are the respective functions of Commodity Markets, Capital Markets and Money Markets ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

পণ্যের বাজার, মূলধনের বাজার ও টাকার বাজারের কাজ কি ?

3. Explain the working of a Produce Exchange.

[C. U. B. Com. 1964]

কাঁচামালের বাজারের কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

4. Discuss the role of Produce Exchange in trade and industry.

[C. U. B. Com. (Pass) 1965]

শিল্পবাণিজ্যে কাঁচামালের বাজারের ভূমিকা আলোচনা কর।

5. Explain the working of Futures Market.

ফটকা বাজারের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।

6. Discuss the services rendered by Futures Markets. Also state the steps taken for preventing these markets from becoming places of gambling. [C. U. B. Com. (Hons.) 1967]

ফটকা বাজারের অবদান আলোচনা কর। ইহা যাহাতে জুয়াখেলার আড্ডা না হয় তজ্জন্য যে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে উহা উল্লেখ কর।

7. Discuss the functions of the 'Futures' and 'Forward' Markets. Do they prevent speculation ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1969]

ফটকা বাজার ও অগ্রিম বাজারের কার্যাবলী আলোচনা কর। উহারা কি ফটকাবাজী বন্ধ করে ?

8. "Capital market has substantially changed in recent years in India." Explain. [C. U. B. Com. (Hons.) 1970]

ভারতের মূলধন বাজার বর্তমানে রীতিমত পরিবর্তিত হইয়াছে।

9. "The Stock Exchange helps in the orderly flow of distribution of savings as between different types of competitive investments." Discuss the statement and show how the stock Exchange regulates the investment psychology.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1970]

বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতামূলক লগ্নির ব্যাপারে শেয়ার বাজার সঞ্চয়কে সুশৃঙ্খলভাবে প্রবাহিত করে। ইহা আলোচনা কর এবং দেখাও শেয়ার বাজার কিভাবে লগ্নির মনস্তত্ত্বকে নিয়মিত করে।

10. Discuss the role played by Stock Exchanges towards economic development. [C. U. B. Com. (Pass) 1966]

শেয়ার বাজার অর্থনৈতিক উন্নতিতে যে ভূমিকা গ্রহণ করে উহা আলোচনা কর।

11. What are the functions of a Stock Exchange ? Describe the constitution of the Calcutta Stock Exchange Association.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1968]

শেয়ার বাজারের কি কাজ? কলিকাতা শেয়ার বাজার সমিতির গঠন বর্ণনা কর।

12. Describe the functions of the Calcutta Stock Exchange.
[C. U. B. Com. (Pass) 1968 ; (Pass) 1969]

কলিকাতা শেয়ার বাজারের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

13. Define speculation. Discuss the economic significance of speculation.

ফটকাবাজী কাহাকে বলে? উহার অর্থ নৈতিক তাৎপর্য আলোচনা কর।

14. What is an Investment Trust? How does Management Trust differ from a Unit Trust? State the role of Unit Trust of India. [C. U. B. Com. 1968]

বিনিয়োগকারী ট্রাস্ট কাহাকে বলে? ব্যবস্থাপনা ট্রাস্ট এবং ইউনিট ট্রাস্টের মধ্যে পার্থক্য কি? ভারতের ইউনিট ট্রাস্টের ভূমিকা আলোচনা কর।

15. Discuss the functions of and services rendered by the Unit Trust of India. [C. U. B. Com. (Hons.) 1969]

ভারতের ইউনিট ট্রাস্টের কাজ ও অবদান আলোচনা কর।

16. Explain the functions of Commercial Banks in helping trade and industry. How such a Bank raises its funds?
[C. U. B. Com. (Hons.) 1967]

শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্যকারী হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর। এরূপ ব্যাঙ্ক কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করে?

17. The recent increase in the Bank Rate of Reserve Bank by half per cent is appreciated by some and condemned by others. What are your views? [C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যাঙ্কের হার অর্ধ-শতাংশ বৃদ্ধি করা কেহ সমর্থন করেন এবং কেহ উহার নিন্দা করিয়া থাকেন। তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

18. Discuss the pros and cons of the Nationalisation of Commercial Banks.

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণের সপক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তিগুলি আলোচনা কর।

19. What is Social Control over Banks? Discuss its merits and demerits.

ব্যাঙ্কের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কাহাকে বলে? উহার গুণাগুণ আলোচনা কর।

20. Give an account of the different kinds of short-term lending by Commercial Banks.

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের স্বল্প-মিয়াদী ঋণদানের বিভিন্ন প্রণালীর বিবরণ দাও।

21. What are Negotiable Instruments ? Give an account of the different kinds of Negotiable Instruments with their distinctive features and difference.

হস্তান্তরযোগ্য দলিল কাহাকে বলে ? উহাদের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যসহ বিবরণ লিখ।

22. Give an account of the different kinds of inland and foreign remittance facilities.

স্বদেশ ও বিদেশে টাকা-পয়সা পাঠানোর বিভিন্ন পদ্ধতির বিবরণ দাও।

23. Give an account of credit accommodation for foreign trade transactions.

বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন-দেনে ঋণ সংগ্রহের একটি বিবরণ দাও।

24. Give an account of bank clearing system.

ব্যাঙ্কের নিকাশ-ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

25. Discuss the part played by the Unit Trust of India in the Indian Capital Market. [C. U. B. Com. (Hons.) 1971]

ভারতীয় মূলধন বাজারে ভারতের ইউনিট ট্রাস্টের ভূমিকা আলোচনা কর।

26. Con pare and contrast capital market and money market. Enumerate the principal constituents of each.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1972]

মূলধন বাজার ও টাকার বাজারের মধ্যে তুলনা কর। প্রত্যেকের সদস্যদের নাম উল্লেখ কর।

একবিংশ অধ্যায়

বীমা

(Insurance)

বীমা এবং উহার প্রয়োজনীয়তা (Insurance and its Importance)

যে চুক্তি দ্বারা কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোন দুর্ঘটনা বা ক্ষতির জন্য কিংবা নির্দিষ্ট সময় অন্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয় সেই চুক্তিকে **বীমা** (**Insurance**) বলে।

দুইপক্ষ ভিন্ন চুক্তি হয় না। বীমাচুক্তিতেও দুইটি পক্ষ বর্তমান।

বীমাচুক্তিতে যিনি দুর্ঘটনা বা ক্ষতির জন্য কিংবা নির্দিষ্ট সময় অন্তে অর্থপ্রদান করিবার জন্য ঝুঁকি বহন করেন তাঁহাকে **বীমাকারী (Insurer)** বলা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে দুর্ঘটনা বা ক্ষতির জন্য বা নির্দিষ্ট সময় অন্তে বীমাকারী যাহাকে অর্থপ্রদান করিয়া থাকে বা যাহার জন্য বীমার ঝুঁকি বহন করিয়া থাকে তাহাকে **বীমাকৃত ব্যক্তি (Insured)** বলে। যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কিস্তিতে বা একযোগে বীমার ঝুঁকি বহনের জন্য বীমাকৃত ব্যক্তি বীমাকারীকে দিয়া থাকেন তাহাকে **বীমা মাশুল (Premium)** বলা হয়।

বীমার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে :

১। মানুষ নানাপ্রকার ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপদ-আপদের ঝুঁকি লইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। মানুষের জীবন, ধন-সম্পত্তি প্রভৃতির কোন্‌টা কখন কোন্ ক্ষতি বা বিপদের সম্মুখীন হয় কিছুই বলা যায় না। নানাপ্রকার ক্ষয়-ক্ষতি ও আপদ-বিপদের জন্য মানুষকে অনেক সময় সর্বস্বান্ত হইতে হয়। সুতরাং মানুষের এই বিপদের গুরুত্ব অপরিসীম এবং উহার বিস্তৃতিও ব্যাপক। ইহা তাহার ব্যক্তিগত জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া চলাফেরা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। মানুষের মৃত্যু ছাড়া অন্য বিপদ বা ক্ষতি যে সকলের সমানভাবে ঘটিবে ইহার অবশ্য কোন নিশ্চয়তা নাই। কাহারও হয়ত সামান্য ক্ষতির মধ্য দিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে, আবার কাহারও হয়ত পর পর অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। কখন্ কাহার কি বিপদ বা ক্ষতি ঘটে সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা চলে না সত্য, কিন্তু মানুষকে যে নানাপ্রকার ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপদ-আপদের ঝুঁকি লইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয় ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তাই কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সমাজ-জীবনে এরূপ নানাবিধ অকল্যাণকর ঝুঁকি লইয়া নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টায় ব্রতী থাকিতে পারেন না। মানুষের উদ্‌গ্রীব মন এরূপ অকল্যাণকর পরিস্থিতি হইতে যতটা সম্ভব অব্যাহতি পাইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। বীমার প্রয়োজনীয়তা এইখানেই। বীমা কোম্পানী মানুষের কোন

ক্ষতি বা দুর্ঘটনা ঘটিলে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার বিনিময়ে অবশ্য বীমা কোম্পানীকে কিস্তিতে কিস্তিতে বীমা মাশুল (Premium) দিতে হয়। এই বীমা কোম্পানী স্বল্প পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে বিরাট টাকার ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে। এইভাবে বীমা মানুষের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া থাকে এবং তাহার সমাজ-জীবনে নিরাপত্তা আনিয়া দেয়। বীমা মানুষের কোন ক্ষতি বা দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে পারে না। ইহা তাহার কোন ক্ষতি বা দুর্ঘটনা ঘটিলে তজ্জন্য চুক্তি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। ইহাতে কোন ক্ষতি বা দুর্ঘটনার যতটা লাঘব হয় তাহাই বীমার দ্বারা সম্ভব। কিন্তু এরূপ অর্থপ্রদান দ্বারাও মানুষের কম উপকার সাধিত হয় না। জীবন বীমা করার পর কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে বীমা কোম্পানী মৃতব্যক্তিকে অবশ্যই জীবন দান করিতে পারে না। কিন্তু এজন্য বীমা কোম্পানী চুক্তিমত অর্থপ্রদান করিয়া উক্ত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে অন্যপ্রকারে জীবন দান করিয়া থাকে। উক্ত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি বীমার টাকার অভাবে হয়ত চরম দুর্গতির সম্মুখীন হইত এবং অনাহারে-অনিদ্রায় মৃত্যুবরণ করিত। আমাদের দেশে গরীব-মধ্যবিত্ত পরিবারে এরূপ বিপদ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় জীবনবীমা করা থাকিলে অনেক পরিবারই যে রক্ষা পাইতে পারে ইহা বলাই বাহুল্য। কোন বীমাকৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় ও নির্দিষ্ট সময় অন্তে বীমার টাকা পাইতে পারেন। তখনও উক্ত টাকা তাঁহার অনেক উপকারে লাগিয়া থাকে। উক্ত টাকার অভাবে হয়ত তাঁহার কন্যার বিবাহ বা পুত্রের অধ্যয়ন বিঘ্নিত হইত। কোনও ব্যক্তি হয়ত ব্যবসার জন্য অনেক টাকার মাল গুদামজাত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন কারণে উক্ত গুদামে অগ্নি সংযোগ হইলে তাঁহার গুরুতর ক্ষতি হয়। গুদামে মাল মজুত রাখিয়া স্বভাবতই তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিবেন না। কিন্তু উক্ত মাল সামান্য বীমা মাশুলের (Premium) বিনিময়ে অগ্নি বীমা করা থাকিলে তিনি নিশ্চিন্ত মনেই ব্যবসায়ে মন দিতে পারেন। অগ্নির দ্বারা হঠাৎ কোন ক্ষতি হইলে বীমা কোম্পানী উক্ত ক্ষতিপূরণ করিবে। সমুদ্রে জাহাজ চলাচলে জাহাজ ডুবির ভয় আছে। কোন ব্যক্তি কলিকাতা হইতে প্রচুর টাকার মাল জাহাজযোগে লণ্ডনে প্রেরণ করিয়া অবশ্যই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। কিন্তু উক্ত মালের নৌ বীমা করা থাকিলে তিনি অবশ্যই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। যে জাহাজে মাল প্রেরিত হইতেছে উক্ত জাহাজ সমুদ্রমগ্ন হইলে কেবল জাহাজ-বাহিত মালের মালিকই ক্ষতিগ্রস্ত হন না, জাহাজেরও মালিক ইহাতে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন। জাহাজখানা নৌ বীমা করা থাকিলে তাঁহাকে আর এই ক্ষতির ঝুঁকি বহন করিতে হয় না। ইহা ছাড়া, মোটর বা বিমান দুর্ঘটনা, অপহরণ, শ্রমিকের দুর্ঘটনা, বেকারত্ব, কর্মচারীর বিশ্বস্ততা, শ্রমিকের স্বাস্থ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার বীমার দ্বারা উক্ত বিভিন্ন প্রকারের ক্ষয়-ক্ষতি হইতে মানুষ অব্যাহতি পাইতে পারে। সুতরাং সমাজ-জীবনে বীমার প্রয়োজনীয়তা যে কত, উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে তাহা উপলব্ধি করিতে কাহারও অসুবিধা হইবে না।

২। বীমার প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য ক্ষেত্রেও কম নয়। বীমা করার পর যে বীমাপত্র (Insurance Policy) পাওয়া যায় প্রয়োজনবোধে উহা ব্যাঙ্ক কিংবা উক্ত বীমা কোম্পানীতে বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করা যায়। সুতরাং অর্থাভাব ঘটিলেও বীমাপত্র এইভাবে মানুষের উপকারে আসিয়া থাকে।

৩। কোন ব্যক্তি-বিশেষের জীবন ভিন্ন যৌথ জীবন বীমাও প্রচলিত আছে। সেক্ষেত্রে একজনের মৃত্যু ঘটিলে পুরা টাকা পাওয়া যায়। অংশীদারী কারবারের অংশীদারদের যৌথ জীবন বীমা বিশেষ কার্যকরী দেখিতে পাওয়া যায়। অংশীদারী কারবারের কোনও অংশীদারের মৃত্যু হইলে তাহার প্রাপ্য তাহার উত্তরাধিকারীকে দিয়া দিতে হয়। এরূপ অবস্থায় ব্যবসা হইতে নগদ টাকা দিতে হইলে ব্যবসায়ের প্রভূত ক্ষতি হইতে পারে। অংশীদারদের যৌথ জীবন বীমা করা থাকিলে এরূপ অবস্থায় যে টাকা বীমা কোম্পানী হইতে পাওয়া যায় তাহা মৃতব্যক্তির ওয়ারিশগণকে অনায়াসে দেওয়া চলে।

৪। বীমা কোম্পানী বীমা মাশুল (Premium) বাবদ যে টাকা পাইয়া থাকে তাহার সুষ্ঠু বিনিয়োগ ভিন্ন বীমা কোম্পানীর উপযুক্ত লাভ হইতে পারে না। তজ্জন্য বীমা কোম্পানী শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধার দিয়া বা শেয়ার ক্রয় করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিতেও সহায়তা করিয়া থাকে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট বিটেন প্রভৃতি দেশ বীমা কোম্পানীর কল্যাণে এবিষয়ে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করিয়াছে।

আমাদের দেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণে এবং শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য জীবন বীমা ও সাধারণ কোম্পানীগুলি রাষ্ট্রীয়করণ (Nationalisation) করা হইয়াছে।

সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক ক্ষেত্রে বীমার দান অশেষ—ইহা অনস্বীকার্য।

বীমাচুক্তির বৈশিষ্ট্য ও নীতি (Characteristics and Principles of Insurance Contract)

বীমা চুক্তির নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যক নীতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) ইহা ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের চুক্তি (Contract of Indemnity) কিংবা কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটিলে তখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার চুক্তি (a contract to pay a certain sum of money on the happening of a certain event)।

ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের চুক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, বীমা কোম্পানী বীমা মাশুলের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কোন ক্ষতি সংঘটিত না হইলে ক্ষতি-পূরণের প্রশ্নই উঠে না এবং আদায়ীকৃত বীমা মাশুলের টাকা বীমা কোম্পানীরই থাকিয়া যায়। উহা ফেরত দেওয়ারও প্রশ্ন উঠে না। অগ্নি বীমা, নৌ বীমা প্রভৃতি ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের চুক্তি (Contract of Indemnity)। অগ্নি বীমায় অগ্নিকাণ্ডের

ফলে কোন সম্পত্তির ক্ষতি হইলে বীমা কোম্পানী উক্ত ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে। নৌ বীমায় সমুদ্রযাত্রায় জাহাজের কিংবা উহার মালের কিংবা জাহাজ ও মাল উভয়ের ক্ষতির ফলে মাশুলের লোকসান হইলে বীমা কোম্পানী উক্ত ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতিই পূরণ হইয়া থাকে। অতিরিক্ত অর্থ বীমা কোম্পানী প্রদান করে না। কিন্তু অগ্নি বীমা কিংবা নৌ বীমার মত জীবন বীমা প্রকৃতপ্রস্তাবে ক্ষতিপূরণের চুক্তি নহে। ক্ষয় ক্ষতি একটা আকস্মিক ঘটনা যাহার জন্য বীমা করা থাকিলে কোন ক্ষয়-ক্ষতি সংঘটিত হইলে উহা বীমা কোম্পানী পূরণ করিয়া থাকে। যে ক্ষতির জন্য বীমা করা হইল উহা সংঘটিত না হইলে কোন অর্থই বীমা কোম্পানী প্রদান করে না। কিন্তু জীবন বীমায় বীমা কোম্পানীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতেই হয়। উক্ত অর্থ-প্রদান দুইটি ঘটনার যে-কোনটি ঘটিলেই করিতে হয়। একটি হইল নির্দিষ্ট বয়ঃপূর্তি এবং দ্বিতীয়টি হইল মৃত্যু। এই উভয়-বিধ ঘটনাই মানুষের জীবনে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং জীবন বীমায় টাকা প্রাপ্তির কোন অনিশ্চয়তা নাই। তাহা ছাড়া, নির্দিষ্ট বয়ঃপূর্তিতে টাকা পাওয়াটা কোন ক্ষতি-পূরণের পর্যায়ে পড়ে না। আর মানুষের মৃত্যু হইলে উহার জন্য যে ক্ষতি তাহা সম্পত্তির ক্ষতির মত টাকার অঙ্কে হিসাব করা যায় না। জীবন বীমাতে বীমা কোম্পানীর প্রকৃত ক্ষতি নির্ণয় করারও প্রয়োজন হয় না। যে পরিমাণ টাকার বীমা করা হইয়াছে উহা প্রদান করাই ইহার কর্তব্য।

(২) বীমা চুক্তিতে অর্থগত বীমা-স্বার্থ (Insurable Interest) থাকা চাই। ইহার অর্থ এই যে, বীমাকৃত ব্যক্তির (Insured) ইহাতে এতটা স্বার্থ থাকিতে হইবে যাহাতে বীমার বিষয়বস্তুর কোন ক্ষতি হইলে তাহার আর্থিক লোকসান ঘটিবে। এরূপ অর্থগত বীমা-স্বার্থ (Insurable Interest) না থাকলে বীমা চুক্তি সম্পাদন হয় না। অগ্নিকাণ্ডের ফলে কোন কিছু নষ্ট হইলে মালিকের অবশ্যই আর্থিক লোকসান ঘটে। জাহাজ, মাল, মাশুল ইত্যাদির কোন ক্ষতি হইলেও অনুরূপে মালিকের আর্থিক লোকসান সংঘটিত হয়। মানুষের জীবনের উপরও তাহার আথিক স্বার্থ আছে। একজনের মৃত্যু হইলেও অপরের আর্থিক লোকসান হইতে পারে। যেমন, স্বামীর জীবনের উপর স্ত্রীর, পুত্রের জীবনের উপর পিতার, পিতার জীবনের উপর পুত্রের ও অধমর্ণের জীবনের উপর উত্তমর্ণের আথিক-স্বার্থ নিহিত আছে। এরূপ অবস্থায় উহাদের হইয়া বীমা চুক্তি সম্পাদন করা চলে। বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে লোকসান এবং উহার নিরাপত্তায় লাভ—এই হইল অর্থগত বীমা-স্বার্থের মূলকথা।

(৩) ইহা পারস্পরিক পূর্ণ বিশ্বাসের চুক্তি (Contract of Uberrimae Fidei—utmost good faith)। যিনি যে জিনিসের বীমা করিবেন তাঁহাকে সে জিনিসের সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়া পূর্ণ বিশ্বাসের পরিচয় দিতে হইবে। বীমার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোন কিছুই গোপন করা চলিবে না। কারণ বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ জানিতে না পারিলে বীমা কোম্পানীর প্রবঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং বীমা চুক্তিতে

কোন জিনিস গোপন করিয়া বীমা কোম্পানীকে প্রতারণা করার চেষ্টা করিলে চুক্তি অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইবে। সর্বপ্রকার বীমাতেই এই পারস্পরিক পূর্ণ বিশ্বাস নিতান্ত প্রয়োজন। নৌ বীমাতে জাহাজ, মাল, মাশুল ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য নির্ভুলভাবে বীমা কোম্পানীকে বীমা করার সময় জানাইতে হয়। কোন ভুল তথ্য জানাইয়া ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা হইলে এবং পরে উহা ধরা পড়িলে বীমা কোম্পানী চুক্তি মত টাকা দেওয়ার জন্য মোটেই দায়ী থাকে না। অগ্নি বীমাতেও যে সম্পত্তির জন্য অগ্নি বীমা করা হইতেছে তাহার কোন তথ্য গোপন রাখা চলে না। জীবন বীমাতেও যাহার জীবন বীমা করা হইবে তাহার বয়স, স্বাস্থ্য, পারিবারিক ইতিহাস ইত্যাদির প্রকৃত তথ্য জানাইতে হইবে এবং কোন কিছুই গোপন করা চলিবে না।

(৪) বীমা-সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি (Actuary) কর্তৃক বৈজ্ঞানিক উপায়ে জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি স্থির করিয়া বীমা মাশুল (Premium) নির্ধারণ করাই জীবন বীমার একটি অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক এরূপ হিসাব-নিকাশ দ্বারা যাহাতে বীমা মাশুল স্থির হয় সেদিকে বীমা কোম্পানীর দৃষ্টি দিতে হয়।

বিভিন্ন প্রকার বীমা (Different types of Insurance)

বীমা নানাপ্রকারের হইতে পারে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) নৌ-বীমা (Marine Insurance) : সমুদ্রপথে যাত্রী ও পণ্য বহন করিয়া যে জাহাজ চলাচল করে উহার ঝড়-ঝঞ্ঝা, নানাবিধ সামুদ্রিক বিপদ-আপদের (Perils of the Sea) আশঙ্কা থাকে। উক্ত বিপদ সংঘটিত হইলে জাহাজ, মাল ও মাশুলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সামুদ্রিক বিপদ-আপদ হইতে যে জিনিসের ক্ষতি হইতে পারে তাহা পূরণের উদ্দেশ্যে যে বীমা করা হয় তাহাকে 'নৌ বীমা' বলে।

(২) অগ্নি বীমা (Fire Insurance) : অগ্নির কবলে পড়িয়া বিষয়-সম্পত্তির যে ক্ষতি হইতে পারে তাহা পূরণের উদ্দেশ্যে যে বীমা করা হয় তাহাকে 'অগ্নি বীমা' বলে।

(৩) জীবন বীমা (Life Insurance or Assurance) : নির্দিষ্ট সময় অন্তে কিংবা তৎপূর্বে মৃত্যু হইলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাওয়ার চুক্তিতে যে বীমা করা হয় তাহাকে 'জীবন বীমা' বলে।

(৪) দুর্ঘটনা বীমা (Accident Insurance) : কোন দৈব-দুর্ঘটনার ফলে কোন জীবন বা সম্পত্তি নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের জন্য যে বীমা করা হয় তাহাকে 'দুর্ঘটনা বীমা' বলে। নিজস্ব দৈহিক কিংবা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের জন্য এরূপ বীমার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই অনস্বীকার্য। ইহা ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে অন্য কোনও ব্যক্তির দৈহিক ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব বহন করিতে হইলে তিনি এরূপ

বীমা করিতে পারেন এবং বীমার টাকা পাইলে উক্ত দায়-দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারেন। যেমন, শ্রমিকদের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষয়-ক্ষতির জন্য এরূপ বীমা করা চলে। এরূপ বীমা শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বীমা (Workmen's Compensation Insurance) নামে পরিচিত এবং ইহাকে দুর্ঘটনা বীমার আওতায় আনা চলে। এরূপ ক্ষতি অবশ্যই দুর্ঘটনার জন্য সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন। স্বাভাবিক কারণে কোন ক্ষতি সংঘটিত হইলে এই বীমার দ্বারা উহা পূরণ করা চলে না।

(৫) বিশ্বস্ততা প্রতিশ্রুতি বীমা (Fidelity Guarantee Insurance) : সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অসাধুতা বা বিশ্বস্ততার অভাবে প্রতিষ্ঠানের মালিককে অনেকক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কর্মচারী কর্তৃক তহবিল তছরূপ এই ক্ষতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এরূপ ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেকক্ষেত্রেই মালিক জামিন হিসাবে কর্মচারীর নিকট হইতে কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ জমা চাহিয়া থাকেন। উক্ত পরিমাণ অর্থ কর্মচারী দিতে অপারগ হইলে তিনি একখানা 'বিশ্বস্ততা প্রতিশ্রুতি পত্রের'ও (Fidelity Guarantee Bond) ব্যবস্থা করিতে পারেন। উক্ত প্রতিশ্রুতি পত্রের এবং তজ্জন্য কিস্তিতে কিস্তিতে অঙ্গীকারমত বীমা মাশুলের বিনিময়ে বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠানের মালিককে উক্ত কর্মচারীর অসাধুতাজনিত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরূপ বীমাকে 'বিশ্বস্ততা প্রতিশ্রুতি বীমা' বলে। মালিকের অবহেলা ও সতর্কতার অভাবে যদি উক্ত ক্ষতি হয় তবে অবশ্য কোম্পানী দায়ী থাকে না। উক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা কোম্পানী মালিককে যে টাকা দিয়া থাকে উহা ঐ অসাধু কর্মচারীর নিকট হইতে পুনরুদ্ধারের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বীমা কোম্পানী ইচ্ছুক তৎসম্পর্কেও যথোচিত সাহায্য করাও মালিকের অবশ্য কর্তব্য।

(৬) অপহরণ বীমা (Burglary Insurance) : চুরি-ডাকাতির ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা কম বেশী সকলেরই থাকে। এজন্য যে ক্ষতি হয় তাহা পূরণ হওয়ার উদ্দেশ্যে যে বীমা করা হয়, তাহাকে 'অপহরণ বীমা' বলে। মহাজন, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি যাহারা টাকা-পয়সার লেন-দেন সমধিক করিয়া থাকে তাহারাই এরূপ বীমা অধিক করিয়া থাকে।

(৭) শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বীমা (Workmen's Compensation Insurance) : কলকারখানায় কাজ করিবার সময় অনেক শ্রমিককে অনেক বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইতে হয়। এরূপ বিপদ-আপদের ফলে অনেক শ্রমিক অঙ্গহানি হইয়া অকর্মণ্য হইতে পারে। কোনও শ্রমিক এরূপ অঙ্গহানি ও অকর্মণ্য হইলে কারখানার মালিককে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। কারখানার মালিক আবার উক্ত ক্ষতির হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বীমা কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। এরূপ বীমাকে 'শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বীমা' বলা হয়।

(৮) মোটর বীমা (Motor Insurance) : মোটর বীমা দুই প্রকার :

(১) কোন দুর্ঘটনার জন্য মোটর কিংবা উহার মালিকের ক্ষতির বীমা এবং (২) কোনও মোটর দুর্ঘটনার ফলে তৃতীয় পক্ষের ক্ষতি। প্রথম প্রকার বীমা দ্বারা মালিক নিজের ক্ষতিপূরণ করেন। কিন্তু মোটর দুর্ঘটনার ফলে অন্য কেহ আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে মালিককেই তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। মালিক এরূপ ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বীমা করিতে পারেন। উক্ত বীমার ফলে বীমা কোম্পানী তৃতীয় পক্ষকে ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে। এরূপ বীমাকে তৃতীয় পক্ষের ঝুঁকিবহন বীমা (Third Party Risks Insurance) বলে। জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য এরূপ বীমা করা প্রত্যেক মোটর মালিকের পক্ষেই বাধ্যতামূলক।

(৯) কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বীমা (Employees' State Insurance) : যাঁহারা মাসিক ৫০০ টাকার বেশী বেতন পান না তাঁহারা এই বীমার আওতায় আসিয়া যান। যে সকল কারখানার কাজ নিয়ত ও শক্তিচালিত এবং কর্মচারীদের সংখ্যা অন্তত ২০ জন সেই সকল কারখানায় এই বীমা প্রযোজ্য। ১৯৪৮ সালে এই বীমা চালু হয়। ইহার ফলে শ্রমিক ও কর্মচারিগণ পীড়িত অবস্থায়, অকর্মণ্য অবস্থায় এবং পোষ্যপালনের জন্য সাহায্য পান। ইহা ছাড়া ইঁহারা চিকিৎসার সুবিধাও পাইয়া থাকেন। ইহার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন উহা শ্রমিক, মালিক, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার দ্বারা প্রদত্ত অর্থের তহবিল হইতে মিটানো হয়। শ্রমিক ও কর্মচারীদের আয়ের অনুপাতে উহাদিগকে একটা পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে হয় এবং উহা প্রতি মাসে বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া হয়। কারখানার মালিককেও প্রত্যেক শ্রমিক ও কর্মচারীর জন্য অনুরূপ অর্থ প্রদান করিতে হয়।

(১০) প্রেরিত অর্থ-বীমা (Cash-in-Transit Insurance) : এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরিত হইলে পথিমধ্যে চুরি-ডাকাতির ফলে উহা খোয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এরূপ বিপদ-আপদের জন্য যে বীমা করা হয় উহাকে প্রেরিত অর্থ-বীমা বলে। এরূপ বীমা করা থাকিলে এবং পথিমধ্যে অর্থ খোয়া গেলে বীমা কোম্পানী উক্ত ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে।

নৌ বীমার প্রকৃতি, মূলনীতি, উপাদান ও ঝুঁকি (Nature, Basic Principles, Elements and Risks of Marine Insurance)

নৌ বীমার **প্রকৃতি (Nature)** বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হয় যে, সামুদ্রিক বিপদে জাহাজ ও মালের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হইলে এবং জাহাজ ও মালের নৌ বীমা করা থাকিলে নৌ বীমাকারক (Insurer) উক্ত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ ব্যাপারে কোন ক্ষতি হইলে উহা পূরণের ব্যবস্থা হয়। কোন ক্ষতি না হইলে এবং জাহাজ ও মাল গন্তব্যস্থলে নিরাপদে পৌঁছাইলে কোন ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের প্রশ্ন উঠে না। নৌ বীমার দ্বারা বীমাকৃত ব্যক্তি ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায় তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা হয়। এখানে ক্ষয়-ক্ষতি সংঘটিত হইলে উহা শুধু অর্থের দ্বারা পূরণই করা হয়। উহার দ্বারা বীমাকৃত ব্যক্তি

কোন প্রকার লাভবান হন না এবং লাভবান হওয়া এ বীমার প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ। নিম্নলিখিত **মূলনীতির (Basic Principles)** ভিত্তিতে নৌ বীমা চুক্তি সম্পাদিত হইয়া থাকে :

১। **সৎ-বিশ্বাস (Good Faith):** নৌ বীমা সম্পূর্ণ সৎ-বিশ্বাসের চুক্তি **(Contract of Uberrimae Fidei—utmost good faith)**। সুতরাং ইহাতে বীমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন গোপনীয়তার স্থান নাই। এরূপ বীমার পলিসি **(Policy)** যিনি লইতে ইচ্ছুক তাঁহাকে কোন প্রকার গোপনীয়তা রক্ষা না করিয়া বীমার বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ দিতে হয়। ইহার উদ্দেশ্য—উভয়পক্ষ বিশেষত বীমাকারী **(Insurer)** কোন প্রকারে বীমার চুক্তি পালনে প্রবঞ্চিত না হন। যে পক্ষ প্রবঞ্চিত হইবে তাহার পক্ষে বীমার চুক্তি পালন করা বাধ্যতামূলক হইবে না।

২। **বীমা স্বার্থ (Insurable Interest):** বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে লোকসান এবং উহার নিরাপত্তায় লাভ ইহাই বীমা স্বার্থের মূলকথা। সুতরাং বীমাকৃত ব্যক্তির ইহাতে এতটা স্বার্থ থাকা প্রয়োজন যাহাতে বীমার বিষয়বস্তুর কোন ক্ষতি হইলে তাঁহার আর্থিক লোকসান সংঘটিত হয়।

৩। **ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের চুক্তি (Contract of Indemnity):** ইহার অর্থ হইল—বীমার বিষয়বস্তুর কোন ক্ষতি হইলে চুক্তিমত অর্থ প্রদান দ্বারা বীমাকারক উক্ত ক্ষতি পূরণ করিবে। কোন ক্ষতি না হইলে উহা পূরণ করার কোন প্রশ্ন উঠে না।

৪। **ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা (Mitigation of Loss):** ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে—কোন ক্ষতি দেখা দিলে বীমাকৃত ব্যক্তির চেষ্টা হইবে উক্ত ক্ষতি যথাসম্ভব হ্রাস করা এবং তজ্জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিষয়বস্তু বীমা না করা হইলে উহার ক্ষতি এড়াইবার জন্য তিনি যেরূপ চেষ্টা করিতেন অনুরূপ চেষ্টায় বীমাকৃত ব্যক্তি ব্রতী হইবেন—ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা নীতির ইহাই বিশেষ তাৎপর্য।

৫। **তৃতীয় পক্ষের উপর দাবীর নীতি (Principles of Subrogation):** বীমাকারক (Insurer) যখন বীমাকৃত ব্যক্তির দাবী পূরণ করিয়া থাকেন তখন বীমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বীমাকৃত ব্যক্তির তৃতীয়পক্ষের নিকট কোনও দাবী-দাওয়া থাকিলে উক্ত দাবীদাওয়ার সুবিধাও বীমাকারক পাইয়া থাকেন। এই নীতির দ্বারা উহা স্বীকৃত হইয়া থাকে এবং নৌ বীমার ইহা একটি বিশেষ অপরিহার্য বিষয়।

৬। **আসন্ন কারণ নীতি (Principle of Causa Proxima):** একাধিক কারণে জাহাজ বা মালের ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু নৌ বীমার শর্ত অনুযায়ী যেটি আসন্ন বা নিকটতম কারণ উহা বীমা করা থাকিলে নৌ বীমাকারী উহার ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকেন। নৌ বীমার ক্ষতিপূরণ করিতে ইহা একটি অপরিহার্য নীতি। একটি উদাহরণ দিলে এই নীতিটি আরও পরিষ্কার হইবে।

কোনও জাহাজ ও মালের সংঘর্ষজনিত ক্ষয়ক্ষতির জন্য বীমা করা হইল। জাহাজটি অন্য জাহাজের সহিত সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এই সংঘর্ষের জন্য যে পণ্য উঠানো-নামানো প্রয়োজন হইল এবং বিলম্ব ঘটিল তাহার ফলে জাহাজে অবস্থিত অনেক পণ্যের ক্ষতি হইল। এখানে এই মালের ক্ষতির আসন্ন বা নিকটতম কারণ বিলম্ব ও পণ্য উঠানো-নামানো। সংঘর্ষ ইহার আসন্ন কারণ নহে। সুতরাং উঠানো-নামানো ও বিলম্বজনিত ক্ষতির জন্য বীমা না করা থাকিলে সংঘর্ষজনিত ক্ষতির বীমায় এই ক্ষতিপূরণ হইবে না।

৭। **ঝুঁকির সংযুক্তি (Attachment of Risk) :** যে ঝুঁকির জন্য বীমা করা হইবে উক্ত ঝুঁকির সংযুক্তি না হইলে অর্থাৎ উক্ত ঝুঁকির কাজ আরম্ভ না হইলে নৌ বীমার চুক্তি কার্যকর হয় না। সেক্ষেত্রে বীমাকৃতব্যক্তি যে বীমা মাশুল প্রদান করিয়াছেন উহা বীমাকারকের নিকট হইতে ফেরত পাইবেন। কিন্তু যেক্ষেত্রে উভয়পক্ষের অজ্ঞাতে ঝুঁকি আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই বিষয়বস্তু বিনষ্ট হইয়াছে সেক্ষেত্রে এই নীতি পালিত হইবে না ("While a policy does not attach till the risk begins, it can equally not attach after the risk is determined in one way or other, except in those cases where both parties being ignorant of the position of the thing insured, contract to lost or not lost.")

৮। **বাৎসরিক চুক্তি (Year to year contract) :** নৌ বীমার একটি বিশেষ নীতি হইতেছে যে, উহার চুক্তি প্রসঙ্গত এক বৎসরের জন্যই সম্পাদিত হয় এবং পরে প্রয়োজন হইলে উহার মিয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

নৌ বীমার **উপাদান (Elements)** বলিতে উক্ত চুক্তির অপরিহার্য বিষয়-গুলিকেই বুঝাইয়া থাকে। এই উপাদানগুলি হইতেছে—বীমাকারক ও বীমাকৃত ব্যক্তির নাম, বীমার বিষয়বস্তু, যে যে ঝুঁকির জন্য বীমা উহার উল্লেখ, বীমার ঝুঁকির সময়কাল, অপরিহার্য শর্ত (Warranties), বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাকৃত ব্যক্তির অর্থগত স্বার্থ (Insurable Interest) ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকার **ঝুঁকির জন্য** বীমা করা যাইতে পারে। সাধারণত যে যে ঝুঁকির জন্য নৌ বীমা করা হয় উহা নিম্নরূপ :

(ক) জল, ঝড়, সংঘর্ষ, মগ্নচড়ায় আবদ্ধ প্রভৃতি জনিত ক্ষতি।

(খ) অগ্নি, জলদস্যু, চুরি, অবরোধ ইত্যাদি জনিত ক্ষতি।

(গ) ঝড়, জল বা শত্রুকর্তৃক অধিকৃত হওয়ার হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য সমুদ্রবক্ষে মাল নিক্ষেপ (Jettison) জনিত ক্ষতি।

(ঘ) অসাধু উদ্দেশ্যে মাল নিক্ষেপ (Barratry) জনিত ক্ষতি।

নৌ বীমাপত্র লওয়ার এবং ক্ষতি দাবী করার পদ্ধতি (Procedure followed in taking out a Marine Insurance policy and making a claim on it)

নৌ বীমা করার বা উহার বীমাপত্র লওয়ার পদ্ধতি দুই প্রকার :

১। নৌ বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে গৃহীত বীমাপত্র এবং

২। লয়েডের ঝুঁকিবাহকদের (Lloyd's Underwriters) নিকট হইতে গৃহীত বীমাপত্র।

বীমাপত্র লওয়ার উক্ত দুই প্রকার পদ্ধতি থাকায় নৌ বীমাপত্রেরও দুই রকম নামকরণ হইয়া থাকে :

(১) কোম্পানী বীমাপত্র (Company Policy) এবং

(২) লয়েডস্ বীমাপত্র (Lloyd's Policy)।

(১) **কোম্পানী বীমাপত্র (Company Policy) :** ভারতে কোম্পানী বীমাপত্রই প্রচলিত। কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, জাহাজ, মাল কিংবা মাশুলের 'কোম্পানী নৌ বীমা' করার ইচ্ছা করিলে সরাসরি নৌ বীমা কোম্পানীতে উপস্থিত হইতে পারেন এবং নৌ বীমার চুক্তিপত্র পূরণ ও উহার জন্য বীমা মাশুল প্রদান করিয়া বীমাপত্র গ্রহণ করিতে পারেন।

(২) **লয়েডস্ বীমাপত্র (Lloyd's Policy) :** ইহা সরাসরি গ্রহণ করা চলে না। কারণ লয়েডস্ কোন বীমা কোম্পানী নহে। ইহা বহুসংখ্যক ঝুঁকিবাহকদের (Underwriter) সমিতিবদ্ধ (Incorporated) প্রতিষ্ঠান। উক্ত ঝুঁকিবাহকগণই লয়েডস্ প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া নৌ বীমা সংক্রান্ত কাজ-কারবার করিয়া থাকে। আবার এই ঝুঁকিবাহকগণের অনেক দালাল আছে। কোনও ব্যবসায়ীর 'লয়েডস্ নৌ বীমাপত্র' গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকিলে সর্বপ্রথমে তাহাকে এরূপ কোনও দালালের (Broker) সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। এই দালালই জাহাজ, মাল, মাশুল প্রভৃতির মূল্য ও অন্যান্য বিবরণ জানিয়া বীমা মাশুলের হার (Rate of Premium) স্থির করিয়া দেন। ব্যবসায়ী উক্ত হারে বীমা মাশুল দিতে স্বীকৃত হইলে দালাল বীমার বিষয়বস্তুর বিস্তৃত বিবরণ একখানি কাগজে লিখিয়া লন। তখন উক্ত কাগজখানি লইয়া দালাল একাধিক ঝুঁকিবাহকের নিকট উপস্থিত হন। কারণ একজন ঝুঁকিবাহক কোনও নৌ বীমাপত্রের সমস্ত অংশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। কোনও ঝুঁকিবাহক যে পরিমাণ দায়িত্ব লইতে ইচ্ছুক তাহা ঐ দালালের কাগজখানিতে লিখিয়া দিয়া থাকেন এবং দালাল কর্তৃক নির্ধারিত বীমা মাশুলের হার গ্রহণযোগ্য কিনা বা কি হার গ্রহণযোগ্য তাহাও লিখিয়া দিয়া থাকেন। এইভাবে যে পর্যন্ত না সমস্ত ঝুঁকির দায়িত্ব গৃহীত হয় সে পর্যন্ত দালালকে বিভিন্ন ঝুঁকিবাহকের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এইভাবে সম্পূর্ণ মূল্যের ঝুঁকি গৃহীত হইলে দালাল নৌ বীমাপত্র প্রস্তুত করেন এবং ঝুঁকিবাহকদের দ্বারা লয়েডস্ স্বাক্ষর কেন্দ্রে (Lloyd's

Signing Bureau) গিয়া স্বাক্ষর করাইয়া লন। অতঃপর বীমাপত্রে প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প লাগাইয়া এবং বীমা মাশুল গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ীকে বীমাপত্রখানি সমর্পণ করেন। দালাল অবশ্য তাঁহার পারিশ্রমিক হিসাবে বীমা মাশুলের শতকরা ৫ ভাগ পাইয়া থাকেন। জাহাজ, মাল ও মাশুলের ক্ষতি হইলে যাহাতে আনুষঙ্গিক ব্যয়সহ সমস্ত টাকা বীমা ঝুঁকিবাহকদের নিকট হইতে পাওয়া যায় তজ্জন্য বীমার বিষয়বস্তুর প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করিয়া সাধারণত নৌ বীমাচুক্তি সম্পাদিত হয়।

নৌ বীমাচুক্তি অনুযায়ী কোন ক্ষতি হইলে বীমাকারীকে (Insurer) উহা জানাইতে হয়। বীমাকারী উক্ত সংবাদ পাওয়ার পর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং ক্ষতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইলে বীমার টাকা প্রদান করিয়া থাকে। দাবী উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সমাধান প্রয়োজন :

(১) বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাকৃত ব্যক্তির অর্থগত স্বার্থ ছিল।

(২) যে সামুদ্রিক বিপদের জন্য বীমা করা হইয়াছে তাহার আসন্ন কারণবশত (Causa Proxima) ক্ষতি সাধন হইয়াছে।

(৩) সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে জাহাজ সমুদ্রযাত্রার উপযোগী ছিল।

(৪) যখন সমুদ্রযাত্রা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত—প্রতি পর্যায়ে জাহাজ সমুদ্রযাত্রার উপযোগী ছিল।

(৫) সমুদ্রযাত্রা আইনানুগ ছিল।

(৬) জাহাজের নিয়মিত ও নির্ধারিত গতিপথ পরিবর্তন হয় নাই।

(৭) বীমাকৃত ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত অসাধু আচরণ বা ত্রুটির জন্য ক্ষতি ঘটে নাই।

উপরি-উক্ত অবস্থাগুলির যথাযথ মীমাংসা হইলে বীমার টাকা পাওয়া যায়।

নৌ বীমার বিষয়-বস্তু (Subject-matter of Marine Insurance)

নৌ বীমার বিষয়-বস্তু নিম্নলিখিত তিন রকমের :

(১) জাহাজের নৌ বীমা (Hull Insurance) : সমুদ্রপথে যে জাহাজ যাতায়াত করে উহা সামুদ্রিক বিপদের (Perils of the Sea) ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। উক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য যে নৌ বীমা চুক্তি সম্পাদিত হয় উহাতে জাহাজই নৌ বীমার বিষয়-বস্তু দাঁড়ায়। এরূপ বীমাই 'জাহাজের নৌ বীমা' বলিয়া পরিচিত।

(২) মালের নৌ বীমা (Cargo Insurance) : সমুদ্রপথে জাহাজে যে মাল প্রেরিত হয় তাহাও নানাকারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। এজন্য মালের ক্ষতি-পূরণের জন্য যে নৌ বীমা সম্পাদিত হয় তাহাকে 'মালের নৌ বীমা' বলে।

(৩) মাশুলের নৌ বীমা (Freight Insurance) : সমুদ্রপথে জাহাজ ও মালের ক্ষতি হইলে মাশুলেরও ক্ষতি হয়। মালের মালিক মালের ভাড়া বাবদ যে মাশুল দিয়া থাকেন মাল নিরাপদে গন্তব্যস্থলে না পৌঁছাইলে মালের যেমন ক্ষতি হয়

উক্ত মাশুলেরও তেমনি ক্ষতি হয়। জাহাজের মালিকেরও জাহাজ ভাড়া দেওয়ার জন্য যে মাশুল পাওয়ার কথা জাহাজ নিরাপদে গন্তব্যস্থলে না পৌছাইলে জাহাজ ও মাশুল উভয়েরই লোকসান হয়। এই মাশুলের লোকসান বা ক্ষতির হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য যে নৌ বীমা চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহাকে 'মাশুলের নৌ বীমা' বলে।

বিভিন্ন প্রকারের নৌ বীমাপত্র (Different types of Marine Insurance Policy)

নৌ বীমাপত্র দুই প্রকার প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে :—

(১) কোম্পানীর বীমাপত্র এবং (২) লয়েডের বীমাপত্র।

যে বীমাপত্র লয়েডের ঝুঁকিবাহকদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হয় উহাকে 'লয়েডের বীমাপত্র' (Lloyd's Policy) বলে। লয়েড পূর্বে কেবল নৌ বীমাপত্র প্রদান করিত। এখন জীবন বীমা ছাড়া ইহারা অন্যান্য সকল প্রকার বীমাই করিয়া থাকে। কোম্পানী ও লয়েডের ঝুঁকিবাহক যে বিভিন্ন প্রকার নৌ বীমাপত্র প্রদান করিয়া থাকে নিম্নে উহাদের উল্লেখ করা হইল :

(১) **সময় সম্পর্কিত বীমাপত্র (Time Policy) :** ইহা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বীমাচুক্তি সম্পাদনের নিদর্শন। উক্ত সময় উত্তীর্ণ হইলে বীমা চুক্তির মিয়াদও উত্তীর্ণ হয়।

(২) **সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কিত বীমাপত্র (Voyage Policy) :** ইহা নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রার (যেমন, কলিকাতা হইতে লণ্ডন পর্যন্ত) জন্য বীমাচুক্তি সম্পাদনের নিদর্শন। উক্ত সমুদ্রযাত্রা সম্পূর্ণ হইলে বীমার মিয়াদ উত্তীর্ণ হয়।

(৩) **মিশ্র বীমাপত্র (Mixed Policy) :** ইহা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রার জন্য চুক্তি সম্পাদনের নিদর্শন। এরূপ বীমাপত্র লইলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রা সম্পূর্ণ করিতে হয়।

(৪) **মূল্য উল্লিখিত বীমাপত্র (Valued Policy) :** এরূপ বীমাপত্রে বীমার বিষয়-বস্তুর মূল্য উল্লেখ থাকে এবং বীমা কোম্পানী উক্ত মূল্য পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ করার জন্য দায়ী থাকে।

(৫) **মূল্য অনুল্লিখিত বীমাপত্র (Unvalued or Open Policy) :** ইহাতে বীমার বিষয়-বস্তুর মূল্য উল্লেখ থাকে না। বীমার বিষয়-বস্তুর ক্ষতিসাধন হইলে তখন উহার মূল্য স্থির করা হয় এবং তদনুযায়ী বীমা কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দিয়া থাকে।

(৬) **চলমান বীমাপত্র (Floating Policy) :** পর পর বিভিন্ন জাহাজে বা বিভিন্ন সময়ে মাল প্রেরণের প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক বার বীমা চুক্তি সম্পাদন না করিয়া সবগুলির জন্য একটিমাত্র বীমাপত্র লওয়া চলে। ইহাই 'চলমান বীমাপত্র'। ইহাতে একটি নির্দিষ্ট মূল্যের বীমার উল্লেখ থাকে এবং উক্ত বীমার বিষয়-বস্তুর

প্রত্যেকবারে যে পরিমাণ টাকার মাল চালান যায় সেই পরিমাণ টাকার বীমাচুক্তি সম্পাদন হইয়াছে ধরা হয়। যখন উক্ত উল্লিখিত মোট টাকার মিয়াদ পূর্ণ হয় তখন বীমাচুক্তির মিয়াদও শেষ হয়।

(৭) **নির্মাতার ঝুঁকি বীমাপত্র (Builder's Risk Policy):** জাহাজ নির্মাণের সময় নির্দিষ্ট কালের জন্য এরূপ বীমাপত্র লওয়া যায়। ইহাতে উক্ত সময়ের মধ্যে জাহাজ নির্মাণের সময় উক্ত জাহাজের কোন ক্ষতি হইলে উহা পূরণ হইয়া থাকে।

(৮) **নৌবহর বীমাপত্র (Fleet Policy):** কোনও মালিকের নৌবহর থাকিলে উক্ত নৌবহরের সবগুলি জাহাজের জন্য এই বীমাপত্র লওয়া চলে।

(৯) **বন্দর ঝুঁকি বীমাপত্র (Port Risk Policy):** বন্দরে জাহাজ থাকাকালীন অবস্থায় যদি কোন ক্ষতি ঘটে তাহা পূরণের জন্য এই জাতীয় বীমাপত্র লওয়া চলে।

(১০) **যৌগিক বীমাপত্র (Composite Policy):** ইহাতে একাধিক বীমা কোম্পানী বীমার ঝুঁকি বহন করিয়া থাকে এবং প্রত্যেক ঝুঁকি বাহকের দায়িত্ব সম্পূর্ণ পৃথক থাকে।

নৌ বীমার অপরিহার্য শর্ত (Warranty in Marine Insurance)

জাহাজ সমুদ্রযাত্রাকালে উহার যে সমস্ত অবস্থার উপর বীমার চুক্তি পালন নির্ভর করে তাহাকে নৌ বীমার 'অপরিহার্য শর্ত' বলে।

অপরিহার্য শর্ত আবার দুই প্রকারের—(১) প্রকাশ্য অপরিহার্য শর্ত (Express Warranty) এবং (২) অনুমিত অপরিহার্য শর্ত (Implied Warranty)।

বীমা চুক্তিপত্রে যে অপরিহার্য শর্তগুলির উল্লেখ থাকে তাহাকে 'প্রকাশ্য অপরিহার্য শর্ত' বলে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 'প্রকাশ্য অপরিহার্য শর্তে'র মধ্যে পড়ে:

(১) নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে জাহাজ সমুদ্রযাত্রা করিবে।
(২) নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে জাহাজ চলাচল করিবে।
(৩) জাহাজ ও মালের নিরপেক্ষতা বজায় থাকিবে।

যখন চুক্তির স্বরূপ হইতে অপরিহার্য শর্তগুলি বুঝিতে পারা যায় এবং উহার সুস্পষ্ট উল্লেখ প্রয়োজন হয় না তখন তাহাকে 'অনুমিত অপরিহার্য শর্ত' বলে। নৌ বীমায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 'অনুমিত অপরিহার্য শর্তে'র পর্যায়ে পড়ে:

(১) জাহাজের সমুদ্রযাত্রার উপযোগিতা (Seaworthiness of the Ship)—ইহার অর্থ হইল যে, জাহাজখানির সমুদ্রযাত্রার সময় সমুদ্রের সাধারণ বিপদ-আপদ (Ordinary Perils of the Sea) উপেক্ষা বা সহ্য করিবার ক্ষমতা উহার আছে। ইহাতে অতিরিক্ত মাল বোঝাই হয় নাই এবং ইহাতে উপযুক্ত সংখ্যক দক্ষ

(Efficient) কর্মচারী, চালক, লস্কর প্রভৃতি আছে। জাহাজের এই অবস্থা মাত্র সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ হওয়ার সময় প্রয়োজন।

(২) জাহাজের সমুদ্রযাত্রার আইনত বৈধতা আছে। ইহাতে কোন প্রকার বে-আইনী মদ, মাল, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি চালান হইতেছে না।

(৩) জাহাজ তাহার নিয়মিত (Normal) গতিপথ পরিবর্তন করিবে না।

উপরি-উক্ত 'অপরিহার্য শর্তগুলি'র উপর বীমাচুক্তি পালন নির্ভর করে। উক্ত শর্তগুলির অন্যথা হইলে চুক্তি অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং বীমা কোম্পানীর ঝুঁকি বহনের কোন দায়িত্ব থাকিবে না।

নৌ বীমার গুরুত্ব (Importance of Marine Insurance)

সামুদ্রিক বিপদ-আপদ হইতে জাহাজ, জাহাজে বোঝাই পণ্য এবং উহাদের মাশুলের যে ক্ষতি হইতে পারে উহা পূরণের উদ্দেশ্যে যে বীমা করা হয় তাহাকে নৌ বীমা (Marine Insurance) বলে। ইহার সুবিধা বা গুরুত্ব নিম্নরূপ :

১। সমুদ্রপথে যাত্রী ও পণ্য বহন করিয়া যে জাহাজ চলাচল করে উহার ঝড়-ঝঞ্ঝা, দস্যুভয়, শত্রুভয় প্রভৃতি নানাবিধ সামুদ্রিক বিপদ-আপদের (Perils of the Sea) আশঙ্কা থাকে। উক্ত বিপদ-আপদ সংঘটিত হইলে জাহাজ, মাল ও মাশুলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ অবস্থায় জাহাজের মালিক বা পণ্যের মালিক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সুতরাং নৌ বীমা করা থাকিলে বীমা কোম্পানী উক্ত ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার ফলে জাহাজ ও পণ্যের মালিকগণ নিশ্চিন্ত মনে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারেন।

২। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার এবং উন্নতি নৌ বীমার সুযোগ-সুবিধার ফলেই অনেকটা সম্ভব হইয়াছে। সমুদ্রযাত্রায় কোন জাহাজ আটক হইলে, দস্যুকর্তৃক লুণ্ঠিত হইলে কিংবা শত্রুকর্তৃক অধিকৃত হইলে জাহাজের ও পণ্যের মালিকদের বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয় একথা বলাই বাহুল্য। এরূপ পরিস্থিতিতে অতি অল্পসংখ্যক ব্যবসায়ীই এই ঝুঁকি লইয়া সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতেন। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোনদিনই ব্যাপকতা লাভ করিতে পারিত না। কিন্তু সামান্য বীমা মাশুলের বিনিময়ে এই ক্ষতির হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া বীমাগ্রহীতাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থা। তবে একথাও বলা চলে যে, সমুদ্রপথে এরূপ দুর্ঘটনার বিরাট ঝুঁকি আছে সত্য, কিন্তু এই বিপদ খুব বেশী ঘটিতে দেখা যায় না। ফলে বীমাকারীদিগকে এরূপ ক্ষতি কমই পূরণ করিতে হয়। এজন্য বিভিন্ন বীমাগ্রহীতাদের নিকট হইতে বীমা মাশুল লইয়া এবং উক্ত মাশুল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিয়া বীমাকারী লাভজনকভাবে এরূপ ব্যবসা চালাইবার সুবিধা পায়। নৌ বীমা এইভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বীমার ব্যবসার সুযোগ-সুবিধা দিয়াছে। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য যে ইহার ফলে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে একথা বলা চলে।

নৌ বীমাপত্রের বিভিন্ন দফা (Different Clauses of a Marine Insurance Policy)

নৌ বীমাপত্রে যে যে **দফাগুলির (Clauses)** উল্লেখ থাকে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :

১। বীমাকৃত ব্যক্তির (Insurer) নাম, ঠিকানা ও পরিচয়।

২। বীমাকারীর (Insurer) নাম, ঠিকানা ও পরিচয়।

৩। জাহাজের নাম ও অন্যান্য পরিচয়।

৪। বীমার বিষয়-বস্তু ও উহার মূল্য।

৫। বীমার চুক্তি আরম্ভের সময়—জাহাজ বন্দরে অবস্থান করার সময় হইতে, না জাহাজ ছাড়ার সময় হইতে।

৬। জাহাজ উহার নিয়মিত গতিপথ পরিবর্তন করিতে পারিবে কিনা।

৭। যে যে সামুদ্রিক বিপদের (Perils of the Sea) জন্য বীমাচুক্তি গৃহীত হইয়াছে তাহার উল্লেখ। সাধারণত নিম্নলিখিত সামুদ্রিক বিপদ বা ক্ষতি বীমার অন্তর্গত হইয়া থাকে :

(ক) জল, ঝড়, সংঘর্ষ, মগ্নচড়ায় আবদ্ধ প্রভৃতি জনিত ক্ষতি।

(খ) অগ্নি, জলদস্যু, চুরি, অবরোধ ইত্যাদি জনিত ক্ষতি।

(গ) ঝড়, জল বা শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার ভয় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সমুদ্রবক্ষে জাহাজের অধ্যক্ষ কর্তৃক মাল নিক্ষেপ (Jettison) জনিত ক্ষতি।

(ঘ) অসাধু উদ্দেশ্যে সমুদ্রবক্ষে মাল নিক্ষেপ (Barratry) জনিত ক্ষতি।

উপরি-উক্ত বিপদের যে-কোনটার আসন্ন কারণে (Causa Proxima) ক্ষতি হইয়াছে ইহা প্রমাণিত না হইলে বীমার টাকা পাওয়া যায় না।

৮। বীমার বিষয়-বস্তু রক্ষার জন্য প্রয়োজনবোধে মামলা-মোকদ্দমা ও উহার জন্য ব্যয় করার অধিকার সম্বন্ধে নির্দেশ।

৯। বীমা কোম্পানী কর্তৃক বীমা মাশুল (Premium) পাওয়ার স্বীকৃতি।

১০। ইহা ছাড়া নৌ বীমাপত্রের নীচে একটি স্মারকলিপি (Memorandum) যোগ করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে কোন্ কোন্ বিষয়ে নৌ বীমা কোম্পানী দায়ী অথবা দায়মুক্ত তাহার একাধিক দফার (Clauses) উল্লেখ থাকে। নিম্নে এই জাতীয় কয়েকটি দফার উল্লেখ করা হইল।

(ক) বিশেষ আংশিক ক্ষতিমুক্ত (Free of Particular Average—F. P. A.) : এরূপ দফা থাকিলে কতকগুলি দ্রুত পচনশীল (Perishable) জিনিসের ২ হইতে ৫ শতাংশের বেশী ক্ষতি না হইলে বীমা কোম্পানী দায়ী থাকে না।

(খ) ধৃত ও অবরোধ মুক্ত (Free of Capture and Seizure—F.C.S.) : এরূপ দফা থাকিলে যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত বীমা মাশুল না দিলে শত্রুকর্তৃক ধৃত বা অবরোধের জন্য যে ক্ষতি তাহার জন্য বীমা কোম্পানী দায়ী থাকে না।

(গ) বিশেষ আংশিক ক্ষতিসহ (With Particular Average—W.P.A.) : এরূপ দফা থাকিলে বীমা কোম্পানী আংশিক ক্ষতির জন্যও দায়ী থাকে।

(ঘ) সমস্ত ঝুঁকির জন্য (Against All Risks—A.A.R.) : এরূপ দফা থাকিলে বীমা কোম্পানী সকল প্রকার ক্ষয়-ক্ষতির জন্যই দায়ী থাকে।

(ঙ) সকল আংশিক ক্ষতিমুক্ত (Free of All Averages—F.A.A.) : এরূপ দফা থাকিলে সামগ্রিক ক্ষতি ভিন্ন কোন আংশিক ক্ষতির জন্য বীমা কোম্পানী দায়ী থাকে না।

(চ) বৈদেশিক সাধারণ আংশিক ক্ষতি (Foreign General Average—F. G.A.) : এরূপ দফা থাকিলে এবং সাধারণ আংশিক ক্ষতির দায় স্বীকৃত হইলে উক্ত ক্ষতি বৈদেশিক দেশের আইন-কানুন অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে বলিয়া বুঝায়।

(ছ) সংঘর্ষজনিত ক্ষতি (Running Down Clause—R.D.C.) : বীমাকৃত জাহাজের সহিত অন্য জাহাজের সংঘর্ষের ফলে ক্ষতিপূরণ পাইতে হইলে এই দফা অনুযায়ী বীমা কোম্পানী উক্ত ক্ষতিপূরণের কিছু অংশ বহন করে।

(জ) বীমাচুক্তি বজায় থাকার দফা (Continuation Clause) : গন্তব্যস্থলে জাহাজ পৌছানোর পূর্বে বীমাচুক্তির মিয়াদ শেষ হইলে এই দফা অনুযায়ী বীমা কোম্পানীকে জানাইলে চুক্তির মিয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

(ঝ) পুনর্বীমা দফা (Re-insurance Clause) : নৌ-বীমার বিষয়বস্তু অন্য কোন বীমাকারীর নিকট বীমা কোম্পানীর পুনর্বীমা করার ইচ্ছা থাকিলে উহার শর্তাদি ইহাতে উল্লিখিত থাকে। এরূপ পুনর্বীমায় যাহাতে বীমাগ্রহীতার স্বার্থের কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

(ঞ) দাবী ত্যাগের ধারা (Waiver Clause) : এই দফা থাকিলে কোনও বিপদ-আপদের সময় বীমার বিষয়-বস্তুকে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করার জন্য বীমা-গ্রহীতা বা বীমাকারী কোন ব্যয় করিলে একে অন্যের উপর উহার দায়িত্ব চাপাইতে পারিবে না এবং ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে কোন অধিকারের তারতম্য ঘটিবে না বা উহা ক্ষুন্ন হইবে না।

(ট) বিনষ্ট হউক কি না-হউক (Lost or Not Lost) : এই দফা থাকিলে বীমাচুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বীমার বিষয়-বস্তু বীমাগ্রহীতার অজ্ঞাতে যদি বিনষ্টও হয় তাহা হইলেও বীমা কোম্পানী ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী থাকে।

(ঠ) মোকদ্দমা ও হয়রানি দফা (Sue and Labour Clause) : এই দফা থাকিলে বীমার বিষয়-বস্তুর রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য কিংবা উদ্ধারের জন্য বীমাগ্রহীতা মোকদ্দমা রুজু করিলে বা অন্যভাবে হয়রানি হইলে বা যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে যে ব্যয়ভার বহন করিবেন বীমা কোম্পানী উহার ন্যায্য অংশ বহন করিতে বাধ্য থাকেন।

(ড) ভিড়ান ও অবস্থান দফা (Touch and Stay Clause) : এই দফায়

জাহাজ কোন্ কোন্ বন্দরে ভিড়িবে এবং কোন্ বন্দরে কতদিন থাকিবে উহার উল্লেখ থাকে।

(চ) গুদাম হইতে গুদাম পর্যন্ত (Warehouse to Warehouse) : সাধারণত মাল জাহাজে উঠাইবার (Loading) সময় হইতে মাল খালাস করা (Unloading) পর্যন্ত সময়ের জন্য বীমার ঝুঁকি কোম্পানী গ্রহণ করে। কিন্তু এই দফা থাকিলে মাল প্রেরকের গুদাম হইতে মাল বাহির হইবার পর মাল প্রাপকের গুদামে পৌঁছানো পর্যন্ত সময়ের জন্য বীমা কোম্পানী ঝুঁকি বহন করিয়া থাকে।

(ণ) ধর্মঘট, দাঙ্গা এবং আন্দোলনমুক্ত (Free of Strike, Riots and Civil Commotions—F. S. R. C. C.) : এরূপ দফা থাকিলে বীমা কোম্পানী এরূপ পরিস্থিতির ফলে ক্ষতির জন্য ঝুঁকি বহন করে না। বীমাগ্রহীতা এজন্য ক্ষতিপূরণ পাইতে ইচ্ছা করিলে অতিরিক্ত বীমা মাশুল দিয়া উহাকে এই দফাটি বাতিল করিয়া লইতে হয়।

(ত) ইন্‌চমারী দফা (Inchmaree Clause) : জাহাজের অধ্যক্ষ, চালক বা নাবিকদের গাফিলতির জন্য জাহাজের কোন ক্ষতি হইলে এই দফা থাকিলে ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা হয়। ইন্‌চমারী নামক জাহাজের এরূপ ক্ষতি হওয়ায় উহার নাম অনুযায়ী এই দফার এরূপ নাম হইয়াছে। এই জাহাজ ছাড়ার সময় জাহাজের কোনও নাবিকের অবহেলার জন্য উক্ত জাহাজের বাষ্প প্রস্তুতের এঞ্জিন (Boiler) ফাটিয়া যায়। উহা এরূপ ক্ষয়-ক্ষতির জন্য বীমা করা ছিল না বলিয়া বীমা কোম্পানী ক্ষতি-পূরণ করিতে বাধ্য থাকে না। উহার পর হইতে এই দফা সাধারণত নৌ বীমাপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সাধারণ গড়ক্ষতি এবং বিশেষ গড়ক্ষতি (General Average and Particular Average)

নৌ বীমা-সংক্রান্ত ক্ষতিকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা হয়—(১) সামগ্রিক ক্ষতি (Total Loss) এবং (২) আংশিক বা হারাহারি ক্ষতি (Partial or Average Loss)।

কোনও বীমার বিষয়-বস্তু সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইলে উহাকে সামগ্রিক ক্ষতি (Total Loss) বলা হয়। সামগ্রিক ক্ষতিকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়—(১) প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি (Actual Total Loss) এবং (২) আনুমানিক সামগ্রিক ক্ষতি (Constructive Total Loss)।

বীমার বিষয়-বস্তু যখন এরূপভাবে নষ্ট হয় যে, উহা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ার সামিল তখন উহাকে বলা হয় 'প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি'। যেমন, সমুদ্রমগ্ন জাহাজ। কিন্তু যখন বীমার বিষয়-বস্তু সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় নাই, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং উহার পুনরুদ্ধার রীতিমত সন্দেহজনক হইয়া পড়িয়াছে তখন উক্ত ক্ষতিকে 'আনুমানিক সামগ্রিক ক্ষতি' বলা হয়। যেমন, কোনও জাহাজ জলমগ্ন

পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আটকাইয়া রহিয়াছে এবং উহা উদ্ধারের ব্যয় জাহাজের মূল্য অপেক্ষা বেশী পড়িতে পারে তখন এরূপ ক্ষতি আনুমানিক সামগ্রিক ক্ষতির পর্যায়ে পড়ে।

নৌ বীমার বিষয়-বস্তু সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হইয়া আংশিক বিনষ্ট হইলে উহাকে আংশিক ক্ষতি (Partial Loss) বলা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের ইহা গড়পড়তার হারাহারিভাবে বহন করিতে হয় বলিয়া উহাকে হারাহারি ক্ষতি (Average Loss) বলিয়াই বিশেষভাবে অভিহিত করা হয়। এই 'হারাহারি ক্ষতি' আবার দুই অংশে বিভক্ত—(১) সাধারণ হারাহারি ক্ষতি (General Average Loss অথবা সংক্ষেপে General Average) এবং (২) বিশেষ হারাহারি ক্ষতি (Particular Average Loss অথবা সংক্ষেপে Particular Average)। জাহাজ মাল ও মাশুলের সহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থরক্ষার জন্য যে ক্ষতি সংঘটিত হয় উহাকে 'সাধারণ হারাহারি ক্ষতি' বলা হয়। এই ক্ষতি সকলের স্বার্থরক্ষার জন্য জাহাজের অধ্যক্ষ কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে (Voluntarily), কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে সংঘটিত হইয়া থাকে। যেমন, ঝড়ের সময় জাহাজকে হালকা করার উদ্দেশ্য কিছু মাল সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ। এরূপ ক্ষতি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলকেই নির্দিষ্ট হারে বহন করিতে হয়। জাহাজ (Ship), পণ্য (Cargo) ও মাশুল (Freight) ইহা বহনের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষ (Contributing Interest)। যে ক্ষতি দৈবাৎ সংঘটিত হয় এবং ব্যক্তিবিশেষকে নির্দিষ্ট হারে বহন করিতে হয় উহাকে 'বিশেষ হারাহারি ক্ষতি' বলা হয়। যেমন, জাহাজের ভিতর হঠাৎ জল প্রবেশ হওয়ায় কোনও মালের ক্ষতি।

সাধারণ হারাহারি ক্ষতি (General Average) নির্ধারণের উদাহরণ।

মনে করি, জাহাজ, পণ্য এবং মাশুলের মূল্য যথাক্রমে ১ লক্ষ, ৮০ হাজার এবং ২০ হাজার টাকা এবং যে পণ্য বিনষ্ট হইয়াছে উহার মূল্য ২৫ হাজার টাকা। এই ক্ষতির হারাহারি ভাগ নিম্নরূপ হইবে :

(১) জাহাজের মালিক বহন করিবে :—

$$\frac{১,০০,০০০ \times ২৫,০০০}{২,০০,০০০} = ১২,৫০০ \text{ টাকা}$$

(২) পণ্যের মালিক বহন করিবে :—

$$\frac{৮০,০০০ \times ২৫,০০০}{২,০০,০০০} = ১০,০০০ \text{ টাকা}$$

(৩) মাশুলগ্রহীতা বহন করিবে :—

$$\frac{২০,০০০ \times ২৫,০০০}{২,০০,০০০} = ২,৫০০ \text{ টাকা}$$

বিশেষ হারাহারি ক্ষতি (Particular Average) নির্ধারণের উদাহরণ—

মনে করি, ১ লক্ষ টাকা মূল্যের ১২০০ বেল পাটের মধ্যে ২০০ বেল ক্ষতিগ্রস্ত

হইয়াছে। উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত পাট বিক্রয় করিলে পাওয়া যাইবে ১০ হাজার টাকা এবং উহা ক্ষতি না হইলে বিক্রয় হইত ২২ হাজার টাকা। ইহার 'বিশেষ হারাহারি ক্ষতি' নির্ধারণ নিম্নলিখিতরূপে হইবে :

পাটের মূল্য—	২০,০০০ টাকা।
উহার বাজার দর—	২২,০০০ টাকা।
ক্ষতিগ্রস্ত পাটের মূল্য পাওয়া যাইবে—	১০,০০০ টাকা।
সুতরাং প্রকৃত ক্ষতি—	১২,০০০ টাকা।

সুতরাং বিশেষ হারাহারি ক্ষতির পরিমাণ হইবে—

$$\frac{১২,০০০ \times ২০,০০০}{২২,০০০} = \text{প্রায় ১০,৯০৯ টাকা}$$

নৌ বীমার বিষয়-বস্তুর যেরূপ ক্ষতিই সংঘটিত হউক না কেন উহা যদি বীমা করা থাকে তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপরি-উক্ত নিয়মে নির্ধারিত ক্ষতি বীমা কোম্পানী পূরণ করিয়া থাকে।

অগ্নি বীমা ও উহার গুরুত্ব (Fire Insurance and its Importance)

অগ্নির কবলে পড়িয়া পণ্য বা বিষয়-সম্পত্তির যে ক্ষতি হইতে পারে তাহা পূরণের উদ্দেশ্যে যে বীমা করা হয় তাহাকে 'অগ্নি বীমা' (Fire Insurance) বলে।

কারবারী জগতে অগ্নি বীমার গুরুত্ব অসীম। কোনও ব্যক্তি হয়ত কারবারের উদ্দেশ্যে অনেক টাকার মাল গুদামজাত করিয়া রাখিয়াছেন। কোনও কারণে উক্ত গুদামে অগ্নি সংযোগ হইলে তাহার গুরুতর ক্ষতি। ইহাতে তাঁহার গুদামজাত পণ্যের ক্ষতি, মুনাফার ক্ষতি এবং কারবার বন্ধ হওয়া জনিত ক্ষতির সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় থাকে। যেখানে এরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে সেরূপ অবস্থায় গুদামে মাল মজুত রাখিয়া স্বভাবতই তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিবেন না বা নিশ্চিন্ত মনে কারবার পরিচালনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন না। কিন্তু উক্ত মাল সামান্য বীমা মাশুলের (Premium) পরিবর্তে অগ্নি বীমা করা থাকিলে তিনি নিশ্চিন্ত মনে কারবারে মন দিতে পারেন এবং ঘুমাইতে পারেন। কারণ অগ্নির দ্বারা তাহার মালের কোন ক্ষতি হইলে বীমা কোম্পানী উক্ত ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ দাহ্যবস্তুর (Combustible Goods) পক্ষে এরূপ বীমা অপরিহার্য। সুতরাং সুষ্ঠু কারবার পরিচালনার জন্য অগ্নি-বীমা যে অশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে একথা বলাই বাহুল্য। শুধু গুদামজাত মালের ক্ষেত্রেই নয় প্রত্যেক কারবারী প্রতিষ্ঠান, কারখানা প্রভৃতির এরূপ বীমা করা থাকিলে অগ্নিজনিত সমূহ বিপদের আশঙ্কা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলেও ক্ষতিপূরণ বাবদ যে টাকা পাওয়া যায় উহা দ্বারা কারবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এইভাবে কারবার বিলোপ সাধনের হাত হইতে রক্ষা পায়।

অগ্নি বীমাপত্র গ্রহণ এবং উহার ক্ষতিপূরণ দাবীর পদ্ধতি (Method of taking out a Fire Insurance Policy and making a Claim on it)

অগ্নি বীমার উদ্দেশ্য অগ্নিকাণ্ডের ফলে কোন ক্ষয়-ক্ষতি হইলে উহা পূরণ করা। ইহার জন্য বীমাপত্র (Policy) গ্রহণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে :

১। কোনও কিছুর অগ্নি বীমা করিতে হইলে তজ্জন্য বীমা কোম্পানীতে আবেদনপত্র পেশ করিতে হইবে।

২। বীমা কোম্পানী উক্ত আবেদনপত্র পাওয়ার পর উহাদের নির্দিষ্ট প্রপত্র (Form) বীমা করিতে ইচ্ছুক এরূপ ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানকে পাঠাইবে। এই প্রপত্র প্রস্তাবনা (Proposal) নামে পরিচিত। এই প্রস্তাবনা প্রপত্র যথাযথভাবে পূরণ করিয়া বীমা কোম্পানীকে পাঠাইতে হইবে। উক্ত প্রস্তাবনায় বীমার বিষয়-বস্তুর প্রকৃতি, মূল্য, অবস্থান প্রভৃতির বিশদ বিবরণ জ্ঞাপন করা হয়।

৩। উক্ত প্রস্তাবনা পাওয়ার পর বীমার বিষয়-বস্তুর অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কিরূপ সম্ভাবনা আছে তাহা বিচার করার জন্য এবং বীমা মাশুল স্থির করার জন্য বীমা কোম্পানী উহার মূল্যনিরূপকের (Appraiser) নিকট উহা অর্পণ করিবে। মূল্যনিরূপক প্রয়োজন মনে করিলে উহা সরজমিনে তদন্ত করিয়া বীমার মাশুল স্থির করিবেন। উহা স্থির হওয়ার পর প্রস্তাবককে বীমা কোম্পানী বীমা মাশুল প্রদান করার নির্দেশ দিবে।

৪। বীমার মাশুল প্রদত্ত হওয়ার সময় হইতে বীমাচুক্তি কার্যকরী হইবে বলিয়া গণ্য হয় এবং বীমাপত্র প্রদান করা হয়।

৫। প্রথম বীমা মাশুল জমা দিলে বীমা কোম্পানী উহার জন্য যে রসিদ দিয়া থাকে উহাকে 'কভার নোট' (Cover Note) বলে। এই 'কভার নোট' বীমাপত্র না পাওয়া পর্যন্ত বীমাপত্রের পরিবর্ত (Substitute) হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে। বিভিন্ন শর্তাবলী-সম্বলিত এবং যথাযথভাবে স্ট্যাম্প ও শীলমোহরযুক্ত বীমাপত্র বীমা কোম্পানী বীমাগ্রহীতাকে প্রদান করিয়া থাকে।

৬। বীমার মিয়াদ কোন্ তারিখ পর্যন্ত উহা বীমাপত্রে উল্লেখ থাকে। ঐ তারিখ বা উহার পর আরও তিনদিনের মধ্যে যদি বীমাপত্রের পুনর্নবীকরণ (Renew) না হয় তবে বীমাপত্রে উল্লিখিত তারিখ হইতে ঐ বীমার মিয়াদ শেষ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উপরি-উক্ত উপায়ে অগ্নি বীমা সম্পন্ন হয় এবং বীমাপত্র গৃহীত হয়। অগ্নি বীমার দাবী উত্থাপনের পদ্ধতি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। বীমার বিষয়-বস্তু অগ্নিদগ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ উক্ত সংবাদ বীমা কোম্পানীকে জানাইতে হয়। কতদিনের মধ্যে এই সংবাদ জানাইতে হইবে এবং দাবীর হিসাব পেশ

করিতে হইবে উহা বীমাপত্রে উল্লেখ থাকে। সাধারণত বাজারদর অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণ স্থির করিয়া ১৫ দিনের মধ্যে দাবী পেশ করিতে হয়।

২। আংশিক ক্ষতি হইলে তাহার পরিমাণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত বস্তু হইতে কিছু ভাল বস্তু বাহির হইলে তাহার পরিমাণ এবং তজ্জনিত ব্যয়ও কোম্পানীকে জানাইতে হয়।

৩। ঘর, গুদাম প্রভৃতি অগ্নিদগ্ধ হইলে উহা মেরামত করিতে কিরূপ ব্যয় হইতে পারে তাহার পরিমাণও জানাইতে হয়।

৪। বীমাপত্রে পুনঃসংস্থাপন শর্ত (Re-instatement Clause) থাকিলে বীমা কোম্পানী অধিক ক্ষতিপূরণ করার পরিবর্তে উক্ত বস্তু পুনঃসংস্থাপনের জন্য দায়ী থাকে।

৫। অনেক সময় দাবীর প্রমাণের জন্য আদালত হইতে শপথ (Affidavit) লইতে হয়।

৬। বীমা কোম্পানী ক্ষতিপূরণ স্থির করার জন্য পরিদর্শক পাঠাইয়া থাকে। ঐ সঙ্গে ক্ষতিনির্ণায়ক (Assessor)-ও নিযুক্ত হয়।

৭। ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে মতবিরোধ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষের একজন করিয়া সালিশী (Arbitrator) নিয়োগ করার নিয়ম। আবার সালিশীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে বিচারক (Umpire) নিয়োগ করারও নিয়ম থাকে।

এইভাবে দাবীর পরিমাণ স্থির হইয়া ক্ষতিপূরণ হইয়া থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের অগ্নি বীমাপত্র (Different types of Fire Policies)

ঝুঁকি বহনের তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার অগ্নি বীমাপত্র প্রদত্ত ও গৃহীত হইয়া থাকে। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল :

১। **নির্দিষ্ট মূল্যের বীমাপত্র (Policy of Specific Value) :** সম্পত্তির মূল্য যাহাই হউক না কেন উহার একটা মূল্য উল্লেখ করিয়া যে বীমাপত্র গৃহীত হয় উহাকে 'নির্দিষ্ট মূল্যের বীমাপত্র' বলে। এরূপ ক্ষেত্রে উল্লিখিত মূল্যের যতটা ক্ষতি হয় ততটাই বীমা কোম্পানী পূরণ করিয়া থাকে। যেমন, কোনও ব্যক্তি তাঁহার ১০ হাজার টাকার সম্পত্তির জন্য যদি ৫ হাজার টাকার বীমাপত্র গ্রহণ করেন তবে তিনি ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত যতটা ক্ষতি হইবে ততটাই বীমা কোম্পানী হইতে পাইবেন। অর্ধেক মূল্যে বীমা করা হইয়াছে বলিয়া ক্ষতির অর্ধেক পাইবেন, এ নিয়ম এরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২। **হারাহারি ক্ষতি বীমাপত্র (Average Loss Policy) :** কোন বীমাপত্রে হারাহারি ক্ষতি দফা (Average Loss Clause) লিখিত থাকিলে বীমা চুক্তি অনুযায়ী মোট মূল্যের যতটা অংশ বীমা করা হয় মোট ক্ষতিরও ততটা অংশ ক্ষতিপূরণ বাবদ বীমা কোম্পানী হইতে পাওয়া যায়। যেমন, কোনও ব্যক্তি যদি

৪০,০০০ টাকার সম্পত্তি ২০,০০০ টাকার জন্য বীমা করেন তবে ২০,০০০ টাকা ক্ষতি হইলে তিনি ১০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পাইবেন।

৩। **মূল্য উল্লিখিত বীমাপত্র (Valued Policy):** এরূপ বীমাপত্রে চুক্তির সময়ে বীমার বিষয়-বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং বীমা কোম্পানী যদি উক্ত নির্ধারিত মূল্য স্বীকার করিয়া লয় তবে উহা বীমাপত্রে উল্লেখ থাকে। এরূপ বিষয়-বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতি হইলে বীমা কোম্পানী হইতে সম্পূর্ণ টাকাই পাওয়া যায়, অর্ধেক ক্ষতি হইলে অর্ধেক টাকা পাওয়া যায়। যে সকল মূল্যবান জিনিসের পুনঃসংস্থাপন কিংবা সঠিক মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব নহে, অথচ মালিকের সহিত ইহার বিশেষ স্মৃতিজড়িত সেরূপ ক্ষেত্রে এরূপ বীমাপত্র জড়িত হয়।

৪। **চলমান বীমাপত্র (Floating Policy):** যে সকল জিনিসের পরিমাণ পরিবর্তনশীল, যেমন, বিক্রয়ের ফলে হ্রাস পায় এবং ক্রয়ের ফলে বৃদ্ধি পায় কিংবা যে সকল জিনিস বিভিন্ন স্থানে মজুত থাকে তজ্জন্য এরূপ বীমাপত্র গৃহীত হয়। ইহাতে কোন নির্দিষ্ট পণ্যের বা স্থানের উল্লেখ না করিয়া নির্দিষ্ট মূল্যের উপর বীমা-চুক্তি সম্পাদিত হয়।

৫। **মুনাফা ক্ষতির বীমাপত্র (Loss of Profit Policy):** অগ্নির দ্বারা কোন ব্যবসায়ের ক্ষতি হইলে কিছুকালের জন্য হয়ত পূর্বের ন্যায় মুনাফা লাভ সম্ভব নাও হইতে পারে। বিশেষ চুক্তির দ্বারা এরূপ মুনাফা ক্ষতির বীমাপত্র গ্রহণ করা চলে।

৬। **পুনঃসংস্থাপন শর্ত বীমাপত্র (Re-instatement Clause Policy):** এরূপ বীমাপত্র লওয়া হইলে ক্ষতিপূরণের টাকার পরিবর্তে এই নষ্ট জিনিস পুনঃ-সংস্থাপনের শর্ত থাকে।

৭। **মীমাংসাযোগ্য অগ্নি বীমাপত্র (Adjustable Fire Policy):** এরূপ বীমাপত্রে সাধারণত মজুত মালের মূল্য স্থির না করিয়া প্রথমত বীমার প্রথম মাশুল দেওয়া হয়। পরে প্রতি মাসে মজুত মালের হিসাব প্রস্তুত করিয়া বৎসর শেষে প্রকৃত বীমা মাশুল কম দেওয়া থাকিলে তখন বাকীটা দিতে হয়।

জীবন বীমা কর্পোরেশনের পক্ষে সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে প্রবেশ (Life Insurance Corporation in General Insurance Business)

১৯৫৬ সালে জীবন বীমা ব্যবসা জাতীয়করণ করা হয়। তখন সাধারণ বীমা ব্যবসাকে জাতীয়করণের কোন চেষ্টা করা হয় নাই। বেসরকারী প্রচেষ্টায়ই এই ব্যবসা চলিয়া আসিতেছিল। ভারতে এই ব্যবসা খুব বেশী দিনের পুরাতন নয়। ১৯০৭ সালে প্রথম সাধারণ বীমা ব্যবসা চালু হয়। ১৯২৯ সালের পরে এই ব্যবসা কিছুটা উন্নতি লাভ করে এবং ১৯৫৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সাধারণ বীমা ব্যবসা কোম্পানীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৭টি। উহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৯১টি। কিন্তু বীমা আইন অনুযায়ী রেজেস্ট্রীকৃত সাধারণ বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ১৯৬৭

সালের ৩১শে ডিসেম্বর শেষে দেখা যায় ১৩২টি। উহাতে ভারতীয় কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৭৩টি। ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে বিদেশী কোম্পানীর তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় মন্থরগতিতে হইলেও ইহারা দেশের মধ্যে ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং বিদেশেও ইহাদের ব্যবসা অনেক ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করিয়াছে। ভবিষ্যতে শিল্পোন্নতির অগ্রগতি অব্যাহত থাকিলে ইহারাও উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে জীবন বীমা কর্পোরেশনের পক্ষে সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে প্রবেশের সিদ্ধান্ত সমালোচনার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু একথাও সত্য যে, সাধারণ বীমা কোম্পানীগুলি অনেকটা উন্নতি লাভ করিলেও ইহাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রবেশ করিয়াছে। ইহারা নানাপ্রকার অসদাচরণ, তহবিল তছরূপ, মিথ্যা হিসাব এবং অনুরূপ অন্যান্য দোষে দুষ্ট। ইহাদের অসদাচরণ দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে The Executive Committee of General Insurance Council ইহাদের জন্য কতকগুলি আচরণনীতি (Code of Conduct) পালনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু উক্ত Executive Committee উঁহাদের কার্যপরিচালনা অনুসন্ধান দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উঁহারা উক্ত আচরণনীতি পালন করিতেছেন না। সুতরাং উক্ত Committee ১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে নূতনভাবে আবার উক্ত আচরণনীতি পালনের নির্দেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু ইহারও সুফল পাওয়া যাইতেছিল না। এরূপ অবস্থায় জীবন বীমা কর্পোরেশন যদি ইহাদের ব্যবসায়ে প্রবেশ করে তবে উহাতে অন্যায় কিছু করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরং ইহাতে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইবে এবং উহারা সৎভাবে ব্যবসা পরিচালনার দিকে মনোনিবেশ করিবে। ইহা ছাড়া যাঁহারা বিভিন্ন বীমাপত্র লইতে ইচ্ছুক তাঁহারা জীবন বীমা কর্পোরেশনে গিয়া অর্থাৎ একই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল প্রকার সুবিধা পাইবেন।

সাধারণ বীমা জাতীয়করণ (Nationalisation of General Insurance)

বর্তমানে জীবন বীমার মত সাধারণ বীমাও ১৯৭১ সালের ১৩ই মে হইতে জাতীয়করণ করা হইয়াছে। কারণ জীবন বীমা যে কারণে জাতীয়করণ হইয়াছে সে কারণ ইহাতেও যে নাই এমন নহে। সাধারণ বীমা ব্যবসা জাতীয়করণ হওয়ার ফলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যাইবে :

১। ইহাতে প্রতিযোগিতাজনিত অপচয় ও অসাধুতা দূর হইবে।

২। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থের যোগানও ইহা হইতে কিছুটা পাওয়া যাইবে এবং উক্ত অর্থ, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সহায়ক হইবে।

৩। জাতীয়করণ হইলে মুনাফা অর্জন কোম্পানীগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে না। ফলে বীমাকৃত ব্যক্তিগণের মাশুলের হার কম হইবে।

৪। কর্মচারীদের বেতনের মধ্যেও সমতা দেখা দিবে। চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও উঁহারা নিশ্চিন্ত হইবেন এবং ইহার ফলে বীমার কার্যপ্রসারকল্পে ইহারা অধিকতর যত্নবান হইবেন।

৫। রাষ্ট্রীয় সংস্থা বলিয়া বীমার ব্যাপারে উহা জনসাধারণের পূর্ণ আস্থা অর্জন করিতে পারিবে।

কিন্তু জাতীয়করণ হওয়ায় নিম্নলিখিত **অসুবিধাগুলিও** দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে :

১। ইহাতে বেসরকারী ব্যক্তিগত উদ্যমের অভাব হইবে বলিয়া দক্ষতা হ্রাস পাইবে।

২। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া ইহাতে আমলাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থা চালু হইবে। এজন্য কর্মচারীদের স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে। অযথা কাজ বিলম্বিত হইবে। স্বজনপোষণ, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, কার্যে অবহেলা প্রভৃতি দেখা দিবে।

৩। ইহাতে উর্ধ্বতন কর্মচারীদের বেতনের হার বৃদ্ধি পাইবে, ফলে ইহা একটি ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। সুতরাং বীমা মাশুল কমিবে কিনা বলা কঠিন। প্রতিযোগিতার অভাব এবং কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া বরং বীমার হার বৃদ্ধি করিবে বলিয়াই মনে হয়।

৪। পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য জীবন বীমা হইতে যে অর্থের সংস্থান হইবে সাধারণ বীমা হইতে সেরূপ সংস্থান সম্ভব নয়। কারণ ইহাদের বীমা মাশুল হইতে আয় জীবন বীমার তুলনায় অনেক কম।

উপরি-উক্ত অসুবিধা থাকিলেও সমাজ-তান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র গঠনের ক্রমোন্নতির জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মত সাধারণ বীমা ব্যবসাও জাতীয়করণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া আমাদের অভিমত।

কিন্তু ভারত সরকার প্রথমে সাধারণ বীমা জাতীয়করণের পক্ষপাতী ছিলেন না। এজন্য বীমা আইন সংশোধন দ্বারা ইহার উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control) চালু করা হয়। ইহার ফলে সাধারণ বীমা কোম্পানীগুলি নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক ব্যবসা চালাইতে বাধ্য হয়। ফলে প্রিমিয়ামের ন্যায্য হার প্রবর্তন, বীমাকৃত ব্যক্তিদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সাধারণ বীমা ব্যবসার অনেক দুর্নীতি দূর করার চেষ্টা হয়। ইহা ছাড়া কোম্পানীগুলির নিকট অধিক পরিমাণ আমানত দাবী করা হয়। ইহার ফলে অনেক অদক্ষ কোম্পানী ব্যবসা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। কোম্পানীগুলি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত লগ্নিপত্র (Securities) ভিন্ন উহাদের অর্থ বিনিয়োগ করিতেও পারে না। সুতরাং নানাবিধ বিধিনিষেধ দ্বারা ইহাকে দুর্নীতিমুক্ত করার চেষ্টা জাতীয়করণ করার পূর্বেও করা হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকার জীবন বীমাপত্র (Different kinds of Life Policies)

জীবন বীমাপত্র নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে :

(১) মিয়াদী বীমাপত্র (Endowment Policy) : এরূপ বীমাপত্রে নির্দিষ্ট বয়স বা সময় অতিক্রান্ত হইলে বীমাকৃত ব্যক্তি কিংবা ঐ সময়ের পূর্বে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার উত্তরাধিকারী বীমার টাকা পাইয়া থাকেন। সাধারণত এরূপ মিয়াদ বা সময় ২০।২৫ বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই মিয়াদের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী কিস্তিতে কিস্তিতে বীমা কোম্পানীকে বীমা মাশুল (Premium) দিতে হয়। নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত জীবিত থাকিলে, মিয়াদী বীমাপত্রের টাকা বীমাকৃত ব্যক্তি ভোগ করিতে পারেন। এই মিয়াদী জীবন বীমাপত্র আবার দুই প্রকারের হইতে পারে :

(ক) মুনাফা সমেত (With Profit) : ইহাতে বীমা কোম্পানী কর্তৃক অর্জিত লাভের অংশ বীমাকৃত ব্যক্তিও পাইয়া থাকেন। মুনাফা সমেত বীমাপত্রে বীমা মাশুল কিছু বেশী দিতে হয়।

(খ) মুনাফা ছাড়া (Without Profit) : ইহাতে বীমা কোম্পানী কর্তৃক অর্জিত লাভের অংশ বীমাকৃত ব্যক্তি পান না। যে টাকার জন্য বীমা করা হয় শুধু সেই টাকাই পাইয়া থাকেন। ইহাতে অবশ্য বীমা মাশুল কিছু কম দিতে হয়।

(২) আজীবন বীমাপত্র (Whole Life Policy) : ইহাতে বীমাকৃত ব্যক্তি (Insured) যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন তাঁহাকে বীমা মাশুল (Premium) দিয়া যাইতে হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী কিংবা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি বীমার টাকা পাইয়া থাকেন। এরূপ বীমায় বীমাকৃত ব্যক্তি বীমার টাকার ফল ভোগ করিতে পারেন না। ইহা পরিবারবর্গের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই করা হয়। এরূপ বীমাপত্রও (ক) মুনাফা সমেত (with profit) এবং (খ) মুনাফা ছাড়া (without profit) হইতে পারে।

আজীবন বীমাপত্রের **সুবিধা :**

১। ইহাতে বীমা-মাশুলের হার অন্যান্য বীমা-মাশুলের তুলনায় কম। ফলে, বীমাকৃত ব্যক্তি কম বীমা-মাশুল দেওয়ার সুবিধা ভোগ করেন।

২। বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর বীমার টাকা পরিবারের আর্থিক দুর্গতি দূর করে।

৩। উত্তরাধিকারদের পক্ষে এই টাকা পাইলে উহারা সহজে 'এস্টেট্ ডিউটি' (Estate Duty) দিতে পারেন।

৪। মুনাফা সমেত বীমাপত্র হইলে টাকা কিছু বেশী পাওয়া যায়। তবে উহাতে বীমা-মাশুলের হার কিছু বেশী দিতে হয়।

আজীবন বীমাপত্রের অসুবিধা :

১। ইহাতে মৃত্যু পর্যন্ত বীমা-মাশুল দিতে হয়। ফলে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষে বীমা-মাশুল দেওয়া এক কষ্টকর ব্যাপার হইয়া পড়ে।

২। বীমাকৃত ব্যক্তিকে এজন্য বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে পড়িতে হয়।

মিয়াদী বীমাপত্রের সুবিধা :

১। ইহাতে আজীবন বীমা-মাশুল দিতে হয় না। ফলে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষে বৃদ্ধ বয়সে বীমা-মাশুলের টাকার যোগান দিয়া অসচ্ছলতার মধ্যে পড়িতে হয় না।

২। ইহাতে বীমাকৃত ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যু হইলে পরিবারবর্গকে আর্থিক দুর্গতির মধ্যে পড়িতে হয় না।

৩। বৃদ্ধ বয়সে এরূপ বীমার টাকা বীমাকৃত ব্যক্তিকে আর্থিক অসচ্ছলতার হাত হইতে রক্ষা করে।

মিয়াদী বীমাপত্রের অসুবিধা :

১। ইহাতে আজীবন বীমা অপেক্ষা বীমা-মাশুল বেশী দিতে হয়।

২। বীমাকৃত ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় বীমার টাকা পাইলে উহা তাঁহার দ্বারা ব্যয়িত হইয়া যায়। ফলে তাঁহার মৃত্যুর পর পরিবারবর্গের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কোন সুরাহা হয় না।

(৩) **নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বীমা-মাশুল প্রদেয় আজীবন বীমাপত্র (Whole Life Policy with Limited Payments) :** এরূপ বীমাপত্র লইলে বীমাকৃত ব্যক্তিকে নির্দিষ্টকালের জন্য শুধু মাশুল দিতে হয় (যেমন ২০ কিংবা ২৫ বৎসর), কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মৃত্যু অথবা উক্ত সময়ের পরে মৃত্যু ভিন্ন বীমার টাকা পাওয়া যায় না। এরূপ বীমাও 'মুনাফা সমেত' কিংবা 'মুনাফা ছাড়া' হইতে পারে।

জীবন বীমার উপরিলিখিত বিভাগ ছাড়া নিম্নলিখিত কয়েকটি বিভাগও আছে।

(১) **একক জীবন বীমাপত্র (Single Life Policy) :** এরূপ বীমাপত্রে একজন মাত্র ব্যক্তির জীবন বীমা করা থাকে। উক্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় অন্তে টাকা পাইয়া থাকেন কিংবা ইতিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী অথবা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি (nominee) টাকা পাইয়া থাকেন।

(২) **যৌথ জীবন বীমাপত্র (Joint Life Policy) :** ইহাতে একই বীমাপত্রে একাধিক ব্যক্তির জীবন বীমা করা থাকে। উহারা চুক্তিমত নির্দিষ্ট সময় অন্তে টাকা পাইয়া থাকেন। ইহার পূর্বে বীমাকৃত ব্যক্তিদের যে-কেহ মারা গেলে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বীমার টাকা পাওয়ার অধিকার জন্মে। সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রী এবং অংশীদারী কারবারের অংশীদারগণ এরূপ বীমাপত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(৩) **সন্তান-সন্ততির জন্য বীমাপত্র (Policy upon the lives of the Children) :** এরূপ বীমাপত্র দ্বারা পিতা কিংবা অভিভাবক নাবালক পুত্র-কন্যাদের বিবাহ, শিক্ষা বা অন্য প্রয়োজনের জন্য বীমা করাইয়া থাকেন। এরূপ বীমা কোম্পানী চুক্তিমত নির্দিষ্ট সময় অন্তে বীমার টাকা প্রদান করিয়া থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের

পূর্বে যাহার জন্য বীমা করা হইয়াছে তাহার মৃত্যু হইলে বীমা-মাশুল বাবদ প্রদত্ত টাকার সামান্য অংশ ব্যয় বাবদ কাটিয়া রাখিয়া বাকী টাকা বীমা কোম্পানী ফেরত দিয়া থাকে।

(৪) বার্ষিকী (Annuity) : কিস্তমত নির্দিষ্টকাল টাকা দেওয়ার বিনিময়ে কিংবা একযোগে একটা মোটা টাকা দেওয়ার বিনিময়ে বীমা কোম্পানী কিছুকাল ধরিয়া বৎসর বৎসর যে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহাকে 'বার্ষিকী' বলে। যিনি উক্ত 'বার্ষিকী' প্রদান করিয়াছেন টাকা তাঁহাকে দেওয়া চলে কিংবা চুক্তিমত তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিকে দেওয়া চলে।

জীবন বীমাপত্রের দফাগুলি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) বীমাপত্রের ক্রমিক সংখ্যা। (২) প্রস্তাব পেশ করার তারিখ। (৩) বীমা গৃহীত হওয়ার সময়ের বয়স। (৪) বীমাকৃত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও পরিচয়। (৫) বীমার মূল্য। (৬) বীমা-মাশুলের পরিমাণ। (৭) বীমা-মাশুল দেওয়ার নিয়ম। (৮) বীমার টাকা পাওয়ার মনোনীত ব্যক্তি। (৯) বীমা বাতিলের নিয়ম। (১০) বাতিল বীমার পুনরুদ্ধার করার নিয়ম। (১১) প্রত্যর্পণ মূল্য। (১২) ঋণ পাওয়ার নিয়ম। (১৩) মনোনয়ন ও হস্তান্তর করার নিয়ম। (১৪) বীমাকৃত টাকা পাওয়ার নিয়ম।

জীবন বীমার মাশুল (Premium of a Life Insurance Policy)

বীমা-মাশুলের হার স্থির করিতে হইলে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচার করিতে হয় :

(১) মানুষের জীবিত থাকার সম্ভাবনা (Prospect of Life)।

(২) মৃত্যুহার তালিকা (Mortality Tables)।

(৩) চক্রবৃদ্ধি সুদের হার (Rate of Compound Interest)।

(৪) ব্যয়ের হার (Expense Ratio)।

বীমা কোম্পানী বীমাকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ঝুঁকির বোঝা বিস্তারে সহায়তা করিয়া থাকে। কারণ বিভিন্ন বীমাকৃত ব্যক্তিদের নিকট হইতে যে বীমা-মাশুল আদায় হয় উহা দ্বারাই কোম্পানী বীমার ঝুঁকি বহন করিয়া থাকে। এজন্য বীমা-মাশুলের হার এরূপভাবে স্থির করা প্রয়োজন হয় যাহাতে কাহারও মৃত্যু হইলে কিংবা নির্দিষ্ট সময় অন্তে বীমা চুক্তি মত টাকা প্রদানের জন্য যে ক্ষতি হয় উহা অবশিষ্ট জীবিত ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বীমা মাশুল দ্বারা যেন পূরণ হয়। বীমা-মাশুল আবার একই বয়সের সকলের নিকট হইতে সমহারে আদায় করিতে হয়। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একচ্যুয়ারিগণ (Actuaries) বীমা-মাশুলের হার নির্ধারণ করার জন্য মৃত্যুহার তালিকা (Mortality Tables) দেখিয়া বিভিন্ন বয়সের মানুষের জীবিত থাকার কতখানি সম্ভাবনা এবং উহার মৃত্যুর আশঙ্কাই বা কতখানি তাহা গণিতের সূক্ষ্ম

হিসাব দ্বারা নির্ণয় করিয়া লন। এইভাবে 'জীবিত থাকার সম্ভাবনা' ও 'মৃত্যুর আশঙ্কা' এতদ্ উভয়ের সমীকরণ (Equation) দ্বারা বীমা-মাশুলের হার স্থির করা হয়।

দ্বিতীয় প্রয়োজন হইতেছে উক্ত নির্ধারিত হারে যে বীমা-মাশুল আদায় হইবে তাহা চক্রবৃদ্ধি সুদে লগ্নী করিলে বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে অথবা মিয়াদ পূর্ণ হইলে যে টাকা প্রদেয় সেই অঙ্কে যেন পৌঁছান যায়। সুতরাং সুদের হার স্থির করা হইল দ্বিতীয় কাজ। বাজারের অবস্থা অনুযায়ী প্রকৃত সুদ পাওয়া গেলেও সুদের আনুমানিক হার বীমা-মাশুল স্থির করার সময় নির্ধারণ করিতে হয়। এইভাবে যে বীমা-মাশুলের হার স্থির করা হয় উহাকে বলা হয় 'নীট বা খাঁটি বীমা মাশুল' (Net or Pure Premium)। কিন্তু কোম্পানীর অফিস পরিচালন, এজেণ্টদের কমিশন, ডাক্তারের ফি প্রভৃতির জন্য অনেক ব্যয় করিতে হয়। উক্ত ব্যয়ের একটা হার (Expense Ratio) স্থির করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। প্রকৃত বীমা-মাশুল এই ব্যয়ের অংশ যোগ করিয়া আদায় হয়। এই জীবিত থাকার সম্ভাবনা, মৃত্যুহার তালিকা, সুদের হার ও ব্যয়ের হার বিচার করিয়া যে বীমা-মাশুল স্থির করা হয় তাহাকে বলা হয় 'ভার বোঝাই বীমা-মাশুল' (Loaded Premium)। ব্যয়ের যে অংশ বীমা-মাশুলের সহিত যুক্ত করা হয় তাহাকে বলা হয় Margin বা Loading।

হস্তান্তরকরণ ও মনোনয়ন (Assignment and Nomination)

প্রয়োজনবোধে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বীমাপত্র হস্তান্তর করিতে পারেন। এরূপ হস্তান্তর অধমর্ণ উত্তমর্ণকে করিতে পারেন কিংবা স্নেহ ও ভালবাসার দরুণ আত্মীয়-স্বজনকে দানস্বরূপও বীমাপত্র হস্তান্তর করা যাইতে পারে। যাহাকেই হস্তান্তর করা হউক না কেন তিনি বীমাপত্রের সমস্ত সুবিধার অধিকারী হন। হস্তান্তরকারীর বীমাপত্র সংক্রান্ত স্বত্বাধিকার যেমন তিনি প্রাপ্ত হন তেমনই আবার হস্তান্তরকরণ তারিখ হইতে উহার দায়ও গ্রহণ করিতে হয়। স্ট্যাম্পযুক্ত পৃথক দলিলের সাহায্যে কিংবা বীমাপত্রে পিঠসহি (Endorsement) দ্বারা এরূপ হস্তান্তর সম্পাদন করিতে হয়। হস্তান্তর করিতে হইলে উহা বীমা কোম্পানীকে জানাইতে হয় এবং উহা বীমা কোম্পানীর অজানা থাকিলে উক্ত ব্যক্তিকে বীমাপত্রের স্বত্বাধিকার প্রদান করার দায়িত্ব কোম্পানীর থাকে না।

বীমাকৃত ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পর বীমার টাকা অন্য কাহাকেও দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। এরূপ নির্দেশনামাকে 'মনোনয়ন' (Nomination) বলে। মনোনয়ন প্রপত্র পূরণ করিয়া কিংবা বীমাপত্রে পিঠসহি দ্বারা করা চলে। মনোনয়নে মনোনয়নকারী ভিন্ন তাঁহার উত্তরাধিকারীকে টাকা দেওয়ার নিয়ম নাই। 'হস্তান্তর-করণে' উত্তরাধিকারী টাকা পাওয়ার অধিকারী। বীমাকৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে 'মনোনয়ন' বাতিল করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু 'হস্তান্তরকরণ' বাতিল করা চলে না। আবার 'হস্তান্তরকরণ' হইলে 'মনোনয়ন' বাতিল হইয়া যায়।

সমর্পণ মূল্য (Surrender Value)

কোম্পানীর নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বীমা-মাশুল দেওয়া হইলে এবং উহার পর বীমাকৃত ব্যক্তি বীমা-মাশুল দিতে অপারগ হইলে তিনি বীমাপত্রখানি কোম্পানীকে সমর্পণ (Surrender) করিতে পারেন এবং তৎপরিবর্তে যাহা প্রাপ্য তাহা পাওয়ার জন্ম আবেদন জানাইতে পারেন। কোম্পানী এরূপ অবস্থায় প্রদত্ত বীমা-মাশুল হইতে খরচ-খরচা বাবদ কিছুটা টাকা কাটিয়া রাখিয়া বাকীটা বীমাকৃত ব্যক্তিকে দিয়া থাকে। এরূপ প্রদত্ত অর্থকে 'সমর্পণ মূল্য' (Surrender Value) বলে।

আদায়ীকৃত বীমাপত্র (Paid-up Policy)

কোম্পানীর নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বীমা-মাশুল দেওয়া হইলে এবং উহার পর বীমাকৃত ব্যক্তি বীমা-মাশুল দিতে অপারগ হইলে তিনি আর বীমা-মাশুল দিতে পারিবেন না বলিয়া জানাইতে পারেন। কোম্পানী এরূপ অবস্থায় উক্ত বীমা-পত্রের বীমা-মাশুল আদায় হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লয় এবং যে বীমা-মাশুল দেওয়া হইয়াছে তজ্জন্য চুক্তিমত নির্দিষ্ট বয়ঃপূর্তি হইলে অথবা তৎপূর্বে মৃত্যু হইলে টাকা প্রদান করিয়া থাকে। এই ব্যবস্থাকে 'আদায়ীকৃত বীমাপত্র' বলে।

স্বয়ংক্রিয় বাতিল রদ বীমাপত্র (Automatic Non-forfeiture Policy)

এই শর্ত বীমাপত্রে যুক্ত থাকিলে বীমা-মাশুল দিতে বিলম্ব হইলে তজ্জন্য বীমাপত্র নষ্ট বা বাতিল (Lapse) হয় না। এরূপ বীমাপত্র বীমা মাশুল না দেওয়ার জন্য বাতিল হওয়ার উপক্রম হইলে 'সমর্পণ মূল্যের' টাকা পাওনা হইলে তাহা হইতে বাকী বীমা-মাশুল পরিশোধের ব্যবস্থা কোম্পানী নিজ হইতেই করিয়া থাকে।

অ্যাক্‌চুয়ারীর হিসাব-নিকাশ (Actuarial Valuation)

সাধারণ উপায়ে জীবন বীমা কোম্পানীর মুনাফা (Profits) নির্ণয় করা যায় না। ইহা বীমাপত্রের সমস্ত দায় স্থির করিয়া নির্ণয় করিতে হয়। এভাবে মুনাফা নির্ণয় করা বিশেষজ্ঞ ভিন্ন সম্ভব নয়। বীমা কোম্পানীর এরূপ বিশেষজ্ঞকে 'অ্যাক্‌চুয়ারী' (Actuary) বলে। 'অ্যাক্‌চুয়ারী' যে উপায়ে জীবন বীমা কোম্পানীর মুনাফা স্থির করে তাহাকে 'অ্যাক্‌চুয়ারীর হিসাব-নিকাশ' (Actuarial Valuation) বলে। যদিও বীমা কোম্পানী বীমা-মাশুল কোম্পানীর কাগজে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে লগ্নী করিয়া এবং ঋণ প্রভৃতি দিয়া অর্থোপার্জন করে তথাপি এরূপ হিসাব-নিকাশ ভিন্ন বীমাকৃত ব্যক্তিদিগকে অধিবৃত্তি (Bonus) এবং অংশীদারগণকে লভ্যাংশ (Dividend) দেওয়া চলে না। তবে অ্যাক্‌চুয়ারীর হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। কারণ কোম্পানীর দেনা-পাওনা, সম্পত্তি, লাভ-লোকসান প্রভৃতির নিখুঁত হিসাব করিতে হইলে মানুষের জীবিত থাকার সম্ভাবনা, মৃত্যু,, সুদের হার, ব্যয়ের

হার প্রভৃতি জটিল বিষয়গুলির আশ্রয় লইতে হয়। এজন্য অনেকক্ষেত্রে প্রতিবৎসর এরূপ হিসাব-নিকাশ (Valuation) করা সম্ভব হয় না। এরূপ হিসাব-নিকাশ সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। এরূপ হিসাব-নিকাশ এক বৎসর পর হইলে বলা হয় 'বার্ষিক হিসাব-নিকাশ' (Annual Valuation), দুই বৎসর পর হইলে বলা হয় 'দ্বিবার্ষিক হিসাব-নিকাশ' (Biennial Valuation), তিন বৎসর পর হইলে বলা হয় 'ত্রৈ-বার্ষিক হিসাব-নিকাশ' (Triennial Valuation) এবং পাঁচ বৎসর পর হইলে বলা হয় 'পঞ্চবার্ষিক হিসাব-নিকাশ' (Quinquennial Valuation)। জীবন বীমা কোম্পানীতে সাধারণত পঞ্চবার্ষিক হিসাব-নিকাশ প্রচলিত।

বীমা অধিবৃত্তি (Insurance Bonus)

বীমাপত্র 'মুনাফা সমেত' (With Profit) অথবা 'মুনাফা ছাড়া' (Without Profit) হইতে পারে। বীমা কোম্পানীর হিসাব-নিকাশ হইলে উহাতে প্রচুর মুনাফা হইয়াছে এরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত মুনাফার একটি অংশ বীমাকৃত ব্যক্তি-দিগকে দেওয়া হয়। উহাকে 'অধিবৃত্তি' (Bonus) বলে। অধিবৃত্তি নগদ দেওয়া হয় না। উহা হিসাব-নিকাশের পর ঘোষণা করা হয় এবং বীমাপত্রের টাকার সহিত সংযুক্ত করা হয়। বীমার টাকা প্রদানের সময় চুক্তিমত বীমাপত্রের টাকা ও মোট পাওয়া অধিবৃত্তি দেওয়া হয়। অধিবৃত্তি হাজারের উপর ঘোষণা করা হয়। হাজারে ২৫·০০ টাকা যদি 'অধিবৃত্তি' ঘোষণা করা হয় তবে প্রতি হাজার টাকার বীমাপত্রের উপর ২৫·০০ টাকা হারে অধিবৃত্তি দেওয়া হয়। অধিবৃত্তি জনসাধারণকে বীমার দিকে আকৃষ্ট করার একটি বড় প্রলোভন।

জীবন বীমা কর্পোরেশনের গঠন (Formation of Life Insurance Corporation)

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ভারতে অনেক জীবন বীমা কোম্পানী ছিল। উহারা তখন ছিল বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। উহাদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা ছিল। ফলে জীবন বীমা ব্যবসা দক্ষতার সহিত পরিচালনা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। যাহারা বীমা করিতে ইচ্ছুক তাহারাও বিভিন্ন কোম্পানীর অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া পছন্দমত কোম্পানীতে বীমা করিতে পারিত। বীমাকৃত ব্যক্তিদের তরফ হইতেও এ ব্যবস্থা মন্দ ছিল না। তাহাদের বীমা-মাশুল দেওয়া, বীমার টাকা পাওয়া, বীমা কোম্পানী হইতে ঋণ পাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু কোম্পানী-গুলির অর্থলগ্নী ঠিকমত চলিতেছিল না। অর্থলগ্নী ব্যাপারে অনেক কোম্পানীর বহু গলদ ধরা পড়িয়া যায়। উক্ত অর্থ-লগ্নীতে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ফলে বীমাকৃত ব্যক্তিদের অধিবৃত্তির হার বজায় থাকিত না এবং তজ্জন্য উহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এজন্য অনেক কোম্পানীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দেখা যায়। এরূপ পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার জীবন বীমা কোম্পানী-

গুলি রাষ্ট্রীয়করণে মনস্থ করেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী এক জরুরী আইন (Ordinance) জারী করিয়া জীবন বীমা কোম্পানীগুলি রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। এরূপ রাষ্ট্রীয়করণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর টাকা লগ্নী ব্যাপারে অসাধুতা দূর করা এবং লাভের শতকরা ৯৫ ভাগ বীমাকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিবৃত্তি (Bonus) হিসাবে বিতরণ করা। বীমা কোম্পানীগুলি পরিচালনার জন্য 'লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই সংক্ষেপে এল. আই. সি. (L. I. C.)। উহার মূলধন স্থির হয় ৫ কোটি টাকা। উহা ভারত সরকারই যোগান দেন। উহার কার্য-নির্বাহক কমিটি ১৫জন সভ্য দ্বারা গঠিত। বর্তমানে লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনই সমস্ত জীবন বীমা কোম্পানী পরিচালনা করে। পূর্বের কোম্পানীগুলি কর্পোরেশনের অধীন হিসাবে কাজ করিতেছে। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় বোম্বাইয়ে। ইহা ছাড়া কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরে ইহার আঞ্চলিক (Zonal) কার্যালয়ও আছে।

জীবন বীমা রাষ্ট্রীয়করণের সুবিধা :

(১) ইহাতে প্রতিযোগিতাজনিত অপচয় ও অসাধুতা দূর করা সম্ভব।

(২) ইহার অর্থ বিনিয়োগ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সহায়ক হয় এবং জনস্বার্থমূলক হয়।

(৩) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থের কিছুটা যোগানও ইহা হইতে পাওয়া সম্ভব।

(৪) মুনাফা অর্জন ইহার প্রধান লক্ষ্য নয় বলিয়া বীমাকৃত ব্যক্তিগণ অধিক হারে অধিবৃত্তি (Bonus) পাইতে পারেন।

(৫) কর্মচারীদের বেতনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান হয়, বেতন বৃদ্ধি পায় এবং কর্মের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেখা দেয়। ইহাতে কর্মচারিগণ বীমার কার্য প্রসারকল্পে অধিক যত্নবান হন।

(৬) রাষ্ট্রীয় সংস্থা বলিয়া বীমা করার ব্যাপারে ইহা জনসাধারণের পূর্ণ আস্থা অর্জন করিতে পারে।

ইহার অসুবিধা নিম্নরূপ :

(১) ইহাতে ব্যক্তিগত উদ্যমের অভাব বলিয়া দক্ষতার সহিত ইহার কার্য পরিচালনা হইবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

(২) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহা আমলাতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। এজন্য সাধারণ কর্মচারীদের স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তাহা ছাড়া স্বজনপোষণ, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, কার্যে অবহেলা প্রভৃতি বেশী দেখিতে পাওয়ার সম্ভাবনা।

(৩) ইহাতে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের বেতনের হার অত্যধিক। এজন্য ইহা একটি ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠান। ফলে বীমাকৃত ব্যক্তিগণ কতটা উচ্চ-হারে অধিবৃত্তি পাইবেন তাহা বিবেচনার বিষয়।

(৪) প্রতিযোগিতার অভাব বলিয়া বীমা-মাশুলের হারও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

উপরি-উক্ত অসুবিধা থাকিলেও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে (Socialistic Pattern) রাষ্ট্র গঠন করিতে হইলে এরূপ রাষ্ট্রীয়করণের প্রয়োজন আছে। কালক্রমে এই সকল অসুবিধা দূর হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

জীবন বীমাপত্র গ্রহণ ও উহার দাবী পেশ (Method of taking-out a life policy and making a claim on it)

জীবন বীমাপত্র গ্রহণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

১। প্রথমত, জীবন বীমার কোনও প্রতিনিধি (Agent)-র সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে। তিনি একখানা প্রস্তাবনা প্রপত্র (Proposal form) পূরণ করিতে দিবেন। উক্ত প্রপত্রে বীমা-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সকলই প্রকাশ করিতে হয়। সাধারণত উক্ত প্রপত্রে প্রস্তাবকারীর নাম, ঠিকানা, বয়স, জাতি, ধর্ম, পেশা, পূর্বের বীমা থাকিলে তাহার বিবরণ, পারিবারিক ইতিহাস, রোগভোগ, কত টাকার বীমা করিবে এবং কিভাবে বীমা-মাশুল দিতে ইচ্ছুক প্রভৃতি জানাইতে হয়।

২। ইহার পর প্রস্তাবকারীর স্বাস্থ্য, ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষিত হইবে। প্রস্তাবকারীর স্বাস্থ্য বীমা করার উপযুক্ত, ডাক্তার এই মত প্রকাশ করিলে বীমার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়।

৩। ইহা ছাড়া বীমার প্রতিনিধিকেও বীমার প্রস্তাব সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিতে হয়। এই মতামতের মধ্যে বীমার প্রস্তাবকারীর আয় অনুযায়ী বীমার পরিমাণ যথাযথ হইয়াছে কিনা তাহা প্রতিনিধিকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করিতে হয়।

৪। ইহার পর বীমা কোম্পানী অর্থাৎ Life Insurance Corporation of India উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের সম্মতি (Letter of Acceptance) পাঠাইয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বীমা-মাশুল (Premium) দেওয়ার অনুরোধ জানায়। বীমার প্রস্তাব গ্রহণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকিলে প্রস্তাবনা প্রপত্র পাঠানোর সঙ্গে বীমা-মাশুল জমা দেওয়া চলে।

৫। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর বীমা-মাশুল প্রদত্ত হইলে বীমা কোম্পানী প্রথম বীমা-মাশুলের রসিদ (First Premium Receipt) প্রদান করিয়া থাকে। ইহার পর বীমাপত্র সম্পাদন করিয়া বীমা কোম্পানী বীমাকৃত ব্যক্তিকে উহা পাঠাইয়া থাকে। বীমাপত্র গ্রহণের কাজ উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বীমা চালু রাখিতে হইলে নির্দিষ্ট সময়মত বীমা-মাশুল প্রদান করিয়া যাইতে হইবে।

বীমার দাবী নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পেশ করার নিয়ম :

১। বীমাকৃত ব্যক্তির জীবিতকালে বীমার মেয়াদকাল পূর্ণ হইলে তাহাকে উক্ত মেয়াদকাল পূর্ণ হইবার সাধারণত একমাস পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিসহ দাবীপত্র (Claim Voucher) পেশ করিতে হয় :

(ক) বয়স প্রমাণিত না হইলে বয়সের প্রমাণ।

(খ) বীমাপত্র (Policy) এবং প্রয়োজন হইলে বোনাস সার্টিফিকেটগুলি।

(গ) দাবী পরিশোধ রসিদ (Claim Discharge Voucher)।

(ঘ) ইহার অল্পদিন পরেই বীমাকৃত ব্যক্তি চুক্তি অনুযায়ী টাকা পাইয়া থাকে।

২। বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর দাবী পেশ করিতে হইলে প্রথমত বীমাকৃত ব্যক্তির স্বত্বনিয়োগী (Assignee) অথবা মনোনীত প্রাপক (Nominee)-কে বীমা কোম্পানীর নিকট মৃত্যুর সংবাদ জানাইতে হয়। মৃত্যুসংবাদ জানানোর পর বীমা কোম্পানীর নির্দেশমত দাবীপূরণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পেশ করিতে হয়।

(ক) বয়স প্রমাণিত না হইয়া থাকিলে বয়সের প্রমাণ।

(খ) ইউনিয়ন বোর্ড, পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি কিংবা কর্পোরেশনের মৃত্যু রেজিস্টার (Death Register) হইতে মৃত্যু-সংক্রান্ত বিবরণ।

(গ) চিকিৎসকের বা হাসপাতালের নিকট হইতে মৃত্যুর প্রত্যয়পত্র (Death Certificate)।

(ঘ) কর্মে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যু হইলে নিয়োগকর্তা (Employer)-র নিকট হইতে প্রত্যয়পত্র।

(ঙ) বীমাকৃত ব্যক্তির মৃতদেহ দেখিয়াছেন উক্ত মর্মে কোন সম্মানিত অনাত্মীয় ব্যক্তির নিকট হইতে প্রত্যয়পত্র।

(চ) বীমাকৃত ব্যক্তির শবদেহ সৎকারের সময় উপস্থিত ছিলেন উক্ত মর্মে কোনও সম্মানিত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রত্যয়পত্র।

(ছ) বীমার টাকার দাবীদার কর্তৃক পূরিত নির্দিষ্ট প্রপত্র।

(জ) বীমাপত্র এবং উহার বোনাস সার্টিফিকেটসমূহ।

(ঝ) স্বত্বনিয়োগী (Assignee) অথবা মনোনীত প্রাপক (Nominee) ছাড়া অন্য কোন দাবীদারের পক্ষে উত্তরাধিকার প্রত্যয়পত্র (Succession Certificate) কিংবা মৃত ব্যক্তির শেষ ইচ্ছার প্রোবেট গৃহীত দলিল (Duly Probeted Will)।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি প্রাপ্ত হওয়ার পর বীমা কোম্পানী বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া দাবীদারের নিকট হইতে দাবী পরিশোধের রসিদ (Claim Discharge Voucher) গ্রহণ করিয়া টাকা পরিশোধ করিয়া থাকে।

জাহাজ বন্ধকীপত্র (Bottomry Bond)

জাহাজের যাত্রাপথে উহার সংস্কার বা মেরামত প্রয়োজন হইতে পারে। তজ্জন্য অর্থের অভাব হইলে জাহাজ বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণ করা চলে। যে বন্ধকীপত্র দ্বারা এরূপ ঋণ গৃহীত হইয়া থাকে উহাকে 'জাহাজ বন্ধকীপত্র' বলে।

পণ্য বন্ধকীপত্র (Respondentia Bond)

জাহাজের যাত্রাপথে উহার সংস্কার বা মেরামত প্রয়োজন হইতে পারে। তজ্জন্য

অর্থের প্রয়োজন হইলে জাহাজের পণ্য বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণ করা চলে। যে বন্ধকী-পত্রের দ্বারা এরূপ ঋণ গৃহীত হইয়া থাকে উহাকে 'পণ্য বন্ধকীপত্র' বলে।

প্রতিকল্প উত্তমর্ণ (Subrogation)

বীমাকারী যখন বীমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করেন তখন বীমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বীমাগ্রহীতার তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে কোন অধিকার থাকিলে সে অধিকার বীমাকারীও পাইতে পারেন। এজন্য অবশ্য চুক্তি থাকা প্রয়োজন। যে চুক্তির বলে বীমাকারী উক্ত অধিকার প্রাপ্ত হন উহাকে 'প্রতিকল্প উত্তমর্ণ' বলে। যে নীতির ভিত্তিতে এরূপ অধিকার স্বীকৃত হয় উহাকে প্রতিকল্প উত্তমর্ণের নীতি (Doctrine of Subrogation) বলা হয়।

নিস্তারণ (Salvage)

বিপদের সময় কোন জাহাজ বা জাহাজের পণ্যাদির উদ্ধারকার্যের জন্য তৃতীয় পক্ষের সাহায্য প্রয়োজন হইতে পারে। এরূপ সহায়তার জন্য তৃতীয় পক্ষকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় উহাকে 'নিস্তারণ' বলে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. What is Insurance ? Discuss its importance.

বীমা কাহাকে বলে ? উহার গুরুত্ব আলোচনা কর।

2. Discuss the essential characteristics of an Insurance contract.

বীমাচুক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

3. Give a brief account of the different kinds of Insurance.

বিভিন্ন প্রকার বীমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

4. State the nature of marine insurance and discuss the principles, elements and risks involved in a marine policy.

[C. U. B. Com. (Hons.) 1970]

নৌ বীমার প্রকৃতি এবং নৌ বীমা চুক্তিপত্রে যে নীতি, উপাদান ও ঝুঁকি বিবেচিত হইয়া থাকে উহা আলোচনা কর।

5. Give a short account of the different kinds of Marine Insurance Policy.

বিভিন্ন প্রকার নৌ বীমাপত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

6. What is a Lloyds' Policy ? How many types of policies may be issued by Lloyds. [C. U. B. Com. (Hons.) 1967]

ল্যয়েডের বীমাপত্র কাহাকে বলে ? ল্যয়েড কত প্রকার বীমাপত্র প্রদান করিয়া থাকে ?

7. What are the advantages of Marine Insurance ? Discuss the principal clauses of such a policy. [C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

নৌ বীমার কি সুবিধা ? নৌ বীমাপত্রের বিভিন্ন দফা আলোচনা কর।

8. Discuss the main clauses of a Marine Insurance Policy. [C. U. B. Com. (Pass) 1968]

নৌ বীমাপত্রের বিভিন্ন দফাগুলি আলোচনা কর।

9. Distinguish between General Average and Particular Average. What are the contributing interests in a General Average Loss and how are the claims adjusted ? [C. U. B. Com. 1956]

সাধারণ গড়ক্ষতি এবং বিশেষ গড়ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। সাধারণ গড়ক্ষতি পূরণের জন্য কাহারা দায়ী এবং উক্ত দায় কিভাবে স্থির হয় ?

10. What is Fire Insurance ? Discuss the method of taking out a Fire Insurance Policy and making a claim on it.

অগ্নি বীমা কাহাকে বলে ? অগ্নি বীমাপত্র গ্রহণ ও উহার ক্ষতিপূরণ দাবী কিভাবে করিতে হয় উহার আলোচনা কর।

11. Describe the different kinds of Fire Insurance Policies that may be issued by the Fire Insurance Company.

অগ্নি বীমা কোম্পানী সাধারণত যে যে প্রকারের অগ্নি বীমাপত্র প্রদান করিয়া থাকে উহার বিবরণ দাও।

12. Do you think that the decisions of the Life Insurance Corporation to enter into General Insurance business has been a wise one ? Discuss fully. [C. U. B. Com. (Hons.) 1964]

জীবন বীমা কর্পোরেশনের পক্ষে সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত কি সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে বলিয়া তুমি মনে কর ? বিশদভাবে আলোচনা কর।

13. Should General Insurance of the country be nationalised ? Give reasons for your answer. [C. U. B. Com. (Hons.) 1966]

দেশের সাধারণ বীমা-ব্যবস্থা কি জাতীয়করণ করা উচিত ? তোমার উত্তরের যুক্তি দেখাও।

14. What is Life Insurance ? Give a short account of different kinds of Life Policies.

জীবন বীমা কাহাকে বলে ? বিভিন্ন প্রকার জীবন বীমাপত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

15 'Whole life' and 'Endowment' Policies both with profit and without profit are issued by the Life Insurance Corporation. Discuss.

their respective advantages and disadvantages. List the main clauses of a Life Insurance Policy. [C. U. B. Com. (Pass) 1964]

মুনাফা সমেত ও মুনাফা ছাড়া আজীবন বীমাপত্র এবং মিয়াদী বীমাপত্র জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদান করা হয়। উহাদের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর। একটি জীবন বীমাপত্রে দফাগুলির উল্লেখ কর।

16. Some say that formation of the Life Insurance Corporation has been a wise move on the part of the Government, others maintain that the Life Insurance business should have been kept under the private sector. What are your views ? [C. U. B. Com. 1958]

কেহ কেহ বলেন জীবন বীমা কর্পোরেশন গঠন সরকারের পক্ষে বিজ্ঞতার পরিচয়, আবার কেহ কেহ বলেন জীবন বীমা বেসরকারী আওতায় থাকা উচিত ছিল। তোমার মতামত কি ?

17. What do you understand by L. I. C. ? How and for what purpose it has been brought into existence ?

[C. U. B. Com. 1961]

এল. আই. সি. বলিতে কি বুঝ ? উহা কিভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে ?

18. How would you take out a life policy and make a claim on it ?

জীবন বীমাপত্র কিভাবে গ্রহণ করিবে এবং কিভাবে উহার দাবী পেশ করিবে ?

19. Write short notes on : Surrender Value, Actuarial Valuation, Subrogation, Bottomry Bond, Respondentia Bond, Salvage.

সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও : সমর্পণ মূল্য, অ্যাকচুয়ারীয় হিসাব নিকাশ, প্রতিকল্প উত্তমর্ণ, জাহাজ বন্ধকীপত্র, পণ্য বন্ধকীপত্র, নিস্তারণ।

20. Discuss the importance of fire and marine insurance in business. What is meant by General Average ?

[C. U. B. Com. (Pass) 1971]

কারবারে অগ্নি ও নৌ বীমার গুরুত্ব আলোচনা কর। গড়ক্ষতি বলিতে কি বুঝ ?

21. Discuss the importance of fire and marine insurance in business. [C. U. B. Com. (Pass) 1972]

কারবারে অগ্নি ও নৌ বীমার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সরকার এবং বাণিজ্য জগৎ

(Government and the Business World)

কারবারের উপর সরকারী প্রভাব এবং সরকারী হস্তক্ষেপের পদ্ধতি
(Influence of Government over business and the methods of Governmental interference over it)

ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর সরকারী প্রভাবকে রাষ্ট্রের প্রভাবও বলা হয়। রাষ্ট্র অবাস্তব (Abstract)। সরকারের মাধ্যমে উহা বাস্তব রূপ (Concrete shape) গ্রহণ করে। সুতরাং এক্ষেত্রে সরকারী প্রভাব বলিতে রাষ্ট্রের প্রভাবকেই বুঝাইতেছে।

বর্তমান সরকার বা রাষ্ট্র ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এমন সময় ছিল যখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার কোন অংশ গ্রহণ করিত না এবং অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণ করারও চেষ্টা করিত না। তখন সরকারের কাজ ছিল দেশের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করা, দেশকে অন্য দেশের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা এবং বিদেশের সহিত যথাসম্ভব মিত্রতা বজায় রাখা। তখনকার সরকারী নীতিকে বলা হইত 'নির্বিরোধ নীতি' (Laissez Faire Policy)। এই নীতির যাঁহারা সমর্থক তাঁহারা শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপকে অনিষ্টকর, নিষ্ফল ও সরকারী অর্থের অপব্যয় মনে করেন ("For Government to regulate industry is pernicious, to assist it is futile and to participate in it is to waste public money")[1]। কিন্তু কালক্রমে সরকারী নির্লিপ্ততার অবসান ঘটিতে আরম্ভ করে। বিশেষত শিল্প-বিপ্লবের পর ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিসর ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে জনকল্যাণের খাতিরে শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। বর্তমান কালে প্রত্যেক রাষ্ট্রই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State) আখ্যা গ্রহণ করার জন্য সচেষ্ট। এরূপ অবস্থায় দেশের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং কেবল বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করার কাজ লইয়া ব্যাপৃত থাকা আর কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। নাগরিকদিগের কল্যাণ ভিন্ন রাষ্ট্রের উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। এজন্য চাই জনগণের শিক্ষার উন্নতি, স্বাস্থ্যের উন্নতি, দরিদ্র, বেকার ও বৃদ্ধদের সংরক্ষণ, শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি, রাস্তা নির্মাণ, জলসেচ ব্যবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতি। প্রকৃত প্রস্তাবে বর্তমানে সমাজে যে জটিল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি, ধনবৈষম্য দূর, শ্রমিক-শোষণ রোধ প্রভৃতি ভিন্ন জনকল্যাণ সম্ভব নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে শিল্প-বাণিজ্য

1. *Cf.* M. C. Shukla, Business Organisation and Management (1965), P. 727.

ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। ভারত রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক রূপ (Socialistic Pattern) দেওয়াও বর্তমান ভারত সরকারের উদ্দেশ্য। এজন্য ভারত সরকার শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করিয়াছেন। জনকল্যাণের জন্য এরূপ নীতি অবশ্যই সমর্থনযোগ্য।

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সংগঠন, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত নিম্নলিখিত উপায়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ পরিস্ফুট হয় :

(১) রাষ্ট্রীয়করণ কিংবা শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ : সোভিয়েত রাশিয়ায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। সেখানে সকল প্রকার শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত এবং রাষ্ট্র-কর্তৃক পরিচালিত। সেখানে শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বে-সরকারী উদ্যমের কোন স্থান নাই। ভারত বা বৃটেন এই রাষ্ট্রীয়করণ নীতি আংশিক গ্রহণ করিয়াছে।

(২) সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যমের পাশাপাশি অবস্থান : এই নীতি অনুযায়ী কতকগুলি শিল্প ও ব্যবসা সরকারী খাতে (Public Sector) এবং কতকগুলি শিল্প ও ব্যবসা বে-সরকারী খাতে (Private Sector) পরিচালিত হয়। ভারত ও বৃটেনে এই নীতি বিশেষভাবে প্রচলিত। এই নীতিকে বলা হয় 'মিশ্র অর্থনীতি' (Mixed Economy)।

(৩) শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে বে-সরকারী উদ্যমকে সাহায্য ও উৎসাহ দান : এরূপ ব্যবস্থায় বে সরকারী শিল্প ও ব্যবসা যাহাতে জনকল্যাণমূলক হয় এবং যথোচিতভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে সেজন্য সুবিধাজনক আইন প্রণয়ন ও সাহায্য দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকে। এরূপ নীতিও ভারতে প্রচলিত।

(৪) বিভিন্ন প্রকার আইন পাশ করিয়া বে-সরকারী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করা : বে-সরকারী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে জনকল্যাণ-বিরোধী কার্যকলাপ রোধ করা, শ্রমিক-শোষণ নীতি বন্ধ করা ও অন্যান্য দুর্নীতি দমনমূলক আইন পাস করিয়া উক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা এই নীতির উদ্দেশ্য।

জাতীয়করণ এবং উহার সুবিধা ও অসুবিধা (Nationalisation and its advantages and disadvantages)

কোনও প্রতিষ্ঠানের মালিকানাস্বত্ব সরকার কর্তৃক গৃহীত হইলে এবং উক্ত প্রতি-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতির উপর সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইলে উহাকে রাষ্ট্রীয়করণ বা জাতীয়করণ (Nationalisation) বলে। সুতরাং জাতীয়করণের মূল উদ্দেশ্য হইল দুইটি : (১) সরকার-কর্তৃক মালিকানাস্বত্ব গ্রহণ এবং (২) উহার পরিচালনায় সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। আবার সরকারী কর্তৃত্ব ও

মালিকানা দুই উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে : (১) সরকারী বিভাগের অন্তর্গত রাখিয়া যেমন, ভারতীয় রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতি এবং (২) স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করিয়া যেমন, দুর্গাপুর, রুঢ়কেল্লা ও ভিলাইয়ের লৌহ ইস্পাত কারখানা, হিন্দুস্থান শিপ ইয়ার্ড (প্রাঃ) লিঃ, হিন্দুস্থান কেব্‌লস্‌, হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট্‌ প্রভৃতি।

জাতীয়করণের সুবিধা নিম্নরূপ :

(১) ইহাতে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও সম্প্রসারণ জনস্বার্থমূলক হয়। কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। উহা দেশের জনসাধারণের সম্পত্তি।

(২) ইহার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার হওয়ার সুযোগ পায়। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইলে উহা ব্যক্তিত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই নিয়োজিত হইবে এবং শ্রমশক্তি শোষিত হইবে। ফলে উহাদের জনকল্যাণমূলক পূর্ণ সদ্ব্যবহার কখনই সম্ভব হইবে না।

(৩) ইহাতে প্রতিযোগিতা ও অপচয় দূর হয়। ব্যক্তিগত মালিকানা ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে যে নানাপ্রকার অনিষ্টকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহার সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে থাকে না।

(৪) উন্নয়নমূলক গবেষণা-কার্য সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে। রাষ্ট্রীয় কারবারের উদ্দেশ্য হইবে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এজন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তাহার অভাব রাষ্ট্রায়ত্ত কারবারে দেখা দেয় না। ফলে ব্যক্তিগত কারবারের মত অর্থাভাবের জন্য গবেষণা-কার্য চলার কোন বাধা ইহাতে আসে না। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় কারবারে গবেষণায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেশী পাওয়া যায়।

(৫) রাষ্ট্রীয় কারবারে জনসাধারণের পূর্ণ আস্থা ও সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব। কারণ এরূপ কারবার প্রকৃত প্রস্তাবে জনসাধারণের কারবার।

(৬) মুনাফা অর্জন ইহার প্রধান লক্ষ্য নহে। জনকল্যাণই ইহার প্রধান লক্ষ্য। এরূপ প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্য জনসাধারণ কম মূল্যে পাইতে পারে।

(৭) রাষ্ট্রীয় কারবারে অর্জিত মুনাফা জনকল্যাণমূলক নানাবিধ কার্যে ব্যয়িত হইতে পারে এবং নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইতে পারে।

(৮) রাষ্ট্রীয় কারবারই বেকার সমস্যার সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগ করিতে পারে। মুনাফা অর্জন প্রধান লক্ষ্য নহে বলিয়া বেশী সংখ্যক লোকও ইহাতে নিয়োজিত হইতে পারে।

(৯) এরূপ অনেক শিল্প আছে যেমন, লৌহ-ইস্পাত শিল্প কিংবা বিমানপোত নির্মাণ-শিল্প যাহাতে এত অধিক টাকার প্রয়োজন হয় যে, বে-সরকারী মালিকানায় উহা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। ফলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ভিন্ন এরূপ শিল্পের উন্নতি হইতে পারে না।

জাতীয়করণের অসুবিধা নিম্নরূপ :

(১) ইহাতে ব্যক্তিগত উদ্যমের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এজন্য জাতীয়করণের যত গুণ-গানই হউক না কেন ইহা দক্ষতার সহিত কখনই পরিচালিত হইতে দেখা যায় না।

(২) এরূপ প্রতিষ্ঠান আমলাতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। এজন্য শ্রমিক ও মালিকের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বলিয়া কোন কিছুই নাই। এখানে সকলেই কর্মচারী। সেজন্য উর্ধ্বতন কর্মচারী অধস্তন কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগের দিকে কমই দৃষ্টি দিয়া থাকে।

(৩) এরূপ প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত স্থানে নিয়োগের সুবিধা আছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে স্বজনপোষণ, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, কাজে অবহেলা প্রভৃতিই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) এরূপ প্রতিষ্ঠানে উর্ধ্বতন কর্মচারীদের বেতনের হার অত্যধিক। ফলে ইহাতে ব্যয়-বাহুল্য বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) প্রতিযোগিতার অভাবহেতু জনসাধারণকে প্রকৃত প্রস্তাবে অধিক মূল্যেই জিনিস ক্রয় করিতে হয়।

(৬) গবেষণামূলক কাজের সুযোগ-সুবিধা বেশী থাকিলেও উহাতে উক্ত কাজের অগ্রগতির পরিবর্তে অর্থের অপচয়ই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

সুতরাং জাতীয়করণের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি-তর্ক বিদ্যমান। এরূপ অবস্থায় মধ্যপথ অবলম্বন করা অনেকের মত। তাহাতে সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান উভয়ই থাকিবে। এরূপ ব্যবস্থায় কেবল গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক শিল্পগুলি সরকারী মালিকানায় থাকিবে। অবশিষ্ট শিল্পগুলি বে-সরকারী মালিকানায় থাকিবে। এরূপ ব্যবস্থাকে 'মিশ্র অর্থ-নীতি' (Mixed Economy) আখ্যা দেওয়া হয়। বর্তমানে ভারতে শিল্প-বাণিজ্য ব্যাপারে এই নীতি চালু আছে।

ভারত সরকারের শিল্প-নীতি (Industrial Policy of the Government of India)

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারত সরকারের শিল্প-নীতিকে উদাসীন স্বাতন্ত্র্যবাদ (Apathetic Laissez Faire) বলিয়া অভিহিত করা হইত। কিন্তু স্বাধীনতার পর ভারত সরকার শিল্প-সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করিতে অগ্রসর হন। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকারের শিল্প-নীতি প্রথম প্রকাশ পায়। পরে ১৯৫১ ও ১৯৫৩ সালে উহাতে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। ইহার পর ১৯৫৬ সালে পুনরায় নূতন করিয়া শিল্প-নীতি ঘোষিত হয়। ইহাই ভারত সরকারের বর্তমান মূল শিল্প-নীতি। ইহাতে ক্রমপর্যায়ে শিল্প-জাতীয়করণের নীতি গৃহীত হইয়াছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুত শিল্পোন্নতি সাধন করাও এই নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহাতে শিল্পগুলিকে তিনটি পৃথক পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। নিম্নে উক্ত শিল্প-নীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল :

(১) প্রথম পর্যায়ে দেশরক্ষা ও সামরিক দিক দিয়া প্রয়োজনীয় শিল্প, অস্ত্র-শস্ত্র গোলাবারুদ উৎপাদন-শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, খনিজ তৈল, ভারী যন্ত্রপাতি, বিমানপোত, রেল-পরিবহন, বিমান-পরিবহন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, জাহাজ, আণবিক শক্তি প্রভৃতি ১৭টি শিল্প উল্লিখিত হইয়াছে। এই শিল্পগুলির উন্নয়ন ও পরিচালনা সরকারী দায়িত্বে রাষ্ট্রায়ত্তভাবে গড়িয়া তোলা হইবে। উক্ত শিল্পগুলির মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র, আণবিক শক্তি, রেলপথ ও বিমান-পরিবহন ছাড়া অন্যক্ষেত্রে যে-সমস্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান চালু আছে সেগুলি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে উহা বর্তমানে চালু থাকিবে এবং প্রয়োজনবোধে সরকারী সাহায্যও দেওয়া যাইবে। কিন্তু এই পর্যায়ে নূতন কোন শিল্প বে-সরকারী উদ্যোগে গড়িয়া উঠিতে পারিবে না।

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ে এ্যালুমিনিয়াম, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, রোগের বীজাণুনাশক ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ, প্লাষ্টিক, রং এবং সড়ক-পরিবহন প্রভৃতি ১২টি শিল্পের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যম পাশাপাশি থাকিবে। এক্ষেত্রে সরকার নূতন শিল্প স্থাপন করিবে। সরকারী সহযোগিতায় বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানও ইহার প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) অবশিষ্ট যাবতীয় শিল্প তৃতীয় পর্যায়ে। ইহা বে-সরকারী উদ্যমে পরিচালিত হইবে। তবে ইহাতে সরকারের অংশ গ্রহণ করিবার কোন বাধা নাই। প্রয়োজন বোধ করিলে সরকার উহার যে-কোনটা রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে পারিবে। ইহাতে বে-সরকারী উদ্যমকে সাহায্য করাও সরকারী নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

(৪) এই শিল্প-নীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।

(৫) ইহাতে শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের নীতিও গৃহীত হইয়াছে।

(৬) শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষার উপরও এই নীতিতে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

(৭) সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে অর্থনৈতিক কাঠামোকে রূপান্তরিত করাও এই নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। সেজন্য শিল্পোন্নয়নে বে-সরকারী প্রচেষ্টা উৎসাহিত হইলেও সরকারী প্রচেষ্টার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

(৮) উপরি-উক্ত মূল শিল্পনীতির ভিত্তিতে ১৯৭৩ সালে যে শিল্পনীতি ঘোষিত হয় উহাতে স্বনির্ভরতা (Self-reliance) এবং যৌথ মালিকানা (Joint Sector)-র উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য গৃহীত ব্যবস্থা (Steps taken by Central and State Governments in India for furtherance of industry, trade and commerce)

অনেক দেশেরই শিল্প ও ব্যবসা পূর্বাপেক্ষা অনেক ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। এখন শিল্প ও ব্যবসা কোন স্থান বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। এজন্য প্রতিযোগিতার

ক্ষেত্রও প্রসারিত হইয়াছে। উৎপাদন ব্যবস্থায়ও নানাবিধ জটিলতা দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন জনের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থ এখন শিল্প ও ব্যবসায়ের সহিত জড়িত। এরূপ অবস্থায় কোন দেশের রাষ্ট্র বা সরকারের পক্ষে পূর্বের মত আর নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন থাকা চলে না। তাই পূর্বের নির্বিরোধ নীতি (Laissez Faire Policy) ত্যাগ করিয়া সরকারকে অনেক ক্ষেত্রে শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করিতে হইতেছে এবং ইহার উন্নতি ও প্রসারের জন্য নানাভাবে সরকার উৎসাহ ও সহায়তা দান করিতেছেন। যে সমস্ত উপায়ে সাধারণত এই উৎসাহ ও সহায়তার কাজ চলিতেছে নিম্নে তাহাদের কতকগুলি উল্লেখ করা হইল :

(১) **সংরক্ষণ ও সাহায্য দান :** অনেক দেশীয় শিল্পকে বৈদেশিক প্রতি-যোগিতার হাত হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় যে বিদেশী পণ্যের হাত হইতে শিল্পকে রক্ষা করা প্রয়োজন তাহার উপর উচ্চহারে আমদানী শুল্ক ধার্য করা হয় কিংবা দেশীয় শিল্পকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

(২) **সুসংহত মুদ্রা-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার সংগঠন :** আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান (Gold Standard) ত্যাগ করার পর দ্রব্যমূল্য যাহাতে অযথা উঠানামা না করে তজ্জন্য মুদ্রা-ব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য বহু দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। যথোপযুক্ত টাকার বাজার ভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুষ্ঠু কাজ-কারবার ব্যাহত হয়। এজন্য টাকার বাজার সংগঠনের দায়িত্বও সরকারের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

(৩) **মূলধন সংস্থা :** ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় মূলধন অনেকক্ষেত্রেই যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। সরকারের এক্ষেত্রে সাহায্য করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, লগ্নি সংস্থা প্রভৃতির স্থাপন ও উন্নতিবিধান করিয়া সরকার মূলধন সরবরাহের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়া দিতেছেন।

(৪) **আইন প্রণয়ন :** শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য যদৃচ্ছ গড়িয়া উঠিতে থাকিলে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার প্রকট হইয়া পড়ে। অনেকক্ষেত্রে শ্রমিক ও জনসাধারণের স্বার্থও বিপন্ন হয়। সুতরাং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিকমত পরিচালনার জন্য এবং বিভিন্ন পক্ষের ও রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য আইন-প্রণয়ন প্রয়োজন। এজন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র শিল্প ব্যবসা-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করিয়া আসিতেছেন।

(৫) **যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি :** যানবাহন ব্যবস্থার সম্যক্ উন্নতি ভিন্ন যেমন দেশরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্ভব নয় তেমনই ইহার উন্নতি ভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব নহে। এজন্য সরকারকে রেল, জাহাজ, মোটর প্রভৃতি যানবাহন-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইতেছে।

(৬) **কর ব্যবস্থার সামঞ্জস্য :** রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন উহা জনসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া পূরণ করা হয়। কিন্তু যদৃচ্ছ কর স্থাপন করিলে জনসাধারণ বিপন্ন হইয়া পড়ে এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতিলাভ করিতে পারে না। এজন্য কর-স্থাপন নীতিতে জনসাধারণের স্বার্থ যাহাতে উপেক্ষিত

না হয় অথচ প্রচুর রাজস্ব আদায় হয় এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই বর্তমানে সরকারকে অগ্রসর হইতে হইতেছে।

(৭) সরকারী বিভাগের সাহায্য ও সহায়তা : শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারকল্পে কেবল আইন-প্রণয়ন ও নীতি-নির্ধারণ করিলে চলে না। ব্যাপকতা অনুযায়ী উহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও বিভাগের প্রয়োজন। এজন্য বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগ গঠন করিয়া শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য ও সহায়তা করা হইতেছে।

(৮) বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগ : বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-স্বার্থ রক্ষাকল্পে প্রায় প্রত্যেক দেশই বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকে।

(৯) পণ্য-ভোগ নিয়ন্ত্রণ : কোন সময়ে কোনও পণ্যের চাহিদা অনুযায়ী যোগান কম হইলে ব্যবসা ও জনস্বার্থের কল্যাণে উহার ভোগও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে।

(১০) শিল্প-সংস্কার (Rationalisation of Industry) : শিল্প-সংস্কার সাধন করিয়া উহা সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া উন্নত করা সম্পর্কে বর্তমানে সরকারী সাহায্য ও সহায়তাও দেখা যাইতেছে।

শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য স্থাপিত সরকারী বিভাগ এবং সাধারণ প্রতিষ্ঠান (Different Government Departments and Public Bodies established to regulate and promote industry and commerce)

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র শুধু আইন-প্রণয়ন ও নীতি-নির্ধারণ করিয়া শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার সাধন করিতে পারে না। এজন্য বিভিন্ন সরকারী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ভারতে এরূপ অনেক সরকারী বিভাগ বহুদিন হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে স্বাধীনতার পর ইহার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উত্তরোত্তর বিভিন্ন মন্ত্রী-দপ্তর ও বিভাগ সৃষ্টি হইতেছে। নিম্নে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্পর্কিত ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কতকগুলি বিভাগের কিছুটা পরিচয় প্রদত্ত হইল :

(১) অর্থমন্ত্রী দপ্তর (Ministry of Finance) : এই দপ্তর ভারতের আর্থিক নীতি, মুদ্রা-ব্যবস্থা, টাকার বাজার, ব্যাঙ্ক-ব্যবসা, লগ্নী কারবার, কর-ব্যবস্থা, সরকারের আয়-ব্যয় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। এই দপ্তর আবার প্রধানত তিনটি বিভাগে বিভক্ত : (১) রাজস্ব বিভাগ (Department of Revenue), (২) ব্যয় বিভাগ (Department of Expenditure) এবং (৩) অর্থনৈতিক-বিষয়ক বিভাগ (Department of Economic Affairs)। উক্ত তিন বিভাগের আবার কতকগুলি উপবিভাগও আছে। এই দপ্তরের কার্য পরিচালনার জন্য অনেকক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রয়োজন হয়।

(২) **বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী দপ্তর** (Ministry of Commerce and Industry) : শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া এই দপ্তর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প ও বাণিজ্য নীতি নির্ধারণ ও উহা যথাযথভাবে কার্যকরী করা এই দপ্তরের কাজ। ইঁহার কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ইহা বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগে বিভক্ত। ইহা পূর্বে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সরবরাহ মন্ত্রক (Ministry of Foreign Trade and Supply) এবং শিল্পোন্নতি, কোম্পানী ব্যাপার ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য মন্ত্রক (Ministry of Industrial Development, Company Affairs and Internal Trade) এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে ইহা বাণিজ্য মন্ত্রক (Ministry of Commerce), কোম্পানী ব্যাপার মন্ত্রক (Ministry of Company Affairs), শিল্পোন্নতি, বিজ্ঞান ও করণকৌশল (Ministry of Industrial Development, Science and Technology) প্রভৃতি মন্ত্রকে বিভক্ত। ইহা ছাড়া, আমদানী-রপ্তানী এবং বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক উন্নয়ন পরিষদ (Development Councils) গঠিত হইয়াছে। নিম্নে উহার কিছুটা পরিচয় প্রদত্ত হইল :

(ক) **রপ্তানী উপদেষ্টা পরিষদ** (Export Advisory Council) : এই পরিষদ ২০ জন বে-সরকারী সদস্য লইয়া গঠিত। রপ্তানী বাণিজ্যে উন্নতিবিধান করাই এই পরিষদের কাজ। এজন্য ইঁহারা রপ্তানী বাণিজ্যের সুবিধা-অসুবিধা, সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি আলোচনা করিয়া কোন্ দিকে কোন্ পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহার সুপারিশ করেন। উক্ত সুপারিশ অনুযায়ী সরকার প্রতি ছয় মাস বা এক বৎসর অন্তর রপ্তানী-নীতি নির্ধারণ করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পণ্য রপ্তানীর অনুমতি দিয়া থাকেন।

(খ) **আমদানী উপদেষ্টা পরিষদ** (Import Advisory Council) : কোন্ পণ্যের আমদানী কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত সে সম্বন্ধে এই পরিষদ সরকারকে উপদেশ দিয়া থাকেন। উক্ত উপদেশ বা সুপারিশ অনুযায়ী রপ্তানীর মত সরকার প্রতি ছয় মাস বা এক বৎসর অন্তর আমদানী-নীতি নির্ধারণ করেন এবং পণ্য আমদানীর অনুমতি দিয়া থাকেন।

আমদানী ও রপ্তানীর অনুমতি পত্র দিবার ভার চীফ্ কণ্ট্রোলার অব এক্সপোর্টস্ এণ্ড ইম্পোর্টস্ (Chief Controller of Exports & Imports)-এর উপর। ইহা ছাড়া রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য রপ্তানী উন্নয়ন পরামর্শ কমিটি (Export Promotion Advisory Committee), রপ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন (Export Credit and Guarantee Corporation) গঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন স্থানে মেলা, প্রদর্শনী, প্রদর্শনী গৃহ, বাণিজ্যিক কেন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ও স্থানে প্রতিষ্ঠা করার কাজ বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগের উপর দেওয়া আছে।

(গ) বাণিজ্যিক তথ্য ও পরিসংখ্যান বিভাগ (Department of Commercial Intelligence and Statistics) : নানাপ্রকার বাণিজ্যিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং উহাদের যথাযথ বিন্যাসও প্রকাশ করা এই বিভাগের কাজ। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম ডিরেক্টর জেনারেল অব কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড স্ট্যাটিষ্টিকস্ (Director General of Commercial Intelligence and Statistics)।

(ঘ) শুল্ক কমিশন (Tariff Commission) : কোন শিল্প সংরক্ষণ-প্রার্থী হইলে উহার বিচার-বিবেচনা, অনুসন্ধান, সুপারিশ প্রভৃতির কাজ এই বিভাগ করিয়া থাকে। এতদ্ উদ্দেশ্যে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই বিভাগ গঠিত হয়। দ্রব্য মূল্যান্তর, জীবন-যাত্রার মান ও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর সংরক্ষণের প্রভাব বিচার-বিশ্লেষণ করাও ইহার কাজ।

(ঙ) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (State Trading Corporation) : বে-সরকারী প্রচেষ্টায় যে সমস্ত দ্রব্যের আমদানী-রপ্তানী কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো দেশের বা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বাঞ্ছনীয় নহে তাহার কাজ-কারবার গ্রহণ করার জন্য এই কর্পোরেশন ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১ কোটি টাকা মূলধন লইয়া স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ফলে ব্যবসায়ীদের অযথা মুনাফাবাজী অনেক বন্ধ হইয়াছে।

(চ) নিয়ামক বিভাগ (Department of Control) : বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন, বণ্টন, মূল্যনীতি, আমদানী-রপ্তানী, বৈদেশিক মুদ্রার সদ্ব্যবহার ও সঞ্চয় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন বিভাগ আছে। যে সমস্ত কর্মচারী এই বিভিন্ন বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ তাঁহাদের মধ্যে আমদানী-রপ্তানী কন্ট্রোলার (Controller of Imports and Exports), লৌহ ও ইস্পাত কন্ট্রোলার (Controller of Iron and Steel), টেক্সটাইল কমিশনার (Textile Commissioner), অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (Economic Adviser), স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রীজ উন্নয়ন কমিশনার (Development Commissioner for Small-scale Industries) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বিভাগ পরিচালনার জন্য অফিস ও বহু কর্মচারী আছে।

(ছ) শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ (Advisory Council to Industries) : এই পরিষদ দেশের মধ্যে বিভিন্ন নূতন শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া থাকেন। বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইহার অধীনে আরও অনেক বিভাগ বা পরিষদ আছে। সামগ্রিকভাবে শিল্পোন্নয়ন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

(জ) জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন (National Industrial Development Corporation) : শিল্পে ঋণদান ও সাহায্যপ্রদানের জন্য বিভিন্ন সংস্থা গঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এই সংস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা নূতন শিল্প স্থাপনের নীতি নির্ধারণ ও উহা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকারের

প্রতিনিধি হিসাবে বিশেষত পাট ও কার্পাস শিল্পের পুনঃসংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজও ইহার উপর ন্যস্ত ছিল।

(ঝ) **জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (National Small-scale- industries Corporation) :** ইহার প্রান কাজ হইতেছে ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য সরকারী অর্ডার সংগ্রহ করা, সওদা বিক্রয়ের ভিত্তিতে যন্ত্রাদি দেওয়া, উহাদের পণ্য বিক্রয়ে সাহায্য করা এবং ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এস্টেট প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।

(ঞ) **লাইসেন্স কমিটি (Licence Committee) :** লাইসেন্স ছাড়া কোন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই লাইসেন্স দেওয়ার ভার এই কমিটির উপর।

(ট) **জাতীয় গবেষণাগার (National Laboratories) :** দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বা স্থানে জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের কাজ গবেষণার দ্বারা কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করা এবং এইভাবে অর্থ নৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করা। ভারতের বিভিন্ন জাতীয় গবেষণাগারের মধ্যে National Chemical Laboratory (Poona), National Physical Laboratory (New Delhi), Central Fuel Research Institute (Jealgora—Bihar), Glass and Ceramic Research Institute (Jadavpur—Calcutta), Central Scientific Instruments Organisation (New Delhi), Central Mining Research Station (Dhanbad) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এরূপ জাতীয় গবেষণাগার যাহা স্থাপিত হইয়াছে উহাদের সংখ্যা ৩০টির অধিক হইবে।

(ঠ) **কারিগরি প্রতিষ্ঠান (Technical Institutes) :** ভারতে কারিগরি বিদ্যা প্রসারের এবং উন্নতির জন্য অনেক কারিগরি প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের প্রধান কাজ কারিগরি শিক্ষা দেওয়া এবং গবেষণার দ্বারা উন্নত মান স্থির করা। কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য সারা ভারতে কারিগরি শিক্ষা পরিষদও গঠিত হইয়াছে।

(ড) **ভারতীয় মান নির্ধারণ সংস্থা (Indian Standards Institution—I. S. I.) :** ইহা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে। কৃষিজাত ও শিল্পজাত-দ্রব্যাদি, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পণ্য ও দ্রব্য-সামগ্রীর মান নির্ধারণ এবং উহার উৎকর্ষসাধন ইহার প্রধান কাজ। কোন নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী কোন দ্রব্য উৎপাদিত হইলে এই সংস্থা উহার জন্য প্রমাণপত্র (Certificate) প্রদান করিয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে উক্ত দ্রব্যের উপর এই সংস্থার I. S. I. নামাঙ্কিত ছাপ ব্যবহার করার অনুমতিও দিয়া থাকে। এই নামাঙ্কিত ছাপ দেখিয়া জিনিস ক্রয় করিলে নির্দিষ্ট মানের পণ্য ক্রয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এইভাবে পণ্যের মান বজায় থাকিলে উহার আভ্যন্তরীণ ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশের বাজারেও এরূপ পণ্য সমাদর লাভ করে।

(চ) ক্ষুদ্রায়তন সেবামূলক সংস্থা (Small-scale Services Institute): আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলের (International Planning Team) সুপারিশ অনুযায়ী প্রথম পরিকল্পনার শেষের দিকে চারিটি আঞ্চলিক ক্ষুদ্রায়তন সেবামূলক সংস্থা এবং উহাদের কয়েকটি শাখা স্থাপিত হয়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে পরামর্শ এবং সাহায্যদানের জন্যই ইহা স্থাপিত হয়। নিজেদের কারখানার মাধ্যমে ইহা কারিগরি পরামর্শ এবং সেবাও বিতরণ করে এবং ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের উপর স্থাপিত কারখানা হইতে কারিগরি জ্ঞান ও কার্যকলাপ প্রদর্শন করিয়া থাকে। উন্নত প্রণালীর কারিগরি বিদ্যা এবং যন্ত্রাদির ব্যবহারও ইহা শিক্ষা দিয়া থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রত্যেক রাজ্যেই ইহা স্থাপিত হইয়াছে।

(ণ) বাণিজ্যিক কমিশনার (Trade Commissioners): সরকারী কর্মচারী হিসাবে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক কমিশনার নিযুক্ত আছেন। ইনি নিজ দেশের পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির চেষ্টায় থাকেন এবং নিজ রাষ্ট্রের সহিত তিনি যে রাষ্ট্রে অবস্থিত সে রাষ্ট্রের বাণিজ্যসম্পর্ক যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় সেদিকে সচেষ্ট থাকেন। ইনি যে রাষ্ট্রে নিযুক্ত হন উহার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া নিজ দেশে প্রেরণ করেন। ঐ সকল তথ্য হইতে দেশের আমদানী রপ্তানী-কারকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হন।

(ত) রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ (Export Promotion Councils): ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের শোচনীয় প্রতিকূল উদ্বৃত্তের প্রতিকারের জন্য সরকার যে যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করিয়াছেন উহাদের মধ্যে রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ অন্যতম। যে সকল পণ্য প্রধানত রপ্তানী হইয়া থাকে উহাদের রপ্তানী যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাহার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রত্যেক পণ্যের জন্য একটি করিয়া রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ইহার প্রধান কাজ রপ্তানী বৃদ্ধির বাধা অপসারণ করা, বৈদেশিক বাজার অনুসন্ধান করা, বৈদেশিক বাজার সৃষ্টি করা এবং উহা সম্প্রসারণের নিমিত্ত উপযুক্ত পরামর্শ দান করা। বর্তমানে এরূপ ১৯টি পরিষদ আছে।

(থ) পণ্য বিক্রয়মণ্ডলী (Marketing Boards): ভারতের কৃষিজাত এবং ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি, বিক্রয় বৃদ্ধি, উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতি, উহার সম্প্রসারণ এবং উহার উন্নতির জন্য কার্যকরী পরামর্শ দানের জন্য বিভিন্ন বিক্রয়-মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে চা, কফি প্রভৃতি মণ্ডলী (Board) উল্লেখযোগ্য।

(দ) বিক্রয় দোকান (Sales Emporium): কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের প্রধান প্রধান শহরে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের জন্য অনেক দোকান খোলা হইয়াছে। The West Bengal

Handloom Emporium, The Kashmir Sales Emporium, The Madras Handloom Emporium প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।

(ধ) বাণিজ্যিক লাইব্রেরী এবং মিউজিয়াম (Commercial Libraries and Museums) : সরকারী এবং বে-সরকারী প্রচেষ্টায় এ জাতীয় অনেক লাইব্রেরী এবং মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহাতে বাণিজ্য-বিষয়ক নানাবিধ পুস্তকাদি, তথ্য ও লোকশিক্ষার জন্য নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে।

উন্নয়ন পরিষদ (Development Councils)

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে সরকারের নিষ্ক্রিয়ভাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ ছাড়া সরকার বিভিন্ন সংস্থা ও পরিষদের মাধ্যমে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির পথ প্রশস্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। এই বিভিন্ন সংস্থা ও পরিষদের মধ্যে উন্নয়ন পরিষদ (Development Councils) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উন্নতির উপায় উদ্ভাবনের জন্য কয়েকটি শিল্প-ক্ষেত্রে এরূপ উন্নয়ন পরিষদ গঠন হইয়াছে। যে যে শিল্পক্ষেত্রে এরূপ পরিষদ গঠিত হইয়াছে উহাদের মধ্যে ইক্ষু (Sugar), অজৈব রাসায়নিক (Inorganic Chemicals), মনুষ্য-নির্মিত তন্তু (Man-made Textiles), তৈল, পরিষ্কারক ও রং (Oils, Detergents and Paints), ভারী বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি (Heavy Electricals), মোটরগাড়ী, মোটরগাড়ী সহায়ক, পরিবহন যান, ট্রাক্টর ও মাটি-সরানো যন্ত্র এবং আভ্যন্তরীণ দহনযন্ত্র (Automobiles, Automobile Ancillary, Transport Vehicles, Tractor and Earth-moving Equipment and Internal Combustion Engines), ঔষধ ও ভেষজ বিজ্ঞান (Drugs and Pharmaceuticals), জৈব রাসায়নিক (Organic Chemicals), খাদ্য-প্রক্রিয়া (Food Processing), কাগজ, মণ্ড ও সম্বন্ধযুক্ত শিল্প (Paper, Pulp and Allied Industries), যন্ত্রের হাতিয়ার (Machine Tools), চামড়া ও চামড়ার জিনিস (Leather and Leather Goods), তন্তুশিল্পের যন্ত্রপাতি (Textile Machinery) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উন্নয়ন পরিষদের কাজ ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। উহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। উন্নয়ন পরিষদ (Development Councils) Industries (Development and Regulation) Act অনুযায়ী গঠিত। এরূপ পরিষদের সভ্য মালিক, শ্রমিক, বিশেষজ্ঞ এবং সম্ভোগকারীদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইয়া থাকে। যে যে কার্যের জন্য এরূপ উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হইয়া থাকে উহা আইনে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত আইন অনুযায়ী ইহার কার্য ও গুরুত্ব (Functions and Importance) নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১। যে শিল্পের জন্য যে পরিষদ গঠিত হইয়াছে উহার প্রথম কাজ হইবে উক্ত শিল্পের উৎপাদন লক্ষ্য (Targets) কি হইবে উহা সুপারিশ করা, উৎপাদন কার্যক্রমের (Programme) মধ্যে সংযোজনা (Co-ordination) স্থাপন করা এবং উহার অগ্রগতি (Progress) পর্যালোচনা (Review) করা।

২। উক্ত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার (Production Capacity) যাহাতে সদ্ব্যবহার হয় এবং উন্নতি বিধান হয় তজ্জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা।

৩। শিল্পের দক্ষতা ও ব্যয়ের (efficiency and cost) মান ও আদর্শ (standards and norms) স্থির করা।

৪। যাহাতে পণ্যের বিক্রয় ও বণ্টন পদ্ধতির উন্নতিবিধান ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

৫। পণ্যের আকার ও আয়তন অনুযায়ী উহার নির্দিষ্ট মান (standardisation) নির্ধারণ করা।

৬। নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদির (controlled materials) সুষ্ঠু বণ্টনে সাহায্য করা।

৭। কারবার পরিচালনায় উন্নত প্রণালী, দক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধি যাহাতে দেখা দেয় তাহার উপায় সুপারিশ করা।

৮। শ্রমিক কল্যাণ সাধন (labour welfare) করা এবং ছাঁটাই কর্মীদের বিকল্প চাকুরীর (alternative employment) ব্যবস্থা করা।

৯। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রণালী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উন্নতি বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার (Research) ব্যবস্থা করা।

১০। হিসাবরক্ষণ (Accounting) ও পরিব্যয় (costing)-সংক্রান্ত ব্যাপারে উন্নত প্রণালী উদ্ভাবন করা।

১১। পরিসংখ্যান (statistics and data) ও উহার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট মান (standardisation) নির্ধারণ করা।

১২। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের (small-scale and cottage industries) বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisation) এবং বিভিন্ন রকমের পণ্য উৎপাদন (diversification in production) সম্পর্কে উন্নতিবিধান।

১৩। শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা (productivity) বৃদ্ধি ও তাহাদের কাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিবিধান করা।

১৪। শিল্পের প্রয়োজনীয় সংবাদ ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও বিতরণ (dissemination) ব্যাপারে উন্নতিবিধান করা।

১৫। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশমত অন্যান্য বিষয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা ও কার্যক্রম প্রস্তুত করা এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ দ্বারা শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ক্ষেত্র প্রশস্ত করা।

সুতরাং প্রত্যেক পরিষদের উহার নির্দিষ্ট শিল্পের উপর প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ

ক্ষমতা বিস্তার করিবার অধিকার আছে। প্রত্যেক পরিষদের সভ্যগণ নির্দিষ্ট সময় পর পর মিলিত হইয়া বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা দ্বারা উন্নয়নমূলক পন্থা নির্ধারণ করিয়া থাকেন। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে পরিষদ গঠন যে যুগোপযোগী হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাদের চেষ্টায় নানাবিধ শিল্প প্রসার দ্রুততর হইতেছে ইহা শিল্পোন্নতির পরিসংখ্যান হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার উদ্দেশ্যে যে ব্যয় হইবে উহা নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পের উপর কর (less) ধার্য করার অধিকার রাখে। উক্ত কর হইতে আদায়ীকৃত অর্থ পরিষদকে নিম্নলিখিত ব্যয় নির্বাহের জন্য দেওয়া হয় :

(ক) পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য।

(খ) কর্মীদের প্রশিক্ষণের (Training) জন্য।

(গ) গবেষণার জন্য।

(ঘ) প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্য।

সুতরাং শিল্পজাত পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও অনুসন্ধান এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ দ্বারা দক্ষতা বৃদ্ধি যাহার উপর শিল্প নৈপুণ্য বিশেষভাবে নির্ভর করে উহার কোনটাই পরিষদের আওতার বাহিরে নয়।

বিক্রয়মণ্ডলী (Marketing Boards)

বিক্রয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইলে সম্ভোগকারীদের প্রয়োজন ও সন্তুষ্টির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। বিক্রয়ের কাজ প্রকৃতপ্রস্তাবে সম্ভোগকারীদের লইয়া। উহাদের চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী পণ্যের উৎপাদন না হইলে বিক্রয় প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। আবার চাহিদা ও রুচির পরিবর্তন ঘটাইয়া পণ্য ক্রয়ে প্রলুব্ধ করাও বিক্রয় প্রচেষ্টার অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে। বিক্রয়-মণ্ডলী (Marketing Boards) এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান যাহার চেষ্টায় কোনও পণ্যের উৎপাদনে উৎকর্ষ ও বিক্রয় কার্যে আশানুরূপ সাফল্য সংগঠিত হইয়া থাকে।

ভারতের কৃষিজাত এবং ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পজাত দ্রব্য জাতীয় জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এদিকে সম্যক দৃষ্টি দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই। সুতরাং স্বাধীনোত্তর যুগের বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে এদিকেও দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। কৃষিজাত এবং ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টি, বিক্রয় বৃদ্ধি উৎপাদনের উৎকর্ষ ও সম্প্রসারণ এবং এ জাতীয় বিভিন্ন পণ্য ও শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এজন্য স্বাধীনোত্তর যুগে কতকগুলি বিক্রয়মণ্ডলী (Marketing Boards) স্থাপিত হইয়াছে। উহারা পণ্যমণ্ডলী (Commodity Boards) নামেই বিশেষ পরিচিত। ইহাদের অনেকগুলি নির্দিষ্ট আইন দ্বারা গঠিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান Statutory Bodies)। ইহাদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই আছে। সরকার মনোনীত সরকারী ও বে-সরকারী সদস্য লইয়া এই সকল মণ্ডলী গঠিত। সংশ্লিষ্ট

পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যাপারে ইহাদের অবদান সত্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উহাদের কাজ ও গুরুত্ব (Functions and Importance) নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান মণ্ডলীর পরিচয় হইতে সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে :

১। **কেন্দ্রীয় চা-মণ্ডলী (Central Tea Board) :** ইহা ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের চা আইন (Tea Act) অনুযায়ী গঠিত হইয়াছে। উক্ত আইন কার্যকর করার ভার এই মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য—ভারত ও ভারতের বাহিরে চা বিক্রয় বৃদ্ধি করা, এবং উহার নূতন নূতন বাজার সৃষ্টি করা। চা উৎপাদনে উৎকর্ষ সাধন ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ ও চায়ের দালালদিগকে লাইসেন্স প্রদান করাও ইহার বিশেষ কাজ। চা রপ্তানীর উপর কর (less) ধার্য করিয়া উহার ব্যয় নির্বাহ হয়। চা রপ্তানী দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি প্রধান আয়। চা-মণ্ডলী ভারতের বাহিরে বিভিন্ন বাজারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে বিশেষ সহায়তা করিয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহা যে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অধিকার করিয়া আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২। **কফিমণ্ডলী (Coffee Board) :** ইহাও বিশেষ আইন দ্বারা সৃষ্ট এবং ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের Coffee Market Expansion Act-এর অন্তর্গত। এই মণ্ডলী ভারতের কফি শিল্পের উন্নতি এবং কফি বাজারের সম্প্রসারণের চেষ্টায় নিয়োজিত আছে। দেশের উৎপাদিত কফি আভ্যন্তরীণ বাজারে এই মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে নিলাম ও সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিক্রয় হইয়া থাকে। কফি রপ্তানীকারকদের এই মণ্ডলীর নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হয়। কফির বাজার সম্প্রসারণের প্রচারকার্য এই মণ্ডলীই চালাইয়া থাকে। ইহা ছাড়া গবেষণার দ্বারা চা আবাদের উৎকর্ষ সাধন ব্যাপারেও ইহা লিপ্ত আছে।

৩। **সর্বভারতীয় খাদি ও গ্রাম্য শিল্পমণ্ডলী (All India Khadi and Village Industries Board) :** ইহা Khadi and Village Industries Commission-এর নিকট সহযোগী এবং ইহার পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। প্রত্যেক রাজ্যেও এরূপ মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছে।

৪। **সর্বভারতীয় হস্তশিল্পমণ্ডলী (All India Handicrafts Board) :** ইহা ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ভারতের বিভিন্ন হস্তশিল্পের উন্নয়ন এবং উহাদের পণ্যাদি বিক্রয়ের পরামর্শদাতা হিসাবে বিশেষ সেবা পরিবেশন করিয়া আসিতেছে। প্রায় ৪০টি হস্তশিল্পের উন্নয়নে এই মণ্ডলী ব্যাপৃত। ইহার আওতায় শিল্পগুলির মধ্যে কার্পেট, ধাতুদ্রব্য, হাতে ছাপান, হাতীর দাঁত, জরি, কাঠ, বেত, বাঁশ, খেলনা, মাটির জিনিস ও অলঙ্কারাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫। **সর্বভারতীয় হস্তচালিত তাঁতমণ্ডলী (All India Handloom Board) :** ইহা ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হস্তচালিত

তাঁতশিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন ও উহাতে উৎপাদিত পণ্যাদি বিক্রয় সম্প্রসারণের পরামর্শ-দাতা হিসাবে ইহা কাজ করিয়া আসিতেছে। এই পরামর্শদানের জন্য ইহার পাঁচটি আঞ্চলিক অফিস ও উহার অধীনে ১১টি অফিস আছে।

৬। **কেন্দ্রীয় রেশমমণ্ডলী (Central Silk Board):** ইহা ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে স্থাপিত হয়। পরে অবশ্য ইহা পুনর্গঠিত হয়। ভারতের রেশম চাষের তদারকি ভার এবং রেশম শিল্পের উন্নয়নের সর্ববিধ দায়িত্ব ইহার উপর ন্যস্ত আছে। রেশম মহার্ঘ দ্রব্য। কিভাবে ইহার মূল্য হ্রাস পাইতে পারে তজ্জন্যও ইহা গবেষণায় লিপ্ত আছে।

৭। **নারিকেলকাতা মণ্ডলী (Coir Board):** ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের Coir Industry Act অনুযায়ী ইহা গঠিত। নারিকেলের ছোবড়া হইতে যে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন হয় উহার উন্নয়নে ও রপ্তানীতে ইহা ব্যাপৃত। ইহার প্রধান কার্যালয় কেরল রাজ্যের এর্নাকুলামে অবস্থিত।

৮। **ভারতীয় রবারমণ্ডলী (Indian Rubber Board):** ইহাও বিধি-বদ্ধ সংস্থা এবং ভারতের রবার শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ইহা রবার চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্যই বিশেষভাবে ব্যাপৃত।

সুতরাং বিভিন্ন পণ্যমণ্ডলী যে নানাবিধ শিল্পের উন্নতিতে মনোনিবেশ করিয়া আছে এবং উহাদের উন্নতি ও সম্প্রসারণে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে ইহার দান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক শিল্পে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা (Steps taken by Government, both Central and State, in India for extending financial assistance to industries)

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পে আর্থিক সাহায্য দিয়া আসিতেছেন। ভারতের মত শিল্পে অনুন্নত দেশে এরূপ সাহায্য নিতান্তই প্রয়োজন। প্রত্যক্ষভাবে বে-সরকারী কারবারের শেয়ার ক্রয় দ্বারাও এই সাহায্য দেওয়া হয়। অপ্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার (Financial Institution) মাধ্যমে এই সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের দেশে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক ব্যাঙ্ক, ম্যানেজিং এজেন্ট, মহাজন, সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতির মাধ্যমে শিল্পে অর্থ সাহায্য অর্থাৎ ঋণের ব্যবস্থা প্রচলিত। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রয়োজন মিটাইতে পারিতেছে না বলিয়া সরকারী প্রচেষ্টায় বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহারা নানাভাবে শিল্পে ও বাণিজ্যে অর্থের যোগান দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে Industrial Finance Corporation, State Financial Corporation, Industrial Credit and Investment Corporation, National Industrial Development Corporation, National Small Industries Corporation, Industrial Development Bank প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। State Aid to Industries Act-

এর মাধ্যমে সরকার প্রত্যক্ষভাবে শিল্পে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানেও সরকার প্রত্যক্ষভাবে ঋণ দিয়াছেন। তন্মধ্যে জাহাজ কোম্পানী, লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প এবং রাসায়নিক-শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জাহাজ কোম্পানীগুলিকে প্রথম পরিকল্পনাকালে সরকার ২৪ কোটি টাকা ঋণ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এইভাবে ঋণ দেওয়ার জন্য ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। এই ঋণের সুদ স্থির হয় শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। Iron and Steel Equalisation Fund হইতে টাটা এবং ইণ্ডিয়ান্ আইরণকে ১০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন পর্যন্ত এই ঋণের উপর কোন সুদ দাবী করা হয় নাই। ইহার পর হইতে উহার উপর শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হারে সুদ ধার্য হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আইরণ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর সহিত বেঙ্গল স্টীল কর্পোরেশনের সংযুক্তির এবং সম্প্রসারণের জন্য ৭.২০ কোটি টাকা বিশেষ ঋণ দেওয়া হয়। এইভাবে আরও অনেক কোম্পানীকে সরকার প্রত্যক্ষভাবে ঋণ দিয়া আসিতেছেন।

ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণ দেওয়া ব্যাপারে স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আছে। ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ইহা বিভিন্নভাবে সাহায্য করিতেছে। ইহার সুবিধাজনক শর্তে অর্থ সাহায্য পরিকল্পনা (Liberalised scheme of financial assistance) এবং পথনির্দেশক পরিকল্পনা (Pilot Scheme) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণের জন্য স্টেট্ ব্যাঙ্কের এজেন্টদের নিকট আবেদন পাঠাইতে হয়। উক্ত আবেদনপত্রের ভিত্তিতে স্টেট্ ব্যাঙ্ক অন্যান্য ঋণ-সংস্থার সহযোগিতায় ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এইভাবে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের শেষে বিভিন্ন শিল্পে প্রায় ৫৬ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কও ঋণ-সংক্রান্ত ব্যাপারের মীমাংসার জন্য শিল্প-ঋণ (Industrial Credit) বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছে। ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ঋণের প্রত্যাভূতি পরিকল্পনা (Credit Guarantee Scheme) এবং বৃহৎ শিল্পের জন্য Industrial Development Bank প্রতিষ্ঠা ঋণদান ব্যাপারে বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

সুতরাং সরকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন উপায়ে শিল্প-বাণিজ্যে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন।

বণিক সভা এবং উহার কার্যাবলী (Chamber of Commerce and its functions)

শিল্প-বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করেন তখন উহাকে বণিক সভা নাম দেওয়া হয়। ইহা একটি অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং সভ্যগণের মধ্যে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি প্রভৃতি যেমন থাকেন, তেমন আবার হিসাব পরীক্ষক, হিসাব রক্ষক, আইনবিদ্ প্রভৃতিও থাকেন। ইহা যৌথ কারবারের ভিত্তিতে নিবন্ধন হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার নামের শেষে 'লিমিটেড'

(Limited) কথাটি যুক্ত থাকে না। ইহা স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। একাধারে ইহা সদস্যের স্বার্থরক্ষায় ব্যাপৃত এবং অন্যদিকে জনকল্যাণের জন্য জনসম্পর্ক (Public Relations) স্থাপনেও বিশেষ সচেষ্ট। ইহার এবংবিধ কার্যাবলী নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে :

১। ইহা শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং উক্ত তথ্যাদি পুস্তকের আকারে কিংবা রিপোর্টের আকারে উহার সভ্যগণকে এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য সরবরাহ করিয়া থাকে।

২। ইহা শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক পুস্তকের পাঠাগারও (Library) রাখিয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে পড়াশুনা বা গবেষণা কার্যে লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের পক্ষে এরূপ পাঠাগার বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে।

৩। ইহা শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক পত্রিকা, ব্যবসা সমীক্ষা (Review of Trade) প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সকল পুস্তক পাঠ করিলে শিল্প বাণিজ্যের অতীত ও বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানলাভ হয় এবং উহাদের ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। ইহার ফলে সদস্যগণ ও জনসাধারণ উভয়ই উপকৃত হয়।

৪। ইহা সংবাদ-সংস্থা (Information Bureau)-ও স্থাপন করিয়া থাকে। ইহার ফলে শিল্প-বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষে তথ্য জানা সহজসাধ্য হয়। এইভাবে ইহা শিল্প বাণিজ্য প্রসারে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

৫। অনেক বণিক সভা বাণিজ্যশিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষা প্রদান, পরীক্ষা গ্রহণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করিয়া থাকে। লণ্ডন চেম্বার্স অব কমার্স এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

৬। ইহা সভ্যদের ট্রেড মার্ক (Trade mark) ও পেটেণ্ট (Patent) সংক্রান্ত অধিকার রক্ষার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

৭। নির্দিষ্ট মানের সঠিক ওজন ও মাপ যাহাতে সর্বত্র চালু থাকে বা ব্যবহৃত হয় সেদিকেও ইহা দৃষ্টি দিয়া থাকে। ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ উপকৃত হইয়া থাকেন।

৮। রপ্তানী বাণিজ্যে ইহা প্রভব লেখ (Certificate of Origin) প্রদান করিয়া থাকে। এরূপ সার্টিফিকেটের বলে আমদানীকারক শুল্ক সম্বন্ধে সহজেই সুবিধা পাইয়া থাকে।

৯। ইহা বৈদেশিক বাণিজ্য সহজসাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে জাহাজ ও অন্যান্য পরিবহন-সংক্রান্ত বিষয়ের নানাবিধ তথ্য, আইন-কানুন প্রভৃতি পরিবেশন করিয়া থাকে।

১০। ইহা প্রয়োজন হইলে সভ্যদের পক্ষে বাণিজ্য হুণ্ডিতে (Bill of Exchange) স্বীকৃতি দিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের স্বীকৃতির মত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইহা বিশেষ সহায়ক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে এবং লেন-দেন সহজসাধ্য করে।

১১। বৈদেশিক বাণিজ্য-চুক্তি, শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে কর স্থাপন, আইন পাস প্রভৃতি সম্পর্কে ইহা পরামর্শদাতা এবং উপদেষ্টার কাজ করিয়া থাকে।

১২। সভ্যদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিলে ইহা সালিশীর (Arbitrator) কাজ করিয়া থাকে।

সুতরাং শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে ইহা বিভিন্নভাবে সহায়তা করিয়া থাকে এবং ইহার সভ্যদের এবং জনসাধারণের বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শকের (friend, philosopher and guide) কাজ করিয়া থাকে। Bengal Chamber of Commerce, Bharat Chamber of Commerce, Bengal National Chamber of Commerce and Industry, Indian Chamber of Commerce প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন বণিক সভা।

বণিক সভার সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational Structure of a Chamber of Commerce)

বিভিন্ন বণিক সভার সাংগঠনিক কাঠামোর প্রকৃতি প্রধানত এই প্রকারের। তবে প্রত্যেক বণিক সভা নিজস্বতা রক্ষার জন্য উহার সংগঠনে বিশেষ কোন বিষয়ের উপর আলোকপাত করিতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে বেঙ্গল ন্যশনাল চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির (Bengal National Chamber of Commerce and Industry) সাংগঠনিক কাঠামো আলোচনা করিতে পারি।

১। এই সংস্থা ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২য়া জানুয়ারী প্রথম স্থাপিত হয়। তবে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে যে সংবিধান (Constitution) গৃহীত উহার সামান্য রদবদল দ্বারা বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো রচিত।

২। ৩২ জন সদস্য লইয়া ইহার একটি কার্যকরী কমিটি (Executive Committee) গঠিত। উক্ত কমিটি ইহার পরিচালনার নীতি নির্দেশ দিয়া থাকে এবং পরিচালকমণ্ডলী হিসাবে অন্যান্য কাজ-কারবারের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে। এই কমিটির একজন প্রেসিডেণ্ট, দুইজন ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট এবং একজন অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ (Honorary Treasurer) আছে। পূর্বে ইহার একজন অবৈতনিক সেক্রেটারী ছিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান অনুযায়ী অবৈতনিক পদটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উহার পরিবর্তে এখন একজন সবেতন সেক্রেটারী ও একজন সহকারী সেক্রেটারী আছেন। এই সেক্রেটারী ও সহকারী সেক্রেটারী অফিস পরিচালনার যাবতীয় কার্য নির্বাহ করেন।

৩। এই সংস্থার সভ্যের সংখ্যা প্রায় ৩০০। যে সকল কারবারী প্রতিষ্ঠানের কাজ-কারবার প্রধানত পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে উহারা এই সংস্থার সভ্য হইতে পারেন। এই সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ইহার সভ্যগণ ব্যবসা পরিচালনে যাহাতে একই নীতি অনুসরণ করে উহাও দেখা ইহার কাজ। অনেক যৌথ কারবার, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, ষ্টীমার

কোম্পানী, ক্লিয়ারিং এজেন্ট (Clearing Agent) প্রভৃতি ইহার সভ্য। সভ্যদের কারবারী স্বার্থের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং উহা রক্ষা করা এই সংস্থার বিশেষ কাজ।

৪। কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার বিভিন্ন পদমর্যাদার অনেক কর্মচারী আছে।

৫। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহার একটি শ্রমিক বিভাগের গোড়াপত্তন হয়। শ্রমিকদের সমস্ত লইয়া সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা ও উহাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার মীমাংসা করা এই বিভাগের বিশেষ কাজ।

৬। অর্থনৈতিক ব্যাপার (Economic Affairs) পরিচালনার জন্যও ইহার একজন পৃথক সেক্রেটারী আছে।

৭। সভ্যদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ মিটানোর ব্যাপারেও ইহার বিশেষ ভূমিকা আছে। এই সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্যের ধারক ও স্মারক হিসাবে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থরক্ষায় ইহা প্রহরীর মতই কাজ করিয়া আসিতেছে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. Discuss the influence of Government over business and the methods of Government interference over it.

কারবারের উপর সরকারী প্রভাব এবং সরকারী হস্তক্ষেপের পদ্ধতি আলোচনা কর।

2. What is Nationalisation ? Discuss the advantages and disadvantages of nationalisation.

জাতীয়করণ কাহাকে বলে ? উহার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

3. Give an account of the Industrial Policy of the Government of India.

ভারত সরকারের শিল্পনীতির বিবরণ দাও।

4. What steps have been taken by Central and State Government in India for furtherance of industry, trade and commerce ? (A general idea is wanted)

[C. U. B. Com. (Hons.) 1965]

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। (একটি সাধারণ ধারণা চাই)

5. Describe the different Government departments and Public bodies which have been established to regulate and promote Industry and Commerce.

যে সকল সরকারী বিভাগ এবং সাধারণ প্রতিষ্ঠান শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের জন্য স্থাপিত হইয়াছে উহাদের বিবরণ দাও।

6. What steps Government, both Central and State, have taken in India for extending financial assistance to industries and what are the broad conditions laid down for obtaining such assistance ?

[C. U. B. Com. (Hons.) 1964]

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের শিল্পে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত সাহায্য পাওয়ার জন্য কি কি শর্ত আরোপ করিয়াছেন ?

7. What do you understand by a Chamber of Commerce and Industry ? Discuss its functions. [C. U. B. Com. 1952, 1963]

বণিক ও শিল্প সভা কাহাকে বলে ? উহার কাজ আলোচনা কর।

8. Discuss the functions of a Chamber of Commerce. Enumerate briefly the organisational structure of any Chamber of Commerce that you may know. [C. U. B. Com. (Hons.) 1971]

বণিকসভার কাজ আলোচনা কর। যে বণিক সভা জান উহার সাংগঠনিক কাঠামো উল্লেখ কর।

9. Explain the importance and functions of Development Councils or Marketing Boards. [C. U. B. Com. (Hons.) 1972]

উন্নয়ন পরিষদ বা বিক্রয়মণ্ডলীর গুরুত্ব ও কাজ ব্যাখ্যা কর।

10. Explain the Public Relations aspects of a Chamber of Commeree. [C. U. B. Com. (Hons.) 1973]

বণিকসভার জন-সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয় ব্যাখ্যা কর।